গল্পসমগ্র ৩

সুবোধ ঘোষ

সুপ্রকাশনী
৮ বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

মুদ্রণে
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

সূচী

গল্পসমগ্র ৩

কালপুরুষ

যাঁর নাম তিনকড়ি দত্ত তাঁরই নাম কালপুরুষ।

জীবনবাবু বলেন— শুনেছ হে তিনকড়ি, ছেলেরা তোমার যে নতুন একটা নাম দিয়েছে?

—কি?

—কালপুরুষ।

তিনকড়ি দত্তের গম্ভীর মুখের উপর যেন একটা সূক্ষ্ম হাসির শিহর সিরসির করে ওঠে। আস্তে আস্তে মুখ তুলে জীবনবাবুর মুখের দিকে তাকান তিনকড়ি দত্ত। তারপরেই মুখ নামিয়ে নিয়ে আবার কাজ করতে থাকেন। এবং হেঁট মুখেই যেন আনমনার মতো বিড়বিড় করেন— তা একরকম ঠিকই বলেছে।

নিকেলের ফ্রেমের চশমা। পুরু কাচ। ঘাড় ঝুঁকিয়ে যখন কাজ করেন তিনকড়ি, তখন চশমা আলগা হয়ে চোখের কাছে ছোট ছোট একটা দূরবীনের মতো ঝুলতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘাড় টান করে যখন পথের দিকে তাকান, তখন তিনকড়ি দত্তের চোখদুটোকে ড্যাবা-ড্যাবা দুটো কাচের ঢেলার মতো দেখায়।

তিনকড়ি দত্তের এই ঘড়ির দোকানকেই ছেলেরা কালপুরুষের দোকান বলে। তিনকড়ি দত্তের চেহারা, তাঁর এই দোকানের চেহারা এবং তাঁর গম্ভীর মুখের ভাষার মধ্যেও এমন কিছু আছে, যে জন্য মনে হয়, হ্যাঁ, ছেলেরা ঠিকই বলেছে, কিছু বেমানান হয়নি। লোকটা কালপুরুষই বটে।

ঘড়ির দোকানের চেহারাটা এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বলতে গেলে একটুও বদলায়নি। সেই একটি টুল, তার সামনে কাঠের ছোট একটা ডেস্ক। তিন তাকের একটা ছোট আলমারি আর দেয়ালের গায়ে গোটা দশেক ক্লকের খোলস। টেবিলের উপর ঘাড় ঝুঁকিয়ে ছোট ছোট কাঁটা আর চিমটে নিয়ে ঘড়ি মেরামত করেন তিনকড়ি দত্ত। মাঝে মাঝে নিকেল-ফ্রেমের চশমার পুরু কাচ একেবারে ঘড়ির ধড়ের উপর ঠেকিয়ে দিয়ে ঘড়ির ব্যাধি সন্ধান করেন।

ঘড়ি মেরামত করতে এসেছেন যে ভদ্রলোক, তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁফ ছাড়েন তিনকড়ি।

—কালচক্র! এর মরজি ঠাহর করা চারটিখানি কথা নয় মশাই!

ঘড়ির ধড়ের উপর আবার সেই ড্যাবা-ড্যাবা চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নাড়েন তিনকড়ি দত্ত। —হুঁ, এই ব্যাপার!

—কি? আগন্তুক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

তিনকড়ি বলেন— ব্যালেন্স স্টাফ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। চার্জ পড়বে তিন টাকা দু-আনা।

কোন মক্কেল তিন টাকা দু-আনা দিতে রাজি হয়, অনেকেই আবার রাজি হয় না। কেউ

কেউ দর কমাবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তিনকড়ি দত্ত এককথার মানুষ। বেশ ভদ্রভাবে এবং শান্ত স্বরে, সেই ড্যাবা-ড্যাবা কাচের গোলকের মতো দুটি চোখ তুলে একই কথা বলেন— এ তো হেলাফেলা করে সেরে দেবার মতো নিতান্ত একটা কারিগরী কাজ নয় মশাই। এসব হলো কালের ব্যাপার। এক চুল এদিক-ওদিক হলে কত অঘটন ঘটে যেতে পারে।

লোকে বলে টাইম, সময়! তিনকড়ি বলেন কাল! যখন ঘড়ির টাইম টিউন করেন তিনকড়ি, তখন তাঁর গম্ভীর মুখের রকম-সকম দেখলে মনে হয়, যেন নিগূঢ় কালের মহিমা কিংবা রহস্যের সঙ্গে একটা জানাজানি কানাকানি আর ধরাছোঁয়ার খেলা খেলছেন তিনকড়ি।

সন্ধ্যাবেলা যাঁরা তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানে এসে বসেন, তাঁদের কারও ঘড়ি নেই। ঘড়ি মেরামতের কোন দরকার বা তাগিদও তাঁদের নেই। সন্ধ্যার সময়টা শুধু সংসারের সুখ-দুঃখের কথা বলে পার করে দিতে হয় ; তিনকড়ির দোকানটা এরকম সান্ধ্য আসরের জায়গা হিসাবে মন্দ নয়। খরিদ্দারের ভিড় নেই। ক্বচিৎ ও কদাচিৎ দু-একজন মেরামতের মক্কেল আসে। আর আসে তারা, যাদের সংসারে একটা শুভ ঘটনার লগ্ন আসন্ন হয়েছে। শুভ বিবাহের, শুভ যাত্রার, অথবা শুভকর্মের ঘটনা।

—টাইম ঠিক করে দিন তিনকড়িদা।

ছোট-বড় ও মাঝারি, নানা আকারের হাতঘড়ি, কিংবা বড় দেয়ালঘড়িও কেউ কেউ নিয়ে আসে। ঘড়িটার ধড় খুলে একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে, ঘড়ির গায়ে দু-একটা টোকা দিয়ে, এবং কখনও বা কাচের কভার খুলে ডায়ালের উপর ফুঁ দিয়ে, ঘড়ির চাবি ঘুরিয়ে দম পুরো করে দেন তিনকড়ি। তারপর আলমারির ভিতরে রাখা একটা মলিন চেহারার টাইম-পীসের দিকে তাকান। টিক-টিক করে সময় বাজিয়ে চলেছে তিনকড়িদার ত্রিশ বছরের পুরনো টাইম-পীস। এই টাইম-পীসের সময়ের সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিয়ে হাতের ঘড়িটাকে একবার কানের কাছে তোলেন, তারপরেই আগন্তুকের হাতে ফিরিয়ে দেন। সকলেই জানে, এর জন্য মাত্র আট আনা চার্জ করেন তিনকড়িদা।

তিনকড়ি দত্তের ঐ ত্রিশ বছরের পুরনো টাইম-পীসের একটা সুনাম আছে, যেটা তিনকড়ি দত্তেরই কারিগরী জীবনের একটা সুনাম। তিনকড়ি দত্তের হাতে টাইমের টিউনিং একেবারে নিখুঁত হয় বলে অনেকেরই বিশ্বাস আছে। তিনকড়ি দত্তের হাত বড় পয়া। ডাকঘরের ঘড়ির সঙ্গে দু-তিন মিনিট যদি অমিলও হয়ে যায়, কিবা আসে যায়? অনেকেই বিশ্বাস করে, তিনকড়ি দত্তের ঐ টাইপ-পীসই ঠিক টাইম রাখে। শুভলগ্নগুলিকে একেবারে ঠিকঠিক কাঁটায় কাঁটায় ধরে ফেলে তিনকড়ি দত্তের হাতে টিউন করা ঘড়ি।

জীবনবাবু বলেন— ঠিকই, সত্যেনবাবুর জামাই বেচারা সেদিন যদি ওর নিজের ঘড়িকে বিশ্বাস করে রওনা হতো, তবে বেচারার প্রাণ শেষ হতে যেত।

অনাথবাবু— কি ব্যাপার?

জীবনবাবু— পঞ্জিকামতে যাত্রা শুভ ছিল আটটা একান্নতে। জামাই বেচারা ওর নিজের ঘড়ির আটটা একান্নতেই রওনা হবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু বাধা দিলেন সত্যেনবাবু। আমাদের তিনকড়ির ঘড়ির মতে সত্যেনবাবুর ঘড়িতে তখন আটটা আটচল্লিশ। কাজেই জামাই বাবাজীকে আরও তিন মিনিট অপেক্ষা করে রওনা হতে হলো। প্রাণে বেঁচে গেলেন বাবাজী।

অনাথবাবু— তার মানে?

জীবনবাবু— প্রথম বাসটা ধরতেই পারলেন না বাবাজী। চকে পৌঁছবার এক মিনিট আগেই বাসটা চলে গিয়েছিল। কাজেই পাঁচ মিনিট পর দ্বিতীয় বাসটিতে জায়গা নিতে হয়েছিল।

অনাথবাবু— কিন্তু শেষ পর্যন্ত...কি...ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ?

জীবনবাবু— প্রথম বাসটা এক মাইল পর্যন্ত গিয়েই আর একটা বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়েছিল, আর তিনজন যাত্রী প্রাণে মারাও গিয়েছিল।

জীবনবাবুর গল্পটা থামতেই আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকান তিনকড়ি দত্ত। সেই গম্ভীর মুখের উপর একটা সূক্ষ্ম প্রসন্নতার শিহর।

তিনকড়ি বলেন— সবই কালের খেলা।

সবই কালের বিধান। কালের নিয়ম। কালের নির্দেশ। কাল পূর্ণ হলে হয়, না হলে হয় না, শুভ কিংবা অশুভ। তিনকড়ি দত্তের গম্ভীর মুখে এই ধরনের গম্ভীর কথাগুলি যখন গম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে বাজে, তখন আর একবার মনে হয়, এবং বিশ্বাসও হয়, ঠিকই বলেছে ছেলেরা, লোকটা কালপুরুষই বটে।

তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের এহেন সান্ধ্য আসরে বসে গল্প করতে করতে জীবনবাবু একদিন হেসেই ফেললেন— কি ব্যাপার তিনকড়ি ?

—কি ?

—মনে হচ্ছে, কাল জয় করবার চেষ্টা করছ !

—বুঝলাম না জীবনবাবু।

—তোমার বয়স কত ?

—আপনার চেয়ে কিছু কমই হবে।

—তা জানি, কিন্তু কত কম ?

—বছর সাত-আট।

—তার মানে, তোমার বয়স এখন তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন !

—তা হবে।

—মাথার চুল সাদা হবার বয়স।

—হ্যাঁ।

—ক'দিন আগেও তো তোমার মাথায় বেশ সাদার ঘটা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

—তা দেখেছেন বৈকি।

—কিন্তু আজ এতো কালো কেন ? কলপ দিয়ে কাল জয় করছ বোধহয়।

মাথা হেঁট করেন তিনকড়ি দত্ত। আর নিকেল ফ্রেমের চশমা ঝুঁকিয়ে একমনে কাজ করতে থাকেন।

এবং, তার কিছুদিন পরে আর এক সন্ধ্যায় তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের এই ছোট বারান্দায় একটি চৌকির উপরে মাত্র মিনিট দশেক বসেই চলে গেলেন জীবনবাবু আর অনাথবাবু।

জীবনবাবু বিরক্তভাবে বললেন— না, তুমি একটা কাণ্ডই করলে তিনকড়ি।

বিয়ে করেছেন তিনকড়ি দত্ত। এটা হলো তৃতীয় বিয়ে। ত্রিশ বছর আগে প্রথম বিয়ের পর এক বছর যেতে না যেতেই স্ত্রীর মৃত্যু হলো। তার দশ বছর পরে দ্বিতীয় বিয়ে। সে স্ত্রীও তিন বছরের বেশি রইল না। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর যোলটা বছর একলা জীবন পার করে দিতে পেরেছে যে মানুষ, সে মানুষ কালের কোন্ নির্দেশে আবার বিয়ে করে ? তিনকড়ি

দত্তকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল জীবনবাবুর কিন্তু একটু বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে, এবং বোধহয় বেশ একটু ঘৃণাবোধ করেছিলেন বলেই রূঢ় প্রশ্নটা আর মুখ খুলে উচ্চারণ করতে পারেননি। মোট কথা, তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের সান্ধ্য গল্পের প্রৌঢ় আসরটাই ভেঙে গেল।

এইতো, সরু গলির মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার ছোট একটা বাড়ি। ভিতরে দুটো ঘর, আর বাইরে একটা বারান্দা। বারান্দাটার একপাশে দোকান, আর এক পাশে একটা চৌকি। বড় একটা ঝাঁপ নামিয়ে দিলেই দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়, আর বারান্দাটা বন্ধ হয় একটা দরজা বন্ধ করে দিলে।

রোজগার বলতে ঐ তো রোজগার। একটা একলা পেট চলে যায়, এইমাত্র। সে মানুষ বিয়ে করলো কোন্ সাহসে আর কোন্ লজ্জায় ?

এমন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়েই বা দিল কে ? আর মেয়েটাই বা কেমন ?

তিনকড়ি দত্তের বিয়ের পর অনাথবাবু আর জীবনবাবু যতখানি রাগ করে সান্ধ্য আসরটা ভেঙে দিযে চলে গেলেন, তার চেয়ে বেশি রাগ করলেন, যখন শুনতে পেলেন যে, তিনকড়ি দত্তের বউ সত্যিই যা-তা একটা মেয়ে নয়। খেঁদি-পেঁচি নয়, বুড়ি-ধাড়িও নয়। জীবনবাবুর স্ত্রী আর অনাথবাবুর স্ত্রী, দুজনেই তিনকড়ি দত্তের নতুন বউকে দেখে এসে আশ্চর্য হয়ে আক্ষেপ করলেন— আহা, মেয়েটা দেখতে সত্যিই বড় সুন্দর। বয়স একটু বেশি হলেও তেমন কিছু বেশি নয়। বউটা নিজের মুখেই যখন বললে যে ত্রিশ বছর বয়স, তখন সত্যি করে বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হতেই পারে না।

কার মেয়ে— কোথাকার মেয়ে— সে-সব তথ্যও কিছু কিছু জেনে নিয়েছেন জীবনবাবুর স্ত্রী আর অনাথবাবুর স্ত্রী। খুব গরিবের মেয়ে নয়। বাপ আছে, মা আছে। বাপের একটা কাপড়ের দোকান আছে। দোকানের আয়ও কম নয়।

জীবনবাবু বলেন— তবে তো তিনকড়ির কথাই মেনে নিতে হয়। সবই কালের নির্দেশ। কালের ইচ্ছা।

অনাথবাবু বলেন— রেখে দিন মশাই। খোঁজ নিয়ে দেখুন, কি-না-কি ধাপ্পা দিয়ে মেয়ের বাপকে ভুলিয়েছে তিনকড়ি। অনেক টাকা পয়সা আছে বলে একটা বড়াই দেখিয়ে, ভাঁওতা দিয়ে…।

জীবনবাবু— কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মেয়ের বাপটাই একটা বেহদ্দ কৃপণ। টাকা-পয়সা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি ছিল না।

অনাথবাবু— তাই হবে বোধহয়। নইলে মেয়েটারই বা বিয়ে হতে এত দেরি হবে কেন ?

এমন বিয়ের পরিণাম কি হতে পারে ? রোজই সন্ধ্যার আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে পথের এক কিনারা ধরে বেড়াতে বেড়াতে যখন আলোচনা করেন জীবনবাবু আর অনাথবাবু, তখন তাঁরাও কল্পনা করতে পারেন না যে, এই প্রশ্নটা তিনকড়ি দত্তের ঘরের ভিতরেও একটা কঠোর বিস্ময়ের স্বরে কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে। নিয়তি হঠাৎ বলে ওঠে— আশ্চর্য!

তিনকড়ি—কি ?

নিয়তি— বুঝে দেখ।

তিনকড়ি— সত্যি বুঝতে পারছি না নিয়তি।

নিয়তি— এ বিয়ে কেন হলো ?

তিনকড়ি— হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি ভাবতেও পারিনি যে, যে মানুষের দু-দুবার বিয়ে হয়েছে আর স্ত্রী মারা গিয়েছে, সে মানুষের আবার এই বয়সে নতুন করে একটা বিয়ে হয়ে গেল কেন ?

নিয়তি হাসে— বাঃ।
তিনকড়ি— কি ?
নিয়তি— তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কেউ যেন তোমাকে জোর করে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে।
তিনকড়ি হাসেন— কতকটা সে-রকমই ব্যাপার নিয়তি। কালের ইচ্ছেয়...
মুখ ফিরিয়ে নেয়, সরে যায় নিয়তি। আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাঁধা বিনুনীটা খুলতে থাকে, আর বোধহয় দু-চোখের ভ্রূকুটি চাপতে চেষ্টা করে। তারপরেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।
—কি হলো নিয়তি ? আমার কথা শুনে হাসছো ?
—না, আমি ভাবছি আমার কথা।
—কি ?
—ভাবছি, এই বিয়ে হবে বলেই কি আমিও কালের ইচ্ছায় এতদিন ধাড়ি হয়ে বাড়িতে বসেছিলাম ?
তিনকড়ি বলেন— তুমি ঠিকই ভেবেছ নিয়তি।
নিয়তির চোখের বিস্ময় এইবার যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে। একটা ভয়ের বিস্ময়,বোধহয় একটা ঘৃণারও বিস্ময়। মানুষটার মনে একটা সন্দেহও নেই যে, বিয়ে করে ভুল করেছে। মনের ভিতরে একটা আক্ষেপও নেই যে, এই বয়স আর এই রকম একটা ঘড়ির দোকানের রোজগার নিয়ে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে শুধু বিয়ে করাই হয়, সে মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যায় না। নিয়তির জীবনকে ঠকাতে গিয়ে ওর নিজেরও জীবন ঠকেছে, এই বোধও কি নেই মানুষটার ?
যেন একটা দুঃসহ অভিযোগের জ্বালা চাপতে চেষ্টা করে নিযতি। —এমন বিয়ে যেন কারও না হয়।
তিনকড়ির চোখে-মুখে যেন একটা নির্বোধ ও বেহায়া প্রসন্নতার মৃদু হাসি থমথম করে। —কালের কৃপা না হলে হতে পারে না নিয়তি। আমার মতো মানুষের ঘরে তোমার মতো মানুষ আসবে, এ তো চারটিখানি সৌভাগ্যের কথা নয়।
মাথা হেঁট করে নিয়তি। আস্তে আস্তে, যেন একটা করুণ অলসতার ভারে অবশ হযে মেজের উপর বসে পড়ে, তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে নিযতি।
—ছিঃ, ছটফট করে কাছে এগিয়ে আসেন তিনকড়ি। তিনকড়ির চোখ দুটো যেন বেদনার ভারে এই মুহূর্তে ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝরাবে। একটা পাখা হাতে নিয়ে নিয়তির মাথার উপর বাতাস দিতে থাকেন।
অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে তাকায় নিয়তি। নিয়তির চোখ দুটো যেন ঘুম-ঘুম ক্লান্তির ভারে ছোট হয়ে গিয়েছে। তিনকড়ির হাত থেকে পাখাটাকে কেড়ে নিয়ে নিয়তি বলে— যাও।
—কোথায় ?
—শুনতে পাচ্ছ না, খদ্দের হাঁকডাক করছে ?
হ্যাঁ, কে একজন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছে— কোথায় গেলে তিনকড়িদা, ঘড়ির টাইমটা একটু ঠিক করে দাও।
ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়ে আবার দোকানের সেই ছোট টুলের উপর বসেন তিনকড়ি, আর চোখের উপর নিকেল-ফ্রেমের মোটা চশমাটাকে চাপতে থাকেন।

—তোমার কি একটুও ভয় নেই ? পিছনে না তাকিয়ে, শুধু পিছনের একটা ছায়ার স্পর্শে যেন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করে নিয়তি, আর, ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে খোলা চুলের বোঝা নেড়ে-চেড়ে খোঁপা বাঁধতে থাকে।

—কিসের ভয় ? আশ্চর্য হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন তিনকড়ি।

—হঠাৎ এই যে একটা বিয়ে করে ফেললে, যে বিয়ের ফল ভালো হতে পারে না।

—কাল শুভ হলে বিয়ের ফল ভালো হবে না কেন নিয়তি ?

—তার মানে ?

—খুব শুভলগ্নে আমাদের বিয়ে হয়েছে।

কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে যেন ছুটে বের হয়ে যায় নিয়তি। উঠোনের উপর এসে দাঁড়িয়ে একটা হাঁপ ছাড়ে। যেন প্রচণ্ড একটা ঠাট্টার সাপ নিয়তির হৃৎপিণ্ডের উপর ছোবল দেবার জন্য ফণা তুলে হিসহিস করে উঠেছে।

উঠোনের ওপারে একটা ছোট ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায় নিয়তি। কপাটের শিকলটাকে ঝনঝন করে বাজিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —রান্না ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে যাবে ?

—অ্যাঁ ? কি হয়েছে ? কি বলছো নিয়তি ? বলতে বলতে এগিয়ে আসেন তিনকড়ি।

কপাটটা একটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দেয় নিয়তি। —শুধু চাল আছে, আর কিছু নেই। কি রাঁধবো বলে যাও।

এগিয়ে এসে নিয়তির একটা হাত ধরে সান্ত্বনা দেন তিনকড়ি। —এই কথা ! ...বেশ তো... এর জন্যে চিন্তা কি ? ...আমি এখনি আসছি !

ঘরের ভিতরের তাকের উপর থেকে একটা কৌটো তুলে নিয়ে কৌটার ঢাকনি খোলেন আর টাকা বের করেন তিনকড়ি। পাঁচ-টাকার পাঁচটা নোট।

নিয়তি বলে— তুমিই না বললে, ও টাকাটা কবালীবাবুর দেনা শোধের জন্য রেখেছ ?

তিনকড়ি— হাঁ, সেই জন্যেই রেখেছিলাম। যাক্‌গে, এখন তো কাজে লাগিয়ে দিই। আগে ভাত-কাপড়ের খরচ, তারপর··নয় কি নিয়তি ?

বাজার করতে বের হয়ে যাবার আগে নিয়তির কাছে এগিযে এসে নিয়তির মাথায় হাত বোলাতে থাকে তিনকড়ি। —তুমি আসবার পর থেকে আমার সাহস বেড়ে গেছে নিয়তি।

—কি বললে ? নিয়তির চোখদুটো কটকট করে জ্বলে।

—আগে হলে দিনটা উপোষ করেই কাটিয়ে দিতাম, দেনা শোধের টাকা দিয়ে বাজার করবার সাহসই হতো না।

কেঁপে ওঠে নিয়তির চোখ। এবং শরীরটাও হঠাৎ অবশ হয়ে যায়। দরজার কপাট ধরে কপাটের আড়ালে মুখ লুকোয় নিয়তি।

চলে যান তিনকড়ি। গলাবন্ধ কোট গায়ে, এবং গলার দু-পাশে এলিয়ে দেওয়া পাকানো চাদরের দুটি ঝুল। তাই আর দেখতে পেলেন না তিনকড়ি, নিয়তি তখন কপাটের উপর কপাল ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে আর চোখ মুছছে।

এমনই শুভলগ্নে বিয়ে হয়েছে যে, দেনাশোধের টাকা খরচ করে উপোসের অভিশাপ থেকে প্রাণটাকে বাঁচাবার খোরাক যোগাড় করতে হচ্ছে। কালের ইচ্ছার ইঙ্গিতটা কি এখনও দেখতে পাচ্ছে না মানুষটা ?

কি অদ্ভুত শুভক্ষণ ! এবং কি তার মহিমা ! যেন একটা শীতল ও শান্ত অভিশাপের ঘরে এসে বন্দী হয়েছে নিয়তির ভাগ্যটা। মানুষটার মুখের দিকে জ্বালাভরা চোখ নিয়ে তাকালেও

মানুষটা প্রসন্নভাবে হাসে। একটুও ভয় নেই, সন্দেহও নেই যে, নিয়তির মতো নারী ওর মতো পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। শুভক্ষণের কীর্তি এরই মধ্যে কত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে কিন্তু দেখেও দেখতে পাচ্ছে না মানুষটা। মানুষটার চোখ দুটো প্রচণ্ড একটা অন্ধতায় খুশি হয়ে রয়েছে।

এই তিন মাসের মধ্যে ভুলেও কোন মুহূর্তে তিনকড়ির গা ছোঁয়নি নিয়তি। রোজই খেয়ে উঠে যখন পান চেয়ে হাত বাড়িয়ে দেন তিনকড়ি, তখন পানের ডিবেটাকে তিনকড়ির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সরে যায় নিয়তি। নিজের হাতে তিনকড়ির হাতে পান তুলে দেয় না। তিনকড়ির ঐ স্পর্শলোভাতুর হাতের ছোঁয়া পেতে যেন ভয় করে নিয়তির, এবং বুঝতে পারে নিয়তি, ঘৃণাও করে। কিন্তু কি আশ্চর্য, নিয়তির সেই সতর্ক কুণ্ঠা আর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে একটুও ব্যথিত হয় না তিনকড়ির হাতটা। ব্যস্তভাবে, আর মুখের উপর তেমনই শান্ত হাসি টেনে নিয়ে ডিবের পান তুলে মুখে দেন তিনকড়ি।

দেনাশোধের টাকা নিয়ে বাজার করতে চলে গিয়েছে মানুষটা। আর কিছুক্ষণ পরেই হাসতে হাসতে চাল ডাল ঘি তেল মশলার বোঝা নিজের হাতেই বয়ে নিয়ে ফিরে আসবে। সেই চাল ডাল আর মশলার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করবে না নিয়তির। তবু ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে, আর রাঁধতে হবে। অদৃষ্টের একটা ক্ষুধিত ঘৃণাকে ভাত খাইয়ে তোয়াজ করতে হবে। কেন? কিসের জন্য? এই প্রশ্নের জ্বালা আর সহ্য করতে পারে না নিয়তি। ছটফট করে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে, আর একটা বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকে। নিয়তির প্রাণটাই যেন একটা ঘুম ঘুম অবসাদের আবেশে নিঝুম হয়ে যায়।

—নিয়তি!

ডাক শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে নিয়তি। কে জানে কখন ফিরে এসেছে মানুষটা! বাজার নিয়ে ফিরে এসেছে। এখনই রান্না করতে হবে। কি ভয়ানক শাস্তি! ছিঃ, এমন রান্না না রাঁধলে আর এমন খাওয়া না খেলে কি নিয়তির অদৃষ্টটা শুকিয়ে মরে যেত?

তিনকড়ির মুখের দিকে না তাকিয়ে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিথিল খোঁপাটাকে ভেঙে নিয়ে বাঁধতে বাঁধতে নিয়তি যেন একটা ঘুমভাঙা আক্রোশের সুরে আস্তে চেঁচিয়ে ওঠে। —পারবো না।

তিনকড়ি হাসেন— কি?

নিয়তি— রাঁধতে পারবো না।

তিনকড়ি— রান্না হয়ে গিয়েছে। খাবে চল।

কেঁপে ওঠে নিয়তির চোখ দুটো। তিনকড়ি বলেন— বাটা মাছের ঝোল রেঁধেছি।

—কি বললে? যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিয়তি।

তিনকড়ি বলেন— খবরটা তোমার মার কাছেই শুনেছি নিয়তি, তুমি বাটা মাছের ঝোল খেতে ভালবাসো।

ঘরের দেয়ালের কোণের কাছে মুখটাকে লুকিয়ে ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিয়তি। আঁচল তুলে চোখ ঢাকা দেয়। তিনকড়ি বিচলিতভাবে ডাকেন— কি হল নিয়তি?

নিয়তি ফুঁপিয়ে ওঠে— যাও, তুমি খেয়ে নাও। আমার যখন ইচ্ছে হয় খাব।

নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের কাছে ঝুলছে। টুলের উপর বসে কাজ করছেন তিনকড়ি আর ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখতে থাকে নিয়তি। নিয়তির জীবনের একটা নির্মম পরিহাস কেমন নিশ্চিন্ত মনের আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ করে চলেছে।

—ইমপালস্ পিন বদলাতে হবে, দু-টাকা পাঁচ আনা চার্জ পড়বে। বলুন।

আস্তে আস্তে কথা বলেন তিনকড়ি।

আগন্তুক বলে— না দরকার নেই। অত বড় ওয়াচ ডিলার আর মেকার মুখার্জী ব্রাদার্স দেড় টাকায় সারিয়ে দেবে বলেছে।

চলে যায় আগন্তুক। আর একজন আসে। আগন্তুকের হাতে ছোট একটা ঘড়ি তুলে দিয়ে তিনকড়ি বলেন— স্প্রিং বদলে দিয়েছি, আর প্যালেট ও লিভারটাতে যে গোলমাল ছিল, তাও ঠিক করে দিয়েছি। এইবার আপনার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে কোন শুভক্ষণের একচুল এদিক-ওদিক হবে না। কবে আপনার বাস্তু প্রতিষ্ঠা!

—কাল সকাল আটটা আটান্নতে।

—ঠিক আছে। আগন্তুকের হাতে ঘড়িটা তুলে দিয়ে চার টাকা চার আনা আদায় করেন তিনকড়ি।

পিছনের দরজার ফাঁকটা যেন ছোট্ট একটা হাসি হেসে তারপরেই খট্ করে একটা তুচ্ছতা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের উপর চেপে ধরে আর মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকান তিনকড়ি। তারপরেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করেন।

আবার দরজা খুলে যায়। নিয়তি এগিয়ে এসে দোকানের সেই জীর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে যেন হাসতে থাকে।

তিনকড়িও হাসেন— তুমি তো জানো না নিয়তি, পাড়ার ছেলেরা আমার কি নাম দিয়েছে!

—কি নাম?

—কালপুরুষ।

মুখ কুঁচকে হাসি চাপে নিয়তি। —বাঃ, বেশ ভালো নাম।

আলমারির দিকে হাত তুলে মলিন চেহারার সেই টাইপ-পীসটাকে দেখিয়ে দিয়ে তিনকড়ি যেন অদ্ভুত এক অহংকারের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে— দেখছো নিয়তি?

—কি?

—ঐ টাইপ-পীস।

—হ্যাঁ।

—এই ঘড়িটার ভুল হয় না।

—তার মানে?

—শুভক্ষণ ধরিয়ে দিতে একটুও ভুল করে না। এই ঘড়ির সময় দেখে যারা শুভক্ষণ ধরেছে, তাদেরই শুভ হয়েছে। আশ্চর্য! ত্রিশ বছর ধরে এই আশ্চর্য দেখে আসছি। এমন কি…।

—কি?

—তোমার বাবার সঙ্গে হঠাৎ যেদিন এখানেই দেখা হয়ে গেল, সেদিন এই ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম যে, একটা শুভ ব্যাপার হবেই হবে। তোমার বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশে দেখা হয়েছিল। পাঁজি খুলে দেখলাম, এগারই বৈশাখ সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশের চেয়ে ভালো শুভক্ষণ খুব কমই হয়।… তার পরের আষাঢ়েই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে।

নিয়তির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে হাসতে থাকেন তিনকড়ি।

—এইবার বুঝতে পারছো নিয়তি, কেন এই বিয়ে হলো। একেই বলে কালের ইচ্ছা…নয় কি নিয়তি?

নিয়তি বলে— হ্যাঁ।…কিন্তু আজ আর কিছুক্ষণ পরেই ছোটকাকা আসবেন।

—কেন?

—আমি আজ যাব।

—কোথায় ?

—কোথায় যাব বুঝতে পার না ? তাও বলতে হবে ?

—কাশীপুরে ? বাবার কাছে ?

—হ্যাঁ। বাবার চিঠি এসেছে। আজই চলে যেতে লিখেছেন।

—কেন নিয়তি ? তিনকড়ির মুখের হাসি যেন মুমূর্ষু মানুষের মুখের করুণ যন্ত্রণার মতো কাতরে কাতরে কাঁপতে থাকে। নিয়তি চলে যাবে, কালের ইচ্ছাতেও এমন অঘটন ঘটতে পারে বলে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনকড়ি।

নিয়তির চোখে একটা কঠোর সংকল্পের উল্লাস ঝিকঝিক করে হাসে। কালের ইচ্ছার রকম দেখে এতদিনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন এক সখের কালপুরুষ ! বিয়ে করবার কোন দরকার ছিল না এবং বিয়ে করা উচিত ছিল না যার, একটা নারীর জীবনকে কোন সুখে সুখী করবার শক্তি নেই যার, সে মানুষ, কে জানে কেন, একটা নিষ্ঠুরতার নেশায় পাগল হয়ে নিয়তির মতো মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এল ? কালের ইচ্ছার অজুহাত দেখিয়ে একটা মেয়ের ত্রিশ বছর বয়সের স্বপ্ন আর পিপাসাকে খুন করেছে যে, সেই মানুষের চোখের এই আতঙ্ক দেখলে আরও ঘৃণা হয়। কি আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত নিয়তির মনের এই ঘৃণাকে দেখতেই পায়নি মানুষটা। নিয়তির মনের ঘৃণা যখন এক-এক বার হঠাৎ ভয়ে দুর্বল হয়ে কেঁদে ফেলেছে, তখনও বুঝতে পারেনি যে এটা অভিমানের কান্না নয়, এটা একটা ত্রিশ বছর বয়সের মেয়ের জীবনের বিদ্রোহ।

কাশীপুরের বাড়িতে পর পর চিঠি দিয়েছে নিয়তি— আর সহ্য করা সম্ভব নয়। কাশীপুরের বাড়িও শেষ পর্যন্ত চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, না, আর সহ্য কবার দরকাব নেই। চলে এস।

তিনকড়ির হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়তির সেই কঠোর চোখের সংকল্প একটুও হতভম্ব হয় না। নিয়তি বলে— চলে যাচ্ছি, যাওয়া উচিত। এ ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে, বললে বুঝবেই বা কি ?

—তুমি কি আমাকে ঘেন্না করে চিরকালের মতো··· ।

তিনকড়ির করুণ প্রলাপ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ দরজার বাইরের কড়া নেড়ে কে যেন হাঁক দিয়েছে— নিয়তি, আমি ছোটকাকা এসেছি।

ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনকড়ি। চমকে ওঠে নিয়তি। কেঁপে ওঠে নিয়তির হাতটা। নিয়তির মুক্তির লগ্নটাকে বাধা দিয়ে একটা অন্ধ আবদার ডুকরে উঠেছে। আঁচল দিয়ে তিনকড়ির মুখটাকে চেপে ধরে ভ্রূকুটি করে নিযতি। এই প্রথম তিনকড়ির জীবনের উপর নিয়তির স্পর্শের স্বাদ লুটিয়ে পড়েছে। নিয়তি বলে— চুপ কর।

হেসে ওঠে তিনকড়ির মুখ। আলমারির টাইম-পীসের দিকে তাকায়। তারপরেই পঞ্জিকা খুলে চেঁচিয়ে ওঠে। —সাতটা এগার। চমৎকার শুভক্ষণ। দেখছো নিয়তি, আমার টাইম-পীসও কাঁটায় কাঁটায় বলছে, সাতটা এগার। খুব শুভক্ষণে তুমি যাত্রা করলে নিয়তি।

টাইপ-পীসের দিকে দু-চোখের একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে নিয়তি বলে— এই বিশ্বাস নিয়েই বসে থাকো, খুব হাসতে থাকো, আমি যাই।

তিনকড়ি— সত্যি নিয়তি। তুমি ফিরে এসে নিশ্চয় দেখতে পাবে, আমি হাসছি। আমার আর কোন দুঃখ নেই। আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বড়ই শুভক্ষণ। এস···এস।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিয়তি— হ্যাঁ, চলুন ছোটকাকা, আমি তৈরি।

নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের কাছে ঝুলতে থাকে, কাজ করেন তিনকড়ি। মাঝে মাঝে খরিদ্দার আসে। কেউ কেউ হেসে প্রশ্ন করে—এত রোগা হয়ে গেলেন কেন কালপুরুষদা ?

তিনকড়ি হাসেন— কালের ইচ্ছা।

ঘড়ির দোকানের সান্ধ্য আসর আবার জমে উঠেছে। জীবনবাবু আসেন, অনাথবাবু আসেন, এবং আরও অনেকে আসে। সকলেই সন্দেহ করেন, যদিও সেই সন্দেহ নিয়ে কেউ আলোচনা করেন না, তিনকড়ির স্ত্রী বোধহয় আর আসবে না। আসবার হলে কি এই এক বছরের মধ্যে অন্তত একবারও আসতো না ?

কিন্তু তিনকড়ির মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, ওরই মনে কোন সন্দেহ নেই। বেশ নিশ্চিন্ত মনে, সেই গম্ভীর মুখ, আর মাঝে মাঝে মুখের উপর সেই শান্ত হাসি টেনে নিয়ে কথা বলেন তিনকড়ি।

শুধু দিন দিন রোগা হয়ে যেতে থাকেন তিনকড়ি। কোন অসুখ নেই, তবু গাছের ভাঙা ডালের মতো শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। কলপ ক্ষয়ে গিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে তিনকড়ির যে মাথার চুল, সেই মাথার চুল এইবার যেন দিনে দিনে ফিকে হয়ে শেষে একেবারে সাদা হয়ে যায়। পাড়ার ছেলেরা আড়ালে আড়ালে বলে— এইবার সত্যিই মানিয়েছে তিনকড়িদাকে, একেবারে খাঁটি কালপুরুষ।

জীবনবাবু জানেন, তিনকড়ির শ্বশুরবাড়ি কাশীপুরে। তবু এই এক বছরের মধ্যে, টালিগঞ্জের এই বাড়ি আর দোকানের ঝাঁপ একটি দিনের মতো বন্ধ রেখে একবারও কাশীপুর ঘুরে এল না তিনকড়ি। অনাথবাবু বলেন— কিন্তু প্রতি মাসে ত্রিশ-চল্লিশটা টাকা কাশীপুরে স্ত্রীর কাছে ঠিক পাঠিয়ে দেয় তিনকড়ি, সে খবর জানেন তো ?

—জানি। একটু বিস্ময় প্রকাশ করেন জীবনবাবু।

টালিগঞ্জের গলির ভিতর দিয়ে শীতের হাওয়া বয়ে যায়। বৈশাখের জ্বালাও লাগে। আর বর্ষার জলে গলির কাদা পিছল হয়ে যায়। তিনকড়ির নিকেল-ফ্রেমের চশমা তেমনই নাকের কাছে ঝুলতে থাকে, কাজ করেন তিনকড়ি। ত্রিশ বছর বয়সের টাইপ-পীসে ঠিক নিয়মমত দম দিয়ে এবং কানের কাছে তুলে নিয়ে শব্দ শোনেন, টিক-টিক-টিক, কালের ইচ্ছায় কত শুভক্ষণ আসছে আর যাচ্ছে, শুনতে পান তিনকড়ি।

তিনকড়িকে একদিন হাঁসফাঁস করে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করেন সান্ধ্য বৈঠকের জীবনবাবু— এ কি হলো তিনকড়ি ?

তিনকড়ি হাসেন— কালের ইচ্ছায় যা হয়, তাই হয়েছে জীবনবাবু।

একদিন মুখ খুলে বলেই ফেলেন অনাথবাবু— কাশীপুরের ব্যাপার কি তিনকড়িবাবু ? উনি আসবেন কবে ?

কাচের গোলকের মতো দুটো চোখ তুলে আস্তে আস্তে হাসেন তিনকড়ি। —কাল সহায় হলেই আসবেন।

আবার ঘাড় ঝুঁকিয়ে খুটখাট করে কাজ করেন তিনকড়ি। এবং নিজের মনেই বিড়বিড় করেন— কাল পূর্ণ না হলে কেউ আসে না, যায়ও না।

জীবনবাবু আর অনাথবাবু ওঠেন। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাকান তিনকড়ি।— আমিও যাব।

অনাথবাবু হেসে ওঠেন— কোথায় ? কাশীপুর ?

তিনকড়িও যেন গম্ভীর মুখের একটা শীর্ণ হাসি চেপে চেপে বললেন— ভোর পাঁচটা তিন মিনিটটা খুব শুভক্ষণ। —এত ভোরে ট্রাম পাওয়া যাবে তো অনাথবাবু ?

জীবনবাবু বলেন— বাস পাবেন।

রাত দশটাও পার হয়নি। জীবনবাবু ছুটে এসে তিনকড়ি দত্তের দোকানের দরজার কাছে

দাঁড়ালেন। অনাথবাবুও আসতে দেরি করলেন না। দুজনেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। চন্দ্র ডাক্তারের চাকরটাই খবর দিয়েছিল।

—কখন মারা গেলেন কালপুরুষদা? ঘড়িব দোকানের সামনে পাড়ার ছেলেদের ভিড় আলোচনা করে। চন্দ্র ডাক্তার বললেন, পাশের দোকানদার খবর দিয়েছিল। আমি এসেই দেখি, হয়ে গিয়েছে। একটা ঘড়ির ওপর কান পেতে পড়ে আছেন। হার্ট ফেলিওর!

বারান্দায় নিয়ে এসে মাদুরের উপর তিনকড়িকে এরই মধ্যে কারা যেন শুইয়ে দিয়েছে। বোধহয় চন্দ্র ডাক্তারের চাকর আর পাশের দোকানদার।

তারপর? একটা ব্যবস্থা করতে হয়। জীবনবাবুর নির্দেশে পাড়ার ছেলেরা সব ব্যবস্থা করে ফেলে। শবযাত্রাব সব আয়োজন।

কিন্তু তারপর? আর দেরি কেন? পাড়ার ছেলেরা প্রশ্ন করে, এবার ঘাটে রওনা হলেই তো হয়।

জীবনবাবু বলেন— একটু অপেক্ষা কর!

অনাথবাবু বলেন— কাশীপুরে লোক পাঠিয়েছি। তিনকড়িবাবুর স্ত্রী একবার আসুক, শেষ দেখা দেখে নিক্। তারপর—

কাশীপুর থেকে আসতে এত দেরি হবার কথা নয়। সত্যিই তিনকড়ির স্ত্রী আসবেন কি? জীবনবাবু আর অনাথবাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেন।

ভোর হয়ে এসেছে। তিনকড়ির স্ত্রী আসবেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে। ছেলেদের ভিড়ের সঙ্গে কারা যেন আলোচনা করে, এবং হেসে ওঠে ছেলেরা। —আপনি কি পাওনা টাকা আদায় করতে এসেছেন তারকবাবু?

তারকবাবু হাসেন— লোকটাই যখন চলে গেল, তখন আমার তিনশো টাকাও যাবেই। দুঃখ করে লাভ নেই।

পরমেশবাবু বলেন— আমার একটা দামী ঘড়ি সারতে দিয়েছিলাম। কে জানে, সেটা আর ফেরত পাওয়া যাবে কি না?

হেসে ওঠে ছেলেরা। এবং একটি ট্যাক্সি এসে থামে। তিনকড়ির স্ত্রী এসেছে।

—তোমরা একটু সরে যাও। সবাইকে অনুরোধ করেন জীবনবাবু।

তিনকড়ির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল নিয়তি। নিয়তির চোখ দুটো যেন দুটো পাথরের চোখ। চোখের উপর থরথর করছে একটা ভ্রূকুটি।

—চল এবার। ডাক দেন জীবনবাবু।

তিনকড়িকে খাটের উপর তোলবার জন্য এগিয়ে আসে ছেলেরা। কিন্তু একটা প্রচণ্ড বিস্ময়েব চমক লেগে সকলেই থমকে যায়। কেউ দু-পা পিছিয়ে যায়, কেউ হাত সরিয়ে নেয়, কেউ কেঁপে ওঠে। তিনকড়ির টাইম-পীসের অ্যালার্ম বেজে উঠেছে।

পাঁচটা তিন মিনিট।

একটা ছেলে ভয়ে ভয়ে বিড়বিড় করে— কালপুরুষদা, কালপুরুষদার টাইপ-পীস, কি সাংঘাতিক, একেবারে একদম কাঁটায় কাঁটায়…।

জীবনবাবু বলেন— কি আশ্চর্য!

অনাথবাবু বলেন— তাই তো।

আর, নিয়তি যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে এসে ঘড়িটাকে আঁকড়ে ধরে। শাড়ির আঁচল মুঠো করে ঘড়িটাকে চেপে চেপে সেই শব্দের ঝংকার বন্ধ করতে চেষ্টা করে। যেন কারও মুখ বন্ধ করতে চাইছে নিয়তি।

—মাগো! ফুঁপিয়ে ওঠে নিয়তি।

এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে কাছে এগিয়ে গিয়ে ভীতস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন— ওকি ? ওকি ? কি করছিস নিয়তি ?

নিয়তি বলে— মানুষটা যে খিল খিল করে হাসছে ছোটকাকা।

খদ্যোত

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলেও পঁয়ত্রিশের চেয়ে কম বয়সের মানুষ বলে মনে হয় এবং গৌরকান্তি বললে যা বোঝায় তার চেয়ে অনেক বেশি ফরসা গায়ের রং, পুষ্কর রায়চৌধুরীর চেহারাটা সত্যিই সব সময় যেন ধবধব করে। ঠোঁট দুটোও সব সময় যেন দুরন্ত রক্তের আভায় লালচে হয়ে টুকটুক করে। দেখে মনে হয়, একজন খাঁটি বিলিতী সাহেবমানুষ আলখাল্লার মতো প্রকাণ্ড ঢিলে একটা পাঞ্জাবি আর জরি পাড়ের ধুতি পরে রয়েছে।

যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, তাকেই প্রথম আলাপে মুগ্ধ করে দিতে পারে পুষ্কর রায়চৌধুরী। বড় সুন্দর করে কথা বলতে পারে পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং গলার স্বরেও যেন সুরেলা মধুরতার ধ্বনি রিমঝিম করে। কিন্তু শুধু কথার ভঙ্গী নয়, এবং সুন্দর চেহারার আবেদনও শুধু নয়, যে-সব কথা বলে পুষ্কর রায়চৌধুরী, সে-সব কথাও যেন বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল। যে শোনে তারই মনে পুষ্কর রায়চৌধুরীব জন্য একটা শ্রদ্ধাময় সমবেদনার আবেশ নিবিড় হয়ে ওঠে।

এই শহরের শেষ প্রান্তে শেষ ল্যাম্পপোস্টের ছায়া থেকে একটু দূবে, শুধু পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে থাকা একটা নিরালাতে যে বাগান-বাড়িটা প্রায় বিশ বছর ধরে ছাড়াবাড়ির মতো সাড়াহীন অস্তিত্ব নিয়ে পড়েছিল, সেই বাগান-বাড়িকে শহরের মানুষ কলকাতার সেই বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর একটা সম্পত্তি বলে জানতো। আরও জানতো, বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর এই রকমের আরও কত সম্পত্তি দেশের আরও কত শহরের কত নিরালাতে পড়ে আছে। আজকাল যে পুষ্কর রায়চৌধুরী সস্ত্রীক এই বাড়িতে থাকে, সে হলো সেই বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরীর একমাত্র ছেলে।

বিখ্যাত বি বি রায়চৌধুরী আজ আর বেঁচে নেই। এবং শহরের অনেকেই জানে, তাঁর সেই সব সম্পত্তিও আর বেঁচে নেই। সব গিয়েছে। বি বি রায়চৌধুরী মারা যাবার আগেই তিন তাঁর সেই বিপুল সম্পত্তির অন্তর্ধানের দুঃখ সহ্য করে গিয়েছেন। এবং বোধহয় এই শহরের এই বাগান-বাড়িটাই তাঁর ঐশ্বর্যের বিপুল ধ্বংসের মার থেকে কোনমতে আত্মরক্ষা কবতে পেরেছে। এবং একমাত্র ছেলে পুষ্কর সস্ত্রীক এসে সেই বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে।

একটা যে-সে মানুষের ছেলে নয় পুষ্কর রায়চৌধুরী ; এবং একদিন যে অবস্থা ছিল সে অবস্থার গৌরবও যে-সে ধরনের ছিল না। আজও গল্প করে পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং প্রথম আলাপে বিমুগ্ধ শ্রোতা সে গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হয়ে যায়। আজই সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ করে এসেছে পুষ্কর রায়চৌধুরী। তিনদিন হলো দুমকা থেকে বদলি হয়ে এই শহরে এসে সবেমাত্র চার্জ নিয়েছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট, বয়সে ভারিক্কি নয়, মেজাজও ভারিক্কি নয়, হাসিখুশি ও স্পোর্টপ্রিয় মানুষ যে মিস্টার দত্তগুপ্ত, তিনিও পুষ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপের বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে পুষ্কর রায়চৌধুরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধাবিচলিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিলেন।

পুষ্কর বলে— বাবার নিউমোনিয়ার সংবাদ যেদিন কাগজে বের হলো, সেদিন স্টক

এক্সচেঞ্জের সেই বিচলিত অবস্থা আজও আমার মনে পড়ে মিস্টার দত্তগুপ্ত। ইন্ডিয়ান আয়রণ পঁচিশ টাকা পনর আনা থেকে চট করে পঁচিশ টাকা আট আনায় ডিক্লাইন করে গেল। সিলভারেও বেশ প্যানিক দেখা দিয়েছিল। একশো ছেষট্টি টাকা আট আনা থেকে স্টার্ট করে একশো চৌষট্টি টাকা পনর আনাতে ফিনিশ হয়ে গেল।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, একটু আশ্চর্যেরই ব্যাপার হয়েছিল মিস্টার দত্তগুপ্ত। কোন স্টেটের প্রেসিডেন্টের হঠাৎ মৃত্যু হলেও মার্কেটের উপর এ রকম রিয়্যাকশন হয় না, কিন্তু আমার বাবা···।

বলতে বলতে পুষ্কর রায়চৌধুরীর লালচে ঠোঁট দুটো যেন একটা অভিমানের ব্যথায় শিউরে ওঠে। যেন বলতে চায় পুষ্কর রায়চৌধুরী, আমি তো সেই বিপুল প্রভাব ক্ষমতা ঐশ্বর্য আর গৌরবেরই সন্তান। অথচ···।

অথচ, সেই বি বি রায়চৌধুরীর ছেলে পুষ্কর আজ টাকার অভাবে ছোট একটা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না।

এই শহরটা কালচারের দিক দিয়ে বড় দরিদ্র। দুটো লাইব্রেরি ছাড়া বলতে গেলে আর কোন আয়োজনই নেই যার সাহায্যে এই শহরের মানুষের মন আর রুচির রিফাইন্‌মেন্ট সম্ভব হতে পারে। তাই পাঁচ বছর ধরে একটা কাজের পরিকল্পনা যেন পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবনের স্বপ্ন হয়ে রয়েছে। একটা আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা।

দেশের আর বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির রেপ্লিকা আনাতে হবে। আর চাই, প্যারিস প্লাস্টার দিয়ে তৈরি যত ঐতিহাসিক কীর্তির—তাজমহলের, হুমায়ুনের কবরের, বুদ্ধগয়া কোনারক আর মাদুরার মন্দিরের মিনিয়েচার। সারনাথের ও মথুরার ধ্যানী বুদ্ধের, আর জৈন গোমতেশ্বরের এক-একটা মডেল মূর্তি। এই সব শিল্পকীর্তির নমুনা দিয়ে গ্যালারি সাজাতে হলে যে টাকা দরকার, সে টাকাটা মোটামুটি যোগাড় হয়েই আছে।

—তা ছাড়া ক্র্যাফটেরও একটা ওয়্যাড্ভারহাউস হবে এই ইনস্টিটিউট। এর জন্য আমি সারা ভারত তোলপাড় করবো মিস্টার দত্তগুপ্ত। মহীশূরের চন্দনকাঠের কাজ, জয়পুরের মীনা, উড়িষ্যার ফিলিগ্রি, মুর্শিদাবাদের আইভরি। তা ছাড়া বার্মার ল্যাকার, পাঞ্জাবের কামানগিরি, কাশ্মীরের ল্যাটিস ওয়ার্ক। নেপাল আর তিব্বত থেকে কিছু গ্রেটেস্কও আনাবো।

দত্তগুপ্ত বলেন— বড় চমৎকার আপনার পরিকল্পনা। আমি মনে-প্রাণে আপনার সাফল্য কামনা করি।

মুখে যা বলে পুষ্কর রায়চৌধুরী তার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্যের বর্ণনায় ভরে আছে মোটা একটা ফাইল, যেটা এই ধরনের আলাপের সময় পুষ্কর রায়চৌধুরীর হাতেই থাকে। ইনস্টিটিউটের জন্য প্রথমেই একটা ভবন চাই। সেই ভবনের একটা প্ল্যানও ফাইলের ভিতরে আছে। এবং সেই প্ল্যান ফাইলের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে নিজেরই চোখের সামনে রেখে গম্ভীর হয়ে যায় পুষ্কর রায়চৌধুরী।

—ওটা কি? প্রশ্ন করেন দত্তগুপ্ত।

পুষ্কর হাসে— আমার দুশ্চিন্তা। আর্ট আর ক্র্যাফ্‌টের নমুনাগুলি যোগাড় করে ফেলতে যে টাকা দরকার হবে, সে টাকা অবশ্য আমিই দেব। কিন্তু···।

—আজ্ঞে! চোখ বড় করে প্রশ্ন করেন দত্তগুপ্ত।

পুষ্কর হাসে— নেই নেই করেও বি বি রায়চৌধুরীর ছেলের এখনও যা আছে, তাতে ওসব বস্তু কেনবার মতো লাখ খানেক টাকা হয়েই যাবে। কিন্তু···

আবার গম্ভীর হয় পুষ্কর। —কিন্তু এই বিল্ডিংটা তৈরীর খরচের জন্য একটু ভাবনায় পড়তে হচ্ছে। বিল্ডিংটা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজ এগুতেই পারছে না। আশা করি···আপনি

আমার এই দুশ্চিন্তার ভার লঘু করতে কিছুটা সাহায্য করবেন।

—আমি কি করতে পারি, বলুন ? আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য কারতে প্রস্তুত আছি।

—তবে আজই সন্ধ্যায় একবার গরীবের আশ্রমে দয়া করে পদার্পণ করুন না কেন ? একটু চা খাবেন এবং আমার কাছ থেকে আরও ডিটেল্‌স্ জানবার পর নিজেই বুঝতে পারবেন যে…।

দত্তগুপ্ত— আজ নয়, কাল সন্ধ্যায় অবশ্যই যাব।

২

এই বাড়িটা যেন একটু গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বাগানটা প্রায় একটা জঙ্গল হয়ে বাড়িটার গায়ের উপর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। দিনমানে নানারকম ছায়া আর আবছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই বাড়ির চেহারাটা তবু কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হলে বাড়িটা যেন অন্ধকারের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়।

বাড়িটা অন্ধকার ভালবাসে বোধ হয়। তা না হলে সন্ধ্যা হলে এবং বেশ একটু রাত হয়ে গেলেও বাড়ির ভিতরে বা বাইরে আলো জ্বলতে দেখা যায় না কেন ?

কিন্তু বাড়িটার ভিতরে ও বাইরে যে ভালরকমের আলোর ব্যবস্থা আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, এক মাস দু'মাস বা কয়েক মাস ধরে অন্ধকারের সঙ্গে যেন একটানা মাখামাখি করবার পর হঠাৎ কয়েকটা দিন অন্ধকারের সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে আর আলো ছড়িয়ে এই বাড়ির রাতের জীবনটা হেসে ওঠে। বাড়ির জানালা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ে, বাড়ির বারান্দায় আলোর ডুম জ্বলজ্বল করে।

যে সন্ধ্যায় এই বাড়িতে কোন ব্যক্তির চা-এর নিমন্ত্রণ থাকে, শুধু সেই সন্ধ্যায় এবং সন্ধ্যার পর থেকে আরও দু'তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়িটা আভাময় হয়ে জংলা বাগানটাকেও হাসিয়ে দেয়।

তা না হলে রোজই অন্ধকার। আকাশে চাঁদ থাকলেও বাড়িটার চেহারা জংলা বাগানের যত গাছের ছায়ার আবরণে আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেখে কিছুই বুঝতে পারা যায় না, বাইরের বারান্দার উপর কোন মানুষ বসে আছে কি নেই।

সন্ধ্যার পর বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার অন্ধকারে দুটি চেয়ারের উপর বসে গল্প করে দুটি মানুষ, স্বামী আর স্ত্রী ; পুষ্কর রায়চৌধুরী এবং নীরজা রায়চৌধুরী। নিবিড় প্রীতির ডোরে বাঁধা দুটি জীবনের তৃপ্তি গল্প করে টুকরো টুকরো মিষ্টি ঝংকারের মতো মিষ্টি হাসির শব্দ উথলে ওঠে।

যতক্ষণ না বুড়ো খানসামা এসে ডাক দেয়, মেজ লাগায়া হুজুর, ততক্ষণ এইভাবে সংসারের এক টুকরো নিরেট অন্ধকারের নীড়ে একেবারে বুকে-বুকে কাছাকাছি আর লাগালাগি হয়ে বসে থাকে পুষ্কর ও নীরজা।

মাঝে একবার বুড়ো খানসামাকে ডাক দিয়ে জেনে নেয় নীরজা, আজ কি রান্না করছে খানসামা ? পুষ্কর যা খেতে ভালবাসে, ঠিক তাই তো ? চিকেন গ্রিল আর দেরাদুন চালের ভাত ? একমুঠো মনক্কা আর বাদাম ছেঁচে রাখতে বুড়ো খানসামাকে বলা হয়েছিল। ভুলে যায়নি তো খানসামা ?

হ্যাঁ, পুষ্করের আর একটা শখের অভ্যাস আছে। মেজ লাগিয়ে যতক্ষণ না বুড়ো খানসামা ডাকতে আসে, ততক্ষণের মধ্যে পাঁচ আউন্স হুইস্কির স্বাদ পেতে চায় পুষ্কর রায়চৌধুরীর সান্ধ্যকালীন তৃষ্ণাটা। নীরজা নিজের হাতে একটা ট্রের উপর হুইস্কি-ঢালা ছোট একটা জার আর ক্রিস্ট্যালের একটা গেলাস সাজিয়ে নিয়ে বারান্দার ছোট টেবিলের উপর রেখে দেয়।

মাঝে মাঝে চেয়ার থেকে উঠে, ক্রিস্ট্যালের গেলাসে চুমুক দিয়ে দিয়ে, আর পায়চারি করে ঘুরে ঘুরে নীরজার সঙ্গে গল্প করতে থাকে পুষ্কর রায়চৌধুরী।

জংলা চেহারার বাগানের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে হাজার হাজার জোনাকি যেন গুচ্ছ ধরে মিটমিট করে জ্বলছে। দেখলে হাসি পায়। গুচ্ছ গুচ্ছ কতগুলি দুর্বল লোভের পোকা মিছিমিছি আলোর ঝলক ছাড়বার চেষ্টা করছে। পুষ্কর রায়চৌধুরী হেসে ফেলে— জান তো নীরজা, বাংলা কবিতায় জোনাকিকে বলে খদ্যোত।

হাসতে হাসতে কেশে ফেলে পুষ্কর রায়চৌধুরী। —খদ্যোত, কি ভয়ানক ভাষা রে বাবা! আমি ঐ খদ্যোত দেখে ঘেন্না করে বাংলা কবিতা পড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

কথাটা ঠিকই, বাংলা কবিতা পড়া ছেড়েই দিয়েছে পুষ্কর। কিন্তু কবে ছেড়েছে সেটা নীরজার জানা নেই।

কিন্তু ঘেন্না করে বাংলা কবিতা পড়া ছেড়ে দিযেছে বলে ভালবেসে ইংরেজী কবিতা পড়ে থাকে পুষ্কর, এটাও সত্যি নয়। শুধু বাংলা কবিতাকে কেন, সারা সংসারের সব আলো-ছায়াকে বোধহয় ঘৃণা করে পুষ্কর রায়চৌধুরী। এই জংলা বাগানের ইউকালিপটাসের ঠিক মাথার উপরের আকাশে যে চাঁদ ভাসতে থাকে, সে চাঁদের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পুষ্করের ইচ্ছে করে না, ভালই লাগে না, এবং ঘৃণাই করে বোধহয়। সরকারী চাকরি নিতে ইচ্ছে করে না, নেয়ওনি পুষ্কর; কারণ দেশের সরকারকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে পুষ্কর। দেশী ক্যাপিটালিস্টগুলোকে দেখলেই গা ঘিনঘিন করে; কাজেই কোন দেশী কনসার্নে সার্ভিস নেওয়া সম্ভব নয়। বিদেশী মার্চেন্টগুলিকে ইতর বলে মনে হয়, ওদের কাছে চাকরি করা পুষ্কর রায়চৌধুরীর সম্মানে পোষায় না। এই সবই জানে নীরজা। পুষ্কর রায়চৌধুরী যা বলেছে, মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস করেছে এবং নীরজা নিজের চোখেই দেখেছে, মানুষের ছায়া আর ছোঁয়াও পুষ্করের সহ্য হয় না। তাই ট্রেনে চড়তে ঘৃণা বোধ করে এবং গত পাঁচ বছরের মধ্যে যে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেনি পুষ্কর, তার একমাত্র কারণ হলো, জানে নীরজা, মানুষের ভিড়ের ছোঁয়াচ বড় ঘেন্না করে পুষ্কর, সহ্য করতেই পারে না।

—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি? বলতে বলতে হেসে ফেলে পুষ্কর। নীরজার সঙ্গে গল্প করতে করতে কথাগুলি পুষ্করের গলার একটা অদ্ভুত স্বরের বিদ্রূপে মাঝে মাঝে নাকিসুরের ধিক্কারের মতো বেজে ওঠে।

—আমি সত্যিই সবকিছু ঘৃণা করি নীরজা। ভগবান-টগবান সমাজ-টমাজ সব কিছুকে…আমার অদৃষ্টকেও আমি ভয়ানক ঘৃণা করি নীরজা! ভালবাসি শুধু…।

নীরজাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নীরজার মুখটাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় পুষ্কর।

পুষ্করের কথাগুলিকে হুইস্কির প্রলাপ বলে মনে করে না নীরজা। নীরজা জানে, মানুষটা শুধু একজনকে ভালবেসে এবং শুধু সেই জনেরই ভালবাসার জোরে সারা সংসারের সব আলো-ছায়াকে ঘৃণা করেও খুশি হয়ে আছে। নীরজা পুষ্করকে ভালবাসে, এটাই যেন পুষ্করের জীবনের একমাত্র অহংকার।

এবং নীরজার জীবনটাও যেন একটা জেদ। পৃথিবীর কত গবেট কুৎসিত আর ইতর মানুষ বছরে লক্ষ টাকার সুখ ভোগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু শুধু পুষ্কর, নীরজার জীবনের পনর বছরের সঙ্গী, শোবার আগে নীরজার কপালটা যার ভালবাসার চুমো না পেলে ঘুমই আসে না নীরজার, সেই মানুষটা টাকার অভাবের জন্য সামান্য চিকেন গ্রিল আর পাঁচ আউন্স হুইস্কির স্বাদ থেকেও মাঝে মাঝে বঞ্চিত হয়। টাকার কথা চিন্তা করতে হয়। নীরজার বুকের ভিতরেও যেন একটা প্রচণ্ড অভিযোগের আগুন ধিকধিক করে জ্বলে। এই পৃথিবী আর এই সংসারের সবকিছুর উপর একটা নির্মম ঘৃণায় কঠোর হয়ে গিয়েছে নীরজারও বুকটা। এত

মানুষ সুখে আছে, শুধু কষ্ট পাবে কি তারই স্বামী ? নীরজার জীবনের বিরুদ্ধে অদৃষ্টের এই চক্রান্তের আহ্লাদ কি ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যায় না !

পুষ্কর বলে— আমি কোন ভয়কে ভয় বলেই মনে করি না। কারও পরোয়া করি না, তুমি থাকতে আমার অদৃষ্টের কোন বদমাইশী আমাকে জব্দ করতে পারবে না, এবং···। বলতে বলতে প্রায় চেঁচিয়ে হেসে ফেলে পুষ্কর— এবং আজ পর্যন্ত যে জব্দ করতে পারলও না, সেটা তোমারই ভালবাসার জন্য।

নীরজার খোঁপার উপর হাত দিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে পুষ্কর। নীরজা বলে— কি করছো ?

পুষ্কর হাসে— একটা খদ্যোত !

টোকা মেরে জোনাকিটাকে নীরজার খোঁপা থেকে ফেলে দিয়ে হঠাৎ একটু আশ্চর্য হয়ে ফটকের দিকে তাকায় পুষ্কর।

—কে আসছে ? আজ তো কারও আসবার কথা নয়।

ফটকের কাছ থেকে ছায়াটা আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দার কাছে পৌঁছতেই গম্ভীর স্বরে হাঁক দেয় পুষ্কর— কে ?

—আমি হেমন্ত।

—হেমন্ত ? কোন হেমন্ত ?

—পুষ্করদা কথা বলছেন বোধহয় !

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠিক চিনে উঠতে···।

—আমি আপনার শ্যামলী বউদির ভাই।

—শ্যামলী বউদির ভাই, হেমন্ত···ও ইয়েস, মনে পড়েছে।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর জেঠতুতো দাদার স্ত্রী সেই শ্যামলী বউদি যে আজ আর বেঁচে নেই, সেকথা জানে পুষ্কর। এবং মনেও আছে, বিয়ের পর নীরজাকে দার্জিলিং-এর বাড়িতে রেখে দিয়ে কার্সিয়ং-এ শ্যামলী বউদির বাড়িতে যখন গিয়েছিল পুষ্কর, তখন এই হেমন্তরই সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা টেনিস খেলে বেশ ক'টা দিন আনন্দ করা গিয়েছিল। সেই হেমন্ত আজ এতদিন পরে, এখানে, এই সন্ধ্যাতে, কেমন করে আর কিসের জন্য আসে ?

হেমন্ত বলে— আমি একটা চাকরি নিয়ে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি পুষ্করদা। আজই জানতে পেরেছি, আজকাল আপনি এখানে এই বাড়িতে থাকেন। তাই ইচ্ছা হলো একবার দেখা করে আসি। তাছাড়া বউদির সঙ্গেও দেখা হবে। ওঁকে তো আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

বারান্দার থামের গায়ে হাত রেখে সুইচ টিপে পুষ্কর। দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে। পুষ্করও যেন দপ্ করে হেসে ওঠে। —এই যে তোমার বউদি।

আলোটা আর পুষ্কর রায়চৌধুরীর হাসিটা দপ্ করে জ্বলে উঠেছে, কিন্তু বোধহয় সেজন্য হেমন্তর চোখ দুটো ওভাবে ধাঁধিয়ে যায়নি। পুষ্করদার স্ত্রী নীরজা বউদির রূপ কি অদ্ভুত রূপ ! মনে হয়, নীরজা বউদির মুখে ওরকম সুন্দর একটা হাসি শিউরে উঠেছে বলেই আলোটা জ্বলে উঠেছে।

—নমস্কার বউদি ! নীরজার দিকে হাত তুলে অভিবাদনের ভঙ্গি করে বারান্দার উপরে উঠে দাঁড়ায় হেমন্ত। নীরজাও মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করে— বসুন।

পুষ্কর এবং নীরজা, দুজনের চোখেচোখে একটা পরামর্শের বিনিময়ও হয়ে যায়। দুজনের মনে একই প্রশ্ন। কেমন ধরনের মানুষ হেমন্ত ? বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে চা-এর টেবিলের কাছে বসতে অনুরোধ করা উচিত, এমন মানুষ কি ?

পুষ্কর— এখানে কিসের কাজে এসেছ হেমন্ত ? কেমন চাকরি ?

হেমন্ত— আমি সেটেলমেন্টের কাজে এসেছি, সার্ভেয়ারের চাকরি। মাত্র দেড়শো টাকার মাইনেতে স্টার্ট পেয়েছি। বাবা মারা যাবার পর থেকে বাড়ির যা অবস্থা হয়েছে, তাতে এই দেড়শো টাকাই একটা সৌভাগ্য।

পুষ্কর আর নীরজা, দুজনেরই চোখের উজ্জ্বল কৌতূহল যেন হঠাৎ একটা হতাশার আঘাত পেয়ে অপ্রসন্ন হয়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাগানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে নীরজা। পুষ্করও হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। —আচ্ছা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। এখন··· তাহলে···।

বলতে বলতে ভিতরের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য এক পা এগিয়ে গিয়ে পুষ্কর বলে— তুমি এখন তাহলে এস হেমন্ত।

হেমন্তর বিহ্বল চাহনিটা যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, একটা সুস্বপ্নের শোভা হঠাৎ ছিড়ে গেলে যেমন করে চমকে ওঠে ঘুমন্ত চোখ।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় হেমন্ত। —হ্যাঁ, হঠাৎ এসে আপনাদের একটু বিরক্ত করে ফেললাম বোধহয়···আচ্ছা, আসি তবে পুষ্করদা।

পুষ্কর—এখানে তোমাদের কাজ কতদিন চলবে ?

হেমন্ত— বোধহয় মাস কয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

পুষ্কর— কাজটা বোধহয় নিতান্ত মীন ম্যানুয়াল কাজ ?

হেমন্ত— কি বললেন ?

পুষ্কর— দৌড়দৌড়ির কাজ বোধহয় ?.

হেমন্ত— তা তো বটেই। প্রায় রোজই গাঁয়ে গাঁয়ে আর মাঠে মাঠে ঘুরতে হয়। আজই তো সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেলিমপুরের সব আবাদী জমির জরিপ শেষ করে তবে···।

পুষ্কর— সেলিমপুর ?

হেমন্ত— হ্যাঁ।

পুষ্কর— সেলিমপুরের মুর্গীর খুব সুনাম শুনেছি।

হেমন্ত হাসে— কথাটা ঠিকই, দামও বেশ সস্তা।

পুষ্কর— কিন্তু তোমার পক্ষে কি সম্ভব হবে ?

হেমন্ত— কি ?

পুষ্কর— ডজন দুই মুর্গী একটা ঝাঁকায় ভরে আমার এখানে যদি পাঠিয়ে দিতে পার, তবে···।

হেমন্ত হাসে— খুব পারা যাবে।

চলে গেল হেমন্ত। এবং সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর—একটা খদ্যোত।

হেসে ফেলে নীরজা। বুড়ো খানসামা এসে ডাক দেয়—মেজ লাগায়া হুজুর।

৩

যেমন নতুন ম্যাজিস্ট্রেট দত্তগুপ্ত তেমনই আরও অনেকে পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবার আগ্রহ নিয়ে এই বাড়িতে এসেছেন। চা খেয়েছেন আর চলে গিয়েছেন। এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু টাকা সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ পাঁচশত, কেউ এক হাজার, কেউ আরও কিছু বেশি।

যিনি পাঁচ টাকা সাহায্য করবেন বলে মনে করে পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই বাড়িতে চা-এর টেবিলে এসে বসেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত পাঁচশত টাকা সাহায্য করেছেন, এমন ব্যাপারও হয়েছে। যিনি একবার চাঁদা দিয়েই মনে করেছিলেন যে, যা দেবার ছিল তা দিয়ে দেওয়া হলো, তিনিও শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন। কারণ তাঁকে আরও তিনবার এসে এই বাড়ির চা-এর টেবিলে বসতে এবং আরও তিনবার চাঁদা দিয়ে চলে যেতে হয়েছে।

দত্তগুপ্তও ভেবেছিলেন যে, শ' তিনেক টাকা দিয়ে তিনি পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবন ও সাধনার প্রতি তাঁর মমতা ও শ্রদ্ধার কর্তব্যটা সেরে দেবেন। কিন্তু পুষ্কর রায়চৌধুরীর এই বাড়ির চা-এর পেয়ালা হাতে তুলে নেবার 'পর দত্তগুপ্তের ভাবনা যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

পুষ্কর রায়চৌধুরী বলে— আপনি তিনশ টাকা দেবেন, ভাল কথা, আমি খুশি হয়ে এই সামান্য টাকাকে আপনার অসামান্য সহৃদয়তার উপহার বলে গ্রহণ করবো। কিন্তু...এ ছাড়া, আপনি যদি শুধু চীফ ইক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জিবাবুকে একবার বাংলোতে ডাকিয়ে নিয়ে এসে শুধু একটু বলে দেন যে...।

—কি বলবো ? দত্তগুপ্তের গলার স্বর হঠাৎ যেন একটু বিরক্ত হয়ে চমকে ওঠে।

পুষ্কর— মুখার্জিবাবু যেন সরকারী কন্ট্রাক্টর পার্থসারথিবাবুকে একটু বলে দেয় যে...।

—কি ?

—পার্থসারথিবাবু যেন অন্তত পাঁচটা হাজার টাকা আমার এই আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য দান করেন। জানেনই তো, পার্থসারথিবাবু হলেন টাকার কুবের।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যের সব ডিটেল্‌স্‌ যেন এইবার স্পষ্ট হয়ে একেবারে খোলাখুলি ভাষায় কি ভয়ানক গুঞ্জনের মতো বাজতে শুরু করে দিয়েছে। দত্তগুপ্তের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। পুষ্কর রায়চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দত্তগুপ্ত। তারপরেই দত্তগুপ্তের চোখের চাহনি শক্ত হয়ে ওঠে।

—না। পুষ্কর রায়চৌধুরীর পরামর্শের এই গুঞ্জনকে যেন ঘৃণা করে চেঁচিয়ে ওঠেন দত্তগুপ্ত।

—আপনি ভেবে দেখুন মিস্টার দত্তগুপ্ত। পুষ্কর রায়চৌধুরীর দুই ঠোঁটে একটা লালচে হাসি জ্বলতে থাকে।

—না, ভেবে দেখবার কিছু নেই।

পাশের ঘর থেকে দরজার পরদা সরিয়ে এই ঘরের চা-এর টেবিলের কাছে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসে একটি রঙীন মূর্তি ; বিরক্ত দত্তগুপ্তের দিকে দু' হাত তুলে ছোট্ট একটি কোমল অভিবাদনের ভঙ্গী নিবেদন করে হেসে ওঠে পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী নীরজা। —নমস্কার।

—নমস্কার ! পাল্টা অভিবাদন জানাতে গিয়ে দত্তগুপ্তের হাত দুটো যেন আর-এক বিস্ময়ের হঠাৎ-আবেশ সহ্য করতে চেষ্টা করে এবং চোখের শক্ত চাহনিটা টলমল করে ওঠে।

পুষ্কর রায়চৌধুরী বলে— দেখে সুখী হও নীরজা, ইনিই মিষ্টার দত্তগুপ্ত, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু ওঁর সামনেই বলে দিতে আমার একটুও বাধবে না, ওঁর মতো রিফাইন্ড মনের মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। অফিসারদের কথা ছেড়েই দাও, বড় বড় আর্টিস্টদের কথাই ধর, তাঁরাও অনেকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শেখেননি।

নীরজা হাসে— দেখে সুখী হয়েছি এবং জেনেও সুখী হলাম। আমার সৌভাগ্য।

রূপ তো অনেক নারীরই আছে, কিন্তু পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী নীরজার মতো এমন মনোহরা রূপ খুব কম দেখতে পাওয়া যায় বললেও কম বলা হয়। এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর স্ত্রী যে এত

বড় রূপসী, এই সত্য শহরের খুব কম মানুষেরই চোখে দেখে উপলব্ধি করবার সৌভাগ্য হয়েছে ; কারণ এই বাড়ির বাইরে কখনও বের হয় না নীরজা। পথ দিয়ে যেতে এই বাড়ির বারান্দা ও জানালার কাছে, কিংবা বাগানের গাছের ছায়ার কাছে নীরজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে যারা দেখেছে, তারা শুধু দূর হতে দেখা ফুলের স্তবকের মতো একটা শোভাকেও দেখেছে। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, নীরজার চোখের তারাতে কি সুন্দর একটা দ্যুতিময় তীব্রতা চিকচিক করে জ্বলে। নীরজার ঠোঁট দুটো কি অদ্ভুত এক রঙীন হাসির রং-ঝারি। নীরজার বুটিদার জামদানির আঁচলটা যখন কাঁধের কাছ থেকে একটু আলগা হয়ে সরে যায়, তখন নীরজার ঘাড় আর গলার গড়নও যেন একটা ছন্দেব বিস্ময়ের মতো উথলে ওঠে। সেই সঙ্গে গলার সোনার হারটাও দুলে ওঠে, আর ঝিক কবে হেসে ওঠে হাবেব লকেটের হীরাটা। লাল পাউডারে মাজা এবং প্রায় অর্ধেক খোলা বুকের রংও যেন শিউরে হেসে ওঠে।

দত্তগুপ্তের হাতের কাপের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে নীরজা বাযচৌধুরীর চোখে ছোট্ট একটা মিষ্টি ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে— এ কি।

বলতে বলতে দত্তগুপ্তের চেয়াবেব কাছে এসে দাঁড়ায নীরজা। —আর এক কাপ চা নিন মিস্টার দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্ত বিব্রতভাবে বলেন— না, আর নয়। ডাক্তারের নির্দেশ আছে যে··· ।

নীরজা রায়চৌধুরীর গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়। টেবিলের উপর হাত রেখে আর মাথা ঝুঁকিয়ে এবং দত্তগুপ্তের একেবারে চোখের কাছে মুখটা এগিয়ে দিয়ে যেন একটা নিবিড় অনুরোধের নিঃশ্বাস ছাড়ে নীরজা। যেন এই পৃথিবীর কেউ শুনতে না পায়, আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে কথা বলে নীরজা— আমার অনুরোধ, প্লীজ।

নীরজার খোঁপার সৌরভ, নীরজার পাউডারে মাজা বুকের সৌরভ এবং সেই সঙ্গে নীরজার সেই অদ্ভুত চোখের দ্যুতিময় তীব্রতা যেন সিক্ত হয়ে গিয়ে আবেদন করছে, আর এক কাপ চা খান মিস্টার দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্ত ব্যস্তভাবে বলেন— বেশ তো, আর এক কাপ চা খাব, তাতে আর··· ।

পট হাতে তুলে নিয়ে দত্তগুপ্তের পেয়ালায় চা ঢালতে থাকে নীরজা। নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে পুষ্কর বলে— আমার আর্ট ইনস্টিটিউটের জন্য বিল্ডিং তৈরির টাকা তোলবার একটা উপায় হিসাবে আমি মিস্টার দত্তগুপ্তকে একটা চেষ্টা করবার জন্য অনুরোধ করেছি নীরজা, কিন্তু উনি বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েছেন।

দত্তগুপ্ত বলেন— না না, সে কি কথা· ·বিরক্ত হব কেন ?

দত্তগুপ্তের মুখের দিকে দুচোখের চাহনি একেবারে অপলক করে দিয়ে তাকিয়ে থাকে নীরজা। দত্তগুপ্তের চোখের কত কাছে নীরজার মুখটা। নীরজার চোখের তারার মধ্যে দত্তগুপ্তের গলার লাল টাই-এর লাল ছায়াটা কাঁপছে। ফিসফিস করে যেন নিঃশ্বাসের শব্দ দিয়ে দত্তগুপ্তের কানের কাছে কথা বলে নীরজা। —যদি বিরক্ত হয়ে থাকেন, তবে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এখানে আসতে ভুলবেন না, আমার অনুরোধ।

দত্তগুপ্ত— আসবো বৈকি, নিশ্চয় আসবো।

সিগারেট ধরিয়ে আর মুখভরা ধোঁয়া ফুরফুর করে ছেড়ে দিয়ে পুষ্কর বলে— আমার প্রস্তাবটা যখন আপনার কাছে এতই কঠিন বোধ হচ্ছে, তখন··· ।

দত্তগুপ্ত লজ্জিতভাবে বলেন— কঠিন ঠিকই···কিন্তু···যাক্‌গে···এমন কিছু কঠিন নয় যে··· ।

পুষ্কর— তাহলে মুখার্জিবাবুকে বলে পার্থসারথিবাবুর কাছ থেকে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা আপনি পাইয়ে দেবেন বলে আশা করতে পারি।

দত্তগুপ্ত—হ্যাঁ, আশা করতে পারেন বৈকি।

হেমন্ত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। সেলিমপুর থেকে এক ঝাঁকা মুর্গী মুটের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে এবং নিজেও মুটের সঙ্গে এসে এই বাড়ির বারান্দার কাছে দাঁড়িয়েছে। হেসে উঠেছে পুষ্কর, হেসে উঠেছে পুষ্করদার স্ত্রী নীরজা বউদি।

হেমন্ত হাসে। —আপনার জন্যে আরও কতকগুলি অদ্ভুত জিনিস এনেছি বউদি।

—সর্বনাশ। একটা লাজুক অস্বস্তির শিহর সামলাতে গিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকে নীরজা।

হেমন্ত— অভয়নগরের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। জিনিসগুলি সেখানেই কিনেছি।

জিনিসগুলি হলো, লাল টুসটুসে এক হাজার লিচুর একটা গুচ্ছ, একটা সাঁওতালি চিরুনি, গালার তৈরি একটা ঝাঁপি আর পিতলের একটা পিলসুজ। পিলসুজের গায়ে সামান্য একটু মীনার কাজ আছে, গড়টা মন্দিরের মতো।

—বাঃ, চমৎকার জিনিস। মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ফুরফুরিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর।

—আপনি খুশি হলেন তো বউদি ? নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত রকমের একটা আশাবিহ্বল চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত। যেন নীরজা বউদি খুশি হলে হেমন্তর বুকের সব নিঃশ্বাস আর ধমনীর সব রক্তকণা খুশি হয়ে যাবে।

নীরজা বলে— যখন এত সব দামী দামী জিনিস এনেছেন, তখন খুশি হতেই হচ্ছে।

হেমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে— এমন কিছু দামের জিনিস নয় বৌদি। সবসুদ্ধ ন' টাকা দাম পড়েছে। তা, কি আর এমন দাম ? পুষ্করদার বিয়েতে আমি উপস্থিত হতে পারিনি, আপনাকে সামান্য একটা উপহার দেবার চান্স পাইনি। আজ যখন চান্স পেয়েছি, তখন···।

—ওয়েল ডান হেমন্ত। হেসে হেসে কাশতে থাকে পুষ্কর। তোমার উপহার পেয়ে নীরজা নিশ্চয় ধন্য হয়ে গিয়েছে।

যে কাজের জন্য এসেছিল হেমন্ত সে কাজ শেষ হয়েই গিয়েছে। এবং কথাও ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনই যে চলে যেতে হবে, চলে যাওয়া উচিত, সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছে হেমন্ত। নীরজা বউদির চোখের সামনে বসে থাকা একটা মুহূর্তের অনুভব যেন একটা বিপুল তৃপ্তির স্বর্গ। নীরজার মুখের দিকে যে-রকম মুগ্ধতার আবেশ নিয়ে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত, তাতে এই ধারণাই করতে হয় যে, ভয়ানক ভুল করেছে খদ্যোতটা। অন্ধকার ছেড়ে প্রচণ্ড একটা আলোর দিকে লুব্ধ হয়ে তাকাতে গিয়ে ঝলসে গিয়েছে চোখ ; তাই বসে থাকতে পারছে না, চলে যেতেও পারছে না, শুধু ছটফট করছে।

—এখন তবে এস হেমন্ত। পুষ্করের কথায় হেমন্তর আত্মাটা যেন হঠাৎ সাবধান হয়ে চমকে ওঠে এবং আর দেরি না করে চলে যায় হেমন্ত।

মুখের উপর রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকে নীরজা।

দত্তগুপ্তও তাঁর প্রতিশ্রুতির সম্মান রক্ষা করেছেন। কন্ট্রাক্টর পার্থসারথিবাবু খুশি হয়ে এসে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। কারণ এই সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে মিস্টার দত্তগুপ্ত আর মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে তিনি যে উপকার পেয়েছেন তার দাম পাঁচ হাজারের দশ গুণেরও বেশি। তিন মাইল রোড আর তিনটে ব্রিজ তৈরির কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন পার্থসারথিবাবু।

কিন্তু মিস্টার দত্তগুপ্ত আরও দুবার এই বাড়িতে এসে চা খেয়ে যাবার পর তৃতীয়বার হঠাৎ কেন যেন সাবধান হয়ে গেলেন। হঠাৎ সন্দেহ করেন দত্তগুপ্ত, পুষ্কর রায়চৌধুরীর বাড়ির এই চায়ের টেবিলও যেন একটা ভয়াল ইন্দ্রজাল।

দত্তগুপ্ত— না, আর আমার কাছে টাকার দাবি করবেন না।

পুষ্কর হাসে— ভাল কথা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন দত্তগুপ্ত। টেবিলে চা-এর পট নেই, এবং নীরজাও আসছে না। দত্তগুপ্ত বলেন— মিসেস রায়চৌধুরী কোথায় ?

পুষ্কর হাসে— বলতে পারছি না।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দত্তগুপ্তের চোখ দুটো। তারপর যেন তাড়া-খাওয়া একটা ভীরু ছায়ার মতো ধড়ফড় করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে যান।

পাশের ঘরে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে নীরজা রায়চৌধুরী।

মিঃ দত্তগুপ্তের জানতে ও বুঝতে একটু সময় লেগেছিল যে, পুষ্কর রায়চৌধুরীর আর্ট ইনস্টিটিউটও কাগজপত্রে আঁকা আর লেখাজোখা করা একটা ইন্দ্রজাল। ওটা স্বর্গত বি বি রায়চৌধুরীর ছেলের জীবিকা। অনেকের কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করেছে পুষ্কর রায়চৌধুরী, কিন্তু সে টাকা দিয়ে কোন ভবন নির্মাণের জন্য এক ডজন ইটও কেনেনি।

ভয়ানক এক ভুলের লজ্জা থেকে পালিয়ে যাবার জন্য শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে করে আর অনেক চেষ্টা করে মুঙ্গেরে বদলি নিয়ে চলে গেলেন দত্তগুপ্ত।

দত্তগুপ্তের মতো আরও অনেকে বুঝতে দেরি করেছে, কিন্তু বুঝে ফেলবার পর তারা আর এই বাড়ির ছায়ার কাছেও আসেনি। লজ্জা পেয়ে কিংবা রাগ করে অথবা হতাশ হয়ে তারা সরে গিয়েছে। সন্ধ্যা আর রাত্রির অন্ধকারে বাড়িটার আশেপাশে গাছের গা ও মাথা ছেয়ে জোনাকির আলো কি ভয়ানক দপ্‌দপ্‌ করে! বাড়িটাকে একটা অভিসন্ধির দুর্গ বলে মনে হয়। যে একবার ভিতরে ঢুকেছে, সে অন্তত একটা মোটা অঙ্কের চেক উৎসর্গ না করে ফিরে আসতে পারেনি। যে টাকা একবার এই বাড়ির চা-এর টেবিলের কাছে এসেছে সে টাকা আর এখান থেকে ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই সব মানী আর ধনীদের কারও মনে এমন সাহসের সঞ্চার দেখা দিল না যে, একদিন এসে পুষ্কর রায়চৌধুরীকে একটা ঘৃণার ধিক্কার শুনিয়ে দিয়ে চলে যায়।

স্টেভেডর মিস্টার কাঞ্জিলাল কলকাতা থেকে হাওয়া বদল করতে এই শহরে এসে কিছুদিন হলো আছেন। এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হয়ে পুষ্কর রায়চৌধুরীর আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে দুশো টাকা দিয়ে সাহায্য করবার জন্য এই বাড়িতে এসে চা খেয়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে নগদ আরও দু' হাজাব টাকা ছিল। সেই দু' হাজার টাকাও চা-এর টেবিলের উপর, অর্থাৎ নীরজা রায়চৌধুরীর সেই সুন্দর চোখের দ্যুতিময় চাহনির সামনে সঁপে দিয়ে তারপর বিদায় নিয়েছেন মিস্টার কাঞ্জিলাল।

—দেখছো নীরজা, মিস্টার কাঞ্জিলালের কাছে ঠিক দু' হাজার টাকা রয়েছে। কি আশ্চর্যের ব্যাপার!

কাঞ্জিলাল আশ্চর্য হয়েছিলেন। —অ্যাঁ, কিসের আশ্চর্য পুষ্করবাবু ?

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে পুষ্কর। —তুমি ওরকম লজ্জায় মরে গিয়ে একেবারে নীরব হয়ে আছ কেন নীরজা ?

চা-এর পট হাতে নিয়ে মিস্টার কাঞ্জিলালের কাপে চা ঢালতে ঢালতে আরও লজ্জিতভাবে লাজুক হাসির মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় নীরজা।

পুষ্কর বলে— কাল রাতে নীরজা অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে মিস্টার কাঞ্জিলাল।

—অ্যাঁ, স্বপ্ন ?

—হ্যাঁ, কে যেন একজন নীরজার কানের কাছে বলছে, তোমার একখানা অয়েল আঁকবার জন্য কলকাতার আর্টিস্ট যে দু' হাজার টাকা চেয়েছে, সে টাকা আমি দেবো। তুমি আপত্তি

করতে পারবে না। আমি তোমার গত জন্মের বন্ধু।

পুষ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকে নীরজা। —তুমি একটু চুপ কর তো।

মিস্টার কাঞ্জিলাল নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন— অদ্ভুত, খুব অদ্ভুত স্বপ্ন।

নীরজার চোখ ছলছল করে ওঠে, নীবজার নিঃশ্বাসের বাষ্প মিস্টার কাঞ্জিলালের কানেব উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এবং সেই সঙ্গে নীরজার চাপা-গলার একটা কাতর অনুরোধের স্বরও কাঞ্জিলালের কানের কাছে ফিসফিস করে ওঠে। —আমার একটা স্বপ্নের ওপর আপনি কোন মায়াটায়া দেখাবেন না। আপনি আমার কেউ নন।

—না, তা হয় না। আপনার ধমক-ধামক আমি গ্রাহ্য করবো না মিসেস রাযচৌধুরী। এই দু' হাজার টাকা আমি এখানেই রেখে যাব।

—কাল আবার আসছেন তো? কাঞ্জিলালের মুখের দিকে অপলক চোখের ভেজা-ভেজা চাহনি তুলে ধরে এবং সেই চাহনিকে চোখ বুঁজে নিংড়ে দিয়ে প্রশ্ন করে নীরজা।

কাঞ্জিলাল বলেন— দেখি···আসতে তো ইচ্ছে করছেই···কিন্তু··· ।

নীরজার গলার স্বর যেন চারদিকের একটা উৎকর্ণ সংসারের ভয়ে ভীরু হয়ে ফিসফিস করে—আসবেন মিস্টার কাঞ্জিলাল। আমি আশায় থাকবো।

বার বার কয়েকবার এসেছিলেন কাঞ্জিলাল। কিন্তু শেষের সেইবার কি যেন সন্দেহ করে ভ্রূকুটি করে, অর্থাৎ বেশ বিরক্ত হয়ে পুষ্করের মুখেব দিকে তাকিয়ে রইলেন। —না, মিস্টার রায়চৌধুরী, হাজার টাকা পারবো না। বড়জোর একশো টাকা দিতে পারি।

পুষ্কর হাসে— তাই দিন তাহলে।

একশো টাকার চেক পুষ্করের হাতে তুলে দিযে কাঞ্জিলাল বলেন—নীবজাদেবীকে এখনও দেখছি না কেন?

পুষ্কর—বেঁচে আছেন, কিন্তু··· ।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পুষ্কর বলে— কিন্তু বেশ রাত হয়েছে মিস্টার কাঞ্জিলাল।

কাঞ্জিলালের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, এবং সেই মুহূর্তে ঘব ছেড়ে চলে গেলেন কাঞ্জিলাল।

পাশের ঘরে মুখের উপর রুমাল চেপে খিলখিল করে হেসে হেসে ছটফট করে নীরজা।

৫

আজ আর কারও এই বাড়িতে চা খেতে আসবার কথা নেই। আজ না, কালও না। এবং দেখতে দেখতে প্রায় একটা মাস পার হযে যাবার পরেও এই বাড়িতে চা-এর জন্য লোলুপ হয়ে ছুটে আসবে, এমন কোন উদ্‌ভ্রান্তের সন্ধান পায়নি পুষ্কর রায়চৌধুরী। মিসেস জোন্সের হোটেলে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে এসেছে পুষ্কর। শুধু জানতে পারা গিয়েছে যে, মল্লিক ব্রাদার্স নামে একটা কোল কোম্পানীর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা, একজন পি মল্লিক কিছুদিন পরে আসবেন। একটা মাস থাকবেন এবং শিকারের শখ মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবেন।

বুড়ো খানসামা আজকাল রাত্রিবেলায় মেজ লাগিয়ে যখন ডাক দেয়, তখন খাবার টেবিলে গিয়ে শুধু আটার পরোটা আর তরকারি আর সামান্য এক বাটি পায়েস দেখে নীরজার চোখ দুটো ছলছল করে। এ খাবার খেতে পুষ্করের যে একটুও ভাল লাগে না, ভাল করে জানা আছে নীরজার। ছলছল চোখ দুটোও যেন হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। অদৃষ্টের এই চক্রান্ত ভেঙে গুঁড়ো করে দেবার জন্য বুকের ভিতরে একটা দুরন্ত জেদ ছটফট করতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে নীরজা— পি মল্লিকের খবর কি ?

পুষ্কর— এখনও কোন খবর নেই। খুব সম্ভব আরও এক মাস পরে আসবে।

একটা মাসের এক একটা দিন যেন আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে পার হতে থাকে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে যে আসে, আর চলে যায়, সে হলো হেমন্ত।

দু' আউন্স হুইস্কি শেষ হয়ে যাবার পর পুষ্করও একদিন বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে— খদ্যোতটা, যেটাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না, সেটা কিন্তু ঠিক নিয়ম করে নিয়ে মাঝে মাঝে আসছে।

ডেভিলের কথা মনে পড়তেই ডেভিল এসে হাজির হয়। কী অদ্ভুত সত্য কথা! ফটকের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে পুষ্কর— সত্যিই যে খদ্যোতটা আসছে নীরজা।

বারান্দার আলো জ্বলে ওঠে আর হেমন্ত এসে বারান্দার উপরে উঠেই হাসতে থাকে— বউদির জন্য একটা নতুন জিনিস এনেছি।

নতুন জিনিসই বটে। এক সের চিনির পাখি, অর্থাৎ গোলাপী রং-এর কতগুলি নিরেট মিষ্টি শরীরের চিল হাঁস আর কবুতর।

হেমন্ত বলে— হীরাগঞ্জে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা দোকানে এগুলিকে দেখতে পেয়েই ইচ্ছে হলো, বউদির জন্য কিনে নিয়ে যাই।

পুষ্কর— কিন্তু তোমার হাতে এত বড় একটা ব্যাগ কেন হেমন্ত ?

হেমন্ত—হীরাগঞ্জে এখন ক্যাম্প পড়েছে কিনা ; স্টাফের প্রায় সকলেই সেখানে আছে। কাল হলো মাইনের তারিখ। ট্রেজারি থেকে টাকাটা নিয়ে যাবার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

পুষ্কর— কত টাকা ?

হেমন্ত—হাজার দুই হবে।

পুষ্কর— তুমি বেশ ক্লান্ত হয়েছ বলে মনে হচ্ছে হেমন্ত।

হেমন্ত— আমাদের মতো মানুষের আবার ক্লান্তি কিসের পুষ্করদা ? এসব খাটুনি গ্রাহ্যই করি না।

পুষ্কর— হেমন্তকে আজ চা না খেয়ে চলে যেতে দেবে না নীরজা।

নীরজা ডাকে— আসুন।

এবং তারপর আর কতক্ষণই বা সময় লাগে ? সেই চা-এর টেবিল এবং পুষ্কর রায়চৌধুরীর চোখে সেই উজ্জ্বলতা, এবং নীরজা রায়চৌধুরীর চোখের তারায় সেই দ্যুতিময় তীব্রতা। চা-এর পট হাতে তুলে নিয়ে হেমন্তর পেয়ালায় চা ঢালতে থাকে নীরজা।

পুষ্কর বলে— তোমার নীরজা বউদি তোমাকে কি-যেন বলতে চায় হেমন্ত, কিন্তু লজ্জার জন্য বলতে পারছে না।

—বলুন বউদি।

নীরজা বউদির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে হেমন্তর চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়। যেন নীরজা বউদির মুখের একটা কথা শোনবার জন্য হেমন্তর অদৃষ্টটা পিপাসিতের মতো এতদিন ধরে নিদারুণ প্রতীক্ষার দুঃখ সহ্য করছিল।

পুষ্কর বলে—হাজার দুই টাকা নীরজার বড় দরকার ছিল। আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল, কালও বন্ধ থাকবে, কাজেই টাকা তুলতে পরশু হয়ে যাবে। অথচ কাল সকালেই টাকাটা নীরজার ভয়ানক দরকার। না পেলে নীরজার ভয়ানক অপমানের ব্যাপার হবে।

—বউদির অপমান ? হেমন্তর চোখ দুটো কুঁচকে যায়, যেন হেমন্তর বুকের হাড়ে একটা চোট লেগেছে।

পুষ্কর— হ্যাঁ হেমন্ত, নীরজার এক গরীব বান্ধবী তার মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য নীরজার কাছে সাহায্য চেয়েছে। নীরজাও দু' হাজার টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছে। কাল সকালেই টাকা নিতে আসবে নীরজার বান্ধবী।

হেমন্ত— আপনি যদি এখনই একটা চেক লিখে আমাকে দেন পুষ্করদা, তবে আমি এই রাতেই একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি :

পুষ্কর— কি চেষ্টা করবে ?

হেমন্ত— আগরওয়ালার গদিতে গিয়ে চেকটা ক্যাশ করে আনতে পারি। আগরওয়ালা আমাকে বেশ একটু খাতির করে।

পুষ্কর— তা হয় না হেমন্ত। সেটা আমার অপমান। পুষ্কর রায়চৌধুরীর টেবিলের দেরাজে নগদ দু' হাজার টাকা থাকে না, একথা বাইরের মানুষকে জানানোর অর্থ পুষ্কর রায়চৌধুরীর প্রেস্টিজ নষ্ট করা।

হেমন্ত উদ্বিগ্ন হয়— তাহলে কি উপায় হবে ?

পুষ্কর— তুমি যদি একটু সাহস কর, তবেই উপায় হতে পারে।

হেমন্ত— আমি ? আমি কি সাহস করতে পারি বলুন ?

পুষ্কর— তুমি তোমার এই টাকা নীরজাকে দুদিনেব জন্য লোন দাও।

হেমন্ত— সর্বনাশ ! এ যে পরেব টাকা, স্টাফের পেমেন্টের টাকা। এ টাকা আমি কেমন করে দিই, বলুন ?

পুষ্কর— আমি আর কিছু বলতে চাই না হেমন্ত। যাক্‌গে ·হেমন্তকে আর এক কাপ চা দাও নীরজা। হেমন্তর কাপে চা ঢালে নীরজা। কিন্তু চা-এর কাপেব দিকে নয়, হেমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরজার সুন্দর চোখের বড় বড পাতাগুলি কাঁপতে থাকে।

নীরজা বউদি কি দুঃখিত হলেন ? অপরাধীর মতো ক্ষমাভিক্ষু চাহনি তুলে ছটফট করে ওঠে হেমন্ত— আমি বড় দুঃখিত বউদি, বিশ্বাস করুন, সম্ভব হলে আমি নিশ্চযই আপনাকে এই টাকাটা দিয়ে যেতে পারতাম।

নীরজাব নিঃশ্বাস যেন সিরসির শব্দ করে কেঁপে কেঁপে বুকেব উপব পড়ে থাকা লকেটের হীরাটাকে কাঁপাতে থাকে। —সম্ভব নয় যখন, তখন দেবেন না।

হেমন্ত— কিন্তু আপনাকে যে কাল বড় অপ্রস্তুত হতে হবে।

নীরজা— হবে বৈকি, কিন্তু সেজন্য আপনি ভাবেন কেন ?

হেমন্ত— সত্যি, না ভেবে থাকতে পারছি না বউদি।

নীরজা— আমি আপনার এমন কোন আপন-জন নই যে, আমার মান-অপমানের জন্য আপনার এত ভাবনা করবার দরকার হতে পারে।

হেমন্ত— এত শক্ত কথা বলবেন না বউদি। আপনাকে নিতান্ত আপন-জন বলে মনে করি বলেই··· ।

নীরজার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে ফিসফিস করে— বিশ্বাস করি না !

হেমন্তর নিঃশ্বাস যেন দুঃসহ একটা বেদনা সহ্য করতে গিয়ে মৃদু হয়ে এবং বিপুল অনুনয়ের বেদনায় ফিসফিস করে। —বিশ্বাস করুন বউদি।

—তবে ? প্রশ্ন করে নীরজা। নীরজার চোখের তারার সেই ভয়ানক সুন্দর দ্যুতিময় তীব্রতা ঝিকঝিক করে জ্বলতে থাকে।

হেমন্ত যেন আনমনার মতো বিড় বিড় করতে থাকে— ওরা চোর বলে সন্দেহ করবে, সাসপেণ্ড করবে, চাকরিটাও যাবে, জেলও হয়ে যেতে পারে··· ।

কিন্তু নীরজা বউদির খোঁপার সৌরভ যেন হেমন্তর করুণ হৃৎপিণ্ডটার চারদিক ঘিরে

ছুটোছুটি করছে। চেঁচিয়ে ওঠে হেমন্ত— ঠিক আছে, ঠিক আছে। টাকাটা আপনি নিন বউদি।

—দাও, আমার কাছেই দাও। হ্তা বাড়িয়ে দিয়ে টাকার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে টেবিলের এক-পাশে হাতের কাছেই রেখে দেয় পুষ্কর।

নীরজার কপালের উপর ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে হাসছে। রুমাল দিয়ে মুখের হাসি চাপা দিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে চলে যায় নীরজা।

হেমন্ত বলে— আজ তবে আসি পুষ্করদা।

পুষ্কর— এস।

চলে যায় হেমন্ত; এবং তখনি শুনতে পায় পুষ্কর, ভিতরের ঘরে রুমাল-চাপা একটা সুন্দর মুখের অদ্ভুত এক উল্লাসের চাপা-চাপা হাসির শব্দ যেন নেচে নেচে বাজছে। আস্তে আস্তে উঠে ভিতরের ঘরের ভিতর ঢুকে হেসে ওঠে পুষ্কর। —খদ্যোতটা শেষ পর্যন্ত একটা কাজ দিল তবে নীরজা। ...একি? তুমি কি করছো নীরজা?

নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকফাটা একটা বিস্ময়ের আর্তনাদ ছেড়ে তারপরেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্কর। শুনতে বড় ভুল করেছে পুষ্কর। নীরজা রায়চৌধুরী আজ আর রুমাল দিয়ে মুখের হাসি চাপছে না। চাপছে একটা ফোঁপানো কান্নার স্বর।

—খদ্যোতটার জন্য? চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্কর।

কথা বলে না নীরজা, মুখ তুলে তাকায়ও না।

—তুমি বড় বেশি হাঁপাচ্ছ, বড় বিশ্রী কান্না কাঁদছো নীরজা! দাঁতের উপর দাঁত চেপে কথা বলে পুষ্কর।

কিন্তু কোন উত্তর দেয় না নীরজা।

—মনে হচ্ছে খদ্যোতটা যেন তোমারই সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

উত্তর দেয় না নীরজা।

—ছিঃ, ট্রেচারি দাই নেম ইজ উওম্যান! আবার দাঁতে দাঁতে শব্দ করে যেন একটা ধিক্কারের জ্বালা আছড়ে দিয়েই নীরব হয়ে যায় পুষ্কর; চোখের চাহনিও ফ্যালফ্যাল করতে থাকে। পুষ্কর রায়চৌধুরীর অদৃষ্টের সব গর্ব অসহায় হয়ে গিয়েছে।

পুষ্কর রায়চৌধুরীর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র অহংকার, একমাত্র শান্তি হঠাৎ যেন একটা অভিশাপে বিষাক্ত হয়ে সর্বময় শাস্তির জ্বালা হয়ে উঠছে। ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্কর— তুমি বোধ হয় আর হাসতে পারবে না নীরজা?

উত্তর দেয় না নীরজা। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে আর নিথর হয়ে বসে থাকে।

পুষ্কর— কিন্তু তুমি না হাসলে আমি বাঁচবো কি করে?

তবু উত্তর দেয় না নীরজা।

পুষ্কর— তা হলে এখনই টাউনে গিয়ে হেমন্তর খোঁজ করে ওকে ওর টাকাটা দিয়ে আসি, কেমন?

চোখের উপর চাপা রুমালটা সরিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে নীরজা— এস।

বিজয়িনী

কোন উপায় যখন নেই, তখন চিন্তা করে লাভ কি ?

তবু চিন্তা করে বরুণা, আর, বরুণার উপর রাগ করে সোমেশ। যেখানে মায়া করবার কোন অর্থ হয় না, সেখানে মায়া করে লাভ কি ?

কিন্তু মায়া না করে পারে না বরুণা, এবং চিন্তাই করে।

যার সম্পর্কে সব সময় যত মায়ার কথা বলে বলে সোমেশকে বিরক্ত করে বরুণা, সে হলো বরুণারই বোন অঞ্জনা। বয়সে বরুণার চেয়ে খুব বেশি ছোট নয় অঞ্জনা, বড়জোর চার বছরের ছোট হবে।

সোমেশ মাঝে মাঝে বলে— তাও যদি বুঝতাম যে, এক মায়ের পেটের আপন বোন, তবে না হয় বোনের কথা ভেবে একটু-আধটু··· ।

ঠিকই, ঠিক আপন বোন নয়, বরুণার সৎ-বোন অঞ্জনা। এবং কে না জানে, বরুণার সেই ভয়ানক সৎ-মা মানুষটি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন বরুণাকে কিরকম হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে আর কষ্ট দিয়ে খুশি হয়েছিলেন।

বরুণার বয়স তখন মাত্র দু' বছর, যখন বরুণার মা হঠাৎ একদিন বুকের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই জোরে জোরে তিনবার শ্বাস ছেড়ে দিয়ে মরে গেলেন। এবং তারপর একটা বছরও পার হয়নি, নতুন করে একটা মাকে যেদিন বাড়িতে নিয়ে এলেন বাবা, সেদিন বরুণার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক চোখ তুলে দিযে তাকিয়েছিলেন নতুন মা, এবং নতুন মা'র চোখ দুটো বেশ ছলছলও করেছিল।

এসব ঘটনার ছবি বরুণার সেই দু' বছর বয়সের আরও অনেক স্মৃতির মতো বরুণার মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে। বড় হয়ে বাবার কাছ থেকে সে ঘটনার গল্প শুনেছিল বলেই নিজের জীবনের সেই অতীতটাকে, শিশুকালের সেই সব সুখ আর দুঃখগুলিকে কিছু কিছু কল্পনা করতে পারে বরুণা। এবং আজও মনে পড়ে বাবার সেই করুণ মুখের ছবি, আর করুণ আক্ষেপের ভাষা। বরুণা তখন বেশ বড়টি হয়েছে। বরুণাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে কতবার বলতেন বাবা। —তোর নতুন মা আগে এমনটি ছিল না বরু, বিশ্বাস কর। কত ভালবাসতো তোকে ; আমি রাত করে অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেছি, তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে রয়েছে তোর নতুন মা। সেই মানুষ আজ একবার খোঁজও নেয় না যে, তুই ভাত খেলি কি খেলি না। ছিঃ ছিঃ, কি ছিল, আর কি হলো !

আজ বরুণা তার জীবনের সবচেয়ে পুরনো অতীতের ছবি বলতে যে ছবিকে আবছায়ার মতো মনের ভিতরে দেখতে পায়, সে ছবি বরুণার পাঁচ বছর বয়সের একটা অনুভবের আবছা স্মৃতি মাত্র। নতুন মা'র কোলে ফুটফুটে একটা কচি মানুষ শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, আর বরুণা সেই ছোট ছোট হাত-পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার জন্য নতুন মা'র কোলের উপর ঢলে পড়েছে। নতুন মা একটু বিরক্ত হয়ে বলেছেন— আঃ, বিরক্ত করিস না বরু। সর দেখি।

সেই যে বরুণাকে সরিয়ে দিলেন নতুন মা, তারপর···তারপর আর কোনদিন নতুন মা'র কাছে এসে গা ঘেঁষে বসতে পেরেছিল বলে মনে পড়ে না বরুণার। এবং আজও বেশ স্পষ্ট করে মনে পড়ে, একদিন নতুন মা বাবার উপর ভয়ানক রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন— ও মেয়েকে আঁতুড়ে নুন খাওয়ানো উচিত ছিল। সেদিন, বরুণার জন্য একটা সিল্কের শাড়ি কিনে এনেছিলেন বাবা।

নতুন মা'র সন্দেহ ছিল যে, বাবা বরুণাকে ভালবাসে, এবং অঞ্জনাকে ভালবাসেই না।

বাবা দুঃখিত হয়ে নতুন মাকে বলতেন— ছিঃ, তুমি এত মিথ্যে সন্দেহও করতে পার। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

মনে পড়ে বরুণার, বরুণারই বিয়ের আগের দিনে রাগ করে না খেয়ে, আর ঘরের কপাটে খিল এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন নতুন মা। তার আগে বাবার সঙ্গে সারা সকাল ঝগড়া করেছিলেন— সর্বস্ব খুইয়ে, ধার করে আর অফিসের ফাণ্ডের সব জমা টাকা তুলে তুমি বরুর বিয়ে দিচ্ছ, আমার অঞ্জুর কি উপায় হবে তাহলে ? অঞ্জু কি বানের জলে ভেসে এসেছে ? অঞ্জু তোমার মেয়ে নয় ?

ঘরের ভিতরে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে সারাটা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন নতুন মা। নতুন মা'র সেই কান্নার করুণ স্বর আজও বরুণা যেন কানে শুনতে পায়।

এবং সেই বিয়ের দিনের একটা ঘটনার ছবিও মনে পড়ে বরুণার। সেদিন বাইরের ঘরে বরুণাকে কাঁদ-কাঁদ মুখ নিয়ে একলাটি পড়ে থাকতে দেখে অঞ্জনা ভয়ানক রাগ করেছিল।— তুই দিদি একটা ভয়ানক মুখ্খু। মা'র ওসব আবোল-তাবোল কথা শুনিসই বা কেন, আর ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করিসই বা কেন ?

সেই অঞ্জনা আজ কোথায় আছে ? ভাবতে গিয়ে মন খারাপ না করে পারে না বরুণা, সোমেশ যতই রাগ করুক না কেন।

বরুণার বিয়ে হয়েছে এই তো মাত্র পাঁচটা বছর হলো। বাবা মারা গিয়েছেন বরুণার বিয়ের মাত্র দুটি বছর পরেই। আর নতুন মা মারা গিয়েছেন, এই সেদিন, এক বছরও হয়নি।

বেচারা নতুন মা'র সেই সন্দেহভরা দুঃস্বপ্নটাই সত্য হয়ে উঠেছে। আজ নতুন মা'র কথা মনে পড়লে বরুণার চোখ দুটো বার বার ভিজে যায়। সত্যিই যে, আজ সেই ভয়ানক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নতুন মা'র সেই রাগের কথাগুলিই যেন ভয়ানক আর্তনাদের স্মৃতির মতো করুণ হয়ে বরুণার মনের ভিতর বাজছে। আমার অঞ্জুর কি উপায় হবে ?

বরুণার বাবা চাকরি করতেন গয়ার পুরনো শহরের যে মারোয়াড়ীর অফিসে, সে অফিস আজও সেখানে আছে। দোকানের পিছনে যে গলির ভিতরে ছোট একটা বাড়িতে বরুণার জীবনের ষোলটা বছর পার হয়েছিল, সেই বাড়িতে এখন অন্য ভাড়াটে থাকে। অঞ্জনা থাকে ঐ গলিতেই আর একটা বড় বাড়িতে, নিবারণকাকার বাড়ি।

বাবার খুড়তুতো ভাই নিবারণকাকা। এত বড় বাড়িটা নিবারণকাকার নিজেরই বাড়ি। নিবারণকাকার অবস্থা ভাল, তামাকের আড়তদারী করেন। নিবারণকাকার বাড়িতে অনেক লোক। সব নিয়ে চল্লিশ জনেরও বেশি হবে। বড়-বউদির চারটি, মেজ-বউদির তিনটি আর ছোট-বউদির দুটি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া, নিবারণকাকার দুই মেয়ে আর দুই জামাইও এই বাড়িতে থাকে। তাদেরও ছেলেপিলে আছে। এত বড় সংসারের কাজে, মাত্র একটি ঝি রেখেছিলেন নিবারণকাকা।

কিন্তু, খবর পেয়েছে বরুণা, অঞ্জনাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার পরেই সেই ঝি-টাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন নিবারণকাকা।

এই অঞ্জনার উপায় কি হবে ? কথায় কথায় সোমেশকে বিরক্ত করে বরুণা— তুমি কি ভেবেছ, টাকা খরচ করে অঞ্জনার বিয়ে দেবেন নিবারণকাকার মতো মানুষ ? কখ্খনো না। স্বপ্নেও এমন আশা করো না। মেয়েটাকে শুধু দু'মুঠো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে, আর চিরকাল খাটাবে, যতদিন না মেয়েটা মরে যায়।

সোমেশ— কিন্তু তুমিই বা স্বপ্নে কি আশা করছো ? তুমি অঞ্জনার বিয়ে দেবে ?

বরুণা— তুমি আশা দিলেই আশা করতে পারি।

সোমেশ ভ্রূকুটি করে। —আমি আশা দেব ? আমি ? যে মানুষ একটা জমিদারের

সেরেস্তায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করে, সে মানুষ তোমার সৎ-বোনের বিয়ের খরচ যোগাবে ? তা···সৎ-বোনের জন্য মনে মনে যত খুশি মায়া কর বরুণা, কিন্তু পাগলের মতো কথা বলে আমাকে বিরক্ত করো না।

চুপ করে বরুণা। সোমেশেরই মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে। অভিযোগ করবার কিছু নেই ; সোমেশের যুক্তির মধ্যে একটুও ভুল নেই। কোথা থেকে টাকা দেবে বেচারা সোমেশ ? নিজেরই স্ত্রী বরুণাকে আজ পর্যন্ত একটা সোনার জিনিস কিনে দিতে পারেনি যে সোমেশ, সে কেমন করে ষোল ভরি সোনার জিনিস, মোটামুটি দানসামগ্রী আর শয্যাদ্রব্য, একটা হারমোনিয়ম আর নগদ এগারশ' টাকা বরপণ দিয়ে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়াতে পারবে ? রাজগীরে থাকে, এক পাত্রের খোঁজ পেয়েছে বরুণা। বার বার চিঠি লিখে সেই পাত্রের মা'র সঙ্গে অনেক কথা আলোচনা করেছে, অনেক অনুনয় আর মিনতি জানিয়েছে। এবং পাত্রের মা শেষ পর্যন্ত, মাত্র এই সামান্য দাবির সর্তে বরুণার বোন অঞ্জনার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন। অঞ্জনার একটা ফটোও পাত্রের মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বরুণা।

বরুণার নিজের গায়ের জিনিসগুলির সবই যদি থাকতো, তবে নয়··· তাতেই বা কি ? ষোল ভরির দাবির মধ্যে মাত্র সাত ভরি যোগাড় হতো। বাকি খরচ কোথা থেকে আসতো ?

বরুণারই একবার টাইফয়েড হয়েছিল, এবং টাইফয়েডের পর প্রায় পঙ্গু ধরনের একটা অবস্থা হয়েছিল বরুণার। একটা বছর হাঁটা-চলাও করতে পারেনি। এহেন একটা কঠিন রোগের চিকিৎসা করবার জন্য যে টাকা দরকার, সে টাকাও যোগাড় করবার সামর্থ্য হয়নি সোমেশের। বরুণারই গায়ের জিনিসগুলি বেচে দিয়ে ওষুধপত্র আর ডাক্তারের দাবি মেটাতে হয়েছিল। সোমেশ আজও অপরাধীর মতো মুখ করে নিজেকেই ধিক্কার দেয়— টাকা যোগাড় করবার ক্ষমতা থাকলে কি তোমার ঐ সামান্য দু-চারটে গয়না বেচে ওষুধ কিনতাম, আজ পর্যন্ত একটা দেড় ভরি জিনিসও তোমাকে···।

—ওসব কথা ছেড়ে দাও। বলতে গিয়ে বরুণার মুখটা করুণ হয়ে যায়।

সোমেশ বলে— আমিও বলি, তুমি ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও। রাজগীরের ছেলের মা'র কাছে মিছিমিছি চিঠি লেখালেখি করো না।

বরুণা— কিন্তু···।

সোমেশ— কি ?

বরুণা— গয়াতে গিয়ে অঞ্জনাকে একবার কি দেখেও আসতে পারবো না ? সেটাও কি খুব খরচের ব্যাপার ?

নতুন মা মারা যাবার পর সেই যে একবার গয়াতে গিয়েছিল বরুণা, তারপর আর যায়নি। নিবারণকাকা এসে গম্ভীর হয়ে অঞ্জনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, ব্যস্, তারপর আর নয়। সেদিনের অঞ্জনার সেই জলভরা চোখ দুটোকেই বার বার মনে পড়ে। এবং সেই অঞ্জনার চিঠি এসেছে— তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে দিদি।

একবার গয়া ঘুরে আসতে ক'টা টাকাই বা খরচ করতে হবে ? সে খরচও কি দিতে পারবে না সোমেশ ?

সোমেশ হাসে— তা···একবার গয়াতে যাওয়া আর ঘুরে আসা, হ্যাঁ, সে খরচ যোগাড় হয়েই যাবে।

২

রফিকাবাদ নামে যে জায়গাতে একটা মাটির বাড়িতে সোমেশ ও বরুণা থাকে, সেখান থেকে গয়া যেতে হলে রোজকার ডাক-বহা মোটর সার্ভিসের বাসেই যাওয়া যায়। ভাড়া লাগে বার আনা। দুটি মানুষের যাওয়া-আসার জন্য খরচ পড়ে দেড় টাকা আর দেড় টাকা, মোট তিন টাকা।

কিন্তু সোমেশ জানে, এবং বরুণাও জানে, নিবারণকাকার বাড়িতে গিয়ে ওঠা যাবে না। ওঠা উচিতও নয়, কারণ মুখে কিছু না বললেও খুশি হবে না নিবারণকাকা। গয়াতে গিয়ে কোন হোটেলে হয়তো একটি দিনের মতো থাকবার আর দু'বেলা ভাত খাওয়ার খরচও যোগাড় করতে হবে। সে জন্য অন্তত আরও চারটে টাকা চাই। অর্থাৎ মোট দশটা টাকা হলেই হয়ে যায়।

কিন্তু আর কয়েকটা দিন দেরি করতে চেয়েছিল সোমেশ। দশটা টাকাও এখন হাতে নেই। মাইনেটা পাওয়া যাক্, তারপর একদিন··· ।

কিন্তু বরুণা আবার সোমেশকে বিরক্ত করেছিল— না, আর দেরি করতে ভাল লাগছে না।

সোমেশ আশ্চর্য হয়—আর মাত্র পনরটা দিন পরেই বোনকে দেখতে পাবে, তবু··কি আশ্চর্য, কেন যে এত ঘ্যানর ঘ্যানর কর ? এরই মধ্যে তোমার বোন মরে যাবে না।

বরুণা— কিন্তু এই পনেরটা দিন তো কষ্ট পাবে মেয়েটা। ভাববে, দিদি বুঝি আসবেই না। যাবই যখন, তখন বেচারাকে আরও পনরটা দিন চিন্তায় রেখে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?

অগত্যা বাধ্য হয়ে সাহুজীর কাছ থেকে একমাসের জন্য এক টাকার সুদ স্বীকার করে দশটা টাকা ধার নিতে হয়। তিন দিনের ছুটি নিতে হয়, এবং গয়াতে এসে একটা হোটেলেও উঠতে হয়।

এবং তারপর যা হয়ে গেল, তার জন্য একেবারে গম্ভীর হয়ে, মনের রাগ মনের ভিতর চেপে রেখে, আবার রফিকাবাদে ফিরে যাবার জন্য চকের বাস স্ট্যান্ডের কাছে এসে দাঁড়ায় সোমেশ। ঝোঁকের মাথায়, একটা অদ্ভুত জেদের অহংকারে একি কাণ্ড করে ফেললো বরুণা ! এরকম কঠোর একটা দায় মাথায় তুলে নিতে একটুও ভয় করলো না বরুণার ?

নিবারণকাকার বাড়িতে যাওয়া হলো। বোনকে বুকে জড়িয়ে একেবারে আহ্লাদে গলে পড়লো বরুণা। সবই ভাল হতো, যদি ঘটনাটা সেখানেই ফুরিয়ে যেত। কিন্তু তারপরেও কেন মিছিমিছি··· ।

অঞ্জনার দোষ নেই। অঞ্জনা বার বার আপত্তি করেছিল। বার বার বরুণার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর লুকিয়ে লুকিয়ে বরুণার শাড়ির আঁচল ধরে এক একটা টান দিয়ে বরুণাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল অঞ্জনা— তুমি চুপ কর দিদি।

কিন্তু চুপ করতে পারেনি বরুণা। কাকা আর কাকিমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা ঝগড়া বাধিয়ে ফেললো বরুণা।

নিবারণকাকা ঠাট্টা করে বললেন— আঃ, কোত্থেকে আজ হঠাৎ এসে সৎ-বোনের জন্য দরদ দেখাতে শুরু করেছেন, এতদিন ছিলেন কোথায় আপনি ?

কাকিমা বললেন— অঞ্জু সুখে আছে কিনা, সে খোঁজ তোমাকে নিতে হবে না। তুমি ঘরে গিয়ে নিজের সুখের খোঁজ নাও।

বরুণা তবু চেঁচিয়ে তর্ক করে— আমার বোনের সুখ-দুঃখের খোঁজ আমি নেব না তো কে নেবে ?

তিন বউদি বরুণার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসে আর ফিসফিস করে—ইস্, কত

কত সুখের মানুষটি। কত ক্ষ্যামতা।

বরুণা বলে— আমি শুধু জানতে চাই, অঞ্জনার বিয়ে দেবাব জন্য কি চেষ্টা আপনারা করেছেন?

নিবারণকাকা— চেষ্টা করি বা না-কবি, তুমি জিজ্ঞেস কববার কে?

কাকিমা বলেন— এত বড গলা কবে কথা বলতে লজ্জা কবে না তোমাব?

বরুণা— কিসের লজ্জা?

কাকিমা— দাও না বোনের বিয়ে, দেখি কত মুবোদ?

বরুণা চেঁচিয়ে ওঠে— হ্যাঁ, মুবোদ আছে।

বড-বউদি মুখ টিপে হাসে আব ফিসফিস কবে। —কত টাকা মাইনে পান সোমেশবাবু?

বরুণা আবার বেহায়ার মতো চেঁচিয়ে ওঠে— পঞ্চাশ টাকা।

নিবারণকাকা— তবে চুপ কব এবং চুপচাপ চলে যাও।

বরুণা— না।

নিবারণকাকা— তার মানে?

বরুণা— অঞ্জনাকে নিয়ে যাব।

অঞ্জনাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বরুণাব কানেব কাছে ফিসফিস কবে— না, দিদি। তুমি চলে যাও, আমি বেশ আছি দিদি।

অঞ্জনার হাত ধবে টান দেয় বরুণা— চল।

অঞ্জনা আবাব কি-যেন বলতে চেষ্টা কবে। বরুণা ধমক দেয়—চুপ কব।

নিবারণকাকা সোমেশেব মুখেব দিকে তাকিয়ে আস্তে একটা হুংকাব ছাড়েন – কি হে, তুমি নীরব কেন? তোমার স্ত্রীর রকম-সকম চোখে দেখতে পাচ্ছ না? তোমাবও কি ইচ্ছা ?

সোমেশ বলে— আজ্ঞে আমি তো—আমি এসব কাণ্ড ঠিক পছন্দ কবতে পারছি না।

কাকিমা চেঁচিয়ে ওঠেন— তোব মতলব কি অঞ্জনা? তুইও কথা বলছিস না কেন? বডলোক দিদির বাডিতে যাবি?

অঞ্জনা মাথা হেঁট করে নীবব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তিন বউদি একসঙ্গে ভ্রূকুটি করে আর কলকল করে ওঠে— যেতে দিন, যেতে দিন। আপনি আপত্তি করবেন না, মা। গযা শহবে কি আর ।

বরুণা পাল্টা ভ্রূকুটি কবে। —ঝি পাওয়া যায় না? তাই না?

তিন বউদি একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে— হ্যাঁ, তাই।

অঞ্জনার হাত ধবে নিবারণকাকাব বাডিব দবজা পাব হয়ে আব গলির ধুলোর উপর পা দিয়েই খিলখিল করে হেসে সোমেশের মুখের দিকে তাকায় বরুণা। —কেমন জব্দ করে দিলাম।

রফিকাবাদে যাবার জন্য মোটর বাসের তিনটে টিকিট কিনতে হবে। পকেটে হাত দেয় সোমেশ। এবং ভয়ানক গম্ভীর হয়ে, ছোট একটা ভ্রূকুটি করে বরুণার দিকে তাকায়—কাকে জব্দ করলে?

বরুণা হাসে— নিবারণকাকাকে।

সোমেশ— মোটেই না, কাকে জব্দ করলে, সেটা বুঝতে এখনও ।

কথা শেষ না করেই বাসের টিকিট কেনবার জন্য এগিয়ে যায় সোমেশ।

অঞ্জনার কি উপায় হবে ? অনেক দিন তো পার হয়ে গেল। একটা বর্ষা শেষ হয়ে গিয়ে, অনেকগুলি মাস পার হয়ে, আবার একটা বর্ষা প্রায় এসে পড়লো। রফিকাবাদের জ্বলন্ত আকাশের এদিকে ওদিকে ছোট ছোট মেঘ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। আর ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় বরুণা।

বড় গলা করে নিবারণকাকার মুখের উপর যে কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে বরুণা, আজ যদি সেই কথার জের ধরে জবাব চাইতে আসেন নিবারণকাকা, তবে কি উত্তর দেবে বরুণা ?

মাঝে একদিন সোমেশও ভয়ানক রুক্ষ স্বরে এবং রাগ করে একটা অভিযোগও করে ফেলেছে। —তোমার জন্যেই আজ একটা অপমান সহ্য করতে হলো !

বরুণা ভয় পায়—অপমান ?

সোমেশ— হ্যাঁ। গয়াতে আদালতের কাছে নিবারণকাকার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

বরুণা— কি বললেন নিবারণকাকা ?

সোমেশ— যা বলা উচিত, তাই বললেন। বিশ্রীভাবে মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা করলেন, কি হে সোমেশ, তোমার স্ত্রী বরুণা মহাশয়া লাখ টাকা খরচ করে সৎ-বোনের বিয়ে দিয়ে ফেলেছে বোধহয় ?

মাথা হেঁট করে বরুণা। চোখ দুটো জলে ভরে গিয়ে ছলছল করতে থাকে। নিবারণকাকার উপর রাগ করা যায় না। ঠিকই বলেছেন, যে মেয়ের কানে সোনার গিল্টি করা এক জোড়া পিতলের কানপাশা দোলে, আর হাতে কাচের চুড়ি, যার স্বামী জমিদারের সেরেস্তায় খাতা লিখে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে আর শুধু ডালভাত খেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে, সে মেয়ে কোন্ মুখে সৎ-বোনের বিয়ে দেবে বলে বৃথা মুরোদের কথা বলে ?

এই ক' মাসের মধ্যে বার বার অনেকবার বড় ভয়ানক রকমের গম্ভীর হয়েছে, এবং বরুণার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলাও বন্ধ করেছে সোমেশ।

বরুণার আনমনা মুখটাও মাঝে মাঝে বড় করুণ হয়ে যায়। ঠিকই তো, বেচারা সোমেশকেও বড় অশান্তির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে বরুণা। বরুণার একটা নতুন শাড়ির দাবি মেটাতে গিয়ে যে-মানুষ বার বার হিসেব করেছে, টাকার অভাব সহ্য করতে গিয়ে বিরক্ত হয়েছে, যে মানুষকে আজকাল মাঝে মাঝে একই সঙ্গে দুটো নতুন শাড়ি কেনবার কথা ভাবতে হয়। অঞ্জনার জন্যও যে একটা নতুন শাড়ি চাই।

অঞ্জনা যখন ঘরের বাইরে এদিক-ওদিক থাকে, তখন বরুণাকে দু' কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না সোমেশ। —একজনের দাবি মেটাতেই হিমসিম খাই, কোথা থেকে আবার আর-এক জনের দাবি এসে জুটলো। তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকেই জব্দ করলে বরুণা।

আরও উদাসভাবে কিছুক্ষণ সোমেশের সেই বিরক্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে বরুণা। আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে। —আমিই বা কি কম জব্দ হয়েছি ?

সোমেশ চেঁচিয়ে ওঠে— তুমি ছাই জব্দ হয়েছ। লজ্জা থাকলে তবে তো জব্দ হবে ?

চুপ করে বরুণা। সোমেশকে আর বিরক্ত করতে চায় না। তাই বলতে পারে না বরুণা, আমারই সব অহংকার যে জব্দ হয়ে গেল। নিবারণকাকার কাছে বড় গলা করে যে-কথা বলে এলাম, সেখা যে আমারই আশা আর প্রতিজ্ঞার কথা। অঞ্জনার বিয়ে দেবার মুরোদ হলো না, সে তো আমারই পরাজয়ের কথা।

কিন্তু অঞ্জনা যখন ঘরের দিকে এগিয়ে আসে, তখন সোমেশও সাবধান হয়ে যায়। এই দুঃসহ সমস্যার কথা ছেড়ে দিয়ে অন্য সমস্যার কথা নিয়ে বকবক করতে থাকে সোমেশ।

ছোট সজনে গাছটাকে এমন করে মুড়িয়ে দিয়ে গেল কাদের গরু ?···অঞ্জনা এত দেরি করে স্নান করে কেন ?···তুমি কি আর চা খাবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ ?

হেসে ফেলে বরুণা। চলে যায় সোমেশ। আর, অঞ্জনা বারান্দার উপরে ঘুর ঘুর করে দাঁড়ের টিয়া পাখিটার সঙ্গে আবোল-তাবোল ঠাট্টার কথা বলতে থাকে, ঠাট্টার হাসি হাসতে থাকে।

এবং বরুণার প্রাণটাও যেন হঠাৎ একটা দুরন্ত স্বপ্নের আবেশে বিভোর হয়ে উঠতে থাকে। জ্বল জ্বল করতে থাকে বরুণার চোখ দুটো।

অঞ্জনা ডাক দেয়—তুমি এবার খেয়ে নাও দিদি। আর কত দেরি করবে ?

বরুণা বলে— আমি খাব না রে অঞ্জু।

—তার মানে !

—আমি দিনে দু'বার ভাত-ডাল গিলতে পারবো না।

—কেন ?

—শরীরে সহ্য হয় না। আমি একবেলা যা পারি দুটো খেয়ে নেব।

কোথা থেকে ছুটে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় সোমেশ। আর, রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে। —আবার পঙ্গু হবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি ? মনে রেখ, আবার যদি অসুখে পড়, তবে···।

বরুণা হাসে— তবে কি ? চিকিৎসা হবে না এই তো ?

কোন উত্তর না দিয়ে, কটমট করে বরুণার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চলে যায় সোমেশ।

৪

সাতদিন ধরে একটানা জ্বরে ভুগে নিয়ে যেদিন দেয়াল ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে বরুণা, সেদিন বরুণার মুখের দিকে আবার কটমট করে তাকিয়ে বরুণার হাত ধরে সোমেশ। হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বিছানার উপর শুইয়ে দেয়। —সাবধান, তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। তোমার আদুরে বোনটি আছে কি করতে ? আরও কিছু দিন রান্নবান্না করলে তোমার বোনের রূপ কালো হয়ে যাবে না।

বিছানার উপর বসে বরুণা বলে— কিন্তু আমি ভাবছি···।

—কি ?

—মেয়েটা কি দিদির বাড়িতে এসেও দাসীর মতো শুধু খাটবে ?

—তার মানে ?

—অঞ্জনার একটা গতি হওয়া চাই তো।

—কি গতি ?

—অঞ্জনার কি বিয়ে হবে না ?

—কেমন করে হবে ? কে বিয়ে করবে ? ক' লাখ টাকা তোমার আছে যে বোনের বিয়ে দেবে ? বলতে বলতে উগ্র হয়ে উঠতে থাকে সোমেশের চোখ দুটো।

—কোন উপায় কি নেই ? বরুণার মুখটা যেন ভয়ানক একটা জেদের স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে সোমেশ। —হ্যাঁ, একটা উপায় আছে।

—কি ?

—আমাদের দেশ-গাঁয়ে আগে যে নিয়মটা ছিল।

—কি ?

—এবকম হতভাগা মেয়েকে কাশীতে নিয়ে গিযে বিশ্বনাথেব কাছে উৎসর্গ কবে ছেড়ে দিযে আসা হতো।

—তাবপব ?

—তাবপব আব কি ? সে মেয়ে যা হতো তা বিশ্বনাথই জানেন।

হঠাৎ সোমেশেব উগ্র চোখেব দৃষ্টিটা লজ্জিত হযে ওঠে। বরুণাব দু'চোখ থেকে ঝবঝব কবে জল ঝবে পডছে। চোখ মুছে নিযে বরুণা বলে ছি ছি, তুমি এমন ভযানক কথাও বলতে পাব ' শত হোক, আমাবই তো বোন, তোমাবই স্ত্রীব বোন, তাব ওপব তোমাব কোন মাযা নেই ?

সোমেশ কুণ্ঠিতভাবে বলে— অনেক দুঃখে বলছি বরুণা। সত্যিই কি আমি চাই যে, অঞ্জনাব এবকম একটা ভযানক দশা হযে যাক। ও বেচাবা কি দোষ কবেছে বল ? ওর ভাগ্যেব দোষ।

চুপ কবে সোমেশেব মুখেব দিকে তাকিযে থাকে বরুণা। সোমেশ যেন অনুতপ্ত হয়ে নিজেব মনেব আবেগে বলতে থাকে - এখানে থেকেও কত কষ্ট পাচ্ছে অঞ্জনা, তবু তো বেচাবা সব সময হাসে। নিজেই বলে, বেশ তো আছি, চিবকাল এখানেই থাকবো।

সেবেস্তায যেতে হবে। সময হযে এসেছে। আলনা থেকে কামিজটাকে তুলে নিযে গায়ে দিতে থাকে সোমেশ। আব, তেমনই মুখব হযে, যেন মনেব একটা বদ্ধ বেদনাব কাহিনীকে একেবাবে অবাধ কবে দিয়ে বলতে থাকে। —আমিও তো তাই বলি। বেচাবাব যখন কোন গতি হবেই না, কোন উপাযই নেই, তখন এই বাডিব কষ্টেব মধ্যেই কষ্ট হোক, তবু এখানে ওকে মাযা কববাব মতো মানুষ তো আছে, এ তো আব নিবাবণকাকাব বাডিব মতো একটা নিষ্ঠুব বাডি নয।

বান্নাঘবেব ভিতব থেকে হঠাৎ বেব হযে এসে এই ঘবের ভিতবে ঢোকে আব হাসতে থাকে অঞ্জনা। অঞ্জনার হাতে হলুদের দাগ, শাড়ির আঁচলটা ভেজা।

বরুণা— শাড়িটা ভেজালি কেন অঞ্জু ?

অঞ্জনা— ইচ্ছে কবে কি ভিজিযেছি ? বাসন মাজতে গিয়ে টবেব জলেব উপব আঁচলটা পড়ে গেল তাই ।

বরুণাব মুখেব অদ্ভুত হাসিব আভা ঝিকঝিক কবে। —কি বান্না কবছিস অঞ্জু ?

অঞ্জনা— আলুব দম, পেঁযাজ দিযে মুসুবিব ডাল, আব ।

বরুণা— খুব হলুদ বেটেছিস বুঝি ?

অঞ্জনা— হলুদ নয, জাফবান গুলেছি।

বরুণা— জাফরান কেন ?

সোমেশের দিকে ছোট একটা ভ্রূকুটি তুলে খিল খিল করে হেসে ওঠে অঞ্জনা —এই ভদ্রলোক হলুদ পছন্দ করেন না, জাফবানে খুব রুচি। যাই হোক, আপনি এখনই সেরেস্তায় যাবেন না, একটু পরে যাবেন।

সোমেশ— কেন ?

অঞ্জনা— এখনো রান্না শেষ হয়নি।

সোমেশ— আমি এক ঘন্টার মধ্যেই ফিবে আসছি।

৫

সন্ধ্যা হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে আর উদাসভাবে তাকায় না বরুণা। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে যাবার শক্তি নেই। জ্বর আর হয়নি, কিন্তু কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরটা যেন একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবার জন্য সমস্তক্ষণ থরথর করে কাঁপে ; আর বুকের ভিতর একটা বেদনার ভারে নিঃশ্বাসটা ভারি হয়ে যায়।

কিন্তু বরুণার চোখ দুটো যেন সফল স্বপ্নের আনন্দে ঝিকঝিক করে হাসে। যেন, এই রকমই একটা অনড় হয়ে যাওয়া জীবন কামনা করেছিল বরুণা। বেশ চেষ্টা আর চিন্তা করে, অনেক হিসেব করে আর রোজ একবেলার উপোস সেধে এতদিনে একটা আশার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গিয়েছে বরুণা।

বিছানার কাছেই একটা কাঠের বাক্সের উপর একটা ওষুধের শিশি রয়েছে। শিশির ভিতরে টলটল করছে তরল ওষুধ, যেমন গাঢ় তেমনই কালো। এই ওষুধটা বরুণার কোমরে মালিশ করতে হয়। ক'দিন ধরে নিজের হাতে আর মালিশ করতে পারে না বরুণা। সোমেশই মালিশ করে দেয়। মালিশের পর, সাবান আর গরম জল দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, সাবধান, ভয়ানক বিষাক্ত এই ওষুধ।

সাহুজীর বাড়িতে রামলীলার গান শোনবার জন্য নিমন্ত্রণ হয়েছে। গান শুনতে চলে গিয়েছে সোমেশ আর অঞ্জনা। দু' জনের কেউ রামলীলার গান শোনবার জন্য একটুও উৎসাহিত হয়নি। কিন্তু বরুণাই বার বার বলে, অনেক সাধাসাধি করে শেষ পর্যন্ত দুজনকে রামলীলার গান শোনবার জন্য সাহুজীর বাড়িতে পাঠিয়ে ছেড়েছে।

দু' হাতে চোখ চেপে ধরে একবার ফুঁপিযে ওঠে বরুণা। যেন নতুন মা'র সেই করুণ কান্নার স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার অঞ্জনার কি উপায় হবে ?

বালিশের গায়ে চোখ ঘষে ঘষে মনে মনে বিড়বিড় করে বরুণা— নিশ্চয়ই উপায় হবে নতুন মা। আমি থাকতে কেন উপায় হবে না ?

নিবারণকাকা ঠাট্টা করছেন, বোনের বিয়ে দেবে বলে যে খুব বড় গলা করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেমাক দেখিয়েছিলে, কই, কোথায় তোমার বোন ? বিয়ে দিতে পেরেছ কি ?

বরুণার বুকের ভিতরটা যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে। বেশ তো আর কিছুদিন পরে একবার যেন এই ঘরের ভিতরে ঢুকে ঠাট্টা করতে আসেন নিবারণকাকা। তাহলে···কল্পনা করতে পারে বরুণা, তাহলে কি ভয়ানক জব্দ হয়ে চলে যাবেন নিবারণকাকা। অঞ্জনার সিঁথির দিকে তাকিয়ে লাল টুকটুকে সিঁদুরের চিহ্ন দেখতে পেয়েই চমকে উঠবেন, আর বোকা বনে গিয়ে সরে পড়বেন। হাড়ে হাড়ে বুঝবেন, বোনের বিয়ে দেবার মুরোদ ছিল কি না বরুণার।

টিম টিম করে জ্বলছে ছোট একটা বাতি। বাতিটাতে অনেক তেল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে অঞ্জনা। যেন তেল ফুরিয়ে বাতিটা নিভে না যায়। দিদির তো শরীরে আর সাধ্যি নেই যে, উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ঢালতে পারবে।

—না না না, আর দেরি করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। চুপ করে পড়ে থাকলে আরও দেরি হয়ে যাবে। বিড়বিড় করে বরুণার শুকনো সাদা রক্তহীন ঠোঁট।

বালিশের পাশ থেকে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিল হাতে তুলে নেয় বরুণা। আস্তে আস্তে, যেন সফল প্রতিজ্ঞার উল্লাসে চোখ দুটোকে হাসিয়ে নিয়ে কথাগুলিকে লিখে ফেলে বরুণা। —তুমি রাগ করো না। অঞ্জনাকে বিশ্বনাথেরই কাছে রেখে গেলাম।

কাগজটাকে ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে দিয়েই ওষুধের শিশিটার দিকে অপলক হয়ে তৃষ্ণার্তের মতো তাকিয়ে থাকে বরুণা। কী সুন্দর দেখতে এক শিশি গাঢ় কালো ও টলটলে

তরল মরণ।

শিশিটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় বরুণা

পরশুরামের কুঠার

চারদিকের কোলিয়ারিগুলির সুদিন পড়েছে। বাজার বস্তি বাড়ছে। নিত্য নতুন কুলী কারিগর কেরানী ও দোকানীর ভিড়ে নয়াবাদ যেন গেঁজে উঠেছে। নয়াবাদকে তাই আর শুধু বাজার বলা যায় না। শুধু একটা থানা দিয়ে আর সামলে রাখা সম্ভব নয়। একজন সাবডিভিসনাল অফিসারকে আদালত নিয়ে বসতে হলো নয়াবাদে। সেই থেকে নয়াবাদ মহকুমা।

কিছু ভদ্রলোকের আমদানি হলো। প্রথম যাঁরা এলেন তাঁরা শুধু কয়েকজন উকীল, দুজন ডাক্তার আর একজন ওভারসিয়ার। প্রাইমারী বাংলা স্কুল হলো একটা। মিউনিসিপ্যালিটিও চালু হলো।

তার অনেক আগেই নয়াবাদের লালমাটির ডাঙ্গা ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে ক্যাথলিক মিশনের সুন্দর একটা গির্জা। দেশী খৃষ্টান মেয়েদের কনভেন্ট, একটা অনাথালয় আর একটা জেনানা হাসপাতাল। ঝাউবনের ফাঁকে সাদা নতুন ইমারতগুলি উঁকি দিয়ে ছবির মতো স্থির হয়ে থাকে।

তারপর শুরু হলো নয়াবাদের একটানা অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন। রাতের রেলগাড়ীর মতো নয়াবাদকে টেনে নিয়ে গেলে বছরের পথ ধরে, হু হু করে, পরিণামান্তরে। কিন্তু সবচেয়ে বদলে গেল যে, নামধাম চেহারা পর্যন্ত— তার নাম ধনিয়া।

বাঙালীটোলা থেকে সামান্য একটু দূরে দুর্গাবাড়ির পেছনে এক আমড়াতলায় ধনিয়ার ছোট একটা মেটে ঘর। খাপরার ছাউনি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘরের সুমুখে একটা ছাগল বাঁধা থাকে। বাংলা স্কুলের ছেলেরা তাই নাম দিয়েছে— ছাগল লজ।

তিলকের মা ধনিয়া। তিলককে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। তিলকের বাবা কে, তাও কেউ জানে না। কিন্তু দু' তিন বছর পর পর নিয়মিতক্রমে তিলকের অনুজ ও অনুজারা ভূমিষ্ঠ হয়। শোণিতস্নাত এক একটি আনন্দের কণিকা যেন চুপে চুপে সকলের অলক্ষে মায়ের হাত ধরে জীবনের পথে দেখা দেয়। তারপরেই হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে মেলার ভীড়ে হারিয়ে যায়। আর তাদের কেউ দেখতে পায় না।

থাকে থাকে, ধনিয়া একদিন উধাও হয়ে যায়। মাস দুয়েক তার আর দেখা পাওয়া যায় না। তখন তাকে পাওয়া যাবে মিশন জেনানা হাসপাতালের একটা ফ্রী বেডে। ক্ষুদ্র বিবর্ণ একটি মানুষের শাবক কুঁকড়ে পড়ে আছে ধনিয়ার বুকের কাছে। ক'টা দিন যেন উষ্ণ নরম ডানার তলায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। শ্লথ শরীরটা একটু ভরাট হয়ে আসে, চামড়ার ভাঁজ আর রেখাগুলি ধীরে মিলিয়ে যায়। মিটমিট করে তাকায়— হাত পা ছোঁড়ে। একটু স্পর্শ পেলেই চারাগাছের পাতার মতো লোলুপ ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে।

তারপর আর নয়। পাখি উড়ে যায়। ধনিয়া একা ফিরে আসে তার ছাগল লজে। তিলকের ভাইটিও যথানিয়মে মিশন অনাথালয়ে চালান হয়।

ধনিয়া অদ্ভুত মানুষ। হাসপাতালের নার্সেরা আশ্চর্য না হয়ে পারে না। লেডি ডাক্তারও হতবুদ্ধি হয়ে বলেন, "জীসস্! আমি সত্যি ঘাবড়ে গেছি। এই মেয়েটা আমার বাইবেল ও বিজ্ঞান উল্টে দিয়েছে। জানতাম পাখির বাচ্চাই বড় হয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই প্রথম

দেখলাম পাখিই পালিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে দিয়ে।"

ভদ্রলোকের পাড়া ঘেঁষে থাকে ধনিয়া। আত্মীয় বলে ওর কেউ নেই। ওর সমাজ নেই। কিন্তু এ শুধু সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধের পর আর সে নিয়ম চলে না।

প্রতিরাত্রে সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যায়, শুধু কানাকানির ওপর দিয়ে আমড়াতলায় এক অদ্ভুত পৃথিবীর লীলাখেলা চলেছে। আবছা আলো, চাপা হাসি। শব্দ এখানে শুধু ফিসফিস, গান এখানে শুধু গুঞ্জন। সবই অস্পষ্ট। এখানে কাউকে আসতে দেখা যায় না, কেউ কখনও চলেও যায় না। রাউণ্ডের পুলিশ ছাড়া সেসব অদৃশ্য ছায়া-জীবনের পরিচয় আর কেউ জানে না। কিন্তু তা নিয়ে শোরগোল হয় না কখনও। রাত্রে যতবার ধনিয়ার দরজা খোলে, রাউন্ডের পুলিশেরও ততবার আয়ের পথ খুলে যায়।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ভদ্রসমাজে ধনিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা হয় কেন? ধনিয়ার কথা ভুলতে পাবে না অনেকেই।

বাংলা স্কুলের ছুটি হলে বাড়ি ফেরার পথে ছেলেদের মনে পড়ে ধনিয়াকে। ছাগল লজের আমড়া গাছ। ধনিয়ার ধমক খেয়ে, ঢিল মেরে দু-একটা পাকা আমড়া না চিবিয়ে আসলে ওদের সমস্ত জাগ্রত দিনের পরিতৃপ্তি যেন অপূর্ণ থাকে।

সন্ধেয় ক্লাবঘরে উকীল ও ডাক্তারবাবুদের মধ্যে ধনিয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। তাঁরা বলেন— মেয়েটার কেউ নেই, অথচ চলে যায় বেশ। Something wrong!

রাত্রি দশটার পর রাউন্ডের কনষ্টেবলেরা পোষ্টে যাবার আগে এক টিপ খৈনি মুখে দিতেই ওদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সমস্তরাত্রি টহলের একঘেয়েমি। তারই মাঝে আমড়াতলার সামনে মিষ্টি অন্ধকারে কিছুক্ষণ থমকে থাকা। ধনিয়ার ঘরের দরজার ফাঁকে প্রদীপের একটু ক্ষীণাভা— প্রাপ্তি ও পুরস্কারের দিব্যজ্যোতি। চাঁদনী রাতের আকাশের দিকেও ওরা এত আগ্রহ করে মুখ তুলে কখনও তাকায় না।

এখানেই শেষ নয়। ধনিয়ার ব্যক্তিত্বের ছায়া আরও অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে— বাঙালী ভদ্রঘরের শুদ্ধান্তঃপুরে পর্যন্ত। এটা অবশ্য নিছক প্রয়োজনের তাড়নায়। ঘটনা এমনি দাঁড়ালো যে সন্তানবতী বধূসমাজও এহেন ধনিয়ার সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে আর পারলো না। তাদের মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাটুকু নইলে বুঝি মাঠে মারা যায়।

ভদ্রবাড়ির প্রসূতিদের একটা না একটা আধি ব্যাধি লেগেই আছে। কেউ সূতিকায় জর্জর, কেউ রক্তহীনতায় সিঁটিয়ে যায়, কারও বা বুকের অপত্যনির্ঝর অকালে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মিশন হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মোটা ফী নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসূতিদের পরীক্ষা করে অভিমত দিলেন। —প্রসূতিদের চিকিৎসা চলতে পারে কিন্তু শিশুদের জন্য কোন ট্রিটমেন্টই সফল হবে না। ওদের দরকার ভাইটালিটি, ওষুধ নয়।

'—তবে উপায়?'

'—উপায় একজন সুস্থ সবল আয়া, শিশুদের বুকের দুধ খাওযাবার জন্য।'

ঘরে ঘরে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এই বংশরক্ষার সঙ্কটে গরজের বালাই ডেকে আনলো ধনিয়াকে। আমড়াতলা থেকে একেবারে ভদ্রবাড়ির আঁতুর ও অন্তঃপুরে।

ধনিয়ার ডাক পড়ে বাড়ি বাড়ি। বুকের দুধ খাইয়ে যাবার ঠিকে! দু' বেলার রেট মাসিক ছ' টাকা, দৈনিক একপো চালের সিধে আর ঠিকে শেষ হলে বিদায় নেবার দিন একটা নতুন শাড়ি। এই বরাদ্দে ধনিয়া বাড়ি বাড়ি খেটে যায়।

প্রত্যহ সকাল বা সন্ধের আগে ধনিয়া ঠিকে খাটতে বার হয়। হাতে একটা ভাঁজ করা

পরিষ্কার তোয়ালে। সব সময় মুখ হাসি হাসি। সুগন্ধি নেবু তেলে চুবিয়ে চুল বাঁধা। লাল সায়ার ওপর একটা পাতলা ধোলাই শাড়ি। চলবার সময় পায়ের আঙুলে রূপোর চুটকিগুলো খই ফোটার শব্দের মতো বাজতে থাকে। নাকে একটা সোনার চিড়িতনের নাকছাবি— ঠোঁটের মিটিমিটি হাসির সঙ্গে মানিয়ে যায় বেশ। প্রসাধন তেমন কিছু নয়, পরিচ্ছন্নতাই বেশি। কিন্তু সুশ্রী চেহারা, হঠাৎ দেখে মনে হয়— বড় বেশি ঠাট।

ঘোষাল বাবুদের বাড়ির অন্দরে ধনিয়া ঢুকলো। এখানে একবেলা ঠিকে খাটতে হয়। মাত্র তিন মাসের একটা ছেলে।

ধনিয়াকে দেখেই ঝি প্রথমে মুখ কুঁচকে ঘরের ভেতর চলে গেল। একটা মোড়ার ওপর বসে আছেন জীর্ণ শীর্ণ ঘোষালবাবুর স্ত্রী। সামনে একটা দোলনায় ঘুমন্ত নতুন খোকাটা।

ঝি গিয়ে জানালো— ঐ এসেছেন ! কী ঠাট রে বাবা ! গা ঘিন ঘিন করে।

ঘোষালবাবুর স্ত্রী বিরূপা ঝিকে শান্ত করলেন। —যাক্, মুখের ওপর কিছু বলিস্ নি ঝি ! দায়ে পড়েছি, কাজ নিতে হবে। ভেতবে যে যেমন লোক হোক্ না, আমাদের কি ?

ধনিয়া এগিযে এসে দোলনা থেকে শিশুটিকে কোলে তুলে বসে। দু-একটা অবান্তর প্রশ্ন করে— 'আজ কেমন আছ দিদি ?' উত্তবেব কার্পণ্য দেখে আর বেশি কিছু বলে না। কাজ শেষ হবার পর একটুখানি দাঁড়ায়। গামছায সিধে বেঁধে নিয়ে চলে যায়।

বিকেলে নরেনবাবুর বাড়ি মেয়েদের একটা জটলা বসে। হাজির হয় ধনিয়া। একটা ধাড়ি ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হয়। তিন বছর বয়সের রোগাপটকা ছেলে, পেটে এখনও গরুর দুধ হজম হয় না। বুড়োটে চেহারা আর উগ্র স্বভাব নিয়ে বাড়িময় লোককে জ্বালাতন করে। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কাঁদে আর মাটিতে গড়ায়। কোন প্রবোধ সান্ত্বনা মানে না।

বারান্দায় উঠে ধনিয়া হাততালি দিল। —আও মেবা লাল।

চীৎকাররত ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো ভূতলশয্যা থেকে একবার ফণা তুলে তাকালো, তারপর এক দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ধনিয়ার কোলে। খানিকক্ষণ ধনিয়ার হাতের বাজু নিযে টানাটানি উপদ্রব করলো। তারপর চুপ করে ধীর স্থির হয়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়লো ধনিয়ার কোলে।

কিছুক্ষণ পরে ধনিয়া ডাকলো— ছেলে ঘুমিযে পড়েছে। কোথায় শোয়াই ?

অকস্মাৎ ঘরের ভেতর মেয়েদের মধ্যে যেন একটা বড় রকমের রসিকতার ঝড়ের দোলায় সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলো। জব্দ করার জন্য সকলে মিলে চেপে ধরলো নরেনবাবুর স্ত্রীকে। —কই, উত্তর দাও শীগ্‌গির। ছেলের নতুন মা কি বলছেন।

লজ্জায় ও বিরক্তিতে অপ্রস্তুত নরেনবাবুর স্ত্রী ছটফটিযে উঠলেন। —আমি ওব সঙ্গে কথা-টথা বলতে পারবো না বাবা। পুঁটি তুই গিয়ে খোকাকে নিয়ে আয়।

অগত্যা ওভারসিয়ারবাবুর মেয়ে পুঁটি, আট বছরের বয়সের একটা বোকা বোকা খুকী, সেই এগিয়ে গেল।

ধনিয়া সিধের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণ সকলেই উকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকে। এতখানি পথ হেঁটে এসেছে মেয়েটা, তবু পা দুটো পরিষ্কার। ধুলো ময়লা যেন পিছলে ঝরে গেছে।

কেউ বা বেফাঁস বলে ফেলেন। —মাগীর হাত দুটো কী নিটোল। তাগাটা মাংসের মধ্যে দেগে বসে গেছে।

খিড়কির দোর দিয়ে ধনিয়া অদৃশ্য হতেই পেছনের কৌতূহলী দৃষ্টিগুলি যেন শান্ত হলো। মাস্টারের বউ নাকিয়ে নাকিয়ে দু-তিন বার শিউরে উঠলেন। —আমি আর লাল সায়া পরছি না বাবা। এ জন্মে নয়। আজ থেকে ইতি।

দুপুরে দেখা যেত, ঘরের বাইরে একটা মোড়ার ওপর বসে ধনিয়া তামাক টানে। অদূরে ঘাসের ওপর চলন্ত ছাগলটার সঙ্গে স্নেহাপ্লুতস্বরে ডাকাডাকি, উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা চলতে থাকে।

কিন্তু ক'দিন থেকে ধনিয়াকে আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমড়াতলার মেটে ঘরের দরজায় কুলুপ লাগানো। ধনিয়ার ছাগলটা বাঁধা রয়েছে নালার ধারে আর একটা কুঁড়ের সামনে— বুড়ো প্রসাদী ডোমের ঘর।

আশি বছরের মতো বয়স হয়েছে প্রসাদীর। আঠার বছর বয়সে কালাপানি হয়েছিল একবার ডাকাতির দায়ে। তারপর ছাড়া পেয়ে আরও পাঁচবার জেল খেটেছে চুরির জন্য। মোট বেয়াল্লিশ বছর জেলের ভাত খেয়েই জীবন কেটেছে তার। বাইরে এসে রোজগার করে ভাত খাবার রীতিনীতিই সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে একেবারে বসিয়ে দিল তাকে। ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে কোমরটা ভেঙে গেল, আর সোজা হলো না।

তার ওপর এল শরীর ছাপিয়ে বয়সের জরা। প্রসাদী শুধু টিকে রইলো মরবার জন্য। এখন ওকে দেখলে মনে হয় মূর্তিমান একটা ক্ষুধা যেন হাঁ করে রয়েছে। ছাগলটা ছাড়া প্রসাদীই হলো ধনিয়ার একমাত্র পোষ্য। দিনের রান্না শেষ করে ধনিয়া রোজ একথালা ভাত পৌঁছে দিয়ে আসে প্রসাদীকে। এই জন্যই বোধহয় ওর মরতে যা কিছু দেরী হচ্ছে।

প্রসাদীর ঘরের সামনে ধনিয়ার ছাগল।

এদিকে জেনানা হাসপাতালে সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে। ধনিয়ার বেড ঘিরে নার্সদের ভিড়। সকলের মুখে একই অনুনয়। —অন্ততঃ এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে রাখ ধনিয়া।

—না মিস্ বহিন, পারবো না।

লেডি ডাক্তার বলেন—তোমার বদনামের কথা কে না জানে? চাপা দিতে তো পারবে না। তবে নিজের বাচ্চাকে নিজের কাছে রাখ না কেন?

—না ডাক্তারনীজি, আমি খাওয়াতে-পরাতে পারবো না। ছেলে কষ্ট পাবে আর বড় হয়ে আমার দুশমন হবে। ছেলেকে মানুষ করার মতো পয়সা আমার নেই।

—কী বলছিস পাগলের মতো। ভিখিরি মেয়েগুলোও ছেলে ছেড়ে দেয় না। ওদের বুঝি পয়সা খুব বেশি!

—ওরা ছেলেকে মানুষ করে না বহিন, ওরা ছেলেকে ভিখিরি করে। আমি তা পারবো না।

—আচ্ছা, আমরা সকলে কিছু কিছু চাঁদা দেব। ছেলে নিয়ে যা সঙ্গে।

—তা হলে আপনারাই কেউ ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে যান না! আমি তো আপনাদের আয়া হয়েই থাকবো।

লেডি ডাক্তার আর নার্সেরা বেশি বিতর্কে মন দেয় না। ধনিয়ার চোখের দিকে তাকাতে ওদেরও কেমন গা ছম্ ছম্ করে। সেবা মমতাকে তারাও ভাড়া খাটায়, কিন্তু ধনিয়ার এই প্রশান্ত নিস্পৃহা— বড় নির্মম ও বিসদৃশ মনে হয়।

—আদাব। আমি চলি এবার।

ধনিয়া উঠে দাঁড়ায়। একজন নার্স ধনিয়ার বেবিকে বেড থেকে ফ্লানেলের টুকরোয় জড়িয়ে কোলে তুলে নেয় —নার্সারীতে চালান করা হবে। ধনিয়ার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কাঁসার থালা আর ঘটিটা একটা তোয়ালেতে বেঁধে, হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

আর একজন নার্স রেজিস্টার নিয়ে আসে। লেডি ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন —বাচ্চাকা বাপকা নাম?

ধনিয়া —তা জানি না।

লেডি ডাক্তার রেগে উঠলেন। —বরাবর তোমার ঐ এক কথা। যার সঙ্গে আজকাল থাক, তারই নাম বল না কেন ?

—অনেকের সঙ্গেই থাকি, তার মধ্যে অনেকের নামও জানি না। কসুর মাপ করবেন ডাক্তারনীজি, যে কোন একটা নাম লিখে নিন।

—তোমার ভবিষ্যৎ খারাপ। খুব খারাপ।

লেডি ডাক্তার রাগ করে উঠে চলে যান।

মেল ট্রেন নয়াবাদ স্টেশন ছেড়ে তখন সিটি বাজিয়ে জোরে স্পীড নিচ্ছে। হাসপাতালের ইমারতটা কাঁপছে দুরদুর করে। লাল কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ধনিয়া নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। কী রকম একটা দুর্বলতায় নার্সদের চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসে।

ফটক পার হতেই দারোয়ান ঘণ্টা দিল। রাত নটা।

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। ধনিয়ার আমড়াতলার জীবনে কোন ছেদ পড়েনি। বছর তিন আগে শুধু শেষবার জেনানা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

নয়াবাদ মিউনিসিপ্যালিটি জাঁকিয়ে উঠেছে। নতুন টাউন বাড়ানো হয়েছে প্ল্যান করে। উকীলবাবু যে গাড়ি কিনলেন তারই নম্বর পড়লো সাতশো একচল্লিশ।

পাঁচ সাত দশ বারো ষোল আঠারো— বছরের পর বছর চলে গেছে। ধনিয়া প্রায় চল্লিশের কোঠায় পা দিল। মাঝে মাঝে সড়কের ধারে খোলা উনুন জ্বেলে বসে— তেলেভাজা বেচে। সন্ধের দিকে ঘরে ফেরার পথে কুলিরা কিছু কিছু কেনে। এক আধ ঝুড়ি ঘুঁটেও তৈরি করে কখনো, সব বিক্রি হয়ে যায়। চেহারায় হয়তো জলুসের অভাব, তার চেয়ে পয়সার অভাব বেশী। আমড়াতলায় ক্বচিৎ কোন রাত্রে লোকের গলার স্বর শোনা যায়। কিন্তু শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে। ধনিয়া তাই ভয় পায় না। সে জানে তাকে ভিক্ষে করতে হবে না।

ভদ্রসমাজে ধনিয়ার আনাগোনা ঘুচে গেছে অনেকদিন। সন্তানবতীদের স্বাস্থ্য হয়েছে ভাল। বুকের দুধ খাওয়াবার ঠিকে নেই। তা ছাড়া সাগর পার থেকে ধনিয়ার বহু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে— হরেক রকমের বিলিতি ফুড। এঁড়েলাগা নবজাতকদের ধুকপুকে আয়ু ভিজিয়ে রাখতে ধনিয়ার আর ডাক পড়ে না। তাকে বোধহয় সকলে ভুলেই গেছে।

বড়দিনের ছুটি। পাটনার স্কুল কলেজগুলি বন্ধ। ছেলেরা ঘরে ফিরেছে। শিকার পিকনিক কার্নিভাল আর প্রদর্শনীর মরসুম। নয়াবাদের ধমনী বিচিত্র উৎসাহ চঞ্চল। সেদিন ধনিয়ার ঘরে উনুনে আগুন পড়লো না। একটিও পয়সা নেই হাতে। অনেকদিন আগের ঘটনাগুলি, নানা রঙে রঙীন একটা মায়াময় আলেখ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

ধনিয়া উঠলো।— বাবুদের বাড়ি বাড়ি একবার দেখা করে আসি। একদিন তো চাকরি করেছি। পররবীর দাবী করা যেতে পারে। যদি খুশি মনে হয়— দশটা টাকাও যদি ওঠে।

নরেনবাবুর বাড়ির অন্দরে ঢুকতে পেল না ধনিয়া। ঘোষালবাবু চার আনা দিলেন। ধনিয়া দেখলো— বাড়িময় ছেলেপিলে। ছেলেগুলো বেশ ঢ্যাঙা হয়ে গিয়েছে।

আর একটা বাড়ি। এতটা নিষেধের কঠোরতা এখানে নেই। কিছু সিধে দিয়ে গিন্নিমা বললেন —যা পাবার পেলে বাছা, এবার ওঠ শীগগির।

ধীরেনবাবুর বাড়ির দেউড়িতে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ঝি এসে একটা টাকা হাতে দিল। —মা দিয়েছেন, এই নিয়ে বিদেয় হও।

ধনিয়া— এ ঝি-দিদি, তোমাদের বড় ছেলে কই ?

ঝি কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বললো— ঐ যে তাস খেলছে। তা, অত

খোঁজে দরকার কি তোমার ?

—উঃ কত বড় হয়ে গেছে। দাঁত ওঠার পরও মাই ছাড়তে পারেনি। একবার কামড়ে দিয়ে আমাকে কী নাকাল করেছিল, মনে আছে তো ঝি ?

—আদিখ্যেতা ভাল লাগে না বাপু। তুমি যাও। এদিকে ঘেঁষতে আর এস না।

আরও অনেক বাড়ি বাকী আছে। কিন্তু একটা খটকা ধনিয়াকে ভাবিয়ে তুললো। এটা তো ঠিক পরবী পাওয়া হচ্ছে না। একেই বোধহয় ভিক্ষে বলে।

সন্ধে হতে দেরি আছে। ধনিয়া তবু জোরে পা চালিয়ে ঘরের দিকে ফিরে গেল।

কিন্তু জের সহজে মিটলো না। ঘরে ঘরে ঝি আর গিন্নিদের আপত্তির কলরব শোনা গেল। —ও রাহু, আবার এতদিন পরে উদয় হলো কোথা থেকে। পাড়াভরা সব আইবুড়ো ছেলে। মাগী যে কখন কার সর্বনাশ করে বসে কে জানে।

কর্তারা শুনলেন। একেবারে বাজে আশঙ্কা নয়। পাড়া ঘেঁষে এসব জীব থাকা উচিত নয়। ওরা থাকলেই যত গুণ্ডা বদমাসের উপদ্রব ডেকে আনে।

ক্লাবের সান্ধ্যবৈঠকেও বিষয়টা আলোচিত হলো। প্রস্তাবটা সকলেই অনুমোদন করলেন। দুর্গাবাড়ির কাছাকাছি আমড়াতলার নোংরামি এবার সরিয়ে দেওয়াই উচিত।

ব্যাণ্ডের শব্দ। ধনিয়া হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখে দাঁড়ালো। মিশন অনাথালয়ের ছেলেরা মার্চ করে বনভোজনের উৎসবে যোগ দিতে চলেছে। নীল ব্লেজারের হাফ-প্যান্ট আর সাদা ফ্লানেলের সার্ট। গায়ে লাল মোজা আর বুট। পাঁচ থেকে ষোল বছর বয়স, অন্নপুষ্ট কিশোর মানুষের একটা পল্টন। শোভাযাত্রার আগে আগে ওদেরই ব্যান্ড পার্টি। এদের পোষাক একটু ভিন্ন ধরনের। মাথায় ভেলভেটের টুপি, তাতে সাদা পাখির পালক আর কচি ঝাউপাতা পিন দিয়ে আঁটা। নধর অধরে ছোট ব্যাগপাইপের রীড। ছোট ছোট ড্রাম স্ট্রাপ দিয়ে বুকের ওপর ঝোলানো।

বড়দিনের প্রভাত সূর্যের আভা সবেমাত্র কুযাসা ঠেলে পথে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে। শোভাযাত্রা এসে মোড়ের কাছে একবার থামলো। ব্যাগপাইপ আব ড্রামগুলি তিনবার শব্দের ঝনৎকার তুলে স্তব্ধ হলো। আশপাশ থেকে পিল পিল করে ছেলে মেয়ে বুড়ো— কৌতূহলী একটা জনতা এসে ওদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ধবধবে সাদা আলখাল্লা আর প্যান্টালুন পরা এক পাদরী সাহেব ডেভিডের একটা গাথা হিন্দীতে সুর করে পড়লেন।

—আমেন !

ছেলেদের গলার স্বর ! বনান্ত বাতাসের শব্দ, ঝর্ণার শব্দ— ভোরবেলার পাখির গলার কাকলির মতো শব্দ। ধনিয়ার যেন একটু চমক লাগলো। এগিয়ে গিয়ে শোভাযাত্রার কাছাকাছি দাঁড়ালো, একটা গাছে ঠেস দিয়ে।

লম্বা দাড়িওয়ালা পাদরীগুলোকে কেমন জংলী জংলী মনে হয়। আর একজন পাদরী বক্তৃতা করলেন, বুকের ওপর ক্রশটা চিক্‌চিক্ করছে। —আজ থেকে উনিশশো চল্লিশ বছর আগে বেথেলহেমের আকাশে এমনি এক সকাল বেলায় লাল সূর্য উঠেছিল। এক দরিদ্র ছুতোর নারীর কোলে মানবপুত্র আবির্ভূত হলেন।

পাদরীর বক্তৃতার মাথামুণ্ড কিছু বোঝা যায় না। ধনিয়া একটু সরে দাঁড়ালো, যাতে ছেলেদের মুখগুলি স্পষ্ট দেখা যায়।

—সেই মানবপুত্র একদিন কাঁটার মুকুট পরে চলেছেন জেরুজালেমের পথে, নিজেকে বলিদানের জন্য, তোমার-আমার পরিত্রাণের জন্য···।

ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি তখন অদৃশ্য চুম্বনের মতো প্রত্যেকটি ছেলের মুখের ওপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এর মধ্যে অন্ততঃ ছ'টি তারই উপহার। কিন্তু কে তারা চেনবার উপায় নেই। ঐ ড্রামবাজিয়ে দশ বছর বয়সের ছেলেটি, সার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে। হয়তো সেই একজন। কিংবা পাশেরটিও হতে পারে। কিন্তু কে নয় ? মনে হচ্ছে সবাই।

বিভোর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। জনতা কখন সরে গেছে। দূরে বনেব মাথায় কুয়াসা গেছে গলে। মাঠের মাঝ দিযে চলেছে শোভাযাত্রা। ধুলো উড়ছে। সকল পার্থিব রজঃ মধুময় হয়ে উঠেছে।

গাছের ঠেস ছেড়ে দিযে অতি অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে ধনিযা ঘবেব দিকে ফিবলো। অগাধ এক ক্লান্তি ও পুলকের বন্যা যেন সমস্ত শরীর ছেযে বয়ে চলে গেছে— প্রিয়সঙ্গসুখের চরম ক্ষণে উৎসারিত সজলাসারেব মতো। বুকেব ওপর আঁচলটা ভাল করে টেনে নামিয়ে দিল ধনিয়া। কাঁচুলি ভিজে গেছে।

মিউনিসিপাল কমিশনাবদের বৈঠক। কোতোয়ালী অফিসাবের কাছে জরুরী নোট পাঠানো হলো। —শহরের নানা ভদ্রপল্লীতে যতগুলি নষ্টচরিত্র ছোট জাতের মেযে প্রচ্ছন্নভাবে কুৎসিত ব্যবসাযে লিপ্ত রযেছে তাদেব যেন সেগ্রিগেট করে বাজারের লাইনে বসিয়ে দেওযা হয।

কড়া সরকাবি নির্দেশ। টাউন থানার পুলিসের ওপর ভার পড়লো। এই ধরনের দুষ্টা মেয়েদের নামের লিষ্টি দাখিল করতে— খাতায় নাম চড়িয়ে সকলকে বাজারের লাইনে বসিয়ে দিতে।

ধনিয়ার আমড়াতলার সংসারেও এ-নির্দেশের আঘাত এসে পৌঁছতে দেরি হলো না। —আর এভাবে চলবে না। হয় সরে পড়, নয় পথে এস— কিংবা সুপথে থাক।

ধনিয়া সাধ্যসাধনার ত্রুটি করলো না। ঘটিবাটি বেচে টাউন পুলিশকে নগদ ত্রিশটা টাকা পান খাবার খরচ দিতে রাজি হলো। তাকে রেহাই দেওয়া হোক্। কনেষ্টবলেরা মানলো না কেউ— এবার আর ফাঁকি নেই। আমাদেবও চাকরির ভয় আছে। নাম তোমাকে লেখাতেই হবে।

হেড কনেষ্টবল ধমক দিলো— ওসব ফন্দি-ফিকির ছাড় এবার। নাও, টিপ সই দাও।

রাত্রি হয়েছে। প্রসাদী দোসাদ হাঁটুতে মুখ গুঁজে আগুনের ধুনীর সামনে বসেছিল। ধুনীর আগুন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কানের কাছে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা। প্রসাদী কানে শুনতে পাচ্ছে না কিছু। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা একটা জ্বলন্ত অঙ্গারে লেগে ঝলসে গেছে। তবু কোন জ্বালা নেই। সকাল থেকে শরীরটা শুধু সির্ সির্ করে কেঁপেছে। এখন সে স্পন্দনও নেই। আজ দুদিন ধরে ধনিয়া আসছে না। পেটে এক দানাও ভাত পড়েনি।

—প্রসাদী চাচা ! ধনিয়া এসে ফুঁপিয়ে কেঁদে পড়লো। প্রসাদী তবু সাড়া দিল না। ধনিয়া বুড়োকে একবার জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে থুতনিটা টেনে ওঠালো। বুড়ো চোখ মেলে তাকাতেই আবার ডাকলো। —প্রসাদী চাচা !

ধনিয়া কাঁদছে। এ কান্নার বেদনা বিদ্যুতের ছোঁয়াচের মতো প্রসাদীকে যেন আঘাত করলো। ধড়ফড়িয়ে উঠলো শরীরটা। —এ কি ? তুই ধনিয়া ?

—হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী !

—ছি ছি, এ কি বলছিস !

—হাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।

—আরে না, তুই তো লছমী।

—না চাচা, আমার স্বামী নেই।

—কোন গাইয়ের স্বামী নেই, তারা কি লছমী নয় ?

—তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই।

ধনিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো— এবার চলি চাচা, আর দেখা হবে কি না জানি না।

অপোগণ্ড ছেলের মতো প্রসাদী একবার তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো— ধনিয়ার হাতে সেই পরিচিত গামছাবাঁধা ভাতের থালাটা নেই, তার নিত্যদিনের প্রাণের পসরা। প্রসাদী হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। মূক অভিমানে যেন হাঁটুর ভেতর আবার মাথাটা গুঁজে দিল। আর একবার নতুন করে কানের কাছে বেজে উঠলো কূলহারা কালাপানির উতরোল।

দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। আনমনে মাথার কাপড়টা ফেলে দিয়ে চুলগুলি গুছিয়ে শক্ত করে একটা খোঁপা এঁটে দিল। আঁচল দিয়ে তেলা মুখটা মুছে নিল একবার। তারপর চিরকেলে সেই মিটিমিটি হাসি আবার সারা মুখে চিক চিক করে উঠলো।

—তুমি রাগ করেছ চাচা ! ধনিয়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অসহায় অসাড় প্রসাদীর জরাজর্জর শরীরটাকে বেড়ালের ছানার মতো কোলের ওপর তুলে নিল। কাঁচুলি খসিয়ে প্রসাদীর মাথাটা চেপে ধরলো বুকের কাছে। আঙুল দিয়ে বুড়োর মাথার পাকা চুলের জটগুলি ছাড়িয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।

এক ঘণ্টা পর। পরিতৃপ্তির আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রসাদী। ক্লান্ত সিক্ত চোয়াল দুটো এলিয়ে পড়েছে। প্রসাদীকে ধুনীর কাছে মাটিতে শুইয়ে দিল ধনিয়া।

চকবাজারের দক্ষিণে একটা চওড়া গলি, দুদিকে দোতলা বাড়ির সারি। গলির ঠিক মাঝামাঝি পথের দুদিকে মুখোমুখি একটা দেশী আর একটা বিলাতী মদের দোকান। নীচের তলার সব ঘরগুলিই দোকান—পানবিড়ি, সরবত, আতর, চাট আর চামেলী তেল। একটা দোকানে ভাঙা তবলা পাখোয়াজ মেরামত হয়। পথের মাঝে একটা গাছতলায় শানবাঁধানো চাতালের ওপর হিজ্‌রেরা হাততালি দিয়ে নাচে। ওপরতলার জানালাগুলি সন্ধের পর থেকেই এক এক টুকরো বায়স্কোপের পর্দার মতো আলোয় ঝলমল করে। রূপের বেসাতিনীদের লাইন।

নতুন বছরে দোতলার লাইনে একটা নতুন ঘরের জানালা খুলে গেল।

চল্লিশ বছরের আগুনে শুদ্ধ করা জীবন যৌবন, তার সব খাদ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ধনিয়া মনের মতো করে সাজলো।

ঘরের ভেতর ঝাড়ের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে, চূড়া করে খোঁপা বাঁধলো। একটা সোনালী চুম্‌কিদার রুমাল জড়িয়ে দিল তার ওপর। ঝুটা মোতির মালা দিল গলায়। একটা পাতলা নীল রেশমী শাড়ীকে সায়া ছাড়াই কোমরে এক পাক জড়িয়ে নিল। মুঠো মুঠো পাউডার ছিটিয়ে দিল গায়ে। কড়া জরদা দিয়ে একগাল পান চিবিয়ে ঠোঁট মুখ রক্তাক্ত করে নিল। এক পেয়ালা নির্জলা দেশী মদ ঢক ঢক করে খেয়ে গরম করে নিল গলাটা। সবুজ মখমলের কাঁচুলি বাঁধলো আঁটসাট করে। হাফগরাদ জানালাটার ওপর কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো ধনিয়া।

ময়রার দোকান থেকে ধোঁয়া আর ভাজা পাঁপরের গন্ধে শীত-রাত্রির বাতাস ভারি হয়ে গেছে। নীচের সড়কে গ্যাস-পোস্টের কাছে ক্ষুদ্র একটা জনতা, হাঁ করে জানালার দিকে তাকিয়ে।

হোর রাত্রি, হোক নেশা আর গ্যাস-লাইটের পোড়া জ্যোৎস্না। ওদের ঠিক চিনতে পারা

যায়। বুঝা চেহারা ঘোষালবাবুর বড় ছেলেটা ঘনঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। চোখে চোরা চাউনি খাজাঞ্চীবাবুর ছেলেটা রুমাল নেড়ে কিছু একটা ইসারা করার চেষ্টা করছে। টলতে টলতে একটা মাতালও এসে দাঁড়ালো ওদের মধ্যে। হাতের মুঠো দুটো একটা চোখের ওপর দূরবীণের মতো লাগিয়ে কিছুক্ষণ তাক্ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মাতালটা।

এক ঢোক পানের পিক গিলে নিল ধনিয়া। কান দুটো তেতে ঘেমে উঠেছে। আঁচলটা গা থেকে পেছনে ঠেলে নামিয়ে দিল। দু' হাত তুলে মাথার ওপর জানালার খিলানটা ধরে বুকটা সামনের গরাদের ফাঁকে জোরে চেপে ধরলো ধনিয়া।

জনতার চোখে ধাঁধা। অসংবৃতা এক রঙীন মরীচিকার মূর্তি জ্বলছে জানালার ওপর। নীচে পাতলা রেশমী শাড়ীর আড়ালে আঁকা দুটি সুপুষ্ট জঙ্ঘার ছায়াময় লোভানি। ওপরে একজোড়া দুরন্ত সবুজ গ্রহ, কাঁচুলির বন্ধনে চিরকালের মতো গতিহারা।

সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে এক বিদ্‌ঘুটে আনন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো ধনিয়া। তবু প্রতীক্ষায় শান্ত হয়ে থাকে। সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝরাত্রি পর্যন্ত, শেষরাত্রি পর্যন্ত— যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।

মানবিকা

আর এখানে বেশিক্ষণ নয়। শুধু আর মাত্র তিনটি ঘণ্টার অপেক্ষা, তার পরেই আবার ট্রেন ধরবে তাপস।

ছুটি পাওয়া যায়নি। তবু রবিবারটাকে কাজে লাগাতে হয়েছে। শনিবার রাত্রিবেলা মঞ্জুলাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে তাপস। চক্রধরপুরে এসে পৌঁছেছে রবিবার বেলা এগারটারও কিছু পরে। সুতরাং তিনটের ট্রেনই ধরতে হয়, তা হলে কাল সোমবারে কলকাতায় পৌঁছে ঠিক সময়মত অফিসের কাজে হাজির হতে পারা যাবে।

চক্রধরপুরের এই বাড়ি হলো বিপিন ডাক্তারের বাড়ি। তার মানে, মঞ্জুলার বাপের বাড়ি— অর্থাৎ তাপসের শ্বশুরবাড়ি। টাউনের একটু বাইরে, বেশ একটু নিরিবিলি খোলামেলা জায়গাতে এই বাড়িটা। দূরের পাহাড়ের গা জড়িয়ে আর এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে টেবোঘাটের সড়ক, সে সড়কের ছবিটা এ বাড়ির এই বারান্দাতে বসেই দেখা যায়।

বারান্দাতে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে ঐ পাহাড়ী ঘাটের আর শালবনের দিকে তাকিয়ে সময় পার করে দিচ্ছে তাপস। মঞ্জুলা সেই যে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে, তারপর আর এক মুহূর্তের জন্যও এদিকে আসেনি। এখানে, এই বারান্দার উপর যে তাপস নামে একটা অস্তিত্ব চুপ করে বসে আছে, এই সামান্য সত্যটাও বোধহয় একেবারে ভুলে গিয়েছে মঞ্জুলা।

বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার, বেশ একটু অস্বাভাবিক। প্রায় এক বছর পরে মেয়ে আর মেয়ের বর বাড়িতে এসেছে অথচ বাড়িতে একটা খুশির সাড়া জেগে উঠলো না। আর একটা কথা, মঞ্জুলার বিয়ে হবার পর এই প্রথম বাপের বাড়িতে এসেছে মঞ্জুলা। তাপসও বিয়ের পর এই প্রথম শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। অথচ, সারা বাড়িটাই যেন কেমন নির্বিকার আর নীরব শান্ত ও উদাস হয়ে ঘটনাটাকে কোনমতে সহ্য করছে। যেন কারও কোন কথা বলবার নেই, হাসবার দরকার নেই, একটু ছুটোছুটি করবারও দরকার নেই।

অথচ, বাড়িতে লোক আছে। বিপিন ডাক্তারও তো এতক্ষণ ছিলেন। তিনি এই কিছুক্ষণ আগে বাগানের ওদিক দিয়ে আর ওপাশের গেট দিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন। তাপসের

কাছে আসেননি বিপিনবাবু, তাপসের সঙ্গে একটা কথা বলবার, কিংবা তাপসের রাত-জাগা ক্লিষ্ট মুখটাকে একবার দেখবারও দরকার আছে বলে বোধহয় মনে করেননি। হ্যাঁ, একটা চাকর অবশ্য এসেছে। তাপসকে চা আর খাবার দিয়েছে। চা আর খাবার খেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে তাপস আর চুপ করে বসে বসে দূরের শালবনের চেহারা দেখেছে। এখনও দেখছে।

মঞ্জুলার মা অবশ্য নেই। তিনি মেয়ের বিয়ে দেখেননি। আজকের এই দুঃসহ ঘটনাকে দেখবার দুর্ভাগ্য থেকেও বেঁচে গিয়েছেন। তিনি মারা গিয়েছেন অনেকদিন আগেই, বোধহয় সাত বছরেরও আগে।

কিন্তু বড়-বউদি আছেন, মেজ-বউদি আছেন। এঁরা তো সম্পর্কে গুরুজন হন। এঁরাও তো একবার ঘরের বাইরে এসে তাপসের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারতেন।

তাই বা কেন ? বাড়ির জামাই চুপ করে ঘরের বাইরের বারান্দায় বসে থাকবে, তাকে ঘরের ভিতরে এসে বসতে কেউ বলবে না—এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যবহার আর কি হতে পারে ? আজই দুপুরে এসে, আবার আজই মাত্র আর তিন ঘণ্টা পরে বিকালের ট্রেনে চলে যাবে তাপস, বাড়ির কোন মানুষ তাকে একটা দিনের জন্যও থেকে যেতে অনুরোধ করবে না, এটাই বা কেমন কথা ?

তাপস জানে না, কিন্তু এ রকমেরই কথা হয়ে আছে। এই এক বছর ধরে মঞ্জুলার চিঠিতে বড়-বউদি আর মেজ-বউদি যে সত্য জানতে পেরেছেন, আর, স্বয়ং বিপিনবাবুও যে সত্য বুঝতে পেরে গিয়েছেন, তাতে আজ তাপসকে সমাদব করবার দবকার আছে বলে কেউ মনে করবে না। মঞ্জুলা তৈরি হয়েই এসেছে। এ বাড়ির মনও আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে। তাপস না এলেই ভাল হতো। কিন্তু নিতান্তই যখন এসেছে, তখন বসে থাকুক, তাবপর চলে যাক।

তাপস এসেছে, এটা তাপসেরই একটা মূর্খ উৎসাহের দোষ। মঞ্জুলাকে চক্রধরপুরে পৌঁছে দেবার জন্য মঞ্জুলা তাপসকে অনুরোধ করেনি। ন'মামা কলকাতা থেকে টাটানগর যাচ্ছেন, সুতরাং ন' মামা অনায়াসে একটু ঘুরপথ হয়ে মঞ্জুলাকে চক্রধরপুরে পৌঁছে দিয়ে টাটানগর চলে যাবেন। এই ব্যবস্থাই করে রেখেছিল মঞ্জুলা। কিন্তু তাপস নিজেই হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললে— আমিই যাব। নাই বা পেলাম ছুটি। শনিবার রওনা হব, রবিবার দুপুরে পৌঁছব, আবার রবিবারই বিকেলের ট্রেনে রওনা হয়ে সোমবার সকাল দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাব। তাহলেই ঠিক সময়ে অফিস করতে পারা যাবে।

বিপিন ডাক্তার মনে মনে অনেক আক্ষেপ করেছেন। মাঝে মাঝে মুখ খুলে বলেও ফেলেছেন— না, খুবই ভুল হয়েছে।

অর্থাৎ তাপসের সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে দেওয়া খুবই ভুল হয়েছে। ভুলটা অনেকটা জেনেশুনেই করা হয়েছে। বড়-বউদি আর মেজ-বউদি দুজনেই জানতেন, বিপিন ডাক্তারও সবই জানতে পেরেছিলেন, সন্দীপের সঙ্গে বিয়ে হলেই সুখী হবে মঞ্জুলা।

সন্দীপ, দেখতে শুনতে খুবই ভাল ছেলে, ভাল কাজ করে, ভাল লেখাপড়া শিখেছে। আর, একটা বছরেরও বেশিদিন ধরে মঞ্জুলার সঙ্গে চেনা-শোনাও হয়েছিল। বড়-বউদি আর মেজ-বউদির কাছে স্পষ্ট করে বলে দিতেও বাকি রাখেনি মঞ্জুলা, বিয়ে যদি করি তবে সন্দীপকেই বিয়ে করবো।

—তার মানে ?

—তার মানে, সন্দীপ যদি বিয়ে করতে রাজি না হয়, তবে আমার বিয়েই হবে না।

—কিন্তু সন্দীপ কি বলে ?

—সেটা তোমরা জিজ্ঞাসা করে দেখ।

সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সন্দীপ বলেছিল, আমার একটুও আপত্তি নেই।

বড়-বউদি—ওভাবে বলো না, একটু স্পষ্ট করে বল।

সন্দীপ লজ্জিতভাবে হেসেছিল— আমার ইচ্ছেও তাই।

সন্দীপের সঙ্গেই যে মঞ্জুলার বিয়ে হবে, এ বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সন্দীপ যখন নতুন চাকরি পেয়ে টাটানগর চলে গেল, তখন বড়-বউদি কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন— মঞ্জু তবে আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

লজ্জিতভাবে হেসেছিল সন্দীপ—যতদিন ইচ্ছে অপেক্ষা করুক। আমাকে অবশ্য যেদিনই চিঠি দেবেন আপনারা…।

নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন বড়-বউদি।

টাটানগর থেকে মঞ্জুলাও কয়েকটা চিঠি পেয়েছিল। সে চিঠি বড়-বউদি আর মেজ-বউদি দুজনেই এক ফাঁকে পড়ে ফেলেছিলেন। আর, আরও নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন, ভালবাসা যখন হয়েছে, তখন আরও কিছুদিন দেরি করতে পারা যায়। মঞ্জুলার জন্যে আর কোন পাত্র খোঁজ করবার কোন মানে হয় না। সন্দীপ আরও কিছুদিন দেরি করতে চায়। দেরি করুক। তাতে কিছু আসে যায় না। আর মঞ্জুলাও বিয়ের জন্য এমন কিছু উতলা হয়ে উঠছে না।

কিন্তু ভাগ্যেরই দোষ বলতে হবে। একটু ভাবতে, বুঝতে, সহ্য করতে আর ধৈর্য ধরতে এমন কয়েকটা ভুল হয়ে গেল, যে-জন্যে আজ মঞ্জুলাকে আর এ-বাড়ির সব মানুষকেই অনুতাপের জ্বালা ভুগতে হচ্ছে।

শোনা গেল, সন্দীপের নাকি টাটানগরেরই এক ভদ্রলোকের খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে। কে যে খবরটা প্রথম বটিয়েছিল, কে জানে? কিন্তু খবরটা এই চক্রধরপুরেও পৌঁছে গেল।

সন্দীপকে চিঠি দিয়েছিল মঞ্জুলা, চিঠি দিযেছিলেন বড-বউদি, শেষে বিপিন ডাক্তারও একটা চিঠি দিয়েছিলেন। সবারই চিঠিতে ঐ একটি উদ্বিগ্ন আর করুণ প্রশ্ন— এ কি খবর শোনা যাচ্ছে? খবরটা নিশ্চয় ভয়ানক একটা মিথ্যে।

সন্দীপের কাছ থেকে কোন উত্তর আসেনি।

খোঁজ নিয়ে জানতে পেলেন বিপিন ডাক্তার, সন্দীপ বোম্বাই চলে গিয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেল না, সন্দীপের বিয়ে হযে গিয়েছে কি হয়নি।

বড়-বউদি বললেন— বুঝতে আর কি অসুবিধে আছে?

মেজ-বউদিও বলেন— যে ছেলে এতগুলি চিঠির একটাও উত্তর দিলে না, আর বোম্বাই চলে গেল, সে ছেলে কি যে করে বসে আছে সেটাও খুব বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বড়-বউদি— আমার তো মনে হয়, বিয়ে করেছে সন্দীপ।

মেজ-বউদি— নিশ্চয়। তা না হলে আমাদের চিঠির উত্তর দেবে না কেন?

চক্রধরপুরে সন্দীপের বাড়িতে শুধু একটা মালী থাকে; সে মালীও কিছু বলতে পারে না। সে শুধু জানে, বাবু বোম্বাইয়ে আছেন আর মাঝে মাঝে মালীর মাইনেটা পাঠিয়ে দেন।

মঞ্জুলার প্রাণটাও এই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে পুরো তিনটে মাস যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি মঞ্জুলা— কোন অভিমানের কথা নয়, কোন আক্ষেপের কথা নয়।

একটা বছর পার হবার পর বিপিন ডাক্তার বললেন— মঞ্জুলার তো বিয়ে দেওয়া উচিত।

বড়-বউদি— উচিত ঠিকই, কিন্তু মঞ্জুলা কি রাজি হবে?

—রাজি করাও।

বড়-বউদি আর মেজ-বউদি দিনের পর দিন অনুরোধ করেছেন। কিন্তু মঞ্জুলা যেন অবিচল। বিয়ে করতে রাজি নয় মঞ্জুলা।

মঞ্জুলার ন' মামা কলকাতা থেকে লিখলেন— বেশ ভাল পাত্র আছে, আমারই জানা-শোনা ছেলে তাপস। ভাল চাকরি করে। বেশ শিক্ষিত ছেলে। মঞ্জুলা যদি রাজি হয় তবে অবিলম্বে জানাবেন। আমি বললে তাপসও রাজি হয়ে যাবে।

বিপিন ডাক্তার দুই পুত্রবধূর সঙ্গে পরামর্শ করেন। —ছেলেটিকে তো ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

বড়-বউদি— মঞ্জু যদি ভাল মনে করে, তবেই··।

বিপিন ডাক্তার— কথাটা হলো, আজ হয়তো তাপসকে ভাল বলে মনে করছে না, কিন্তু···তার মানে, বিয়েটা যদি হয়ে যায়; তবে·কালক্রমে ভাল সম্পর্ক হয়েই যাবে। সেটাই স্বাভাবিক।

বড়-বউদি— আমারও তো তাই মনে হয়। চেনাশোনা হবার পর আপনা থেকেই·।

বিপিন ডাক্তার— তাহলে তোমরা ওকে একটু বুঝিয়ে বল।

মঞ্জুলাকে খুব ভাল করে বুঝিযে দিলেন মেজ-বউদি— আপত্তি করবার কোন মানে হয় না মঞ্জু। বিয়ের পরেও ভালবাসা হয়, আর সেটাই হলো আসল ভালবাসা।

মঞ্জুলা রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল— ভালবাসা চাই না। তবে বিয়ে হোক্। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যাও।

মঞ্জুলার এই সম্মতি যে দুরন্ত এক অনিচ্ছার সম্মতি, এটা সেদিন বুঝতে পেরেও সাবধান হননি বিপিনডাক্তার। মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যেই ব্যস্ত হযে উঠলেন। বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর তাপসের সঙ্গে যেদিন কলকাতা রওনা হলো মঞ্জুলা, সেদিন বাড়ির আর সবারই চোখ জলে ভরে গিয়ে ছলছল করেছিল। কিন্তু মঞ্জুলার চোখ শান্ত, শুকনো খটখটে। বিপিনডাক্তারকে আর দুই বউদিকে শান্তভাবে প্রণাম করে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল মঞ্জুলা; ঘটনাটা যেন কোন ঘটনাই নয়, মঞ্জুলার জীবনটাকে এই বিয়ের উৎসবের কোন ফুলের আর গন্ধধূপের সৌরভ যেন স্পর্শও করতে পারেনি। যেন এ পাড়া থেকে ওপাড়াতে বেড়াতে যাচ্ছে মঞ্জুলা।

২

কলকাতার জীবন। কে জানে, সেদিন মনটা কেন যেন বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কলকাতার এই বাড়িটাকে যদি সত্যিই ভাল লাগতো, তবে ভালই হতো। আড়াল থেকে তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে যদি ভাল লাগতো, তবে ভালই হতো। তাপস যখন অফিস থেকে ফিরে এসে ঐ ঘরে চুপ করে আর একলা হয়ে বসে থাকে, তখন ঐ ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে যদি ইচ্ছে হতো, তবে ভালই হতো। এই ভদ্রলোক তো কোন অপরাধ করেনি।

কিন্তু মাত্র ঐ একদিন, সেদিনের মনের ভাবনাটা যেন বৈশাখের আকাশের এক টুকরো হঠাৎ-মেঘের মতো দেখা দিয়েছিল। তারপর আর নয়। এই এক বছরের মধ্যেও নয়। তাপসকে সহ্য করবার কথা মনে উঠলেই মনটা যেন বিষিয়ে যায়।

কি করে সম্ভব? তাপস দেখতে কুৎসিত নয় ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন একেবারে সাদা-সিধে একটা চেহারা। মুখের কথাগুলি যেন প্রাণহীন কতগুলি ভাষার শব্দ। শুধু চাকরি আর বাড়ি, এ ছাড়া ভদ্রলোকের জীবনে যেন আর কোন সত্য নেই। ভদ্রলোক কোনদিন

বাগানে দাঁড়িয়ে রাত্রির আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। অন্তত মঞ্জুলার তো চোখে পড়েনি।

মঞ্জুলাকে এ বাড়িতে আনবার কি দরকারই বা ছিল এই ভদ্রলোকেব ? কোনদিন তো কোন কাজের জন্য মঞ্জুলাকে ডাকবার দরকার বোধ করেন না ভদ্রলোক। চাকব আছে, রান্নার লোক আছে। যা দরকার তা সবই পেয়ে যান ভদ্রলোক। স্নান কবেন, খাবার খান, অফিস চলে যান। মাঝে মাঝে ঘরে বসেই একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে অফিসেবই কাজের লেখা লেখেন। এ রকমের একটা রিক্ত মনেব মানুষ বিয়ে কবলোই বা কেন ? এর জীবনে কোন স্ত্রীর দবকার হয় না। এই মানুষ কারও স্বামী হবাব যোগ্যও নয়।

তাপসের সঙ্গে বিয়ে হযেছে। পৃথিবীটা বলবে, এই তাপসই হলো মঞ্জুলাব স্বামী। কিন্তু মঞ্জুলার মন জানে, ওটা একটা অসাব ছাযা মাত্র। একটা দুর্ভাগ্যেব অঙ্ক থেকে আব একটা দুর্ভাগ্যের অঙ্কে এসে পৌঁছেছে মঞ্জুলার অদৃষ্টের নাটকটা। যাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারা যাবে না, তাবই বাড়িতে একটি ঘবে বসে রঙীন শাড়ি পরে একটা মিথ্যে ঘরণীব রূপ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে।

একদিন সত্যিই, জোর করে মনটাকে যেন ভেঙেচুবে একটা কাণ্ড করতে চেয়েছিল মঞ্জুলা। অফিস থেকে ফিরে এসে যখন বাইরের ঘরে একা বসেছিল তাপস, তখন এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িযেছিল মঞ্জুলা। তাপস হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মঞ্জুলার দিকে তাকিয়েছিল আর হেসেছিল।

ছিঃ, যেন এক গাদা শুকনো ধুলোর হাসি। চমকে উঠে আর চোখ বন্ধ করে, তখনই চলে এসেছিল মঞ্জুলা। দেখতে একটুও ভাল লাগেনি।

দেখতে ভয় কবে। আব, খুবই বুঝতে পাবে মঞ্জুলা, কেমন যেন ঘেন্নাও করে। তাপসের জীবনের কোন কাজ, কোন কথা, কোন হাসিব সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওযা অসম্ভব। জোর করে একটা দুঃস্বপ্নের সঙ্গে ঘব করা যায় না। এখানে মবতে পারা যায়, কিন্তু বাঁচতে পারা যায় না।

হঠাৎ একদিন চক্রধরপুরের একটা চিঠি এসে অদ্ভুত এক বিস্ময়েব বার্তাকে যেন গুঞ্জন করে মঞ্জুলার কানের কাছে শোনাতে থাকে। বড়-বউদি লিখেছেন, সন্দীপ এসেছে। সে-খবরটা নিতান্ত মিথ্যে একটা খবর, সন্দীপ বিযে করেনি। যাই হোক, আশা করি তুমি আর তাপস ভালই আছ।

বড়-বউদিকে সেদিনই চিঠির উত্তর দিয়েছিল মঞ্জুলা— তাপস নামে একটি শাস্তির সঙ্গে আমি বেশ সুখেই আছি। তোমাদের দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই। আব ঐ নতুন খবরটা আজ আমাকে জানাবার কোন দরকার ছিল না।

এই চিঠির পর আরও কয়েকটা চিঠি লিখে বড়-বউদিকে সত্যিই একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে মঞ্জুলা। জেনেছেন বড়-বউদি, না, তাঁদের সব কল্পনা মিথ্যে হযে গিয়েছে। এই এক বছরের মধ্যেও তাপসকে মেনে নিতে পারেনি মঞ্জুলা। তাপসকে সহ্য করবার আর সামর্থ্যও নেই বোধহয়। তা না হলে এত স্পষ্ট করে এসব কথা লিখবে কেন মঞ্জুলা ? —আমি এখানে থাকবো না। আমি এই ঘেন্না থেকে সরে যেতে চাই। তাপসের সঙ্গে তোমরা যদি কোন সম্পর্ক রাখতে চাও, রেখো ; কিন্তু আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি ন' মামার সঙ্গে শিগগির চক্রধরপুর যাচ্ছি।

বড়-বউদি আর মেজ-বউদি আগেই আলোচনা করে রেখেছেন, দেখা যাক কি হয় ? যদি সত্যিই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তবে···।

বড়-বউদি বলেন— তবে মনে হয়···সন্দীপকেই বিয়ে করতে রাজি হবে মঞ্জু।

মেজ-বউদি—কিন্তু সন্দীপ ?

বড়-বউদি— এখন তো সন্দীপের কথা থেকেও বোঝা যায়, সন্দীপ মনে মনে খুব একটা আঘাতও পেয়েছে।

—কেন ?

—মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে শুনতে পেয়ে।

—কিন্তু এটাও তো একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, তুমি ভাল ছেলেটি এতদিনে ভবে চুপ করে বসেছিলে কেন ? একটা চিঠিও দাওনি কেন ?

—সন্দীপ বলছে, চিঠি দিয়েছিল।

—কে জানে ? চিঠি দিলে চিঠি না পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।

—যাই হোক, এখন তো সন্দীপ কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হলো তাপস। তাপসকে যখন সহ্যই করতে পারবে না মঞ্জু, তখন ·।

—তখন ওর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

বড়-বউদি আর মেজ-বউদির পক্ষে আজ আর কিছু বলবার নেই। কারণ মঞ্জুলা এসেই গিয়েছে। মঞ্জুলার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, যেন ওর প্রাণটা এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে একটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে মঞ্জুলা— আমাব যা বলবার তা তো আগেই বলে দিয়েছি। আমাকে আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করো না।

বড়-বউদি— তাপস কি তবে···।

মঞ্জুলা— এখনই চলে যাবে।

বড়-বউদি— তুমি কি তবে···।

—না। ওর কাছেও আমার আর কিছু বলবার নেই।

তাপসকে এ বাড়ির কোন মানুষ কোন কথা বলবে না। তাপসকে এই বাড়িটাও যেন কোনমতে শুধু তিনটে ঘণ্টার অস্বস্তির মত সহ্য করছে।

৩

ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে বসে বই পড়ছিল মঞ্জুলা। এই বইটা এখানে এক বছর ধরে পড়ে আছে, তবু হারিয়ে যায়নি। এই বইয়ের ভিতরে একটি পাতায় যাব নাম লেখা আছে, সে মানুষটাও হারিয়ে যায়নি। আবার ফিরে এসেছে। এখানেই আছে। কে জানে, এখন বোধহয় বাড়ির মালীর সঙ্গে বাগানে ঘুরে ফিরে গন্ধরাজের গোড়ায় সার-মাটি ছড়াচ্ছে। ফুল ফলানো সন্দীপের জীবনেরই একটা শখ ছিল। সে শখটা এখনো আছে বোধহয়। আর একটা শখ ছিল, বিকেল হবার পরেই এই বাড়িতে একবার বেড়াতে আসবার। খবর পায়নি কি সন্দীপ, মঞ্জুলা যে এসেছে ? খবর পেয়েছে বোধহয় ; তবু এখনই নিশ্চয় আসবে না। এখনও তো বিকেল হয়নি, আর ···বারান্দার উপরে বসে আছে যে, মঞ্জুলার জীবনের একটা অকাম্য আবির্ভাব, সে এখনও আছে। ভালই হয়, তাপস চলে যাবার পরেই যেন সন্দীপ আসে। তাপসকে চোখে দেখলে সন্দীপও হয়তো মঞ্জুলার শাস্তির রকমটা দেখে হেসে ফেলবে।

এই বইটা হাতে তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই পড়ছে মঞ্জুলা। কিন্তু একটা পাতাও পড়তে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বইটাই বার বার তিনবার আনমনা মঞ্জুলার হাত ফসকে পড়ে গিয়েছে। বইটারও গায়ে যেন বিশ্রী রকমের ধুলো লেগে আছে। মনটা জোর করে ধরতে চায়, কিন্তু হাতটা যেন ময়লা হয়ে যাবার ভয়ে শিথিল হয়ে যায়। ধপ্ করে পড়ে যায় বইটা।

সন্দীপ ফিরে এসেছে, সন্দীপ এখানে আছে, সন্দীপ আর-একটু পরেই আসবে— মনে হয়, চমৎকার একটি ঠাট্টাব কথা ভাবছে মঞ্জুলাব মনটা। এক বছবেব মধ্যেও একটা চিঠির উত্তর দেয়নি যে, সে মানুষেব মনেব বাগানে গন্ধবাজ ফোটে কিনা সন্দেহ।

বইটাকে টেবিলেব উপব ফেলে বেখে দেয মঞ্জুলা।

বড-বউদি বলেন— বড বিশ্রী ব্যাপাব হলো।

—কি ?

—তাপস চলে যাচ্ছে।

—যাবেই তো।

—হ্যাঁ, যাবে ঠিকই। কিন্তু যাবাব আগে তোমাব সঙ্গে একবাব দেখা কবতে চাইছে।

—না।

মঞ্জুলাব নিশ্চিন্ত মনটা আবাব অস্বস্তিতে ভবে ওঠে। আবাব নির্বোধেব মতো এমন আহ্বান কবে কেন ভদ্রলোক ? কিছুই তো জানিয়ে দিতে বাকি বাখেনি মঞ্জুলা। কলকাতাতেই একদিন স্পষ্ট কবে বলে দিয়েছিল, আমাব এখানে থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই।

আসবাব সময ট্রেনেও একবার আবও স্পষ্ট কবে বলে দিয়েছিল— আমি আব কলকাতায় ফিবে যাব না।

আব, এ তিন ঘণ্টা ধবে বাইবেব বাবান্দায বসে সাবা বাডির অশ্রদ্ধা আব তুচ্ছতা পেল যে লোকটা, সে কি এতই নির্বোধ যে এখনও কিছু বুঝতে পারছে না ? মঞ্জুলার সঙ্গে যে এ-জীবনে কোন সম্পর্ক থাকবে না, এই সত্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু দেখতে পাযনি কি ? তবে কোন লজ্জায় আব কোন সাহসে যাবার আগে মঞ্জুলার সঙ্গে কথা বলতে চায় ?

অস্বীকাব করে না মঞ্জুলা, কল্পনা কবে বেশ বুঝতে পাবে, মঞ্জুলাব মনেব এই সব কথা যদি কেউ শুনতে পায, সে মঞ্জুলাকে একটা হিংস্রতাব প্রাণী বলে মনে করবে। বিয়ে হয়েছে যার সঙ্গে, লোকে যাকে মঞ্জুলার স্বামী বলে জানে, তাকে এইভাবে একটা জঞ্জালের মতো সরিয়ে দেওয়া। শুনতে পেলে যে-কোন মানুষ বিপিনডাক্তারের মেয়েকে একটা নির্মমতার দানবী বলে মনে করবে। কিন্তু দোষ কাব ? তাপস যদি না আসতো, তবে তো এই বাডিটাকে আর মঞ্জুলাকে এমন সাংঘাতিক অভদ্রতার কাণ্ড করতে হতো না। একটু দুঃখ হয় বইকি। এত নির্বোধ হলো কেন মানুষটা ?

বড-বউদি বলেন— যাও একবার, একটা কথাব কথা বলে দিয়ে চলে এস।

মেজ-বউদি—সবই তো বুঝতে পেবেছেন তাপসবাবু, তবে আবাব মিছিমিছি কথা বলতে চান কেন ?

বড-বউদি— আমাবও একটা সন্দেহ হয়, বোধহয় একটা বাজে কথা অপমানেব কথা-টথা বলে যেতে চায় তাপস।

মেজ-বউদি— হতে পারে, আশ্চর্য নয়।

মঞ্জুলা বলে— অপমানের কথা-টথা বললেও বুঝতাম, লোকটা নির্বোধ নয়।

বড-বউদি— তবে আর কি ? একবাব গিয়ে কথাটা শুনে নিয়েই চলে এস। আব এ সব সহ্য করতে পারছি না।

বড-বউদির মুখটা যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে গম্ভীব হয়ে যায়।

কি-যেন ভাবে মঞ্জুলা। তারপর, যেন একটা শান্ত আক্রোশের মতো শক্ত একটা মূর্তি ধরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। —তিনটের ট্রেন ধরতে হবে যখন, তখন আর দেরি করছো কেন ?

তাপস— তাই তো, আর দেরি করবার মানে হয় না।

মঞ্জুলা—তবে যাও।

আবার ঘরের ভিতরেই চলে আসছিল মঞ্জুলা। কিন্তু তাপস ডাকে— একটা কথা ছিল।

মঞ্জুলা— কি ?

তাপস— তুমি তো তাহলে এখন এখানেই থাকবে ?

—সেকথা তো আগেই বলেছি।

—না, সেজন্যে বলছি না। বলছি, বর্ষার এই মাস দুটো এখানকার স্বাস্থ্য খুব সুবিধের নয়। শুনেছি এই দু' মাস এখানে নানারকম অসুখ-বিসুখ ।

মঞ্জুলার চোখে দুঃসহ অস্বস্তির ভ্রূকুটিটা আবও শক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রলাপ শোনাও যে একটা বিশ্রী শাস্তি।

তাপস হাসে— একটু সাবধানে থেকো। আব কলকাতায় পৌঁছেই আমি দু' শিশি কডলিভার অয়েল পাঠিয়ে দেব।

—কেন ? কার জন্যে ?

—তোমার জন্যে। তোমার তো একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে দেখেছি।

—ভাল কথা। কিন্তু পাঠাবাব দবকাব নেই, দরকার হলে ও-জিনিস এখানেই পাওয়া যাবে।

—আচ্ছা চলি। তাপস নামে এই অবাঞ্ছিত অস্তিত্বেব মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক নির্বোধেব হাসি জ্বলজ্বল করতে থাকে।

মঞ্জুলার চোখ দুটো যেন হঠাৎ ভয পেযে চমকে ওঠে। এ কী বকমেব সাংঘাতিক হাসি। লোকটা যেন নিজের বুকের রক্তের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মঞ্জুলা বলে— তুমি সবই বুঝতে পেরেছো তো ?

তাপস— বুঝেছি।

—কি বুঝেছো ?

—তুমি আর কলকাতায় যাবে না।

—কেন যাব না, সেটাও নিশ্চয় বুঝেছো।

—বুঝেছি বই কি। আমার কাছে থাকতে তোমার ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না ?

—সেটা তুমি জান।

—তুমি জান না ?

—আমি তো শুধু জানি, তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাকে বিয়ে কবেছো। কাজেই, তোমাকে খুব ভুগতে হলো।

—তোমাকে তো কিছুই ভুগতে হয়নি, হবেও না।

—হবে বইকি।

—কেন ? তোমার কিসের অসুবিধে ?

—আমার বেশ খারাপ লাগবে।

—কেন ?

—সোজা কথা। তুমি আমাকে পছন্দ করনি, কিন্তু আমি তো তোমাকে খুবই পছন্দ করেছি।

—পছন্দ করে তোমার লাভটা কি ? আমি তো তোমাকে···।

—কি ?

—কোনদিন তোমাকে একটা কথাও বলে… ।

—তবু… ।

—তার মানে ?

—তবু ঘরে তো ছিলে । এখন অফিস থেকে ফিরে এসে ঘরটাকে ফাঁকা ফাঁকা মনে হবে । এই যা ।

চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকে তাপস । তারপরেই মঞ্জুলার মুখেব দিকে তাকায় ।

থরথর করে কাঁপতে থাকে মঞ্জুলাব চোখ । তাপসেব চোখে এ কী ভয়ানক দৃষ্টি । নির্বোধ হাসির মুখটা কী ভয়ানক চতুর আর কত হিংস্র । তাপস নামে সেই মানুষটার যে এরকম একটা মুখ আর ও-রকম দুটো চোখ থাকতে পারে, কোনদিন যে কল্পনাও করতে পারেনি মঞ্জুলা ।

তাপস বলে— চলি ।

মঞ্জুলা— শোন ।

তাপস—কি ?

মঞ্জুলা— তুমি কি ক্ষমা করে যেতে পারবে না ?

—ক্ষমা ? তোমার দোষ কোথায় যে ক্ষমা করবো ?

—দোষ আছে বইকি ।

—কোন দোষ নেই ।

—কিন্তু তুমি যে বলছো ।

—কি বলছি ?

—আমি না থাকলে ঘব ফাঁকা লাগবে ।

—লাগবে ।

ফুঁপিযে উঠে দু' হাত তুলে চোখ ঢাকে মঞ্জুলা— তবে আমাকে নিয়ে চলো ।

বড়-বউদি আব মেজ-বউদি দুজনেই সামনে এসে দাঁড়ান । —চুপ কব মঞ্জু ।

মঞ্জু বলে— না বউদি, এই ট্রেনেই চলে যাই ।

মৃগনয়না

শরতের এই নীল আকাশ, যে আকাশের দিকে তাকালে সকলেরই চোখ মুগ্ধ হয়ে যাবে, সেই আকাশের দিকে তাকালে হিরণের চোখ দুটো মুগ্ধ হয় না কেন ?

মুগ্ধ হয় কি না হয়, সেটা অবশ্য হিরণই বলতে পারে । কিন্তু বলে না । কেউ কখনও শোনেনি যে, পৃথিবীর কোন সুন্দরতার দিকে তাকিয়ে কোনদিন বলেছে হিরণ— কী চমৎকার !

কোনদিন কোন ফুলবাগানের দিকে তাকিয়েও কি বলতে পেরেছে হিরণ, কী চমৎকার ! কোনদিনও না ।

পরেশবাবুর বাগানটার দিকে তাকালে সবারই চোখ জুড়িয়ে যায় । যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই রঙীন । বাগানের সবুজ ঘাসগুলি সমান করে ছাঁটা । কাঁটা গাছের বেড়াও যেন একটা পরিপাটি সরলতা । ফুলের চারদিকে যে সব ফড়িং প্রজাপতি আর ভোমরা উড়ে বেড়ায় তারাও একটা ছন্দ মেনে চলে । এলোমেলোভাবে উড়ে বেড়ায় না । এখানে টকটকে লাল

ফুল, ওখানে সাদা, পিছনে হলদে করবী আর নীল অপরাজিতা। বাগানটা সত্যিই যেন ফুটন্ত বৈচিত্র্যের একটা বিস্ময়।

এই সেদিনও হিরণ এসেছিল। পরেশবাবুর বাগানটার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বাগানটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। তারপরেই বলে উঠলো— মাধবীলতাটা শুকনো।

সারা বাগানটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, অনেক চেষ্টা করে আর অনেক সময় নিয়ে আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে সত্যিই দেখা যায়, পাঁচিলটার ঐদিকে এক কোণে একটা মাধবীলতা শুকিয়ে রয়েছে।

বেশ তো, কোন সন্দেহ নেই, পরেশবাবুর এত বড় বাগানটার এক কোণে সত্যিই একটা বিশ্রী শুষ্কতা লুকিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এই বাগানের এই যে শত শত সুশ্রী ফুল পাতা আর লতা বাতাসে দুলছে, যা দেখে ফড়িং আর প্রজাপতির চোখও মুগ্ধ হয়েছে, সেটা কি হিরণেব চোখে পড়েনি?

সত্যিই পড়েনি। তা না হলে, অন্তত এত বড়-বড় বসরাই গোলাপগুলিব সম্পর্কে একটা খুশির মন্তব্য করতো হিবণ।

কিন্তু চোখে না পড়বাব তো কথা নয়। বসরাই গোলাপের একেবাবে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখেছে হিবণ। তবু মুখ থেকে একটা সামান্য খুশির উচ্ছ্বাসও শব্দ করে বেজে ওঠেনি। মনে হয়, পৃথিবীর কোন ভাল জিনিসকে ভাল বলতে গেলে হিরণের বুকটাই ফেটে যাবে। বোধহয় ওর নিঃশ্বাসেই একটা নিদারুণ সতর্কতা আছে, যেন ভুলেও ভালকে ভাল বলে না ফেলতে হয়।

এ বিষয়ে হিরণের জীবনটা যেন সংযমের একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠেছে। কখনও ভুলেও মুখের কথার ফাঁকে কোন প্রশংসা, প্রশস্তি, অভ্যর্থনা বা কৃতার্থতার ভাষা যেন বেজে না ওঠে। বন্ধুরা ইচ্ছে করেই পরেশবাবুর বাগানের শোভা সম্পর্কে কতবার আলোচনা কবেছে। পরীক্ষা করে বুঝতে চেষ্টা করেছে, হিরণের প্রাণটা খুশি হয়ে সেই চমৎকার বাগানের একটা ফুলেরও একটু সামান্য প্রশংসা করে কিনা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। এ বিষয়ে হিরণের মুখ যেন প্রতিজ্ঞা করে বন্ধ করা একটা মুখ। কোন মন্তব্য করে না হিরণ। যদি নেহাতই করে তবে সেটা হলো একটা খুঁত আবিষ্কারের কথা। অর্থাৎ, সেই শুকনো মাধবীলতাটা— বড় বিশ্রী দেখতে ঐ মাধবীলতাটা, মন্তব্য করে হিবণ।

চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে পাড়ার প্রায় সবারই নেমন্তন্ন হয়েছিল। খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন চৌধুরী সাহেব। নেমন্তন্নের আসরের জন্য ফোর্ট থেকে ভাড়া করে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা আনিয়েছেন। ফোর্টের ব্যান্ড পার্টিও এসেছে। আর, ভোজের যে আয়োজন করেছেন, সে আয়োজন যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই সুন্দর আর তেমনই বিপুল। তিন রকমের পোলাও আর চার রকমের মাংস রান্না হয়েছে। রান্না করেছে নবাববাড়ির খানসামার দল।

অতিথিরা খুশী, অতিথিরা পরিতৃপ্ত, অতিথিরা মুগ্ধ। চৌধুরী সাহেবের হাসিমুখের অভ্যর্থনায় সকলে আরও খুশি। সত্যিই, চৌধুরী সাহেবের ভদ্রতার তুলনা হয় না।

হিরণ বলে— মিষ্টি পোলাওটার বাদামগুলো কেমন যেন কচ্‌কচ্‌ করলো। চৌধুরী সাহেবের একটা চোখ কেমন যেন কুঁচকে রয়েছে দেখা গেল। সামিয়ানাটার এক-জায়গায় একটা তালি আছে। ব্যান্ড-মাস্টারের মুখে বসন্তের দাগ।

সমীর বলে— ঠিকই বলেছো হিরণ, কিন্তু আর কি দেখলে বল?

নৃপেন বলে— মাংসের কালিয়াটা কেমন লাগলো?

হরিপদ বলে— ভোজের জায়গাটা কেমন সাজানো হয়েছিল, বল?

সমর বলে— ব্যাগ-পাইটার টিউন কেমন লাগলো?

একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেয় না হিরণ। বোধহয় হিরণের অন্তরাত্মাই উত্তর দিতে পারে না। কে জানে কি-রকমের নিদারুণ একটা বাধা যেন হিরণরে মুখ বন্ধ করে রেখেছে। কিছুতেই বলতে পারলো না হিরণ, চৌধুরী সাহেবের বাড়ির এই চমৎকার ভোজ-সভায় এসে চমৎকার কিছু দেখলো কি না, চোখে পড়লো কি না, কিংবা অনুভব করলো কি না হিরণ।

কিন্তু সেজন্যে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, হিবণ কখনও হেসে ওঠে না, ওব চোখে কিংবা মুখের ভাষায় কখনো কোন উল্লাস জেগে ওঠে না। সুকুমাববাবুর মেয়ের বিয়ের সময়, যখন একদিকে নিমন্ত্রিতেরা ভিড় করে খেতে বসেছে আব ওদিকে বিয়েব মন্ত্রপাঠ শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় বিদ্যুতের তারে কি একট্যা গোলমাল হয়ে সব আলো একসঙ্গে হঠাৎ নিভে গেল। সুকুমারবাবু যেন আতঙ্কিতের মতো একটা আর্তনাদ করে ওঠেন। সমর হরিপদ আর সমীরও আক্ষেপ করে ওঠে— আঃ, ভদ্রলোক সত্যিই বিপদে পড়লেন।

কিন্তু চেঁচিয়ে হেসে ওঠে হিরণ— বাঃ, বেড়ে অন্ধকার। নেমন্তন্ন খাও এবার! বিয়ের মন্তর এবার ঘ্যানর ঘ্যানর করুক।

নরেশবাবু একবার কলেজে গিয়েছিলেন, ছেলের পরীক্ষার ফী জমা দিতে। লোকের কাছ থেকে ধার কবে আর নিজেবই একটা আংটি বেচে দিয়ে টাকা যোগাড় করেছিলেন নরেশবাবু। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, কলেজে উপস্থিত হয়েই দেখলেন, পকেটে টাকা নেই। ট্রামে কিংবা বাসে কোন চোর নিশ্চয়ই পকেট থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন নরেশবাবু। পথে দেখা হতে হিরণকেও এই দুর্ভাগ্যের খবরটা বলেছিলেন নরেশবাবু। কিন্তু শোনামাত্র হিরণের চোখ দুটো যেন ছটফট করে হেসে উঠলো। চেঁচিয়ে উঠলো হিরণ— বাঃ, চোর ব্যাটাব তো বেড়ে হাত-সাফাই। একটুও টের পাননি বোধহয়?

নরেশবাবু বলেন— একটুও না।

হরিণ বলে— কি করে যে এমন অদ্ভুত হাতসাফাই হয়, আশ্চর্য।

হিবণেব মুখের সেই ছটফটে ভাষার উল্লাসটা যেন জোরে হাতসাফাই-এর উদ্দেশে একটা বিস্ময়ের ঘোষণা।

এইভাবেই চলছে হিরণের জীবনটা। কেউ কোন নতুন বাড়ি তুলেছে, দেখতে গিয়ে বাড়িটার একটা খুঁতই শুধু চোখে পড়ে হিবণের। সিঁড়ির সিমেণ্টের এক জায়গায় একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। আর একটা জানালার কাঠ চিড় খেয়ে এক জাযগায ফেটে গিযেছে।

কিন্তু আর কি কিছু নেই, যেটা দেখতে ভাল, খুবই শোভন আব সুন্দর?

না, হিরণ বলতে পারল না, বললও না যে, বাড়িটার মোজেয়িক বড় চমৎকার, ঘরগুলি বেশ বড়-বড়, আর খুব আলো-হাওয়া আছে।

বাড়ির মালিক যদুবাবু বলেন— সিমেন্টে বড় ঠকে গেছি হে। প্রায় দশ টন সিমেন্টে ভেজাল ছিল। অর্ধেকই মাটি।

এইবার হেসে ওঠে হিরণের মুখটা— বাঃ, সিমেন্টওযালা দেখছি খুব ওস্তাদ!

এটাও হিরণের চরিত্রের একটা অদ্ভুত আগ্রহ। কারও দুর্ভাগ্যেও একটা সহানুভূতির কথা বলতে যেন হিরণের বিবেকেই বাধা আছে, মানা আছে। আজ পর্যন্ত কেউ কখনও হিরণকে এমন কথা বলতে শোনেনি যে, আহা, অমুক বেচারা খুবই অসুবিধেয় পড়েছে। নিখিলের বড় ক্ষতি হয়ে গেল। চারুবাবুর উপর এটা বড় অন্যায় করা হচ্ছে।

চোখের উপরেই তো দেখা যায়, পাড়ার কত নিরীহ মানুষ বিপদে পড়েছে, কষ্ট পেয়েছে, সমস্যায় পড়েছে, দুশ্চিন্তা করছে। হিরণও দেখতে পায় বইকি। বন্ধুরা যখন আলোচনা করে, তখন সবই মন দিয়ে শোনেও হিরণ। কিন্তু, একটা আক্ষেপ? না, কখনও না। একটা সহানুভূতির কথা? না, কখনও না। বলতেই পারে না হিরণ।

২

মনে হচ্ছে, বেশ একটা অসুবিধেয় পড়েছে হিরণ।

সমর বলে— ঠিক বুঝতে পারছি না, কিসের অসুবিধে ?

সমীর বলে— এটা একটু আশ্চর্যের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে, ঠিক বিয়ের পরেই হিরণ যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

হরিপদ বলে— অথচ, বিয়ের পর দু-তিনটে মাস তো খুব বেশিরকম খোশমেজাজে ছিল হিরণ।

—তা ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, মেজাজে যেন ছিটেফোঁটা ফুর্তিও নেই।

সমর— সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, মনোজের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে হিরণ।

চমকে ওঠে সমীর— তাই নাকি ?

সমর— হ্যাঁ, অথচ মনোজ হলো ওরই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হরিপদ— কবে থেকে এ ব্যাপার চলছে ?

সমর— তা জানি না।

হরিপদ— আমি কিন্তু একটা আন্দাজ করতে পারছি।

সমীর— কি ?

হরিপদ— আমার মনে হয়, সেই যে, সেই প্রথম দিনেই যে কাণ্ডটা হলো, তারপর থেকে…।

সমীর— প্রথম দিন মানে ?

হরিপদ— সেই যে, বউভাতের দিন, যেদিন আমরা সবাই হিরণের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করলাম।

সমর— তা তো মনে পড়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কোন কাণ্ড হতে তো দেখিনি।

হরিপদ— আমি দেখেছিলাম।

সমীর— কি ?

হরিপদ— ঐ যে মনোজ একটা কথা বললো, তারপর হিরণের স্ত্রী মনোজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

হ্যাঁ, এইবার সবারই মনে পড়ে। হিরণের কথায় সুমিতা যেন চমকে উঠেছিল আর মনোজের মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল। সুমিতার প্রাণটা যেন হঠাৎ একটা শ্রদ্ধার গুঞ্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল আর সারা মুখ সুস্মিত হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, সামান্য একটা প্রশংসার ব্যাপার। সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় একটা কথা হরিপদর কানের কাছে বলে ফেলেছিল মনোজ— সত্যিই চমৎকার দুটো চোখ, একেই বলে মৃগনয়না।

সমীর, হরিপদ আর সমর আর কিছু জানে না এবং তার আগে যে ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল, তার কিছু খবর রাখে না। তাই ওদের পক্ষে ঘটনাটাকে একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় বলে মনে হবে, এটা স্বাভাবিক।

সুমিতার মুখের দিকে তাকালে সবারই চোখে যে সত্য সবার আগে দেখা দেবে, সেটা হলো সুমিতার ঐ চোখ দুটো ! একেবারে নিখুঁত দুটি সুন্দর চোখ। সুমিতাও জানে, তার রূপের ভুল আর যা-কিছু কিংবা যতকিছুই থাকুক না কেন, অন্তত চোখ দুটোকে কেউ নিন্দে করবে না। যার চোখ আছে, সে সবার আগেই সুমিতার ঐ টানা-টানা কালো চোখ দুটোকেই দেখবে আর খুশি হবে।

কিন্তু শুনে চমকে উঠেছিল সুমিতা। জীবনে যার কাছ থেকে সবচেয়ে খুশির স্বরে কথাটা শুনতে পাবে বলে আশা কবেছিল সুমিতাব মন, তাবই কাছ থেকে একটা অদ্ভুত কথা শুনতে পেল সুমিতা। বাসব ঘবে, সেই প্রথম আলাপেব প্রথম ক্ষণে, যখন সুমিতার সেই টানা-টানা কালো চোখ দুটো হেসে হেসে আবও নিবিড আব লাজুক হযে হিবণেব মুখেব দিকে তাকায়, তখন হঠাৎ বলে ওঠে হিরণ, তোমাব ঘাডেব ওপব ওটা কি ? আঁচিল ? না জরুল ?

সুমিতাব চোখেব হাসি স্তব্ধ হয়ে যায়। মনেব আশাটা যেন হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে মুষডে পডে।

হিবণ হাসে— তোমাব বাঁ কানেব কাছে ওটা কিসেব দাগ ? মনে হচ্ছে, একটা ফোঁডা হয়েছিল ?

সুমিতা মাথা হেঁট কবে— হ্যাঁ।

বিযেতে দানসামগ্রী যা পেয়েছে হিবণ, সেটা মতি মাসিমাব মতো বাগী আব খুঁতখুঁতে মানুষেব কাছেও প্রশংসা পেয়েছে। —না, বেয়াই কিপটেমি কবেনি, বেশ ভাল জিনিসই দিযেছে।

কিন্তু সুমিতা শুনে আশ্চর্য হযে যায়। হিবণ বলে— মিববে কেমন যেন তিনটে স্ক্র্যাচ আছে , আব ফুলদানিটাব পালিশ ম্যাটমেটে।

কিন্তু মেহগনিব অমন চমৎকাব পালঙ্কটা ? তাব মধ্যে তো খুঁত নেই। সেটা যে একটা চমৎকাব জিনিস, এ কথাটা একটু খুশি হযে বলতে পাবে না কেন হিবণ ? একবাব জিজ্ঞাসাও কবেছিল সুমিতা— পালঙ্কটা বাবা নিজে পছন্দ কবে কিনেছেন।

কিন্তু সুমিতাব মুখেব এই খুশিব কথাটা শুনেও, আব চোখেব জিজ্ঞাসাটাকে দেখেও উত্তব দিতে পাবেনি হিবণ।

সববত তৈবি কবতে সুমিতাব দক্ষতাব কথা কে না জানে ? শ্বশুববাডিতেও সুমিতাব সববতেব স্বাদুতা সকলেব প্রশংসা পেযেছে। সববত খেযে একটাও প্রশংসাব কথা শুধু একজন বলতে পাবেনি, সে হলো হিবণ। তবে একটা কথা বলেছে হিবণ — তোমাব চা কিন্তু সুবিধেব নয় সুমিতা।

—কেন ? কি হলো ?

—কখনো দেখছি খুব মিষ্টি, কখনো আবাব একেবাবেই মিষ্টি নয।

মনোজ আসে মাঝে মাঝে। সুমিতা নিজেই চা তৈরি কবে। সে চা খেয়ে মনোজ কোন প্রশংসা কবে না, নিন্দেও কবে না। কিন্তু একটি কথা বলে - আপনাব হাতেব সববত কিন্তু অতুলনীয। আমি জীবনে কখনও এত ভাল সববত খাইনি

সুমিতা হাসে— একটা মাসেব মধ্যে সববত খাওযাব লোভেও তো একদিন এলেন না।

মনোজ হাসে— বেশ তো, বলেন তো বোজই আসবো। দেখি কত সরবত খাওযাতে পারেন।

সুমিতা— আসুন। একটুও ভয় পাই না।

অবশ্য বোজই আসে না মনোজ। কিন্তু, মনে হয, সুমিতা যেন বোজই একটা আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। হিবণকেই তাগিদ দিযে কথা বলে— কই, তোমাব বন্ধু যে আজও এলেন না।

হিবণ গম্ভীব হয়ে বলে— তা আমি কি কবে বলবো ?

হিরণ গান গাইতে পারে ভাল। মাঝে মাঝে নিজেই যেন একটা আশাব উৎসাহে এসরাজ বাজায় আর গান গায়। সুমিতা কাছেই বসে গান শোনে। গান শেষ হবার পব হিরণের চোখ দুটো যেন উৎসুক হয়ে সুমিতার মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় হিবণের মনে একটা

প্রশ্ন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। জানতে চায় হিরণ, গান শুনে কত খুশি হলো সুমিতা।

সুমিতা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়— গান গাইবার সময় তোমার মাথাটা এত দোলে কেন ?

চমকে ওঠে হিরণ। চোখের দৃষ্টিটা যেন তিক্ত হয়ে যায়। আর কিছুই দেখলো না, বুঝলো না সুমিতা, শুধু হিরণের মাথা দোলানোর অভ্যাসটাই সুমিতার চোখে পড়লো।

কিন্তু মনোজের গলার স্বর যে এত ভাঙা-ভাঙা, গান গাইবার সময় মনোজের গলা যে তিন পর্দাতেও চড়তে পারে না, সেটা তো কোন দিন বুঝলো না সুমিতা ? কোন দিনও তো এমন কথা বলল না যে, মনোজের গলার স্বর সুবিধের নয়।

ফটো তুলিয়েছে হিরণ। শহরের সবচেয়ে ভাল স্টুডিওর হাতের কাজ। ফটোতে কোন খুঁত আছে বলে মনে হয় না। খুঁত থাকলেও চোখে পড়বে না। কিন্তু ফটো দেখা মাত্র হেসে ফেলে সুমিতা।

হিরণ বলে— হাসলে কেন ?

সুমিতা বলে— কানটা আবছা হয়ে গিয়েছে।

ঠিকই, দেখতে পায় হিরণ, ফটোর চেহারাটাতে একটা কান সামান্য একটু আবছা হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফটোর নাক মুখ চোখ যে হেসে-হেসে জীবন্ত মূর্তির নাক মুখ আর চোখের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে, এটা কি চোখে দেখতে পেল না সুমিতা ? অদ্ভুত।

কিন্তু একদিনও তো এ কথাটা বললো না সুমিতা, মনোজ একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। চোখে না দেখবার তো কথা নয়। মনোজ যখন গল্প করে আর চা খেয়ে চলে যায়, তখন সুমিতা হিরণেরই কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে— মনোজবাবুর রুচি কিন্তু বেশ ভাল।

—কেন ?

—দেখছো না, কী চমৎকার সিল্কের একটা কামিজ পরেছেন।

সুমিতার মুখের দিকে যেন একটা রুক্ষ বিক্ত আর অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে হিরণ। সে দৃষ্টিতে যেন দুঃসহ একটা জ্বালাও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁপতে থাকে।

৩

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে হিরণ। আজ মনোজের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবে সুমিতা। টিকিট কেনা হয়েই গিয়েছে।

হিরণের চোখের তারা দুটো যেন ক্ষমাহীন একটা আক্রোশে চাপতে গিয়ে কাঁপতে থাকে। —এসব আবার কি আরম্ভ করলে ?

সুমিতা— কি বললে ?

হিরণ— তোমার যে চক্ষুলজ্জা বলেও কোন পদার্থ নেই।

সুমিতা হেসে ফেলে— আমার চোখই নেই, চক্ষুলজ্জা থাকবে কেমন করে ?

হিরণ— তুমি সত্যিই তাহলে সিনেমা দেখতে যাবে ?

সুমিতা— কি আশ্চর্য, তুমি এত রাগ করে কথা বলছো কেন ?

হিরণ— রাগ করে নয়, আশ্চর্য হয়ে কথা বলছি।

—কিসের আশ্চর্য ?

—শত হোক, স্বামীর বন্ধু যতই বন্ধু মানুষ হোক, তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া কোন স্ত্রীর পক্ষে···বেশ একটু বাড়াবাড়ির ব্যাপার হয়ে যায় সুমিতা। তুমি যেও না।

সুমিতাও গম্ভীর হয়— আমি যাব।

হিরণ— না, যেও না।

সুমিতা— কেন ?
হিরণ— ভাল দেখায় না ।
সুমিতা— কেন ভাল দেখায় না ?
হিরণ— একবার বলেছি । না শুনে থাকলে আর শুনতে চেয়ো না ।
সুমিতা— শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি ।
হিরণ— বুঝতে পারবেও না কোন দিন ।
সুমিতা— তুমি বুঝিয়ে দিতে পারবে না ।
হিরণ— ইচ্ছে করলেই পারি ।
সুমিতা— তোমার ইচ্ছেই হবে না ।

চুপ করে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হিরণ । সুমিতার কথাগুলি যেন একরোখা কতগুলি অর্থহীন প্রতিবাদ । আবার হেঁয়ালির মতও মনে হয় । কি যেন বলতে চাইছে সুমিতা, কিন্তু বলতে পারছে না বলেই এলোমেলো করে অন্য কথা বলছে ।

কিন্তু সুমিতা বোধহয় বুঝতে পারছে না, এই এলোমেলো প্রতিবাদ আর তর্কের ভাষা কী সাংঘাতিক বিষের জ্বালা ছড়িয়ে হিরণের মনটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে । স্বামীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এ কী দুঃসাহসের কথা অক্লেশে বলে দিতে পারছে সুমিতা ।

না, বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই । যে নারীর চোখে এত ভুল, সে নারীব মনেও ভুল দেখা দিতে কতক্ষণ ? ভুল এরই মধ্যে দেখা দিয়ে ফেলেছে কিনা কে জানে ?

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অন্য ঘবের দিকে চলে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় সুমিতা । সুমিতা যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে আনমনার মতো দরজার বাইরে গাছপালাগুলিব দিকে তাকিযে আছে । কে জানে কি দেখছে সুমিতা ? কিন্তু সুমিতাব টানা-টানা কালো চোখ দুটো ছলছল করছে । কী অদ্ভুত এই চোখ ! জলে ভরে গিযে সে চোখের সুন্দরতা যেন আবও গভীর হয়ে টলমল কবছে ।

কিন্তু আজ সুমিতার এই সুন্দর চোখ দুটো বোধহয় হিরণের জন্য কোন আশা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পাববে না । সুমিতার চোখ যেন অন্য কারও জন্যে কাঁদছে ।

—ছিঃ । হিরণেব গলার স্বর যেন একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে ধিক্কার দিয়ে ওঠে ।

সুমিতা কোন উত্তর না দিয়ে তেমনই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে । যেন প্রাণপণে মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে সুমিতা । তাই কোন কথা বলতে পারছে না ।

হিরণ বলে— এমন সুন্দর চোখেও এমন ভুল হয় ?
চমকে ওঠে সুমিতা— কি বললে ? কার চোখ ?
—তোমার চোখ ।
—কি করেছে আমার চোখ ?
—তোমার চোখ দুটো শুধু দেখতেই চমৎকাব, কিন্তু· ।

ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় সুমিতা । তারপর হিরণের কাছে এসে আর হিরণের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে । আর সঙ্গে সঙ্গে হেসেও ফেলে— কবে দেখলে, আমার চোখ দেখতে চমৎকার ?

—রোজই দেখছি ।
—কোনদিন তো বলনি ।
—সেটাই বোধহয় ভুল হয়েছে ।
—কিন্তু··· ।
—কি ?

—তোমার চোখ যে আর-একটা ভুল করেছে!

—কি?

—এতক্ষণ ধরে দেখেও বুঝতে পারনি, সুমিতা কার জন্যে কাঁদছে আর কেন কাঁদছে।

হিরণ— কার জন্যে?

সুমিতা— তাহলে এখনও বুঝতে পারনি দেখছি।

হিরণ— তার মানে?

সুমিতা— তার মানে, মনোজের সঙ্গে আমার সিনেমা দেখতে যাবার কোন কথাই হয়নি।

চমকে ওঠে হিরণ— কে বললে? দুটো টিকিট যে দেখলাম।

সুমিতা—হ্যাঁ। আমার আর তোমার টিকিট।

অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে হিরণ— তবে?

সুমিতা— তবে এক কাপ চা নিয়ে আসি। তারপর রওনা হব।

হিরণ— বেশ।

চা নিয়ে আসে সুমিতা। আর, চা খেয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে হিরণ— চল, আর দেরি করে লাভ নেই। আজকের চা-টা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।

বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই মাথার কাপড় টানে সুমিতা। সমরবাবু আসছেন।

হিরণ বলে— সমরের মুখের হাসিটা দেখছো, সত্যিই দেখতে চমৎকার। নয় কি?

সুমিতা হেসে ফেলে—হ্যাঁ।

হিরণ বলে— বাঃ।

সুমিতা— কি হলো?

হিরণ— পরেশবাবুর বাগান থেকে হাসনুহানার গন্ধ ভেসে আসছে।

সুমিতা— হ্যাঁ।

হিরণ— ভারী সুন্দর, চমৎকার মিষ্টি গন্ধ।

শুক্লা নবমী

কোন দিন কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে কখনো এই ভয় হয়নি যে, আমার স্বামীকে অশ্রদ্ধা করবার দুর্ভাগ্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেবে। কিন্তু যা দুঃস্বপ্নের মধ্যেও অসম্ভব ছিল, আজ তাই হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, স্বামীকে অশ্রদ্ধা করছি। না করে পারছি না। সে মন আজ আমার নেই।

সত্যি সত্যি দেবতা বলেই তো একদিন মনে হয়েছিল তাঁকে, আমার এই স্বামীকে, যাঁকে আপনারা আজও বলেন আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু, যিনি আজকাল সকাল বেলায় একটি এবং সন্ধ্যাবেলায় একটি টিউশনি করে নিজের জীবনধারণ করছেন এবং আমাকেও ভাত-কাপড় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।

সকালেই হোক আর সন্ধ্যাতেই হোক, টিউশনি সেরে যখন ক্লান্ত হয়ে বিষণ্ণ ও শুকনো মুখ নিয়ে স্বামী আমার ঘরে ফেরেন, তখন হেঁসেলের দুয়ারে বসে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। হাত-মুখ ধোওয়ার জলটুকু এগিয়ে দিতে অথবা একটা হাতপাখা তাঁর হাতের কাছে তুলে দিতে পারি না। ইচ্ছে করলেও পারি না।

এসব যে খুশিমনে করি, কিংবা করে খুশি হই, তা মোটেই সত্য নয়। স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারি না বলে নিজেকেও যে ক্ষমা করতে পেরেছি, তা নয়। নিজের ওপর বেশ ঘেন্নাই হয়, রাগও করি। মনটা পুড়ে যায়। তবু সেই আগের মতো হাতপাখা নিজের হাতেই তুলে নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। হাসিমুখে কথা বলা দূরে থাক, স্বামী যদি হাসিমুখে আমার দিকে তাকান, তবুও প্রসন্ন হতে পারি না।

পারি না, কারণ আর সহ্য করতে পারি না। আপনারা তো তাঁকে বলেন আইডিয়ালিস্ট, কিন্তু তিনিই তো আমার জীবনটাকে এমন শ্রদ্ধাহীন আর আশাহীন করে দিলেন। আমাকে ভাত-কাপড় দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু দিতে পাবছেন কই ? কেন এমন দশা হলো ? কে এই দশার জন্য দায়ী ?

তিনিই দায়ী। শুধু ভাত-কাপড় কেন, আমাব জন্য কার্সিয়ং-এ একটা সৌখিন বাড়ি করে দেবার সামর্থ্যও তাঁর ছিল ! বিয়ের রাতে বাসর-ঘরে তিনি যখন প্রথম আমার হাত ধরেছিলেন তখন তাঁর হাতে দুটো হীরের আংটি দেখেছিলাম। বিয়ের আগেই শুনেছিলাম, মস্ত বড়লোকের ছেলেব সঙ্গেই আমার বিয়ে হচ্ছে ; শ্বশুববাড়িতে প্রথম এসেও দু' চোখ ভরে প্রমাণ দেখেছিলাম কথাটা মিথ্যে তো নয়, বরং যতখানি ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী সত্য। বাপের এক ছেলে আমার স্বামী, গঙ্গাব ধারে মস্ত বড় তাঁর পৈতৃক বাড়ি। ঘরের আসবাব-পত্রের দামই হবে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর। লাইব্রেরীতে পাঁচ হাজারের চেয়েও বেশী বই, দাম বিশ হাজার টাকার চেয়ে বেশী। লোহার সিন্দুকে এক গাদা কোম্পানীর কাগজ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম আমার স্বর্গীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সোনা আর জড়োয়া গয়নার একটি স্তূপ। ব্যাঙ্কের পাশ-বইও দেখেছিলাম সাত-আটটি !

কোথায় গেল সে সব ? সবই গেছে আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর আদর্শবাদের অনাচারে ছিন্নভিন্ন হয়ে, ধুলো হয়ে, লুপ্ত হয়ে। আজ আমাকে নিয়ে তিনি থাকেন সালকিয়া বাজারের কাছে একটা গলির ভেতরে বিশ টাকা ভাড়ার একটা বাড়িতে, যে বাড়িতে আমার বাপের বাড়ির টেরিয়ার কুকুরটা সাত দিন থাকলেও ঘেন্নায় মরে যাবে।

স্বামীর আমার কোন খারাপ খেয়াল নেই। আপনারা এ বিষয়ে যতখানি নিঃসন্দেহ, আমি তার চেয়ে বেশি। বড়লোকের ছেলে হয়েও মদের বোতল তিনি বোধ হয় জীবনে চোখেও দেখেননি, সিগারেটও খান না, এমনকি জরদা দিয়ে একটা পান খেতেও তাঁর আপত্তি আছে। আর একটা যে সন্দেহ অনেক স্ত্রীই তাঁদের স্বামী সম্বন্ধে না করে পারেন না, সে সন্দেহের লেশমাত্রও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না আমার স্বামীর চরিত্রে। শুধু আমি কেন, আপনারাও সবাই জানেন, পরিচিতা বা অপরিচিতা মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনায় ও আচরণে তিনি কত সংযত আর কত শ্রদ্ধাশীল।

কিন্তু সবচেয়ে প্রগল্‌ভ তাঁর আদর্শবাদ ! এক একটা দেশসেবা, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-উন্নয়ন, স্বদেশী এবং হেন-তেন নানা প্রকার আদর্শের উৎসাহে বিরাট পৈতৃক সম্পদের সব শেষ করে দিয়ে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন এবং কি করছেন দেখুন !

এতটা আমি আশঙ্কা করিনি। এখনও স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা নেই, প্রথম প্রথম স্বামীর সব স্বদেশী ব্রত আর দেশসেবা এবং রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধই হয়েছিলাম। দেবতার মতই তো তাঁকে মনে হতো। মনে হতো, তাঁর সুন্দর চেহারার চেয়ে তাঁর মনের ভেতরটা আরও কত বেশি সুন্দর।

দেখেছিলাম একদিন, বিয়ে হবার মাস কয়েক পরে, মাঘমাসের শীতের রাত্রে হঠাৎ গায়ের লেপ টেনে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন— ললিতা, দেখ তো আমার টেবিলের দেরাজে কিছু টাকা-পয়সা আছে কি না ?

দেখে এসে বললাম— আছে, তিনশো টাকা আছে।

—দাও।

দেরাজ থেকে টাকা এনে দিলাম। স্বামী তখুনি বের হয়ে গেলেন। ঘরের জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। রাগ হচ্ছিল, চোখে জল আসছিল এবং একটা সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঘেন্নাও আসছিল মনের ভেতর। বড়লোকের ছেলে টাকা নিয়ে মাঝরাতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়, এ কি সত্যিই সেরকম বড়লোকেব ছেলে ? আমার কপালে কি সেই অভিশাপ এসে লাগলো ?

শেষরাত্রে ফিরে এলেন স্বামী, আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু। নিজের থেকেই বললেন— নিজের ওপর কেমন একটা ঘেন্না এল হঠাৎ, তাই না গিয়ে পাবলাম না।

ব্যাপারটা এই। শীতের রাতে লেপ গায়ে দিয়ে আরামে শুয়েছিলেন স্বামী, হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে পড়লো, বাগ্‌দি পাড়ায় বাচ্চা বাচ্চা দুধের ছেলেগুলো এই শীতে শুক্‌নো কলাপাতার গাদার ওপর ঘুমিয়ে রয়েছে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরবার সময় নিজের চোখেই এই দৃশ্যটা তিনি দেখে এসেছিলেন। মনে পড়তেই আর থাকতে পারলেন না, টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে বিনয় সাহার ঘুম ভাঙিয়ে, তার দোকান থেকে এক গাদা কম্বল কিনে নিযে বাগ্‌দিপাড়ায় ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিয়ে তার পরে ফিরে এলেন।

স্বামী হাসছিলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের ভেতরে কি যে হচ্ছিল তা আজও আমার মনে আছে। ইচ্ছে করছিল, তাঁর বুকের ভেতর মুখ আর চোখ গুঁজে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, যেখানে লুকিয়ে আছে এমন সুন্দর সোনাব মতন একটা মন। ইচ্ছে করছিল, পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করি। কিন্তু আমাকে আমার মনের আনন্দ আর আবেগ প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তিনিই আগে আমার হাত ধরে প্রশ্ন কবলেন— কিন্তু তুমি এবকম জেগে বসে আছ কেন ?

কি মমতা ছিল তাঁর সেই অনুযোগের মধ্যেও ; কিন্তু আজ কই ? আজ আমি যখন জ্বরভরা গায়ে এক বাটি পান্তা ভাত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কাঙালের মতো শুধু পোড়া লঙ্কা দিয়ে মেখে গিলে-গিলে খেতে থাকি, তিনি একবার তাকিয়ে দেখেন শুধু। এক জোড়া শুক্‌নো ঠাণ্ডা আর বেদনাহীন চোখ। তাকিয়ে দেখেই তাঁর ছেঁড়া খদ্দরের কামিজটা গায়ে চড়িয়ে টিউশনি করতে অথবা কোথায় কোন্ এক আদর্শ করতে বের হয়ে যান। আর আমি একা ঘরে বসে আমার জীবনের অভিশাপের হিসেব করতে থাকি।

আমার স্বামীর ওপর আমার এই অশ্রদ্ধাকে আপনারাও হয়তো ক্ষমা করতে চাইবেন না। বলবেন, আমি বড় অসহিষ্ণু, স্বামীর ওপর আমার সমবেদনা নেই। আপনারা বলবেন, চারুবাবুও তো কিছু স্বর্গসুখ উপভোগ করে বেড়াচ্ছেন না। তিনিও তো আপনার মত মাঝে মাঝে পান্তা ভাতেই ক্ষুধা মিটিয়ে নিচ্ছেন, এবং তার জন্যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন না। আপনারাও আদর্শের দোহাই দিয়ে বলবেন— চারুবাবুর স্ত্রী ললিতার মনটা ঠিক সহধর্মিণীর মন নয়। স্বামীর জীবনের দুঃখের ভাগ সমানভাবে গ্রহণ করতে যে স্বীকার না করে, তাকে কি··· ।

জানি, তাকে সহধর্মিণী বলা যায় না। কিন্তু আপনারা সে খবরটা জানেন কি, যে খবরটা কোন খবরের কাগজে বের হয়নি, কিংবা আমি ও আমার স্বামী কোনদিনও বন্ধু বা প্রতিবেশীর কাছে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারিনি ?

আমার পল্টু মারা না গেলে আজ তার বয়স হতো তের বছর। কিন্তু আপনাদের এই কলকাতা শহরেই তিন্ বছর আগে, ঠিক যেদিন আপনারা নানা জায়গায় বুদ্ধ পূর্ণিমার অনুষ্ঠান ও উৎসব করছেন, ঠিক সেই দিন আমার কোলের ওপর শুয়ে থেকেই সে চোখ বন্ধ করলো।

স্বামী আমার বুদ্ধ-পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা সেরে ঘরে ফিরে এসেই দেখলেন, পণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে চিরকালের মতো। আপনাদের চারুবাবুকে অনেক উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিয়ে বিদায় নিল পণ্টু। আর ডাক্তার ডাকতে হবে না, ডাক্তারের ফী যোগাড় করার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না। শূন্য পকেট নিয়ে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে বৃথা আর ওষুধ অন্বেষণ করে ফিরতে হবে না।

পণ্টুর বয়স তখন দশ বছর। ছেলেটা ভুগছিল দু' বছর থেকে, যেদিন সালকিয়ার এই গলিতে এসেছি সেইদিন থেকে। আপনারা জানেন না, পণ্টুর জন্য ডাক্তার যে টনিক আর ফুডের ফর্দ করে দিয়েছিলেন, দু' বছরের মধ্যে মাত্র একটি মাস নিয়মমত তাকে সেই ফুড আর টনিক খাওয়াতে পেরেছিলাম এবং মাত্র এই একটি মাসের চিকিৎসার খরচ যোগাড় করতে গিয়ে আমার গায়ে সোনার চিহ্ন বলতে শেষ যে বস্তুটা ছিল, এক জোড়া রুলি, তা'ও বিক্রি করে দিয়ে টাকা যোগাড় করেছিলাম।

এক কথায় বলতে পারি, আমার পণ্টুর চিকিৎসা হয়নি। ডাক্তার বার বার বলেছিলেন—পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান ছেলেকে, নইলে বিপদ হবে। কিন্তু আমার আইডিয়ালিস্ট স্বামী ছেলের জন্য দৈনিক এক ছটাক ছানাও যোগাড় করতে পারেননি। টাকার জন্য চুরি করতে পারেননি। কিন্তু ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং ধার পাননি। পণ্টুও আমার দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো।

আপনারা দেখেননি আমার পণ্টুকে। হাসপাতালের প্রসূতি-সদনেব রিপোর্ট খুঁজলে এখনো দেখতে পাবেন, যে সদ্যোজাত শিশুটিব দেহের ওজন রেকর্ড ওজন বলে লেখা রয়েছে রিপোর্টে, সেই শিশুটি হলো আমারই পণ্টু। দু-বছরের মধ্যে এমন সুন্দর হাসি-খুশি, দুরন্ত রাজহাঁসের মতো নরম নধর আমার পণ্টু দেখতে দেখতে জিরজিরে একখানা হাড়মাত্র হয়ে গেল। ওষুধ পাইনি, ফুড পাইনি, এক ছটাক ছানাও পাইনি— পণ্টুকে শুধু সাগুব জল খাইয়ে আর সরষের তেল মাখিয়ে আমি দুটো বছর মরতে দিইনি। কিন্তু বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন নিজের থেকেই চলে গেল পণ্টু।

আমি বলি, আমার স্বামীর ঐ আদর্শবাদই আমার পণ্টুকে মেরেছে। ক্ষমা করতে পারি না তাঁকে। ভুলতে পারবো না, যে মানুষ মাঘ মাসের বাত্রে উঠে বাগদিপাড়ায় শীতার্ত ছেলেগুলির গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিয়ে এসেছে, সেই মানুষের ছেলে মরে গেল বিনা ওষুধে, বিনা খাদ্যে। পঙ্গুর মতো, বোবার মতো, আমার স্বামী মরা পণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দু' চোখ জলে টলমল করছিল, কিন্তু আমি দেখছিলাম, কী কুৎসিত ও নির্মম মূর্তি। ওর আদর্শবাদের চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই সংসারে। ওর ত্যাগের চেয়ে বড় মূর্খতা আর কিছু নেই ত্রিভুবনে।

এখন হয়তো আপনারা কিছুটা বুঝতে পারছেন, কেন আমি আমার স্বামীর সম্বন্ধে এমন করে হৃদয়হীনের মতো কথা বলছি। আরও আশ্চর্যের কথা এবং আমার পক্ষে তো একেবারেই অসহ্য, তিনি এখনো দেশের শুভাশুভ নিয়ে, মহাপুরুষদের জীবনকথা নিয়ে, আরও অনেক-রকম তত্ত্ব নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের কাছে বিবেকানন্দ ও গান্ধীর প্রেম সেবা অহিংসা ও ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসে তিনি এখনো উপবাস করেন এবং আবির্ভাব দিবসে গঙ্গাস্নান করে এসে গীতা পড়েন এবং দু-একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে বক্তৃতাও করে আসেন। শুনেছি তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়, কারণ তাঁর বক্তৃতায় নাকি একটা আন্তরিকতার আবেদন থাকে।

আপনারা যাই বলুন, আমার কাছে এসবই ভুয়ো, অর্থহীন, একটা অভিশাপ। অনেক সহ্য

করতে পারি, এতটা সহ্য করতে পারি না।

অনেক দিন কেটে গেল। যতদিন না মরি ততদিন বেঁচে থাকতে হবে, এ ছাড়া জীবনেব আর কোন অর্থ খুঁজে পাই না। ছেলেকে হারিয়েছি, আর স্বামী বলে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন আদর্শবাদী : দু'বেলা টিউশনি করে যে সম্পদ নিয়ে আসেন তাতে সাপ্তাহিক রেশনটা শুধু নিয়মিত ঘরে আসে। কিন্তু আজকাল দেখে একটু আশ্চর্য লাগছে, স্বামী আমার যেন একটু চালাক হয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝে ভাবি, এই চালাকি কাণ্ডজ্ঞানটুকু যদি আগে থাকতো!

আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর অনেক ভক্ত আছে। আজকাল দশটা বাজলেই তিনি আর ঘরে থাকেন না, স্নান করেন না, ভাতও খান না। বলে যান— তুমি রান্নাবান্না করে খেয়ে নিও ললিতা। আমার জন্যে চাল নিও না।

প্রথমে বুঝতে পারিনি, ব্যাপারটা কি। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলাম।

ঠিক দশটা বাজলেই তিনি তাঁর কোন ভক্তছাত্রের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং কখনো সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব, কখনো রাজনীতি, কখনো বুদ্ধ-খ্রীস্ট-বিবেকানন্দ-গান্ধীর আদর্শ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। আলোচনা করতে করতে ঘণ্টা দুই-তিন-চার পার হয়ে যায়। তাঁর ভক্ত ছাত্র অথবা ছাত্রের বাবা কিংবা মা অনুরোধ করেন— অনেক বেলা হয়ে গেছে চারুবাবু, এখানেই স্নান করে দুটো খেয়ে নিয়ে…।

আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু মৃদু হেসে একটু আপত্তির ভঙ্গী করেন, কিন্তু পরমুহূর্তে রাজী হয়ে যান— হ্যাঁ, বেলা অনেক হয়েছে, এবং আপনারা যখন না খাইয়ে ছাড়বেন না, অগত্যা বাধ্য হয়েই…।

স্নান করে ছাত্রভক্তের বাড়িতে উদরপূর্তি করে পাঁচ রকম অন্নব্যঞ্জনের আস্বাদ গ্রহণ করে ঘরে ফিরে আসেন স্বামী। লক্ষ করেছি, তাঁর স্বাস্থ্যটা আগের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে উঠছে। যে ফতুয়াটা একেবারে ঢিলে হয়ে তাঁর কাঁধের হাড়ের সঙ্গে ঝুলতো, সে ফতুয়াটা এখন গায়ের সঙ্গে আঁটসাঁট হয়ে লেগে রয়েছে।

ভালই, তবে এই নতুন আদর্শবাদটা এতদিন চাপা ছিল কেন? যদি প্রথম থেকেই এইরকম বুদ্ধি রেখে তিনি আদর্শের সাধনা করতেন, তবে কি আর আজ আমাকে এমন শূন্য হয়ে, ছেলে হারিয়ে, স্বামীর ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে, এমন একটা অভিশপ্ত জীবনের বোঝা নিয়ে পড়ে থাকতে হতো? একটু বুদ্ধি রেখে, একটু সাবধান হয়ে আদর্শবাদী হলে কি আজ গঙ্গার ধারের বাড়ি, বাড়ির ফার্নিচার, এতগুলি ব্যাঙ্কের পাশ-বই, লাইব্রেরী আর সিন্দুকের ভেতরে গয়নার স্তূপ— সবই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেত?

আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু এতদিনে পয়সার মর্যাদা বুঝেছেন, এবং পয়সা বাঁচাবার কায়দাটুকুও শিখেছেন। উন্নতি হয়েছে তাঁর। কিন্তু…কিন্তু ভেবে পাই না, শ্রদ্ধা কেন আসে না? এখনো তো পারলাম না, আগের মতন তাঁর গা ঘেঁষে বসে তাঁর গায়ে পাখার বাতাস দিতে। উদ্বেগ হয় না, যদি বাড়ি ফিরতে রাত করেন। আমার মমতাহীনতার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তাঁর শরীরটা এত ভাল হয়ে উঠেছে দেখেও আমি সুখী হতে পারছি না। কি যেন মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে।

কিছুদিন আগেও তো তাঁকে দেখেছি, কলতলায় হাত-মুখ ধুচ্ছেন। দেখে রাগ হয়েছে। নিজের মূর্খতার দোষে সব-হারানো ও প্রবঞ্চিত একটা মানুষের মূর্তি। কিন্তু আজকাল রাগ হয় না। বরং লজ্জা পাই। হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলে মনে হয়, যেন একজন অচেনা পুরুষ ঘরে এসে ঢুকলো।

বড়লোকের ছেলে, দু' আঙুলে হীরের আংটি, সেই অনেকদিন আগেকার এক সুন্দর তরুণের মূর্তিটি আমার মনে আছে— আমার স্বামী, আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু। আর সেদিনও দেখেছি, ছেঁড়া খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠান সেরে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন— সেও তো আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু। কিন্তু আজ তো আমার দু' চোখের দৃষ্টিতে অভ্যস্ত সেই পরিচিত মূর্তির কোনটিই দেখতে পাই না। ছাত্র-ভক্তের বাড়িতে পেটপুরে সুখাদ্য খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট চারুবাবু ঘরে ফেরেন। ভেঙেছে তাঁর সেই জোর, গেছে তাঁর সেই চোখের জল। হীরের আংটি গেছে, কিন্তু মৃত ছেলের দিকে তাকানো বুক-নিংড়ানো বেদনার অশ্রুজলও গেছে। অতীতকে ভুলে গেছেন, দু'বেলা পেটভরা খাওয়ার লোভ ও কৌশলবাদের কাছে হারিয়ে গেছে তাঁর বলিষ্ঠ দারিদ্র্যের আশীর্বাদ।

আজ বুঝতে পারছি, সত্যি সত্যি মনের গোপনে স্বামীর জন্যে যে এককণা ভালবাসার সোনা ছিল, এতদিনে আমার গায়ের সোনার শেষচিহ্ন রুলি দু' গাছির মতো তাও শেষ হয়ে গেল। আপনাদের কাছে এখনো হয়তো আইডিয়ালিস্ট সেজে ঘোরাফেরা করেন আমার স্বামী, কিন্তু আমি তো জানি, কি সর্বনাশ হয়ে গেছে এমন কঠিন একটা মানুষের আত্মার। একবার নয়, দু'বার নয়, কতবারই তো দেখেছি, মরতে ভয় করেন না আমার স্বামী। অনেক ঘটনার কথা জানি, অনেক ঘটনার কথা শুনেছি। জলে-ডোবা মানুষকে তুলতে গিয়ে, বসন্ত রোগীর সেবা করতে গিয়ে, সত্যাগ্রহের সময়ে ঘাতক সৈনিকের উদ্যত রাইফেলের সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে— অনেকবার জীবন বিপন্ন করেছেন তিনি। সেই মানুষ আজ বাঁচতে চাইছেন, প্রাণের জন্য কি অদ্ভুত দরদ! বিনা ওষুধে মরেছে যাঁর ছেলে, তবু চুরি করতে পারেননি যিনি, তিনি আজ কায়দা করে, কি সূক্ষ্ম কৌশলে নিজের বিবেক আর আত্মসম্মানের ঘরে সিঁদ কেটে, প্রতিদিন যেচে আর সেধে পরের বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছেন।

আমার ঘরে চাল বাঁচছে, পয়সাও বাঁচছে, রান্নাবান্নার হাঙ্গামাও কমেছে, কিন্তু তবু তো ভাল লাগছে না। আমি বেঁচে আছি মরবার জন্যে, আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু বেঁচে রয়েছেন কিসের জন্য! এমন মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারি, এবং আগের মতো ভালবাসতে পারি, এমন শক্তি আমার নেই।

আগে রাগ করেছি তাঁর ওপর, কিন্তু তবু এই রাগের মধ্যেই ভালবেসেছি আর ভয় করেছি, ঐ আদর্শবাদীর কঠিন মেরুদণ্ডটিকে। কষ্ট সহ্য করতে পারিনি যখন, তখনই শুধু অশ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু এখন···।

এখন আমার দিন যাচ্ছে এই ভাবেই। যখন স্বামী শুয়ে থাকেন ঘরের ভেতর, আর আমি বসে থাকি রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে, তখনও মনে হয় এ পৃথিবীতে আমি একা হয়ে গেছি, সব শূন্য হয়ে গেছে। আমার কপালে সিঁদুরের দাগ রয়েছে, কিন্তু মনেই পড়ে না যে আমার স্বামী, অর্থাৎ আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু, আমার এত কাছে রয়েছেন। যে সান্নিধ্য পৃথিবীর সব ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করতাম একদিন, তার আর কোন মূল্য নেই। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে না তাঁর কাছে। শুনতে আপনাদের খুব খারাপ লাগবে তবু না বলে থাকতে পারছি না। সময় সময় মনে হয়, সত্যি আমার স্বামী নেই। এই তো আজ আবার বেশ বেলা করে ঘরে ফিরেছেন, এবং চৌকির ওপর শুয়ে পান চিবোচ্ছেন আমার স্বামী। কিন্তু পরের বাড়ি গিয়ে যেচে ভাত খেয়ে, তার ওপর আবার পান খেয়ে ঘরে ফিরতে পারে, এমন একটা চরিত্রকে তো কখনো আমি আমার স্বামীর মধ্যে দেখিনি।

এই তো আমার জীবনের চেহারা— শূন্য হয়ে গিয়েও জ্বলছি। আজ বুঝতে পারি, এতদিন অশ্রদ্ধা করেছিলাম আমার স্বামী নামে মানুষটিকে নয়, তাঁর আদর্শবাদকে। আজ তাঁর

সেই নিষ্ঠুর আদর্শবাদ নেই, এবং স্বামীর ওপর খুশি হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু কই, খুশি হওয়ার দূরে থাক্‌, আমার স্বামী আছে বলেই মনে হয় না। এ কী ভয়ানক জ্বালা, নিজেকে ধিক্কার দিই, সইতে পারি না।

এতদিনে আমার স্বামীর অর্থাৎ আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর মেরুদণ্ড ভেঙেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার এই দুঃখদীর্ণ ও অভিশপ্ত জীবনে যে একটা মাত্র অহংকার শেষ পর্যন্ত ছিল, তাও আজ চূর্ণ হয়ে গেছে। সালকিয়ার গলির এই জীর্ণশীর্ণ ও আলো-বাতাসহীন গৃহজীবনকেও সহ্য করেছি। আমার কোলের ওপর শুয়ে থেকেই ছেলে আমার চিরকালের মতো চোখ বন্ধ করলো— তাও সহ্য করেছি। আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু ছেঁড়া কামিজ গায়ে দিয়ে টিউশনি করতে বের হয়ে গেছেন, তা'ও সহ্য করেছি। সহ্য করতে কষ্ট হয়েছে তা কেউ জানে না। কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারি না। এক এক সময় ভাবি— কেন ঘরে ফিরে আসেন আপনাদের চারুবাবু? পরের বাড়ির খাট-পালঙ্কে একটা ভাল বিছানার ওপর বেহায়া আরামে শুয়ে থাকলেই তো পারেন। কেন আবার এই ছেঁড়া তোষকের ওপর ঐ বেহায়া শরীরকে শোয়াতে আসা?

২

চলছে দিন, যদিও একে চলা বলে না। আজ বোধহয় শুক্লা নবমী। যদিও শ্রাবণ মাস, তবুও আকাশে ঘনঘটা নেই এবং সন্ধেটাও এখনো শেষ হয়নি। রান্নাবান্না করিনি। উনি বাড়ি না আসা পর্যন্ত রান্না চড়াই না, কাবণ, আজকাল আবার রাত্রি বেলাটাও কোথায় কোন ভক্তছাত্র, বড়লোক আত্মীয়, খুব চেনা বা অল্পচেনা বন্ধুর বাড়িতে এবং বলতে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে, শিয়ালদা স্টেশনে উদ্বাস্তুদের রিলিফ শিবিরেও ঢুকে পড়ে এবং ভাত খেয়ে পরিতৃপ্ত মনে ঘরে ফেরেন। তাই সন্ধ্যা বেলাটা আমি আর রান্না চড়াই না। দু'মুঠো চাল-ডাল জলে ভিজিয়ে রাখি, আর হেঁসেলের চৌকাঠের কাছে বসে প্রেতিনীর মতো সন্ধের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সেই ভেজানো চাল-ডাল চিবোই। কারণ আমাকে বাঁচতে হবে যতদিন না মরে যাই।

কলতলায় নবমীর চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। মনেও পড়েছে, আজকের দিনটা হলো আমাদের বিয়ের দিন। চৌকাঠের কাছে বসেছিলাম, কিন্তু মুহূর্তের মনের ভুলে যেন অন্য একটা পৃথিবীতে আর অন্য একটা যুগে চলে গেলাম। শ্রাবণের নবমী, চারদিকে ধূপ এবং চন্দনের গন্ধ, শাঁখও বাজছে। লোকের ভিড়। কত হাসি আর কলরব। উঠোনের ওপর আলপনা। সমস্ত জগৎ-সংসার আমাকে হুলুধ্বনি দিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে একটি সুন্দর মুখের সামনে তুলে ধরলো। ধন্য হলাম, জীবন আমার অমৃতেব স্পর্শ পেল সেই দুটি স্মিত চক্ষুর দৃষ্টিতে।

শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন আপনাদের চারুবাবু। আমার দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কী অদ্ভুত শুকনো হাসিহীন ও প্রাণহীন একজোড়া চোখের দৃষ্টি— এ কি সেই চোখ? মুহূর্তের মধ্যে আমার শুক্লা নবমীর চাঁদ ঐ নোংরা কলতলায় আছাড় খেয়ে মরে গেল।

শুনতে পেলাম, এবং বুঝতে পারলাম, বমি করছেন স্বামী। শুনেছিলাম, বড়লোকের ছেলেরা রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে বমি করে। কেন করে তাও শুনেছিলাম। তবে কি স্বামী আমার আবার নতুন করে বড়লোক হলেন? আগেও তো বড়লোক ছিলেন, কিন্তু তখন তো এভাবে রাতের বেলা ঘরে ফিরে বমি করেননি।

যাই হোক্, কিছুই আশ্চর্য নয়। বড় লোকের এঁটো খেয়ে বাড়ি ফিরলেও বোধহয় বমি করতে হয়। কোথায় গিয়ে কি খেয়ে এসেছেন জানি না। হয় গুরুভোজন হয়েছে, নয় বড়লোকের এঁটো গেলাসের কোন ঘৃণ্য বস্তু পান করে এসেছেন।

—ললিতা! আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু ডাকলেন আমাকে। —বড় কষ্ট হচ্ছে ললিতা, একবার কাছে এস।

স্বামীর কথা শুনতে পেলাম, বমি করছেন আবার, তাও শুনতে পেলাম। কিন্তু মাপ করবেন আপনারা, আমার নির্মমতার কথা শুনে রাগ করবেন না, স্বামীর ডাক শুনেও আমি তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। প্রচণ্ড একটা ঘৃণা এসে আমার সব শক্তি, বিবেচনা, কর্তব্যবুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান লুপ্ত করে দিল।

স্বামী নিজেই উঠলেন। কলতলায় গিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। জল তুলে নিয়ে এসে নিজেই ঝাঁটা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করলেন। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে রইলেন।

আমি শুয়ে রইলাম হেঁসেলের দাওয়ায়। আমি বুঝতে পারলাম, সত্যিই স্বামী নয়, যেন একটা অপরিচিত পুরুষ এসে ঘরের ভেতর শুয়ে রয়েছে!

নিজের ওপরেও কম ঘেন্না হয়নি। ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের এই চোখ-মুখের ওপর এক শিশি অ্যাসিড ঢেলে দিই, কদর্য ও কুৎসিত হয়ে যাক্ ইহজীবনের মতো, কেউ যেন আর চিনতে না পারে ললিতাকে— বাপ-মা'র আদুরে মেয়ে আর আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর সেই প্রাণের জিনিস ললিতাকে।

৩

আপনাদের আইডিয়্যালিস্ট চারুবাবুর আদর্শ চুলোয় গেছে, আর ললিতার ভালবাসাও শ্মশানে গেছে। সালকিয়ার গলিতে একটা ঘরে থাকে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। এ ছাড়া আর আমাদের জীবনের অন্য কোন পরিচয় নেই।

এক এক সময় ভাবি, মরবো তো শীগ্‌গির, খুব বেশি দেরি নেই। শরীরের সমস্ত হাড়ে কিরকম একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে আজ মাস তিনেক হলো। অসহ্য ব্যথা, মাঝে মাঝে মূর্ছা। যখন মূর্ছা ভাঙে, তখন দেখি যে কলতলায় কিংবা উনোনের কাছে পড়ে আছি।

মরবো, একথাটা ভাবতে আনন্দ পাই না। কারণ যেভাবে মরলে হাসিমুখে মরতে পারতাম, সে সুযোগ নেই। জীবনের সেই শুক্লা নবমীর প্রথম উৎসবের দিনটিতে, যেদিন আপনাদের চারুবাবুকে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিনও যদি একটি কথাও না বলে তাঁর চোখের সামনে মরে যেতাম, ভালই লাগতো বোধহয়। কিন্তু আজ আর তেমন সুখের মরণ কল্পনা করতেও পারি না। স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরবার সাধ আর নেই।

বোধহয়, খুব বেশি নিষ্ঠুরের কথার মতো শোনাচ্ছে আমার কথাগুলি। কিন্তু না বলে থাকতে পারছি না। মরবো তো ঠিকই, কিন্তু মরবার সময় আপনাদের চারুবাবুকে কাছে পাব কি? কাছে থাকলেও তিনি আমার মাথাটা কোলে তুলে নেবেন কি? সবচেয়ে বড় ভয়, স্বামীর কোলে মাথা রাখতে আমার ভাল লাগবে কি?

আজ হাড়ের ব্যথাটা বড় বেশি বেড়েছে। স্বামী চলে গেছেন সকাল বেলায় টিউশনি করতে। আজ আর আমি রাঁধবো না, রান্না করার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই। আসল কথা হলো, রাঁধবার মতো আজ ঘরে কিছুই নেই, রেশন আনা হয়নি। স্বামীকে রেশন আনতে বলেছিলাম, তিনি বললেন— টাকা নেই। বলেই বের হয়ে গেলেন।

শুয়েছিলাম হেঁসেলের চৌকাঠের কাছে। বেলা হয়েছে। বাসনওয়ালা হাঁক দিয়ে নতুন বাসন ফিরি করতে বের হয়েছে, শুনতে পাচ্ছি। কলতলায় কাকের দল মিছামিছি এসেছে,

এককণা ভাতের দানাও কলতলায় নেই।

কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না। মুখের ওপর রোদ পড়তেই উঠে বসলাম। বুঝলাম, দুপুরও পার হয়ে গেছে। ভাবছি, স্নান করবো, খোঁপা ভেঙে চুল এলিয়ে দিয়ে, গায়ের আঁচলটা নামিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে রোদের মধ্যে বসলাম তেলের বাটি নিয়ে।

হঠাৎ স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। চমকে উঠলাম। আঁচলটা গায়ে জড়াবারও সময় পেলাম না। রাগে গা জ্বলে উঠলো। বলতে যাচ্ছিলাম— বের হও, এদিকে এস না এবং সত্যি সত্যি দু' চোখের দৃষ্টি বিষিয়ে নিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

স্বামী তাঁর কাঁধের ওপর থেকে ছেঁড়া চাদরটা তুলে নিয়ে দাওয়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন— কুসংস্কার, যত সব কুসংস্কার!

আমার মুখে যে ধিক্কারের ভাষাটা এসেছিল, সেটা আর বেজে উঠলো না। স্বামীর চিৎকারে বাধা পেলাম। কিন্তু কিসের কুসংস্কার?

স্বামীর চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক রকমের, মুখটা শুকনো, যেন একটা জ্বরের জ্বালায় ছটফট করছেন। চেঁচিয়ে বললেন— টাকা আছে?

শুনে ঘেন্না হলো। উত্তর দিলাম না। কিন্তু তিনি তেমনি চেঁচিয়ে বললেন— সোনা-টোনা কিছু আছে? মনে মনে হাসলাম। কথা বললাম না।

কতক্ষণ চুপ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম, তা জানি না। স্বামীও নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। লোকটা সামনে থেকে এখনো সরে যাচ্ছে না, বিরক্ত হয়েই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

শিউরে উঠলাম। তাঁর দু' চোখে বড় বড় দুটো জলের ফোঁটা চিক্‌চিক করছে। ঠিক এমনি ভাবেই তাকিয়েছিলেন তিনি সেদিন পল্টুর মুখের দিকে —যেদিন পল্টু নিষ্প্রাণ হয়ে আমার কোলের ওপর শুয়েছিল।

কথা বললাম। জিজ্ঞেসা করলাম— কি হয়েছে? স্বামীও কোন উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কলতলায় গিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে নিলেন।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম, আপনাদের চারুবাবু এতদিন পরে আবার কাঁদেন কেন? কি এমন করুণ দৃশ্য দেখলেন যে ঐ চোখে আবার জল দেখা দিল? তবে কি তিনি এতদিন পরে দেখতে পেয়েছেন তাঁর ললিতাকে, তাঁর শুক্লা নবমীর চাঁদ আজ রোগজীর্ণ ক'খানা হাড় নিয়ে সালকিয়ার গলিতে স্যাঁতসেঁতে ঘরের দাওয়ায় কিভাবে পড়ে আছে। কিন্তু আমি তো এখনো মরিনি, অমন করে জলভরা চোখে তাকাবার দরকার কি?

বোধহয় নিজের মনের দুর্বলতা আর মোহ নিয়ে বৃথা একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। স্বামী আমার একমুহূর্তেই সে স্বপ্ন ভেঙে দিলেন।

বললেন— কিছু টাকা যে আমার এখনই চাই।

—কত টাকা?

—অন্তত দশ টাকা?

—নেই।

—কত আছে?

—এক টাকা।

—তাতে হবে না। আরও চাই।

—নিয়ে এস।

—কোথা থেকে আনবো?

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি— নিয়ে এস ভিক্ষে করে কিংবা চুরি করে। কী এমন কঠিন কাজ।

আমার চিৎকারের প্রত্যুত্তরে চিৎকার করলেন না স্বামী। শান্তভাবেই বললেন— অন্তত আট-দশটা টাকা না হলে হয় না। কি উপায় হতে পারে বলো?

বললাম— ঐ যে পড়ে রয়েছে তোমার সম্পত্তি, বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে এস।

হেঁসেলের ভেতরে পেতল-কাঁসার থালা-ঘটি-বাটিগুলি দেখিয়ে দিলাম।

বাইরের রাস্তায় ঠিক সন্ধিক্ষণ বুঝে বাসনওয়ালাও হাঁক দিচ্ছিল। আপনাদের চারুবাবু আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে কতগুলি বাসন তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন এবং বাসনওয়ালার কাছে বেচে দিয়ে আটটা টাকা নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলেন।

সমস্ত ঘটনাটা একটা হেঁয়ালির মতো লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। আপনাদের চারুবাবুকে এতটা বিচলিত হতে, কিংবা চিৎকার করে কথা বলতে এর আগে আমি কখনো শুনিনি।

তিনিই এ হেঁয়ালি পরিষ্কার করে দিলেন। বললেন— যত সব কুসংস্কার। গিয়েছিলাম নীতুদের বাড়ি। কিন্তু দেখলাম নীতুদের বাড়িসুদ্ধ লোক উপোস করছে, কারণ আজ গান্ধীজীর মৃত্যুদিন। আজ ওদেব বাড়িতে রান্নাবান্না কিছুই হয়নি। যত সব কুসংস্কার।

রহস্যটা এতক্ষণে স্বচ্ছ হলো। নীতু হলো আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর একজন ভক্তছাত্র। আজ টিউশনি সেরে নীতুদের বাড়িতে দুপুর বেলায় হাজির হয়েছিলেন। প্রতিদিন যে কৌশলে পরের বাড়ি খেয়ে ফেরেন, সেই কৌশলের সাধনা করতেই সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেখলেন, তাঁর আদর্শে ও উপদেশে অনুপ্রাণিত নীতু আর নীতুর বাড়ির সবাই উপোস করে গান্ধী তিরোভাব দিবস পালন করছে। ব্যর্থ হয়ে, লোভী ও ক্ষুধার্ত আইডিয়ালিস্ট আজ ফিরে এসেছেন ঘরে। কিন্তু যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আজ তাঁকে খেতেই হবে, আজ আরও বেশী করে খাবেন। মানুষেব কুসংস্কার আজ আর সহ্য করতে পারছেন না আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু। মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসে উপোস করা একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কি? নীতুদের সঙ্গে অনেক তর্ক করে ঘরে ফিরেছেন চারুবাবু। নীতুরাও একটু আশ্চর্য হযে গেছে।

টাকার দরকার এই জন্যেই। চারুবাবু আজ আরও বেশি করে খাবেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আজ মরিযা হয়ে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর চোখে পাগলের দৃষ্টি, গায়ে যেন দুঃসহ জ্বরের জ্বালা এবং কথায় এক লোভী ও ক্ষুধার্ত জীবেব ভয়ংকব কাতরানি।

স্বপ্ন আমার ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তাঁর দিকে তাকাতে গিয়ে ঘেন্নায চোখ জ্বলে উঠলো।

তিনি কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং ফিরে এলেন বাজার থেকে একগাদা খাদ্যবস্তু কিনে নিয়ে— মাছ, কপি, সন্দেশ, ছানা, রাবড়ি, দই, সরু চাল, সোনা মুগের ডাল।

ব্যস্তভাবে বললেন— তাড়াতাড়ি রান্না চডিযে দাও। আমি খেয়েই একবার বের হব। অনেক কাজ আছে।

বিধাতা যদি আজ এসে আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে এই হুকুম দিতেন— থালায় আর বাটিতে বিষ সাজিয়ে নিজের হাতে স্বামীকে খেতে দাও, তাহলেও বোধহয সেকাজ এত কঠিন মনে হতো না, যত কঠিন মনে হচ্ছে এই মাছ আর কপি রেঁধে স্বামীকে খাওয়াতে। ধিক্ এ জীবন, ধিক্ আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবুর অদৃষ্ট!

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। উনুন ধরালাম, এবং আমিও মরিয়া হয়ে আজ রান্না করলাম। তিন রকম মাছের তরকারি, ছানার ডালনা, কপির বড়া এবং তরকারি, ভাজা পাঁচ রকম, ডাল রাঁধলাম তিন রকম।

রাঁধতে রাঁধতে সন্ধে পার হয়ে গেল। আলো জ্বাললাম। দেখলাম আপনাদের চারুবাবু

কলতলায় স্নান করছেন।

রান্না শেষ হলো। ঘর ধুয়ে মুছে, শুকনো কাপড় দিয়ে আর একবার ভাল করে মেজেটা ঘষে দিয়ে, তারপর আসন পাতলাম। সব খাবার বাটিতে ও রেকাবিতে, এবং ভাতের একটা স্তূপ থালার ওপর সাজিয়ে রাখলাম। প্রদীপটাকে এই ভূরিভোজের যজ্ঞক্ষেত্রের পাশে রেখে দিলাম।

তারপর ইচ্ছে করছিল, ঘর থেকে ছুটে বাইরে চলে যাই। আপনাদের আইডিয়ালিস্ট চারুবাবু একটা ক্ষুধার জীবমাত্র হয়ে এই খাদ্য গিলে গিলে মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসটাকে হিংস্র বিদ্রূপে ব্যর্থ করছেন— এ দৃশ্য যেন আর দেখতে না হয়। কিন্তু কোথায় যাব ? হাড়ের ব্যথা আমাকে পঙ্গু করে রেখেছে। মরতে হলে যেন এই দৃশ্য দেখার আগে এই দাওয়ার ওপরে নিঃশব্দে মরে যাই।

বোধহয় আবার স্বপ্ন দেখছিলাম। যখন তন্দ্রা ভাঙলো, তখন বুঝলাম দাওয়ার ওপর শুয়ে আছি। রান্নাঘরের ভেতর প্রদীপটা তখনো মিটমিট করে জ্বলছে এবং সাজানো খাবার সবই পড়ে আছে। আপনাদের চারুবাবু এখনো খেতে আসেননি।

ওঘরের ভেতরেও আলো জ্বলছে বোঝা যায়, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ শোনা যায় না। কি জানি এতক্ষণ ধরে নীরবে ঘরের ভেতর বসে কি করছেন আপনাদের চারুবাবু ?

আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, রাত গভীর হয়েছে। সমস্ত গলিটাই নিঝুম হয়ে আছে। একটু পরেই পাশের তেতালা বাড়িতে দেয়াল-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজলো— রাত দুটো।

সে কি ? আপনাদের চারুবাবু কি তবে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন ?

উঠলাম। ছোট উঠোনটা পার হয়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকালাম।

না, ঘুমিয়ে পড়েননি আপনাদের চারুবাবু। তিনি বসেছিলেন ঘরের মেজেতে একটা আসনের ওপর। তাঁর সম্মুখে একখানা গীতা খোলা পড়ে রয়েছে। ধীর স্থির একটা প্রশান্ত মূর্তি, এক মনে গভীর আগ্রহে এবং নিষ্পলক চক্ষে গীতা পড়ছেন।

চোখ দুটি নিষ্পলক কিন্তু দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা চিক্ চিক্ করছে সেই দুটি চোখের কোণে।

ভয়ে ভয়ে শুধু একবার বললাম— অনেক রাত হয়েছে, খেয়ে নাও।

আপনাদের চারুবাবু উঠলেন না, কোন উত্তর দিলেন না। গীতা বন্ধ করে আর চোখ মুছে বসে রইলেন।

তবে কি তিনি সত্যিই আজ উপোস করবেন, মহাপুরুষের তিরোভাব দিবসের সম্মান রাখবেন ? তবে এই ভয়ানক খাই-খাই কাণ্ড করলেন কেন ? একি নিজের হাতে নিজেরই আত্মার ওপর কশাঘাত ? কিংবা জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ দুঃখের সঙ্গে একটা পাগলামি ? অথবা অভিমান, মা-মরা ছেলেমানুষ যেমন মায়ের ওপর অভিমান করে ?

শেষ পর্যন্ত উঠলেন না, খেলেনও না আপনাদের চারুবাবু। আজ ঘরে খাবার আছে, অনেক আছে এবং নানারকম আছে ; অন্তত আজকের দিনটার মতো আছে, তবু খেলেন না। যা ছিল না, তাই এইভাবে আছে করে নিয়েছেন, নইলে বোধহয় উপোস করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

কাছে এগিয়ে গিয়ে সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। আমাকে ওভাবে দেখে একটু যেন বিব্রতভাবে ভয়ে ভয়ে বললেন— কিছু মনে করো না। ঘরে খাবার না থাকলে সত্যি সত্যিই তো আর ব্রতের উপোস হয় না। তাই…।

হ্যাঁ তাই। আর তাঁকে কথা বলতে হয়নি, কারণ আমিই আর বলতে দিইনি। কারণ,

দেখতে পেয়েছি এক অসহায় নিঃস্বের ভগ্নব্রত জীবনের জ্বালা কোথায় জ্বলছে।

তারপর কি হয়েছিল সব মনে নেই। শুধু এইটুকু জানি যে, সে রাত্রি ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙেছিল। বুঝলাম, স্বামীর বুকের কাছে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ঘরের ভেতরে প্রদীপটা তখনো জ্বলছিল। মনে হলো, শুক্লা নবমীর চাঁদ থেকে একমুঠো আলো এসে পড়েছে আমার জীবনের বাসর-ঘরে। স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম, ইনিই তো সেই।

সকাল হলে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। হেঁসেলে ঢুকতেই দেখলাম, বিড়ালে সব খাবার খেয়ে চলে গেছে।

তার পরের ঘটনাগুলি আপনাদের শোনাবার আর প্রয়োজন হবে না।

আমি বেঁচে আছি মরবার জন্য, এবং বিশ্বাস করি স্বামীর কোলে মাথা রেখে যদি মরি, তবে সে মরণ বড় সুখেরই হবে।

অনধিকার প্রবেশ

বিকেল থেকে আকাশে মেঘ জমেছে একটু একটু করে। সন্ধ্যা হতে না হতেই জমাট অন্ধকারের ছায়া নেমে এল শহরের বুকে। বদলা হওয়ার দমক আসছে হুহু করে দিগবিদিকের খেয়াল না রেখে, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি শুধু ছড়িয়ে দিচ্ছে পথচারীদের গায়ে। এমনি দিনে প্রিয়তোষ চলেছে হন হন করে একটা গলি দিয়ে। বর্ষারাতেও গলির মধ্যে চলেছে অবিরাম জনপ্রবাহ। ধাবমান জনতাকে পেয়ে বসেছে কি যেন একটা নেশার আমেজ। কত রকমের লোক, কে তার খবর রাখে, অন্ধকার বাড়িয়ে দিয়েছে গলির মর্যাদা। দিনের আলোয় সেখানে ডাক দিয়ে যায় বুড়ো ফিরিওয়ালা, ছন্দের টুং-টাং তোলে কালীঘাট-ফেরত রিকশাওয়ালা।

বাড়িগুলির বড় বড় নম্বর অন্ধকারে বেশ দেখা যাচ্ছে। সারা দিনের উদাস গৃহবীথিকা জেগে উঠেছে আনন্দের প্রমত্ততায়। এগারো নম্বরে প্রিয়তোষ ঢুকে পড়ল। সঙ্কীর্ণ ঘরে নোংরা মাদুরবিছান মেজেতে বসে আছে একসার লোক। সামনের নড়বড়ে তক্তপোষে এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক পেঁয়াজ কুচিয়ে চলেছে। একটা লোক সকলের ফরমাসমত গেলাস, পেঁয়াজ, মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা এগিয়ে দিচ্ছে। দলের সবাইকে চেনে প্রিয়তোষ। পুলিনবাবু পান-পাত্র হাতে স্থূলাঙ্গীর সঙ্গে নিম্নস্বরে কথা বলছেন। অতুলবাবু পা ছড়িয়ে বসে আছেন, মুখে বিদ্রূপের হাসি। মুখে চোখে বড়মানুষী ভাব— স্বতঃসিদ্ধ রায়। গা-ঘেঁষে বসে আছে গ্যাসমিস্ত্রী শিউশরণ আর জুটমিলের কুলী রমজান। যাঁরা লোকনিন্দার ভয় করেন, তাঁদের মুখ একবার জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভিড় কমলেই তাঁরা ঢুকবেন।

প্রিয়তোষ সফেন তাড়ির পাত্রে চুমুক দিচ্ছে একটু একটু করে। ঘর প্রায় খালি, মাঝে মাঝে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আধখোলা দরজা দিয়ে এসে সকলের ঝিমিয়েপড়া উৎসাহকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। রমজান মিঞা মিষ্টিগলায় গান ধরেছে— 'মেহেরবাণী হুস্‌ন্‌কী নয়াজোয়ানী দেখ্ কর।' গেলাস হাতে প্রিয়তোষ চোখ বুঁজে স্বপ্ন দেখছে, ফাঁকা মাঠের মধ্যে সারি সারি রুক্ষমূর্তি খেজুর গাছ, তাদের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রস।

—বাবুজী!

ঘরের বাইরে চাপাগলার আওয়াজে প্রিয়তোষের চমক ভাঙল। ভিতরে তখন দু-একজন

মাত্র রয়েছে। স্থূলাঙ্গী নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

মিনতিভরা কণ্ঠে আবার শোনা গেল— বাবুজী, বাবুজী! বিষণের ডাক প্রিয়তোষকে ফিরিয়ে আনল স্বপ্নের আবর্ত থেকে; সন্তর্পণে দরজা খুলে সে বাইরে এল। গলির দু'পাশের বাড়িগুলি অন্ধকারে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলার হঠাৎ-জেগে-ওঠা প্রাণ রাত্রির গভীরতার সঙ্গে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

অন্ধকারে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে বিষণের দীর্ঘ মূর্তি। ফালি চাঁদের মতো গলির মোড়ে রাস্তার বাতিটা ঘোলাটে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। বিষণ আর প্রিয়তোষ চলেছে সেই দিকে—অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠেছে তারা।

সে-রাতে অন্ধকারের ঢেউ যেন শহরের বুকে কালির বন্যা বইয়ে দিল। ঘন মেঘের পর্দা ধীরে ধীরে যেন নেমে আসছে পৃথিবীকে ঢেকে দিতে। জনহীন রাজপথগুলি অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে অসাড়ে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে পথের ঠিকানা যেন থেকে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়তোষ চলেছে অন্ধের মতো বিশ্বজগৎকে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে। তালুকদারবাবুদের দেউড়িতে একটাব ঘণ্টা বেজে গেল। তাদের পথচলা যেখানে শেষ হল, সেখানে তখন শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। দু'-তিনখানা অ্যাম্বুলেন্স-কার দাঁড়িয়ে আছে, কুলিরা একটার পর একটা মুমূর্ষু লোক এনে গাদাগাদি করে রাখছে তার মধ্যে। একটা উগ্র ভাপসা গন্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে নাকে এসে লাগছে।

নোংরা বস্তি। তরকারির খোসা আর ভাতের ফ্যান চারদিকে ছড়ানো, তার সঙ্গে কিছু কিছু ইঁদুরের নাড়িভুড়ি। বাড়িওয়ালা ট্যাক্স দেয় বটে, কিন্তু ধাঙড, মেথররা নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে সপ্তাহে এক-একদিন পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। বস্তির বাসিন্দা সকলেই সামান্য চাকুরে। সুশীলবাবু ছাপাখানায় কাজ করেন। গৌরবাবু কাজ করেন মাড়োয়ারির গদিতে। ফটিকবাবু স্কুলে মাস্টারি করেন। এছাড়া পরানবাবু, হৃদয়বাবু, শীতলবাবু,—তিনজনেই স্টেশনে হকারি করেন। মা ষষ্ঠীর কৃপা সকলের ঘরেই আছে। সাত-সিকে ভাড়ার আলোবাতাসহীন ঘরে স্বামী-স্ত্রী আর পাঁচ-সাতটি ছেলেমেয়েতে কোন রকমে রাত কাটানো মাত্র হয়। মেয়েদের বিয়ে হয় না। আট হাত সরু-পাড় কাপড পরে, মা-বাপের কড়া শাসনে তারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে, সুযোগ পেলেই বাইরে আসে, ছেলেদের দিকে তাকায় আর হাসে। ছেলেরা কোরা-ধুতির ওপর নতুন কেনা পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘাড় ছেঁটে বাপের ভয়ে কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে যায়; বিকেল না হতেই ফিরে এসে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে।

বস্তির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ঘরে থাকে প্রিয়তোষ। আড়াই টাকা ভাড়ার ঘরটিতে দরজা ছাড়াও দুটি জানালা আছে। প্রিয়তোষের পেশা গল্পলেখা। জীবনের ভয়ঙ্কব অভিজ্ঞতা তাব লেখাকে দিয়েছে এক অসহ্য সম্পদ। সে লেখার মধ্যে প্রেমের চিহ্ন নেই।

বিষণ কোথা থেকে এসে জুটেছে প্রিয়তোষের সঙ্গে। এক চোখ কানা, সারামুখে বসন্তের দাগ, বুড়োকে দেখে তার মায়া হয়েছিল। তখন থেকে তার হাতেই সে তুলে দিয়েছে সংসারের ভার। প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল নেই। মাঝে মাঝে ফটিকবাবু আসেন খোঁজখবর নিতে। যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ শুরু হলে জিনিসপত্রের চড়া দামে এসে থেমে যায়। ফটিকবাবু বলেন, বস্তির পাট এবার উঠল ভায়া। বোমার ভয় আমার নেই। না খেয়ে শুকিয়ে মরাকেই আমার যত ভয়। আটটা বাজলেই তিনি বিদায় নেন। অন্ধকারে তাঁর শীর্ণ অভাবমলিন মূর্তি মিলিয়ে যায়, প্রিয়তোষ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

দুপুরবেলা বস্তির গোলমাল অনেকটা থেমে যায়। ছেলেমেয়েদের বাপেরা ধুঁকতে ধুঁকতে

কাজে বেরিয়ে যায়, অকালবার্ধক্যে শীর্ণ মায়েরা ব্যবহারজীর্ণ যন্ত্রের মতো একটার পর একটা সংসারের কাজ করে যায়। বড় মেয়েরা অন্ধকার ঘরের কোণে বসে ভয়ে ভয়ে অঙ্গের স্বাস্থ্য খুঁজে খুঁজে দেখে, ছোট ছেলেরা কলতলার কাক তাড়ায়—খেলা করে।

আড়াই টাকার ঘরে বসে প্রিয়তোষ গল্প লেখে—তাদের বিষয়ে, যারা আড়াই কোটি টাকার মালিক, যারা প্রভুত্ব করে আড়াই লক্ষ লোকের ওপর। লিখতে লিখতে বিকেল হয়ে যায়, সে মুখ তুলে দেখে গৌরবাবুর মেয়েটা মিছামিছি হেসে চলে যাচ্ছে।

আজ রাতের ব্যাপার প্রকাশ পেল বিষণের মুখ থেকে। পরানবাবু সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরছেন কাজ সেরে। বস্তির কাছাকাছি একটা অন্ধকার গলিতে বিড়ি ধবাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই তিনি দেখলেন—অদূরে গ্যাসপোস্টের আড়ালে কারা লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বীরত্ব দেখাবার এমন সুযোগ পবানবাবু ছাড়লেন না। হুঙ্কার দিয়ে অগ্রসর হতেই কে একজন সবেগে উধাও হয়ে গেল। আর একটা কাঠি জ্বালাতেই থামের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া বেপথুমতী বেলাকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। ডুরে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউজ পরা, চোখে কাজল, পরিপাটি করে খোঁপা বাঁধা—আমতলা বস্তির গৌর সিংহীব মেয়ে বেলাকে আব চেনা যায় না।

পবানবাবুর সঙ্গে বেলা তো বাড়ি ফিরল। তার অভিসাররাত্রির সঙ্গী শীতলবাবুর ছেলে গণেশ অন্ধকারে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে। রাত দশটায় মাড়োয়াড়ির কবলমুক্ত গৌরবাবু বাড়ি এসে হাঁপানিজীর্ণ দেহে যেন নতুন শক্তি ফিবে পেলেন। মেযেকে ঘা কতক দিয়ে তিনি দমকলের মতো সবেগে গালাগালির তোড় ছাড়লেন শীতলবাবুব উদ্দেশে। শীতলবাবুও নিশ্চেষ্ট থাকবার পাত্র নন। তাঁর সোনাব চাঁদ ছেলে নিবপবাধ। গৌবের মেয়ে শীঘ্রই বাজাের তুলবে, এই সদম্ভ উক্তি তিনি কবাতে একটা হাতাহাতিব সূত্রপাত হয। বস্তিব বাসিন্দারাও কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করলেন। হাতাহাতি, ক্রমে লাঠি দা নিয়ে মারামারিতে পবিণত হল। খবর পেয়ে অবিলম্বে ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স-কাব, সুশীলবাবুরা সদলে যাত্রা করলেন হাসপাতালের দিকে।

সকলের অলক্ষ্যে প্রিয়তোষ তার নিজের ঘবে ফিরে এল। একটু পরে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই ভাঙা কাঁসার মতো ঝগড়াটে গলার শব্দে সে চমকে উঠল। সে শব্দে মধ্যরাত্রির ঘন অন্ধকারটাও যেন খান্ খান্ হয়ে গেল। সুশীলবাবুর স্ত্রী সূতিকা জ্বরে ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়েছেন, পবানবাবুর স্ত্রী দু'বছর থেকে ভুগছেন হার্টের অসুখে, শীতলবাবুর স্ত্রীর ফুসফুসে ক্ষয় ধরেছে। আজ রাতে কর্তাদের রণতাণ্ডব তাঁদেব চিত্তেও এনে দিয়েছে কুৎসিত এক কলহের প্রেরণা।

লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোর সামনে বসে লিখছে প্রিয়তোষ। বস্তির গৃহিণীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রস্থান কবেছেন। গৌরবাবুর মেয়ের কান্না থেমে গেছে। লেখা থামিয়ে প্রিয়তোষ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, কখন ভোরের আলো ফুটবে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ, এঞ্জিনের বাঁশি আর রিকশার টুং-টাং। ভোরের আলোয় দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রিয়তোষ স্বপ্ন দেখছে, বেলা শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, পরনে ডুরে শাড়ি, পবিপাটি করে খোঁপা বাঁধা।

এক-একটা দিন করে বর্ষা কেটে গেল। আকাশের মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে নতুন রূপ বেরিয়ে পড়ল। আমতলা বস্তির নোংরা আবহাওয়ার ওপরেও শরতের সোনালী হাসির ছায়া পড়ল। বিবর্ণ খোলার চালে মেঘমুক্ত আকাশের নির্মল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, পাশের ডোবাটাতে ব্যাঙের একটানা ডাক গেছে থেমে। বস্তির প্রাণীদের বেসুরো জীবনেও যেন কার

সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগেছে। প্রায়ই দেখা যায় ফটিকবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে গুন্‌গুন্ করছেন, সুশীলবাবু কাজে যাচ্ছেন একটা টপ্পা গাইতে গাইতে। গৃহিণীদের রুক্ষ মুখেও প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠেছে।

এই কুড়িয়ে-পাওয়া আনন্দের ধাক্কা সামলাতে পারলেন না কেবল গৌরবাবু। একদিন কাজ থেকে ফিরে প্রবল কাশির দমকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বিত্তহীনের ঘরে মরবার দিনেও ডাক্তার ডাকার কথা সহজে কারও মনে হয় না, ফিট হওয়া তো একটা সামান্য ব্যাপার। সাবিত্রী মেয়ে বেলাকে ডেকে দিলেন বাপের মাথায় জল দিয়ে হাওযা করতে, জ্ঞান হলে রান্না তৈরি না দেখলে ক্ষুধার্ত স্বামী অনর্থ ঘটাবেন।

বেলা হাওয়া করছে প্রায় আধঘন্টা ধরে ; মুদিতনেত্র গৌরবাবু নিঃশ্বাস ফেলছেন ধীরে ধীরে। ঘরের মধ্যে কুপী জ্বলছে, তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই হয়েছে বেশি। সুশীলবাবুরা ঘরের মধ্যে ভিড় করে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করছেন। হৃদয়বাবু ছেলেবেলা স্বাস্থ্যরক্ষা পড়েছিলেন, বললেন—ব্লটিং কাগজের ধোঁয়া গৌরের নাকে দাও! পরানবাবু নাড়ি দেখে বললেন, অবস্থা ভাল নয়, গলির মোড়ে জ্ঞান কবরেজকে ডাকতে পাঠাও। ঘরের এককোণে সাবিত্রীর চাপাকান্না শোনা যাচ্ছে। অভুক্তভোগীরা নিম্নগলায় আশ্বাস দিচ্ছে। সুশীলবাবুর স্ত্রী বেলাকে দেখিয়ে বললেন—ওই ডাইনির জন্যই বাপের প্রাণটা গেল। রোগী দেখে প্রিয়তোষ কিছু চমকে উঠল। তার সাড়া পেয়ে বেলা মাথা নীচু করে আরও জোরে হাওয়া করতে লাগল। বিষণকে নিয়ে প্রিয়তোষ ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

মাঝরাতে ডাক্তার পাওয়া শক্ত ব্যাপার। অনেক সাধ্যসাধনার পর এক নামকরা ডাক্তার আসতে রাজি হল। দক্ষিণা পঁচাশি টাকা। চৌষট্টি টাকা ফি-এর ওপর রাতের মজুরি ষোল টাকা বেশি, আর পেট্রোল খরচ পাঁচ টাকা। ডাক্তার বললেন—একশ' টাকার কমে রাতে আমি নড়ি না মশায়, গরীব বলেই দিলাম কিছু ছেড়ে। টাকাটা যেন মারা না যায় দেখবেন। বস্তির লোকদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না।

ভিজিটের বহর শুনে প্রিয়তোষের মনটা একবার শঙ্কিত হয়ে উঠলেও সে তখনি সামলে নিল! তার মায়ের দু'-একখানা হালকা গহনা তার কাছে তখনও আছে, ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাঁর আশীর্বাদ।

প্রিয়তোষ যা সন্দেহ করেছিল তাই হল। ডাক্তার বললে—সন্ন্যাস, এ রোগ সারবার নয়। প্রিয়তোষবাবু, আপনি আমাকে অনর্থক ট্রাবল দিলেন। রোগ সারাতে না পারলেও টাকাটা গুনে নিতে ডাক্তার একটুও ইতস্তত করল না। তার বিদায় নেওয়ার ঘন্টাচারেকের মধ্যেই গৌরবাবুর মৃতদেহ নিয়ে সুশীলবাবুরা বেরিয়ে গেলেন।

গৌরবাবুর মৃত্যুতে বস্তির ওপর দিয়ে যেন একটা আচমকা আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল। কেবল শীতলবাবু শত্রুনিপাতে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে থেমে গেলেন, কারণ এক মাস পরেই তাঁর স্ত্রী শ্মশান যাত্রা করলেন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে। দুঃখময় সংসার চালনার ভারী যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এল তাঁর বিস্ময়াহত দৃষ্টির সম্মুখে।

অলস মধ্যাহ্নের মতো ম্লান জড়তা এসে আচ্ছন্ন করেছে প্রিয়তোষকে। এখন বেশির ভাগ সময়ই সে ঘরে বসে আনমনে কাটায়। এগারো নম্বরে যেতে ভাল লাগে না। স্থূলাঙ্গীর স্থূল রসিকতা, নাকীসুরে আপ্যায়ন তাকে আর প্রলুব্ধ করে না। সন্ধ্যার একটু আগেই বস্তি ছাড়িয়ে দূরে পার্কে গিয়ে সে শুয়ে থাকে পামগাছের নীচে। চানাচুরওয়ালা হাঁক দিয়ে যায়, ভিখারী ছেলেমেয়ের গলাভাঙা গান কানে আসে। পার্কের ভিতর লাল সুরকিঢালা চওড়া রাস্তা, হাস্যকোলাহলে মুখর করে চলেছে সন্ধ্যা-বিহারিণী ভদ্রবাড়ির মেয়েরা। পশ্চিম আকাশের

লাল রং এসে লুটিয়ে পড়েছে তাদের বিচিত্র শাড়ির গায়ে। প্রিয়তোষ ভাবে, রামবাবুর মেয়ে সরু-পাড় মোটা শাড়ি পরে এখন হয়ত রান্না চড়িয়েছে, আট হাত শাড়ি পরে বেলা হয়ত কলে জল ধরছে, ভিখিরি মেয়েগুলি এতক্ষণে উনুনে চাল ফুটিয়ে নিচ্ছে।

ঘরে এসে সারারাত প্রিয়তোষের কলম আর থামে না। বিষণ অনুযোগ করে বলে—এইবার বহুমাকে নিয়ে এস বাবুজী, আমি একলা আর পারি না। প্রিয়তোষ হাসে, কলম কিন্তু থামে না। খোলা জানালা দিয়ে শিশিরভেজা হাওয়া আসে। লেখা থামিয়ে এক-একবার সে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়, আর বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার বস্তির প্রাঙ্গণে রুক্ষ-চুলে ভরা করুণ মুখ হাওয়ায় ভেসে উঠছে না? প্রিয়তোষ অনুভব করে বেলা তার দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে।

যে উদ্যম একদিন তাকে জীবনের পথে উৎসাহী পথচারী করে তুলেছিল, তার যেন সমাধি হয়ে আসছে। জগতের সর্বত্র চলেছে সেই একই আহ্বান আর প্রত্যাখ্যান, দুরাশা আর আশাভঙ্গের অর্থহীন খেলা।

বস্তির ঘরখানি হয়ে উঠল তার শেষ আশ্রয়। সেখানে সে একটানা লিখে চলে তার নতুন লেখা, যা তার জীবনে কোনদিনই প্রকাশিত হবে না। শরতের মধ্যাহ্ন উত্তাপে প্রখর হয়ে ওঠে, একটা বাজতেই জুটমিলের বাঁশির আর্তনাদ শোনা যায়। প্রিয়তোষ গৌরবাবুদের দরজায় চুপি চুপি ধাক্কা দেয়।

দরজা খুলে দেয় বেলা। সাবিত্রী বলেন—এস বাবা। আসবাবহীন ঘর, প্রিয়তোষ বসে একটা পিঁড়ি টেনে। বেলার কাজ শেষ হয়নি তখনও। ঝেড়ে মুছে ঘরটিকে সে তক্‌তকে করে তোলে। লজ্জা, হাসি, অভিমান খেলা করে তার মুখে। প্রিয়তোষ কাগজে মোড়া একটা বাণ্ডিল সাবিত্রীর হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যায়।

বস্তির বাসিন্দাদের জীবন চলেছে একটানা গ্লানির টানে। মাঝে মাঝে সে তাল ভঙ্গ হয় গৌরবাবুর স্ত্রীর আর্তবিলাপে, শীতলবাবুর সকরুণ আত্ম-অনুযোগে। নিরুদ্দিষ্ট গণেশের সন্ধান মেলেনি আজও। শোকাতুর পিতার কটূক্তি বর্ষিত হয় পরানবাবুর উদ্দেশে।

প্রিয়তোষের সবচেয়ে ভাল লাগে ফটিকবাবুকে। পঁচিশ টাকা স্কুলের মাইনে ও টিউশনির দশ টাকায় নির্ভর করে তিনি তাঁর নিজের ও গৌরবাবুর সংসারের ভার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আড়াই টাকা মাইনেতে একটি একটি করে চারটি ছেলে পড়াতে হয় তাঁকে। চার বাড়িতে বিদ্যার সঙ্গে তাঁর শরীরের রক্তটুকু যেন শুষে নিচ্ছে। সকল কষ্ট সহ্য করেন তিনি হাসিমুখে, দুঃখের চাকায় নিষ্পেষিত হয়েও তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে এক কপট সুখের প্রসন্নতা।

অসামাজিক প্রিয়তোষ গৌরবাবুদের ঘরে যাতায়াত করে—সুশীলবাবুরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। শীতলবাবু সব ভুলে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন, গৌরের মেয়ের সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। প্রাঙ্গণে বিচার সভা বসলো সুশীলবাবুর নেতৃত্বে। প্রিয়তোষের বিরুদ্ধে দু'দফা অভিযোগ আনলেন শীতলবাবু ;—সে মদ খায় ও গৌরের মেয়ের সঙ্গে তার রহস্যময় সম্বন্ধ। পরানবাবু বললেন—গৌরের মেয়ে আজকাল চওড়াপাড়া শাড়ি পরছে, গায়ে জামা থাকে সব সময়। হৃদয়বাবু সাবিত্রীর ঘরের দিকে তাকিয়ে চড়াগলায় মন্তব্য করলেন—আমরা বেঁচে থাকতে চোখের সামনে কোন কুকাণ্ড বরদাস্ত করবো না। ভাবের আতিশয্যে তাঁর ফিরিকরা সাধা গলাও হঠাৎ বাধা পেয়ে গেল। প্রতিবাদ করলেন শুধু ফটিকবাবু, কিন্তু তাঁর ক্ষীণ স্বর সমবেত কণ্ঠের ধমকে মিশে গেল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রিয়তোষ অস্বীকার করল না। বেলার সঙ্গে তার জীবনের অনুভূতির ফুল একে একে ফুটে উঠছে। সে কেমন করে অস্বীকার করবে? সে সত্যকে আমতলা বস্তির সামাজিক হুঙ্কারে

কিছুতেই নামিয়ে অপমানিত হতে দেবে না। আবেগে প্রিয়তোষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

বস্তির বৈঠক রায় দিল—প্রিয়তোষকে অবিলম্বে বস্তি ত্যাগ করতে হবে। নিজের ঘরে বসে তখন সে লিখে চলেছে তার নতুন লেখা একমনে।

ক্রুদ্ধ বিষণ তাঁর পাশে বসে বলে—রাতের অন্ধকার গাঢ় হলে ঝকঝকে দামী মোটর এসে লাগে বস্তির গায়ে। সুশীলবাবু আর শীতলবাবুর মেয়েরা দামী পোশাক পরে মোটরে বসে। অনেক রাতে তারা ফিরে আসে নোটের তাড়া হাতে নিয়ে।

প্রিয়তোষের অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল না। সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাঙনের যে ইতিহাস গড়ে উঠছে, তার প্রতিরোধ কেউ করতে পারবে না। সে তো উপলক্ষ মাত্র। সকল বিধিনিষেধের অর্গল ভেঙে বেরিয়ে পড়বে নতুন দিনের নতুন লোক। বাংলাদেশের লেখক প্রিয়তোষ, শুধু লেখে—লিখে লিখেই ফুরিয়ে যায়।

বিদায়ের দিন মধ্যাহ্নে বেলার চোখের দৃষ্টি জানালার ফাঁক দিয়ে অভিনন্দিত করল প্রিয়তোষকে। সুশীলবাবুরা তার গৃহত্যাগ উপলক্ষে একযোগে কাজ কামাই করে গৌরবাবুর ঘর পাহারা দিচ্ছেন। হেমন্তের পড়ন্ত রোদ লুটিয়ে পড়ল দূর মিলের চিমনির গায়ে, ন্যাড়া বেলগাছটার আগায়। বিষণের সঙ্গে চললো প্রিয়তোষ আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে।

বেলার দৃষ্টি একান্তভাবে তার মনের মানুষের মূর্তিটিকে শেষবারের মতো খুঁজছিল। ভাগ্যিস বেলা জানে না যে প্রিয়তোষ লেখক মাত্র ; মানুষ নয়—জীবনেব আহ্বানেব সম্মুখে যাবা তাদের পৌরুষের ওপব ঘোমটা টেনে দিযে চুপি চুপি সরে পড়ে। ওরা শুধু লেখে—জীবন ছেড়ে দিযে পালিয়ে যায় বলেই ওরা লেখক।

গ্রাম-যমুনা

কত রকমের পরব ও উৎসব আছে কিন্তু হোলির মতো কোনটি নয়। চম্পুগাঁয়ের চামারেরা একথা ভাল করে জানে।

ক'মাস আগেই গেছে নাগপঞ্চমী ; সকাল থেকে মেয়েরা ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করেছে। দেয়ালগুলি নতুন করে গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে, চুন গুলে বড় বড় সাপের মূর্তি এঁকেছে তার ওপর। প্রায় সারা গাঁয়ের নরনারী শিশু পাতকুয়োগুলির কাছে ভিড় করে স্নান করেছে, মাটির তেলাইয়ে সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে ও দুধে পূর্ণ করে ঘরের বাইরে রেখে দিয়েছে। সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে শ্রীনাগের সেই নৈবেদ্যের সামনে। বাস্তু সাপের গর্তে ভাত ঢেলে দিয়েছে তারা। সারাদিন মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে গান গেয়ে শ্রীনাগের কৃপা প্রার্থনা করেছে। খয়ের গাছের ডাল দিয়ে ঘরের চারদিকে গণ্ডী দেগে দিয়েছে, ভবিষ্যতে কোন সাপ সেই গণ্ডী লঙ্ঘন করে তাদের সুখের নীড়ে বিষ ছড়াতে আসবে না।

তারপর সন্ধেও হলো, চম্পুগাঁয়ে ভরাবর্ষার মেঘের ঘটা অন্ধকার ঘনিয়ে আনলো। বর্ষণে প্লাবনে ছোট্ট চম্পুগাঁ যেন গলে যাচ্ছে। অদূরে ফল্গুর বুকে ঢল নেমেছে—জলের তোড়ের গোঙানি শোনা যায়। তবু সেবক মাহাতোর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে ওঠে—ঢোলের শব্দ গুমরে ওঠে। পানভোজন আর হাসিখুশির কলরব, নাগপঞ্চমীর উৎসবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ কাজরি গায়। মেয়েরা দলবেঁধে গান করে।

উৎসবে গাঁয়ের প্রায় সকলেই উপস্থিত। শুধু আসেনি সাধু চামার। তাকে কেউ আসতেও আহ্বান অনুরোধ করেনি।

সাধুকে এইভাবে গাঁয়ের সবাই মিলে শাস্তি দিয়ে আসছে, আজ এক বছর ধরে। দোষ সাধুরই বলতে হবে।

সেবক মাহাতোর মেয়ে রূপা। সকালবেলা বিলে হাঁস ছাড়তে যায়, আর স্নান করে ফিরে আসে। সাধু চামার বিলের ধারে ঘুরঘুর করে ; হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর একদিন কথাটা বলেই ফেললো সাধু—রূপা, আমার কথাটা কিছু ভাবছিস না ?

এর পর আর তাকে মাপ করা যায় না। বয়সে রূপার চেয়ে ছোট হয়েও এত সাহস পায় কোথা থেকে ? সাধুকে একরকম একঘরে করেই রাখা হয়েছে।

সেবক মাহাতো সাধুকে অনেকবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—আমার মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তুমি এসব নিয়ে আর আলোচনা করো না। বার বার জিদ করতে এস না।

রূপা দেখতে না হয় খুবই ভাল, কিন্তু সাধুর সঙ্গে বিয়ে দিতে দোষটা কি ?

দোষ—রূপার ইচ্ছেটা। আগে রূপা একরকম রাজিই ছিল। জিজ্ঞাসা করলে লজ্জা পেয়ে হাসতো, হ্যাঁ-না কিছুই বলতে পারতো না। কিন্তু রূপা স্টেশনের হাসপাতালে কাজ পেয়েছে—মেয়েদের ওয়ার্ডের জমাদারণী। এই চাকরি জোটার সঙ্গে সঙ্গে রূপার সাজসজ্জা আর মনটা বোধহয় চম্পুগাঁয়ের মেটে বাড়িগুলির’ সঙ্গে আর খাপ খাচ্ছে না। গ্রামের মেয়ে হয়েও, গ্রাম-যমুনার ডাক যেন ভুলতে বসেছে রূপা।

গাঁয়ের অনেকে রূপার ওপর ও সেই সঙ্গে সেবক মাহাতোর ওপর খুব বেশি প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু মাহাতোর টাকার জোর আছে—পুজো-পার্বণে সেবকের উদারতাই গাঁয়ের আনন্দোৎসবের একমাত্র আশ্রয়। আর সাধু যদিও কারিগর মাত্র, কিন্তু খেটে খায়—বয়স আছে শরীরও আছে। ও যদি রাজি হয়, তবে চম্পুগাঁয়ের যে কোন মেয়ের বাপ খুশি হয়ে ওকে জামাই করতে রাজি আছে। কিন্তু সাধুর রোখ ওই একদিকে—রূপা।

মেয়েরা মনে মনে জ্বলে। গাঁয়ের বাতাসে রূপার নামে দু’-একটা বদনামের কথাও মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে ওঠে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেবক মাহাতোর প্রতিপত্তি কেউ ভুলতে পারে না।

গাঁয়ের অনেকে তাই সাধুর ওপরে চটা। ঠিক হয়েছে, এইভাবে শুধু হা-হুতাশ করে আর সেবক মাহাতোর কাছে অপমান খেয়ে ওর দিন কেটে যাক্।

রূপা নিজেকে গাঁয়ের অন্য মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন বকম ভাবে এবং ভিন্ন করে রাখে। সকলের সঙ্গে এক হয়ে সরলভাবে মিশতে পারে না। মেয়েরা আজও একবার রূপাকে গাইতে ডাকলো ; রূপা বললো—না, ওসব ভাল লাগে না আমার।

সভা ভাঙলে সবাই চলে যায়। তখন অন্ধকারে কাদাজলের ওপর দিয়ে ছপ্ ছপ্ করে একটি মানুষ সেবক মাহাতোর ঘরে এসে ওঠে। সাধুকে দেখে মাহাতোর নেশাড়ে মেজাজ জ্বলে ওঠে।—এবার তুমি মার খাবে আমার হাতে।

সাধু তবু মিনতি করে বলে যায় ; মাহাতো নিজের গর্জনে কিছু শুনতে পায় না। রূপা ঘরের ভেতর থেকে সব শোনে।

দশহরা উৎসব। শরতের নতুন আলোর সঙ্গে ক্ষেতের মাটিতে আর তৃণে শস্যে নতুন প্রাণের রঙ লাগে। গাঁয়ের সকলে শোভাযাত্রা করে বার হয়। মেয়েরা যে-যার ভাল সাজটি পরে নেয়। আগে আগে পুরুষেরা ঢোল বাজিয়ে চলে, পেছনে মেয়েরা একটানা অবিরাম গেয়ে চলে। সবচেয়ে আগে থাকে প্রকাণ্ড রঙিন-পাগড়ি মাথায় ও লাঠি হাতে সেবক মাহাতো, রূপাও থাকে শোভাযাত্রার সঙ্গে। ঠিক সঙ্গে নয়, সকলের পেছনে একটু সরে, একা

একা। এক বাঙালি জমিদারবাবুর বাড়ি প্রতিমা দেখে, মেলা ঘুরে ওরা আবার ফিরে আসে গাঁয়ে। সেবক মাহাতোর ঘরে পান-ভোজন চলে।

সাধুকে কেউ ডাকে না। এক-একটি পরব আসে, গাঁয়ের হৃদয়টার যেন কপাট খুলে যায়। সবাই সবাইকে ডাকে। সমস্ত দিনটা যেন লোকের মন থেকে রাগ হিংসার ধুলো ঝরে পড়ে যায়। সবাই সৌহার্দ্যের আনন্দে চঞ্চল। লোকের অহঙ্কারের বেড়াগুলি এই সময় একটু আলগা থাকে। সাধু ঠিক এই পরবের দিনগুলিতেই সাহস করে তার আবেদন নিয়ে আসে সেবক মাহাতোর কাছে। শুধু সেবক নয়, গাঁযের আরও দু'-চারজন বয়স্কদের কাছে সে তার বেদনা ও বক্তব্য বুঝিয়ে বলে। কিন্তু কোন ফল হয় না। সবাই বলে—এরকম দেওয়ানা হয়ে গেলে কেন ছোকরা ? যেখানে আমল পাবে না, সেইখানে ভিড়বার এত জিদ কেন ?

দশহরার রাতে সেবক মাহাতোর ঘবে সাধু আবার এল। সেবক অন্যদিনের মতো আর তেমন বকাবকি করলো না। কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা তেমনি সরল ও স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিল।—দেখ সাধু, তুমি লোক ভাল জানি ; কিন্তু পয়সাও তো একটা ইজ্জৎ। তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে সেইজন্য হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি তোমার কিছু ক্ষেতজোত থাকতো, তবে না হয়...।

সাধু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে চলে গেল। রূপা ঘরের কপাট একটু ফাঁক করে দেখছিল ও দু'জনের কথাগুলি সবই শুনছিল।

দেয়ালির উৎসবও এসে গেল। আবার ঘরদোর নিকিয়ে তক্‌তকে করা হয়েছে। এ মাসেই রূপার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে। আজ সে নিজে হাতে প্রদীপ সাজালো ঘরের চারদিকে। সন্ধে হতেই উঠোনে একটা আগুনের কুণ্ড করে রাখলো—ভাঁড়ে করে জল রেখে দিল পাশে। মাঝরাত্রে প্রেতাত্মারা আসবে নিজের নিজের পুরনো ঘরে। জল খেয়ে তৃপ্ত হবে।

রাত্রি হতেই সেবক মাহাতোর ঘরেব দাওয়ায জুয়া আব মদের হুল্লোড় মেতে উঠলো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চললো উৎসব। সকলে চলে যাবার পর সেবক নিজেও ঘরের ভেতর চললো। উঠোনের দিকে তাকিয়েই ভয়ে চমকে উঠলো—কে ?

যে-মূর্তিটা এগিয়ে এল সে আর কেউ নয়, স্বয়ং সাধু। সেবক যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করে উঠলো—টাঙিটা দে তো রূপা, আজ ওর সব সখ ঘুচিয়ে দেব।

রূপা ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু টাঙি হাতে নিয়ে নয। একটা মোড়া নিয়ে এসে মাহাতোর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললো—নাও, বসে কথা বলো।

মাহাতো বসে নিয়ে শান্ত হলো। সাধুর সেই পুরনো কথা—একটানা বলে চলেছে। মাহাতো শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়ছে। রূপা আজ আব ঘরের ভেতরে যায়নি—একটু দূরে দাঁড়িয়েই সব শুনে গেল।

মাহাতো হঠাৎ সচকিত হয়ে বললো—আরে যা বাবা, বিরক্ত করিস না। তোর বয়স তো রূপার চেয়ে অনেক কম। আর একটু বড় হলে না হয়। যা বিরক্ত করিস না।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রূপা বাইরে বার হতেই মাটির দিকে তাকিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে কুটিল একটা হাসি তার দু'ঠোঁটের ওপর দিয়ে যেন পাক দিয়ে গড়িয়ে গেল। রূপা দেখলো, ঘরের দোর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত কে যেন কতগুলি কালো সরষে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। রূপা আবার হাসলো। শেষে তুক করা সরষে সহায় হলো হতভাগার। কেঁদে হলো না, কাকুতি-মিনতিতে হলো না, জিদ-আবদার-অনুরোধ সব ভেসে গেল তখন আর উপায় কি ? মন্ত্র ফুঁকে সরষে ছিটিয়েছে। আচ্ছা ?

রূপা ডাক দিল—ও মাসী, এসে দেখে যাও।

থুড়থুড়ে এক বুড়ি একটা ঘরের ঝাঁপ খুলে বাইরে এল। রূপা দেখিয়ে দিল ব্যাপারটা—তুক্-করা সরষে কে ছিটিয়ে গেছে।

বুড়ি চিৎকার করে সেই সকালেই গাঁ মাত করে তুললো—সর্বনাশ করলে। কোন্ দুষমন পেছনে লেগেছে। এত ভাল বেটি আমার, এমন জোয়ান আর সুন্দর, তাই পেছনে লেগেছে গো। কি উপায় হবে গো!

পাড়ার অনেকে জুটে গেল। সেবক মাহাতো গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সবাই আলোচনা করলো—এমন দুষ্কর্ম কে করতে পারে? ব্যাপার খুবই গুরুতর মনে হচ্ছে। এর ভেতর অনেক রহস্য আছে।

সকলে দুশ্চিন্তায় মাথা দুলিয়ে এই সব কথা বলছিল। রূপা হঠাৎ বলে উঠলো—এত ভাবনায় কোন কাজ নাই। আমি সরষে মাড়িয়ে যাব, দেখি, কোন্ পিশাচ আমার কি করতে পারে।

রূপা হনহন করে হেঁটে চলে গেল। সকলে সেবক মাহাতোর দিকে তাকিয়ে বললো—কাজটা ভাল হলো না মাহাতো।

সাধু দিন গুনছিল। রূপা সরষে মাড়িয়ে গেছে বেপরোয়া হয়ে—এ খবর শুনেছে সাধু। তার বিষণ্ণ মনের আকাশে এক আহ্লাদের ঝড় নেচে চলে যায়। রাগ করে হোক আর লোভ করে হোক, হরিণ একবার ফাঁদে পা দিলেই হলো। রূপা যেন এই প্রথম তার ভালবাসার রাঙামাটির পথ ধরে একবার হেঁটে গেছে উপেক্ষা-ভরে। কিন্তু তারপর?

সাধু শুধু দিন গুনে যায়। অনেকদিন ফুরিয়ে গেল, কিন্তু রূপার পায়ে সেই রাঙামাটির কোন দাগ লাগে না। এদিকে সেবক মাহাতো এক নামকরা ওঝা আনিয়ে ফেলেছে। নানারকম ভয়ঙ্কর তুক্তাক চলেছে সেবকের বাড়িতে। শোনা গেল সেবক মাহাতোর শত্রুকে বাণ মারার আয়োজন হচ্ছে। সাধু ভয়ে মুষড়ে পড়লো।

কিন্তু গাঁয়ের নানা জনে নানা গোপন খবর এনে সেবক মাহাতো আর ওঝাকে বিভ্রান্ত করে তুললো। তারা প্রায়ই দেখছে—সাধু রাত্রে ঘরে থাকে না। একদিন রাত্রে দেখা গেছে—জঙ্গলে বসে মড়ার খুলিতে পেঁচার চোখ পুড়িয়ে কাজল তৈরি করছে। অমাবস্যার রাত্রে একটা হাঁড়ি নিয়ে সাধু ফল্গুর শ্মশানঘাটে উলঙ্গ হয়ে জল তুলে নিয়ে এসেছে।

ওঝা একদিন সরে পড়লো—লড়াইটা একটু কঠিন হয়ে উঠেছে মাহাতো। অনেকগুলি দেও-দানার সঙ্গে লড়তে হবে। আমি একা পারছি না, আমার বড় সাকরেদকে নিয়ে আসি।

সেবক মাহাতোর সব আশঙ্কা দূর করে দিল আর একটা খবর—সাধু গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পল্টনের চাকরি পেয়েছে।

হ্যাঁ, এখন না গিয়ে তার উপায় কি? কত রকম উপদ্রবই না করলো। কিছুতেই কোন কারসাজি আর সফল হলো না। ভালই হলো, এবার সেরঘাটের বনেদী কোন রবিদাসের বাড়ির ছেলের সঙ্গে রূপার বিয়ে দিতে হবে, নিশ্চিন্ত হয়ে।

* * *

হোলি এসে গেল। এ এক অদ্ভুত পরব। শুক্লা বাসন্তীর এক সন্ধ্যায় বনান্তের কোলে পূর্ণচাঁদের রূপে দেখা দেবে শিশু নব বৎসর। পঞ্জিকা হাতড়ে একে খুঁজতে হয় না। আকাশের নক্ষত্র রাশিচক্র ক্রান্তি ও অয়নাংশ অঙ্ক কষে গুনে এই উৎসবের দিনক্ষণ মাপতে হয় না। অন্তরে ও বাহিরে এক অদৃশ্য পুষ্পধন্বার খেলা চলতে থাকে। আকাশের রঙে, বাতাসের

স্পর্শে, আলোকের আভায়, গাছের কিশলয়ে মুকুলে হঠাৎ এক বিহ্বল যৌবন জেগে ওঠে। হোলি যেন মানুষের মন থেকে আগল খুলে বেরিয়ে আসে। এই একটি দিন মানুষ একটি সহজ সত্যকে উপলব্ধি করে, সে সত্য হলো এই যে, মানুষের অন্য পরিচয় যাই থাক আসলে সে প্রাণমাত্র। এই প্রাণ যখন সারা বছর ধরে সংগ্রাম করে যায়, তখন সে জীবন-সৈনিক বা সামাজিক মানুষ মাত্র। তারপর একটি দিনের জন্য বসন্তের একটি পূর্ণিমায় সে ছুটি পায়। সৈনিকের পোশাক ছেড়ে ফেলে আবার রঙিন উত্তরীয় তুলে নেয়। এই কুঙ্কুমের বর্ষা, আবিরের ঝড়, রংঝারি আর পিচকারি ফোয়ারা—নিখিল চিত্তের স্নায়ুজাল থেকে শেষ ভীরুতার চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে রঙিন করে তোলে। হৃদয় আসি যেথা করিছে কোলাকুলি—দোল-পূর্ণিমায় মানুষের মেলায় তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

চম্পুগাঁয়ের সেবক মাহাতোর আঙিনায় ঢোলক ও বাঁশির শব্দে হোলির রাত্রি প্রমত্ত হয়ে উঠলো। সারা বছরের তৃষ্ণা মিটিয়ে পুরুষেরা সকলেই যেন তাড়িতে মদেতে দেহমন চুবিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও অনেকেরই এই দশা।

মেয়েরা আসর থেকে একটু দূরে বসেছিল। পুরুষেরা ছেলে বুড়ো সবাই নেচে গেয়ে ছড়া কাটছে। খিস্তির উদ্দাম হল্লোড় থেকে থেকে ঢেউ-ভাঙা জলরোলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। নরনারী সবারই গায়ের বসন রঙের ছোপে বিচিত্র। রূপা শুধু এড়িয়ে গেছে—মেয়েরা অনেক অনুযোগ সাধ্যসাধনা করেছে। কিন্তু আবিরের একটি ছোট টিপ ছাড়া আর কোন রঙ সে নেয়নি। এই উৎসবে সে যেন একজন দর্শকের মতো শুধু বসে আছে।

টলতে টলতে একজন এসে আসরে ঢুকলো—সাধু চামার—হাতে একটা বাঁশি। সঙ্গে সঙ্গে সেবক মাহাতো সাধুর তিন পুরুষ তুলে একটা খেউড় গেয়ে উঠলো। সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে সমর্থন জানালো—সা-রা রা-রা সা-রা রারা। ঢোলক বাজিয়ে সেবক মাহাতো গাইলো—

রাত অনেক বাত অনেক, নাই·পাহারা।
ভুখ লাগা ? এস এস কুত্তা হামারা ॥

সকলে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঢোলকে চাঁটি দিয়ে নেচে লাফিয়ে সমস্বরে সায় দিল।—সা-রা রা-রা। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি করতে লাগলো।

সাধু চামার বাঁশিতে একবার ফুঁ দিয়ে একটা হাত তুলে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। এবার তার পালা। সাধু জবাব দিল—

চুপ রহ, চুপ রহ, বোকা চম্পুগাঁও।
বেতাল দেবের বড় চেলা পুজো মেরা পাও।

সকলে একসঙ্গে গর্জন করে জবাব দিল—আবে, যাও যাও।

আজ কি আর কেউ একথায় ভয় পায়! ভূত প্রেত বেতাল বরমদেব—আজ সব তুচ্ছ। সাধু চামার ভয় দেখাতে এসেছে—সে বেতালসিদ্ধ হয়েছে। এসব ফাঁকি ফন্দি ভূতচতুর্দশীর রাত্রেই মানায়।

সাধু চামার বাঁশি বাজিয়ে এক পাক নেচে নিয়ে আবার গাইলো—

খুস্ থাক দুষমন, অনেক দিলে সাজা।
সেপাই হয়ে ফিরে এসে দেখ লেগা মজা!

সকলে—আবে যাঃ যাঃ।

সকলে যেন ধিক্কার দিয়ে উঠলো, পল্টনে নাকি চাকরি পেয়েছে সাধু। যাক্ না চলে। আজকের দিনে আবার শাসাতে এসেছে সকলকে—মজা দেখে নেবে! আজ কে কার পরোয়া

করে ?

সাধু আর একবার নেচে নিয়ে ধরলো,—

তোপ ফাটা, বোম মারা, দম নাহি পায় ।
লড়ে ফিরে সাধুরামের প্রাণ চলে যায় ॥

সকলে—আবে, হায় হায় !

ঢোলকের বাজনা একটু মৃদুতর হয় । মেয়েদের মধ্যেও চাঞ্চল্য কলরব একটু স্থির হয়ে আসে । সাধু গেয়ে যায়—

শুক বলে সুখ নাই, নাই ঠিকানা ।
তবু সারীর কালো চোখে জল ভরে না ॥

সকলে উত্তর দিল—আবে, না না !

আরে না, না । এক ললিত আশ্বাসের সুর । আরে না না, অভিমান করো না, চলে যেও না । জ্যোৎস্নালোকে তোমার সারীর কালো চোখ চক্চক করছে, দেখতে পাচ্ছ না ? সেবক মাহাতো আস্তে আস্তে একটা খঞ্জনি বাজাচ্ছে । সকলে ঢোলক বাজিয়ে দুলে দুলে নাচছে—আবে, না না । ক্লান্ত সাধু বিভোর হয়ে বাঁশি বাজিয়ে চললো । হঠাৎ বুড়ো সেবক মাহাতো যেন একটা খুশির দমকা লেগে চেঁচিয়ে উঠলো—সা-রা, রা-রা, হোলি হ্যায় ।

মেয়েদের মধ্যে এই আনন্দ চাঞ্চল্যের ঝাপটা গিয়ে লাগলো । সব মেয়েরা মিলে হাসতে হাসতে মুঠো মুঠো আবির নিয়ে রূপাকে চেপে ধরলো—এইবার তোকে রঙ মাখতেই হবে ।

প্রিয়ংবদা

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না । ঠিক কথা ।

এবং কথা যদি শুকনো কথা হয়, তবে তো কথাই নেই । চিঁড়ে ভেজা দূরের কথা, চিঁড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে ।

কিন্তু কবিতা সরকারের কথাগুলি কি সত্যই কতগুলি শুকনো কথা !

অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই বলাবলি করে, এবং তাদের ধারণা এই যে, যতই মিষ্টি কথা বলুক না কেন কবিতা সরকার, তাতে পরিমল চৌধুরীর মন ভিজবে না । কবিতা সরকারের কথাগুলি নেহাতই কতগুলি তোষামোদের ঝংকার । কবিতা সরকারের হাসির শব্দটাও তাই ।

প্রায় তিন মাস হয়েছে, পরিমল চৌধুরী অডিটর হয়ে এই অফিসে এসেছে । বড়জোর আর তিন মাস এখানে থাকবে ; তারপরেই আবার দিল্লিতে হেড অফিসে চলে যাবে । অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেরই মনে একটা সন্দেহ এইবার প্রায় একটা বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, দিল্লি ফিরে যাবার সময় পরিমল চৌধুরী একা ফিরবে না । এই অফিসেরই একটি মানুষকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । সে মানুষটির নাম প্রীতিলতা রায় । কবিতা সরকারের মতো প্রীতিলতা রায়ও এই অফিসের হিসেবের কাজের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ।

পরিমল চৌধুরীর দিল্লি ফিরে যেতে আর যে তিনটি মাস বাকি আছে, বোধহয় সেই তিনটি মাস শেষ হবার আগেই প্রীতিলতা রায়কে এই অফিসের ঐ কাউন্টারের ছোট টেবিলটার কাছে বসে থাকতে আর দেখা যাবে না ।

দিল্লিতে হেড অফিসে বদলি হবে প্রীতিলতা ? না । অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই জানে, তা নয়, পরিমল চৌধুরীর অফিসের সঙ্গে প্রীতিলতা রায়ের আর কোন সম্পর্ক থাকবে

না। পরিমলের জীবনেরই সঙ্গে প্রীতিলতার একটা সম্পর্ক হয়ে যাবে। পরিমলের সঙ্গে প্রীতিলতার বিয়ে হবে এবং দু'জনেই একসঙ্গে দিল্লি চলে যাবে।

কি আশ্চর্য, অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই যেটা অবধারিত সত্য বলে এরই মধ্যে বুঝতে পেরে গিয়েছে, আর বিশ্বাস করে ফেলেছে, সেটা কবিতা সরকার বুঝতে পারে না, আর বিশ্বাস করতেও পারছে না। বোধহয় ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না কবিতা সরকার। কারণ, বিশ্বাস করতে ভাল লাগে না। এখনও একটা আশার মায়ায় মূঢ় হয়ে নিজেকে যেন এক অদ্ভুত বিশ্বাসের খুশিতে মাতিয়ে রেখেছে কবিতা।

পরিমল চৌধুরীর চোখের দৃষ্টিকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও জয় করতে পারেনি যে কবিতা সরকার, সে কেন এত বড় আশা পোষণ করে তা সে-ই জানে। অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই জানে, কবিতা সরকার একদিন এই বৃথা দুঃসাহসের প্রতিফল বেশ ভাল করেই পেয়ে যাবে। সাধ করে একটা অসম্ভবের সঙ্গে ভালবাসার খেলা খেলতে যাওয়া যে যেচে অপমান ডেকে আনা ; একটা শাস্তির কাছে অদৃষ্টকে ছেড়ে দেওয়া।

কবিতা সরকারের কথা আর হাসির শব্দগুলি যেন চটুল বেহায়াপনার ঝংকার। পরিমল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার সময় কবিতা সরকারের চোখের চাহনিও নীরবে ঝংকার দিয়ে আর কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। কবিতা সরকারের জীবনের ইচ্ছা যেন ব্যাকুল হয়ে পরিমল চৌধুরীর বুকের উপর তখনি আছড়ে পড়বার জন্য ছটফট করছে, কবিতা সরকারের ভাব-ভঙ্গী দেখলে এরকম সন্দেহ না করে পারা যায় না।

অথচ কবিতা সরকার নিজেই প্রতিদিন নিজের চোখে দেখতে পায়—পরিমল চৌধুরী অফিসের ছ'ঘণ্টার মধ্যে অন্তত তিনবার নিজের ছোট কেবিনটার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে, কারণে ও অকারণে প্রীতিলতার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে কথা বলে পরিমল, সে-কথার শব্দ এদিক-ওদিক থেকে কিছুটা শোনা গেলেও সে-কথার ভাব ও ভাষার কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। এবং খুবই বুঝতে পারা যায়, শুধু অফিসের কাজের কথা নয়, অন্য কোন কথা বলছে পরিমল।

কিন্তু প্রীতিলতা শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে টেবিলের উপরে রাখা লেজার বই-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনও বা চেয়ারটাকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে একমনে টাইপ করতে থাকে। পরিমল চৌধুরীর কথাগুলি যেন শুনতেই পাচ্ছে না প্রীতিলতা। প্রীতিলতার চোখ-মুখের নির্বিকার প্রশান্তি এবং অটুট গম্ভীরতা লক্ষ করে তাই ধারণা করতে হয়।

অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই নিজের নিজের চেয়ারে বসে এবং আড়চোখের চাহনি একটু বিচলিত করে নিয়ে দেখতে থাকে, পরিমল চৌধুরীর চোখ-মুখের ভাব আর ভঙ্গী কখনো আবেদনের মতো, এবং কখনো বা নিবেদনের মতো করুণ হয়ে উঠছে। যেন একটা নিরেট বধিরতার কাছে গুনগুন করছে পরিমল চৌধুরীর জীবনের একটা আগ্রহ।

কিন্তু এক-একদিন বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, সারা মুখটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। পরিমল চৌধুরীর জীবনের স্বপ্ন যেন একটা আশ্বাসের ছবি দেখতে পেয়েছে।

কবিতা সরকার নিজেও তো এই দৃশ্য রোজই দেখতে পায়। তবু কবিতা সরকারের চোখে-মুখে কোন আক্ষেপের বেদনা অথবা বিষাদের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা যায় না। কবিতা সরকার পরিমল চৌধুরীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে, অথচ পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো অপলক হয়ে একটু দূরের সেই কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে কোন দৃশ্যের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে একমনে কাজ করছে প্রীতিলতা। এমন ঘটনা চোখের উপরে দেখতে পেয়েও কবিতা সরকারের আশার আবেগ মুষড়ে পড়ে না। বরং হাসির ঝংকার

আরও একটু মিষ্টি করে দিয়ে এবং বেশ জোরে জোরে কথা বলে—আচ্ছা আমি এখনই ফাইলটা আপনার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলেই দেখবেন যে... ।

অফিসের দীনুবাবু মাঝে মাঝে এমন একটা কথা বলেন, যা শুনে অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেরই ধারণা বিশ্বাস এবং ইচ্ছার রকমটা এলোমেলো হয়ে যায়। দীনুবাবুর কথার মধ্যে একটা বেসুরো যুক্তি যেন সুর করে বেজে ওঠে।

দীনুবাবু বলেন, গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়। দুধ বেচতে হলে গলি গলি ঘুরতে হয়তো হয়, কিন্তু সুরা এক ঠাঁই বসে থেকেই বিক্রি হয়ে যায়। অ্যাঁ ? তবে কি কবিতা সরকারকেই দুধের সঙ্গে তুলনা করছেন দীনুবাবু ? এবং প্রীতিলতা হলো সুরা ?

তা কেন হবে ? কেমন করে হবে ?

প্রীতিলতা দেখতে সুন্দর ও শান্ত। একটু বেশি সুন্দর আর বেশি শান্ত। নিজের টেবিলের কাছে চুপ করে বসে থাকে আর নীরবে কাজ করে। প্রীতিলতা কোনদিনও নিজের হাতে ফাইল নিয়ে অডিটর পরিমল চৌধুরীর কেবিনের ভিতরে যায়নি। মস্ত বড় বড় কাগজের শিট ভরে যখন গাদা-গাদা হিসাবের অঙ্ক টাইপ করার কাজ আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে ফেলে প্রীতিলতা, তখনও কাজের বাহাদুরি নেবার জন্য হিসাবের স্টেটমেন্ট নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের দিকে ব্যস্তভাবে ছুটে যায় না। এহেন প্রীতিলতা সুরা হবে কেন ?

আর, যে কবিতা সরকার যখন-তখন বিনা কাজে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের ভিতরে গিয়ে ঢুকছে, এবং যত আজেবাজে কথা মিষ্টি করে বলছে, সে কবিতা সরকারকে দুধের মতো একটা সাদা ও শুদ্ধ উপকারের বস্তু বলে মনে করা হবে কেন ?

একমাত্র দীনুবাবু কবিতা সরকারের পক্ষে কথা টানেন, তাছাড়া স্টাফের প্রায় সকলেই প্রীতিলতার পক্ষে।

কবিতা সরকারের চেহারাটা দেখতে কুৎসিত না হলেও সুন্দর নয়। এবং প্রীতিলতার তুলনায় কিছুই নয়। আর গুণের কথা ? সেদিক দিয়েও কবিতা সরকারের এমন কোন সম্বল নেই, যার জোরে প্রীতিলতাকে ছাড়িয়ে যাবার সাধ্যি হবে কবিতার। গত বছর এই অফিসের স্টাফ বেশ ঘটা করে রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছিল এবং সেই উৎসবে দু'জনেই গান গেয়েছিল। কিন্তু কে না জানে কী চমৎকার গান গেয়েছিল প্রীতিলতা। প্রীতিলতার গান শেষ হবার পর কবিতা সরকারের গান শুনে উৎসবের আনন্দটা যেন মুখ টিপে কৌতুকের হাসি হেসে ফেলেছিল। কি আশ্চর্য, ওরকম একটা বাজে গলা নিয়ে গান গাইলো কেন কবিতা সরকার ? একটুও ভয় পেল না কবিতা ? ভয় না থাকুক, লজ্জা বলেও তো একটা বস্তু আছে। প্রীতিলতার গানের পর কবিতা সরকারের পক্ষে কোন গান আর না গাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু একটা গান নয়, পর পর তিনটে গান গেয়েছিল কবিতা। এবং সেই সময় উৎসবের আসর প্রায় অর্ধেক শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আর কিছুদিন পরে আর একটা উৎসবের সময় একটু সাবধান হয়ে গিয়েছিল কবিতা। বোধহয় নিজের যোগ্যতার সীমা সম্বন্ধে একটু সচেতন হবার মতো কাণ্ডজ্ঞান পেয়েছিল। প্রবীণ অডিটর মিস্টার রাও রিটায়ার করে চলে গেলেন. তাঁকে স্টাফের পক্ষ থেকে বিদায়-সংবর্ধনা করা হয়েছিল। সে অনুষ্ঠানে প্রীতিলতা একাই গান করেছিল। স্টাফের কেউ কেউ মুখ টিপে হাসি লুকিয়ে কবিতা সরকারকে অনুরোধ করেছিল—আপনার অন্তত গোটা পাঁচেক গান হলে...

কোন উত্তর না দিয়ে কবিতা সরকার হাসিমুখে শুধু মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছিল। এবং দীনুবাবু একটু খুশি হয়ে আড়ালে আড়ালে স্টাফের সেই সব কৌতুকীদের উল্টো ঠাট্টা করেছিলেন—কেমন জব্দ ? কবিতা সরকারকে যত বোকা বলে মনে কর, তত বোকা সে

নয়।

কিন্তু স্টাফের প্রায় সকলেই তবু মনে করে, বোকা বৈকি কবিতা সরকার। নইলে প্রীতিলতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার সাহস করে কেন? গান গাইতে গিয়ে আক্কেল হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরিমল চৌধুরীর ভালবাসা পাওয়ার জন্য যে-সব কাণ্ড করছে কবিতা, তাতে মনে হয় পরিণাম এখনও কল্পনা করতে পারছে না। আক্কেল হবে একদিন, শিগগির হবে, খুব সম্ভব আর তিন মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। মনে মনে প্রীতিলতাকে ভালবাসে পরিমল, এই সত্যের প্রমাণ প্রতিদিন পাঁচবার দেখতে পেয়েও কেন নিজেকে এখনও সামলে ফেলছে না কবিতা?

রূপের অভাব এবং গুণের অভাব যেন শুধু কতকগুলি মিষ্টি কথা আর হাসির ঝংকার দিয়ে পুষিয়ে দিতে চায় কবিতা। শুধু পরিমল চৌধুরীর গায়ে পড়ে বাচালতা করে করে প্রীতিলতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে কবিতা সরকার। বুঝতেও পারে না যে, ওর এইসব মিষ্টি-মিষ্টি মুখরতাকে নিতান্ত শুকনো কথার অসার মুখরতা বলে মনে করে পবিমল চৌধুরী। এই তিন মাসের মধ্যে ভুলেও কোন দিন কবিতা সরকারের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াযনি পরিমল। কোন দিন বেয়ারাকে পাঠিয়ে কবিতা সরকারকে কোন কাজের বা প্রশ্নের জন্য নিজের কেবিনে ডেকে পাঠায়নি!

মাঝে কিছুদিন খুব ভাল করে আর স্টাইল করে সাজসজ্জা চালিয়েছিল কবিতা। প্রীতিলতার সাজসজ্জায় বেশ সুন্দর সৌখীনতা সব সময় রঙিন হয়ে ঝলমল করে। সুতরাং, স্টাফের প্রায় সকলেরই ধারণা হয়েছিল, প্রীতিলতার সাজসজ্জার স্টাইল আব ঝলমলে রঙিনতার সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করবাব জন্য মেতে উঠেছে কবিতা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছে কবিতা। আক্কেল হয়েছে। কবিতা সরকাবের সেই সব রঙিন ঝলমলে সাজ পবিমল চৌধুরীব চোখের উপর যেন একটা ছাযাও ফেলতে পারেনি। কোন মুহূর্তেও একটু উৎসুক হয়ে বা বিস্মিত হয়ে কবিতা সরকারের স্টাইলের সাজ লক্ষ করেনি পরিমল চৌধুরী, মুগ্ধ হওয়া তো দূরের কথা। অথচ, নিজের কানে শুনতে পেয়েছে কবিতা, প্রীতিলতার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে পরিমল—আপনার এই শাড়িকেই বোধহয় বালুচর শাড়ি বলে? কী চমৎকার!

সেই রকমই নির্বিকার প্রসন্নতায় গম্ভীর হয়ে থেকে শুধু আস্তে একটু মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় প্রীতিলতা—না।

—কি বললেন?

এইবার কথা বলে প্রীতিলতা—বালুচর নয়।

প্রীতিলতার চোখে যেন সুন্দর একটা গর্বের তৃপ্তি ঝিকমিক করে হাসছে। অডিটর পরিমল চৌধুরীর সেই আবেদনময় মুখের দিকে যেন একটা সূক্ষ্ম করুণার দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে প্রীতিলতা।

আর, কবিতা সরকার তার সাজের শাড়িটার দিকে ব্যথিত অথচ তীব্র একটা ভ্রূকুটি হেনে তাকিয়ে থাকে। এটাই তো বালুচর শাড়ি, প্রীতিলতা যে শাড়িটা পরেছে, সেটা একটা সাধারণ মাদ্রাজী তাঁতের শাড়ি। কিন্তু পরিমল চৌধুরীব চোখ দুটো বালুচর দেখবার আশায় মুগ্ধ হয়েও দেখতে পাচ্ছে না যে, কত কাছে ঝলমল করছে একটা বালুচর।

তারপর আর নয়। পরাজয় স্বীকার করেছে কবিতা সরকার। তারপর থেকে যত সাদামাটা কালোপেড়ে মিলের শাড়িতে সেজে অফিসে আসে কবিতা সরকার।

এখন সম্বল শুধু কথা। তোষামোদের মতো যত ভাষা, আর যখন-তখন মিষ্টি হাসির ঝংকার। শুধু মিষ্টি কথার জোরে রূপের অভাব আর গুণের অভাব ঢাকা দিয়ে পরিমল চৌধুরীর মনের কাছে মিষ্টি হয়ে ওঠবার এক ভয়ানক তপস্যা শুরু করেছে কবিতা সরকার।

স্টাফের প্রায় সকলেই রাগ করে। এটা কবিতা সরকারের পক্ষে নিতান্ত একটা হীনতা নয় কি ? অডিটর বেচারাকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার জন্য এ কেমন বিশ্রী চক্রান্তের মতো একটা কাণ্ড করে চলেছে কবিতা সরকার ? প্রীতিলতার দিকে মন পড়েছে পরিমলের এবং প্রীতিলতাও এতে অখুশি হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে আর কেন ? পরিমল আর প্রীতিলতার সম্পর্কের উপর এরকম উপদ্রব করা কবিতা সরকারের পক্ষে মোটেই উচিত হচ্ছে না।

দীনুবাবু বলেন—উচিত কি অনুচিত, সেটা তোমরা বুঝবে কি করে ?

—তার মানে ?

দীনুবাবু—পরিমল চৌধুরীকে যদি মনে মনে ভালবেসে থাকে, যদি ভালবাসতে ইচ্ছে করে থাকে কবিতা সরকার, তবে বেচারা একটু চেষ্টা-চরিত্র না করে থাকবেই বা কেমন করে ?

—কিন্তু পরিমলকে ভালবাসে কেন কবিতা সরকার ? কোন্ অধিকারে ?

দীনুবাবু হাসেন—ভালবেসে ফেলেছে, এই অধিকারে।

স্টাফের প্রায় সকলেই একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অফিসটা যে প্রজাপতির অফিস হয়ে উঠলো ? দিনের পর দিন এসব কাণ্ড চোখে দেখতে আব ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু হেস্তনেস্ত হতে এত দেরিই বা হচ্ছে কেন ? এটাও যে একটা রহস্যের ব্যাপার ! প্রীতিলতা কি এখনও মন স্থির করেনি ? কিংবা প্রীতিলতার কি এখনও বুঝতে বাকি আছে যে, প্রীতিলতার কাছে পরিমল চৌধুরীর জীবন একটা আশ্বাস আশা করতে শুরু করে দিয়েছে ?

সন্দেহ হয়, এখনও হয়তো হ্যাঁ বলেনি প্রীতিলতা।

মাঝে মাঝে সত্যিই মনে হয়, প্রীতিলতার সুন্দর মুখটা যেন বিজয় গর্বে জ্বলজ্বলে হয়ে রয়েছে। অডিটর পরিমল চৌধুরীর মতো মানুষ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, ব্যস্, তারপর প্রীতিলতার এই শান্ত চোখমুখের আর মনের যেন কর্তব্য নেই।

দীনুবাবুও মাঝে মাঝে অদ্ভুত কথা বলেন—আমি একটা খবর পেয়েছি।

—কি ?

দীনুবাবু—প্রীতিলতার মামার সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে।

—তাতে হয়েছে কি ?

দীনুবাবু—প্রীতিলতার মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রীতিলতার বিয়ে হবে বলে কোন খবর তিনি পেয়েছেন কিনা ?

—কি বললেন তিনি ?

দীনুবাবু—তিনি বললেন, না, এরকম কোন খবর তিনি পাননি। প্রীতিলতার মা'র কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, এখন বিয়ে করবার কোন ইচ্ছে নেই প্রীতিলতার।

—কিন্তু এদিকে যে এসব কাণ্ড চলেছে, তার কি হবে ?

দীনুবাবু হাসেন—আর তিন মাসের মধ্যে একটা কিছু না কিছু হয়েই যাবে।

আর তিন মাসের মধ্যেই হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অডিটরের কাজ শেষ করে পরিমল চৌধুরী আবার দিল্লি ফিরে যাবে। স্টাফের প্রায় সকলেরই মনের ধারণা ও বিশ্বাস এই দুটি পরিণামের একটি অবধারিত বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু কবিতা সরকার যেন এক পরম নিশ্চিন্ততায় মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। যেন অনন্তকাল পর্যন্ত এই অফিসের ঐ কেবিনের ভিতরে ঢুকে পরিমল চৌধুরী নামে এক হাজার টাকা মাইনের একটা মানুষের কাছে কারণে-অকারণে শুধু ঝংকার দিয়ে হাসবে আর কথা বলবে কবিতা সরকারের জীবন।

কবিতা সরকারের বাচালতায় একটুও বিরক্ত হয় না পরিমল চৌধুরী ! চা-এর সময় যখন

এসে পড়ে কিংবা পার হয়ে যায়, তখন কবিতা সরকার নিজেই একবার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পরিমলের কেবিনে ঢোকে,—কিছু মনে করবেন না, আপনার চা-এর সময় হয়ে গিয়েছে, শুধু এটুকু বলবার জন্যেই এসেছি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরিমল চৌধুরী বলে—ও, ধন্যবাদ।

মস্ত বড় একটা হিসাবের টাইপ-করা স্টেটমেন্ট হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে পরিমল চৌধুরীর টেবিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর ছটফট করে কথা বলতে থাকে কবিতা সরকার। দেখুন তো, কোন ভুল আছে কিনা!

পরিমল—না, কোন ভুল নেই বলেই তো মনে হচ্ছে।

কবিতা—এসব কাজে প্রীতিলতার একটুও ভুল হয় না।

পরিমলের চোখের চাহনি দীপ্ত হয়ে ওঠে।—হ্যাঁ, আশ্চর্য, কোন দিন সামান্য ভুল হতেও দেখলাম না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে কবিতা সরকার।—কিন্তু এসব আমারই কাজ।

পরিমল—তার মানে? আমি তো এসব কাজের ফাইল প্রীতিলতা রায়ের কাছে পাঠিয়ে থাকি।

কবিতা—হ্যাঁ, ঠিকই। কিন্তু প্রীতিলতা আবার আমার কাছেই সেগুলি পাঠিয়ে দেয়। এসব ঝঞ্ঝাট আমিই ভুগি।

হো হো করে হেসে ওঠে পরিমল—মজার ব্যাপার।...প্রীতিলতা রায় কি এখন...।

কবিতা—কি?

পরিমল—অফিসে এখনও আছেন বোধহয়, চলে যাননি বোধহয়।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় পরিমল, এবং কেবিন ছেড়ে বাইরে এসে দূরের কাউন্টারে প্রীতিলতার সেই সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে! তারপরে এগিয়ে গিয়ে প্রীতিলতার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়।

আঃ, যেন হঠাৎ অলস ও ক্লান্ত হয়ে, এবং একটা জ্বালাময় দীর্ঘশ্বাসের বাতাস বুকের ভিতরে টানতে টানতে নিজের টেবিলের দিকে চলে যায় কবিতা।

কিন্তু ক্ষণিকের বিষাদ মাত্র। কবিতা সরকারের আশার আবেগ হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়েছে, একটু ব্যথা লেগেছে, এইমাত্র। কিন্তু ব্যথা ভুলে যাবার মতো ভয়ানক একটা জোর যেন কবিতা সরকারের বুকের ভিতরে আছে। পরের দিন আবার ঠিক এই রকমের কোন একটা অজুহাত নিয়ে পরিমল চৌধুরীর ঘরের ভিতরে ঢুকে খিলখিল করে হেসে ওঠে কবিতা সরকার।

—কি ব্যাপার? হাসি মুখ তুলে আর কলম থামিয়ে প্রশ্ন করে পরিমল।

কবিতা বলে—আপনার বয় বললে, আপনি আজ চা-খাবার কিছুই খাননি।

পরিমল—আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন নাকি?

কবিতা—রোজই জিজ্ঞাসা করি।

পরিমল—মজার ব্যাপার!

কবিতা হাসে—মজার ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু চা-খাবার খেলেন না কেন?

পরিমল—ঐ একঘেয়ে রুটি পুডিং আর চা রোচে না।

কবিতা—বলেন তো আমি একটা কাজ করতে পারি।

—কি?

—আমি একটা লিস্ট তৈরি করে দিচ্ছি, কোন্ দিন কোন্ খাবার আসবে। ধরুন, সোমবারে শুধু ফল আর চা। মঙ্গলবারে আলুর ঘুঘনি, ডিম আর টমেটোর স্যালাড।

বুধবারে...

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পরিমল—তবে দিন একটা লিস্ট করে।...হ্যাঁ, একবার প্রীতিলতা রায়কে জিজ্ঞাসা করলে হয়।

—কি জিজ্ঞাসা করবেন?

—উনি কি রোজই একঘেয়ে চা আর বিস্কুট খাওয়া পছন্দ করেন?

সত্যিই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় পরিমল, এবং হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে প্রীতিলতার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কবিতা। এবং দেখতে থাকে, কী চমৎকার ঢলঢলে একটা গর্বের চাহনি তুলে বিজয়িনীর মতো ভঙ্গী করে পরিমল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে প্রীতিলতা। কি বলতে চায় প্রীতিলতা?

প্রীতিলতারই টেবিলের নিকট দিয়ে যেতে যেতে যে-কথা শুনতে পায় কবিতা সরকার, তা থেকে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, পরিমল চৌধুরীকে এখনও কি-যেন স্পষ্ট করে বলে দিতে পারছে না প্রীতিলতা। এখনও যেন সময় চাইছে প্রীতিলতা।

—কেন? আমার প্রস্তাবটা কি খারাপ? পরিমল চৌধুরীর মুখের হাসি আর ভাষা যেন একটু কাতর হয়ে প্রীতিলতার সুন্দর মুখের অবিকার প্রশান্তি একটু বিচলিত করে দিতে চেষ্টা করছে।

কিসেব প্রস্তাব? হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দূরের একটা আলমারির দিকে তাকিয়ে শাড়ির আঁচল ধরে মিছামিছি টানাটানি করে কবিতা। পরিমল চৌধুবীর এই কাতর নিবেদনের শব্দ সহ্য করতে গিয়ে কবিতা সরকারের কান দুটো যেন তপ্ত রক্তচ্ছটাব জ্বালা লেগে লাল হয়ে ওঠে। কবিতা সরকারের অদৃষ্ট যেন একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাতে কানমলা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গিযেছে।

প্রীতিলতা বলে—আপনার প্রস্তাব ভাল, কিন্তু..।

আর কিছু বলে না প্রীতিলতা, কিন্তু কি আশ্চর্য, প্রীতিলতার এই কিন্তুময় অনাগ্রহের ঘোষণা শুনেও পবিমল চৌধুরীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে না। মুগ্ধ হযে তাকিয়ে শুধু দেখতে থাকে পরিমল চৌধুরী, লেজার বইয়ের ওপর মাথা ঝুঁকিযে দিয়ে কি চমৎকাব একটা ঢলঢলে গৌরবের শোভার মতো সুন্দর মুখটাকে একটুখানি হেলিয়ে দিয়ে বসে আছে প্রীতিলতা।

পরিমল বলে—আমি তাহলে বয়কে বলে দিই, যখন আমার খাবার আসবে তখন সেই সঙ্গে আপনারও খাবার...।

প্রীতিলতা মুখ না তুলেই উত্তর দেয়—না।

পরিমল—কেন মিস রায়?

প্রীতিলতা—এখন না, এখন কিছু বলতে পারছি না। মাপ করবেন।

মাপ চাইছে প্রীতিলতা, কিন্তু মাপ চাইবার কী দৃপ্ত ভঙ্গী। যেন ভক্তের স্তাবকতাকে করুণা করছে প্রীতিলতা।

কিন্তু হেসে ওঠে কবিতা সরকারের মুখটা। পরিমল চৌধুরীর নিবেদন এখনও একেবারে পাগল হয়ে যায়নি। এখনও প্রীতিলতার ইচ্ছার দুয়ারে এসে শুধু ধর্ণা দিচ্ছে পরিমল। এবং এখনও প্রীতিলতাকে সে-কথা বলে ফেলতে পারেনি পরিমল, যে-কথা বলে ফেলবার পর প্রীতিলতার সুন্দর মুখটা চরম জয়ের সুখে আরও রঙিন হয়ে এই অফিস-ঘর ছেড়ে বাড়ি চলে যাবে, তারপর ছুটি নেবে প্রীতিলতা। এবং তার কয়েকদিন পরেই একগাদা রঙিন খামের চিঠি এই অফিসঘরের টেবিলে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ে সারা অফিসের মানুষগুলিকে এই সত্য জানিয়ে দেবে যে, প্রীতিলতার জয় হয়েছে। অডিটর পরিমল চৌধুরীর সঙ্গে প্রীতিলতা রায়ের বিয়ে

এবং তার কিছুদিন পরেই পরিমলের সঙ্গে দিল্লি চলে যাবে প্রীতিলতা।

কিন্তু সে প্রস্তাব নয়। যাক্ হাঁপ ছাড়ে কবিতা সরকারের আতঙ্কিত বুকটা। কিন্তু নিজের টেবিলের কাছে এসে আবার কাজে মন দিতে গিয়ে যেন মনটাকেই খুঁজে পায় না কবিতা সরকার। বুকের ভিতরে হাঁপাচ্ছে আর হাঁসফাঁস করছে একগাদা ক্লান্ত নিঃশ্বাসের ভার।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, কবিতা সরকারের অন্তরাত্মা যেন আহত হলেই আরও বেশি উদ্দাম হয়ে ওঠে। কবিতা সরকারের সম্বলবিহীন স্বপ্ন, বার বার হতাশ হওয়া আর আঘাত-পাওয়া আশা যেন প্রচণ্ড এক অহঙ্কারের জেদে আবার মরিয়া হয়ে ওঠে। হার মানতে চায় না কবিতা সরকারের প্রাণ। যখন তখন এবং কারণে অকারণে, পরিমল চৌধুরীর কেবিনে ঢুকে বাচালতা করে আসবার প্রতিদিনের অভ্যাস তবুও ছাড়তে পারে না। ঐ কেবিনটার বিরুদ্ধে একটা অভিমান করবারও যেন শক্তি নেই কবিতা সরকারের। উটের কাছে কাঁটা গাছের স্বাদ যেমন, কবিতা সরকারের কাছে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের নিভৃতটা বোধহয় তেমনই একটা স্বাদের স্বর্গ। না গিয়ে থাকতে পারে না কবিতা সরকার।

যেদিন, ব্যাঙ্কের লোকগুলি একটানা পাঁচ ঘণ্টা হিসাবের লড়াই সেবে পরিমল চৌধুরীর কেবিন থেকে বের হয়ে চলে গেল, সেদিন হঠাৎ একটা ব্যাপার...।

একি ব্যাপার ? পরিমল চৌধুরীর বেয়ারা কেবিনের ভিতর থেকে আতঙ্কিতের মতো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে কেন ? এত বড় অফিসঘর, এত লোক কাজ করে, কিন্তু কারও দিকে না তাকিয়ে শুধু কবিতা সরকারের মুখ লক্ষ কবে কবিতা সবকারেব টেবিলের দিকে ছুটে আসছে বেয়ারা। কি হলো ? কবিতা সরকারও হঠাৎ লেখা বন্ধ করে আব উদ্বিগ্ন হযে তাকিয়ে থাকে। সারা অফিসঘবে একটা উদ্বেগময ব্যস্ততার সাড়া পড়ে যায়।

বেয়ারা এসে কবিতা সরকারের কাছে বিড়বিড কবে কি একটা কথা বলতেই পরিমল চৌধুরীর কেবিনের দিকে ছুটে চলে গেল কবিতা সরকার, এবং তারপরে সকলেই। বেয়ারা বলে, সাহেব দু'হাতে মাথা টিপে ধরে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছেন আর ছটফট করছেন।

কেবিনের ভিতরে ভিড়ের প্রবেশ দেখেই আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে পরিমল চৌধুরী—কি ব্যাপার ? আপনারা সবাই এত ব্যস্ত হযে . ।

কিন্তু কবিতা সরকার ততক্ষণে, এবং এতগুলি মানুষের চোখের সামনেই একেবারে সীমাহীন তোসামোদ আর বেহায়াপনার আবেগে যেন মাতাল হযে উঠে একটা কাণ্ড করে ফেলে। রুমাল জলে ভিজিয়ে পরিমল চৌধুরীর কপালটাকে বার বার মুছে দিতে থাকে কবিতা সরকার।

পরিমল বলে—থাক থাক, এমন কিছু কষ্টেব ব্যাপার নয যে. .।

কবিতা সবকার ভ্রূকুটি করে এবং শাসানির সুবে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ করুন আপনি।

পরিমল হাসে—হঠাৎ মাথাটা কেমন যেন কটমট করে জ্বলে উঠলো ; কাল ভাল ঘুম হয়নি, তাই বোধহয়...। থাক...এইবার ছেড়ে দিন।

কবিতা সরকারের চোখ দুটো যেন কেঁপে ওঠে—ছেড়ে দিতে পারি ঠিকই, কিন্তু আপনার কি কোন ক্ষতি হচ্ছে ?

পরিমল—না, ক্ষতি হবে কেন ? বরং. .সত্যি কথা বলতে হয়, মাথার জ্বালাটা এরই মধ্যে অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

সত্যিই কবিতা সরকারের ভেজা রুমালের ছোঁয়া পেয়ে পরিমল চৌধুরীর চোখ দুটো যেন ঘুমের স্বাদ পেয়ে আস্তে আস্তে বুঁজে আসছে। কেবিনের ভিতরের ভিড়টা আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে থাকে। এবং যখন ফাঁকা হয়ে গেল, তখন কবিতা সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে ওঠে পরিমল—প্রীতিলতা রায়ও এসেছিল বলে মনে হচ্ছে ?

কবিতা বলে—না, আসেনি।

ঠিক কথা। একমাত্র প্রীতিলতা ছাড়া আর সকলেই বেয়ারার উদ্বেগ বার্তা শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছে আর ছুটে এসেছে। ছুটে আসেনি শুধু একজন। সে ঐ প্রীতিলতা রায়। এখনও নিজের টেবিলের কাছে সে একমনে টাইপ করছে, সেই শান্ত ও সুন্দর মুখটা ঢলঢল করছে।

কবিতা সরকারের হাতের ভেজা রুমাল কবিতা সরকারের হাতেই ছিল। কবিতার হাতের সেই রুমালের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলে ওঠে পরিমল—ধন্যবাদ—

তারপরেই কেবিন ছেড়ে বের হয়ে, আর আস্তে আস্তে হেঁটে, প্রীতিলতার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পরিমল। —হঠাৎ সামান্য একটা মাথার যন্ত্রণা করে, অফিসের এতগুলি মানুষকে ট্রাবল দিয়ে...আপনি শুনেছেন তো মিস বায ?

প্রীতিলতা হাসে—হ্যাঁ, শুনেছি।

কবিতা সরকারও শুনতে পায, কত স্পষ্ট করে এবং কি অদ্ভুত ভঙ্গী কবে কথা বলছে প্রীতিলতা। শুনেছে, তবু ছুটে যায়নি প্রীতিলতা। এবং প্রীতিলতার জীবনের এই ভয়ঙ্কর অহঙ্কারের গুঞ্জন আর হাসির শব্দ কত মুগ্ধ হয়ে শুনছে পরিমল চৌধুরী !

কবিতা সরকারের আশার সব জেদ একটা পাঁজর-ভাঙা বেদনার চাপে মড়মড় করে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। না, এমন মিথ্যা সংগ্রাম সহ্য করবার কোন অর্থ হয় না। মাথা হেঁট করে, এবং চরম পরাজযের শ্রান্তিটাকে যেন ঢোঁক গিলে লুকিযে ফেলতে ফেলতে নিজের টেবিলের কাছে এসে চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ে কবিতা সরকার।

এবং আর তিনটা দিন পার হতে না হতেই স্টাফের প্রায় সকলেই একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে বুঝতে পেরে হেসে ফেলে। এইবার হার স্বীকার করেছে কবিতা সরকার। পরিমল চৌধুরীকে দেখলেই আর কলকল করে হেসে ওঠে না কবিতা সরকাব। যখন-তখন এবং কারণে-অকারণে পরিমল চৌধুরীর কেবিনের ভিতরে ঢুকে বাচালতাও করে না। কি অদ্ভুত ব্যাপাব ! তিন দিনের মধ্যে একবারও পরিমল চৌধুরীর কেবিনে যায়নি কবিতা সরকার।

পরিমল চৌধুরীর আশার জীবনে কোন পরিবর্তন এই তিন দিনের মধ্যে হয়েছে বলে মনে হয না। দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার নিজেই এসে প্রীতিলতার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে কি কথা বলে চলে যায় পরিমল চৌধুরী। এই পরিমল চৌধুরীর এই আকুলতার নিবেদন শুনে শুনে প্রীতিলতার মুখটা ঠিক তেমনই শান্ত ও সুন্দর হয়ে ঢলঢল করতে থাকে।

কিন্তু তার পরের দিন প্রীতিলতার টেবিলের কাছ থেকে যেতে যেতে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায় পরিমল চৌধুরী। অফিসঘবের চারদিকে তাকিয়ে পরিমলের চোখ দুটো কি-যেন খুঁজতে থাকে। তারপরেই ব্যস্তভাবে হেঁটে নিজের কেবিনের দিকে চলে যায় পরিমল।

তারপরেব দিন প্রীতিলতার টেবিলেব কাছে দাঁডিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ফেলে পরিমল—ঐ সেই কাউন্টারের দিকে, যেখানে নিজের কাজের টেবিলে বসে একমনে লেখালেখি করছে কবিতা সরকার।

পরিমল চৌধুরীর অডিটের কাজ শেষ হতে আর মাত্র একটি মাস বাকি আছে। যেদিন থেকে ঠিক একটি মাস পরে পরিমল চৌধুবীকে দিল্লি চলে যেতে হবে, সেইদিন হঠাৎ কেবিনের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে থাকে পরিমল চৌধুরী। যেন হঠাৎ চমকে উঠেছে পরিমলের কেবিনের বাচালতাহীন নীরব ও গম্ভীর বাতাস।

কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একেবারে বেহায়ার মতো অপলক চোখ তুলে কবিতা সরকারের কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে থাকে পরিমল চৌধুরী।

আর সাতটা দিন পর অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই চমকে ওঠে—একি ব্যাপার ?

দীনুবাবু বলেন—কি হলো ?

—কই, প্রীতিলতার টেবিলের কাছে গিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকে না কেন পরিমল চৌধুরী ? প্রীতিলতার সুন্দর মুখের দিকে ভক্তের মতো একবার না তাকাতে পারলে যে পরিমল চৌধুরীর প্রাণ... ।

হ্যাঁ, যে পরিমল চৌধুরীর প্রাণটা প্রীতিলতার সুন্দর মুখের শোভা একবার কাছে এসে দেখে না যেতে পারলে হেসে উঠতে পারতো না, সেই পরিমল চৌধুরী যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে, একটু করুণ হয়ে, এবং বোধহয় বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে কবিতা সরকারের গম্ভীর মুখের দিকে লক্ষ রেখে কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কবিতা সরকারের বাচালতা আর হাসির ঝংকার শুনতে না পেয়ে যেন কাতর হয়ে ছটফট করছে পরিমল চৌধুরীর বুকটা। তা না হলে, বার বার এরকম ছটফট করে কোটের বুকের বোতামগুলিকে বার বার টানাটানি করে কেন পরিমল চৌধুরী ?

তার পরের দিন। অফিসের স্টাফের প্রায় সকলেই দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে, একটা ফাইল হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সোজা একেবারে কবিতা সরকারের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পরিমল চৌধুরী। পরিমল চৌধুরীর চোখের চাহনিতে যেন একটা আবেদন করুণ হয়ে ফুটে উঠেছে। একটু আশ্চর্য হয়ে এবং গম্ভীর মুখ নিয়ে পরিমলের মুখের দিকে কবিতা সরকার চোখ তুলে তাকাতেই পরিমল বলে—এই ফাইল দেখে শেষ তিন মাসেব পারচেজের হিসাবটা তিন কপি টাইপ কবে দেবেন এখনি ?

চমকে ওঠে কবিতা সরকার। বোধহয় চোখের একটা ছলছল সজলতাব বেহায়াপনা লুকিয়ে ফেলবার জন্য মাথা হেঁট কবে। আব, পরিমল চৌধুরী কোন কথা না বলে শুধু দুই চোখ অপলক করে পিপাসিতের মতো কবিতা সরকারের সেই মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকে।

—বলুন না, আপনি কথা বলছেন না কেন ? আপনার আপত্তি আছে কি ? পরিমলের গলার স্বরও ছটফট করে ওঠে।

কবিতা সরকার বলে—একটুও আপত্তি নেই।

স্টাফের প্রায় সকলেই একসঙ্গে আশ্চর্য হয়ে মুখ ঘুরিয়ে দীনুবাবুর দিকে তাকায়। সকলের চোখে যেন একটা নীরব প্রশ্ন ছটফট কবছে—এ কি ব্যাপার দীনুবাবু ? এ কি হলো ?

দীনুবাবু একটুও আশ্চর্য না হয়ে, এবং প্রসন্নভাবে একটা হাই তুলে হেসে ফেলেন।—যা হবার ছিল, তাই হলো।

নতুন শালিক

এই জায়গাটার নাম কাঁকুলিয়া। গেঁয়ো চব্বিশ পরগনা আর শহুরে কলকাতা এখানে এসে এখনো একদেহে লীন হতে পারেনি, বরং তার উল্টোটাই সত্য। দু'জনে যেন আক্রোশে পরস্পরের গলা টিপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শহরের ইচ্ছে গেঁয়োকে উদ্বাস্তু করতে, গেঁয়ো চাইছে শহরের অনধিকার প্রবেশের উৎপাতকে ট্রামলাইনের ওপারে ঠেলে রাখতে। তবু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়—লোহা-লক্কড়, কাঁচ কংক্রীট, গ্যাস পিচ আর বিদ্যুৎ নিয়ে শহরের এই রাবুণে আক্রমণে গাঁয়ের সীতেপনা আর বেশিদিন চলবে না।

মাঠের ওপর দিয়ে যে সরু এবড়ো-খেবড়ো সুরকি-ছড়ানো রাস্তাটা রেললাইন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তারই ওপর এক জায়গায় মাধবী-নিবাস। ছোট বাড়িটা একেবারে আগাগোড়া

লতাপাতায় ঢাকা! নোনাধরা বিবর্ণ একটি থামের গায়ে সিমেন্টে গাঁথা নামটা এখনো লতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে আছে। বাড়ির পেছনে একটা ডোবা, ঝুমকো জবার ডালগুলি প্রায় জলের ওপর নুয়ে থাকে। বাড়ির কর্তা রঘুনাথবাবু গড়েহাটা রোডের ওপরেই এক কাঠের আড়তে হিসেব লেখার কাজ করেন।

কাছাকাছি আর বাড়ি ছিল না। সম্প্রতি কয়েকটা হয়েছে। কাঁকুলিয়ার নারকেলের ঝালরের ঝিরঝিরে ছায়ার নীচে সে-বাড়িগুলি বেশি বেমানান হয়নি। সবই দালানবাড়ি বটে, তবে তাদের গায়ে গাঁয়ের আদরটুকু মাখা থাকে—দোপাটির বেড়া, উঠোনের কোণে একটা গন্ধরাজ, পেছনে দু'-চারটে কুমড়োর মাচা। এক বাড়িতে গায়ে-হলুদের উলু দিলে—দূরে ও নিকটে বিশটা বাড়িতে শোনা যায়। সবাই বুঝতে পারে, নিত্যবাবুর ভাইঝি পারুলের বিয়ে।

রঘুনাথবাবু ছাড়া মাধবী-নিবাসে আর যারা থাকে, তারা সংখ্যায় বেশি নয়। রঘুনাথবাবুর স্ত্রী, মেয়ে সুধা আর ছেলে ভম্বল—যার বয়স মাত্র সাত বছর। মাধবী-নিবাসের এই ক্ষুদ্র পরিবারের গৃহবলিভুক্ কুকুরটার নাম নেলো। একটু রোগাটে চেহারা, হয়তো ভাল করে খেতে পায় না বলেই। নেলোর ক্লান্তিহীন পাহারাই মাধবী-নিবাসের আসল প্রাচীর। নেলো সিঁড়ির ওপর শুয়ে শুয়ে ধোঁকে, কিছুক্ষণ ঘুমোয়, পর মুহূর্তেই একটা মেঠো ইঁদুরকে তাড়া করে সীমানার ওপার করে দিয়ে আসে।

আর আছে দুটো গরু, তার মধ্যে একটার নাম নতুন শালিক। এ নাম ভম্বলের দেওয়া। নতুন শালিককে কখনো খুঁটোয় বাঁধতে হয় না। নিজের মনেই বাড়ির আশেপাশে চরে বেড়ায়। কাছাকাছি যদি কখনো দেখতে না পাওয়া যায়, ভম্বল পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়ে—নতুন শালিক..। নতুন শালিক তখন হয়তো স্লির্ট ট্রেঞ্চের ধারে কচি ঘাস চিবিয়ে ফিরছে। ডাক শুনেই সাড়া দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে আসে।

সুধা কলেজে পড়ে। অনেক কষ্ট করে পড়তে হয়। ঘরে-কাচা কালোপাড় মিলের শাড়ি দিয়েই সুধাকে সাজসজ্জা সারতে হয়। এর ওপরে যাবার মতো আর্থিক সামর্থ্য ওদের নেই। স্যান্ডেল পায়ে দু'মাইল পথ হেঁটে কলেজে যাওয়া-আসা সুধার অভ্যাস হয়ে গেছে। বিকেলে যখন ক্লান্ত হয়ে, ঘামে ভিজে, রোদে ঝলসানো মুখ নিয়ে সুধা ঘরে ফেরে, তখনো ওকে সুন্দর দেখায়।

আজ না হয় রঘুনাথবাবু মাথাভরা কাঁচা-পাকা চুল আর অশক্ত দেহ নিয়ে কাঠের আড়তে হিসেব লিখছেন! কিন্তু তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনের দুঃখে সংগ্রামে ও আদর্শে পোক্ত একটি মেরুদণ্ড আছে, যা কোন আন্দামানের লগুড়ের আঘাত ভাঙতে পারেনি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সুধা হয়েছে বাপেরই উপযুক্ত মেয়ে। কাব্যি করে বললে অত্যুক্তির মতো শোনায়, তবু কথাটা সত্যি—সুধা যেন রঘুনাথবাবুর ছেলেবেলায় দেখা মুক্তির স্বপ্ন, আবার নতুন করে দুরন্ত হয়ে উঠেছে। সুধা পলিটিক্স নিয়ে মেতে আছে, তবু রঘুনাথবাবু কোন নিষেধ করতে পারেন না। সেটা যেন নিজেকেই নিষেধ করা হবে। তাছাড়া সুধা তো পাশ করে যাচ্ছে ঠিক—পয়সার অপব্যয় হচ্ছে না।

রঘুনাথবাবু বলতেন—সুধা, তোদের আন্তর্জাতিকতার কথাগুলি আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

সুধা—আমরা সবদেশের দুঃখীদের মুক্তি চাই, সর্বজাতির পীড়িতদের সেবা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, পৃথিবীর পীড়িতরা সবাই মিলে যেন একটি জাত।

রঘুনাথবাবু—আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু সর্বজাতির পীড়িতদের একত্রে পাবি কোথায়, যে সেবা করবি?

সুধা—আমাদের আশেপাশেই তারা রয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষেতে মাঠে অফিসে

কারখানায়।

রঘুনাথবাবু—আমিও তো তাই বলি। তবে মিছে আমাদের ঘরকুনো বলে নিন্দে করিস কেন ?

সুধা হাসতে থাকে।

একটা পার্টি আর সমিতি আছে, সুধা তারই সদস্যা, অথবা ভলান্টিয়ার, কর্মিনী বা ব্রতিনী যে-কোন আখ্যা দেওয়া যায়। বর্মা থেকে হৃতাশ্রয় শত শত অভাগা প্রতিদিন শেয়ালদায় ট্রেন থেকে নামে। রোগে অনাহারে ও পথক্লেশে জীবগুলি যেন সারা হয়ে গেছে। মাড়োয়ারি সেবা সমিতির রিলিফ ক্যাম্পে গিয়ে পার্টির নির্দেশমতো সেবা-কমিটির সহকর্মিনীদের সঙ্গে সুধাকে খাটতে হয়। প্রায়ই কলেজ কামাই হয়। বাড়ি ফেরে হয়তো রাত্রি এগারটা-বারটায়। আশ্রয়-প্রার্থিনী মেয়েদের কোলের ছেলেদের দুধ জ্বাল দেওয়া থেকে শুরু করে খিচুড়ি-তরকারি রান্না পর্যন্ত, সব কাজ শেষ করে হলুদ-মশলার দাগে শাড়িটার দফা সেরে সুধা বাড়ি ফেরে।

মাধবী-নিবাসের সামনে একটা পতিত জমি শুধু কচুবনে ছেয়ে ছিল। আজ ক'মাস ধরে সেখানে একটি বাড়ি উঠছে। বড় বড় মার্বেলের স্ল্যাব আসছে, নানারকম ইস্পাতের ফ্রেম, সেগুনের চৌকাঠ, ঘষাকাঁচের সার্সী। রোজ সকাল বিকেল ইঞ্জিনিয়ারবা এসে তদ্বির করে যান। বাড়িটা একমহল দু'মহল করে চড়ে উঠছে। একটা অতিকায় কংক্রিটের সরীসৃপ যেন ফণা তুলে উঠতে উঠতে চারতলায় এসে শান্ত হলো।

বাড়িটার নামকরণ হয়ে গেল—দি সান্‌নি নুক—The Sunny Nook, কিন্তু গৃহপ্রবেশের দিন সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে এক কেলটে চেহারার বাঙালিসাহেব পরিবার বাড়িতে এসে ঠাঁই নিল। মিঃ এন-কে (নিশিকান্ত) রায়, তাঁর স্ত্রী ও একটি তরুণী—অর্থাৎ বুড়োবুড়ি ও তাঁদের মেয়ে। এক বছর পার হয়ে গেলেও পাড়ার কোন ভদ্রলোক এঁদের কুলশীলের কোন খবর পেল না। এঁরা কারও সঙ্গে মেশেন না, সমোটর বাড়িতে ঢোকেন এবং সমোটর বেরিয়ে যান। চাকর মালী খানসামা ও ড্রাইভার নিয়ে একটা ভৃত্যগোষ্ঠী আছে। কিন্তু তারাও কেমন একটু অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। প্রতিবেশী কোন ভদ্রলোক প্রশ্ন করলে মালীটা তবু কথা বলে উত্তর দেয়, খানসামা ইঙ্গিতে হ্যাঁ-না জানিয়ে দেয়, গোয়ানীজ ড্রাইভারটা তাকাতেই চায় না। কিন্তু সাত হাত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখলেই কি অন্দরের পরিচয় আটকে রাখা যায় ? তাহলে আর মহেঞ্জোদারোর রহস্য আবিষ্কৃত হতো না।

এন-কে রায় একজন ব্যাঙ্কার এন্ড জেমিন্দার। সরল করে বললে বলা যায়—গোটা দশেক লোন অফিস হয়তো আছে, যার কারবারী কীর্তি আসলে কাবুলী নিয়মেই নিষ্পন্ন হয়, তার ওপর কর্নওয়ালিশী কৌলীন্যের কৃপা। পার্থক্যের মধ্যে—হিসেবটা ইংরাজিমতে রাখা হয়, চোরা অডিটর দিয়ে খাতা গুছিয়ে রাখে ইনকামট্যাক্সকে ফাঁকি দেবার জন্য। একটা অসদোপার্জনকে গালভরা নাম দিয়ে রেজিস্ট্রারী করে যেসব ক্ষুদে ক্ষুদে জগৎ শেঠ দেশকে বিকিয়ে দিতে বসেছে, এন-কে তাদেরই একজন। শোনা যায় বিলিতি বুলেটের চেয়ে আমাদের দমদম বুলেট আরো ভয়ঙ্কর।

সান্‌নি নুকের ফটকের লোহার জাফরির ওপারে একটা ভীষণদর্শন টেরিয়ার সারাদিন মেজাজের গরমে চিৎকার করে ফেটে পড়তে থাকে। ফেরিওয়ালা, ভিক্ষুক বা ঠুলি-লাগামের সাজ-পরা ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া—পথ দিয়ে যেতে দেখলেই টেরিয়ারের বৈরনির্যাতনের উৎসাহ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দরজার গরাদ নখ দিয়ে সরোষে আঁচড়াতে থাকে।

মেয়েটির নাম মীর্ণা। নামটা আগে হয়তো মীনা ছিল, এখন ফিরিঙ্গিয়ানার অলঙ্কারের

ভারে মীর্ণা হয়ে গেছে। যেসব লোক সন্ধ্যায় চায়ের আসরে এসে হাসাহাসি করে, এ-নাম হয়তো তাদেরই দেওয়া। অথবা মিস্ রায় নিজেই সাধ করে নিয়েছে। মীর্ণাও কলেজে পড়ে, কিন্তু এমন একটা কলেজে যেখানে বারো আনা ছাত্রী সাদা-কালো দো-আঁশলা জাতের মেয়ে আর বাকি চার আনা বিশুদ্ধ সাদা। এ কলেজের মেয়েরা অনেকে মদ খায়, সিগারেট খায়, সাইকেল চড়ে, বাস্কেটবল খেলে। মীর্ণা রায় সিগারেট খায়, গোপনে মদ খেতে আপত্তি নেই—যদিও বুড়ো এন-কে এখনও এ খবর জানে না। তবে সাইকেল চড়তে পারে না মীর্ণা—বয়সের অনুপাতে চেহারাটা বড় বেশি মুটিয়ে গেছে। বাস্কেটবল খেলতে গিয়ে কোমরে চোট লেগেছিল প্রথমদিন, তারপর ওপথ ছেড়ে দিতে হয়েছে।

মীর্ণা রায়ও ঐ পার্টি আর সমিতিটার সদস্যা। সন্দেহ হতে পারে সমিতিটা কি বারোয়ারি গাজনতলা যে, যার ইচ্ছা সেই এসে একবার ঢাক পিটিয়ে নেচে যাবে? কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই? নেই নিশ্চয়, নইলে মীর্ণা রায় এখানে কি করে ঢুকতে পারে?

আরও আশ্চর্যের বিষয়, মীর্ণা রায় ঐ সমিতির খাসদরবারের একজন। সুধার মতো আর সব মেয়ে-কর্মীদের কাছে এটা ধাঁধার মতো লাগে। সমিতির পরিচালকদের সদ্বুদ্ধি সম্বন্ধে সংশয় জাগে। কিন্তু সুধার মতো মেয়েদের অহমিকা এখনো এত প্রখর হয়ে ওঠেনি, তাই বিসংবাদ সৃষ্টি করতে ওরা চায় না। সাধনার ক্ষেত্রে এখনো ওরা ছাত্রী হয়েই থাকতে চায়—শিক্ষা নিতে চায়—পরীক্ষা দিতে চায়। তাই ওরা চুপ করে থাকে।

কিন্তু মিস্টার এন-কে কোন্ পরাণে এই ক্ষুরস্য ধারা ইব সমাজসেবার পথে মেয়েকে ছেড়ে দিলেন?

এন-কে শুনেছিলেন যে সমিতিটার আদর্শ হলো আন্তর্জাতিক সেবা। কথাগুলি বড় গোলমেলে লেগেছিল। পরে অনেক ভেবেচিন্তে বুঝলেন, বোধহয় সি-এস-পি-সি-এ'র মতো কোন নিরীহ প্রতিষ্ঠান হবে। কুমার শিবেন্দ্র ভৌমিকের মতো বিলেতফেরত জমিদার বাচ্চাও যখন এই সমিতির আদর্শকে বেছে নিয়েছে, তখন মীর্ণাও সেই দিকে যাবে; ভবিষ্যতে যে-দু'জনের জীবন দাম্পত্যের বন্ধনে ধরা দেবে, আজ আদর্শের আসরে তারা ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। এন-কে খুশিই ছিলেন—সমিতিটা বেশ সুন্দর ঘটকালি করছে।

সমিতির বৈঠকে সুধা আর মীর্ণার মধ্যে কয়েকবার মুখোমুখি দেখা হয়েছে, কিন্তু বার্তা বিনিময় হয়নি কখনো। কাঁকুলিয়ার পথেও দেখা হয়েছে—কতবার চোখাচোখি হয়েছে। কিন্তু দু'জনের মাঝে যেন এক বৈতরণীর ব্যবধান, এমনিভাবেই তারা দু'জনে দু'জনকে তাকিয়ে দেখে। তবু এদের ব্রত এক, আদর্শ এক, বৈঠকের প্রস্তাবে দু'জনে সমান আগ্রহে হাত তুলে সম্মতি জানায়।

মীর্ণা রায় সত্যিই যেন আন্তর্জাতিকতার একটি চলচ্চিত্র। অঘ্রানের সন্ধ্যায় কাঁকুলিয়ার বাতাসে এমন কিছু হাড়কাঁপানো হিম থম্থম করে না; মীর্ণা রায়ের ফারের পোশাক দেখে মনে হয়—আল্পসের কোন উপত্যকার এক কুকুর-সঙ্গিনী মেয়ে বরফঢাকা পাহাড় ডিঙোতে চলেছে। চায়ের আসরে কত জাতের লোক যে আসে তার বর্ণনা চলে না। আসরে সমিতির আদর্শ ব্যাখ্যা করে অভ্যাগতদের বোঝানো হয়। বেঁটে বেঁটে চীনে কাপ্তেন, ঢ্যাঙা মার্কিন মিলিটারি অফিসার, ইংরেজ সাংবাদিক—তাছাড়া দিশী রামের বোতলের মত দীনহীন চেহারার প্যান্টালুন-পরা বাঙালি প্রফেসর আসে। এইসব বিচিত্র মশলা দিয়ে তৈরি এক অদ্ভুত আন্তর্জাতিকতার স্যালাড চেটে সন্ধ্যার সান্নি নুক তৃপ্তির উদ্গার তোলে। ভবিষ্যতের এক গিল্টিকরা সোনালী ফেরদৌসের স্বপ্নে এদের ভাবনায় রিমঝিম সুখের আবেশ লাগে। মীর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকের তামাকের পাইপ হাত থেকে ফসকে পড়ার উপক্রম হয়। সব শেষে মীর্ণা রায় এক প্যাকেট চকোলেট উপহার দেয়—কেনাডিয়ান সৈন্যদের জন্য।

ধন্যবাদ, সাধুবাদ, স্তুতি ও অভিনন্দনের ঝড় জেগে ওঠে।

ভম্বল স্কুলে ভর্তি হয়েছে। রঘুনাথবাবু একটু চিন্তায় পড়লেন—মাসিক খরচের অঙ্ক বাড়লো। উপরি কয়েকটা টাকার সংস্থান না হলে আর চলে না। কাজেই মাধবী-নিবাসের সঙ্গে সান্‌নি নুকের একটা যোগসূত্র দেখা দিল। একদিন দেখা গেল, ধরণী গয়লা নতুন শালিককে হেঁচড়ে নিয়ে এসে সান্‌নি নুকের ফটকের কাছে দাঁড় করালো দুধ দুইবার জন্য।

খাঁটি দুধের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। রঘুনাথবাবু রায়সাহেবকে দুধ বেচছেন আজকাল। ধরণী দুধ দোয়, ভম্বল কাছে দাঁড়িয়ে দেখে। মীর্ণা আর বুড়ো এন-কে পায়চারি করে বেড়ান। সতর্ক দৃষ্টি রাখেন—দুধে জল মেশানো হচ্ছে কিনা।

দুধের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে তবু সংশয় ও অভিযোগের অন্ত ছিল না। মীর্ণা প্রায়ই ভম্বলকে বলে—তোমার বাবাকে বলে দিও খোকা, গরুটার দুধ ভয়ানক খারাপ। এরকম হলে দাম কাটা যাবে।

মীর্ণা আসলে এই গরুটাকে পছন্দই করতো না—বোধহয় ঐ নামটার জন্য। এক-একদিন বিদ্বেষ চেপে রাখতে পারতো না মীর্ণা। ভম্বলকে আবার কথা শুনতে হতো—খোকা, গরুর নাম শালিক রেখেছ কেন? তোমার নাম যদি বুল ডগ রাখা হয়, তবে সেটা কি ভাল শোনাবে?

শেষকালে নতুন শালিককে নিয়েই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল।

রবিবারের বিকেলবেলা সুধা জানালার ধারে বসে বই পড়ছিল—নব্য-রুশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। জাতির মুক্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী চাষী-মজুরের প্রচণ্ড সংগ্রামের কাহিনী। তারা শত্রুকে যখন স্পষ্ট করে চিনে ফেললো, তারপর আর দ্বিধা করেনি। আভিজাত্যের জারজ হিংসার সিংহাসনকে হিড় হিড় করে টেনে নামিয়ে চুরমার করে দিয়েছিল তারা। তাদের সেই আদর্শে জোড়াতালি ছিল না, মিথ্যার সঙ্গে আপস ছিল না...।

সুধা দেখলো—মীর্ণা কুকুর নিয়ে পথের ওপর পায়চারি করছে। নিজের ভাবনার মাঝখানেই সুধা হঠাৎ হেসে ফেললো। ঐ মীর্ণা নাকি তারই সহব্রতিনী—এক আদর্শের সূত্রে দু'জনে বাঁধা! ঘৃণায় গা শিরশির করে উঠলো সুধার। মীর্ণার আদর্শ? পথের কাঁটারাই যদি নিজেদের পথ বলে জাহির করে! আদর্শের মিল? কোথায়? এ-যে জীবন দিয়ে গড়া ব্যবধান! মিটিংয়ের কোন কোরাস সঙ্গীতের নাকিসুর এই ব্যবধান ভেঙে মিলিয়ে দিতে পারবে না। সমিতিটারও যেন কেমন মতিচ্ছন্ন হয়েছে! কয়েকটা বড়লোক কিছু মোটা চাঁদা দেয় বলেই কি এমনভাবে মুখ বুজে অনধিকারীর নষ্টামি সইতে হবে?

কুকুরের ঝগড়ার বিদ্‌ঘুটে চিৎকারের শব্দ। সুধা তাকিয়ে দেখলো—টেরিয়ারে আর নেলোতে মারামারি লেগে গেছে। নেলোটা যদি এখনো ভালয় ভালয় পালিয়ে যায়, তবে বাঁচতে পারে। কিন্তু নেলো যেন ক্ষেপে গেছে, মরিয়া হয়ে টেরিয়ারের ওপর দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে পড়ছে বার বার। টেরিয়ার নেলোর টুঁটি কামড়ে মাটির ওপর এক ঝাপটে চিত করে চেপে ধরলো।

অসহায়ের মতো ছটফট করছে নেলো—চিৎকার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তার ওপর ড্রাইভারটা একটা লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসছে—একটি বাড়ি দিয়ে নেলোকে সাবড়ে দেবে; পরিত্রাহি চিৎকার করছে মীর্ণা।

চার পায়ের ক্ষুরের দাপটে কাদা ছিটকে কোথা থেকে গোঁ গোঁ করে শিং উঁচিয়ে দৌড়ে এল নতুন শালিক—নেলোকে উদ্ধার করতে। তার মনের প্রতিজ্ঞা শিং দুটোর তীক্ষ্ণতা দেখেই

বুঝতে পারা যায়—টেরিয়ারকে না ফুঁড়ে দিয়ে সে আর ফিরছে না।

নেলোকে ছেড়ে দিয়ে টেরিয়ার সভয়ে দূরে সরে গেল। ড্রাইভার লাঠি নিয়ে নতুন শালিকের পিঠে বসিয়ে দিল ঘা'কতক। নতুন শালিক মার খেয়ে পালিয়ে গেল অন্য দিকে। মীর্ণা রায় এই সংগ্রামের আবর্তের মধ্যে পড়ে আতঙ্কের শক লেগে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

নেলো পালিয়ে এসে মাধবী-নিবাসের সিঁড়ির ওপর বসে ধুঁকতে লাগলো। সুধা দেখলো—ওর গলার মাংস গভীর হয়ে ছিঁড়ে গেছে, হয়তো বাঁচবে না।

মীর্ণা রায়ের সত্যি শক লেগেছিল। সন্ধে পার হয়ে গেছে তখন, সান্‌নি নুকের তেতালার একটা ঘরে পাখার নীচে বসেছিল মীর্ণা। বুকের দুরুদুরু ভাবটা তখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। গেঁয়ো-কাঁকুলিয়া যেন চক্রান্ত করে আজ তাকে আক্রমণ করেছে। জোনাকিগুলি দলে দলে ঘরে এসে ঢুকছে। একটা মশার ঝাঁক আলোর বাল্‌বটাকে মারমুখো হয়ে ঘিরে ধরেছে। ডানাওয়ালা বেঁটে কচ্ছপের মতো চেহারা, একটা গুব্‌রে পোকা কষ্ট গুঞ্জন তুলে ঝুপ করে মীর্ণার কোলের ওপর পড়ে আক্রোশে ছটফট করতে লাগলো। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো মীর্ণা।

সকালবেলা রঘুনাথবাবুকে সান্‌নি নুকের চাকর খবর দিয়ে গেল—ব্যারামী গরুর দুধ আর চাই না। অবিলম্বে যেন বকেয়া দাম মিটিয়ে নিয়ে চলে যান।

বিকেলবেলা সমিতির জরুরি বৈঠকে সুধা দেখলো—সমিতির নেতা উপনেতা মোড়ল দালাল সবাই উপস্থিত, শুধু নেই মীর্ণা রায়। অসুস্থ বলেই আসতে পারেনি।

কলকাতার জোয়ান অব আর্ক, সেই মীর্ণা রায়ই কিন্তু প্রস্তাবটা পাঠিয়েছেন, পেশ করলেন কুমার শিবেন্দ্র। প্রস্তাবের বক্তব্য—

সমিতির আন্তর্জাতিক সেবার আদর্শে অনেক বদ্‌জাতির ভেজাল ঢুকতে আরম্ভ করেছে। সভ্যতালিকা পার্জ করা হোক। সন্দেহভাজনদের নাম রিপোর্ট করতে একটি কমিটি গঠনের আজ্ঞা হয়।

নেতাগোছের লোকগুলিই আগে হাত তুলে সায় দিল। মুহূর্তের মধ্যে সুধার চোখের সামনে থেকে যেন একটা ঝাপ্‌সা পর্দা সরে গেল। সুধার মনে হল, কতকগুলি হালফ্যাসানের অঘোরপন্থী যেন কারও মাংস ছিঁড়ে খাবার জন্য হাত তুলে রয়েছে।

সুধাও তাড়াতাড়ি হাত তুলে প্রস্তাবে সায় দিল। সে জানে এখানে এই তার শেষ হাত তোলা।

পিছু ডাকে

জেঠিমা, মেজমামী আর হেনা-বউদি, তিনজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে আর একসঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। সবারই মুখে এক জিজ্ঞাসা—কই শুভা, তোর বাক্সটা কোথায়?

শুভা বলে—ওই তো।

তিনজনেই আবার একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বাক্সটার কাছে এগিয়ে এলেন।

শুভা জিজ্ঞাসা করে—কী ব্যাপার?

জেঠিমা বললেন—বাক্সটা বেশি ভারি হয়ে গিয়েছে। একটু হালকা করে দিতে হবে।

জেঠিমার কথার সরল অর্থ এই যে, বাক্সের ভিতরে এত বেশি জামা-কাপড় ঠাসা হয়েছে

যে বাক্সটা খুব ভারি হয়েছে। যাতে বাক্সটা বেশ-একটু হালকা হয়ে যায়, সেজন্যে যা করা দরকার, তিনি তাই করতে চান। তার মানে, কিছু কাপড়-জামা বের করে নিতে হবে।

মেজমামী বলেন—তাছাড়া, বাক্সের কাপড়-জামা একটু ভাল করে সাজিয়ে ও গুছিয়ে দিতে হবে।

হেনা-বউদি বলেন—বাড়িতে এত লোক থাকতে মণ্টুকে কে সরদারি করে এই বাক্স সাজাতে বলেছিল!

শুভা বলে—আমি বলিনি। মণ্টু নিজেই বললে, দিদি, আমি তোমার সব কাপড়-জামা নতুন বাক্সে ভরে দিয়েছি।

ঠিক কথা, দশ বছর বয়সের মণ্টুর পক্ষে শুভার বাক্স ঠিকমত সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই জেঠিমা মেজমামী আর হেনা-বৌদি আবার নতুন করে শুভার বাক্স সাজিয়ে দিয়ে আর একটু হালকা করে দিতে চান। শুভার পুরনো বাক্স থেকে কাপড়-জামা আর টুকিটাকি আরও সব জিনিস তুলে নিয়ে নতুন বাক্সের ভিতরে এলোমেলো ঠেসে দিয়েছে মণ্টু, সবাই তাই সন্দেহ করেছেন।

শুভার বিয়ে হয়েছে কাল। আজ এই বিকেলে শুভাকে নিয়ে বর আর বরযাত্রীরা সব একটি মোটরবাসে রওনা হয়ে যাবে ধানবাদ থেকে গিরিডি। রাত আটটার মধ্যেই ওরা গিরিডি পৌঁছে যাবে, সেখানে নববধূকে ঘরে তুলে নেবার জন্যে বরণডালা আর শাঁখ বোধহয় এরই মধ্যে তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে।

রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। বরকর্তা বলেছেন, ঠিক তিনটে একুশ মিনিটে যাত্রালগ্ন। তার মানে আর কুড়ি মিনিট বাকি আছে।

শুভার সাজ আগেই সারা হয়ে গিয়েছে। হেনা-বউদি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে নিজের হাতে শুভাকে সাজিয়েছেন। তখন কিন্তু কারো মনে হয়নি যে শুভার বাক্সটাকে একটু ভাল করে সাজিয়ে দেওয়া দরকার। যেন বাক্সটা একটু হালকা হয়। যেন বাক্সের ভিতরে কোন ভুল না থেকে যায়।

তিনজনের এই ব্যস্ততা যেন একটা সন্দেহের আর উদ্বেগের ব্যস্ততা। সবারই হঠাৎ মনে হয়েছে যে শুভার বাক্সের ভিতরে একটা ভুল নিশ্চয়ই থেকে গিয়েছে। মণ্টুর বুদ্ধি আর কতটুকু।

জেঠিমা এক-এক করে এক-একটা শাড়ি টেনে বার করছেন আর কী যেন দেখছেন। কিন্তু দেখতে না পেয়ে আবার একটা শাড়িকে নামিয়ে ফেলেন।

মেজমামী চোখ দুটোকে বাক্সের কাছে নিয়ে এসে কী যেন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন।

শুভা যার নাম, যে-মেয়ের কাল বিয়ে হয়েছে, সে-মেয়ের বয়স আজ বাইশ বছর তিন মাস। আজ থেকে চার বছর আগে, সেদিন এই মেয়ের বয়স ছিল মাত্র আঠার বছর তিন মাস, সেদিনও এই মেয়ে নববধূ হয়ে নতুন জীবনের পথে যাত্রা করেছিল। কিন্তু মাত্র আট মাস পরেই সিন্দূর মুছে দিয়ে সেই মেয়েকে আবার ধানবাদের এই বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

প্রত্যেকে দুঃখিত হয়েছিলেন, আত্মীয়েরা ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন—শুভার আবার বিয়ে দেওয়া হোক। বিধবার বিয়ে তো দোষের কিছু নয়। তাছাড়া এই বয়সের মেয়েকে সারা জীবন বিধবা থাকতে দেওয়া চলে না। ওরকম নিষ্ঠুরতার কোন অর্থ হয় না।

সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হয়েছিলেন শুভারই শাশুড়ি। তিনি বার বার শুভার বাবাকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন—বিয়ে দিন অনাদিবাবু। আমরা সবাই চাই, শুভার আবার বিয়ে হোক।

আবার বিয়ের কথা শুনে শুভাও কোন বিদ্রোহ দেখায়নি। শুধু কয়েকটা দিন খুব কেঁদেছিল। তারপর শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

কোন সন্দেহ নেই, শুভা খুশি হয়েছে। আজই সকালে বরযাত্রীদের সামনে বসে শুভা তিনটে গান গেয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুর দেখে শুভার চোখ একবার শুধু একটু ছলছল করেছিল, তারপর সেই ছলছলে চোখই হেসে উঠেছিল।

কিন্তু যাত্রা-লগ্নের কুড়ি মিনিট আগে হঠাৎ এই তিন অভিভাবিকা এত উদ্বিগ্ন আর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ? মণ্টুর বুদ্ধির ওপর এত সন্দেহ বা কেন দেখা দিল ?

শুভাও স্পষ্ট করে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কেন সবাই বাক্সটাকে হালকা করে দেবার জন্যে আর ভাল করে সাজিয়ে দেবার জন্যে এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সত্যি কথা, মণ্টুর বয়স দশ বছর হলেও মণ্টুর বাক্স-সাজাবার দক্ষতা কারও চেয়ে কম নয়। এই তো মাত্র দশ মাস আগে হেনা-বউদির বোন সুলেখার বিয়ে তো ধানবাদের এই বাড়িতেই হয়েছিল। সুলেখার বাক্সে কাপড়-জামা ভরেছিল আর সাজিয়ে রেখেছিল এই মণ্টু। কই, সেদিন তো এরা কেউ আপত্তি করেনি। কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে সুলেখার বাক্স হালকা করবার জন্যে ছুটে আসেনি !

বাক্সটা প্রায় খালি হয়ে গেছে। প্রায় সব কাপড়-জামা বাক্সের ভিতর থেকে বের করে ফেললেন জেঠিমা। মেজমামী হঠাৎ বলে ওঠেন—এই তো ! পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে হেনা-বউদি বাক্সটার ভেতর হাত চালিয়ে দিয়ে একটা বস্তু তুলে নিলেন। হাঁফ ছাড়েন জেঠিমা—যাক, এবার সব কাপড়-জামা বাক্সের ভিতরে ভরে দাও হেনা।

মেজমামী হাসেন—সত্যি কথা, হেনা কিন্তু মণ্টুর মতো অত সুন্দর করে বাক্সের ভিতরে কাপড়-জামা সাজিয়ে দিতে পারবে না।

হেনা-বউদিও হাসেন—পারতাম, কিন্তু আর তো সময় নেই।

শুভার দুই চোখ এইবার অপলক হয়ে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হেনা-বউদি যে বস্তুটাকে বাক্সের ভিতরের কাপড়-জামার শেষ স্তরের তলা থেকে তুলে নিয়ে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন, সে বস্তুটির পরিচয় জানে শুভা। আজ প্রায় তিন বছর ধরে এই বস্তুটি এই বাক্সের কাপড়-জামার শেষ স্তরের আড়ালেই পড়ে ছিল।

একটি ফটো। চার বছর আগের ফটো। শুভার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে নবেন্দু ; শুভার স্বামী নবেন্দু। সে নবেন্দু আজ আর নেই। নবেন্দু আজ নেহাতই একটি ফটোর নবেন্দু। এই ফটো আজকের নবেন্দু-শুভার বাক্সের ভিতরে একটুও মানায় না। খুব ভুল হবে, যদি ওই ফটো শুভার বাক্সের ভিতর থেকে যায়।

শুভা চুপ করে বসে দেখতে থাকে, হেনা-বৌদি আবার সায়া, কাপড়-জামা নতুন বাক্সের ভিতরে ভরে দিলেন।

বাইরের বারান্দা থেকে অনাদিবাবু ডাক দেন—কই, তোমরা সব কোথায় ?

জেঠিমা বলেন—আয় শুভা।

শুভা হাসে—বাক্সটা এইবার বোধহয় খুব হালকা হয়ে গিয়েছে, জেঠিমা ?

জেঠিমা—অ্যাঁ ? কি বললি ?

শুভা আবার হাসে, আর হাসতে গিয়ে, দুই চোখ জলে ভরে যায়। —ঠিকই সত্যি, বাক্সটা এইবার খুব হালকা হয়ে গেল।

সিদ্ধপুরুষ

রামগড় থেকে রাজপুর কোলিয়ারিতে যাবার সড়কে একুশ মাইল-স্টোনের কাছে এসেই হঠাৎ ব্রেক কষে ছুটন্ত জিপগাড়ির দুরন্ত আবেগ থামিয়ে দিল লোকনাথ, কোলিয়ারির এঞ্জিনিয়র চরণবাবুর ছেলে।

লোকনাথ বললে—দেখবেন তো চলুন, অডিটরবাবু। এখানে একজন সিদ্ধপুরুষ থাকেন।

—সিদ্ধপুরুষ ?

লোকনাথ—হ্যাঁ, একজন খাঁটি সিদ্ধপুরুষ। উনি গাছের ভাষা বোঝেন, গাছের সঙ্গে কথা বলেন। গাছেরা, যত শাল, কেঁদ, মহুয়া আর পিয়ালেরা ওঁকে খুব ভালবাসে। সবচেয়ে বেশি ভালবাসে একটি আমগাছ।

সড়ক থেকে সামান্য একটু দূরে, যেখানে ফাঁকা শালবনের পাশে মুণ্ডাদের গাঁয়ে মাদল বাজছে আর অনেক-পুরনো কয়েকটা ইটখোলার ধ্বংসের গায়ে শেয়ালকাঁটার জঙ্গলের উপর হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে একটা একলা আমগাছের ছায়ার কাছে ছোট্ট একটা ঘর ; ইটের দেয়াল আর খাপ্‌রার চালা।

লোকনাথ বললে—ওই, ওই ঘরটাই হলো সিদ্ধপুরুষের আস্তানা।

—চল, দেখে আসি।

সড়ক থেকে নেমে, ফাঁকা শালডাঙ্গার চোরকাঁটা মাড়িয়ে সেই ঘরের দিকে যেতে যেতে লোকনাথ বললে—এই সিদ্ধপুরুষের বয়স তিনশো বছরের বেশি ছাড়া কম নয়। কোলিয়ারির কম্পাসবাবু বলেন, অন্তত পাঁচশো বছর হবে। ঠিক কবে আর কোথা থেকে তিনি এখানে এসে আস্তানা করলেন, তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। বোশেখ মাসে যখন পাহাড়-পোড়ানো গরম বাতাসের হল্কা লেগে মাঠের গরু মরে যায় আর ঘরের মানুষেরা ছটফট করে, তখন গাছেরা ঠাণ্ডা বাতাস বইয়ে দিয়ে সিদ্ধপুরুষের আস্তানাটিকে ঠাণ্ডা করে রাখে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যে-রাতের আকাশে পূর্ণমাসীর চাঁদ ঝলমল করে জ্যোৎস্না ছড়ায়, সে-রাতে সিদ্ধপুরুষের ঘরের আঙিনার এই আমগাছ চমৎকার একটি সুন্দরী মেয়ে হয়ে আর হেসে-হেসে সিদ্ধপুরুষের কাছে এসে দাঁড়ায়। কম্পাসবাবু দেখেছেন, রাজপুর থানার সেকেন্ড অফিসার নিমাইবাবুও দেখেছেন, সেই চমৎকার সুন্দরীর সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছেন সিদ্ধপুরুষ।

ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন সিদ্ধপুরুষ। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি। কিন্তু এ কী ? এরকম অদ্ভুতভাবে দুই চোখ অপলক করে তিনি আমাকে দেখছেন কেন ?

সিদ্ধপুরুষ বললেন—তুমি তো বিমলের বন্ধু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সিদ্ধপুরুষ—আমাকে মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। চিনতে পেরেছি। আপনি হলেন বিমলের মামাবাড়ির ভোলাদা। সেই যে, আজ বোধহয় ত্রিশ বছর হলো, আপনি বর্ধমানে চলে গেলেন, তারপর আর আপনাকে দেখিনি। শুনেছিলাম, আপনি বিয়ে করেছেন।

ভোলাদা—হ্যাঁ, বিয়ে হবার পর রেলওয়ের ইট সাপ্লাইয়ের কন্ট্র্যাক্ট পেয়ে এখানে এসে আর এই ঘরটি তৈরি করিয়ে সস্ত্রীক ঠাঁই নিয়েছিলাম। তারপর আর বেশি দিন নয়, একটা বছরও

পার হয়নি, তিন দিনের জ্বর সহ্য করতে না পেরে সে চলে গেল। একলা হয়ে এই ঘরে শুধু রয়ে গেছি আমি।

—কিন্তু এরা যে বলছে, আপনি একজন সিদ্ধপুরুষ। পূর্ণিমার রাতে আপনার ঘরের আঙিনার ওই আমগাছের ছায়া নাকি চমৎকাব এক সুন্দরী মেয়ে হয়ে আপনার কাছে দেখা দেয়!

হেসে ফেললেন ভোলাদা—না, ঠিক তা নয়। চমৎকার একটি সুন্দরী মেয়ে আমগাছের ছায়া হয়ে আমার কাছে দেখা দেয়।

—আজ্ঞে? কী বললেন?

ভোলাদা—তোমার বউদি নিজের হাতে এই আমগাছের চারা পুঁতেছিল। আর, জানো না বোধহয়, তোমার সেই বউদি দেখতে খুব সুন্দর ছিল।

কোন মিল নেই, তবু মিল

সেদিন সেখানে যে-কাজ করতে হয়েছিল, সেটা ছিল রিলিফের কাজ। আজ এখানে যে-কাজের জন্য এসেছি, আর ক্যাম্পও করে ফেলেছি, সেটাও রিলিফের কাজ। কিন্তু পাঁচ বছর আগের সেই আগস্ট, আর আজকের আগস্টের আলো-ছায়ার মধ্যে কোন মিল নেই। সেই আগস্টের সকালবেলার বাতাসে যদিও হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার কামড় ছিল না, কিন্তু কুয়াশার মধ্যে যেন মৃদু হিমের একটা মোলায়েম আমেজ ছিল। সেই আমেজের ছোঁয়াচ লেগে গরম কফির স্বাদও নিবিড় হয়ে যেত। তারপরেই দেখতে পাওয়া যেত, কুয়াশা গলিয়ে দিয়ে রৌদ্রের আভা কাথিড্রালের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার উপর লুটিয়ে পড়েছে। সোনার মিনারের মতো ঝলমল করছে সেই চূড়া।

আর আজ এখানে দেখতে পাচ্ছি, একটা গেঁয়ো মন্দিরের মাথার ত্রিশূল জলের উপর ভেসে রয়েছে। তার মানে বন্যার জল মন্দিরটাকে ডুবিয়ে দিয়ে ত্রিশূলের গোড়া অবধি উঠেছে। সেই আগস্টের আকাশে সূর্য ছিল, আজকের এই আগস্টের আকাশে শুধু মেঘ আর মেঘ। সন্দেহ হয়, আবার বৃষ্টি হবে। এই মেঘ সহজে সরে যাবার মেঘ নয়।

দানাপুরের আর্মি মেডিক্যালের অফিস থেকে হঠাৎ জরুরি অর্ডার এসেছে—অতঃপর কর্নেল সলিল মজুমদার কোশীর পূবদিকের এলাকাতে রিলিফের কাজ চালাবেন, আর কর্নেল মালহোত্র নদীর পশ্চিম দিকের এলাকার রেস্কু কাজের ভার নেবেন।

শান্তিপুর থেকে বড় মাসিমারও একটি চিঠি এসেছে—বাবা সলিল, অন্তত সাত দিনের ছুটি নিয়ে একবার চলে এস।

ছুটি নিয়ে শান্তিপুর যাবার জন্য বড় মাসিমার এই তাগিদের কারণও চিঠিতে লেখা আছে। বড় মাসিমা জানিয়েছেন, তার বাগানের তিনটি ভাদুই আমের গাছ—মধুনাথ, ভোজেশ্বর আর গোলবদন খুব ভাল ফলেছে। ফল পাকতে শুরু করে দিয়েছে। আর বোধহয় দশ দিনের মধ্যেই সব ফল পেকে সারা হয়ে যাবে। কাজেই...।

বড় মাসিমার কাছে আজকের আমি অর্থাৎ আর্মি মেডিক্যালের কর্নেল সলিল মজুমদার বোধহয় কুড়ি বছর আগের সেই বারো বছর বয়সের সলিল, আমের লোভ দেখিয়ে চিঠি দিলেই যে-ছেলে শান্তিপুরে ছুটে যেত।

আজ এখানে আমার ক্যাম্পের একটি চেয়ারে বসে আর রিলিফ অপারেশনের চার্ট ও

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে যে-সব গ্রামের নাম দেখছি, তাদের সঙ্গে সেইসব গ্রামের নামের কোন মিল নেই। এখানে এরা হলো, বাহাদুরগঞ্জ মকবুলপুর হারু-মারু ভিখপুরা আর চাঁদিবাজার। পাঁচ বছর আগে সেখানে যাদের বুকের উপর দিয়ে আর্মি মেডিক্যালের কনভয় ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল, তারা হলো—লাস্ত্রা কলম্বানো, সিগনা আর মন্টিলুপো। সেদিন সেখানে নদী আর্নোর জল পার হতে হয়েছিল। আজ এখানে নদী কোশীর জল পার হয়ে দুর্ভাগা গ্রামের আটক-পড়া মানুষগুলিকে উদ্ধার করতে হবে। ঘরে ঘরে ক্ষুধার খোরাক পৌঁছে দিতে হবে।

যেতে হবে মকবুলপুর, যেতে হবে চাঁদিবাজার। কিন্তু বার বার পাঁচ বছর আগের সেই ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ছে কেন ? হ্যাঁ, একটা কারণ আছে। সেদিনও ফ্লোরেন্সের ভিতরে কনভয় নিয়ে ঢুকে পড়তেই হঠাৎ অর্ডার পেয়েছিলাম, মারাঠা ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে এইবার আমার মেডিক্যাল ইউনিটকেও থাকতে হবে, আর রেল-ব্রিজ দখল হয়ে যাবার পর রিলিফের কাজ করতে হবে।

ফ্লোরেন্স দখল করবার সেই দিনগুলিকেও মনে পড়ছে। বারুদের গন্ধধূমে অন্ধ হওয়া আর গোলাগুলির শব্দে বধির হওয়া তিনটি ভয়ানক যুদ্ধের দিন। মাইনের জালে জড়িয়ে পড়ে, আর মৃত্যুময় এক-একটি বিকট বিস্ফোরণের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে ওয়েস্ট কেন্টের আগুয়ান জিপগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। প্রচণ্ড জ্বালা আর শব্দের বিভীষিকার মধ্যে কষ্ট ড্রাগনের মতো এক-একটি জার্মান ট্যাঙ্ক একটু একটু করে পিছনে হটে যাচ্ছে। এক নম্বর গোর্খাদের একটা কোম্পানি শুধু কুকরি আর গ্রেনেড হাতে নিয়ে আব 'কালী মায়ী কি জয়' হাঁক দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্কের উপর ঝাঁপিযে পডছে। মুনোনি ক্যানেল পার হবার সময় নিহত গোর্খাদের লাশের মধ্যে একটি পরিচিত মুখের ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। গায়ের উর্দিতে শুকনো রক্ত তখনও লাল হয়েই আছে, আর কুকরিটাকে হাতে ধরে রেখেছে, মাটির জংলা ড্যাফোডিলের উপর পড়ে আছে নিষ্প্রাণ নন্দু থাপা, যে একদিন আমাকে কাসিনোতে গরম হালুয়া খাইয়েছিল।

একুশ ইন্ডিয়ান ইনফ্যানট্রি ব্রিগেডের উপর নির্দেশ আছে, জার্মান ট্যাঙ্ক হটিয়ে দিতে ও ধ্বংস করতে হবে, ফ্লোরেন্সের বুভুক্ষুদের মধ্যে রুটি ময়দা মাখন আর ওষুধের বিলি-বিতরণের কাজও করতে হবে। আমার মেডিক্যাল ইউনিটকেও তাই বিশুদ্ধ রিলিফেরও ইউনিট হয়ে আর ফ্লোরেন্সের ভিতরে গিয়ে ঠাঁই নিতে হবে।

পিয়াৎসা ভাসারি, সড়কের পাশে একটি ধসে-পড়া সিনেমা ভবনের মধ্যে রুটি-ময়দার বিরাট সম্ভার নিয়ে বসে আছি। মারাঠাদের একটি প্লেটুন আমার রিলিফ ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওদিকে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধার্ত নরনারী, বৃদ্ধ ও শিশু, যুবা ও তরুণী। জমাদার বলবন্ত স্টিক উঁচিয়ে সেই ক্ষুধার্ত ভিড়কে শান্ত হতে আর সুশৃঙ্খল হতে নির্দেশের সঙ্কেত দোলাচ্ছে। আর, মাঝে মাঝে, কে জানে কিসের উল্লাসে সুর করে শিস দিচ্ছে।

রুট-মার্চ করে ওয়েস্ট-কেন্টের ব্যাটেলিয়ন শহরের আরও ভিতরে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছি, সড়কের দু'পাশের বাড়ির উপরতলা থেকে অনেক ফুল, স্বাগত অভ্যর্থনার অনেক ফুলের উপহার ঝরে পড়ছে ঘর্মাক্ত ব্যাটেলিয়নের মাথার উপর। খবর পাচ্ছি, একে একে শহরের সব এলাকাই দখল হয়ে চলেছে। তিন নম্বর পাঞ্জাবের একটি ব্যাটেলিয়ন হিপোড্রোম আর জ্যাকোপিনো এলাকাতে ডেরা করে ফেলেছে। কিন্তু পিয়াৎসা কাভুর, বেচারিয়া আর ডোনাটেনো এখনও উচ্ছৃঙ্খল। সেখানে গলায় লাল রুমাল বেঁধে ফাসিস্তির ছোকরাদের দল পিস্তল আর হাতবোমা নিয়ে পার্টিজান ছোকরাদের মারছে আর মরছে। কিংস ড্রাগুন গার্ডের একটি দল এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দু'পক্ষেরই দুরন্তদের হত্যা করছে। পিয়াৎসা মার্কেরি

খবর বড়ই করুণ। সেখানে ফ্যাসিস্তির ছোকরাদের লাশের সঙ্গে কিছু নিরীহ ঘরোয়া মানুষেরও লাশ ছড়িয়ে পড়ে আছে ; তার মধ্যে বুড়োবুড়ি আর ছোট ছেলেমেয়েও আছে। এদের হত্যা করলো কে ? জমাদার বলবন্ত বলে—টমিলোগ। খুব বেশি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিল ওই ড্রাগুন গার্ডের দল।

সেদিনে আর এদিনে কোন মিল নেই, সে জায়গা আর এই জায়গার রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শের মধ্যেও কোন মিল নেই। সেখানে বিলি করতে হয়েছিল রুটি ময়দা মাখন। এখানে বিলি করতে হচ্ছে চিঁড়ে গুড় আর ছোলা। সেখানে রাতের বুলেভারে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি, বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে একটা পাগল। এখানে এই কিছুক্ষণ আগে নিকটের একটা গ্রামে রিলিফ পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখে এলাম, খড়ের মাচানের উপরে বসে অনেক লোক শোকের কান্নার মতো ভীরু করুণ স্বরে আর একসঙ্গে চিৎকার করে গান গাইছে, হে সীতানাথ রাম ! হে রঘুনাথ রাম !

ওয়েস্ট কেন্টের মাথার উপর তো অনেক ফুল ঝরে পড়েছে। কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কারা ঝরিয়েছে ফুল। সড়কের দু'পাশের বাড়ির উপরতলায় খোলা জানালাতে অনেক সুস্মিতা ও বিহ্বলা সুন্দরীর হাত-দোলানো ফুর্তির খেলাও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারা গেল না, ওরা কারা ? এ তবে কি একটা ছল-অভ্যর্থনার ফাঁদ ?

পালাৎসো রিকার্ডি, যেখানে অ্যালায়েড মিলিটারি সরকারের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ওয়েস্ট কেন্টের ছোকরাদের মুখে আর সে হাসি নেই, বাড়ির উপরতলার জানালাতে খোঁপা বেণী আর স্ফীতবক্ষ জামা দেখতে পেয়েও ওরা আর হল্লা করে গান গেয়ে ওঠে না। কারণ, ওই পালাৎসো রিকার্ডির গেটের সামনে ওয়েস্ট কেন্টের মেসিনগানের সবচেয়ে জবরদস্ত যে দল পাহারা দিচ্ছে, তাদের মাথার উপর অনেক ফুলের সঙ্গে অনেক বোমাও ঝরে পড়েছে। তাই এবার অর্ডার হয়েছে পাড়ায় সন্ধান করে আর ঘর তল্লাশি করে যাকে সন্দেহ হবে তাকেই ধরো।

রিলিফের কাজ মাত্র সকালে ও বিকেলে দু'ঘণ্টা। তারপর সন্ধান আর ধর-পাকড়ের কাজ। শুধু আমার মেডিক্যাল ইউনিটকে নয়, সড়ক মেরামতের একটা ফিল্ড কোম্পানিকেও পেট্রল দিতে বের হতে হয়। ফিল্ড কোম্পানির হাবিলদার চন্দন সিং বলে—আজব তামাসা। আমরা মিস্তিরির দল ব্রেনগান হাতে নিয়ে পাহারাদারি আর খবরদারি করবো, আর কেন্টু-জেন্টু যত কমবাটান ঘরের ভিতরে নেচে-গেয়ে হুল্লোড় করবে, বাঃ !

বুঝতে পারছি না, আজ এখানে বানভাসি কোশীর কাছে, সেকেলে একটা পুরনো গড়-কেল্লার উঁচু চাতালের উপরে বস্তা-বস্তা চিঁড়ে গুড় আর ছোলার ভিড়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে, আর নিকটে ও দূরের এক-একটা প্রায় ডুবন্ত গাঁয়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বার বার শুধু ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ে কেন ? বেশ অদ্ভুত রকমের একটা মনের খেলাই বলতে হবে। এই জল দেখে সেই কুয়াশার কথা মনে পড়ে। এই পিছল কাদার সড়কটাকে দেখে সেই পিয়াৎসা মার্কো আর পিয়াৎসা ভাসারির কথা মনে পড়ে। আর, এই ডুবুডুবু মন্দিরের বিষণ্ণ ত্রিশূলটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, রোদের আভা লেগে সোনার মিনারের মতো ঝলমল করছে ফ্লোরেন্সের কাথিড্রালের চূড়া।

বানের জলের উপর দিয়ে রিলিফের লটবহর নিয়ে আর পাঁচটি মোটর বোট ভাসিয়ে যখন মকবুলপুরে পৌঁছলাম তখন বেলা দশটা। কিন্তু রোদ নেই। আকাশের মেঘের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায়, রোদের ছিটে-ফোঁটা আসার কোন চিহ্নও সেখানে নেই। এই কাদাঘোলা বানের জলের চেহারাও কত কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই আর্নো নদীর জল গোলা-বারুদের কালো ধোঁয়ার ছায়া মেখেও এত কালো হয়ে যায়নি। সে জলে এমন প্রবল

ঢলও ছিল না। কলকল টলমল ছলছল, আর্নো নদীর নীলজল। তবু কী আশ্চর্য, এই কোশীর জল পার হতে গিয়ে বার বার সেই আর্নোকে মনে পড়ে যাচ্ছে। আর আর্নোকে মনে পড়তেই ফ্লোরেন্সের কথা মনে পড়ে যায়।

হ্যাঁ, এটা মকবুলপুর, এদিকে ওদিকে শুধু যত গলা-পচা মাটির ঘর। মরা মহিষ ফুলে ঢোল হয়ে পড়ে আছে। পেয়ারা গাছের মাথার সঙ্গে ভাঙা খাটিয়া জড়িয়ে রয়েছে। পচা খড়ের মাচানের উপর শকুন। এ গাঁয়ে একটিও মানুষ নেই। সিভিল হাসপাতালের কম্পাউন্ডার মোহনরাম, যাকে বন্যা এলাকাতে আমার গাইড হয়ে কাজ করবার জন্য এস-ডি-ও পাঠিয়েছেন, তিনি আক্ষেপ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওঃ, সব বহ্ গিয়া।

—তার মানে, সবাই মরে গিয়েছে?

—নেহি সাহেব, কিছু ভেগেছে, আবার কিছু নিশ্চয় মরেছে।

মানুষ নেই তো চিড়ে-গুড় দেবো কাকে? খড়ের মাচানের উপর বসে শকুনটা একগাদা নাড়িভুড়ি খাচ্ছে। ওর কাছে উপোস কিংবা বুভুক্ষা কোন সমস্যাই নয়।

রিলিফের চার্ট আর ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আর এস-ডি-ও'র রিপোর্টটা একবার পড়ে নিয়ে বুঝলাম, চাঁদিবাজারের কিছু মানুষ আটক পড়ে আছে বলে মনে হয়।

চাঁদিবাজার পৌঁছতে সময় লাগলো পুরো একটি ঘণ্টা। কিন্তু কোথায় বা চাঁদি আর কোথায় বা বাজার? শুধু ছোট্ট একটি একতলা দালানের ছাদ ছাড়া আর সবই ডুবে গিয়েছে। মোহনরাম বললেন, ওটা হলো একটা পুরনো থানাবাড়ি। ছাদের উপর জন পঞ্চাশ মানুষের একটা ঠাসাঠাসি সমাবেশ। শুধু কান্না আর চিৎকার—বাঁচাইয়ে সাহেব, জলদি বাঁচাইয়ে! হ্যাঁ, একটু দূরে আর একটা ছোট্ট সুশ্রী একতলা পাকা-বাড়ি, যার ছাদ ডোবেনি, কিন্তু মেঝে ডুবে গিয়েছে। কম্পাউন্ডার মোহনরাম বললেন—ওটা মেয়ে ইস্কুলের বাড়ি। ওখানে একজন বাঙালিনী মাস্টারণী আছেন।

—আছেন নাকি?

—এখন আছেন কিনা জানি না, কিন্তু ছিলেন। দ্বারভাঙ্গার পুলিনবাবুর মেয়ে।

—আপনার চেনা মানুষ?

—পুলিনবাবুকে চিনি, পুপরিহা রেল-স্টেশনের চায়ের স্টলের ঠিকে নিয়েছেন!

দালানের ছাদের সঙ্গে মই লাগিয়ে আটক মানুষগুলিকে এক-এক করে নামিয়ে মোটরবোটে তুলতে থাকে সেপাই রাজারাম আর অবতার সিং। ওরা দু'জনেই খুব পোক্ত কর্মী। ক্যাসিনোতে দেখেছিলাম ওদের প্রথম। ওরা তখন জাঠ দলের একটা অ্যাম্বুলেন্স কোম্পানিতে ছিল।

মেয়ে-স্কুলের আধ-ডুবন্ত বাড়িটার খোলা দরজা আর খোলা জানালার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকেও কারও চেহারার দেখা পাওয়া গেল না। কে জানে, বাঙালিনী মাস্টারণী এখনও আছে, না চলে গিয়েছে, না মরেই গিয়েছে। ভাবতে গিয়ে খুবই দুঃসহ একটা অস্বস্তি সহ্য করতে হচ্ছে।

কিন্তু বুঝতে পারছি না, এখানে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেই সুদূর ফ্লোরেন্সের পিয়াৎসা ডিসারার একটা ছোট বাড়ির জানালাকে মনে পড়ে কেন? এখানে ওই জানালাটা খোলা—সেখানে সেই জানালা ছিল বন্ধ। কিন্তু কে জানে কেমন করে জমাদার বলবন্ত দেখে ফেলেছিল, সেই বন্ধ জানালার ওদিকে ঘরের ভিতর চুপ করে একটা চেয়ারের উপরে বসে আছেন এক তরুণী ইতালিয়ানী।

সকালবেলাতে এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় এক হাজার অভাবী আর উপোসী নরনারীর হাতে দশটি রুটির এক-একটি প্যাকেট তুলে দেবার পর আমার ইউনিটের লোকগুলি যখন ক্লান্ত হয়

আর সিগারেট খায়, তখন আমিও হাঁপ ছাড়ি আর সিগারেট ধরাই। কিন্তু জমাদার বলবন্ত তেমনই অদ্ভুত এক উল্লাসের শিস বাজায় আর আমাকেই বার বার অনুরোধ করে—জেরা উধর তো দেখিয়ে সাহেব!

উধর মানে ওই ছোট বাড়িটা, যার জানালা সব সময় বন্ধ। জমাদার বলবন্ত হঠাৎ একটা হাত তুলে গোঁফের দু'দিক মুচড়ে দিয়ে যেন একটা অদ্ভুত খুশির হাসিকেও মোচড় দিয়ে লুকিয়ে ফেলে আর বলে—ওদিকে একটা দরজা আছে, দেখুন।

ঠিকই, ওদিকে একটা দরজা আছে। আস্তে একটা ঠেলা দিতেই সে দরজা খুলে গেল, আর দেখতেও পাওয়া গেল, একটা চেয়ারের কাঁধ আঁকড়ে ধরে আর একেবারে নিথর হয়ে বসে আছে এক তরুণী। বাড়িতে দ্বিতীয় কোন মানুষের সাড়া শোনা যায় না, দ্বিতীয় কোন ছায়াও দেখা যায় না। মনে হয়, বাড়ির পুরুষেরা সবাই পালিয়েছে।

আমার পায়ের শব্দ শুনেও তরুণী ইতালিয়ানী কোন সাড়া দিল না। মুখ তুলে একবার তাকালও না। তবে কি খেতে না পেয়ে আর খুব ভয় পেয়ে ওর প্রাণ মন আর শরীরটাও একেবারে নিথর হয়ে গিয়েছে?

মিথ্যে নয় আমার ধারণা। কাছে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, আস্তে আস্তে ধুঁকছে একটা শুষ্ক ও শীর্ণ নারীর বুক। দুই চোখ কোটরের ভিতরে বসে গিয়েছে। চমৎকার সোনালী চুল, কিন্তু উসকো-খুসকো। টেবিলের উপর একটা কাঁচের বোতল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বোধহয় জ্যাম কিংবা জেলি ছিল এই বোতলে। তাই বোতল ভেঙে জ্যাম-জেলির শেষ প্রলেপটুকুও চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে এই মেয়ে, যার সোনালী চুলের ক্রিমের ফিকে গন্ধ এখনও বাতাসে লেগে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—সিনোরিনা?

—সি।

—ইওর নেম?

—আনা।

—হাংবি?

—মি দিয়া ভিনো।

বুঝলাম ক্যাসিনোতে থাকতে চেষ্টা করে যেটুকু ইতালীয় ভাষা বুঝতে শিখেছিলাম তাতেই বোঝা গেল, তরুণী মদ চাইছে।

কী আশ্চর্য, আনার শুকনো এই চোখ দুটো থেকে এত জল ঝরে পড়ছে কেমন করে?

আমি বলি—ইল পানে? খাদা?

আনা বলে—সি সি।

ঘড়ঘড় করছে আনার অদ্ভুত গলার স্বর। কাঁপছে আনার মাথাটা, চোখ দুটোও যেন লোভী হয়ে চকচক করছে।

আনার হাতের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে একটুও দেরি করি না। দশটি রুটির একটি প্যাকেট, এক ডিবে মাখন, আর হ্যাঁ, ব্রান্ডির একটি বোতলও আনার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিলাম।

—গ্রাৎসিয়ে! গ্রাৎসিয়ে! চেঁচিয়ে উঠলো সেই শীর্ণা ও শুষ্কা আনা। কিন্তু কী আশ্চর্য, আনা যে চেয়ার ছেড়ে আমারই কাছে এগিয়ে আসছে। এ কী কাণ্ড, আনা যে আমার গা ঘেঁষে আর একেবারে বুক সেঁটে দাঁড়িয়েছে। কী চায় আনা? মুখটাকে আর শুকনো ঠোঁট দুটোকে আমার মুখের কাছে এমন করে তুলে ধরে কেন?

ভাগলপুরের সেজমামার কথা মনে পড়ছে। খেতে বসে পাতের উপর একগাদা

মাছভাজার দিকে তাঁর চোখ দুটো লোলুপ হয়ে তাকিয়ে থাকতো। তবু তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতেন, মনে মনে বিড়বিড় করে কী-যেন বলতেন। সেজমামী বলেছিলেন—ওটা ওঁর অভ্যাস, দেবতাকে আগে নিবেদন না করে কিছু খান না। সেজমামীর কথা শুনে আমরা মুখ টিপে হাসতাম।

আনার কাণ্ড দেখে এখন আমার মনটাও যেন মুখ টিপে হাসছে। বুঝতে পারছি, এটা হলো আনার প্রাণের একটা লোভের নিবেদন। কিন্তু কী অদ্ভুত লোভ।

কিন্তু চমকে উঠলাম। বাইরে থেকে বন্ধ জানালাটার গায়ের উপর হঠাৎ একটা শিসের শব্দ যেন আছড়ে পড়েছে, জমাদার বলবন্তের অদ্ভুত উল্লাসের শিস। এক হাত দিয়ে আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে আনাকে সরিয়ে দিলাম।

সরে গেল আনা, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ অপলক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে চোখে যেন হঠাৎ-আহত একটা বিস্ময় করুণ হয়ে ছমছম করছে।

আনা বলে—আরিভের্দচি।

আবার এস ! বিদায় দেবার একটা বুলি ! একটা কথার কথা, এইমাত্র।

শুনতে পাচ্ছি, লাস্ট পোস্ট বাজিয়ে আমাদেরই একুশ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের ব্যান্ড সড়ক ধরে কোথায় যেন যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ছুটে চলে এলাম।

কম্পাউন্ডার মোহনরাম বলছেন, চলুন একবার ওই ইস্কুল বাড়িটার ভিতরে গিয়ে খোঁজ করি, সত্যি কেউ আছে কি নেই।

—হ্যাঁ চলুন।

বুঝতে পারছি না, চোখ দুটো, সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের বাতাসটাও হঠাৎ এক-একবার ছটফট করে উঠছে কেন ? এই নিঃশ্বাস কি কাউকে আবার দেখতে আর কাছে পেতে চাইছে ? যদি তাই হয়, তবে তো বুঝতে হবে যে, এটা হলো পাঁচ বছরের পুরনো একটা পিপাসার ছটফটে নিঃশ্বাস।

আমার মোটর বোট ইস্কুল-বাড়িটার প্রায় দেয়ালের কাছে এসে ঠেকলো। এক হাঁটু জলের ভিতরে নামলাম, বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। আর চমকেও উঠলাম। একটা তক্তপোষের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে আছে এক তরুণী। কোন সন্দেহ নেই, এই সেই বাঙালিনী মাস্টারণী, পুলিনবাবুর মেয়ে।

বললাম—ভয় নেই, উঠে বসুন।

ডাক শুনে চোখ মেলে তাকালো পুলিনবাবুর মেয়ে। কী ভয়ানক উদাস দুটো চোখ। যেন তাকিয়েও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। গাল চুপসে গিয়েছে, গলার একটা শিরা ফুলে ফুলে কাঁপছে, আর হাতের চুড়িগুলি কবজি পার হয়ে ঝুলে পড়েছে।

—আপনার নামটা বলবেন ?

—রমা !

—কতদিন না খেয়ে রয়েছেন ?

—সাত দিন।

—খাবেন কিছু ?

—হ্যাঁ।

এই শুষ্কা ও শীর্ণা রমাও একটি অতি করুণ দুর্ভাগ্যের ছবি। উস্কোখুস্কো সোনালী চুলের স্তবক নেই, কালো চুলের ঢিলে বেণী। নীলচে চোখ নয়, বেশ কালচে চোখ। রমাকে দু'হাত দিয়ে ধরে খাটের উপর বসিয়ে দিতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, কাঁধের হাড় খটখট করছে। সন্দেহ হচ্ছে, ভয়ও পাচ্ছি, এই রমার বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসের জোরটুকু এখুনি ফুরিয়ে যাবে

না তো ?—জলদি কীজিয়ে কম্পাউন্ডারবাবু, আমার বোট থেকে এক গেলাস দুধ তাড়াতাড়ি গরম করে নিয়ে আসুন। আর ব্র্যান্ডির শিশিটাও আনবেন। হ্যাঁ, আর কিছু বিস্কুটও।

রমার বুক আর শ্বাস পরীক্ষা করতে দশ মিনিটও সময় লাগলো না। কম্পাউন্ডারবাবু ততক্ষণে গরম দুধ ব্র্যান্ডি আর বিস্কুট এনে দিয়ে আবার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গরম দুধ, ব্র্যান্ডির শিশি আর বিস্কুটের প্যাকেটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রমা। দেখতে পাচ্ছি, রমার দুই চোখে ক্ষুধা আর পিপাসার জ্বালা যেন হঠাৎ স্নিগ্ধ হয়ে গিয়ে চিকচিক করছে।

ডাক দিলাম—শোনো। শোনামাত্র খাট থেকে নেমে এক হাঁটু জলেরই মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো রমা। ওই নিদারুণ শুকনো আর হাঁপ-ধরা ধুকপুকে শরীরে এভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়াবার শক্তি কোথা থেকে আর কেমন করে এসে গেল!

আমার মুখের দিকে তাকায়, আর আমারই একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় রমা। কী যেন বলতে চায়, তবু বলতে পারে না।

এটা ফ্লোরেন্স নয়, ফ্লোরেন্সের পিয়াৎসা ভিসারাও নয়, আর রমার মুখের ভাষাটা আনার মুখের ভাষা ইতালীয়ও নয় যে, রমার কথা আমি বুঝতে পারবো না, কিংবা আমার কথা রমা বুঝতে পারবে না। তবু রমা কথা বলতে পারছে না, আমিও কথা বলতে পারছি না। ভুল হয়ে যাচ্ছে। রমা আর আনা। আনা আর রমা। রমার ঢিলে বেণীতে নারকেল তেলের ফিকে গন্ধ, কোন ক্রিমের ফিকে গন্ধ নয়। কোন মিল নেই, তবু মিল। বলতে ইচ্ছে করছে, খাবার এসেছি।

জমাদার বলবন্ত তো এখানে নেই যে, অদ্ভুত উল্লাসের শিস বাজিয়ে সমস্যাটার একটা হঠাৎ সমাধান করে দেবে। বুঝতে পারছি না, রমাকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারা যাবে কি যাবে না। আমিই তো রমাকে কাছে ডেকে ফেলেছি, সরিয়ে দেবো কী করে?

কিন্তু দরজার বাইরে একটা ছায়া যেন হঠাৎ নড়ে উঠলো। জোরে গলা ঝেড়ে কেশে উঠলেন কম্পাউন্ডার মোহনরাম। চমকে উঠলো রমা, সরে গেল রমা।

সেখানে সেদিনের জমাদার বলবন্তের শিসের শব্দ, আর আজ এখানে কম্পাউন্ডার মোহনরামের কাশির শব্দ—কোন মিল নেই, তবু মিল আছে বলে মনে হয়।

ডাক দিলাম—শোনো আনা।

রমা—কী বললেন?

হেসে ফেললাম—পাঁচ বছর আগে ইতালিতে একদিন একটি উপোসী মেয়েকে ঠিক এইরকমই খাবার দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছিল, তার নাম রমা।

রমা অদ্ভুতভাবে তাকায়—কী বললেন?

আমি বলি—যাকগে, গরম দুধটা এখুনি খেয়ে নিন, তারপর চলুন।

মাটির দীক্ষা

দেশ তখনো ভাঙেনি, ভাঙবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সেই সময়।

ভয়ানক এক হিংসার ঝড়ে নোয়াখালির পল্লীর শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে কুটিরের ভগ্নস্তূপ, হিন্দু নরনারীর জীবন অপমানিত। যারা ঘরে আছে, নির্যাতিত বন্দীর মতো তাঁদের মূর্তি। যারা ঘর ছেড়েছে, শোকার্তের মতো তাদের চোখের দৃষ্টি। সেই সময়।

সেই সময় প্রথম দেখা হয়েছিল নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। চৌমুহনী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপর তারা বসেছিল। অমিতার কোলে আঁচলে জড়ানো একটি ছ'মাসের শিশুও ছিল।

লাকসাম যাবে যে ট্রেন, তারই অপেক্ষায় বসেছিলাম। অনেক রাত হয়েছিল, ট্রেনের আসবার সময়ও পার হয়ে গিয়েছিল। তাই একটা অনিশ্চয়ের মধ্যে বসে বসে প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি নিঃশব্দে জপের মালার মতো যেন চিন্তার ভেতর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল।

সবই অনিশ্চয়ের মধ্যে। দূরান্তরে ঐ অন্ধকারাবৃত ক্ষেত মাঠ ও তরুবীথিকার জগতে আজ মানুষের মানমর্যাদা ও জীবন অনিশ্চয়ের মধ্যে। ঐ অন্ধকারের বুকে হিংসার গরল পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। নীলকণ্ঠ কোথায়? কিন্তু সংসারের তিনি কি মানুষের ইতিহাস থেকে বিদায় নিয়ে সরে গেছেন? এই রকম সংশয়েই তখন মনের ভেতর যেন তোলপাড় করছিল এবং ভারত জীবনের শঙ্কাহরণ নায়ক মহাত্মা গান্ধী তখনো নোয়াখালি এসে পৌঁছননি। তবু সংবাদ শুনেছি, কলকাতা থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। তিনি আসছেন, সেই সময়।

চারদিকের এই অনিশ্চয় ও অন্ধকার সত্ত্বেও অনেক রাতে চাঁদ উঠলো চৌমুহনীর আকাশে। সকল পার্থিব মূঢ়তার বহু উর্ধ্ব থেকে যেন কোটি কোটি স্নিগ্ধ আলোকের কণিকা এসে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে দেখলাম, প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে আছে এক যুবক ও তার পাশে এক তরুণী, কোলের ওপর একটি শিশু। চারদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা, ঘুমন্ত স্টেশন, তারই মধ্যে নিঃশব্দে বসে আছে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান। মনে হচ্ছিল, এ পৃথিবী যেন আজও অসমাপ্ত রচনার মতো এখনো অর্থহীন ও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তারই মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছে পৃথিবীর প্রথম পিতা-মাতা ও সন্তান। এখনো তারা যেন গৃহজীবন লাভ করেনি।

সেই সময় পরিচয় হলো তাদের সঙ্গে। নরেশ ও অমিতা। দেশ ছেড়ে তারা চলে এসেছে, দেশের দিকে ফিরে তাকাবার ইচ্ছা তাদের আর নেই। শুধু প্রাণ ছাড়া আর সব গেছে। লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত সেই দেশের ভিটার কালিমাখা মূর্তিকে শেষ বিদায় জানিয়ে তারা চলে এসেছে।

কিছুই সঙ্গে নেই। একটা ছোটখাট পোঁটলাও না। নিরাভরণ সর্বস্ববর্জিত রূপ নিয়েই তারা বসেছিল। তাই মনে হচ্ছিল, ওরা দুটি অনিশ্চয়ের পথিকমাত্র, শুধু প্রাণ ছাড়া আর কোন পাথেয় নেই।

নরেশ ও অমিতার সঙ্গে আলাপ করলাম, কিন্তু আলাপ করবার মতো কোন উৎসাহ তাদের ছিল না। কেমন একটা উদাসীন ভাব, এই পৃথিবীতে তারা যেন বাইরের লোক, নব আগন্তুক মাত্র। কাউকে বিশ্বাস নেই, কোথাও সমবেদনা আশা করে না। বিরাট একটা সর্বনাশের অভিসন্ধির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন তারা অদৃষ্টকে এক পাশে আলগোছে সরিয়ে এনে রেখেছে। দেশ থেকে এখানে, এখান থেকে দূরে, দূর থেকে দূরান্তরে, শুধু সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

নরেশের পায়ে জুতো ছিল না। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। তার সমস্ত সত্তা যেন অতল এক অসহায়তার মধ্যে ডুব দিয়ে রয়েছে। অমিতা একটু অন্য রকমের। পরিশ্রান্ত ও মলিন

মুখ, কিন্তু দৃষ্টি প্রখর। চারদিকে সাবধানে তাকিয়ে দেখার শক্তিটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। অমিতার শাড়িতে তখনো কচুরিপানার শেকড়ের কুচি লেগে রয়েছে। সেই শাড়ির আঁচলে ঢাকা ঘুমন্ত শিশুটি মাঝে মাঝে ছটফট করে। অমিতা একটু ব্যস্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাবেন ?

নরেশ অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দিল—কোন ঠিক নেই।

অমিতা বললো—কলকাতা যাবার ইচ্ছে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কলকাতা যাবার মতো পথের খরচ সঙ্গে আছে তো ?

নরেশ কোন উত্তর দিল না। অমিতাও উত্তর দিল না। অমিতার কোলের শিশুটি একটু ছটফট করে কেঁদে উঠলো।

একটু স্পষ্ট করেই বললাম—যদি কোন সাহায্যের দবকার থাকে বলুন, আমার পক্ষে যা সাধ্য...।

নরেশ তিক্ত স্বরে বলে—না।

অমিতা বলে উঠলো—একটা কাজ যদি করতে পারতেন ।

নরেশ অপ্রসন্নভাবে অমিতার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু অমিতা শান্তভাবেই বলে—একটা ফুড যদি জোগাড় করে দিতে পারেন তবে..।

তবে কি ? বুঝলাম অমিতার আঁচলে জড়ানো একটা শিশুর প্রাণ ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। তাই অমিতা স্থির থাকতে পারছে না। তাই কলকাতা যাবার পথের খরচ নয়, সসাগরা পৃথিবীর সব মণিমাণিক্যও নয়, এই মুহূর্তে শুধু এক শিশি গুঁড়ো দুধের ফুড পেলেই সে সুখী হবে।

এতক্ষণ দেখতে পাইনি, এখন দেখতে পেলাম, অমিতার কানে একজোড়া সোনার দুল আছে। একটা দুল খুলে নিয়ে অমিতা বলে—এছাড়া দাম দেবার মতো আর কিছু নেই। এটা নিয়ে আপনি...।

নরেশ অমিতাকে ধমক দিয়ে উঠলো—না, রেখে দাও।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—এসবে আমার কোন দরকার নেই। এত রাত্রে, এইরকম জায়গায় ফুড কোথায় পাব জানি না। কিন্তু দেখি...।

নরেশ এবার আমাকেই ধমক দিল—না, কোন দরকার নেই।

একটু চুপ করে থেকে নরেশ বললো—আমিই চেষ্টা করছি।

নরেশ উঠলো। কোথায় যাবে জানি না। এই নিস্তব্ধ রাত্রির নির্মম ঘুমের দ্বারে দ্বারে সন্ধান করে কোথায় যে এক শিশুমানুষের ক্ষুধার বেদনা দূর করার মতো ফুড পাবে নরেশ, তা সেই জানে। তবু দেখলাম, নরেশ যেন এক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তার প্রাপ্যের সন্ধানে যাত্রা করছে।

ট্রেনের শব্দও শোনা যাচ্ছে, নরেশ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—আপনি যান, আপনার ট্রেন আসছে।

* * *

বহুদিন পরে আবার দেখা, নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। তখন খবরের কাগজে কতগুলি কথা নিত্য প্রচারিত হয়ে চলেছে—বাস্তুহারার সমস্যা, উদ্বাস্তুর দাবী, শরণার্থীর কর্তব্য, আশ্রয়প্রার্থীর প্রশ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশ খণ্ডিত হয়েছে, আর কলকাতায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগন্তুক মানুষ হাজারে হাজারে আশ্রয় নিয়েছে প্রতি অঞ্চলে ও বস্তিতে। বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে এক বাড়ির সিঁড়িকোঠায় ক্ষুদ্র-পরিসর এক অন্ধকারময় স্যাঁতসেঁতে আশ্রয়ে বাসা নিয়ে রয়েছে নরেশ, অমিতা ও সেই শিশুটি। শিশুটি বেশ বড়সড় হয়েছে।

চৌমুহনীর সেই গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে নরেশ ও অমিতাকে যেরকম দেখেছিলাম, বেনিয়াপুকুরের ধুলো ধোঁয়া আর দ্বিপ্রহরের রোদে তাদের আর সেরকম মনে হলো না। সেদিন তাদের দেখেছিলাম দুটি পথিক প্রাণের মতো ক্লান্ত ও পীড়িত, কিন্তু তবু সান্ত্বনা চায় না। সেদিন পৃথিবীর প্রথম দম্পতির মতো যেন একটা কঠোর অহঙ্কার নিয়েই তারা সকল অনিশ্চয়ের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে উর্ধ্বগগনের চন্দ্রালোক গায়ে জড়িয়ে বসেছিল।

আজ দেখলাম, নরেশের চেহারা ও আচরণ অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি খুব অল্পই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু নরেশ গায়ে পড়ে অনেক কথা বললো, অনেক অভিযোগ, অনেক দুঃখের কথা, অনেক ক্ষোভের কথা।

একটা চাকরি পেয়েছে নরেশ, কিন্তু সেদিন তারা ধর্মঘট করেছে। মালিক মাইনে বাড়ায় না, তারই প্রতিবাদ। ধর্মঘট কমিটির সহকারী সেক্রেটারি হয়েছে নরেশ।

হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে নরেশ বলে—আমাদের দুঃখের আর অন্ত নেই, সাধনবাবু। কেউ মুখ তুলে তাকায় না।

দেখলাম, নরেশের সত্যিই ক্ষোভের অন্ত নেই। এ পৃথিবীতে কারও মনে কোন সমবেদনা নেই। সামান্য একটা সাহায্য পেতে হলে দশ জায়গায় দরখাস্ত নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয়। এই হলো নরেশের অভিযোগ।

অমিতা ভদ্রতা করলো, সিঁড়িকোঠার সামনে বসে চা খেলাম। অমিতাও বললো—কিছুই ভাল লাগছে না, এও একরকমের নির্বাসন। প্রতি মুহূর্তে এত অসুবিধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে মানুষ কি করে বাঁচে বলুন? ক'দিন হলো ফ্রি রেশন বন্ধ করে দিয়েছে।

ঠিক এরকম কথা অবশ্যই আশা করিনি। এই তো সেই নরেশ, আর সেই অমিতা, নিদারুণ এক অনিশ্চয়ের মধ্যেও যারা আমার সাহায্যের প্রস্তাব তুচ্ছ করতে পেরেছিল। মনে হলো, প্রথম দিনের দেখা সেই প্রাণের সব গর্ব যেন পরাভূত হয়ে গেছে।

সিঁড়িকোঠায় আশ্রিত নরেশ ও অমিতার সংসারের চেহারাও লক্ষ করলাম। হ্যাঁ, দুঃখ ও অভাব আছে বৈকি। এঘরে মানুষের বাস করা উচিত নয়। অমিতার চেহারা আগের তুলনায় অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে। ফ্রি রেশনে যে খাদ্য পাওয়া যায়, তার চেয়ে ভাল খাবার অধিকার নিশ্চয় ওদের থাকা উচিত। ছেলেটার গায়ের জামাটা দু'জায়গায় ছেঁড়া, কিন্তু নরেশের গায়ে একটা দামী কাপড়ের কামিজ। ঘরে কোন দেব-দেবী বা মহাপুরুষের ছবি নেই, কোন বই নেই। অথচ দেখলাম একগাদা কাঁচের ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন। মস্ত বড় একটা পাকা কাঁঠাল মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে, এবং মোটা মোটা মাছি উড়ছে তার চারদিকে। রঙিন কাঁচের একটা ফুলদানির ভেতরে এক প্যাকেট সিগারেট আর দুটো সিনেমার টিকিট। অভাব আর অপচয়, কোথাও শূন্যতা কোথাও অতিরিক্ততা, সব মিলিয়ে কোথায় যেন ছন্দ নষ্ট করে দিয়েছে, যার জন্যে বড়ই শ্রীহীন মনে হচ্ছিল এই দম্পতির সিঁড়িকোঠার সংসার। হয় পৃথিবী এদের সঙ্গে ছন্দ রাখতে পারছে না, নয় এরাই পৃথিবীর সঙ্গে ছন্দ রেখে চলতে পারছে না। কোথায় যেন ভুল রয়ে গেছে। অথচ এই নরেশ ও অমিতাকে একদিন দেখেছি, একটা পোঁটলাও সঙ্গে নেই, নিরাভরণ দুটি মূর্তি নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সুস্থির হয়ে বসে আছে। কিংবা হয়তো আমারই ভাবতে ভুল হচ্ছে। কিন্তু কেন জানি মনে হয়, সেদিন দুঃখ ছিল ভয়ানক কিন্তু এরা ছিল সুন্দর। আর আজ ওদের দুঃখটা বিশ্রী, এবং ওরাও শ্রীহীন।

ওঠবার সময় নরেশ বললো, আপনার সঙ্গে কোন কাপড়ওয়ালার জানাশোনা আছে কি?

—কেন?

—কয়েক গজ টুইলের দরকার ছিল। যদি ধারে পাইয়ে দেন, তবে বড় ভাল হয়।

কোন কাপড়ওয়ালার সঙ্গে জানাশোনা ছিল না, তাই নরেশের অনুরোধ রক্ষার কোন

প্রতিশ্রুতি না দিয়েই উঠলাম।

* * *

অনেক দিন পরে দেখা, এই নরেশ ও অমিতার সঙ্গে। ছেলেটিও বেশ বড় হয়ে উঠেছে দেখলাম।

বেনিয়াপুকুর নয়, ধুলো ধোঁয়া এবং কলকাতার দিনের আলোকে নয়। রাজীবপুরে এক পৌষের প্রভাতে।

ধানচাষীদের এক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সভা সাঙ্গ হবার পর ভিড় থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই সেই চাষী-জনতার ভেতর থেকে খাটো ধুতি এবং ফতুয়া পরা মূর্তিতে বেরিয়ে এসে হাসিভরা মুখ নিয়ে যে লোকটি নমস্কার জানালো, তাকে চিনলাম। নরেশ।

বিস্ময়ের দৃশ্য নিশ্চয়। সকল অনিশ্চয়ের অগ্নিপরীক্ষার জ্বালা উত্তীর্ণ হয়ে একটা মানুষের প্রাণ যেন এইবার তার জীবনের ভিটা খুঁজে পেয়েছে। নরেশকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

নরেশের অনুরোধে আজ আমিই এক কৌতূহলী পথিকের মতো, কি জানি কি দেখবার জন্যে, তার নতুন ঘরে এসে পৌঁছলাম।

মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি, বড় আঙিনা, লতার বেড়া। কুমড়োর মাচানও আছে। কয়েকটা নতুন পেঁপেগাছ। খুঁটোর সঙ্গে দড়ি বাঁধা একটা কালো গরুও আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অমিতা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। সে হাসির সঙ্গে আগুনের আঁচের মতো একটা লালচে আভাও মিশে ছিল। একটা একচালার নীচে উনুনের সামনে বসে এতক্ষণ ধান সেদ্ধ করছিল অমিতা।

আর একবার দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নরেশ ও অমিতার সংসার দেখলাম। আঙিনায় তুলসীগাছ আছে। ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে একটি লক্ষ্মীর সরা ও ছবি রয়েছে। দেয়ালে মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আছে। দাওয়ায় মাদুরের ওপরে কয়েকটা বইও পড়ে আছে দেখলাম—গীতা, রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য আর চণ্ডীদাসের গান।

নরেশ হাসতে হাসতে বলে—কলকাতার জীবন আর সহ্য হলো না।

—কেন?

—সেখানে দুঃখের শেষ নেই, অভাবেরও শেষ নেই মশাই। তার চেয়ে এই ভাল।

—কি?

—এই চাষার জীবন।

—এখানে এসে কি দুঃখ অভাব সব মিটে গেছে?

—তা মিটবে কেন? সবই আছে।

—তবে?

নরেশ সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারলো না। একটু চেষ্টা করে তার যুক্তিগুলিকে যেন গুছিয়ে নিয়ে বললো—তবে শান্তি আছে। নিজের হাতে খেটে দুঃখ-অভাব দূর করবার একটা চেষ্টা তো করতে পারছি। তাছাড়া...।

নরেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তাছাড়া এখানে এসে দু'দণ্ড ধর্মটর্ম পুজোটুজো করতে পারি, কলকাতায় থেকে ওসব রুচিও যেন চুলোয় যেতে বসেছিল।

অমিতা বললো—তাছাড়া...।

—বলুন।

অমিতা হেসে হেসে বলে—এখানে এসে হাঁপ ছাড়তে পারছি। কত বড় মাটির আঙিনা

দেখছেন ?

মাটির আঙিনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বিশ্বাস করলাম, নরেশ ও অমিতার জীবন একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস পার হয়ে, এইখানে এসে মাটির উদার স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়েছে। তাই হাঁপ ছাড়ছে। এই মাটির করুণা দিয়ে ওরা নিজের হাতেই ভাগ্য গড়বে। ওদের চোখে মুখে আর সেই বেনিয়াপুকুরের সিঁড়িকোঠার বিশ্রী দুঃখের ছাপ নেই। ওদের জীবন মাটির দীক্ষা লাভ করেছে। তাই আজ বোধহয় এত সুন্দর ও সুশ্রী দেখাচ্ছে নরেশ আর অমিতাকে।

মনে হলো, এইরকমই এক মানবদম্পতি বোধহয মানুষেব প্রথম সংসার রচনা কবেছিল, এবং এইরকমই একটি মাটির আঙিনা ছিল সেই সংসাবে।

সমীক্ষা দক্ষিণ পলাশপুর

দক্ষিণ পলাশপুর নামে একটি গ্রামের সমীক্ষার এই রিপোর্ট প্রকাশ কবে দেওয়া হলো। কারণ, লোকগণনার সাধারণ রিপোর্ট কিংবা ব্লক উন্নয়নের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হতে এখনও দেরি আছে। আর, সেই দুই রিপোর্টে দক্ষিণ পলাশপুরের নাম করে বিশেষ কোন কথা থাকবে কি থাকবে না, তারও কোনও ঠিক নেই।

বলতে হয়, এটি একটি যথার্থ অনুন্নত গ্রামজীবনের রিপোর্ট। সবচেয়ে নিকট রেল-স্টেশন হলো ষোল মাইল দূরের মতিনগর হল্ট। আর সবচেয়ে নিকট যে-পথে ছোট মোটরগাড়ি অনেক কষ্টে চলতে পারে, সেটা হলো দেড় ক্রোশ পশ্চিমে ধানক্ষেতের সঙ্গে প্রায় একাকার সেই পুরনো অহল্যাবাঈ সড়ক।

এহেন দক্ষিণ পলাশপুরের গ্রাম্যতার মধ্যে একেলে উন্নতির ছোঁয়া কিংবা ছোঁয়াচ কতটুকুই বা লাগতে পারে ? জেলার ম্যাপের মধ্যে দক্ষিণ পলাশপুরের নামেব পাশের চিহ্নটা হলো ছোট্ট একটা কালো বিন্দু। ছোট্ট একটা নীল তারার চিহ্ন নেই, লাল তারার চিহ্নও নেই, তার মানে দক্ষিণ পলাশপুরের কোন কৃষিপণ্য নেই, শিল্পপণ্যও নেই। সন্দেহ হয়েছিল—দক্ষিণ পলাশপুর বোধহয় দশ-বিশ ঘর মানুষের বসতি নিয়ে অতি সামান্য কোন গ্রাম্য অস্তিত্ব কিংবা নিছক একটা নাস্তিত্ব।

পুরনো অহল্যাবাঈ সড়কের পাশে তালডাঙ্গা নামে যে একটু জায়গা আছে, সেখানে এসে পৌঁছতেই বুঝতে পারা গেল, সত্যিই দক্ষিণ পলাশপুর নামে একটা যথার্থ গ্রাম আছে। এখানে একটা বুড়ো বটের ছায়াতে দু'-চারটে গো-গাড়ি সব সময়েই পড়ে থাকে আর ঝিমোয়, যতক্ষণ না দেড় ক্রোশ দূরের দক্ষিণ পলাশপুরে যাবার জন্যে কোন বমাল ব্যাপারী কিংবা অব্যাপারী মানুষ এসে হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকি করে।

গ্রামের ভিতর ঢুকতে সবার আগে যা চোখে পড়বে, সেটা চমকে ওঠার মতো কোন বিস্ময়ের মনুমেন্ট নয়। একটা মন্দির। বটের শিকড়ে আর জটাতে জড়ানো এই মন্দিরের সর্বাঙ্গে বড বড় ফাটল হাঁ করে রয়েছে। বিগ্রহ নেই, সেবাইত নেই। মন্দিরের ভিত্তির গায়ে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে একটা শ্লোক খোদিত আছে। শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কে নাক্বিভে শঙ্করং সংস্থাপ্যাশু...বাস্, এই পর্যন্ত। শ্লোকের বাকি লেখা সবই মুছে গিয়েছে। বোঝা যায়, এটা শিবমন্দির। ১৮৫৭ শকে অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কে নির্মাণ করেছিলেন, কে জানে ? শ্লোকের লিপির সবটুকু যদি থাকতো, তবে নিশ্চয় তার পরিচয়

পাওয়া যেত। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজে সতের শতকের দক্ষিণ বঙ্গের শিল্পরুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খুব সূক্ষ্ম সুন্দরতার কারুকলা না হলেও দেখতে চমৎকার। কিন্তু মন্দিরের ভিত্তির গোড়ার দিকের পাথরে মূর্তিকলার যে কাজ দেখা যায়, তার সঙ্গে বরেন্দ্রভূমির মহাস্থানগড় বৌদ্ধবিহারের পাথুরে রেলিং-এর মূর্তিকলার সাদৃশ্য আছে। প্রশ্ন করতে হয়, পাল যুগের মূর্তিকলার স্টাইল দক্ষিণ পলাশপুরের এই শিবমন্দিরের ভিত্তির পাথরে কেমন করে এল ? দক্ষিণ পলাশপুর তবে কি পাল যুগের আলোছায়ার সৃষ্টি ?

যাই হোক, প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আজকের এই দক্ষিণ পলাশপুর যতই অনুন্নত হোক না কেন, অবচীন নয়। কয়েক শতাব্দী আগে এই দক্ষিণ পলাশপুর অনেক স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর অনেক স্মৃতি দিয়ে ঘেরা একটি উন্নতির উপনিবেশ ছিল। আজ দেখা যাচ্ছে যে, সেকালের উজ্জ্বল আলোর একটি দীপ আজ শুধু পোড়া সলতের কালি হয়ে পড়ে আছে। যে ছিল খুব উন্নত, সে-ই আজ খুব অবনত।

এই মন্দির, সতের শতকে ভগবান শঙ্করের কাছে নিবেদিত এই প্রত্নকীর্তিটি আজ বিংশ শতাব্দীর যে মানুষটির সম্পত্তি, তিনি হলেন দক্ষিণ পলাশপুরের জয়ন্ত ঘোষ। লোকে বলে, চার-আনি। অর্থাৎ ইনি দক্ষিণ পলাশপুর জমিদারির চার-আনি মালিক। আজ অবশ্য আর বলা চলে না। বলতে হয় ছিলেন। জমিদারি চলে গেলেও চার-আনি নামটা চলে যায়নি। আর যে বা যাঁরা বার-আনি ছিলেন, তিনি বা তাঁরা কবে কোথায় যে চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। যাই হোক, মন্দিরটা যখন চার-আনির সম্পত্তি, তখন চার-আনি কেন মন্দিরটার নিদারুণ জীর্ণতার সামান্য একটু সংস্কারও করেন না ? মন্দিরটা যে আর সাত-আট বছরের মধ্যে একেবারে ধসে পড়ে জঞ্জালের একটা ভয়ানক স্তূপ হয়ে যাবে।

২

চার-আনির বাড়িটা অদ্ভুত। রাতের মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলে দেখতে পাওয়া যায়, বিরাট ও গম্ভীর একটা প্রাসাদের চেহারা চমকে উঠেছে। কিন্তু ভোরের আলোতে দেখা যায়, বড়ই পুরনো আর মলিন চেহারার একটা চকমিলান দালান। দেউড়ির মাথা ভেঙে পড়ে গিয়েছে, থামগুলির গায়ে পলেস্তারার চিহ্ন নেই। ইট খসে পড়ে চারিদিকের উঁচু পাঁচিল এমনই খর্ব হয়ে গিয়েছে যে, বাগানে ঘুরে-ফিরে ফুল তুলতো যে মেয়েটি তাকে খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যেত। বাসন্তী রঙের একটি শাড়ি পরে ভোরের আলোতে বাগানের ফুল তোলা এই মেয়ের নিত্যদিনের একটা অভ্যাস ছিল। চার-আনির সেই মেয়ে প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

চার-আনির জয়ন্ত ঘোষ বললেন, না মশাই, ওই সাংঘাতিক ভাঙা মন্দিরের মেরামত করবার রুচি আমার নেই, যদিও ওটা আমারই সম্পত্তি।

আদুড় গায়ের উপর জড়ানো একটা ময়লা চেহারার শাল, বেশ ছোট বহরের ধুতি আর পায়ে বাঘছালের চটি, যার রোঁয়াগুলি প্রায় সবই ঝরে পড়ে গিয়েছে। চার-আনির জয়ন্ত ঘোষের ধবধবে ফরসা চেহারার মধ্যে কেমন-যেন একটা করুণতা আছে।

জয়ন্ত ঘোষ বললেন—আমার পিতামহ, পিতা আর আমি, আমরা তিন পুরুষ ধরে চার-আনি। বার-আনির সবাই দু'পুরুষ আগেই জমিদারি বেচে দিয়ে সরে পড়েছে।

দেয়ালের তাক থেকে পুরনো নথিপত্রের একটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে এসে, তার ভিতর থেকে বেছে বেছে একটা দলিল বের করলেন জয়ন্ত ঘোষ—এই দেখুন, আমাদের তিন পুরুষ আগের সেই বিবাদের আপসনামা। বত্রিশ বছর ধরে মামলা চলবার পর শেষে আপস হলো : কামাখ্যাচরণ ঘোষ বাদী, বিশ্বনাথ ঘোষ গয়রহ বিবাদী। দরখাস্ত পক্ষে বাদী ও উত্তরকারী

বিবাদীগণের নিবেদন এই—আমরা বাদী ও বিবাদী পরস্পরের আত্মীয় বটি। মামলা চলিলে উভয় পক্ষের অমঙ্গল হইবে বিধায় আমরা পক্ষগণের দরখাস্ত ও সালিসে রোএদাদ ইত্যাদির উপর লক্ষ না রাখিয়া নিম্নলিখিত রূপে আপসে নিষ্পত্তি করিলাম। অত্র সোলেনামা ডিক্রির একাংশ গণ্য হইবে এবং আমরা উভয়পক্ষ ইহাতে বাধ্য থাকিব।

দলিলের বয়ান আর বেশি না পড়ে জয়ন্ত ঘোষ অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন। এই ভদ্রাসনের দখল পেলেন কামাখ্যাচরণ ঘোষ, আমার পিতামহ। আর, পেলেন জমিদারির চার-আনি। ওদিকে বিশ্বনাথ ঘোষ গয়রহ্ পেলেন জমিদারির বার-আনি। কিন্তু তাঁদের ছেলেরা একদিন সেই বার-আনি জমিদারিকে আট লক্ষ টাকায় বেচে দিয়ে সরে পড়লেন!

কোথায় সরে পড়লেন?

বিলেতে। বার-আনির বংশের সবাই আজ বিলেতে। তারা কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসর, কেউ বা মস্ত বড় হোটেলের মালিক।

জয়ন্ত ঘোষের দুই চোখের তারা চিকচিক করে যেন হাসতে থাকে।—কী সৌভাগ্য, কী চমৎকার জীবন, কী সুখের সংসার। ওরা সবাই বিবাদীর গুষ্টি হলেও আমি বলবো, ওরাই ভাগ্যিমান। বাবার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েও ওদের কেউই আমাকে চিঠি দিয়ে সামান্য দু'-চারটে শোক-দুঃখের কথাও জানায়নি। ওরা আমাকে বোধহয় একটা মানুষই বলে মনে করে না। তবু আমি বলবো ওরাই মানুষ। কিন্তু হ্যাঁ...।

পুরনো নথিপত্রের বাণ্ডিলটাকে হাত দিয়ে শক্ত রকমের একটা ঠেলা দিয়ে হেসে উঠলেন চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ।—কিন্তু হ্যাঁ, আমিও প্রতিশোধ তুলে নিয়েছি। আমার মেয়ে প্রীতিলতার বিয়েতে কাউকেও নিমন্ত্রণের চিঠি দিইনি। বিয়ে হয়ে যাবার এক মাস পরে সবাইকে একটি করে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে, প্রীতির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, জামাই হলো বিলেত-ফেরত ডাক্তার মনোময় দত্ত। এ হলো লন্ডনের হাসপাতালে চক্ষু-চিকিৎসার চিফ সার্জন সেই মনোময় দত্ত, বার-আনি গুষ্টির সন্তু ঘোষ যার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল।

চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের আদুড় গায়ে জড়ানো শালটা হঠাৎ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো। টিপ টিপ করছে বুকটা। সন্দেহ হয়, জয়ন্ত ঘোষের বুকের ভিতর থেকে প্রতিশোধের গর্ব ও আনন্দ যেন একসঙ্গে উথলে পড়তে চাইছে। বুকের উপর হাত বুলিয়ে জয়ন্ত ঘোষ বলেন—ওরা কেউ আমার চিঠিরও জবাব দেয়নি; দেবে কি করে? লজ্জার মার তো কম সাংঘাতিক মার নয়। আজ মনে মনে ওরা নিশ্চয় স্বীকার করছে যে, চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ যে-সে মানুষ নয়।

বেশ জোরে একটা হাঁফ ছাড়লেন জয়ন্ত ঘোষ।—যাক্ গে ওসব কথা। আমার জামাই মনোময় এখন কলকাতাতে প্র্যাকটিস করছে। বিলিতী স্টাইলের ফার্নিচারে সাজানো দুটি বাড়ি, আর দুটি গাড়ি তার আছে। আমার জামাই মনোময় শুধু সাজ-পোশাকে নয়, মনে-প্রাণেও সাহেব-মানুষ। আপনিও হয়তো মনোময়কে দেখেছেন।

—না, দেখিনি।

—যা-ই হোক, আমিও আমার স্বপ্ন সফল করে ছেড়েছি। চার-আনি হয়ে দক্ষিণ পলাশপুরের অজ গেঁয়েমির মধ্যে পড়ে থাকলেও আমার ভাগ্যটা শেষ পর্যন্ত অজ হয়ে যায়নি।

অজ গেঁয়েমি বলতে চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ কী বোঝেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু দক্ষিণ পলাশপুরের জমির রূপ-গুণের যে-সব অদ্ভুত তথ্য পাওয়া গেল, তাতে বিশ্বাস করতেই হয় যে, এই জমিতে সত্যিই অদ্ভুত এক অজন্মার ভূত ভর করেছে। উত্তরে তালডাঙ্গা আর পশ্চিমে রাজহাট, এই দুই সীমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে যে জমি, তার প্রায় সবটাই

কোনকালে দক্ষিণ পলাশপুরের চার-আনি কর্তার ভূসম্পত্তি ছিল। সে জমিতে ধান ফলে না, কোন কৃষিই সম্ভব হয় না, কেশে ঘাসে ভরাট হয়ে আর পতিত হয়ে পড়ে আছে ওই জমি। ল্যান্ড রেকর্ড অফিসের নথীতে স্বত্বাস্বত্বের খোঁজ নিলে জানা যাবে যে, কেশে ঘাসে ভরাট ওই পতিতের মধ্যে আজকের দক্ষিণ পলাশপুরের দু'পুরুষ আগের যত লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর আর চাকরান মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে।

নদীটার নাম ভাসানি। একটা মজা নদী। চেহারা দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কোন কালে এই ভাসানির জলে কোন নৌকা ভেসে বেড়িয়েছে। এই নদীটাই হলো দক্ষিণ পলাশপুরের জমির অভিশাপ, দুর্ভাগ্যের আসল কারণ। এই মজা নদী ভাসানি বর্ষার জলের ঢল বইতে পারে না। সে জল প্রতি বছর পাঁচ হাজার বিঘে ধেনো জমির উপর গড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত এক রকমের লালবালুর কাদা ছড়িয়ে দেয়। এরকম বালুর কাদা কোথা থেকে যে বয়ে নিয়ে আসে ভাসানির বর্ষার জলের ঢল, তা কেউ বলতে পারে না। এরকম লালবালুব কাদাতে শুধু কেশে ঘাসই ভাল ফলে, আউশ আমন ও রবির কোন শস্য ফলাতেই পারে না।

গ্রামের গা ঘেঁষে অবশ্য রবির বেশ ভাল এঁটেল জমি আজও আছে। পূবদিকের তিনশো বিঘে হলো কালচে দোঁয়াশ। ধান মন্দ ফলে না। সে ধানের নাম হীরেশালি। পশ্চিমে রোগা-রোগা সরু জাতের বাঁশের একটা জঙ্গল আর পানের বরজ গোটা কুড়ি।

দক্ষিণ পলাশপুরের ভিতরে ও বাইরের চারদিকে বড় বড় গাছের চেহারা দেখলে একটু আশ্চর্য হতেই হবে। অনুন্নত এই গ্রামের কয়েকটা গাছ বড় বেশি উন্নত। দেবদারু অর্জুন আর পিয়াশাল, অশোক পলাশ জারুল আর শিমূল, কদম ডুমুর আর পাকুড়। কোন সন্দেহ নেই যে, এদের মধ্যে কয়েকটা বুড়ো বুড়ো গাছের বয়স অন্তত দু'-তিনশো বছর হবে। হতে পারে, এদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো সতেরো শতকের স্মৃতি নিয়ে একালের দক্ষিণ পলাশপুরের মাটিতে পুরনো আদরের ছায়া ছড়ায়।

চার-আনির দালানবাড়ির সামনের বাগানে যে কেতকীর একটা কুঞ্জ ধরনের ভিড় আছে, সে কেতকীকে একটা বিস্ময় বলে মনে করা চলে। কেতকীর কুঞ্জটাকে নয়, বিস্ময়ের সত্যটাকে আবিষ্কার করেছেন যিনি, তিনি হলেন স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার কৌশিক বসু।

একদিন ভোরবেলাতে, সেটা ছিল আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগের এক ফাল্গুনের প্রথম দিন, একজন অপরিচিত যুবককে বাগানের কেতকীর কুঞ্জটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অপ্রসন্ন হয়েছিলেন চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ। বেশ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন—কে মশাই আপনি ? না বলে-কয়ে এখানে এই সময়ে...।

কৌশিক কিন্তু বেশ শান্ত স্বরে জবাব দেয়—আমি আপনাদের এই দক্ষিণ পলাশপুরের স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার।

—আপনি আবার কবে সেকেন্ড মাস্টার হলেন ?

—সেকেন্ড মাস্টার হৃদয়বাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। আমি এই এক মাস হলো তাঁরই জায়গাতে এসেছি।

—কিন্তু এখানে কি মনে করে ?

—আমি আপনাদের এই কেতকী দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছি।

—কেন ?

—আমি জানতাম, সকলেই জানে যে কেতকী ফোটে বর্ষাকালে, আর কেতকীর রং হলো সাদা। কিন্তু কালিদাস লিখেছেন কেতকী বসন্তকালে ফোটে, তার রং হলো হেমাভ, সোনার আভার মতো হলদে। ধারণা ছিল, কালিদাস ভুল কথা লিখেছেন। কিন্তু এই তো এখানে, আপনাদের কেতকীর যে ফুল এই ফাল্গুনে ফুটেছে, তার রং যে সত্যিই হেমাভ।

শুনে শান্ত হলেন জয়ন্ত ঘোষ। তারপর বেশ শান্তস্বরে বললেন—আচ্ছা, এখন তবে আসুন।

ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এসেই চমকে উঠলো প্রীতিলতা!—কী ব্যাপার! কী হয়েছে বাবা?

জয়ন্ত ঘোষ বললেন—কিছুই না। গাছ আর ফুলের সম্পর্কে উনি ওঁর বিদ্যের কথা বলছেন।

৩

দক্ষিণ পলাশপুরের বিদ্যা আর শিক্ষার অবস্থা যে কী রকমের করুণ, সেটা স্কুলবাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। পুরনো ইট দিয়ে আর লাল বালুর কাদা দিয়ে তৈরি এই স্কুলবাড়ির দেয়ালের গাঁথুনি অবশ্য নড়বড় করে না, কিন্তু উপরের খড়ের চালা আর বাঁশের বাতা নড়বড় করে। স্কুলবাড়ির কাছের একটা মাঠে ধসে-পড়া একটা দালানের অনেক ইটের স্তূপ দেখা যায়। বুনো জলজের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে একটা পুরনো পুষ্করিণীর জল; তার ঘাটটাও আজ পুরনো ইটের একটা স্তূপ। এইসব ইট দিয়ে স্কুলবাড়ির দেয়াল গাঁথা হয়েছে। জানা গেল, সেই ভয়ানক বর্ধমান জ্বরের আমলে ভয় পেয়ে বার-আনির যে শরিকের সুখী মানুষগুলি গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতো পালিয়ে গিয়েছিল, এইসব পুরনো ইট তাদেরই দালানের অবশেষ। স্কুলের মর্যাদা এখনও উচ্চ পর্যায়ে উঠতে পারেনি। নবম শ্রেণী পর্যন্ত এসে ঠেকে রয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই হলো কাছাকাছি পাঁচ-সাতটি গ্রামের ছেলে। এই স্কুল পত্তন করেছিল জেলা বোর্ড। এখন সরকারী গ্র্যান্টের সাহায্যে এই স্কুলের স্কুলতা কোনমতে চলছে।

এহেন একটি নিদারুণ গ্রাম্য স্কুলে মাস্টারি করতে কৌশিকের মতো স্কলার ছেলে কেনই বা এল, আর কেনই বা স্থায়ী হয়ে থেকে গেল সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বললেন, আমিও ঠিক বুঝতে পারি না।

শুধু একজন স্কলার ছেলে বললে কৌশিকের পরিচয়ের সবটুকু বলা হয় না। কৌশিক বসু এই গ্রামের ছেলে নয়, বাইরে থেকে আগত একজন আগন্তুক। কৌশিকের চেহারা দেখে মনে হবে, বোধহয় দ্বিতীয় এক বল্লালসেন বাইরে থেকে একজন খাঁটি ক্ষত্রিয়কে আমদানি করেছেন। দীঘল বলিষ্ঠ শরীর, কিন্তু নাক চোখ ও মুখের শ্রী বড়ই কোমল। কৌশিক বসু দেখতে খুবই সুন্দর।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বললেন—বংশের দিক দিয়ে কৌশিক হলো আদি দশরথ বসুর পরে ষোল পুরুষ। আর, ওদিকে চার-আনির জয়ন্ত ঘোষ হলেন আদি মকরন্দ ঘোষের পরে পনেরো পুরুষ। তাঁর মেয়ে প্রীতিলতাকে বলা চলে, ষোল পুরুষ। কাজেই দু'দিকের কৌলীন্যের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে বেশ ভাল মিল ছিল। কিন্তু...হ্যাঁ, আপনার কি সরকারী মৎস্য চাষ বিভাগের কোন কর্তার সঙ্গে চেনাশোনা আছে?

—কেন, বলুন তো?

—এ তল্লাটে মাছের উন্নতি করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

শুনতে পাচ্ছি, ভয়ানক হল্লা চলছে। বুঝতে পারছি, স্কুলের ক্লাসে ক্লাসে পড়া চলছে। ছিপ হাতে তুলে নিয়ে গৌরহরিবাবু বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমাকে এখন মাছ ধরবার জন্য বের হতে হবে।

—কোথায় যাবেন?

—ওই যে, বেশি দূরে নয়, ওই রঘুরামের বিলে। অবিশ্যি সেই অঢেল মৎস্য সম্পদ আজ

আর নেই। শুধু শোল, চিতল আর বোয়াল। তার চেয়ে বেশি হলো বড় বড় জলঢোঁড়া আর কচ্ছপ। তবু, আজও কিছু-কিছু বাটা, ফলুই আর ট্যাংরার বংশ বেঁচে আছে বলেই ওখানে যাই। বাবার মুখে গল্প শুনেছি, প্রতি বছর আষাঢ় মাসে রঘুরামের বিলে খ্যাপলা জাল ফেলে ইজারাদারের জেলেরা হাজার-হাজার রুই-কাতলা তুলতো আর নৌকা বোঝাই করে বাইরে চালান দিত। সে সময় নদী ভাসানির এরকম মজা অবস্থা ছিল না। মাছের নৌকা তরতর করে ভেসে তিন ঘণ্টার মধ্যে নীলগঞ্জের ঘাটে পৌঁছে যেত। আর এক ঘণ্টার মধ্যে পাইকারেরা লুঠেরার মতো ব্যাকুল হয়ে সব মাছ কিনে ফেলতো। কিন্তু আজ দেখুন...আচ্ছা নমস্কার। আপনার যা জানবার তা ওই কৌশিকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

জানবার আর কী-ই বা বাকি আছে।

কৌশিক বসু কিন্তু বেশ মুখচোরা স্বভাবের ছেলে। সহজে কিছু বলতে চায় না। তবু, কথায় কথায় একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছে কৌশিক। মাত্র পঁচাশি টাকা মাইনে পায় বলে কৌশিকের মনে কোন ক্ষোভ অভিযোগ নেই।

ঠিকই, বেশ সুখী ও শান্ত মন নিয়ে দক্ষিণ পলাশপুরের সেকেন্ড মাস্টারির জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে কৌশিক। বি-এ পাশ করে আর রেলওয়ের সার্ভিসে বেশ ভাল মাইনের কাজের জন্য প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়েও শুধু অপেক্ষায় আর আশায় চুপ করে বসে থাকতে পারেনি কৌশিক। গ্রামের স্কুলে তিন-চার মাসের জন্য টেম্পোরারি সেকেন্ড মাস্টারির চাকরি, মাইনে পঁচাশি টাকা, মন্দ কি ? একটা নতুন পরিবেশের বাতাস গায়ে লাগানো যাবে।

তিন-চার মাস পরে চলে যাবার জন্যই এখানে এসে সেকেন্ড মাস্টার হয়েছিল কৌশিক। অঙ্কেতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কৌশিকের মুখের দিকে তাকিয়ে গৌরহরিবাবু আশ্চর্য হয়েছিলেন। —আপনাকে পার্মানেন্ট করা হলেও বোধহয় আপনি এখানে থাকবেন না !

—আজ্ঞে না।

—রেলওয়ের চারশো টাকা মাইনের চাকরিটা আপনি পেয়ে যাবেনই বলে মনে হয়। আপনি ভয়ানক কোয়ালিফায়েড।

—খবর পেয়েছি প্রতিযোগিতার পরীক্ষাতেও আমি ফার্স্ট হয়েছি। কাজেই...।

—চাকরির চিঠি বোধহয় তিন-চার মাসের মধ্যেই এসে যাবে ?

—তার আগেও আসতে পারে।

ভুল কথা বলেনি, এমন কিছু বাড়িয়েও বলেনি কৌশিক। দুটো মাস শেষ হতে না হতেই চাকরির চিঠি এসে গেল, ঠিক আর দু'মাস পরে নতুন মাসের পয়লা তারিখে চাকুরির কাজে যোগ দিতে হবে।

—কিন্তু কী ব্যাপার ? রেলওয়েতে এইরকম ভাল মাইনের একটা চাকরি না নিয়ে আপনি এখানেই রয়ে গেলেন কেন ?

প্রশ্ন শুনে কৌশিক হাসতে থাকে—রয়ে গেলাম।

—কিন্তু তার একটা কারণ থাকবে তো ?

—কারণ কিছুই নেই। ইচ্ছে হলো, তাই রয়ে গেলাম। দেশের বাড়িতে কাকারা আছেন, মা আছেন কাশীতে। প্রতি মাসে মাকে ত্রিশ টাকা পাঠিয়ে দিই।

—এতেই আপনার জীবনের সব সাধ মিটে গেল ?

—না, ছুটির দিনে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করি, আর তার পাঠ উদ্ধার করি। সময়টা ভালই কেটে যায়।

হাসছে কৌশিক। সত্যি বেশ আছে কৌশিক।

৪

জাতের হিসাব নিলে জানা যায় এই গ্রামে অনেক জাতের মানুষ আছে, তাদের ভিন্ন-ভিন্ন পাড়াও আছে। বারুজীবী, বণিক, যুগী, মোদক, কলু, কাঁসারি, কুমার, কামার, নাপিত, রজক আর ভুঁইমালী। কোন পাড়াতে মাত্র দশ ঘর মানুষ, কোন পাড়াতে আবার পঞ্চাশ ঘর। দশ-বিশ ঘর নিয়ে বামুন কায়েতের পাড়াও আছে। একজন কবরেজমশাইও আছেন।

জাত আছে, কিন্তু জাতের পেশা একেবারে নেই বললেই চলে। সেই বর্ধমানের জ্বরের প্রকোপে নয়, একটা অদ্ভুত দুর্ভাগ্যের জ্বরে এই গ্রামের সব জাতের সব পেশা যেন শুকিয়ে-পাকিয়ে মরে গিয়েছে। মঙ্গলবারে শিবমন্দিরের কাছে ডাঙ্গাতে যে হাট বসে, তার মধ্যে দক্ষিণ পলাশপুরের সব জাতেরই মানুষ তিন সারিতে বসে আর সবজি বিক্রি করে। উচ্ছে, ধুঁদুল, কুমড়ো, লাউ আর কাঁকুড়। মাস বুঝে ওল, সিম, বরবটি আর কাঁচা পেঁপেও থাকে। মুদিদের ডাল নুন আর মশলার পসরাও দেখা যায়। বিশ বছর আগেও এই হাটে দা, কাটারি, লাঙ্গলফলা আর বঁটির অনেক দোকান বসতো। তাছাড়া কাঁসার বাসনের পসরাও ঝকঝক করে খদ্দেরের চোখের লোভ জাগিয়ে তুলতো। এখন আর সে সব পণ্যের কিছুই আসে না। গোবর্ধন অবশ্য দশ-বিশ সের মুগকলাই বিক্রি করে, আর যুগী-পাড়ার শ্রীধর ও চন্দ্রনাথ বিক্রি করে খেরো গামছা। পানের বেচাকেনার হল্লাটাও যেন অনেকগুলি রোগীর কাতরানির শব্দ। গো-গাড়িতে বোঝাই হয়ে বাইরে থেকে অবশ্য চকমকে অনেক রকমের পণ্যের আগমন হয়। প্লাস্টিকের খেলনা আর বাসন, রঙিন শাড়ি আর কোরা ধুতি, সুতির গেঞ্জি আর উলের সোয়েটার, রূপসী ফিল্মি তারকাদের ছবি, টর্চ আর সাইকেলের সরঞ্জাম।

তালডাঙ্গার কাছে মোটর ট্রাক থামিয়ে রেখে পাইকাবেরা আসে, সব সবজির সম্ভার কিনে আর গো-গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে চলে যায়। দক্ষিণ পলাশপুরেব অর্থনৈতিক প্রাণটা মঙ্গলবারের হাটে বিকেল পর্যন্ত এই ভাবে ও এইরকম একটা সাড়া নিয়ে একটু চঞ্চল হয়, আর সন্ধ্যা হতেই ফুরিয়ে যায়। মোদক মহেন্দ্রেব মেঠাইয়ের দোকানে সারাদিনের বিক্রিতে দশ টাকার বেশি আসে না।

সবচেয়ে বেশি করে আসে আর সবচেয়ে বেশি বিকিয়ে যায়, সেটা হলো বাইরে থেকে আসা একটা পণ্য, মিলের মোটা সুতোর ধুতি আর শাড়ি। নীলগঞ্জের তাতের কুসুম ফুলের রসে রঙিন-করা বাসন্তী রং-এর শাড়ি হলো সবচেয়ে সৌখীন আর দামী পণ্য, খুব কমই বিক্রি হয়। এই গ্রামে ওই শাড়ির ক্রেতা হলো শুধু ওই এক চার-আনি জয়ন্ত ঘোষ।

সন্দেহ হয়, এই হাট বোধহয় সতেরো শতকের একটি সমৃদ্ধ হাটের ধ্বংসাবশেষ। বাইরে থেকে আজও যে এত ক্রেতা-বিক্রেতার আগমন এখানে হয়, তার কারণও বোধহয় স্মৃতিচারণার মতো একটা ব্যাপার। পুরনো অভ্যেসের জের। নইলে দক্ষিণ পলাশপুরের মতো এরকম একটা দুর্গম অনুন্নত গ্রামে এরকম কোন হাট বসতো না।

জাতপেশার কী অদ্ভুত অসহায় অবস্থা! প্রায় সব পেশারই হাত অসাড় হয়ে গিয়েছে, হাতিয়ারে মরচে ধরেছে। জাতপেশা ছেড়ে দিয়ে কিংবা ভুলে গিয়ে অনেকেই ভিন গাঁয়ের ক্ষেতে মনিষ হয়ে কাজ করে আর দিনমজুরির আড়াই টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

কাঁসারিপাড়ার মথুরানাথের বিবৃতি : কলকাতা থেকে মহাজনেরা এসে দাদন সাধে বটে, কিন্তু দাদন নিতে পারি না। কাঁসার বাসনের যে দর তারা বেঁধে দিতে চায়, সে দর আমাদের পোষায় না। কাজেই পেশা ছেড়ে দিতে হয়েছে। এ তল্লাটে আমার কাঁসার বাসন কেনবার মতো লোকও নেই। অনেক মেহনত করে পদ্মকলির মতো ধাঁচের একটা পেতলের পিলসুজ গড়েছিলাম। চার-আনির বাবুকে কত করে বললাম, আপনার মেয়ের বিয়ের দানসামগ্রীর জন্য

জিনিসটা কিনুন। তিনি বললেন—না, দরকার নেই। বর হলো বিলেত-ফেরত মানুষ, তার বাড়িতে পিলসুজ-টিলসুজ মানায় না।

নীলু ঘোষের বিবৃতি : আমার গোয়ালে এখনও ছ'টা গাই আছে বটে। কিন্তু থেকেও নেই। দুধ যা হয় তাতে দই-ক্ষীরের কিছু কারবার চলছে বটে কিন্তু আর কতদিন চলবে, তা বলতে পারি না। মশার কামড়ে গাইগুলো দিন দিন রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে। চার-আনির বাবুকে সেধেছিলাম, আপনার মেয়ের বিয়েতে অন্তত সের দশেক ক্ষীরের অর্ডার আমাকে দিন। তিনি বললেন, না, ক্ষীর-টীরের দরকার নেই। বর হলো বিলেত-ফেরত মানুষ। বরযাত্রীদের সাহেবী কেতায় খাওয়ানো হবে।

কবিরাজ অনাদি সেনের বিবৃতি : আমার সালসা-পাঁচনের কোন কদর নেই। রোগীর নাড়ি টেপাটিপি করবার জন্যেও আমাকে কেউ আর ডাকে না। কাজেই আমাকে স্কুলের বাংলা পণ্ডিতের কাজ নিতে হয়েছে। চার-আনির বাবু মাথা ধরার কষ্টে ভুগছিলেন, তাকে দেড় টাকা দামের একটা তৈল দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি নিলেন না। বললেন : আপনার তৈল মাথাতে দিলে আমার মাথার কষ্ট বাড়বে।

অদ্ভুত ব্যাপার, পেশা হারিয়ে দুঃখী হয়ে যাবার এই গ্রাম্যজীবনের অবসাদ ও বিষাদের মধ্যে একটা নতুন পেশা বড়ই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে। এরকম বিচিত্র পেশা এবং তার এরকম মূর্তিমন্ত রূপ পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।

দন্তে তৃণ কাটি, অর্থাৎ একটা খড়কুটোকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে, আর জ্বলন্ত ধুনোর একটা তপ্ত ধুনুচি হাতে নিয়ে গ্রামের এপথে-সেপথে ছুটোছুটি করে একটা লোক। এক-একবার থামে, গরুর মতো একটা বোকাটে শব্দের ডাক ছাড়ে। তারপর সারা গায়ে তপ্ত ধুনুচির ছেঁকা লাগায়। লোকটার নাম হলো ভক্ত হারু।

ভক্ত হারুর বিবৃতি : নিজের পাপের জন্যে নয় মশাই, আমি পরের হয়ে তার পাপের জন্য দন্তে তৃণ কাটি প্রাশ্চিত্তির করি। দক্ষিণা নিই মাত্র পাঁচটি টাকা। অন্য গাঁ থেকেও প্রাশ্চিত্তির করবার কাজ পাই। এ জগতে কে যে কত সাধু পুরুষ, তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। কে না প্রাশ্চিত্তির করালো ? কে আর বাকি আছে ? শুধু ওই চার-আনির বাবু ভয়ানক ভচ্চোনা করে আমাকে খেদিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাকি প্রাশ্চিত্তির করবার কোন দরকারই কোনদিন হবে না। আমি সেদিন মনে মনে হেসেছিলাম আর বলেছিলাম, দেখাই যাক্ দরকার হয় কি না।

৫

ধর্ম আছে উৎসবও আছে। পাঁচু ঠাকুরের পুজো হলো এই দক্ষিণ পলাশপুরের নিত্যদিনের ধর্মীয় ব্যস্ততা। পাঁচু ঠাকুরের কাছে পুজো আর মানতেও হুড়োহুড়ি লেগেই আছে। শ্মশানে যাবার পথে আছে চণ্ডীতলা, অশ্বত্থের তলায় একটি সিঁদুর মাখানো শিলা। পালপাড়ার জগদ্ধাত্রীর পুজোটাই হলো এই গ্রামের একমাত্র ও সবচেয়ে হর্ষমুখর একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। এই উৎসবে সবচেয়ে বেশি আমোদ জমিয়ে তোলে নীলগঞ্জের সখীদের গান। ছেলেরা মেয়ে সেজে গান গায়। গানেতে গ্রামের যার-তার নামে যথেচ্ছ রগড়ের কথা থাকে। এ বছরের সখীদের গানে চার-আনির বাবুর মেয়ের নামেও ইঙ্গিত করে কিছু কথা গাওয়া হয়েছে : 'ভাগ্যি নয়কো মাগ্গি ভাই ভাদুদিদি বলেন। ফুলতুলুনী মেয়ে আমার মেম-সাহেবটি হলেন।'

ঠিক কথা। জানাজানি হতে আর রটে যেতে বেশি দেরি হয়নি। চার-আনির বাবুর মেয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে খুবই সুখে আর আদরে আছে। শ্বশুর আর শাশুড়ি দু'জনেই প্রীতিলতাকে খুব ভালবাসে। বিলেত-ফেরত স্বামীর বাড়িতে সাহেবী চালচলনের সঙ্গে নিজেকে খুবই

সহজে মানিয়ে নিয়েছে প্রীতি। মঙ্গলবারের হাটে তোলা আদায় করেন যিনি, চক্রবর্তীমশাই, যিনি চার-আনির বাড়ির সব কাজের একজন সরকারমশাই, তিনি এই এক বছরের মধ্যে তিনবার কলকাতায় গিয়ে প্রীতিকে দেখে এসেছেন। তিনিই বলেছেন, প্রীতি এখন আর সেই বাসন্তী শাড়ির আর ফুলের সাজির প্রীতি নয়। জামাই মনোময়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যখন ময়দানে বেড়াতে যাবার জন্য গাড়িতে ওঠে প্রীতি তখন তাকে সত্যিই শাড়িপরা একটি মেমসাহেব বলে মনে হবে। প্রীতিলতার সাজ-পোশাক আর খোঁপাতে নতুন রকমের রঙ আর ভঙ্গী। প্রীতিকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবার জন্য দেড়শো টাকা মাইনের একজন মাস্টার আছেন। প্রীতির বাপের বাড়িতে যাবার কোন কথা উঠলেই শাশুড়ি গম্ভীর হয় আর জামাই মনোময়ের চোখমুখের ভাবটা করুণ হয়ে যায়। শাশুড়ি বলেছেন, বিয়ের পর একটা বছর পার না হওয়া পর্যন্ত নতুন বউয়ের পক্ষে বাপের বাড়ি যাওয়া আমাদের নিয়ম নয়। প্রীতিও চক্রবর্তীমশাইকে বলেছে—তাই ভাল। আপনি বাবাকে আর মাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কাকা। এদের দুঃখিত করে এখন দক্ষিণ পলাশপুরে যেতে আমার একটুও ভাল লাগবে না।

মদ খেয়ে সব সময় টং হয়ে থাকেন যিনি, যাঁর নাম রায়বাবু, গো-গাড়ি ভাড়া খাটিয়ে যিনি বেশ ভালই আয় করেন, তিনি বলেন—কিন্তু একবার এই দক্ষিণ পলাশপুর ছেড়ে চলে গেলে আর ফিরে না আসাও তো একটা নিয়ম।

—তার মানে?

—তার মানে, ছাড়ার মতো করে একবাব ছেড়ে চলে গেলে আর কখনও ফিরে না আসাই ভাল। ফিরে এলে নির্ঘাৎ কোন আঘাত অপঘাত পেতে হয়। কবরেজমশাইয়েব বড় ছেলে সুধাকর, যে সুধাকর আজ প্রায় পাঁচ বছর হলো কলকাতাতে আছে, কলকাতাতে চাকরি করে, কলকাতাতেই বিয়ে করেছে, আর মাগ-ছেলে নিয়ে কলকাতাতে ভাড়ার বাসাবাড়িতে থাকে, সে বড়দিনের ছুটিতে একবার এসেছিল। দিনদুপুরে পথের উপর একটা কেউটে সুধাকরকে তাড়া করেছিল। সেদিনই বিকেলে কলকাতাতে ফিরে চলে গিয়েছিল সুধাকর।

জানা গেল, দক্ষিণ পলাশপুরের জীবনে এরকম আরও অনেক নিয়ম আছে। শনিবারের সন্ধেতে পথ হেঁটে তালডাঙ্গাতে না যাওয়াই ভাল, কারণ পথ ভুল করিয়ে দেবার জন্য পথেরই উপর আলেয়া ঘুরে বেড়ায়। চণ্ডীতলার কাছে যে ডুমুরগাছটা আছে, তার ফল রান্না করে খেতে নেই। খেলে অমঙ্গল হয়। গাছপাকা ডুমুর খাওয়াই ভাল, এবং খাওয়ার পর মুখ ধুতে নেই। রাত্রিবেলাতে কুকুরের কান্নার শব্দ কানে এলে ঘরের দরজার কপাটে তিনবার টোকা দিতে হয়। পূবমুখো হয়ে হাই তুলতে নেই। যদি মাঝরাতে পায়ের শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু কোন ছায়া দেখতে না পাও, তবে দরজার হুড়কোতে পুরনো ঝাঁটা একবার ছুঁইয়ে দেবে। ভোরবেলাতে চার-আনির দেউড়ির মাটি মাড়াতে নেই; মাড়িয়ে ফেললে একটু গোবর মাড়িয়ে নিতে হবে।

দক্ষিণ পলাশপুরের এইসব করতে নেই আর করতে হয় যেন গ্রামবাসী মানুষগুলির মনের পাতালের যত দেবতা; কেউ ভয় দেখায় কেউ বা লোভ দেখায়। এবং এদের বিক্রমও কিছু কম নয়। গ্রামের কোন মানুষ এদের শাসন মেনে চলতে কখনও ভুল করে না, ভুলেও যায় না।

মোড়লের শাসন এখন আর নেই বললেই চলে। জাতের শাসন অবশ্য কিছুটা আছে। গত এক বছরের মধ্যে একঘরে করে শাস্তি দেবার তিনটে ঘটনা হয়েছে।

এক বছরের চুরির সংখ্যা হলো একুশ, খুনের সংখ্যা দুই, আর মেয়েমানুষ নিয়ে গণ্ডগোল ও মারামারির সংখ্যা হলো সাত।

রোগের মধ্যে মা শীতলার কৃপার ঘটনা সবচেয়ে বেশি। গত বছর মা শীতলার মাথাতে

তুলসীপাতা রাখতে পারা যায়নি। যতবার রাখা হয়েছে ততবারই নাকি গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে। গত বছরে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় একশত জন, মরেছিল আশি জন। ওলাউঠায় মৃতের সংখ্যা ছয়, সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা তিন।

মনে হতে পারে, দক্ষিণ পলাশপুরের এইসব রোগ মরণ আর দরিদ্রতার হাহাকারের দাপটে আনন্দের সব বাদ্য-টাদ্য নীরব হয়ে গিয়েছে। গান-টানও প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছে। চড়কের সময় ঢাক অবশ্য বাজে, কিন্তু সেই বাজনার তেমন কোন জোর নেই। ক্বচিৎ কোন সন্ধ্যাবেলাতে চাষী গেরস্থের মেটে ঘরের দাওয়াতে কেরোসিনের কুপি জ্বলে, খোলের শব্দও বাজে। ঘণ্টা দু'তিন নামকীর্তন চলে—হা রে কিষ্ণ, হা রে কিষ্ণ, হা রে কিষ্ণ হারে হারে! কে জানে, নামকীর্তনের ভাষার এই বিকার নিতান্ত উচ্চারণের বিকার কিনা। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। এই গ্রামের মাঠে কোন রাখালিয়া বাঁশি-টাশি বাজে না। দক্ষিণ পলাশপুরের অবস্থা দেখলে মনে হবে, ওটা নিতান্তই মিথ্যে কবি-কল্পনা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, রায়বাবুর গরু চরায় যে ছেলেটি, তার হাতে সব সময় একটা ট্রানজিস্টার দুলে-দুলে আর ঘুরে ঘুরে ফিল্মি গান শোনায়।

না, ধারণা করলে ভুল হবে যে, দক্ষিণ পলাশপুরে এই গ্রাম্যতার সবটাই হলো সেকেলে জীবনের যত জীর্ণ-শীর্ণ অবশেষ। একেলে জীবনের বিচিত্র রকমের অনেক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই অনুন্নত গ্রামটির জীবনে প্রবেশ করেছে। পালপাড়ার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা প্লাস্টিকের রঙিন ডিসেতে মুড়ি খায়। গো-গাড়ি হাঁকিয়ে রোজ তালডাঙ্গাতে যায় যে বৈদ্যনাথ আর লক্ষ্মীচরণ, তাদের চোখে কালো কাঁচের চশমা, কড়া রোদের চেহারা ওদের চোখে আর সহ্য হয় না। স্কুলে যাবার সরু রাস্তাতে অনেক ধুলো অনেক কাদা আর অনেক গর্ত। তবু রায়বাবুর দুই ছেলে সাইকেল চেপে স্কুলে যায়। রায়বাবু বলেন—বিলিতী ওষুধের একটা শিশিও এ গাঁয়ে দেখতে পাবেন না, কিন্তু চেষ্টা করে খোঁজ নিলে দু'-চারটে বিলিতী মদের বোতল নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।

দুঃখ হয়, দক্ষিণ পলাশপুরের এই অবস্থা যেন একটা আধপোড়া ফিনিক্স পাখির যন্ত্রণাময় চেহারাটার দৃশ্য। ভাল হতো, যদি ভাল করে পুড়ে গিয়ে একেবারে ভস্ম হয়ে যেত এই দক্ষিণ পলাশপুর। তাহলে নতুন করে প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠতো হয় সতের শতকের অখণ্ড-অটুট একটি গ্রাম্যতার চেহারা নিয়ে, নয়তো সিন্ধ্রি চিত্তরঞ্জন ও দুর্গাপুরের মতো বিশ শতকের জানপদী মূর্তি নিয়ে।

তাই ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য বোধ করতে হয়, কৌশিক বসুর মতো আধুনিক স্কলার ছেলে রেলওয়ে সার্ভিসের চারশো টাকা মাইনের একটা অফিসারী পদের মায়া তুচ্ছ করে কেন আর কিসের জন্য এই আধপোড়া দশার দক্ষিণ পলাশপুরে পড়ে আছে।

৬

এক বছর আগের ফাল্গুনেরই একটা মঙ্গলবারের হাটে তোলা আদায় করতে যখন ব্যস্ত ছিলেন চক্রবর্তীমশাই তখন সেই ব্যস্ততারই মধ্যে হেডমাস্টার গৌরহরিবাবুর মুখে একটা খবরের কথা তিনি শুনেছিলেন। আর চমকে উঠেছিলেন। খবরের মতো খবর আর চমকে ওঠবারই মতো কথা। সেকেন্ড মাস্টার কৌশিক বসুর মস্ত মাইনের একটা চাকরির চিঠি এসেছে। চাকরির শুরুতেই চারশো টাকা মাইনে। চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে কৌশিক। তাই এখন ভাবতে হচ্ছে কী করে আর কোথা থেকে আবার একজন সেকেন্ড মাস্টার পাওয়া যায়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার দরকার হবে বোধহয়।

সেই মুহূর্তে আরও ব্যস্ত হয়ে, আর, বলতে গেলে একরকম দৌড় দিয়ে চার-আনির জয়ন্ত

ঘোষের বাড়িতে এসে খবরটাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন চক্রবর্তীমশাই। তারপর স্কুলবাড়িতে গিয়ে আর কৌশিক বসুকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে এলেন আর হাঁফ ছাড়লেন।

জয়ন্ত ঘোষ খুশি হয়ে হাসলেন আর বললেন—এস বাবা, বসো বসো। শুনছি তুমি নাকি স্কুলের মাস্টারির কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?

কৌশিক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শুনছি, তুমি নাকি রেলওয়েতে চারশো টাকা মাইনেতে একটা চাকরি পেয়েছ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর কতদিন এখানে আছ?'

'বড় জোর আর একটা মাস।'

'তোমরা তো কুলীন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমাদের দেশ?'

'ত্রিবেণী, হুগলী।'

'দেশে বাড়ি আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাড়িতে আর কে আছেন?'

'কাকারা আছেন।'

'তোমাব বাবা?'

'তিনি নেই।'

'তোমার মা?'

'কাশীতে আছেন।'

'তোমার বড়কাকার নামটা আর ঠিকানাটা বলবে?'

'হ্যাঁ, জ্ঞানময় বসু, নতুনবাজার, ত্রিবেণী, হুগলী।'

'একটু চা খাও।'

'দিন।'

'চেঁচিয়ে ডাক দিলেন জয়ন্ত ঘোষ—প্রীতি, চা দিয়ে যা।

প্রীতি আসে, চা দিয়েই চলে যায়। জয়ন্ত ঘোষ বললেন—আমার এই মেয়েই আমার একমাত্র সন্তান।

জয়ন্ত ঘোষের সঙ্গে এই আলাপ-সংলাপের ঘটনাব পর মাত্র সাতটা দিন পার হয়ে আর একটা মঙ্গলবারের সকালবেলার রোদ যখন ঝলমল করে জেগে উঠেছে, ঠিক তখন একটা হঠাৎ বিস্ময়ের আবির্ভাবের মতো চার-আনির বাড়ির দেউড়ির কাছে গো-গাড়ি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক, কলকাতার ডাক্তার শ্রীসুবিনয় দত্ত।

প্রজাপতির কি চমৎকার নির্বন্ধ। মামা সুবিনয় দত্ত তার ভাগ্নী প্রীতিলতার জন্য একটি পাত্রের খবর নিয়ে এসেছেন। পাত্র হলো সুবিনয় মামারই জ্ঞাতি সোমেন দত্তের ছেলে মনোময়। বিলেত-ফেরত ডাক্তার মনোময়। পাত্রের ইচ্ছা আব পাত্রের বাপ-মার ইচ্ছার একমাত্র দাবী হলো, খুব সুন্দর মেয়ে চাই। আর কোন দাবী নেই। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, প্রীতির মতো সুন্দর মেয়ে হাজারে কেন, লাখেও একটা পাওয়া যায় না। সুতরাং...

সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্। আর দশটা দিন পরেই প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে গেল। বর মনোময়কে দেখবার জন্য পুরনো মন্দিরের কাছে রাস্তার উপর দক্ষিণ পলাশপুরের ছেলে-মেয়ে-বুড়োর বিরাট একটা ভিড় যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানে

কলকাতা থেকেই পুরুত এসে মন্ত্র পড়েছিল, হোম করেছিল। আর, সুবিনয় মামা তাঁর নিজের চেষ্টায় সব বন্দোবস্ত করে আর বেশ খরচ করে চার-আনির এই পুরনো দালানের বারান্দাতে বরযাত্রীদের সাহেবী কেতায় ডিনার খাইয়েছিলেন। কেটারিং-এর লোক এসেছিল দশ জন, বরযাত্রী পাঁচ জন।

গ্রামের কেউই নিমন্ত্রিত হয়নি। মামা সুবিনয় দত্ত বলেছিলেন, গ্রামের কাউকে লুচিমণ্ডা খাওয়ানো চলবে না। হাটের তোলা আদায় করে যার জীবনযাত্রা কোন মতে কায়ক্লেশে চলছে, তার মেয়ের বিয়েতে গেঁয়োদের নিয়ে দীয়তাং ভুজ্যতাং করবার কোন মানে হয় না।

তারপর? তারপর আর কি-ই বা হতে পারে। দক্ষিণ পলাশপুরের কোন আলোছায়ার চেহারা বদলে যায়নি। শুধু একটি দৃশ্য মুছে গিয়েছিল, চার-আনির বাগানে সকালবেলাতে ঘুরে ফিরে ফুল তুলতে সেই সুন্দরী মেয়েটিকে আর দেখা যায়নি।

সকালবেলার রোদে অনেককালের পরিত্যক্ত বৈরাগীপাড়ার যত বাস্তুভিটার ঘাসের উপর কেউটে ঘুরে বেড়িয়েছে। শুধু কি কেউটে? দাঁড়াশ কালচিতি শাঁকিনী বেত-আছড়া ও আরও কত জাতের কত যে আছে, তার হিসেব করা সম্ভব নয়। ঠাট্টা করে বলতে ইচ্ছে করে জনমেঞ্জয়েব সর্পযজ্ঞ খুব-একটা গ্র্যান্ড সাকসেস হয়নি। সাপেরা হাজারে হাজারে পালিয়ে এসে এই দক্ষিণ পলাশপুরে ঠাঁই নিয়েছিল। দক্ষিণ পলাশপুরের সর্প সম্পদ বড়ই বিপুল।

এর মধ্যে যে সাপের নাম সন্ন্যেসী গোখরো, সে সাপ এই বিশ্বে অন্য কোথাও নেই বলে মনে হয। গেরুযা রং-এর গোখ্‌রো। এরা চার-আনিব বাড়ির দেউড়ির আর পাঁচিলেব ফাটলের মধ্যে বাস করে। ডানপিটে ছেলেরা কোন সন্ন্যাসী গোখ্‌রোব মাথা লক্ষ করে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করলেই রেগে যায় আর চেঁচিয়ে ধমক দেন মাতাল রায়বাবু।—থাম্ ছোঁড়ারা। ওরা কার কি ক্ষেতি করেছে রে? ওদের মারিসনে, কখ্‌খনো মারবিনে। ওরা গুপ্তধন পাহারা দেয়।

কিন্তু ডানপিটে ছেলেরা, কিংবা আগন্তুক বেদেবা ও ব্যাধেরা যখন গুলতি চালিয়ে আব আঠা মাখানো জাল পেতে গ্রামেব গাছের পাখিগুলোকে মারে আর ধবে, তখন হেসে হেসে চেঁচিয়ে ওঠেন রায়বাবু—ধর ধব ধর। সব ধরে ফেল। ঘুঘুব মাংস তো মাংস নয়, আয়ু বাড়াবার ওষুধ।

তবু দক্ষিণ পলাশপুবের পক্ষিসম্পদ একেবারে ফুরিযে যায়নি। জলপাইগুড়িতে পাখির সবকারী স্যাংচুয়ারিতে যাদের খুব কম দেখা যায় কিংবা দেখতেই পাওয়া যায় না, সেরকম বিরল জাতের অনেক পাখি এখানে আছে। সাদা-পেঁচা, মদনা টিয়া, ধনেশ, দোয়েল আর নীলকণ্ঠ অনেক দেখা যায়।

একটা বৎসর চুপ করে থাকবার পর দক্ষিণ পলাশপুরের দোয়েল যেদিন ডুমুরগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে শিস বাজাতে শুরু করেছিল, সেটা ছিল ফাল্গুনেরই একটা দিন। গ্রামের ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই আবার দলে দলে এসে আর ভিড় করে গ্রামের মাঝপথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। কলকাতার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে চার-আনির মেয়ে। গো-গাড়ির ভিতরে বসে আছেন সেই মেয়ে; কী চমৎকার তার সাজের শাড়িটি। চুড়োর মতো খোঁপা। মেয়ের দু'ঠোঁটের মিষ্টি হাসির রকমটাও বদলে গিয়েছে। চার-আনির সেই মেয়েকে আর চেনাই যায় না।

হেডমাস্টার গৌরহরিবাবু বেহায়ার মতো সেদিন সন্ধেবেলা কেন যে নিজেই যেচে কিংবা কে-জানে কিসের গরজে চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। বাইরের ঘরে বসে তখন গল্প করছিলেন চার-আনির বাপ মা ও মেয়ে।

গৌরহরিবাবুকে এভাবে হঠাৎ উপস্থিত হতে দেখে খুবই রাগ করেছিলেন জয়ন্ত

ঘোষ। —কী ব্যাপার ? আপনি আবার আমার এখানে কেন, কিসের জন্য ? একটা সেকেন্ড মাস্টার পেতে হলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিন।

'আজ্ঞে না, বিজ্ঞাপন দেবার দরকার নেই।'

'কেন ?'

'সেই সেকেন্ড মাস্টার কৌশিক তো আর চলে যায়নি।'

'কেন ?'

'কে জানে কেন ! অদ্ভুত এক খেয়ালী ছেলে। যত সব অদ্ভুত খেয়ালের কাণ্ড ! চাকরির চিঠিটাকে একদিন ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলো, আমি আর যাব না স্যার, এখানেই থাকবো।'

'কাণ্ডটা কবে হলো ?'

'সেই যেদিন আমাদের মা-মণির বিয়ে হয়ে গেল।'

চার-আনি জয়ন্ত ঘোষের রাগের চোখ দুটো একবার কেঁপে উঠেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর গৌরহরিবাবুর সেই মা-মণি প্রীতিলতার চোখদুটো হঠাৎ নিষ্পলক হয়ে গৌরহরিবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

তারপর, রাত্রি ফুরিয়ে ভোর হতেই যখন ডুমুরগাছের দোয়েল শিস বাজাতে শুরু করেছে, তখন দেখা গেল কী অদ্ভুত ব্যাপার, চার-আনির মেয়ে প্রীতিলতা, আর মাত্র তিন দিন পরে কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে যে মেয়ে, সেই মেমসাহেব মেয়ে নীলগঞ্জের তাঁতের বাসন্তী শাড়ি পরে আর ফুলেব সাজি হাতে নিয়ে বাগানের ফুল তুলছে। বোধহয় চোখ দুটো ছলছল করে উঠছে, তাই বার বার মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে আর বার বার থমকে দাঁড়াচ্ছে প্রীতিলতা।

সেদিন দুপুরবেলার ঘটনার দৃশ্যটা আবও অদ্ভুত, একেবাবে ভয়ানক রকমের অদ্ভুত। চার-আনির বাড়ির বারান্দার কাছ থেকে একটা দৌড় দিয়ে দেউড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর দন্তে তৃণ কাটি গরুর ডাক ছাড়ছে ভক্ত হাক নামে সেই চিমড়ে চেহারার লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ছটফট কবলো ভক্ত হাক। প্রাশ্চিত্তিরের যন্ত্রণা দেখাচ্ছে হাক। তারপর জ্বলন্ত তপ্ত ধুনুচি হাতে নিয়ে দৌড় দিল। হঠাৎ এক-একবার থামে, রাস্তার ধুলোর উপর শুয়ে পড়ে আর তপ্ত ধুনুচি দিয়ে বার বার বুকের উপর ছেঁকা দিতে থাকে।

এই অনুন্নত অদ্ভুত দক্ষিণ পলাশপুরের উন্নতির জন্য সমীক্ষার রিপোর্টে আপাতত এই সুপারিশ করতে হয় যে, ভাসানি নদীটার একটা বাঁধ দরকার। জলের ঢল সামলাবার জন্যে সেই বাঁধে বেশ বড়-কয়েকটা স্লুইস গেটও দরকার। স্কুলটার জন্য সাহায্যের গ্র্যান্ট বাড়াবারও দরকার আছে যাতে দশম শ্রেণী সহজে চালু করা সম্ভব হয়। অন্তত তালডাঙ্গা থেকে দক্ষিণ পলাশপুর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটাকে পাকা করে দেওয়া উচিত। আর, জানা দরকার কিসের জন্য গ্রামের মানুষগুলির পুরনো পেশা ও কুটিরশিল্প একেবারে মরেই গেল। জানা দরকার, সরকারী পুরাকীর্তি সংরক্ষণের কর্তারা আজও সতেরো শতকের জীর্ণ মন্দিরটাকে সংস্কার করে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন না কেন। তাছাড়া আরও একটু জানা দরকার, এত ভয়েল শিফন আর জর্জেট থাকতে সেদিন নীলগঞ্জের তাঁতের বাসন্তী শাড়ি কেন পরেছিল চার-আনির মেয়ে প্রীতিলতা ? আর বাগানের ফুল তুলতে গিয়ে তার চোখ দুটোই বা ছলছল করছিল কেন ?

ধূলিস্নান

এরা দু'জন যেন সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতি। প্রকৃতি চালাচ্ছেন আর পুরুষ চলছেন।

অবিনাশবাবু, যিনি এককালে কোন-এক কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি এখনও মাঝে-মাঝে হেসে হেসে আর শান্তস্বরে যাদের সম্পর্কে কথাটাকে বলে থাকেন, তারা হলো অবিনাশবাবুর বাড়ির ঠিক সামনের বাড়ির স্বামী আর স্ত্রী।

ফটিকদা, যিনি শখের থিয়েটারে অনেক অভিনয় করে নিজের মুখের ভাষাটাকেও বেশ একটু নাটুকে করে তুলেছিলেন, তিনি বলতেন, এ যেন মেঘের বিদ্যুতের বাসা। যাদের দু'জনের সম্পর্কে ফটিকদার ধারণাটা খুব আশ্চর্য হয়ে কথা বলতো, তারা হলো ওই স্বামী আর স্ত্রী, অবিনাশবাবুর বাড়ির ঠিক সামনের বাড়ির নরেশ আর নীরজা। নরেশ দেখতে খারাপ নয়, আর নীরজাও রূপসী নয়। তবু ফটিকদার কথাটাকে খুব ভুল তুলনার বাচালতা বলে কেউ মনে করেনি। নরেশ যখন কারও মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন মনে হবে, নিতান্ত এক নিরীহতার দুটি চোখ যেন তাকিয়ে আছে। কিন্তু নীরজার চোখের তারা ঝিকমিক করে ; মনটা যেন ওই চোখের চাহনিতে অদ্ভুত একটা আলো হয়ে ঠিকরে পড়তে চায়।

কে যেন নিন্দে করেই কথাটা বলে ফেলেছিল—একটুও মানায় না। তার মানে, নরেশের মতো নিরীহতার কাছে নীরজার মতো একটা ঝকমকে ব্যস্ততাকে একটুও মানায় না। সত্যি, নরেশ যেন একটা অলস শান্তির ছবি। বাইরের ঘরে একটা চেয়ারের উপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে সুস্থির হয়ে বসে থাকে। আর, নীরজা যেন সব-সময় কাজে ব্যস্ত একটা চঞ্চলতার হাওয়া। ডাক-পিয়ন এসে দরজার কাছে দাঁড়ালে নীরজাই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। সব চিঠি নীরজাই পড়ে। তারপর নীরজা নিজেই সেইসব চিঠিকে আবার হাতে তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে নরেশের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে একটা-দুটো চিঠি নীরজার হাতেই থেকে যায় ; কিন্তু সেজন্য নরেশের চোখে কোন প্রশ্নের ছায়াও দেখা দেয় না। নীরজার ইচ্ছা, নীরজা নিজেই জানে ও বোঝে, কোন্ চিঠি নরেশের পড়বার দরকার আছে, আর, কোন্ চিঠি নরেশের পড়বার কোন দরকার নেই।

বাগানের মালী যখন লাল গোলাপের গায়ে পোকার ওষুধ ছিটিয়ে দেবার জন্য পিচকারী হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে, তখন নীরজাও ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে। মালীর কাছে দাঁড়িয়ে কাজ দেখে, যেন কাজে কোন ফাঁকি না থাকে, যেন কোন ভুল না হয়।

পাঁচ বছর আগে একদিন ওই লাল গোলাপ নেবার জন্য স্কুলের ছেলেরা এসেছিল। স্কুলের প্রাইজের অনুষ্ঠানে টেবিল সাজাতে হবে, তাই লাল গোলাপের দুটো তোড়া দরকার। ছেলেরা সে দরকারের কথা নরেশের কাছে বলেও ছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। নরেশ শুধু শান্তভাবে হেসে একটি কথা বলেছিল—আমি তো কিছু বলতে পারছি না, তোমরা ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ।

হ্যাঁ, ছেলেরা শেষে নীরজারই কাছে গিয়ে অনুরোধের কথাটা বলেছিল। আর, নীরজাও খুশি হয়ে মালীকে দিয়ে প্রায় এক ঝুড়ি লাল গোলাপ তুলিয়ে নিয়ে ছেলেদের দিয়েছিল।

কিন্তু আগের দিনের নরেশ ঠিক এরকমের একজন শুদ্ধ নরেশ ছিল না। আজ থেকে দশ বছর আগে এই বাড়িতে যে নরেশ তানপুরা হাতে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা যখন-তখন গান গেয়েছে, সে নরেশ আর গান গায় না। সেজন্য অবিশ্যি এই সংসারের গানের প্রাণের কোন ক্ষতি হয়নি, হবেও না। কারণ, নরেশের গলার সেই গানে শোনবার মতো অথবা শুনে খুশি হবার মতো কোন ব্যাপারই ছিল না। অনেকেই জানেন, বিশেষ করে সামনের বাড়ির

অবিনাশবাবু জানেন যে, নরেশের গানের বাতিক একদিন নীরজারই ইচ্ছার একটি স্পষ্ট কথার কাছে বিনত হয়ে শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়েই গিয়েছে।

শুধু গান গেয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, সে গান পৃথিবীর কোন দরকারে লাগুক বা না লাগুক, এরকম একটা নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি ছিল বলেই বোধহয় নরেশ আর আইনের পরীক্ষাটা দেয়নি। উকিল না হলেও চলবে। নরেশের বাবা তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য এই শহরের মধ্যেই ছোট-বড় যে দশটি বাড়ি রেখে গিয়েছেন, তার ভাড়াই যথেষ্ট। নীরজার বাবাও বোধহয় নরেশের শুধু এই সম্পত্তির দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভেবেছিলেন, তাই নরেশের মতো ছেলের কাছে তাঁর একমাত্র মেয়ে নীরজাকে সঁপে দিয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

এই দশ বছর ধরে নীরজাও যেন প্রতি মুহূর্তের চিন্তা আর আগ্রহ দিয়ে এই বাড়িকে নিজেরই মনের মতো একটি খুশির স্বর্গ করে গড়ে নিয়েছে। নরেশের কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেনি নীরজা। আইন পাশ করতেই হবে, নীরজার ইচ্ছার সেই নির্দেশ যেন একটা দুরন্ত আকাশবাণী। অবাধ্য হতে পারেনি নরেশ। পাটনাতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, আইন পাশও করেছে। তারপব নীবজা যা চেয়েছে, তাও হয়েছে। মুন্সেফ আদালতে রোজই একবার ঘুরে আসে নরেশ। ঠিক সকাল দশটার সময় বেব হতে হয়। নীরজা বলেছে, কেস থাক বা না থাক, রোজ একবার আদালতে যেতেই হবে।

এই শহরের এই পাড়ার প্রায় সকলেই জানে, আজকের এই নরেশ আর সে নরেশ নয়। বদলে গিয়েছে নরেশ। যে নরেশ ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে থাকতেই পারতো না, বেলবাগানেব কাছে ওই এবড়ো-খেবড়ো মাঠেরই এদিক-সেদিক ছুটোছুটি কবে বেড়াত, বাচ্চা ছেলেগুলোর সঙ্গে ডাণ্ডা-গুলি খেলতে গিয়ে সারা বিকালটাই পার কবে দিত, সেই নবেশ আজকাল যেন শান্ত এক তপস্বীর মতো ওই বাড়ির বাইরের ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। নীরজা বলেছে, ওরকম ছেলেমানুষি ছটফটানি তোমাকে একটুও মানায় না। একটুও ভাল দেখায় না। কাজ যখন থাকবে না, তখন চুপ করে ঘরের ভেতরে বসে থাকবে।

অবিনাশবাবুর আজও মনে পড়ে এই নরেশ, যার মাথাতে আজ খুব ছোট করে ছাঁটা চুলের একটা স্তবক শক্ত হয়ে বসে রয়েছে, তার মাথার ঢেউ-খেলানো চুলের ঝালর প্রায় কান পর্যন্ত গড়িয়ে পড়তো আর দুলতো। ফুটবল বেশ ভালই খেলতো নরেশ। পাড়ার অনেকে আজও স্মরণ করতে পারে, খেলার মাঠে যখন ছুটে ছুটে বল ধরতো নরেশ, তখন নরেশের মাথার ঢেউ-খেলানো চুল যেন পাগল সন্ন্যাসীর জটার মতো এলোমেলো হয়ে উড়তো। সেই নরেশকে আজ দেখলে মনে হবে, এই মানুষ জীবনে কোনদিন কোন ফুটবলের চেহারাও বোধহয় দেখেনি।

নীরজার দুই চোখের ওই দ্যুতির সঙ্গে যেন একটা তৃপ্তিও আলো হয়ে হেসে ওঠে। সত্যিই যা চেয়েছিল নীরজা, তাই হয়েছে। অবিনাশবাবুর মেয়ে চিত্রালীর কাছে বলতে গিয়ে নীরজার চোখের ওই আলো সত্যিই ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে—আমি যদি যেতে বলি, তবেই উনি যাবেন। নইলে যাবেন না, যেতে পারবেনই না, অসম্ভব।

অর্থাৎ, শিশিরবাবুর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে আজ সন্ধ্যাবেলা নরেশদা যাবেন কিনা—চিত্রালী শুধু এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল, কারণ শিশিরবাবু বার বার চিত্রালীর বাবা অবিনাশবাবুকে অনুরোধ করেছেন, যেমন করে পারেন নরেশকে নিয়ে আসবেন।

ওই শিশিরবাবুর সঙ্গে নরেশের একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। তাছাড়া নরেশের বাবা ছিলেন শিশিরবাবুর অন্তরঙ্গ উপকারী বন্ধু। শিশিরবাবুও জানেন, বিয়ের পর কত বদলে গিয়েছে নরেশ। এই নরেশ যে নিজেই যখন-তখন শিশিরবাবুর বাড়িতে এসে চেঁচিয়ে ডাক দিত, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিন কাকিমা। সে-নরেশ এই দশ বছরের মধ্যে মাত্র একদিন

শিশিরবাবুর বাড়িতে এসেছিল, যেদিন ওই কাকিমাই এক গেলাস জল খেতে গিয়ে হেঁচকি তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তারপর মরে গেলেন। তিন বছর ধরে ভয়ানক রকমের একটা বুক-ব্যথার রোগে ভুগছিলেন শিশিরবাবুর স্ত্রী, নরেশের আত্মীয়া কাকিমা।

নীরজার প্রাণটা যেন একজন শিল্পী, আর নরেশ যেন একটা শিল্প। নীরজা যেমন করে গড়েছে, তেমনভাবেই গড়ে উঠেছে নরেশ। কোনদিনও আপত্তি করেনি। কোন প্রশ্নও করেনি। নীরজার ইচ্ছার কথাগুলিকে যেন শোনামাত্র মাথা পেতে মান্য করে নিয়েছে নরেশ। নীরজা যদি মনে করে, এই বোশেখ মাসের গরমে খাঁটি দুধ নরেশের পক্ষে ভাল নয়, দই ভাল, তবে নরেশও মনে করে, দই ভাল, খাঁটি দুধ এই শরীরে আর এই গরমে কখনই সহ্য হবে না।

অবিনাশবাবুর স্ত্রী মনোরমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে, ওই নীরজা এই বাড়িতে প্রথম যেদিন এল, সেদিন নীরজার কাছে কম করে বোধহয় দশটা হাসির গল্প বলেছিলেন মনোরমা। নীরজা কিন্তু একটুও হাসেনি। শুধু দুই কালো চোখের দুটো ঝিকঝিকে তারা থেকে অদ্ভুত রকমের একটা আলো, যেন একটা তীব্র দীপ্ত জিজ্ঞাসার যন্ত্রণাকে ঠিকরে দিয়ে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই নীরজা আজকাল সব সময় সারা মুখ হাসিয়ে নিয়ে ওই বাড়ির সব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ছুটোছুটি করে। যেন এক কৃতার্থা জয়িনীর মূর্তি। এই বাড়ির যত ঘরের দরজা ও জানালার পর্দাগুলি নীরজারই ইচ্ছার বাছাই-করা রং আর ডিজাইন নিয়ে দুলতে থাকে, যখন পাহাড়তলির সবুজ শালবনের ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে শহরের পাড়ায় পাড়ায় যত গাছপালার মাথার পাতা দুলিয়ে দেয়।

নীরজা কোন দিনও এই বাড়ির বাইরে গিয়ে কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেনি। যদি কোন মহিলা হঠাৎ কোনদিন এবাড়িতে এসে পড়েন, তবে নীরজা অবশ্য একটা নিরীহ অস্তিত্বের মতো মুখ লুকিয়ে কিংবা নীরব হয়ে বসে থাকে না। না, নীরজার ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব কেউ কখনো দেখতে পায়নি। নীরজা যে কারও বাড়িতে যায় না, সেটাও বোধহয় একটা কঠিন অহমিকা নয়। খুব সম্ভব, একটা অভিরুচি। যেন নিজের ঘরে একেশ্বরী হয়ে থাকবার আনন্দের কাছে আর-কোন আনন্দ ভালই লাগে না। চিত্রালী কতবার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছে, একবার আসুন না বউদি। ক্যারম খেলবেন, আসুন। কিন্তু শুধু হেসে সাড়া দিয়েছে নীরজা, না ভাই, এখন সম্ভব নয়।

—কেন ? এখন তো বেলা তিনটে মাত্র। নরেশদা তো আদালত থেকে ফিরবেন সেই প্রায় পাঁচটায়।

নীরজা হাসে—না, ঠিক সাড়ে চারটেয়।

—কেন ?

—আমার বলা আছে, বাড়ি আসতে যেন সাড়ে চারটের পর আর এক মিনিটও দেরি না হয়।

—যদি দেরি হয় ?

নীরজা—হবেই না, অসম্ভব।

চিত্রালী জানে, ঠিকই বলেছেন নীরজা বউদি। নরেশদা যেন কাঁটায় কাঁটায় বাধ্য একটা যন্ত্রের মতো নীরজা বউদির কথা মান্য করে চলেন। ঝড়-বাদল থাকলেই বা কি ? ঠিক সাড়ে চারটেয় বাড়ি ফিরে আসেন নরেশদা। নীরজা বউদি বলেন, না, আজ আর চা খেতে হবে না, আজ সরবত খাও। এক-একদিন সত্যিই অদ্ভুত রকমের এক-একটা কথা বলে ফেলেন নীরজা বউদি—আজ চা নয়, সরবতও নয়। আজ এখন শুধু কাশির ওষুধটা খেয়ে চুপ করে বসে থাক।

কতবার দেখতে পেয়েছে চিত্রালী, কাশির ওষুধ খেয়ে নিয়ে বাইরের ঘরের চেয়ারে কত শান্ত হয়ে বসে আছেন নরেশদা।

চিত্রালীর মা মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য হয়ে একটা কথা বলেন—ভাগ্যি ভাল যে, ছেলেপুলে নেই।

চিত্রালীর মা মনোরমা বোধহয় মনে করেন, ছেলেপুলে নেই বলেই নীরজার স্বামী-যত্নের চেষ্টা আর কাণ্ডটা এরকম চব্বিশ ঘণ্টার চিন্তার একটা বাতিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলেপুলে আর হবে কবে ? দশটা বছর তো পার হতেই চললো।

এরকম একটা রিক্ততার ভাব নীরজার জীবনে একটুও দুঃসহ বলে বোধ হয়েছে কিনা কে জানে! শশিবাবুর মা কিন্তু বেশ একটু রাগ করেই রগড় করেন।—এ-মেয়ের আর ছেলেপুলেতে দরকারই বা কি ? স্বামীটাকেই তো একেবারে একটা শিশু করে ফেলেছে।

এক-এক সময় সত্যিই মনে হয়, নরেশ একটা ব্যক্তিই নয়, একটা শিশু। চকবাজারে গিয়ে আর দোকানে দোকানে ঘুরে যখন দরকারের জিনিস কেনাকাটা করে নীরজা, তখন নরেশ ওই চকবাজারের রাস্তার একপাশে একটা রিকশার উপরে চুপ করে বসে থাকে। কারণ নীরজা বলে গিয়েছে, আমি এখনই আসছি, তুমি ততক্ষণ এই রিকশাতেই চুপ করে-বসে থাক।

যাই হোক, পাড়ার মানুষ যতই আশ্চর্য হোক, আর শশিবাবুর মা যতই নিন্দে করুক, পুরো দশটা বছর তো এই দু'জনের জীবনে একটা শান্তির একটানা প্রবাহের মতো পার হয়ে গিয়েছে। ঠাট্টা করলেও বাড়িয়ে বলেননি দার্শনিক অবিনাশবাবু ; সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মতো, একজন শুধু চলেছেন, আর একজন শুধু চালিয়েছেন। মাস-পয়লার দিনে নীরজাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যাও, আজ বাড়ি-ভাড়া আদায় করে নিয়ে এস, আজ আর আদালতে যেতে হবে না। তখুনি ব্যস্ত হয়ে বের হয়ে যায় নরেশ। যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। যদি কোনবার মাস-পয়লা পার হয়ে যায়, আর, বাড়িভাড়া আদায়ের কথা নরেশকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যায় নীরজা, তবে নরেশও ভুলে যায়। কোন দিন নিজের স্মৃতিশক্তির দোহাই দিয়ে একথা বলেনি নরেশ, মাস-পয়লা তো পার হয়ে গেল, এবার বাড়িভাড়া আদায়ের চেষ্টা করাই উচিত।

দশ বছরের মধ্যে মাত্র এই শেষ তিনটে মাস, নরেশের ওই বাড়ির বাইরের ঘরে মাঝে মাঝে এমন এক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে, যার পরিচয় এই পাড়ার কারও জানা নেই। অবিনাশবাবু শুধু অনুমান করেন, ভদ্রলোক খুব সম্ভব নরেশের স্ত্রী নীরজারই কোন আত্মীয়জন। হ্যাঁ, যে গাড়িতে চড়ে এই আত্মীয় ভদ্রলোক আসেন সেই গাড়িটা এই পাড়ার অনেকেরই কাছে পরিচিত। ওটা হলো দয়াগঞ্জ ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বিলাস দত্তের গাড়ি। হতে পারে, এই ভদ্রলোক হয়তো বিলাস দত্তেরও কোন আত্মীয়জন।

বেশ সুন্দর ঝকঝকে চেহারা, তেমনই সুন্দর সাজ-পোশাক ; ভদ্রলোক যেন চমৎকার এক অভিরুচির দীপ্ত ছবি। ভদ্রলোক যখন হেসে হেসে কথা বলেন, তখন মনে হয় নরেশের বাড়ির ওই বাইরের ঘরটা যেন চমকে চমকে অদ্ভুত একটা উৎসবের গান শুনছে। ভদ্রলোক নিজেই ব্যস্ত হয়ে অনুরোধ করেন, কই, এবার তাড়াতাড়ি এক কাপ চা দিয়ে ফেলুন, খেয়ে নিয়েই চলে যাই।

এবাড়ির এই দশ বছরের জীবনে কোন দিনও কারও অনুরোধের ভাষা শুনে কাজ করেনি নীরজা। কারও আদেশও শুনতে হয়নি। কিন্তু গত তিন মাসের মধ্যে অন্তত পনেরোটা দিন এই আত্মীয় ভদ্রলোকেরই একটা অনুরোধের কথা যেন উচ্চকিত একটা হর্ষের আদেশের মতো বেজে উঠেছে। শুনে খুশি হয়েছে নীরজা। খুব ব্যস্ত হয়ে, আর, একটুও সময় নষ্ট না করে চা তৈরি করেছে। সত্যিই, ভাবতে গিয়ে বেশ আশ্চর্যও বোধ করে নীরজা। এই তো সেই

শম্ভুবাবু, যার নামে কত গল্প শক্তিগড়ের বউদির মুখে নীরজা শুনেছিল। শম্ভুবাবু খুব ভাল ছবি আঁকেন ; বছরের ছ'টা মাস গোপালপুরে থাকেন, সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ান। কে জানতো যে, গল্পে শোনা সেই শম্ভুবাবুকে একদিন এখানেই এমন করে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে ? দয়াগঞ্জের ফ্যাক্টরির ম্যানেজার বিলাস দত্তের মামাতো ভাই এই শম্ভুবাবুর চোখ গোপালপুরের সমুদ্র দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে যায়নি। সে রকম কোন কারণ নয়, শম্ভুবাবু মাত্র তিন-চার মাসের জন্য ছোট পাহাড়, ঝরনা আর শালবনের সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্য এসেছেন। ছবি আঁকার সব সরঞ্জামও সঙ্গে এনেছেন।

ওই, সপ্তাহের দুটি-তিনটি দিন কোন ছোট পাহাড়ের কাছে, কিংবা ঝরনার কাছে, অথবা কোন শালবনের কাছে গিয়ে বসে থাকেন শম্ভুবাবু ; তারপরেই এই শহরে নরেশের এই বাড়িতে এসে একটা-দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে যান। শিল্পী মানুষের চোখের হাসি দেখে মনে হয়, সেই চোখ বোধহয় নীরজাকেও একটা ঝরনা মনে করে আর খুশি হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু নরেশের বাড়ির বাইরের ঘরের এই হর্ষমুখর ব্যস্ততার নূতন পালা কি এই তিনটি মাস পার হয়েই ফুরিয়ে গেল ? অবিনাশবাবু লক্ষ করেছেন, নরেশের বাড়ির বাইরের ঘর আবার তেমনই নীরব। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপরে নরেশের সেই চুপটি করে বসে থাকা অস্তিত্ব একাই পড়ে থাকে।

চিত্রালী এসে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছেন বউদি ?

নীরজা হাসে। সেই তৃপ্তির, সেই খুশি আর গর্বের হাসি।—ভাল আছি।

—নরেশদা কেমন আছেন ?

নীরজা—আমি যেমন রেখেছি, ঠিক তেমনই আছেন।

এইবার চিত্রালীও হেসে ফেলে—তা তো জানি। কিন্তু...।

নীরজা—না ভাই, কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। আজ এই দশ বছরের মধ্যে ভদ্রলোকের ওপর একটি মুহূর্তের জন্যেও রাগ করতে পারিনি। এ কী আমার কম সৌভাগ্যের কথা ?

চিত্রালী বলে—নরেশদা আপনাকে সত্যিই...।

নীরজা—কি ? বলেই ফেল না কেন ?

চিত্রালী—আপনাকে খুব বেশি ভালবাসেন।

নীরজা—অস্বীকার করতে পারি না। যদি তাই না হতো, তবে কি আমার ইচ্ছা আর আমার কথার কাছে ভদ্রলোক তাঁর জীবনটাকে এমন করে ছেড়ে দিতে পারতেন ?

কী আশ্চর্য, যেদিন চিত্রালীর কাছে নরেশের নামে এরকম একটা উদাত্ত প্রশস্তির কথা বলে দিয়ে আর একটুও লজ্জাকুণ্ঠিত না হয়ে হাসতে পেরেছিল নীরজা, ঠিক সেদিনই বিকালের রোদ যখন একটু লাল হয়ে এসেছে, তখন বাড়ির বাইরের বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে অবিনাশবাবুর বাড়ির দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে নীরজা। দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে চিত্রালী। আশ্চর্য হন অবিনাশবাবু আর মনোরমা। এরকমভাবে পরের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে নীরজা, এটা যে চোখে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস হতো না। কী হলো, কিসের জন্যে, কোন্ দরকারে, অবিনাশবাবুর বাড়ির দিকে এরকম একটা অসহায়তার করুণ ছবির মতো তাকিয়ে আছে নীরজা ?

নীরজা যেন সাজ আর প্রসাধনের সব চমক একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে নিজেকে সাজিয়েছে। সবুজ শাড়ি, সত্যিই যে বৃষ্টিতে ধোওয়া শালবনের সরস সবুজের মায়া আজ নীরজার সুঠাম শরীরটাকে ঘিরে ধরেছে। আর একটু রাত হলে, আর, আগের কাল হলে মনে হতো, ওই সাজ একেবারে খাঁটি অভিসারিকার সাজ। তাই, ভাবতে অদ্ভুত লাগবেই তো ; সে নারী আজ এত সাজে কেন ? নীরজা কি সত্যিই কোথাও যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে ?

বাইরের ঘরে তেমনি একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে আছে নরেশ। নীরজার দিকে তাকিয়েও আছে নরেশ, কিন্তু নরেশের চোখে কোন বিস্ময় নেই, চমক নেই, শিহর নেই, চঞ্চলতাও নেই। কোন প্রশ্নও নেই নিশ্চয়। নইলে এত শান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকতে পারবে কেন নরেশের ওই দুই চোখ?

কিন্তু নীরজার এই সুন্দর করে সাজা চেহারাটা যেন ভীরু বহুরূপীর মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ পাল্টিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। কালো চোখ দুটো হঠাৎ একেবারে সাদা আর লাল ঠোঁট একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

চমকে উঠলেন অবিনাশবাবু, চমকে উঠলেন মনোরমা। নীরজা যেন একটা উতলা আতঙ্কের মতো ছুটে এসে অবিনাশবাবুর বাড়ির ফটকের দরজাটাকে ঠেলা দিয়ে খুলে দিল। ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে নীরজা—কাকাবাবু!

দার্শনিক অবিনাশবাবুর বুকের ভিতরটাই যেন চমকে ওঠে। আর কেঁদে ফেলে। নীরজার মতো মেয়ে যে প্রতিবেশী বৃদ্ধকে কাকাবাবু বলে ডাকতে পারে, একথা আগে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। এই ডাক যেন নীরজার বুকের ভিতরে ফুঁপিয়ে ওঠা একটা ভয়ের ডাক। কিন্তু কিসের ভয়?

অবিনাশবাবুর গলার স্বর করুণ হয়ে ছটফট করে—কোন ভয় নেই। আমরা আছি, কোন চিন্তা নেই। কী হয়েছে বলো?

নীরজা—আমি আর কত সহ্য করবো বলুন? এরকম একজন একরোখা অবাধ্য মানুষ, আমার সামান্য একটা অনুরোধের কথাকেও যে মানুষ একটুও গ্রাহ্য করে না, তার সঙ্গে আমি কি করে ঘর করি, বলুন!

মনোরমা চেঁচিয়ে ওঠেন—কে? কে? কার কথা বলছো? নরেশ?

নীরজা—তাছাড়া আর কার কথা বলছি, কাকিমা? আমি কোনদিনও স্বপ্নেও সন্দেহ করিনি কাকিমা, ভদ্রলোক এরকম একটা পাথরের মতো বধির হয়ে বসে থাকবেন, আমার কোন কথা শুনতেই পাবেন না।

মনোরমা—কথা শুনতে পাবে না, এর মানে কি?

নীরজা—যেন আমাকে চোখেও দেখতে পাচ্ছেন না, এমন করে তাকিয়ে আছেন।

মনোরমা—এর মানেই বা কি?

নীরজা—এর মানে আমাকে তুচ্ছ করা। আমার জীবনের কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা আর সাধ-অসাধকে একটুও গ্রাহ্য না করা। আমি যা চাই, ঠিক তার উল্টোটি হয়ে আর চুপ করে বসে থাকা।

মনোরমা—তুমি এখন বোধহয় কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য...।

—ছি ছি, কখ্খনো না, অসম্ভব, কোথাও বেড়াতে যেতে চাই না। দূর-সম্পর্কের আত্মীয় মাত্র, তার একটা মুখের কথা শুনেই আমি বেড়াতে বের হয়ে যাব কেন?

মনোরমা—এই যে কিছুদিন আগে নতুন ভদ্রলোক, যিনি তোমাদের...।

নীরজা—হ্যাঁ তিনি, তিনি বলেছিলেন, একবার দয়াগঞ্জে গিয়ে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

মনোরমা—নরেশ কী বলে?

—সে যদি একটা কথাও বলতো, কাকিমা—একবার রাগ করেও একটা আপত্তি করতো, তবে আমাকে এত ভয় পেতে হতো না। কিন্তু সে যে অদ্ভুত অবাধ্য একরোখা মানুষ, একটা কথাও বলে না।

কেঁদে ফেলে নীরজা: কালো চোখের দুই তারার সেই ঝিকঝিকে আলো যেন ভয় পেয়ে

নিবে গিয়েছে।

মনোরমা বলেন—বলবে বলবে, নিশ্চয় বলবে। চলো আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি। দেখি নরেশ কেমন করে তোমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারে।

নিকষিত হেম

বাবা, মা আর বউদির সঙ্গে রাজগীরে বেড়াতে গিয়েছিল প্রমিতা। রাজগীরে গিয়ে একদিন থাকা, তারপর আবার গয়ার বাড়িতে ফিবে আসা। এই তো সামান্য একটা ঘটনা। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটা প্রমিতার মনটাকে যে ভাবনায় ভরে দিয়েছে, তার ভার সামান্য নয়। প্রমিতার প্রাণটা যেন দুটো দাগ নিয়ে ফিরে এসেছে।

সাদা শাড়ির আঁচলেব উপর হঠাৎ একটু আবীরের গুঁড়ো ছিটকে এসে লাগলে যেমন দাগ হয়, একটা দাগ যেন সেই রকমের একটা রঙিন চিহ্ন। তুচ্ছ করে আর আঁচল-ঝাড়া দিয়ে সে চিহ্ন ঝরিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে না।

আর-একটা দাগ যেন নিতান্ত কর্কশ আর গা-জ্বালানো একটা আঁচড়ের চিহ্ন। একটা অভদ্র মতলবের লোভ সত্যিই প্রমিতার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। গায়ে যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে; ছটফট করে সরে গিয়েছিল প্রমিতা। সেকথা মনে পড়লে এখনও গা সিরসির করে।

দুই পরিবারে দেখা হয়েছিল বক্তিয়ারপুরে। প্রমিতা, প্রমিতার বাবা খগেনবাবু, মা তরুলতা আর বউদি মাধুরী ; এই দলটি চলে গেল রাজগীরে। আর, একটি পরিবার রাজগীর থেকে বেড়িয়ে ফিরে পাটনা চলে গেল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এক প্রৌঢ়া মহিলা, প্রমিতারই বয়সের এক তরুণী ; সেইসঙ্গে একটি যুবক, দেখতে খুবই সুন্দর।

প্ল্যাটফর্মের উপর কাছাকাছি দুটি জায়গায় দাঁড়িয়েছিল দুই পরিবার। তরুলতা ফিসফিস করে পুত্রবধূ মাধুরীর কানের কাছে কথা বলেন—বুঝতে পারছি, ওঁরা দু'জন হলেন মেয়েটির বাবা আর মা। কিন্তু ছেলেটি কে, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাধুরী বলেন—আমি কিন্তু বুঝতে পেবেছি।

তরুলতা—কী ?

মাধুরী—কেউ নয়।

তরুলতা—তার মানে ?

মাধুরী হাসে—তার মানে, এখনও কেউ নয়। কিন্তু শিগগিরই ওঁদের জামাই হবেন বোধহয় !

তরুলতা—কেমন করে বুঝলে ?

মাধুরী—মেয়েটির কথাবার্তার রকম-সকম আর কাণ্ড দেখেই বুঝতে পারছি।

যুবক ভদ্রলোকের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজেবাজে কত কথাই না অনর্গল বকে যাচ্ছে মেয়েটা। মেয়েটা দেখতে একটুও ভাল নয়। কিন্তু সাজের চেহারা দেখলে বোঝা যায়, সুন্দর দেখাবার জন্য কী চেষ্টাই না করেছে। গায়ের রঙটা বেশ কালো, কিন্তু সাদা মালাবার সিল্কের শাড়িটাকে এমনই কায়দা করে গায়ে জড়িয়েছে যে, ওই কালো চেহারাতেও যেন সাদা জ্যোৎস্নার আভা চিকমিক করে হাসছে। ছোট ছোট চোখ, কিন্তু কাজলের বড়-বড় টানা দিয়ে চোখের চাহনিটাকে কত বড় করে তুলেছে! খোঁপাতেও ফুল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—মৃণাল, চা খাবে নাকি ?

যুবক ভদ্রলোক বলে—না। উৎপলা বোধহয় খাবে।

মেয়েটি ভ্রূকুটি করে যুবক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলে—না, তুমি না খেলে আমিও খাব না।

প্রমিতার মা তরুলতা আবার পুত্রবধূ মাধুরীর কানের কাছে ফিসফিস করেন।—কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেমন করে এই ছেলে ওই মেয়ের বর হবে। মেয়েটাকে যে ছেলেটার সঙ্গে একটুও মানাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমাদের পমির সঙ্গেই এরকম ছেলেকে চমৎকার মানায়।

কথাটা শুনতে পেয়েছে প্রমিতা, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে চমকেও উঠেছে। কারণ, এতক্ষণ ধরে আনমনার মতো কি-যেন ভাবছিল প্রমিতা, আর উৎপলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মৃণালের মুখের দিকেও তাকিয়েছিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলছেন—তুমি আবার কবে ছুটি পাবে মৃণাল ?

মৃণাল বলে—যদি চিফ এঞ্জিনিয়ার এখন জার্মানি না যান তবে আমাকে এখন ধানবাদেই থাকতে হবে।

—তুমিই বোধহয় চিফ এঞ্জিনিয়ারের জায়গায় অফিসিয়েট করবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উৎপলা আবার মৃণালের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা-গলায় কথা বলে—তুমিও আবার বিদেশে পাড়ি দেবে না তো ?

মৃণাল হাসে—না।

উৎপলা—কিন্তু আবার ছুটি পাবে কবে ? পাটনাতে আবার আসবে কবে ?

মৃণাল—ঠিক বলতে পারছি না। তবে গয়াতে একবার আসতে হবে। দেখি...।

উৎপলা—দেখি আবার কি ? গয়া থেকে একবার পাটনা ঘুরে যেতে কতক্ষণ লাগবে ?

উৎপলার মাথাটা যেন দুর্বার এক আবদারের ঝোঁকে মৃণালের কাঁধের উপর হেলে পড়তে চাইছে। কিন্তু সামলে নিয়েছে উৎপলা। মাথাটাকে কাত করে, আর, একহাতে খোঁপার ফুল চেপে রেখে, মৃণালের মুখের দিকে যেন একটা লোভী পিপাসার বেহায়া দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে উৎপলার চোখ দুটো অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কাজলের টান দিয়ে বড় করে আঁকা দুটো ছোট-ছোট চোখ।

শুনতে পায় প্রমিতা, বেশ উৎফুল্ল স্বরে আর হেসে-হেসে উৎপলার সঙ্গে কথা বলছে মৃণাল—হ্যাঁ, চেষ্টা করলে ক'দিনের ছুটি নিয়ে একবার পাটনা ঘুরে যেতেও পারি, কিন্তু তুমি আবার রাজগীর-রাজগীর করবে না তো ?

উৎপলা—করলে ক্ষতি কি ? রাজগীরে আসতে তোমার কি ভাল লাগে না ?

মৃণাল—লাগে বইকি। কিন্তু প্রতি বছর একবার করে একই রাজগীরে বেড়াতে আসতে কেমন যেন লাগে, একটু একঘেয়ে লাগে। তোমাদের সঙ্গে রাজগীরে বেড়াতে আসা এবার নিয়ে মোট তিনবার হলো।

উৎপলা—তা তো হলোই, কিন্তু আমার একটুও একঘেয়ে মনে হয় না। ভাল লাগলে আবার একঘেয়ে মনে হবে কেন ?

প্রমিতার চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা অস্বস্তি ছটফট করে ওঠে। মুখ ঘুরিয়ে দূরের ঐ সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রমিতা। মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোকের জন্য বোধহয় একটা করুণার ভাব প্রমিতার মনের ভিতরে হঠাৎ আক্ষেপ করে উঠেছে। কী অদ্ভুত একটা বিপদেই না পড়েছেন ভদ্রলোক, একটা শাস্তিও বলা যায়। একঘেয়ে লাগছে, তবু বলতে হচ্ছে, ভাল লাগছে। বুঝতেই তো পারা গেল, অন্তত তিন বছর ধরে মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোকটি উৎপলা নামে ওই শক্ত ফন্দির মায়াজালে পড়ে বোকা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি মায়ার জাল ?

একগাদা ফুল খোঁপায় গুঁজে আর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নাকে-মুখে কথা বলতে পারে—একটা বেহায়াপনার জাল !

সন্দেহ হয়, ভদ্রলোক নিজেই বোকা, তাই এত সহজে উৎপলার মতো মেয়ের মায়াজালে ধরা পড়েছেন। ভদ্রলোক একবার মুখ ফিরিয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাবার চেষ্টাও করতে পারছেন না, উৎপলা যেন অনবরত কথা বলে বলে ভদ্রলোকের চোখদুটোকে শুধু ওর নিজেরই মুখের দিকে টেনে ধরে রেখেছে। যদি একবার এদিকে তাকাতে পারতেন ভদ্রলোক, তবে দেখেই চমকে উঠতেন যে, পৃথিবীতে এমন মুখও আছে, যার কাছে উৎপলার মুখটা একটা অন্ধকার মাত্র।

পাটনার ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মের গায়ে লেগেছে, ট্রেনের একটা কামরার দিকে ওরা চলে গেল। ইস, কী বিশ্রী রকমের নির্লজ্জ হয়ে মৃণালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে কামরার দিকে হেঁটে গেল উৎপলা। প্রমিতার চোখে যেন নতুন একটা সন্দেহ হেসে ফেলতে চাইছে। সত্যিই রুমাল তুলে একটা অস্বস্তির হাসিকে এইবার চাপা দিতে চেষ্টা করে প্রমিতা। মৃণালের সঙ্গে এই বেহায়া ধরনের গা-ঘেঁষা ভাবটা কি সত্যিই নিশ্চিন্ত মনের একটা খুশির উৎসাহ ? না, হারাই হারাই সদা ভয় হয় ; একটা উদ্বিগ্ন সতর্কতা ? হেসেই ফেলে প্রমিতা।

মাধুরী বউদি বলেন—তোমার আবার কি হলো ?

প্রমিতা—আমার আবার কি হবে ? কিছুই না।

সেই মুহূর্তে প্রমিতার মুখের এই হাসি হঠাৎ সাবধান হয়ে যায়। গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু লাল হয়ে গিয়েছে প্রমিতার সারা মুখটাই। চোখের দুটি কালো তারার দৃষ্টিও যেন কেমনতর হয়ে গিয়েছে।

ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মৃণাল নামে সেই ভদ্রলোক সোজা প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মৃণালের পাশে বসে কত কথাই না বলছে উৎপলা। কিন্তু মৃণাল তবু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আর উৎপলার দিকে তাকিয়ে কোন কথা শুনতে কিংবা বলতে পারছে না। ট্রেন ছাড়বার আগে মৃণাল যেন এই বক্তিয়ারপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক মায়াময়ী ক্ষণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

ট্রেন ছেড়েছে। উৎপলা ব্যস্ত হয়ে বলছে—আমার ঘড়িতে দশটা তেরো হয়েছে। তোমার ঘড়িতে কি বলছে ?

মৃণাল কিন্তু তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতে পারল না। প্রমিতারই মুখের দিকে তাকিয়ে মৃণালের চোখ দুটো যেন একটা মুগ্ধ বিস্ময়ে সুন্দর মুখটিকে শেষ-দেখা দেখে নিচ্ছে।

জোরে স্পিড নিল ট্রেনটা। কী আশ্চর্য, মৃণাল নামে অচেনা-অজানা এই ভদ্রলোকও অভিবাদনের ভঙ্গীতে হঠাৎ হাত তুলছেন। হতে পারে, খগেনবাবু আর তরুলতাকে লক্ষ করে অভিবাদনের একটা সঙ্কেত জানালেন মৃণাল নামে ওই ভদ্রলোক। কিন্তু প্রমিতার রুমাল-ধরা হাতটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। কী বিপদ, আর-একটু হলে প্রমিতার রুমাল-ধরা হাতটা বোধহয় পাল্টা সাড়া দিয়ে বিদায়-অভিবাদনের ছোট্ট একটি ভঙ্গী দুলিয়ে দিত।

রাজগীর যাবার ট্রেনটা ছাড়তেও আর বেশি দেরি করেনি। রাজগীরে পৌঁছতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। বিম্বিসারের ভাঙা-প্রাসাদের যত পুরনো পাথরের চারদিকে অনেক ঘুরে বেড়ানো হলো। রেস্ট হাউসে চায়ের টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারে প্রমিতা, না, মা আর বউদির কাছে চেয়ারে বসে চা খাওয়া সম্ভব নয়। সেই কথা, সেই পুরনো অভিযোগের কথাই শুরু করেছেন মা। আর, মাধু-বউদিও শতবার শোনা সেই কথাগুলিকেই চুপ করে শুনছেন।

তরুলতা বলেন—আমি তো কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, মাধু। আমরা চেষ্টা করে যে

পাত্রের খোঁজ পাই, তাকে ওর পছন্দ হবে না, আবার নিজেও যে ইচ্ছে করে কাউকে... ।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সরে যায় প্রমিতা ।

একটা সমস্যারই কথা বলেছেন প্রমিতার মা তরুলতা । বয়স হয়েছে, এম. এ. পড়ছে কিন্তু কী অদ্ভুত রকমের ভীতু স্বভাবের মেয়ে প্রমিতা ! বিয়ের সম্বন্ধ আসে, পাত্রের পরিচয়ও জানতে পারে প্রমিতা, কিন্তু প্রমিতার আপত্তির কারণ এই যে, ভয় করে । —না না বউদি, কখ্খনো না । একটা অচেনা-অজানা মানুষের সঙ্গে বিয়ে, আমার ভাবতেই ভয় করে ।

বউদি কতবার বলেছেন—তবে চেনা-জানা করে নিয়েই বলো ।

—ছিঃ, ঘেন্না করে । ওসব হবে না ।

বউদি—এদিকে হবে না, ওদিকেও হবে না, তাহলে কি করে হবে ?

কোন ভদ্রলোকের ছেলে যদি ইচ্ছে করে প্রমিতার কাছে চেনাজানা হতে চেষ্টা করে, তাহলেও কিছু হবে না । বউদি জানেন, ভাগলপুরের সুহাস প্রমিতার সঙ্গে একটু গল্প করবার জন্য কতবার এসেছে আর চেষ্টা করেছে । কিন্তু সুহাসের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেনি প্রমিতা ।

—না, আমার এসব এখন ভালই লাগে না বউদি ।

বউদিও বিরক্ত হয়ে বলেছেন—তবে দেখ, কখন ভাল লাগে আর কাকে ভাল লাগে ।

রাজগীরের মাঠের হাওয়া হু হু করে ছুটে এসে রেস্ট-হাউসের প্রমিতার শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দেয় । আঁচলটা যেন এক বিজয়িনীর পতাকা হয়ে উড়ছে । প্রমিতার চোখ দুটোও হাসছে । মৃণাল নামে সেই ভদ্রলোক এখন যদি হঠাৎ এখানে এসে পড়েন, আর উৎপলা যদি সঙ্গে না থাকে, তবে কী বলতেন ভদ্রলোক ? এই তো, কী আশ্চর্য, ভাবতেই পারিনি যে আপনার সঙ্গে আবার কখনো দেখা হবে ।

রাতের ট্রেন আবার বক্তিয়ারপুর হয়ে পাটনা ফিরে যাচ্ছে । বক্তিয়ারপুরের প্ল্যাটফর্মে এত লোকের ভিড়, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা শূন্যতা আছে মনে হয় । সে ভদ্রলোক এরই মধ্যে এখানে আবার ফিরে আসবেন কেমন করে ? অসম্ভব ।

কিন্তু ইনি আবার কে ? ছোট একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে এই কামরাতেই ঢোকবার জন্যে এদিকে এগিয়ে আসছেন । ওদিকের কত কামরা খালি পড়ে আছে, তবু এই কামরার দিকে কেন ?

কামরার ভিতরে ঢুকে প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবছেন ভদ্রলোক । তাকাবার কী ভঙ্গী ! যেন একটা হাবা ছেলেব চোখ জাদুঘরের একটা আশ্চর্যের জিনিসের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ।

কামরার এদিকে-ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আনমনার মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক । টিকিট চেকার কামরাতে উঠে ভদ্রলোকের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন—জেরা আগে বাড়িয়ে সাহেব ! তবু ভদ্রলোকের হুঁশ নেই ?

এ কী ? খুব হুঁশ আছে দেখছি । খুব বুদ্ধিও রাখে মনে হচ্ছে । প্রমিতারই পাশে সিটের উপর হাতের ব্যাগটাকে ঝুপ করে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোকও ঝুপ করে বসে পড়লেন । ব্যাগটাও যে একটা অভদ্র ভার হয়ে প্রমিতার শাড়ির আঁচলটাকে চেপে রেখেছে, এটুকুও ভদ্রলোকের চোখে পড়ছে না । ভদ্রলোকের ব্যাগটা আর শরীরটা, দুটোই যেন দুর্ভার ক্লান্তি হয়ে প্রমিতার গা ঘেঁষে সিটের উপর এলিয়ে পড়েছে ।

এক হাত দিয়ে আস্তে টেনে শাড়ির আঁচলটাকে সেই অভদ্র ভারের চাপ থেকে ছাড়িয়ে নেয় প্রমিতা । ব্যাগটার ছোঁয়া থেকে অনেকখানি তফাত রেখে সরে বসে । এভাবে তফাত হয়ে বসে থাকতেও অস্বস্তি হয় ; ভয় হয়, যে-কোন মুহূর্তে আর যে-কোন ছুতো করে

লোকটার এই এলিয়ে-পড়া চেহারাটা প্রমিতার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়বে।

ট্রেন ছাড়লো, কামরাটা দুলে উঠলো। ঠিক তখনই উঠে দাঁড়ালেন অদ্ভুত মতলবের এই ভদ্রলোক। কী উপদ্রব! লোকটা অন্ধ না হয়েও অন্ধের মতো এ কী কাণ্ড করছে! প্রমিতার ঘাড়ের কাছে মাথাটা নিয়ে এসে জানালার বাইরে ঝুঁকি দিলেন ভদ্রলোক। প্রমিতা ভ্রূকুটি করে নিজেরই মাথাটাকে কাত করে একপাশে সরিয়ে রাখে।

ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—জল, এই জল! এই পানি!

আহা! কী চতুর বোকামি। ট্রেন ছাড়লো, ঠিক সেই সময়ে বাইরের পানিপাঁড়ের কাছে জল চাওয়া। পানিপাঁড়েটা যদি এখন ছুটেও আসে, তবু চলন্ত ট্রেনের এই কামরার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

ভদ্রলোকের কামিজের বুক-পকেটে বোধহয় কোন ভারী জিনিস আছে, বোধহয় রুমালে বাঁধা টাকা আধুলি সিকি আর পয়সা। বুক-পকেটটা ঝুলে পড়ে প্রমিতার কাত মাথার খোঁপাটাকে ছুঁয়ে রয়েছে। প্রমিতা মাথা নাড়লেও বুক-পকেট সরে যায় না। নাঃ, উঠে গিয়ে আরও দূরে গিয়ে সরে না বসলে এই উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কিন্তু আর কত দূরেই বা সরা যায়? এপাশে বউদি, ওপাশে কোন জায়গাই নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, আবার নিজেরই জায়গায় বসলেন ভদ্রলোক। কিন্তু কে জানে কেন, হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়ালেন। চট্ করে পা সরিয়ে নেয় প্রমিতা। লোকটা প্রমিতার পায়ে পা ঠেকিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

এইবার খগেনবাবু বলেন—ও মশাই, আপনি এরকম করছেন কেন? একটু স্থির হয়ে বসুন।

খগেনবাবুর কথায় ফল হলো। ভদ্রলোক নিজেরই জায়গায় চুপ করে বসে রইলেন। চশমাটা মোছবার জন্যে বুক-পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা টাকা, সিকি আর আধুলি পকেট থেকে এদিকে-সেদিকে গড়িয়ে গেল।

চশমাটা তিন মিনিট ধরে মুছলেন। তারপর ঘাড় ঝুঁকিয়ে আর আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে টাকা সিকি আর আধুলিগুলোকে তুললেন। একটা টাকা প্রমিতার পায়ের জুতোর গা ঘেঁষে পড়ে আছে। সে টাকাটাকে তুলে নেবার জন্য কোন চাড় দেখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারা যায়, ইচ্ছে করেই এই টাকাটাকে দেখতে ভুলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। তার মানে, এই আশা করছেন যে, প্রমিতা নিজেই টাকাটাকে হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের হাতের কাছে এগিয়ে দেবে—এই যে, আপনার টাকা।

প্রমিতা খগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ইশারা করে আর পায়ের কাছের টাকাটাকে দেখিয়ে দেয়।

খগেনবাবু ডাকেন—ও মশাই, ওই যে ওখানে, আপনার একটা টাকা।

ভুল, খুব ভুল করেছে প্রমিতা। এমন উপদ্রব সহ্য করতে হবে কল্পনা করতে পারলে, নিজেরই হাতে টাকাটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিত। তা-ও ভাল ছিল। কিন্তু, এ যে অসহ্য।

টাকাটাকে তোলবার জন্যে ভদ্রলোক হাত বাড়াতে গিয়ে এমন ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়লেন যে, চশমাটা চোখ থেকে ঝুপ করে প্রমিতার কোলের উপর পড়ে গেল। প্রমিতার হাঁটুতেও মাথাটাকে একবার ঠুকে নিলেন ভদ্রলোক, তারপর নিজেই হাত বাড়িয়ে প্রমিতার কোলের উপর থেকে চশমাটাকে তুলে নিলেন।

মাধু-বউদি এইবার আস্তে আস্তে ফিসফিস করেন—ভদ্রলোক কেমন যেন, চালচলনের কোন ইয়ে নেই।

খগেনবাবুর কানের কাছে তরুলতাও খুব আস্তে আস্তে চাপা-স্বরে কথা বলেন—ছেলেটি তো দেখতে ভালই, বয়সও বেশ অল্প বলেই মনে হচ্ছে। কে জানে, এখনও হয়তো বিয়ে হয়নি।

খগেনবাবু হাসেন—থাম থাম, সব সময় এক কথা নিয়ে এত চিন্তে করতে নেই।

তরুলতা—বেশ তো, মেয়েকে তবে আইন-টাইন পড়িয়ে একটা উকিল করে দাও—আমারও চিন্তের লেঠা চুকে যাক।

অনেকক্ষণ পরে, ভদ্রলোকের চালচলনের আরও একটা কাণ্ড দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয় প্রমিতা। যাক্, ওভাবে লোকটা দু'চোখ বন্ধ করে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকলেই বাঁচা যায়।

ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক। কিন্তু কোন রোগ আছে বলে মনে হচ্ছে। বোধহয় চোখের রোগ। হঠাৎ যখন এক-একবার চোখ মেলে কামরার আলোটার দিকে তাকাচ্ছেন, তখন বেশ স্পষ্টই দেখা যায়, চোখ দুটো লালচে হয়ে ছলছল করছে।

রোগী মনে হলেও ভদ্রলোককে এখন বেশ ভালমানুষটির মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু..।

প্রমিতার মনের এই কিন্তুময় সন্দেহটাই সত্য হলো। ট্রেন থেকে নামবার সময় দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিল প্রমিতা। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে সেই ভদ্রলোক যেন একেবারে হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। প্রমিতার কাঁধটাকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে আর পাশ কাটিয়ে নেমে পড়লেন। তারপরেই স্টেশনের লোকের ভিড় আর শোরগোলের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক তো নয়, একটা যাচ্ছেতাই অভদ্রলোক। প্রমিতা লোকটাকে একটা ধিক্কার দেবারও সুযোগ পেল না, এমনই হন্তদন্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পলাতক হয়ে গেল লোকটা।

২

গয়ার বাড়িতে একটানা সাতটা-আটটা মাস থাকলেই যেন হাঁপ ধরে যায়। তাই, শুধু প্রমিতা নয়, খগেনবাবুও মনে করেন, একবার বাইরে বেড়িয়ে আসা ভাল। গত বছরে সারনাথে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল, এবছর রাজগীর। মাঝে মাঝে গিরিডির বাড়িতেও একটা-দুটো মাস কাটিয়ে দিতে ভাল লাগে। তারপর আবার গয়া।

সেই পুরনো গয়া। প্রমিতার অভিযোগ সবচেয়ে বেশি মুখর হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই কোর্ট কামাই করে এইবার বাড়ির সবাইকে রাজগীর ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন খগেনবাবু। ছেলে অসিত আর্মিতে আছে, অসিত মাধুরীকে চিঠি দিয়ে ঠাট্টাও করেছে, এখন আরও কিছুদিন ইচ্ছেমত রাজগীর করে নাও ; আর বেশি সুযোগ পাবে না, আমি হযতো এই বছরেই কোয়ার্টার্রি পেয়ে যাব।

মাধু-বউদিও ঠাট্টা করেন—তার আগে তোমার একটা কোয়ার্টার্রি হয়েছে দেখতে পেলেই ভাল হতো।

প্রমিতা—আর হয়েছে কোয়ার্টার্রি ! এই গযাতেই গয়াপ্রাপ্তি হবে।

মাধু-বউদি—এত হতাশ হয়ে পড়লে কেন ? কোন কারণ তো নেই ?

প্রমিতা—না, গয়া আর ভাল লাগে না বউদি। দেখবার কি আছে এখানে ? শুকনো ফল্গুর বালি আর কতগুলো মন্দির, এই তো ! আর কত দেখবো ? একশোবার দেখা হয়ে গিয়েছে।

গয়া যার কাছে একটা একঘেয়ে জীবনের পুরনো ভার বলে মনে হয়েছিল, সেই প্রমিতার মনে যেন গয়ার জন্য একটা নতুন মায়া দেখা দিয়েছে। বাড়ির বাইরে বেড়াতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল যে মেয়ে, সে মেয়েকেই এখন দেখা যায়, কখনও চকে, কখনও স্টেশনে, আর কখনও বা ফল্গুর ধারে ধারে অনেক দূরে বেড়িয়ে আসে। ড্রাইভার নালিশ

করে—দিদিমণি পেট্রলের খরচ ডবল করে দিয়েছেন।

ছোটকাকা বলেন—কি হলো তোর, প্রমিতা ? গয়াতে আবার এত দেখবার কি পেলি ?

ছোটকাকার কথার জবাব না দিলেও নিজের মনের কাছে জবাবটাকে লুকোতে পারে না প্রমিতা। জবাবটা যে প্রমিতার মনের একটা আশাব কথা। সে আশা সত্যিই লাল আবীরের গুঁড়োর ছোট্ট একটি দাগের মতো হাসছে। সেই ভদ্রলোক, যার নাম মৃণাল, উৎপলাকে যার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই খারাপ লেগেছিল প্রমিতার, সে ভদ্রলোকের একবার গয়াতে আসবার কথা আছে।

কে জানে এসেছেন কি না ? সত্যিই এসেছেন আর এরই মধ্যে চলে যাননি তো ? এলেও সত্যিই কি হঠাৎ একবার দেখা হয়ে যেতে পারে না ? পৃথিবীতে কত কিছুই তো হঠাৎ হয়ে যায়। মৃণালের সঙ্গে একদিন গয়ার পথে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াই বা অসম্ভব হবে কেন ?

দেখতে সত্যিই বেশ ভয় করেছিল প্রমিতার, মৃণালেব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আর হাত নেড়ে কী বিশ্রীভাবে কথা বলছিল উৎপলা ! যেন মাকড়সার মতো জাল বুনে বুনে বেচারা মৃণালকে বাঁধতে চাইছে ছোট-ছোট চোখের বেহায়া খুশি। কিন্তু মৃণাল বাঁধা পড়েছে মনে হয় না। তা না হলে ট্রেন ছাড়বার সময় প্রমিতার দিকে হাত তুলে ওরকম সুন্দর একটা বিদাযভঙ্গী জানাতে পাবতো না।

মাধু-বউদি একদিন প্রমিতার কাছে এসে চমকে চমকে হাসতে থাকেন।—কী আশ্চর্য, প্রমিতা, সত্যিই আশ্চর্য।

—কী হলো ?

—সেরেস্তাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার ভেতরে উঁকি দিয়ে চলে এস।

—কেন ?

—সেই ভদ্রলোক। সেই, কী যেন নামটা, মৃণালবাবু।

প্রমিতার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।—তুমি একটা মিথ্যে সন্দেহ করে আমাকে একটা বাজে ঠাট্টা করছো বউদি, কোন মানে হয় না।

বউদি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন—কিসেব সন্দেহ ? ঠাট্টাই বা করবো কেন ? কি বলছো তুমি ?

—মৃণালবাবু এখানে আসবেন কেন ?

—নিশ্চয়ই আদালতে কোন কাজ আছে, তাই বাবাব কাছে এসেছেন।

—কিন্তু . ।

—বলো, চুপ করে রইলে কেন ?

—আমি কিছুই বলতে পারবো না।

—তুমি একবার দেখা করবে ?

—ছিঃ।

—তবে ?

—ছোটকাকাকে একবার বলো, বউদি।

মাধু-বউদি হাঁপ ছেড়ে হাসেন—তাই বলো ! এরকম স্পষ্ট করে বললেই তো বুঝতে পারি।

মৃণালকে বৈঠকখানার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করলেন ছোটকাকা। মাধু-বউদি মৃণালের জন্য চা পাঠিয়ে দিলেন।

মৃণালের সঙ্গে অনেক গল্প করলেন ছোটকাকা। ছোটকাকার হাসির সঙ্গে মৃণালের গলার হাসির শব্দটাও কত স্বচ্ছন্দে বাজছে, এই ঘরের ভিতরে বসে শুনতে পাচ্ছেন মাধু-বউদি, ও

ঘরের ভিতরে বসে প্রমিতা।

প্রমিতার মা তরুলতাও ব্যস্ত হয়েছেন ; সেরেস্তা থেকে খগেনবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে এসে বললেন—ঠাকুরপোকে একবার ভিতরে ডেকে নিয়ে এসে বলে দাও...।

—কি বলবো ?

—ছেলেটির রাশি আর গণ যেন জেনে নেয়।

—ছেলেটির রাশি গণ জানবার সময় যখন হবে, তখন জানাই যাবে।

মৃণাল চলে যাবার পর ছোটকাকা যখন বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে এলেন, তখন সবার আগে মাধু-বউদি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো ছোটকাকা ?

—অনেক কথা হলো। চমৎকার ছেলে।

—আবার আসতে বলেছেন তো ?

—বলেছি বইকি।

—কি বললেন মৃণালবাবু ?

—সে তো বেশ খুশি হয়েই বললো, নিশ্চয় আসবে।

—কিন্তু পাটনাতেও তো যাবেন ?—মাধু-বউদি কেমন যেন অপ্রস্তুতভাবে কথাটা বলে ফেললেন।

ছোটকাকা বলেন—না, এখন পাটনা যাবার কোন কথা নেই।

—কেমন করে বুঝলেন ?

—নিজেই বললে, আদালতের কাজ শেষ হলে সোজা ধানবাদে ফিরে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করিনি, নিজেই হঠাৎ বললে, পাটনাতে কোনদিন যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ। পাটনাকে একটুও ভাল লাগে না। পাটনাতে গেলে মিছিমিছি নানা ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়। পাটনাতে যেতে ভয় করে।

মাধু-বউদির চোখ বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে আরও বড় হয়ে যায়।—এত কথা নিজেই বলেছেন ভদ্রলোক ?

—হ্যাঁ, আমি কিন্তু এসব কথার বিশেষ কোন মানে বুঝতে পারিনি।

—আপনি না বুঝুন, প্রমিতা বুঝতে পারবে।

—সে কি ! যাক্, ভালই তো, এতদিনে প্রমিতার কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়েছে তাহলে ?

—মনে হচ্ছে।

—তাহলে একটা কাজ করতে হয়। মৃণাল এলে প্রমিতা নিজেই যেন চা নিয়ে যায়।

গয়ার বাড়ির আশাটাকে আর খুব বেশিদিন উদ্বিগ্ন করে রাখেনি মৃণাল। আদালতের কাজ শেষ হয়েছে, এইবার ধানবাদে ফিরে যেতে হবে। এক সন্ধ্যায় মৃণাল এসে এই বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়ালো।

বৈঠকখানার ভেতরে বসে ছোটকাকার সঙ্গে গল্প করে মৃণাল। এইবার এবাড়ির দিক থেকে শুধু একটি অভ্যর্থনা এগিয়ে গিয়ে মৃণালকে চা দিয়ে আসবে। মৃণাল যদি প্রমিতার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে প্রমিতা। মাধু-বউদি বলে দিয়েছেন—বোবার মত শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। অন্তত দু'-একটা কথা বলবে।

সবই ভেবে রাখা আর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। নিজেরই হাতে চা তৈরি করলো প্রমিতা। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ যেন চমকে ওঠে প্রমিতা—পারবো না বউদি।

—কি পারবে না ?

—আমি ওঘরে চা নিয়ে যেতে পারবো না।

—কেন ?

—কেমন ভয়-ভয় করছে।

—তোমার মাথা আর মুণ্ডু!

—না বউদি, আজ থাক; না হয় অন্য কোনদিন হবে, আজ পারবো না।

কি আর করা যাবে! অগত্যা চাকর রামধারীকেই আদেশ করেন মাধু-বউদি—ওঘরে চা পৌঁছে দিয়ে এস রামধারী।

৩

মৃণাল যেদিন ধানবাদ চলে গেল, সেদিন ছোটকাকা স্টেশনে গিয়ে মৃণালের সঙ্গে দেখা কবেছিলেন। মৃণাল বলেছে, আমি ঠিক তিন মাস পরে আবার গয়াতে আসবো।

—অফিসের কাজে?

—না, ছুটি নিযেই আসবো। এক মাসেব ছুটি না পাই, অন্তত পনেরো দিনেব পাওয়া যাবে।

—শুনে খুবই খুশি হলাম।

শুনে আশ্বস্ত হয়েছে গয়ার বাড়ি। আবার আসবে মৃণাল। এবাব অফিসের কোন কাজের জন্যে নয়, এক মাস কিংবা পনেরো দিনেব ছুটিকে আনন্দে হাসিয়ে রাখবাব জন্য এই গযাতেই আসবে। বুঝতে আর অসুবিধে কোথায়, মৃণালের আশা যে এই গয়াবই কাছ থেকে একটি পবম উপহাব চাইছে।

কিন্তু প্রমিতা যদি আবাব এবকম মাথামুণ্ডুহীন লজ্জাব জন্য অভদ্র হয়ে যায়, মৃণালেব কাছে গিয়ে একটা কথা বলতেও না চায়, তবে কি হবে?

তরুলতা বাগ করে বলেছেন—তাহলে আইন পডবেন মেয়ে। আব কি কববেন?

মাধুবী হাসে—এত রাগ করবেন না। প্রমিতা বলেছে, এবাব আব কোন গোলমাল হবে না।

তরুলতা—দেখ তাহলে? আমি অবিশ্যি এ মেযেব মতিগতিকে একটুও বিশ্বাস করি না?

কিন্তু বিশ্বাস না কববাবই বা কি কাবণ থাকতে পারে? মাধু-বউদি প্রমিতার একটা আপত্তির কথা শুনেই বুঝতে পারলেন যে প্রমিতাকে অবিশ্বাস করবার কোন মানে হয না।

খগেনবাবু বলেছেন—চল, অন্তত দশটা দিন গিরিডির বাড়িতে কাটিয়ে আসি।

বাড়ির সবাই রাজি হয়েছে। রাজি হতে চায না শুধু প্রমিতা। মাধু-বউদিকে বেশ স্পষ্ট করে একটা কথাও জিজ্ঞাসা কবে ফেলেছে প্রমিতা—এ সময়ে হঠাৎ আবাব গিরিডি কেন?

মাধু-বউদি হাসেন—কোন ভয় নেই। যথাসময়ে ফিরে আসা যাবে।

সত্যি, গিরিডি যাবার দিনে খুবই গম্ভীর হয়ে যায় প্রমিতা। বউদির কাছ থেকে এত স্পষ্ট আশ্বাসের কথা শুনতে পেয়েও যেন একটা সন্দেহ প্রমিতাকে নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছে না। যথাসময়ে গযাতে ফিরে আসতে পারা যাবে তো।

গয়া ছেড়ে গিবিডি যাবাব দিনেও কিন্তু প্রমিতা তার মনের এই সন্দেহটাকে ঠিক চিনতে পারেনি। কিন্তু গিরিডিতে এসেই একদিন একটি শান্ত আনমনা ভাবনার মধ্যে সন্দেহটাকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে প্রমিতা। ছিঃ, এ কি হলো?

বক্তিয়াবপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একটি ছবি হঠাৎ চোখের উপর ভেসে উঠেছে। উৎপলার ছোট-ছোট দুটো চোখে বড় করে কাজল বোলানো; কিন্তু সেজন্যে বেচাবাকে ঠাট্টা করবে কেন পৃথিবীর চোখ? কি দোষ করেছে উৎপলা? যাকে ভাল লেগেছে, তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তারই মুখের দিকে বার বার তাকাচ্ছে। বেচারা যে প্রাণ দিয়ে আর আত্মা দিয়ে ওর জীবনের পছন্দের মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে রাখতে চাইছে।

কে জানে এখন কি করছে পাটনার উৎপলা ? কে জানে কতবার স্টেশনে এসেছে আর ট্রেনের কামরার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে চোখ, হেলে পড়েছে মাথাটা, ঝরে পড়ে গিয়েছে খোঁপার ফুল। মৃণাল যে আর কোন ছুটিতেই পাটনা যাবে না সেটা কি এখনও বুঝতে পারেনি উৎপলা ?

বুঝতে পারলেই বা কি করবে উৎপলা ? হয়তো একদিন বক্তিয়ারপুরে এসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই তো সেই প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ওর খুশি ভাগ্যটাকে ভয়ানক এক অভিশাপ ছুঁয়ে দিয়েছিল।

মন্দ হয় না, যদি গয়া ফিরতে দুটো মাস দেরি হয়ে যায়, আর মৃণালও গয়াতে এসে দেখতে পায় যে, খগেনবাবুর মেয়ে সেখানে নেই। আরও ভাল হয়, যদি পাটনার উৎপলা হঠাৎ সব জানতে পেরে সোজা গয়াতে চলে আসে। তাহলে গয়ার রাস্তায় উৎপলা আর মৃণালের হঠাৎ মুখোমুখি দেখা একদিন হয়েই যাবে। তারপর ওদের ভাগ্য জানে, কি হবে আর কি না হবে ?

নিজেরও ভাগ্যটার রকম দেখে বেশ আশ্চর্য হতে হয়। সবই যেন অকারণে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। শেষে একটা চাকরি-টাকরিই হয়তো ভাগ্যের সব ঝঞ্ঝাটের মীমাংসা করে দেবে। তাই ভাল, আর প্রাণটাকে বেহায়া করে নিয়ে, একটা চায়ের পেয়ালা হয়ে কারও কাছে এগিয়ে যাবার দরকার নেই।

গিরিডির দিনগুলি মন্দ কাটে না। সারা দিন বাড়িতেই বসে থাকা, আর বিকেল হলে একটু বেড়িয়ে আসা। শুধু সড়ক ধরে সামান্য কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে উশ্রী নদীর কিনারাতে একটা কালো পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকা। বিকেলের রঙিন রোদ পাখায় মেখে বকের দল উড়ে যাচ্ছে ; চুপ করে কিছুক্ষণ দেখা।

এখন মনের সন্দেহটাও যেন সব জোর হারিয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। কি আর করা যাবে ? মৃণাল যদি পাটনাকে কোনমতেই আপন করে নিতে রাজি না হয়, আর গয়ার উকিল খগেনবাবুর বাড়িতেই বার বার এসে এক পেয়ালা চায়ের অভ্যর্থনা আশা করে, তবে তাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। আর খুঁতখুঁত করবার কোন মানে হয় না।

চমকে ওঠে প্রমিতা, কার পায়ের শব্দ যেন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে একেবারে প্রমিতার পাথরের পিছনে একটা ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ে, ভয়ানক একটা অসম্ভবই সম্ভব হয়ে প্রমিতার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। ঘেন্নায় গা সিরসির করে প্রমিতার, রাগে চোখ জ্বলে ওঠে। আর নিজের ভাগ্যটাকেও ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে, বেশ হয়েছে, গয়া ছেড়ে চলে আসবার ভুলের এই রকমই শাস্তি হওয়া উচিত ! উশ্রী নদীর কিনারায় এমন নিরিবিলিতে, এই কালো পাথরটার উপরে কিছুক্ষণ বসে থাকবার শান্তিও আর ভাগ্যে সইল না।

সেই ভদ্রলোক, সেই বিশ্রী মতলবের লোকটা, বক্তিয়ারপুর থেকে গয়ায় ফেরবার পথে ট্রেনের কামরাতে যে লোকটা প্রমিতার শাড়ির আঁচল চেপে দিয়ে, গা ছুঁয়ে দিয়ে, পা মাড়াবার চেষ্টা করে আর কাঁধে ঠেলা দিয়ে, একটা নীচ লোভের খুশি হাসিল করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। চরম অভদ্রতার সেই ভদ্রলোকের ছায়া এখানেও প্রমিতার এই নিরিবিলি শান্তির উপরে আঁচড় দাগতে চলে এসেছে। শুনলে মাধু-বউদি যে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এমন অঘটনও সম্ভব হয় ?

প্রমিতার ঘৃণা আর রাগের চোখ দুটো শুধু চকিতে একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই যেন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী অদ্ভুত রকমের দুটো চোখ নিয়ে প্রতিমাকে দেখছেন ভদ্রলোক। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই। যেন প্রমিতার চেহারাটাকে গিলে খাবার একটা লোভ অচঞ্চল হয়ে চক্‌চক্ করছে।

তাড়াতাড়ি চলে যায় প্রমিতা। ভদ্রলোক শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ওই ভয়ানক ছায়ার ভয়ে ওদিকে বেড়াতে যাবার আর উশ্রীর কিনারাতে ওই পাথরের উপরে বসবার আশা ছেড়েই দিতে হলো। বাড়ির সামনেই সড়কের উপর পায়চারি করে বিকেলবেলার বেড়াবার সাধ মিটিয়ে নেয় প্রমিতা। কিন্তু ভেবে একটু আশ্চর্য না হয়েও পারে না, সে ভদ্রলোক যে সত্যিই এই সড়কে কোনদিন দেখা দিল না। সেই নির্লজ্জ মতলব তো অনায়াসে এই রাস্তাতেও এসে প্রমিতার বেড়ানো বন্ধ করে দিতে পারে। মনে হয় লোকটা এখন গিরিডিতে নেই।

কিন্তু আর সাহসও হয় না, উশ্রীর কিনারার নিরিবিলিতে কালো পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকতে হলে আর একা-একা না যাওয়াই ভাল।

মাধু-বউদি বলেন—তোমাকে আর ওখানে একা-একা যেতে হবে না। আজ আমরাই যাব। আমাদের সঙ্গে চল। দেখে আসি, সত্যিই এই লোকটা সেই লোক কিনা।

ঠিকই, বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন খগেনবাবু, তরুলতা আর মাধু-বউদি, সেই ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে পাথরটার উপর বসে আছেন। খগেনবাবু বলেন—তাই তো, কি আশ্চর্য, সেই ছেলেটিই যে বসে রয়েছে।

মাধু-বউদি বলেন—একবার জিজ্ঞাসা কবে দেখুন না, কেন এখানে এসে বসে রযেছে।

—ওহে ইয়ংম্যান, শুনছো ?

খগেনবাবুর গম্ভীর গলার ডাক শুনে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান আর নমস্কার করেন।

খগেনবাবু—আমাদের চিনতে পেরেছো নিশ্চয় ?

—আজ্ঞে না।

—সত্যি কথা বলছো ?

—মিথ্যে কথা বলবো কেন ?

—বক্তিয়ারপুর থেকে গয়া যেতে ট্রেনেব কামরাতে আমাদের একদিন দেখতে পাওনি ?

—একদিন ওই ট্রেনে যেতে হযেছিল ঠিকই কিন্তু আপনাদের কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—তাহলে তো বলতে হয়, তোমার বিস্মৃতির রোগ আছে।

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন—আজ্ঞে না।

—তুমি সেদিন খুবই অশোভন রকমের কাণ্ড করেছিলে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে আর চুপ করে কি-যেন ভাবলেন। তারপরেই খুব শান্ত স্বরে আস্তে-আস্তে কথা বলেন—হতে পারে।

খগেনবাবু বেশ ক্ষুব্ধভাবে বলেন—কেন হতে পারে ? কারণটা কি ?

—একটা টেলিগ্রাম পেয়ে সেদিন খুবই...।

—তার মানে ?

—টেলিগ্রাম পেলাম, স্ত্রী হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

শুধু খগেনবাবু নয়, তরুলতা আর মাধু-বউদি, আর ওপাশে প্রমিতাও বোধহয় চমকে ওঠে।

খগেনবাবু—তোমার স্ত্রী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কতদিন আগে বিয়ে হয়েছিল তোমাদের ?

—এই তো কয়েক মাস হলো। বিয়ের দু'মাস পরেই শান্তি মরে গেল।

তরুলতা—শান্তি মানে ?

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর নাম শান্তি। সে এই গিরিডিরই মেয়ে।

তরুলতা—কি হয়েছিল শান্তির ?

—বলতে গেলে কিছুই হয়নি। সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল। তাই এরাও আমাকে কোন খবর জানায়নি। আমি তখন নালন্দাতে। সকালবেলা কাগজ কলম নিয়ে শান্তিকেই চিঠি লিখছি ; হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, শান্তি নেই।

খগেনবাবু—নালন্দা থেকে সোজা গিরিডিতেই এসেছিলে নিশ্চয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এসেও কিন্তু শান্তিকে দেখতে পাইনি। পৌঁছতে দেরি হয়েছিল। এসে দেখি ওরা চিতে ধুয়ে-টুয়ে সব শূন্য করে রেখে দিয়েছে।

খগেনবাবু—থাক, আর বেশি বলো না, শুনতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

তরুলতা—তোমাদের বাড়ি এখানেই ?

—আজ্ঞে না। কলকাতায়। আমি কলেজে ইতিহাস পড়াই।

খগেনবাবু—তোমার নাম ?

—মনীশ রায়।

খগেনবাবু—এবার বুড়োমানুষের একটা অনুরোধের কথা শোন মনীশ।

—বলুন।

—চেষ্টা করে মনটাকে শান্ত করো। কি আর করবে বলো ? দুঃখ ভুলে যেতে পারলেই ভাল।

মনীশের মুখের করুণ হাসিটাও যেন প্রসন্ন হয়ে উঠতে চেষ্টা করে—কথাটা ঠিকই বলেছেন। কাল সন্ধ্যাতেই কলকাতা রওনা হব। কাজেই আজ শেষবারের মতো এখানে...।

চমকে ওঠে প্রমিতার চোখের তারা। মাধু-বউদিও যেন চোখ দু'টি বড় করে বুঝতে চেষ্টা করছেন, কি বলতে চাইছে মনীশ।

মনীশ বলে—শান্তির একটা অভ্যেস ছিল ; প্রায়ই এখানে এসে এই পাথরের উপর বসে বিকেলের উশ্রীর শোভা দেখতো। আমিও এখানে এসেই বসতাম। কিন্তু আজ দেখুন, সেই উশ্রী আছে, আমিও আছি—শুধু শান্তি নেই।

তরুলতার চোখ ছলছল করে—আচ্ছা এবার আমরা চলি।

খগেনবাবু—আচ্ছা তুমি বসো মনীশ। আমরা চলি। কিছু মনে করো না, মিছামিছি তোমাকে একটু বিরক্ত করে গেলাম।

মাধু-বউদি হঠাৎ উদ্বিগ্নভাবে প্রমিতার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করেন—এ কি ? কি হলো ? তুমি এরকম করছো কেন প্রমিতা ?

রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রমিতা। এখন যে চলে যেতে হবে, চলে যাবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রমিতা যেন কিছুই দেখতে বুঝতে আর শুনতে পারছে না। বোধহয় সব হিসেব ভুল হয়ে গিয়েছে, কিংবা হিসেবের সব ভুল ধরা পড়ে গিয়েছে।

—কথা বলো, প্রমিতা ? মাধু-বউদি আবার ফিসফিস করেন।

কি বলবে আর কেমন করে বলবে প্রমিতা ? গিরিডির মেয়ে শান্তি এসে যেখানে বসে থাকতো, সেখানে ভুল করে গয়ার মেয়ে এসে বসে পড়েছিল, দেখতে পেয়ে কে-জানে কী ভেবেছিলেন ভদ্রলোক।

প্রমিতা বলে—ভদ্রলোক কি এখনও এখানে একা-একা বসে থাকবেন ?

মাধু-বউদি—হ্যাঁ।

প্রমিতা—এটা ভাল দেখায় না বউদি।

মাধু-বউদি আশ্চর্য হয়ে প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চায় প্রমিতা? মনীশ নামে এই ভদ্রলোককে একটা শূন্যতার মায়ার কাছে একা রেখে চলে গেলে কি অভদ্রতা হবে?

মাধু-বউদি বলেন—যা বলবার স্পষ্ট করে বলেই ফেল, প্রমিতা।

প্রমিতা—ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে চল না কেন?

মাধু-বউদি—কেন? কোথায় যাবেন ভদ্রলোক?

প্রমিতা—আমাদের বাড়িতে, চা খাবেন।

চমকে ওঠেন মাধু-বউদি—তারপর কি হবে? নিজেই চা নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে?

—পাববো।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয় পারবো। এবার দেখে নিও, কোন ভুল হবে না।

নায়িকা মুগ্ধা

দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে কুন্তলা, মানুষ এভাবে একটা অসম্ভবের আশায় এত ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে! ভদ্রলোকের নাম-ধাম গোত্রের কোন পরিচয় জানে না কুন্তলা। ভদ্রলোকও কুন্তলার নাম-ধাম-গোত্রের কী পরিচয়—আর কতটুকু পরিচয় জানতে পেরেছে কে জানে? মনে হয় কিছুই জানতে পারেনি। জানবে কেমন করে? ভদ্রলোক শুধু জানে যে, এই অফিসে কাজ করে কুন্তলা। কুন্তলা নামটাকেও জানে বলে মনে হয় না। জানলে এতদিনে কি কুন্তলার নামে আর এই অফিসের ঠিকানাতে একটা চিঠি লিখে ফেলতেন না এই ভদ্রলোক?

মান-সম্ভ্রমের কোন বোধ, কিংবা কোন লজ্জার বোধ এই ভদ্রলোকের আছে কিনা সন্দেহ। পাঁচটা বাজতেই অফিসের যখন ছুটি হয়, তখন অফিসের বাইরে এসেই দেখতে পায় কুন্তলা, বারান্দার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছেন এই ভদ্রলোক। সাজে-পোশাকে বেশ পরিপাটি যত্ন আছে, দেখতেও বেশ ভাল। বয়সই বা কত হবে? ত্রিশের বেশি হতেই পারে না। কে জানে কোথায় কী কাজ করেন ভদ্রলোক। ঝড় বৃষ্টি আর কড়া রোদ, শীত গ্রীষ্ম আর বর্ষার সব দিনেই দেখা যায়; ভদ্রলোক একেবারে নিয়মিত ও অমোঘ একটি আবির্ভাবের মতো কুন্তলার এই অফিসের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

এই অফিসের কোন লোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ-পরিচয় কিংবা সামান্য চেনাশোনাও যে নেই, সেটাও বেশ বুঝতে পারা যায়। ছুটির পর অফিসের এত লোক বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকিয়ে গল্প করে নিচ্ছে, হাসাহাসি করছে, খেলার কথা আর সিনেমা-ছবির কথা আলোচনা করছে, কিন্তু কই? এই ভদ্রলোকের সাথে তো কাউকে কথা বলতে দেখা যায় না। অফিসের লোকেরা মনে করে, এই ভদ্রলোক নিজের কোন কাজের জন্য এসেছেন আর দাঁড়িয়ে আছেন, কিংবা কারও অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু কোন্ কাজের জন্য কিংবা কার অপেক্ষায়, সেটা জানবার জন্যে কারও মনে কোন ইচ্ছা বা চেষ্টার সাড়া নেই। কুন্তলাকেও তাই একটু আশ্চর্য হতে হয়েছে আর সন্দেহও করতে হয়েছে, তবে কি কুন্তলাকে দেখবার জন্যেই ভদ্রলোক রোজ পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে এখানে আসেন আর দাঁড়িয়ে থাকেন?

পুরো একটা বছর হলো, ভদ্রলোক রোজ আসছেন। রোজ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর কোথায় কোন্ দিকে আর কখন যে চলে যান, তাও জানে না কুন্তলা। কারণ, অফিস থেকে বের হয়ে এই ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে সেই যে মুখ ঘুরিয়ে নেয় কুন্তলা, তারপর আর কোন মুহূর্তেও ভদ্রলোকের দিকে তাকায় না। গেট পার হয়ে ফুটপাথের উপরে এসে প্রায় পাঁচ-দশ মিনিট কুন্তলাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিন্তু ভুলেও মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকায় না কুন্তলা। জানতেও পারে না কুন্তলা, ভদ্রলোক এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কি নেই।

ভদ্রলোক কি সত্যিই বিশ্বাস করেছেন যে, কুন্তলা একদিন হঠাৎ কথা বলে ফেলবে? ভদ্রলোকের চোখের চাহনিতে যেন একটা আশার ব্যাকুলতা লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু কী ভয়ানক একটা ভুল স্বপ্ন মনে পুষে রেখেছেন ভদ্রলোক। কুন্তলার মতো মেয়ে যে কোনদিনও নিজেকে এক ছোট আর এত নীচু করে ফেলতে পারে না, সে-খবর জানেন না ভদ্রলোক। একজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে গায়ে-পড়ে কথা বলা কুন্তলার মতো মেয়ের জীবনের কোন গরজ হতে পারে না। কুন্তলার মতো শিক্ষিতা আর সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে যেচে কথা বলবার জন্য কারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সে-খবরও জানেন না এই ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখের চাহনিতে একটু সাবধানতা আর একটু বুদ্ধি থাকলে ভদ্রলোক বুঝতে পারতেন। রোজই তো ওখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে পান ভদ্রলোক, এই পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে পর-পর তিনটে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে কথা বলে চলে যায় এক-একটি তরুণ অনুরোধ—চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

এই ভদ্রলোক জানেন না, ওরা কারা এত আগ্রহ করে কুন্তলার একটু সান্নিধ্য কামনা করে এরকম অনুরোধের কথা বলছে। ওরা শিক্ষিত, ওরা যথেষ্ট বিত্তবান আর বড় রোজগারের মানুষ। ওরা এক-একটা সুন্দর শখের আর স্টাইলের মানুষ। কুন্তলা যদি নিজে একটু আগ্রহ করে ওদের কারও একজনের গাড়িতে উঠে পড়ে, তবে একদিন তারই জীবনের চিরকালের সঙ্গিনী হয়ে যাবে কুন্তলা, এই সত্যে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু না, কুন্তলার জীবনে এই অহঙ্কারটুকু আছে ; একটা ঝকঝকে গাড়ির অনুরোধের ভাষা শুনে একেবারে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে, এমন মনের মেয়ে নয় কুন্তলা।

তাই ভাবতে গিয়ে মনে-মনে এক-একবার হাসিও পায় কুন্তলার, এই ভদ্রলোকের আশার সাহস তো খুবই অদ্ভুত। শুধু চুপ করে একটা অপেক্ষার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই স্বপ্ন সফল হবে, এইরকম একটা বিশ্বাস ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান নষ্ট করে রেখে দিয়েছে! তা না হলে কি একটা মানুষ এভাবে পুরো এক বছর ধরে শুধু কুন্তলাকে একবার দেখবার জন্য রোজ এসে এই অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন?

এভাবে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকলেও ভদ্রলোকের কোন লাভ হবে না। কারণ ভদ্রলোক জানতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে কুন্তলার মন এই অচেনা আবির্ভাবের উপর কত বিরক্ত ও তিক্ত হয়ে উঠেছে। এটা যে কুন্তলার জীবনের উপর একটা উপদ্রব! অফিস থেকে বের হবার আগেই কুন্তলার মন অস্বস্তিতে ভরে যায়। বের হয়েই তো দেখতে হবে, সেই ভদ্রলোক অদ্ভুত একটা পিপাসা দুই চোখে ভরে নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। কুন্তলা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একেবারে একটা মুগ্ধতার মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কুন্তলার সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন ভদ্রলোক। সে-সময় ভদ্রলোকের বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের আনাগোনাও বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়। এক-একবার চোখে পড়েছে কুন্তলার, ভদ্রলোকের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট শুধু পুড়ছে, সিগারেট মুখে দিতে ভুলে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

প্রথম-প্রথম ভয় হতো ; ট্রামে উঠেই একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিত কুন্তলা, ভদ্রলোকও পিছু-পিছু এসে ট্রামে উঠে পড়েননি তো ? ট্রাম থেকে নেমেও সাবধানে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখতো কুন্তলা, ভদ্রলোকও ট্রাম থেকে নেমে পড়েননি তো ? সন্দেহ হয়েছিল, এমন বেহায়া মানুষ কুন্তলার বাড়ির সন্ধান নিতেও চেষ্টা করবে।

ভুল সন্দেহ। মিথ্যে ভয় ! এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের সব মতলব আর ইচ্ছা যেন নিদারুণ এক অলস তপস্যার মধ্যে অনড় হয়ে পড়ে আছে। শুধু কুন্তলাকে চোখে দেখবার চেষ্টা ছাড়া আর কোন চেষ্টাই নেই।

আরও আশ্চর্য, এই এক বছরে কলকাতা শহরের কত জায়গাতেই তো যেতে হলো কুন্তলার, কতবার ট্রামে বাসে ঘুরতে হলো ; কত দোকানে ঘুরে জিনিস কিনতে হলো, কিন্তু কোনদিনও তো কোথাও এই ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। কুন্তলা যদি ভদ্রলোকের কাছে এমনই একটি আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন হয়ে থাকে, তবে কুন্তলাকে পৃথিবীর অন্য কোন জায়গাতে একবার দেখবার জন্য কোন সখে ভদ্রলোকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠেনি কেন ? কুন্তলার জীবনটা তো শুধু এই অফিসের ছ'টি ঘণ্টাব জীবন নয়। কুন্তলাকে তো ছবির এগজিবিশনে, ভিক্টোরিযা মেমোরিযালের সিঁড়িতে আর সিনেমা ভবনের লাউঞ্জেও দেখা যায়। ভদ্রলোক যদি কুন্তলার জীবনের পরিচয় আরও ভাল করে পেতে চাইতেন, তবে কুন্তলাব ছায়া অনুসরণ করে কুন্তলার নাম-ধাম-গোত্রের পরিচয জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে, আর চেষ্টা করলেই দেখতে পেতেন ভদ্রলোক, কুন্তলার এই সুন্দর চেহারা কী অদ্ভুত সুন্দর সাজে সেজে মার্কেটের স্টলের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে চলে যায়।

কুন্তলার অস্বস্তিটা যেন মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে উঠেছে, এই ভদ্রলোককে আর কোথাও কোনদিনও দেখতে পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকের উপরে মনের এই এক বছরের যত সন্দেহ বিরক্তি আর বিদ্রূপ, সবই যেন হঠাৎ জব্দ হয়ে গিয়ে ছটফট কবে। লোকটাকে ঘেন্না করবার মতো এত কাবণ থাকতেও ঘেন্না করতে পারা যাচ্ছে না।

কিন্তু ইচ্ছে করে ঠিকই, মনের অস্বস্তিটা যেন একটা জ্বালা হয়ে ওঠে। ভদ্রলোককে একটা কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করে, এভাবে একটা মেয়ের চোখের কাছে রোজই উপদ্রবের মতো দেখা দিতে আপনার কি একটুও লজ্জা বোধ হয় না ?

সেদিন খুব ঝড় আর বৃষ্টি চলছিল। তাই অফিসের ছুটির পরেও বাইরের বারান্দায় এসে কুন্তলাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অচেনা ভদ্রলোকের চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলা। মনে হয়েছিল, আজ নিশ্চয়ই ভুল করে কথা বলে ফেলবেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত জবাবও শুনিয়ে দেবে কুন্তলা। তার মানে একটিও কথা না বলে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, কুন্তলাব কাছে উনি নিতান্ত একটি তুচ্ছ অস্তিত্ব।

না ; এমন তুচ্ছতা দেখাবার সুযোগও পায়নি কুন্তলা। কারণ এই অদ্ভুত ভদ্রলোক কুন্তলাকে চোখের এত কাছে আধ ঘণ্টা ধরে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও একটি কথা বললেন না।

বৃষ্টি থামবার পর, ট্রামে ওঠবার পর, ট্রাম থেকে নেমে বাড়ি ফিরে এসে চা খাওয়ার পরও ঘরের ভিতরে চুপ করে পুরো একটি ঘণ্টা বসে থাকবার পর, কুন্তলার মনের ভিতরে যেন একটা অদ্ভুত অভিমানের বেদনা জ্বলতে থাকে। সেই অভিমানের সঙ্গে যেন একটা অপমানের ছায়াও মিশে আছে। লোকটা যেন আজ নিজেই মস্ত বড় একটা সুবিধা পেয়ে গিয়ে কুন্তলাকে তুচ্ছ করে সুখী হয়ে গেল।

কিন্তু পরের দিনও তো আবার ঠিক সেই পাঁচটার সময় অফিসের বারান্দায় একটা দুরন্ত পিপাসিত অপেক্ষার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। কুন্তলাকে দেখতে পেয়ে

ভদ্রলোকের চোখ দুটো তো আবার সেই রকমই নিবিড় হয়ে ওঠে।

প্রণব সরকার গেটের সামনেই রাস্তার উপর গাড়ি থামিয়ে জোরে হর্ন বাজাচ্ছে। ইচ্ছা করে কুন্তলার, এখনই হেসে-হেসে সাড়া দিয়ে ছুটে গিয়ে প্রণব সরকারের গাড়ির ভিতরে উঠে পড়তে। তারপর দেখা যাবে, এই ভদ্রলোকের চোখ দুটো বোকা হয়ে, জব্দ হয়ে আর করুণ হয়ে তাকিয়ে থাকে কিনা।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, এই সামান্য একটা অচেনা অজানা লোকের চোখের আশাকে জব্দ করতে গিয়ে কুন্তলা একটা জঘন্য কাণ্ড করে ফেলতে পারে না।

কিন্তু আর চুপ করে থাকবারও যে শক্তি নেই কুন্তলার। এই ভদ্রলোকের চোখের ওই ভয়ানক শান্ত লোভের দৃষ্টি আর সহ্য হয় না। ভদ্রলোককে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে ফেললেই তো হয়—আপনি রোজ এখানে আসেন কেন ? কোন্ সাহসে ? অপমানিত হবার কোন ভয় নেই বুঝি ?

এমন প্রশ্ন করবার ইচ্ছাটা যে একটা যুক্তিহীন অভদ্রতার ইচ্ছা, তাও বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল কুন্তলা। তা না হলে সেদিন হঠাৎ চোখ-মুখ একেবারে কঠোর করে নিয়ে আর রুক্ষস্বরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে ফেলতে পারতো না কুন্তলা—আপনি রোজই এখানে কিসের জন্য আসেন ? এই অফিসে আপনার কী কাজ আছে ?

ভদ্রলোক হাসতে চেষ্টা করেন—কোন কাজের জন্যে আসি না।

—অদ্ভুত কথা। কাজ নেই, তবু এক বছর ধরে রোজই আসেন। লজ্জার কথা।

—লজ্জার কথা কেন হবে ? আপনিই বা একথা বলছেন কেন ?

—আমি কেন বলছি, সেটা আপনি জানেন !

—আমি তো আপনাকে চিনিও না।

—আমিও তো আপনাকে চিনি না।

—তাই তো বলছি, আপনি হঠাৎ আমাকে এরকম একটা বাজে কথা জিজ্ঞাসা করে বসলেন কেন ?

কুন্তলার গলার স্বর আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে।—আপনি রোজই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, এটা খুব কাজের কাজ, না ?

—না।

—আপনার উদ্দেশ্য কি ?

—আপনি পুলিশের মতো মেজাজ নিয়ে কথা বলছেন কেন ? ভদ্রলোকের গলার স্বরও ভয়ানক তীব্র হয়ে কুন্তলাকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

অফিসের ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর লাঠি ঠুকে ঠুকে বের হয়ে এলেন অফিসের সিনিয়র ক্লার্ক, বুড়ো অনাদিবাবু। চোখে ভাল দেখতে পান না। তাই পুরু লেন্সের চশমার আড়াল থেকে অনাদিবাবুর চোখ দুটো টান হয়ে সামনের মানুষগুলিকে দেখবার চেষ্টা করে। মৃদুস্বরে একটা কথাও বলেন অনাদিবাবু—মনোজ এসেছ নাকি !

—এই যে, আমি এসেছি কাকা। এগিয়ে গিয়ে অনাদিবাবুর হাত ধরেন ভদ্রলোক।

চমকে ওঠে কুন্তলা। ভদ্রলোকের মুখের দিকে, তার মানে মনোজের মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

যেন কুন্তলার জীবনের এক বছরের একটা আদুরে স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই মনোজ তাহলে কুন্তলার জীবনের কোন উপদ্রব নয়। বুড়ো কেরানী অনাদিবাবু হলেন এই মনোজের কাকা। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে, চোখে ভাল দেখতে পান না কাকা, তাই ভাইপো রোজই এখানে এসে কাকাকে বাড়ি নিয়ে যায়। এই তো ব্যাপার।

কিন্তু কী ভয়ানক ছলনার ব্যাপার। এই ছলনা এক বছর ধরে কুন্তলার প্রাণটাকে অস্বস্তির কাঁটায় বিঁধে বিঁধে কষ্ট দিয়েছে। আর এখন কত খুশি হয়ে নিশ্চিন্ত মনে, যেন একটা জয়ের গর্ব নিয়ে কাকার হাত ধরে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে মনোজ।

চোখ ভিজে গিয়েছে কুন্তলার। অনাদিবাবুর কাছে এগিয়ে যায় কুন্তলা—আমাকে চিনতে পারছেন তো ?

অনাদিবাবু চোখ টান করে তাকান—ও হ্যাঁ, তুমি তো আমাদেব কুন্তলা। তাই না ?

কুন্তলা হাসে—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছেন, কিন্তু আপনি কি এখন বাড়ি যাচ্ছেন ?

অনাদিবাবু—হ্যাঁ, আজকাল তো একা-একা বাড়ি যেতে পাবি না। একজন কেউ সাহায্য না কবলে।

কুন্তলা—আপনি আমাকে বললেই তো পাবতেন। আমি ছুটিব পব আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে একটু সাহায্য নিশ্চয় কবতে পাবতাম।

অনাদি—তা দরকার হলেই বলবো।

কুন্তলা হাসে—আজই বলুন না।

অনাদিবাবু—আজ তো মনোজ আছে।

কুন্তলা—আজ ওঁকে চলে যেতে বলে দিন। আমিই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।

অনাদিবাবু আশ্চর্য হয়ে তাকান—তুমি পৌঁছে দেবে ? তুমি আমাদেব বাড়িতে যাবে ?

কুন্তলা—হ্যাঁ।

অনাদিবাবু—মনোজ, তুমি তবে আগেই চলে যাও।

মনোজও আশ্চর্য হয়ে কুন্তলার দিকে তাকায়। কুন্তলা বেশ একটু ভ্রূকুটি করে, আব যেন চাপা অভিমানের স্বরে কথা বলে।—যান না, আমিও তো একটু পরে কাকাকে সঙ্গে নিয়ে আসছি।

গরল অমিয় ভেল

মেহেদি গাছের বেড়ার ওপারে চন্দ্রবাবুব বাড়ির একটি জানালা। প্রায় সব সময় একটি মেয়েকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির নাম মালা বিশ্বাস। চন্দ্রবাবুর মেয়ে। শহরের সকলেই একে চেনে।

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা, মেয়ে হয়ে দুর্নাম কেনার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। মালা বিশ্বাসের চালচলনে যেন মাত্রা নেই। দুর্নামও তাই এককালে মাত্রা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন লোকনিন্দার সেই অশান্ত গুঞ্জন কিছুটা থিতিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর বাড়ির মেহেদি গাছের বেড়া, ফটকের ল্যাম্পপোস্ট আর পথের কাছে মাকাল গাছটা—এসবের মতোই জানালার কাছে মালার দাঁড়িয়ে থাকাটাও এখন একটা নিছক নিসর্গ শোভা মাত্র।

মালা তাকিয়ে দেখে সবাইকে। ফেরিওয়ালারা যায়, পুলিশ লাইনের সেপাইরা যায়। কেউ তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। বেলা সাড়ে দশটায় পথ ভর্তি কবে স্কুলের ছাত্র আর কাছারির বাবুরা যায়। হাটের দিনে পথে ভিড় হয় আরও বেশি। দুপুরের রোদে পথের ধুলো ক্ষেপে আঁধি ওঠে, কখনও বৃষ্টি নামে। মালা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ধারে। কখনও বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলের দল জটলা করে। মালা তবু সরে যায় না। এ এক সমস্যার কথা—একি শুধু দেখার নেশা ? অথবা দেখা দেওয়ার নেশা ?

ঘরের বাইরেও মালা বিশ্বাসকে দেখা যায়। কখনও বেড়াতে বার হয়, কখনও বা অকারণেই ঘুরে আসে। তাই সে প্রায় সকলেরই চেনা। সকলেই চেনে মালা বিশ্বাসের মুখের বসন্তের দাগগুলি, কালো মোটা চেহারা, চোখে অদ্ভুত রকমের চশমা, হাতে ছাতা, সঙ্গে চাকর রামজীবন। তার শাড়ি, রঙ-এর বৈচিত্র্যে আর পরবার কায়দায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো। পথে যেতে হঠাৎ মালা একবার থামে গ্রামোফোনের দোকানের সামনে। রামজীবন গিয়ে কয়েকটা রেকর্ডের দাম জিজ্ঞেস করে আসে। কখনও থামে গুরুদাসের ঘড়ির দোকানের কাছে—রামজীবন অনুসন্ধান করে হাতঘড়ির ভাল ব্যান্ড আছে কিনা।

আড়ালে থাকতে মালা বোধহয় হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু ভিড় খোঁজে যদিও ভিড়ের মধ্যে ঠিক মিশতে পারে না। বারোয়ারিতলায় যাত্রাগানের আসরে বর্ষীয়সী মহিলারা বসেন চিকের আড়ালে। ছোট মেয়েরা বসে চিকের বাইরে দু'সারি বেঞ্চে। মালা বসে চিকের বাইরেই ভিন্ন একটা চেয়ারে, একটু এগিয়ে—সবা হতে দূরে।

মেয়ে স্কুলের বার্ষিক উৎসবে মালা বিশ্বাসও এসেছিল। সকালে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে দেখেছিল, তার গলায় প্রকাণ্ড সাঁওতালী হাঁসুলীটা. আশপাশ থেকে নানারকম ঠাট্টা ভরা টিপ্পনি টিক্‌টিক্ করে উঠলো। কিন্তু ওসব মন্তব্য মালার কানেই আসে না।

ভাদ্রের ঠিক মাঝামাঝি এসে আকাশ ভরা বর্ষার ঘটা একেবারে থেমে গেল। রাণী ঝিলের মাঠের ঘাসে, কালো পাথরের টিলাতে, টেলিগ্রাফের তারে দূরের নিম বনের চূড়ায় প্রথম শরতের আলো চিক্‌চিক্ করে উঠলো ছোট ছেলের হাসির মতো।

ঝাপ্‌সা হয়ে ছিল সারা শহরের প্রাণ, আড়াই মাস ধরে। আজ আবার আলোয় চমকে উঠেছে রঙিন আয়নার মতো। শিকল দেওয়া প্রাণগুলি ছাড়া পেল ঘরে ঘরে। নিঝুম শহরটা সাড়া দিল আবার।

রাণী ঝিলের মাঠে বেড়িয়ে ফেরার মরসুম এল। একটা দেওদারের নীচে দেখা যায় হরিজন স্কুলের ছেলেরা ড্রিল করছে। আয়ার দল ঘুরছে পেরাম্বুলেটার টেনে। শরৎবাবু ও কান্তিবাবু, বিহার-জুডিসিয়ারির দুটি রিটায়ার্ড মানুষ, লাঠি হাতে একসঙ্গে পা ফেলে চলেছেন বাঁধের লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

রাণী ঝিলের নতুন বাতাস আজ ডাক দিয়েছে সবাইকে। হাসপাতাল রোড ধরে সপরিবারে ভদ্রলোকেরা বেড়াতে আসেন। গল্‌ফের লাঠি হাতে মুখে পাইপ কামড়ে আসছে সামুয়েল সাহেব। মালা বিশ্বাস বেড়াতে এসেছে, খোঁপায় জড়ানো প্রকাণ্ড একটা রঙিন রুমাল উড়ছে বাতাসে। প্রচারক চৌধুরী মশায় ঝিলের জলের ধারে একটা খবরের কাগজ পেতেছেন, উপাসনায় বসবার জন্য।

সকলে একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে, ছোট একটা কালো পাথরের টিলা, তার গা ঘেঁষে একটা করবী গাছ। এই পাথরটা ক্রস রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে। কোন দিন এর দিকে তাকিয়ে দেখার মতো কিছু ছিল না। গরু চড়াতে এসে রাখালেরা কোন দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে ভাত খেতে বসে।

সকলেই একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। জায়গাটা পার হতে অন্তত দু-তিন মিনিট সময় লাগছিল সবারই। পাথরটার ওপর বড় বড় হরফে সাদা খড়ি দিয়ে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে নানা ছন্দে কীসব লেখা। পথচারী সকলেই, কেউ একা কেউ সকলে চোখ ভরা দুরন্ত আগ্রহ দিয়ে পড়ছিল লেখাগুলি। প্রথম শরতের সকালবেলা এই পথে-পড়ে-থাকা পাথরটার গায়ে কে ছড়িয়ে গেল এমন এক মুঠো রোমান্স!

বেশিক্ষণ কেউ দাঁড়াচ্ছিল না সেখানে। তা সম্ভবও ছিল না। পড়ে নেয় আর সরে পড়ে। লেখাগুলি ভয়ানক রকমের অশ্লীল।

শুধু তাই হলে ভাল ছিল। দেখা যাচ্ছে, কথাগুলি সবই একটি মেয়েকে উদ্দেশ করে লেখা। শুধু নাম থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কাদের বাড়ির মেয়ে। এই নিদারুণ পরিচয়-লিপির অনেককিছু বাদ দিলে সংক্ষেপে তাকে এইটুকু শুধু চেনা যায় :

—পূর্ণিমা বসু। রূপে আর নামে এমন মিল আব দেখা যায় না। তুমি নাকি গয়না ভালবাস না ? লজ্জাই তোমার ভূষণ, খুব সত্যি কথা। ছ'মাস চেষ্টা করে একটি বার শুধু তোমায় চোখে দেখতে পেয়েছি। জানি তোমার চিঠি আসে ভিয়েনা থেকে। তিনি ভালো আছেন তো ? আর এক যক্ষ যে সিমলা পাহাড়ে হাঁ করে বসে আছেন। ক'দিক সামলাবে ? যাচ্ছ কবে ? যখন-তখন ওভাবে হাই তুলতে নেই, বড় বিশ্রী দেখায়।

কে লিখেছে কে জানে ! এই অজানা অশ্লীল কুৎসাবিশারদের লেখাগুলি মৌচাকে ঢিলের মতো শহরের বুকে এসে লাগলো। তিন ঘন্টার মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ও বৈঠকে, নিভৃতে ও নেপথ্যে গুন্ গুন্ করে উঠলো শুধু এই প্রসঙ্গ—কালো পাথবের লেখা।

শুধু এই প্রশ্ন,—কে লিখলো ?—কে পূর্ণিমা বসু ?—কথাগুলি কি সত্যি ? মনে মনে, মুখে মুখে, আলাপে আলোচনায়, সন্দেহে ও সন্ধানে এক প্রচণ্ড কৌতূহল যেন পবোয়ানা হয়ে ছুটলো চারদিকে : এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

প্রথম কৌতূহলের বিকার একটু শান্ত হয়ে এল। পূর্ণিমা বসুব পরিচয় পাওয়া গেছে। দু' বছ্ব হলো পুরনো গির্জার দক্ষিণে যে নতুন বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেই বাড়ির মালিকের নাম মহীতোষবাবু। মহীতোষবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা। ক'জনই বা এদের চেনে ! লতা-মোড়া উঁচু প্রাচীর দিয়েই ঘেরা থাকে এঁদের বড়মানুষী বনিয়াদ। এঁরা অগোচব। তার মধ্যে পূর্ণিমা বসুকে একরকম অলীক বললেই হয়। কিন্তু সেও আজ সব জানা-অজানার ব্যবধান ঘুচিয়ে নতুন এক আবিষ্কারের মতো সবার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয় নতুন কেউ একজন এসেছে এ শহরে। যেই হোক, পূর্ণিমা বসুব ওপর তাব এত আক্রোশ কেন ? একি কোন বিগত অপমানের প্রতিশোধ ? তবুও এটা বড় কাপুরুষেব মতো কাজ হয়েছে। অত্যন্ত গর্হিত।

অনেকে এই ভেবে লজ্জিত হচ্ছে, পূর্ণিমার বাড়ির লোকেবা কি মনে করলো। কেন তাদের ওপর এই অহেতুক কুৎসার আঘাত ? সত্য হোক মিথ্যা হোক, এই আঘাত কারও গায়ে না বেজে পারে না।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সবাই বিকেলের দিকে একবার বেড়াতে বার হতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে প্রাচীরের বাইরের পৃথিবীতে একটিবার ঘোরাফেরার এই শ্রদ্ধাটুকুও তাঁদের হারাতে হলো। তাঁদের কাউকে আজ আর কোথাও দেখা গেল না।

কিন্তু পূর্ণিমা কি ভাবলো ? এতক্ষণে সেও নিশ্চয় সব খবর শুনেছে। হয়তো ঘরে খিল দিয়ে কাঁদছে, হয়তো আজ সারাদিন খায়নি। ভাবতে গেলে কত কি মনে হয়, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না, এই উপদ্রবে পূর্ণিমার মনের শান্তি কতটা নষ্ট হলো। এও হতে পারে, সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না, তার রীতিমত মনের জোর আছে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়।

ঠিক বেলা বারটার সময় কাছারি রোড দিয়ে যেতে চোখে পড়ে, সমাজবাড়ির সামনে কুঁয়োতলায় প্রচারক চৌধুরী মহাশয় স্নান করছেন। মাথা ভরা টাক আর চিবুক ভবা পাকা দাড়ি, ফরসা রোগা চেহারা। এক এক সময় দেখা যায় স্নান সেরে আদুড় গায়ে কুঁয়োতলার শানে বসে সাবান দিয়ে খদ্দরের ধুতি কাচছেন। দু'খানার বেশি তাঁর ধুতি নেই। সমাজবাড়ির কোণের ঘরটাতে তাঁর আস্তানা। দারা সুত পরিবার অর্থাৎ সংসার বলতে কোন বালাই তাঁর নেই। দুপুরের রোদে সেই লোলপেশী বুড়ো মানুষের সাদা শরীরটা বড় অদ্ভুত দেখায়।

তিনি সত্যবাদী ও নির্ভীক। এই কারণেই সরকারি চাকরি গ্রহণ করতে পারেন নি।

যেখানে দুর্নীতি, সেখানে তিনি ক্রূর ও কঠোর। বহু বহুবার তিনি ছেলেদের সখের থিয়েটারের আয়োজন পণ্ড করেছেন। তিনি একবার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হয়েই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর প্রস্তাব ছিল বিড়ির দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করা, যাতে ধূমপানের পাপ যথেচ্ছা ধুঁইয়ে না ওঠে। সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।

অন্য দিকে যতই নিরীহ ও নমনীয় মানুষ হোন না কেন, নীতিগত কোন অন্যায়ের ব্যাপারে তিনি নিজের কর্তব্য ভুলতে পারেন না। সেখানে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখার মতো প্রতাপ কারও নেই। লোকে জানুক আর না জানুক, প্রচারক চৌধুরী মশায় জানেন, তিনিই স্বয়ং এ-শহরের ভদ্র সমাজের নীতি রুচি ও শালীনতার অভিভাবক স্বরূপ। একবার হোলির দিনে মেথরদের মদ খাওয়া বন্ধ করে সকলকে গেলাস ভর্তি দুধ খাইয়েছিলেন চৌধুরী মশায়। এরকম অঘটনও এ শহরের ইতিহাসে ঘটে গেছে।

তাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন পাপের এই দুঃসাহসিক রূপ দেখে। রাগে ও ঘৃণায় চৌধুরী মশায় স্থৈর্য হারালেন। স্বয়ং থানায় এসে ডায়েরি করিয়ে গেলেন, কে বা কারা শহরের বুকের ওপর বসে এই অপকীর্তি করলো? অবিলম্বে তাকে যেন ধরে ফেলা হয়। এমন কঠোর শাস্তি তাকে দেওয়া হোক যাতে এক যুগ ধরে যত দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের বুক কাঁপতে থাকবে। নইলে বুঝতে হবে দেশে সুশাসনের শেষ হয়েছে, গভর্নমেন্ট নেই।

পুলিশের ইনস্পেক্টর প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি এই ঘড়িয়াল বদমায়েসকে সাত দিনের মধ্যে ধরে ফেলবেন, সে যতই গভীর জলে থাক না কেন।

মালা বিশ্বাস অবশ্যই দেখেছে পাথরের লেখাগুলি। বোধহয় একমাত্র সেই লেখাগুলি ভাল করে পড়েছে, পরম নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে। মালা চিনেছে পূর্ণিমাকে, লোকমুখে শুনে নয়, সে আগেই তাকে জানতো। গির্জার সড়কে বেড়াতে গিয়ে কতদিন সকালবেলা মালা তাকে দেখেছে, দোতলা ঘরের জানালার কাছে বই হাতে বসে আছে পূর্ণিমা। চোখাচোখি হতেই পূর্ণিমা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিত। বোঝা যেত, এই জানালা বন্ধ করা একটা সশব্দ প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে বা কার বিরুদ্ধে তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। হতে পারে—সেটা মালার গায়ে জড়ানো ঐ সবুজ রঙের রেশমী নেট, বড় বেশি ঝকঝক করে।

আজ সারাক্ষণ হেসেছে মালা। রূপসী পূর্ণিমা বসুর সকল অহঙ্কার কালো পাথরের নোংরামির আঘাতে কী ভয়ানক জব্দ হয়ে গেছে।

সমস্ত শহরের শাসন ও সতর্কতাকে বিদ্রূপ করে ক্রসবোর্ডের পাথরটা পনের দিনের মধ্যে আর একবার খেউড় গিয়ে উঠলো।—"সুমিতা নন্দী, প্রতিজ্ঞা করেছ মনের মতো মানুষ না পেলে গলায় মালা দেবে না। তবে তোমার এলবাম ভরা ওসব কাদের ছবি? কিছু বেছে উঠতে পারলে? এ অভ্যেস ভালো নয়। এটা দ্বাপর যুগ নয়। বয়স তো সাত বছর ধরে সেই তেইশে ঠেকে রয়েছে। তবে তোমার মেক আপের পায়ে গড করি। এত শিথিলতাকে কি কৌশলে এত উদ্ধত করে রেখেছ। নাঃ, তুমি সত্যই সুতনুকা, তুমি অমর্ত্য বধূ। ও ছাই মানুষের ছবির এলবামে কি হবে? তোমার বিয়ে না করাই ভালো।"

ব্যাপারটা আগাগোড়া বিস্ময়কর বলেই মনে হচ্ছে। যেই লিখুক না কেন, সে দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। সুচতুর তো নিশ্চয়ই। প্রতি দুশ্চিন্ত মনের মেঘে মেঘে, সন্দেহের পরতে পরতে, এক একবার তার রূপ আবছায়ার মতো গোচরে আসে যেন। কল্পনার নেপথ্যে এই অদ্ভুতকর্মা কাজ করে চলেছে। নেহাত বাজে ফক্কর গোছের কেউ নয়। লেখাপড়া খুব ভালোই জানে। বয়স বিশ-পঁচিশের বেশি বোধহয় হবে না। বোধহয় কোন হতাশ প্রেমিক।

সেবক সমিতির অফিসে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সেক্রেটারি ননীবাবু চিন্তিতভাবে বসেছিলেন। আজ জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হয়েছে। সভ্যেরা সব এল একে একে। এরা সবাই ছাত্র—সতু, প্রিয়তোষ, লোকনাথ ।

ননীবাবু জানালেন—এটা আমাদের সবারই অপমান। কোন এক বদমাস দিনের পর দিন এইসব কুকর্ম করে চলেছে, আজও ধরা পড়লো না। সে যে শিগগির বন্ধ করবে, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কখন কার নামে লেখা উঠবে এই ভয়েই সবাই শঙ্কিত। বাস্তবিক ।

ননীবাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।

—যেই হোক, এটা বুঝতে পারছি, বাইরের লোক কেউ নয়। নিশ্চয় আমরা সবাই তাকে চিনি, তবে ভোল দেখে হয়তো বুঝতে পারছি না।

ননীবাবুর কথায় সংশয়ের কুয়াশা ঠেলে তার মূর্তিটা যেন ছায়ার মতো দেখা যায়।

—এ ধরনের লোককে সহজে চেনা মুশকিল। যাকে কোন মতেই সন্দেহ হচ্ছে না, এ কাজ হয়তো তারই।

স্বয়ং ননীবাবুই শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে বলেন—তাকে না ধরতে পারলে কোন সুরাহা হবে না। হাতে হাতে ধরে ফেলা চাই।

চৌধুরী মশাই রণে হার মানেন নি। অনেকদিন পরে সংগ্রাম করার মতো এক পাপের চ্যালেঞ্জকে পাওয়া গেছে। আবার একদিন থানায় এসে পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে একপ্রকার বচসা করে গেলেন। চৌধুরী মশাই বিশ্বাস করেন না, পুলিশ আন্তরিকভাবে ঠিক কর্তব্য করছে, নইলে অপরাধী নিশ্চয় এতদিন ধরা পড়তো। তিনি প্রস্তাব করলেন—পাথরটার কাছে দিবারাত্র পাহারা দেবার জন্য এক বন্দুকধারী সান্ত্রী মোতায়েন করা হোক্।

ইনস্‌পেক্টর হেসে হেসে বললেন—কি যে বলেন চৌধুরী মশায়, পুলিশের আর কাজ নেই? একটা মামুলী ব্যাপারে কামান-বন্দুক নিয়ে টানাটানি করতে হবে?

চৌধুরী মশাই উত্তেজিত হলেন—মামুলী ব্যাপার! কথাটা প্রত্যাহার করুন।

ইনস্‌পেক্টর—আপনি বৃথা রাগ করছেন। চুরি রাহাজানি খুন ডাকাতির খবর দিন, এক সপ্তাহে আসামীকে বেঁধে আনছি। কিন্তু এসব ভুতুড়ে গোছের ব্যাপার, এটা কি একটা তদন্ত করার মতো কেস চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী মশাই—তাহলে প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ নিয়োগ করুন।

ইনস্‌পেক্টর—মাপ করবেন, আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। তবু আপনার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে আমরা অসমর্থ, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্য করবো।

চৌধুরী মশাই—তাহলে আমাকেও বাধ্য হয়েই গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে কম্‌প্লেন জানাতে হয়।

চৌধুরী মশাই উঠে চলে গেলেন।

ইনস্‌পেক্টর ভয় পেল কিনা বোঝা গেল না। চৌধুরী মশাইয়ের মতো প্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন লোককে রাগানো উচিত নয়। যে কারণেই হোক সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একজন কনস্টেবল লাঠি হাতে পাথরটাকে পাহারা দিল। সকাল বেলা ছিল সামান্য একটু পুরনো লেখার অবশেষ। সুমিতা নন্দীর কলঙ্কগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সজাগ সতর্ক পাহারার এক ফাঁকেই বিকেলের মধ্যে ঝলসে উঠলো একটা নতুন লেখা। সারা গোধূলিবেলা পাথরটা যেন ঠাট্টার সুরে হাসতে লাগলো। —"সুধা দত্ত, অনেক মেয়ের গলায় সুর শুনেছি, তবে তোমার মতো এত মিষ্টি কারও নয়। সত্যিই গলাটি তোমার সুধায় ভরা, ছোট্ট গলগন্ডটাই তার প্রমাণ। হাই-কলার ব্লাউজে আর ঢাকা পড়ছে না। কেন যে এত

ইংরেজি বুলি বলছো, বুঝি না। প্রফেসর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে, ও পথ ছেড়ে দাও।"

কনস্টেবলের চাকরি যাবার উপক্রম হলো। সে কসম খেয়ে জানালো, এক মুহূর্তের জন্যে সে ডিউটিতে ফাঁকি দেয়নি। একটা পিঁপড়ের দিকেও ভুল করে তাকায়নি।

আশ্চর্য এই কালোপাথরের অশরীরী শিল্পী।

সন্দেহের ঝড় উঠছে। অলক্ষ্যে যদি গরুর হাড় বা মড়ার মাথা কেউ ফেলে দিয়ে যেত, তবে না হয় বলা যেত ভূতের কাণ্ড। কিন্তু এটা নিছক প্রাকৃতিক আর চারিত্রিক ব্যাপার। একজন কেউ আছে পেছনে। সাবাস তার বাহাদুরী। তিন মাস ধবে শহর সুদ্ধ লোককে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে। এক এক সময় বেশ ভেবেচিন্তে সন্দেহ হয়। যার-তার ওপব এই কৃতিত্ব আরোপ করা যায় না। যেই হোক সে কবি ও প্রেমিক, সে দুঃসাহসী ও চতুর। এতগুলি তরুণী হিয়ার গোপন কথা যে জানতে পেরেছে, সে গুণী ও যাদুকর। সব সময় তাকে অশ্লীল বলতে বাধে, সে বড় রসিয়ে লেখে।

কিন্তু একবার যদি এই অধরা যাদুকর ধরা পড়ে। চৌধুরী মশায়, পুলিশ, সেবক সমিতি আর নিন্দিতাদের বাপ-ভাইয়েরা ওর হাড়মাস কুচিকুচি করে ছড়িয়ে দেবে রাণীঝিলের মাঠে। সন্দেহ হয় অনেককে। কার্নিভালের বাঙালী ম্যানেজারটা ঠিক তিন মাস ধরে শহরে বসে আছে। কেন? ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেগুলি বড় বেশি গুলতানি করে আজকাল। কেন? নন্দ মিস্তিরি উপন্যাস পড়ছে। হাতুড়ি ছেড়ে হঠাৎ এ সখের ব্যামো আবার কেন? প্রশান্ত পানের দোকান করে, এমন কি লাভ হয়? তবু সপ্তাহে তিনখানা রেকর্ড কেনে। হঠাৎ এত সুরেলা হয়ে উঠলো কেন সে? তবু ভরসা, প্রশান্ত নাকি লেখাপড়া জানে না। কিন্তু এ ভব মাঝারে কিছুই অসম্ভব নয়। সেবক সমিতি সন্দেহ করে পুলিশকে, পুলিশ সন্দেহ করে খদ্দরধারী মতিলালকে। মতিলাল চেষ্টা করছে, কাকে সন্দেহ করা যায়। এই সন্দেহের মাৎস্যন্যায়ে কারও অস্তিত্ব বুঝি আর ঠিক থাকে না।

কিন্তু ক্রসরোডের পাথর কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেল? এক মাস পার হয়ে গেছে, কোন নতুন রহস্যের দাগ পড়ছে না আর। তাহলে চলে কি করে? শহরের প্রাণের তার যে বাঁধা পড়েছে কালো পাথরের সুরে। দিবস রজনী ঐ কালো পাথরে ফুটে উঠবে নব নব শ্বেতলিপিকার ফুল। জ্যোৎস্না রোদ কুয়াশা শিশির—তারই ছোঁয়ায় প্রতি প্রভাতে কত প্রেমবৈচিত্র্যের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রসরোডের পাষাণবেদিকা। ক'মাসের মধ্যে কত অজানা কথা বলে দিল পাথবটা। এই লেখাগুলির মধ্যেই শহরের ঘুমন্ত মহিমা সাড়া দিয়ে উঠেছে।

সিনেমায় দর্শকদের ভিড় কমে গেছে। সকাল বিকেল রাণীঝিলের মাঠে লোকের সমারোহ। গত বছরেও শরৎ এসেছিল এমনি আকাশভরা নীল নিয়ে। কিন্তু রাণীঝিলের মাঠ আর ক্রসরোডের ধূলা এত চঞ্চল হয়ে ওঠেনি জনপদধ্বনির উচ্ছ্বাসে। ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে দোলা লাগে। ক্রসরোডের পাথর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এবার কার পালা কে জানে! মনে হয়, এই ক্ষমাহীন পাথরের অমোঘ অনুশাসন একে একে সকল গোপনচারিণীর কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবে।

শত শত মূক মুখের প্রার্থনা পাথরের কাছে পৌঁছল যেন। বহু জিজ্ঞাসার আবেদনে ক্রসরোডের পাথরে অনুগ্রহের স্বাক্ষর আবার জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠলো।

—প্রীতি মুখার্জি, তুমি অপরূপ না হলেও অদ্ভুত। পরের কোলের ছেলে নিয়ে এত টানাটানি কেন? সবই বুঝি সখি। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, এবার সামলে থেকো। গিরিডিকে ভুলে যাও।

যেই যাক্ ক্রসরোড দিয়ে, সকলকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হবেই লেখাগুলিকে,

যতদিন না কেউ সাহস করে মিটিয়ে দেয়। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধ মুখে যে যাই বলুক, এই কুৎসাদৃপ্ত পাথরের কাছে যেন ঝুঁকে পড়ে সকলেই, অভিবাদনের আবেশে।

শরৎবাবু যান, কান্তিবাবু আসেন। ক্রসরোডে মুখোমুখি দুজনের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই এই কুপথে চলার গ্লানিটুকু বার্তালাপের মধ্যে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন।

কান্তিবাবু—এ যে অসহ্য হয়ে উঠলো মশাই। কুৎসিত লেখাগুলি কি বন্ধ হবে না ?

শরৎবাবু—আর বলেন কেন, বড়ই ঘৃণ্য ব্যাপার !

দুই সজ্জনের আলাপ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতো কিন্তু তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন চৌধুরী মশাই—সাদা ভুরু ও দাড়ির মাঝখানে শাণিত নাক আর কঠোর দৃষ্টি '। ওভাবে চলে যাওয়া—বড় অস্বাভাবিক মনে হয়। শবৎবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

কান্তিবাবু—চৌধুরী মশাই ওভাবে তাকালেন কেন বলুন তো ?

শরৎবাবু সশব্দে হেসে বলেন—কে জানে, উনি হয়তো মনে করছেন আমরা দুজনেই লেখাগুলি লিখেছি।

কান্তিবাবু—বলা যায় না, এ সন্দেহ তাঁর হতে পারে, যে রকম নীতিবাতিক লোক।

এতক্ষণে তারা কি ভাবছে ' কালো পাথবের লেখাগুলি যাদের সুনামকে কালো কবেছে, সেই অপমান শয্যা থেকে তারা কি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে ? কিন্তু যতই কৌতূহল হোক না কেন, এ সংবাদ জানবার উপায় নেই। প্রথমে ভয় হয়েছিল, নিন্দিতাদের মধ্যে দু'একজন অতি-অভিমানিনী আত্মহত্যা কবে না বসে। খুব বেশি ভয় হযেছিল সুধা দত্তের কথা ভেবে।

সত্য মিথ্যা যাচাই হয় না, তবু রীতিমত মনোবেদনা পায় অনেকে। মানুষ আজ খারাপ থাকে, কাল ভাল হয়ে যায়। কিন্তু লোকসমাজে কারও দোষত্রুটিকে ঢোল পিটিয়ে বটিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না, বরং তাতে অনেকে উল্টো বেপরোযা হযে ওঠে। যদি সত্যও হয়, তবুও এতগুলো ভদ্রবাড়ির মেয়েব চরিত্র নিয়ে মাঝ ময়দানে লেখালেখি করা খুবই অন্যায়।

শুধু সন্দেহ নয়, বিচিত্র রকমের গুজব উড়ছে চাবদিকে। পূর্ণিমারা নাকি চিবকালের মতো চলে যাচ্ছে এ শহর ছেড়ে। সুমিত্রা নন্দী বোধহয় বিষ খাবাব চেষ্টা করেছিল। প্রীতি মুখার্জির দাদা খুব সম্ভবত গুণ্ডা লাগিয়েছে—যে এসব লেখা লিখছে, তাকে খুন কবা হবে। সুমিতাব জোর কবে বিয়ে দেওয়া হবে এই মাসেই। গুজব উড়ছে—বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এতগুলি বাড়ির হাঁড়ির খবর কে আর স্বচক্ষে দেখে এসে অধিক বলতে পারে ? হ্যাঁ, সে কাজ একমাত্র পারে এবং যদি দয়া করে—সে হলো কালো পাথরের কবি।

মালা বিশ্বাস তাদের দেখলো একদিন, টাউন সিনেমার ওপরের গ্যালারিতে। প্রথম সারিতে বসে আছে—পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা ও প্রীতি। গুণে গুণে তারা ঠিক চারজন। পাশে ও পেছনের সারিতে আরও অনেক মেয়ে বসে আছে। মালা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আছে একেবারে শেষ প্রান্তে—ঝকঝকে একটা আলোর ঝাড়ের নীচে।

মালা ভাল করে আর একবার দেখলো। হ্যাঁ, ঠিক ওবাই চাবজন। কিন্তু কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হলো ? আগে তো ওরা কেউ কাউকে ভাল করে চিনতোও না। আশ্চর্য, আজ ওরা এক হয়ে গেছে।

পেছনের সারিতে সেনপাড়ার মেয়েদের মধ্যে বসে আছে মুক্তি বায, মালারই স্কুলজীবনের বন্ধু। ওরা সকলেই ব্যস্ত, সবাই উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে সামনের সারির চারজনকে। মুক্তি রায় এক-এক করে চিনিয়ে দিচ্ছিল সকলকে—কে পূর্ণিমা, কে সুমিতা, কে সুধা...।

পূর্ণিমারাও চুপ করে ছিল না। ওদের আলাপ গল্পের উদ্বেল কলরব সমস্ত গ্যালারিকে চুপ

করিয়ে রেখেছিল। সকলেই আস্তে কথা বলে, শুধু পূর্ণিমারা ছাড়া। ওদের হাসি থামতে চায় না। একজনে বাদাম কেনে, চারজনে ভাগ করে খায়। ওরা তাকায় না কারও দিকে। সমস্ত গ্যালারির জনতা যেন প্রকাণ্ড একটা ছায়া মাত্র, শুধু ওরাই সজীব।

মালা একা পড়ে গেছে, তাকে কেউ দেখছে না। জীবনে বোধহয় এই প্রথম সে আড়ালে পড়ে গেল। এত প্রখর বিদ্যুতের বাতিটার নীচে বসে আছে মালা, অস্ট্রিচের পালকের বর্ডার দেওয়া মেরিনো পশমের জামা গায়ে, দু'ইঞ্চি লম্বা সোনার চেনে গাঁথা একজোড়া উদ্ভট প্যাটার্নের দুল দু'কান থেকে ঝুলে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে আছে। তবু কোন বিস্মিত বিরক্ত বা ধিক্কার ভরা দৃষ্টি কোন দিক থেকে তার দিকে তেড়ে আসছে না। মালা আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

ছবির অভিনয় আরম্ভ হলো। ক্ষান্ত হলো গ্যালারির কলরব। আলোগুলি নিভলো। পূর্ণিমাদের সারি থেকে এক-এক টুকরো হাসিভরা কলরব মাঝে মাঝে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো উছলে পড়ছিল। কে জানে, কোন সার্থকতায় ভরে উঠেছে ওদের জীবনের এই খুশিয়ালী রাত!

সিনেমার ছবি চোখের সামনে বৃথা ঝলসে পুড়ছিল। মালা ডুবেছিল তার মনের অন্ধকারে। কালো পাথরের সেই ভয়ঙ্কর কুৎসা, মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। মালা জানতো, এই গরবিনীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন ছবি! এ যে নতুন করে মান পাওয়া। ওদের চোখে মুখে সেই তৃপ্তির উল্লাস।

পেছনের মেয়েদের দৃষ্টি আর-এক তৃষ্ণার ছলনায় ছল ছল। ওরা তাকিয়ে আছে পূর্ণিমার দিকে—এক দুরধিগম্য মহিমালোকের দিকে। ওখানে আসন পেতে হলে ছাড়পত্র চাই, সে বড় কঠিন ঠাঁই।

কালো পাথরের কবি মরে যায়নি।

সেদিন মেয়েদের বাৎসরিক আনন্দমেলার অনুষ্ঠান। রাণী ঝিলের মাঠে বাঁশের জাফরি আর খেজুর-পাতার ঘেরান দিয়ে সারি সারি স্টল সাজানো হয়েছে। পথে যেতে সবাই দেখলো, বহুদিনের স্তব্ধ পাথরটা আবার মুখর হয়ে উঠেছে।

—মুক্তি রায়, অমন মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো ফুলবাগানের গাছের আড়ালে আর কতদিন থাকবে? আজকাল সব সময় হাতে ওটা কি থাকে? কাব্যগ্রন্থ? তোমার আসল কাব্য ভাল আছেন মজঃফরপুরে। আমার আর কি লাভ? শুধু যখন হেঁটে চলে যাও, তখন পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। বড় সুন্দর—তোমার চলার ছন্দ। মুখের দিকে তাকাতে ভাল লাগে না। স্নো-পাউডার দিয়ে কি চোখের কালি ঢাকা পড়ে! অসুখটা সারাবার ব্যবস্থা করো।

দলে দলে মেয়েরা এসেছে আনন্দমেলায়। মালা বিশ্বাসও এসেছে। আজ তার বেশভূষার কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দীনতা। একটা সাধারণ মিলের শাড়ি, আঁচলটা আধ হাত ছেঁড়া। দেশী ছিটের একটা আধময়লা ব্লাউজ। পায়ে জুতো নেই, চোখে নেই চশমা।

চন্দ্রার দিদিরা একটা স্টল নিয়েছে। হরেক রকম ফুলের তোড়া আর বুকে বিক্রি হচ্ছে সেখানে, এক আনা একটি। স্কটিশ মিশনের মেয়েরা খুব ভিড় করেছে সেখানে, তোড়া কেনার জন্য। মালা সেখানে সামান্য একটু দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে চললো।

মালতীরা একটা স্টল নিয়েছে, ঘরে তৈরি নানারকম জ্যাম জেলী আর চাটনী ভরে সাজিয়ে রেখেছে। সেখানে কোন ভিড় নেই, তবু মালতীর অনুরোধে একবার দাঁড়িয়ে এক শিশির দাম ছ'আনা পয়সা রেখে দিয়ে মালা বলে গেল, ফেরবার সময় নিয়ে যাবে।

মালার চোখে পড়েছে একটু দূরেই রাণুদের ম্যাজিকের স্টল। ভিড় সেখানেই সবচেয়ে বেশি। নবীনা প্রবীণা সকলেই সেখানে দলে দলে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। কী এমন

আকর্ষণ আছে রাণুদের স্টলে ?

আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে এল, হ্যাঁ কারণ আছে। সেখানে বসে আছে পূর্ণিমাদের দল। আজ তাদের মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুক্তি রায়। পূর্ণিমারা সবাই খুশি হয়ে ম্যাজিক দেখছিল, আর অন্য সবাই দেখছিল পূর্ণিমাদের।

মালার চলার বেগ শান্ত হয়ে এল। ওদিকে এদিকে যেতে ওর বুকটা যেন দুক দুক করছে আজ। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। তার ছেঁড়া কাপড়, খালি পা, নোংরা ব্লাউজ। নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবে সবাই, পূর্ণিমারাও দেখবে।

হঠাৎ পাশে অনেকগুলি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে চিৎকার করে ডাকলো, মালাদি ! মালাদি !

মালা মুখ ঘুরিয়ে দেখলো অনুপমা ডাকছে তাদের চায়ের স্টলে। সবাই মিলে চিৎকার করে মালাকে চা খেতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

কি ভেবে নিয়ে মালা স্টলের ভেতরে গিয়ে বসলো। পর পর তিন কাপ চা খেল। অনুপমারা খুব খুশি। বয়স্কাদের মধ্যে কেউ তাদের এক কাপ চা খেয়েও অনুগৃহীত করেনি। কত চেনা অচেনা মহিলাদের হাত ধরে ওরা টানাটানি করেছে, কিন্তু কারও হৃদয় গলেনি।

অনুপমা মানুষ জাতির ওপর তাই চটে গেছে। ম্যাজিকেব স্টলের দিকে তাকিয়ে চড়া মেজাজে বলে, বুঝলে মালাদি, আমাদের দোকানের সব বিক্রি মাটিয়ে করে দিয়েছে রাণুদি। কাঁচা আম জলে ডুবিয়ে দেখাচ্ছে আম নেই। ছাই ম্যাজিক, ওটা তো চিনির তৈরি 'আম।

মালা—রাণু তোমাদের দোকানের বিক্রি মাটি করেনি।

অনুপমা—তবে কে ?

মালা—করেছে. .।

উত্তর দিতে গিয়ে মালা হঠাৎ সামলে গেল। অনুপমার মতো এতটুকু একটা মেয়েকে অবাক করে দিয়ে আর লাভ কি ?

চায়ের স্টলের সামনে দিয়ে কতজন আসছে যাচ্ছে। মালা আজ জোর করে সকলের চোখের ওপর ভেসে রয়েছে। তবু যেন তাকে কেউ লক্ষ করছে না। একটু দূরেই বসে রয়েছে পূর্ণিমারা। খুবই ইচ্ছে করেছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে। আজও ভিড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সবাই তাকিয়ে দেখবে তার এই ছেঁড়া ময়লা সাজ তাব নিরাভরণ জীবনের চরম বিনতি। এই তো দেখবার মতো একটা নতুন জিনিস। কিন্তু যদি কেউ না তাকায়, এই আবেদনও যদি ব্যর্থ হয় ' মালার সাহস হলো না।

মালা যেন আভাসে দেখতে পাচ্ছে—এই মেলার ভিড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মতো অসাধারণ। একদল রয়েছে, রাণু অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মতো সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন--মালা বিশ্বাস সাধারণের নীচে। তার এতদিনের আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সেবক সমিতির বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে আবার। সেক্রেটারি ননীবাবু বললেন—একটা দুঃখের কথা বলবো আজ।

ননীবাবুর গলার স্বরে বোঝা গেল, অদ্ভুত কিছু-একটা ঘটেছে। সভ্যেবা কৌতূহলী হয়ে নীনবাবুর মুখের দিকে তাকালো। ননীবাবু টেবিলের আলোটার গায়ে বই মেলে দিয়ে তাঁর চিন্তিত মুখের ওপর যেন আরো খানিকটা অন্ধকার মেখে নিলেন।

—তোমাদের গ্যারান্টি দিতে হবে, একথা আমাদের ক'জন ছাড়া বাইরের কোন জীবের কানে পৌঁছবে না। সে ধরা পড়ে গেছে কালো পাথরের লেখাগুলি যার কুকীর্তি। এ কাজ করেছে চৌধুরী মশাই।

কথাগুলি যেন মাথায় হাতুড়ি মেরে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করে বসলো। প্রিয়তোষের রাগ

হলো—আপনি কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন ?

ননীবাবু—ইয়েস্। যারা দেখেছে স্বচক্ষে, তারাই বলেছে।

প্রিয়তোষ—কে স্বচক্ষে দেখেছে ?

ননীবাবু—তাদের নাম বলতে আমি বাধ্য নই।

ননীবাবুর চোখ দুটো মিট মিট করে এক দুর্বোধ্য প্রদীপের মতো জ্বলতে লাগলো।

সেবক সমিতির দায়িত্ব সমাপ্ত হলো এইখানে। কিন্তু এই উদ্ভট অকল্পেয় তথ্যটা প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে গোপন করে রাখা সম্ভব হলো না। দু'দিনের মধ্যেই সকলে জানলো, বার লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে শুকদাসের ঘড়ির দোকান পর্যন্ত। যে শোনে সেই লজ্জা পায়, আপত্তি তোলে এও কি সম্ভব ?

তবু এই বিশ্বাসের সম্পদ হারাতে কেউ রাজি নয়; হোক না শোনা-কথা। শোনা যাচ্ছে কেউ একজন স্বচক্ষে দেখেছে। তাহলেই হলো।

বিশ্বাস বাড়ির জানালায় সেই অচঞ্চল মূর্তিও আর দেখা যায় না। ক্রসরোডের কালো পাথরে আর লেখা পড়ছে না। শহরের উৎসাহে মন্দা পড়েছে। জমাট গানেব মাঝখানে হঠাৎ যেন সুর ছিঁড়ে গেল।

আজকাল ঘরের ভেতরেই থাকতে ভালোবাসে মালা। বাইরেব পৃথিবী, সেখানে মানায় পূর্ণিমাদের। ওরা অঘ্রাণের তারা, সন্ধ্যা সকাল ওদেবই শুধু দেখতে হয়।

সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে এনে সংসাব ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা—কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা কলুষও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর সকল কামনাব সীমানার ওপাবে, এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িযে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।

মালা নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে। সব দেখা আর দেখা দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কোন সত্য নেই। পৃথিবীব চোখের ওপব নিজেকে যে এতদিন অকুণ্ঠভাবে সঁপে দিয়ে এসেছে, সেই মুছে গেল আজ।

এই বুঝি দুনিয়ার রীতি !

জানালার খড়খড়ি দিয়ে পড়ন্ত রোদের একফালি ঘরে এসে পড়েছিল। আনমনে জানালাটা খুলে দিয়েই মালা বন্ধ করে দিল আবার।

আয়নার সামনে বসেছিল মালা। নিজের চেহারা চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আর বুঝতে বাকি নেই, এ চেহারা যদি গ্রহের মতো আকাশে ভেসে বেড়ায়, তবুও চোখ তুলে কেউ তাকাবে না।

এক এক সময় মালা চেষ্টা করেও তার অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারে না। মনে হয় বাইরের বাতাসে নিঃশ্বাস না নিলে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তবু জোর করে কপাটে খিল এঁটে দেয়—কোন পলাতকার পায়ে যেন বেড়ি পরিয়ে তাকে সবলে ধরে রাখে।

সন্ধে হয়ে আসে, অনেকদিন পরে চাঁদ উঠেছিল আবার। মালা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝোড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। দৃশ্যটা ভালোই লাগলো মালার। মালা ডাকলো—রামজীবন, আমি বেড়াতে যাব এখনি।

সাজ-সজ্জার পর মালা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলো আয়নার সামনে। চোখের জলে দু'দুবার মুখের পাউডার ভিজে গেল। রামজীবন বার বার হাঁক দিচ্ছে। নিজেকে একরকম জোর করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল মালা।

রাণীঝিলের চারদিকে দু'দুবার ঘোরা হল, মাঠটা আড়াআড়ি দু'বার হাঁটা হলো। দিক ছাপিয়ে অন্ধকার আসছে। পূর্বে পশ্চিমে দেওদারের মাথা শিউরে উঠছে। বন জোয়ানের

গন্ধমাখা ধুলো ছিটিয়ে পড়ছে চারিদিকে। ঝড় আসছে। রামজীবনের হাঁক-ডাকে অগত্যা মালা ফিরলো ঘরের দিকে।

রামজীবন এগিয়ে গেছে কিছু দূর। মালা খুবই আস্তে আস্তে যেন টেনে টেনে চলেছিল। হ্যাঁ, এই যে ক্রসরোডের মোড়। এই তো সেই পাথর, অন্ধকারে যেন কারও প্রতীক্ষায় বসে আছে।

মালা থমকে দাঁড়ালো।

এই সেই পাথর, এই কলঙ্ক কীর্তনিয়ার প্রসাদে কত নগণ্যা গরীয়সী হয়ে উঠেছে। অপবাদ হয়েছে প্রশস্তি। কিন্তু এ পাথরের মনে সুবিচার নেই। এর সব চক্রান্তকে আজ একটি আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া যায়। কালো পাথরের কবিকে কেউ ধরতে পারেনি, মালা তাকে আজ নিঃশেষ করে দিতে পারে। সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারা যায় এইক্ষণে। মালা যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়লো পাথবটার ওপর। ব্লাউজের ভেতর থেকে টেনে বার করলো এক টুকরো খড়ি।

বিদ্যুৎ চমকাবার আগে, রামজীবনের হাঁক শোনার আগেই খড়ির আখরে এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা সাদা ফুলদলের মতো ছিটিয়ে পড়লো গায়ে।

—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার থাক্, বেচাবাদেব নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থিব হও।

মনভ্রমরা

মনভ্রমরা অর্থ মন নয়, ভ্রমরাও নয়। দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন-তখন গুন্‌গুন্ করে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা।

সেদিন কথাটার অর্থ আমরা এইরকম বুঝেছিলাম, কারণ এইরকমই বুঝতে শিখেছিলাম। কিন্তু শিখিয়েছিলেন যাঁরা, সেই সতুদা, হীরুদা আর কানুদারাও বোধহয় কথাটার সে-অর্থ আজ একেবারে ভুলে গিয়েছেন।

সেই অর্থটা ভুলে গেলেও সেই কথাটা কি তাঁরা ভুলে যেতে পেরেছেন? সেই মনভ্রমরার কথা?

আমার তো মনে হয়, মনে করিয়ে দিলে সতুদা নিশ্চয় এখনো মনে করতে পারবেন। কানুদা আর হীরুদাও নিশ্চয় আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে স্বীকার করবেন, হ্যাঁ, এখনো তাঁদের মনে আছে সেই কথা। মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে বৈকি। ওঃ, সে কত দিন আগেকার কথা!

অনেকদিন আগেরই কথা বটে। সেদিন আর আজ, মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময়ের ব্যবধান। আমারই মাথা আজ সাদা হয়ে গিয়েছে, আর সতুদা, হীরুদা ও কানুদার মাথার অবস্থা যা হয়েছে তা তো বোঝাই যায়।

সেদিন ঐ কথাটার অর্থ যা বুঝেছিলাম, তা তো বুঝেই ছিলাম। কিন্তু যেটুকু স্পষ্ট করে সেদিন বুঝতে পারিনি, আজ মনে হয়, সেটুকু যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। মনভ্রমরার অর্থ মনই বটে, তবে সে-মন হলো চৈত্র মাসের ভ্রমরার মতো, ভালবাসে গন্ধের ফুল, রঙের ফুল নয়। রঙ দেখে গুনগুনিয়ে গান হয়তো করে, কিন্তু গন্ধের কাছে ছুটে যাবার জন্য গুনগুনিয়ে

কাঁদে।

সতুদা সম্প্রতি মেধাতিথির মনু-টীকার এক দার্শনিক টীকা রচনা করেছেন। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে তাঁকে, কি বলে আপনার দার্শনিক মন ? আমার এই কাব্যিক ব্যাখ্যাটা কি ঠিক নয় ?

যাক গিয়ে এসব তত্ত্বের কথা। আজ সতুদার সঙ্গে দেখা হলে কোনরকম তত্ত্বের নাম করেও তাঁদের অতীতকালের কোন ছেলেমানুষী বাচালতার কথা তুলতে পারব না বোধহয়, তোলা উচিতও নয়। সেদিনের সেই ঘটনার অর্থ বুঝবার জন্য সতুদার মনে আজ আর কোন পুরানো অথবা নতুন দুশ্চিন্তা আছে বলেও মনে হয় না। কিন্তু আজকের এই মেধাতিথি সতুদার সেই ছেলেবয়সের মুখ থেকেই তো আমরা ঐ কথাটা প্রথম শুনেছিলাম। আর, সতুদাদের কথা থেকেই সেদিন আমরা বুঝেছিলাম যে, দেখতে বেশ সুন্দর যে-মেয়ে যখন-তখন গুন্‌গুন্ করে গান করে, তাকে বলে মনভ্রমরা।

সতুদারা ছিলেন দাদাদের দল, আর আমি ভুতো ও বলাই ছিলাম ভাইদের দল। আমাদের চেয়ে বয়সে ওঁরা ছিলেন পাঁচ-বছরের বড়। আমাদের বয়স তখন দশের উপর, আর ওঁদের বয়স তখন পনের'র উপর। তখন শুধু বেবিরা পড়ত ছোট স্কুলে। আমরা তখন মিডল স্কুল ছেড়ে সবেমাত্র হাইস্কুলে ঢুকেছি, আর সতুদারা হাইস্কুল ছেড়ে সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছেন। কাজেই সতুদা যখন তাঁর দলবল নিয়ে তাঁদের বাড়ির বাইরের ঘরে ক্যারম খেলতেন, তখন আমরা শুধু বাইরে থেকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে উকিঝুঁকি দিয়ে দেখতাম। বড়দের আড্ডার কাছে থাকা দূরে থাকুক, কাছাকাছি থাকারও অধিকার আমাদের ছিল না। জানালা দিয়ে খুব সাবধানে আর খুব নিঃশব্দে উকিঝুঁকি দিতে হতো। দেখতে পেলেই তেড়ে আসতেন সতুদা—ভাগ ভাগ ডেঁপোর দল। ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব, যদি দেখি আবার কখনো বড়দের আড্ডার কাছে গা ঘেঁষতে এসেছ।

তখনকার মতো ভেগে পড়লেও আবার ফিরে আসতাম, সেদিন না হোক আর একদিন, ঠিক সেই জানালার কাছেই দাঁড়াতাম, আর সতুদাদের ক্যারম খেলা দেখতাম।

এইভবেই একদিন শুনলাম—ক্যারম খেলার খুট্‌স-খুট্‌স হঠাৎ থামিয়ে সতুদা যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—আজও শুনলি তো হীরু ?

হীরুদা হাত গুটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন—কি ?

সতুদা—মনভ্রমরা গুন্‌গুন্ করে গান করছিল।

হীরুদা বলেন—শুনেছি, এই নিয়ে দশবার শুনলাম।

কানুদা বিস্মিত হয়ে বলেন—এর মানে কিছু বুঝতে পারছিস ?

সতুদা বলেন—কিছু একটা ব্যাপার আছে, নিশ্চয়ই আছে।

জানালার দিকে হঠাৎ সতুদা তাকিয়ে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ দিয়ে উঠে এসে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন ভুতোর ডান হাতের কব্জি। বললেন—কি রে বকাটে, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস ?

ভুতো আর্তনাদ করে—আপনাদের খেলা শুনছি সতুদা।

গর্জন করলেন সতুদা—খেলা শুনছিস ? কি শুনছিস বল ?

করুণ মুখ করে ভুতো বলে—খেলা দেখছিলাম সতুদা, কিন্তু শুনতে পাইনি।

হীরুদা উঠে এসে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রশ্ন করেন—সত্যিই কিছু শুনতে পাসনি তো ?

ভুতো বলে এবং আমরাও বলি—কিচ্ছু না হীরুদা।

ভুতোকে ছেড়ে দিলেন সতুদা এবং তখনকার মতো আমরাও জানালার কাছ থেকে সরে

গেলাম। কিন্তু সেদিন যে কথাগুলি ওদের মুখে প্রথম শুনলাম, ঠিক সেই কথাগুলিই আরও কয়েকবার ঠিক ঐভাবে নিঃশব্দে সতুদাদের ক্যারম খেলার ঘরে ঐ জানালার কাছেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে পেলাম এবং আমাদেরও আর বুঝতে বাকি রইল না যে ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদিই হলেন মনভ্রমরা।

কথাটা শুনে আমরা কিন্তু মনে মনে সতুদাদের উপর রাগই করেছিলাম। সুধাদি গুন্‌গুন্ করে গান করেন তো তোমাদের তাতে কি? গুরুজনের সম্পর্কে মনে কোন মান্যি নেই, যা-তা একটা নাম তৈরি করে দিলেই হলো!

ভুতো বলে—সুধাদি তো সতুদাদের গুরুজন নয়।

বলাই বলে—নিশ্চয় গুরুজন। সুধাদি সতুদাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

ভুতো বলে—সতুদারা তো আর সুধাদির কাছে পড়েননি। সুধাদি আসবার আগেই ওরা হাইস্কুলে চলে গিয়েছিল। ওরা আমাদের চেয়ে অনেক সিনিযর।

কথাটা ঠিকই বলেছে ভুতো। আমরা পড়েছি সুধাদির কাছে, কাজেই সুধাদির জন্য আমাদের মনে যে মায়া আছে, সে মায়া সতুদাদের সিনিয়র-মনে থাকবে কেন? মিডল স্কুলে যাবাব আগে ছোট স্কুলের শেষ বছরটা আমরা সুধাদির কাছেই পড়েছিলাম। সুধাদির সঙ্গে এখনো যে আমাদের কত ভাব আছে, তার কোন খবরই জানেন না ক্যারম-মার্কা সতুদা, হীরুদা আর কানুদা। বিকাল বেলা ওরা যখন বড় মাঠে হকি খেলে হাঁপায়, তখন আমবা সুধাদির সঙ্গে ছুটোছুটি করে ছোট স্কুলের মাঠে কাঠবিড়ালী ধরবার চেষ্টা করি। হকি খেলার শেষে ওবা যখন পয়সা খরচ করে মালাই বরফ কেনে আর খায়, আমরা তখন সুধাদির কাছ থেকে কুচো নিমকি নিই আর খাই। রবিবারের সকালে ওরা যখন মাঠের উপরে সাইকেল রেস খেলে, আমরা তখন ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে থাকি।

সে রবিবারের সকালবেলা ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর বসেছিলাম আমরা। রেস খেলার শেষে ছোট স্কুলের এই পাঁচিলের কাছ দিয়েই সতুদারা সাইকেল ছুটিয়ে চলে যাবার সময় আমাদের দিকে কটমট করে একবার তাকালেন। প্রশ্ন করেন সতুদা—তোরা এই সকালবেলাটা এই পাঁচিলের ওপর এরকম করে বসে রয়েছিস কেন?

আমাদের মধ্যে ভুতোরই সাহস সবচেয়ে বেশি। সতুদার প্রশ্নে বেশ একটু তাচ্ছিল্যের স্বরেই ভুতো জবাব দেয়—এই রকম করেই তো বসে থাকতে হয়।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক দাবিয়ে সাইকেল থামালেন সতুদা। সতুদার চোখ দুটো আরও কটমট করে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—না, এই রকম বাঁদরের মতো দল বেঁধে বসে থাকতে হয় না।

একটা ঢোক গিলে চুপ করে রইল ভুতো। আমাদের সব কথার সাহস সতুদার ঐ একটি ধমকেই ফুরিয়ে গেল। সতুদাও তাঁর চোখের কটমটানি একটু শান্ত কবে নিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে ঠেলা দিলেন। হেলেদুলে আস্তে আস্তে তাঁর রেস-ক্লান্ত সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন, আমরাও হাঁপ ছাড়লাম।

সতুদারা সত্যিই জানেন না, কেন আমরা সকালবেলাটা ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে আছি, তাই ওরকম একটা গালি দিয়ে চলে গেলেন। আমাদেরও একটা খেলা আছে, যার জন্য এইভাবে অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে এই পাঁচিলের উপর বসে থাকতে হয়। তাকিয়ে থাকতে হয় বড় মাঠের এদিকে ওদিকে, অনেক দূরের দিকেও। এ খেলা শেষ হবার পর আমরাও মালাই বরফ কিনি আর খাই, কারণ এ খেলার পর আমাদের পকেটে কিছু পয়সাও আসে—কোনদিন তিন আনা, মাঝে মাঝে দু' আনা, আর বেশির ভাগ দিনই এক আনা।

মিডল স্কুলে গিয়েও যে ছোট স্কুলের এই পাঁচিলটার মায়া আমরা ছাড়তে পারিনি, তার

কারণ হলো এই বিশেষ খেলাটা। সতুদাদের মতো সিনিয়রেরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না যে, এই রকমের একটা খেলা করা যায়, আর সে খেলায় আবার পয়সা হয়।

জানেন সুধাদি। সতুদারা জানেন না যে, মনভ্রমরা বলে যাকে তারা ঠাট্টা করেন, সেই সুধাদির জন্যই আমরা এখন এই পাঁচিলের উপর চুপ করে বসে অপেক্ষা করছি। আমাদের খেলার সব খবর জানেন সুধাদি। তিনিই তো আমাদের রবিবারের সকালবেলার এই খেলা দেখতে দেখতে হেসে গড়িয়ে পড়েন। হাততালি দেন সুধাদি এবং তাঁর ঐ হাসি আর হাততালির জন্য আমাদের সাহস আর উৎসাহ কখনো খান্ত হয় না। সুধাদি এলেই আমরা বড় মাঠে নেমে পড়ব, আর খেলা শুরু হয়ে যাবে। মাঠের দিকে তাকিয়ে আজ আবার অনেকদিন পরে আমাদের বহুদিনের লক্ষ্য ও লোভনীয় সেই বুড়োকে দেখতে পেয়েছি।

বুড়োর সামনের পা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা, পিছনের পা দুটো স্বাধীন। মনের সুখে ঘাড়ের ঝাঁকড়া রোঁয়া দুলিয়ে মাঠের নতুন দূর্বা খাচ্ছে বুড়ো। বুড়োর কানের কাছে একটা ফড়িং ফরফর করছে। তাই মাঝে মাঝে ছটফট করে উঠছে বুড়ো। মাথা ঝেঁকে কান নেড়ে ফড়িং তারায় বুড়ো, তার পরেই কুঁড়ে ব্যাঙের মতো একটা লাফ দিয়ে সবে যায়। আবার মনের সুখে দূর্বা খায় বুড়ো। প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা, ঐ বুড়োকে আজ ধরতেই হবে। ধরতে যদি পারি, আর *ঠেলেঠুলে* কোনমতে কানি-হাউসে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারি, তবে আজ আমাদের রোজগার হবে তিনটি আনা। কম নয়—তিন আনাতে এবেলা আর ওবেলা, দু'বেলারই মালাই বরফ হয়ে যায়।

কানি-হাউস মানে মিউনিসিপ্যালিটির খোঁয়াড়, যার ইজারা নিয়েছে ছেদি মিঞা। ফোলা-ফোলা দুটো গোদা পা আর শুকনো ঝিরকুট শরীর, চোখে সুরমা দেয়, সেই ছেদি মিঞা। ছেদি মিঞার চোখ কানা নয়, তাই বুঝতে পারি না, এই খোঁয়াড়ের নাম কেন হলো কানি-হাউস?

বড় মাঠের চরন্ত জন্তুগুলিকে আমরা ধরতাম, আর কানি-হাউসে নিয়ে গিযে জমা দিতাম। এই ছিল আমাদের খেলা।

ছেদি মিঞা জিজ্ঞাসা করত—কোথায় পেলে এই জানোয়ার, কার কি ক্ষতি করেছে এই জানোয়ার?

ছেদি মিঞার প্রশ্নে ঘাবড়ে গিয়ে আমরা চুপ করে তাকিয়ে থাকতাম। বুকের ভিতরটা দুরদুর করত। ছেদি মিঞা মুখ ভেংচিয়ে হেসে হেসে ধমক দিত—স্কুলের ফুলগাছ খেয়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে এই জানোয়ার, তাই না?

আমরা বলতাম—হ্যাঁ, তাই তাই।

ছেদি মিঞা বলত—তাই বলতে হয়, বুঝলে?

জানোয়ার জমা করে নিত ছেদি মিঞা। কলম তুলে নিয়ে খরখর করে খাতার উপর কি-সব লিখত। তার পরেই পয়সা দিত। টাট্টু ঘোড়া হলে তিন আনা, গাধা হলে দু'আনা আর ছাগল হলে এক আনা। আমরা দেখতাম,—ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে খোঁয়াড়ের মস্ত বড় কাঠের দরজাটা খুলে গেল, আর বিনা অপরাধের সেই জন্তুগুলি আমাদেরই মিথ্যা কথার চাতুরীতে অভিযুক্ত হয়ে হাজতী কয়েদীর মতো সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অন্তর্হিত হলো।

সুধাদিকেই আমরা জিজ্ঞাসা করতাম—এ খেলায় পাপ হচ্ছে না তো সুধাদি?

সুধাদি বলতেন—হচ্ছে বৈকি।

ভয় পেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করতাম—তাহলে এই পাপের কি উপায় হবে সুধাদি?

হেসে ফেলতেন সুধাদি। বলতেন—উপায় তো আমিই আছি!

—তার মানে?

প্রথম প্রথম বুঝতে না পারলেও পরে সবই জেনেছিলাম আর বুঝেও ফেলেছিলাম। সুধাদির কাছেই এসেছিল লছমনের মা, এসেছিল রজ্জাক ধুপী—যার ছাগল আর যার গাধা আমরা খোঁয়াড়ে জমা দিয়ে এক-আনা আর দু' আনা রোজগার করেছিলাম, তাদেরই হাতে দু'আনা আর চারআনা পয়সা দিয়ে সুধাদি আমাদের পাপ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পয়সা দিয়ে তাদের ছাগল আর গাধা খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল লছমনের মা আর রজ্জাক ধুপী। সুধাদি সত্যিই সুধাদি। তাবপর থেকে পাপেব ভয় ছেড়ে দিযেই আমবা ঐ খেলা খেলতাম, কারণ পাপ কাটাবার উপায় ছিলেন সুধাদি।

পাঁচিলের উপর বেশিক্ষণ বসে থাকতে হযনি। এলেন সুধাদি, জিজ্ঞাসা কবলেন—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার খুব ভাল সুধাদি। হবিদা'র বুডোকে আজ আবাব হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছে।

হরিদা'র টাট্টু ঘোড়া, তারই নাম বুড়ো। অনেকদিন অনেক চেষ্টা করেছি বুড়োকে ধরবার জন্য। কিন্তু বুদ্ধিতে কি ভয়ানক ঝানু ঐ বুড়ো টাট্টুটা। যেন আমাদের ছায়ার শব্দও শুনতে পায় বুড়ো। কতবার চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছি বুড়োকে, কিন্তু প্রত্যেকবার ঐ বাঁধা-পা নিয়েই মুহূর্তের মধ্যে তিন লাফে যেন বাতাসে ঘাই মেরে পালিয়ে গিযেছে বুড়ো। আমাদের সব ধৈর্য সতর্কতা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে।

মাঠের উপর নিশ্চিন্ত মনে চরন্ত টাট্টু ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন সুধাদি। বললেন—আজ কিন্তু যেমন করেই হোক্ ধরা চাই হরিদা'র ঐ বুড়োকে। পারবে তো ?

আমরাও বললাম—পারতে হবেই সুধাদি। আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি।

অনেক হাসলেন সুধাদি, অনেক হাততালি দিলেন, আর আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু হরিদা'র বুড়োকে ধরতে পারা গেল না। সেই রকমই তিন লাফে ঘাই মেরে পালিয়ে গেল বুড়ো। মাঠ পার হয়ে সড়কের উপর উঠে আর ঘাড়ের রোঁয়া ঝাঁকিয়ে পিছনের মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। না, আজ আর কোন চান্স পাওয়া যাবে না।

সুধাদি বললেন—ছি ছি, হরিদা'র বুড়োর কাছে আবার হেরে গেলে ?

একে তো হাঁপাচ্ছিলাম, তার উপর আবার ছি ছি করলেন সুধাদি। বড় বেশি দমে গেলাম। তবু বললাম—আর একদিন চান্স পাওয়া যাবেই সুধাদি।

সুধাদি নিজেই তখনি আবার নতুন উৎসাহে হেসে উঠলেন। বললেন—আবার চান্স পাওয়া যাবেই। আর হরিদাকে জব্দ করতে হবেই।

হ্যাঁ, হরিদাকে জব্দ করতেই হবে। এ শহরের সবাই হরিদাকে জব্দ করে আনন্দ পায়, শুধু আমরাই আজ পর্যন্ত সে আনন্দ পাইনি। শুধু তিন আনা পয়সার লোভ নয়, বুড়োকে ধরবার জন্য আমাদের এই আগ্রহের মধ্যে আর একটা জিনিস আছে, হরিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা।

হরিদাকে সতুদারা বলেন, জন গিলপিন হরি। মাথার উপর মস্ত বড় এক শোলার হ্যাট চাপিয়ে আর মালকোঁচা মেরে এই টাট্টু বুড়োর পিঠের উপর সওয়ার হন হরিদা। টাট্টুর পিঠের এক পাশে ঝুলতে থাকে চটে জড়ানো একটা ওষুধের বাক্স, আর অপর পাশে হরিদা'র কম্বল-জড়ানো বিছানা ও একটা ঘটি। শহরের বুকের উপর দিয়ে এইভাবেই সড়কের যত কুকুরকে রাগাতে রাগাতে শহরের বাইরের অনেক দূরের গাঁয়ে ডাক্তারি করতে চলে যান হরিদা, ফেরেন একদিন দু'দিন বা এক সপ্তাহ পরে।

হরিদাকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব তো ? ক্লান্ত হয়ে পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে ঘাসের উপর বসে আমরা এই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে দিলেন না সুধাদি,

বললেন—চলো বেড়িয়ে আসি।

বলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাদি। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপরেই বললেন—নাঃ থাক্‌গে।

আমরা জানতাম, এই কথাই বলবেন সুধাদি। সেই যে কবে বাসন্তী পূজার দিনে আমাদের সঙ্গে একবার বেড়াতে বের হয়েছিলেন সুধাদি, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনদিনই বের হলেন না।

সেই বাসন্তী পূজার দিন বড় সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুধাদির সঙ্গে আমরা ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বড় সুন্দর সাজ করেছিলেন সুধাদি। একে তো দেখতে খুবই সুন্দর, এ শহরের সব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর সুধাদি, তার উপর অমন সুন্দর একখানা চাঁপা রঙের শাড়ি পরে কি সুন্দরই যে সেদিন হয়ে উঠেছিলেন, সেটা আমরা পথে বের হয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

হীরুদাদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে অমন স্টাইলের পুঁটিদিও গম্ভীর হয়ে, বোধহয় একটু রাগ করেই তাকিয়ে দেখেছিলেন সুধাদিকে। কানুদাদের বাড়ির কাছে পৌঁছতেই দেখেছিলাম, চারুমাসী পর্যন্ত ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, আর হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। সবচেয়ে বেশি গর্ব আমাদের। আমরাই প্রত্যেক বাড়ির বারান্দা আর জানালার দিকে তাকিয়ে শহরের যত দিদি মাসী আর খুড়িমাদের লক্ষ করে সুধাদির পরিচয় শুনিয়ে যাচ্ছিলাম—সুধাদি, বেবিদের ছোট স্কুলের দিদিমণি সুধাদি।

পলাশতলার কাছে পৌঁছতেই দেখেছিলাম, শান্তিদা বসে বসে একমনে ছবি আঁকছেন। হঠাৎ হাতের তুলি থামিয়ে সুধাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শান্তিদা। শান্তিদার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন সুধাদি। দেখলাম, যেন হঠাৎ পলাশ ফুলের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে সুধাদির মুখের উপর। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সুধাদি। ভুতোর কাঁধে হাত রেখে ব্যস্তভাবে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন—চলো, এখান থেকে চলো।

সেই যে চলে এলাম, তারপর আর কোনদিন সুধাদির সঙ্গে চলবার সুযোগ পাইনি। তাই আজ আবার বললাম—চলুন না সুধাদি।

সুধাদি বললেন—যাব কোথায় রে ভাই?

—চলুন না, সেদিনের মতো ঐ পলাশতলা পর্যন্ত গিয়ে...।

আমরা আর কথা শেষ করতে পারলাম না। ডাকপিওন এসে সুধাদির হাতে একটা খামের চিঠি দিয়ে চলে গেল। রঙিন খামের এক কোণে একটা ফোটা পলাশের ছবি।

যদিও সুধাদি কোনদিনও বলেননি, কিন্তু, আমরা বুঝি, এই রঙিন চিঠি আসে ঐ পলাশতলা থেকেই। প্রায়ই আসে চিঠি। এবং আর এক রকমের রঙিন খামের চিঠি এদিক থেকেও চলে যায় ঐ পলাশতলার দিকে।

সুধাদির অন্য সব চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসে হয় স্কুলের মালী, না হয় আমি কিংবা ভুতো কিংবা বলাই। কিন্তু এই রঙিন চিঠি সুধাদি নিজের হাতেই ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসেন। বেশি দূরে নয় ডাকবাক্স। ছোট স্কুলের ফটক থেকে বড়জোর দশ গজ দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লালরঙের ডাকবাক্স। ডাকবাক্সের ঠিক অপর দিকে রাস্তার ওপাশে এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে একটি ঘর হলো জন গিলপিন হরিদা'র। হরিদা'র ঘরের জানালার কাছে একটা পেয়ারা গাছ। সেই পেয়ারা গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকে হরিদা'র প্রিয় টাট্টু অর্থাৎ বুড়ো।

বুঝতে পারি, পলাশতলার দিকে বেড়াতে যাবার আর কোন দরকার নেই সুধাদির। শান্তিদার রঙিন চিঠির ভিতর দিয়ে পলাশতলাই এখানে আসে। সুধাদিরও যত চাঁপা রঙের

কথা এখান থেকে রঙিন চিঠির ভিতর দিয়েই পলাশতলায় পৌঁছে যায়।

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়লেন সুধাদি। পড়া শেষ করে নিজের মনেই গুন্‌গুন্‌ করে বলে উঠলেন—পলাশের স্বপ্ন কি বৃথা হবে! চম্পার ঘুম কি ভাঙবে'

ভুতো জিজ্ঞাসা করে—কি বলছেন সুধাদি ?

সুধাদি বলেন—কিছু না। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

আমি ও বলাই একসঙ্গে বলি—বলুন।

—টাউন ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে কয়েকটা কবিতার বই আমার জন্য এনে দিতে হবে। পারবে তো ?

বললাম—নিশ্চয়ই পারব।

রবিবারের সকাল শেষ হলো। আমরাও ছোট স্কুলের ফটক পাব হয়ে বাড়ির দিকে চললাম। শুনতে পেলাম গুন্‌গুন্ করে গান করছেন সুধাদি।

সেদিন সন্ধ্যায় সতুদাদের ক্যারম-খেলার ঘরে উঁকি দিতে এসে আমি, ভুতো আর বলাই শুনতে পেলাম, সতুদা বলছেন—আজও আবার শুনলি তো হীরু ?

হীরুদা বললেন—কি ?

সতুদা—মনভ্রমরা গুন্‌গুন্ কবে গান কবছিল।

হীরুদা বলেন—হ্যাঁ শুনেছি, এই নিয়ে এগার বাব হলো।

কানুদা বলেন—সত্যিই কি যেন হয়েছে মনভ্রমরাব, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

অনেকগুলি রবিবারের সকাল পার হয়ে গেল, তবু হরিদা'র বুড়োকে ধরবার সুযোগ পেলাম না। বুড়োর পিঠের উপর জন গিলপিন হয়ে হরিদা ডাক্তারি করতে কখন যে চলে যান, আর কখন যে ফিরে আসেন, কিছুই জানতে পারছি না। ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগে একবার হরিদা'র ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘরের দরজার কড়ায় তালা ঝুলছে। হরিদা নেই, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়োও নেই! নিরাশ হয়ে স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসি, বড় মাঠের দিকে তাকাই। দু' একটা টাট্টু আর ছাগলকে চরতেও দেখা যায়। কিন্তু এগুলিকে ধরতে মনের ভিতর থেকে আর খুব বিশেষ উৎসাহ পাই না। চেষ্টা করলে ওগুলিকে এখনি ধরতে পারি। কিন্তু তাতে দু'আনা একআনা হলেও এবং মালাই বরফে পেট ঠাণ্ডা হলেও হরিদা'র বুড়োকে না ধরা পর্যন্ত মন ঠাণ্ডা হবে না।

সবাই জব্দ করে যে হরিদাকে, সেই হরিদাকে জব্দ না করলে যে আমাদের মনের একটা প্রতিজ্ঞাও জব্দ হয়ে যায়। বার বার ছি ছি করবেন সুধাদি, এই গ্লানি বার বার সহ্য করাও যায় না।

এক সারি দোকান ঘরের মধ্যে ঐ ঘরটাতেই থাকেন হরিদা। পথ দিয়ে যাবার সময় কতবার দেখতে পেয়েছি, ঘরের ভিতর রান্না করছেন হরিদা, আর পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিচালি চিবোচ্ছে আর কান নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে বুড়ো।

হরিদা যে কি ধরনের মানুষ, আর কি ধরনের ডাক্তারি করেন, তার বিশেষ কিছুই খবর রাখি না আমরা। শহরের এতগুলি ভদ্রলোকের মধ্যে বোধহয় কেউ-ই সে খবর রাখেন না। হরিদা'র মুখটা দেখতে বেশ, যদিও রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে। কুঁয়োতলার কাছে যখন আদুড় গায়ে স্নান করেন হরিদা, তখন কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে হরিদা'র চেহারাকে। হরিদাকে দেখতে অভিশাপে বনবাসী রাজপুত্তুরের মতোই মনে হয়, শুধু শরীরটা রোদে জলে খেটে খেটে একটু ময়লা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু হরিদা নামে একটা মানুষ থাকে এই শহরে, এটা যেন স্বীকার করতে চায় না এই

শহর। কোনদিন কোন বিয়ে-বাড়ির নিমন্ত্রণে হরিদাকে দেখতে পাইনি। কোন উৎসবেই হরিদাকে নিমন্ত্রণ করবার কথা কখনো কোন ভদ্রলোকের মনেও পড়ে না। পথ দিয়ে যাবার সময় চারুমাসী যে-কোন ভদ্রলোককে দেখতে পেলেই মাথার কাপড় টেনে বড় করেন, কখনো বা ঘোমটা টানেন, কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েই দেখেছি, হরিদাকে দেখতে চারুমাসীর মাথার কাপড় নির্বিকার হয়েই থাকে। হাত দিয়ে মাথার কাপড়টা একটু স্পর্শ করবার চেষ্টাও করেন না চারুমাসী। সতুদাকে দেখেছি, সাইকেল থেকে নেমে এক লাফে হরিদা'র ঘরের দরজার কাছে এসে বলেন—দেশলাইটা একবার দাও তো জন গিলপিন। বয়সে এতবড় হরিদা, তবু তাঁরই কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাঁর সামনে সিগারেট ধরিয়ে নিতে সতুদার একটু বাধে না। পথ দিয়ে যেতে এস-ডি-ও সাহেবের মোটর গাড়ি বিকল হয়ে গিয়েছিল। হরিদাকে দেখতে পেয়েই ডাক দিলেন এস-ডি-ও—এই ইধার আও, গাড়ি ঠেল। সতুদাকে যেমন কোন কথা না বলে দেশলাই এগিয়ে দেন হরিদা, ঠিক তেমনি কোন কথা না বলে গাড়িও ঠেলে দিলেন। সামনের বাড়ির অক্ষয়বাবুর বাচ্চা ছেলেটা যখন না ঘুমিয়ে চেঁচাতে থাকে তখন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী বাচ্চাকে শান্ত করার জন্য হরিদা'র ঘরের দিকে তাকিয়ে বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়েই বলতে থাকেন—চুপ চুপ চুপ, বাঘে ধরেছে হরিকে, মস্ত বড় বাঘ। বড় বড় থাবা দিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে হরিকে। চুপ চুপ চুপ।

এই রকমেই তুচ্ছ হয়ে আছেন হরিদা। সম্ভ্রম দূরে থাক, হরিদার যেন অস্তিত্বও নেই। যেটুকু আছে সেটুকুও বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে একেবারেই শেষ করে দিচ্ছেন অক্ষয়বাবুর স্ত্রী। কিন্তু সকলের কাছে এত জব্দ হয়েও হরিদা যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমাদের কাছে কখনই জব্দ হবেন না। হাতের কাছে পাচ্ছি না হরিদা'র বুড়োকে, আর দিনগুলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

সুধাদি পড়ছিলেন রঙিন চিঠি। আমারা এসে বললাম—আজ কোন চান্স পাওয় যাবে না সুধাদি। হরিদা তাঁর বুড়োকে নিয়ে গাঁয়ের দিকে ডাক্তারি করতে চলে গিয়েছেন।

আমাদের কথাগুলি বোধহয় শুনতে পেলেন না সুধাদি। চিঠি পড়া শেষ হলেই নিজের মনে গুন্‌গুন্ করে বলে উঠলেন—সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।

বুঝতেও পারলাম না কিছু। তবে এইটুকু বুঝলাম যে, সুধাদি ঐ রঙিন চিঠিরই কোন একটা কথাকেই গুন্‌গুনিয়ে বলছেন।

উঃ, এত চিঠিও আসে, আর চিঠিতে এত কথাও থাকে, আর পলাশতলার শান্তিদার মনে এত কথাও ছিল?

সুধাদির মনে ঐরকম আর কি-কথা ও আর কত কথা আছে জানি না। কিন্তু দেখছি তো, সুধাদিও সমানে চিঠি লিখছেন। কিরকম যেন মনে হয়, কিছুটা বুঝতেও পারি, তারপর আর কিছু বুঝতে পারি না।

আজ দেখলাম, সুধাদি আমাদের সামনে বসে চিঠি লিখলেন। আমরা যে কবিতার বইগুলি লাইব্রেরি থেকে এনে দিয়েছিলাম, তারই মধ্যে একটা বই তুলে নিয়ে একটা কবিতা বের করলেন সুধাদি। তার পরেই চিঠি লিখতে শুরু করলেন। দু'মিনিটের মধ্যেই চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেল।

রঙিন খাম বন্ধ করে নিয়ে তারপর সুধাদি আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন—পলাশতলার শান্তিদাকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন?

আমরা বলি—খুব চিনি সুধাদি। খুব ভালো লোক। যেমন চেহারা, তেমনি গুণ। আর তেমনি শৌখিন।

হেসে ফেললেন সুধাদি।—এত খবরও জান?

ভূতো বলে—অনেক টাকা আছে শান্তিদাব। সেদিন পথে যেতে যে গালাকুঠিটা দেখেছিলেন, ওটা শান্তিদারই গালাকুঠি।

আমি বলি—খুব ভাল ফটো তুলতে আব ছবি আঁকতে পাবেন শান্তিদা।

বলাই বলে—এ শহবে শান্তিদাব চেয়ে ভাল বেহালা বাজাতে আব কেউ পাবে না।

গুনগুন করতে করতেই হঠাৎ যেন আনমনা হয়ে চুপ কবে যান সুধাদি। বঙিন খামে বন্ধ চিঠিটাব দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আমাদেব মনে হয়, সুধাদিকেও যেন কি এক বঙিন খেলায পেয়েছে। শান্তিদাকে চেনেনও না, একদিনেব জন্য শান্তিদাব সঙ্গে একটি কথাও হয়নি সুধাদিব, তবুও কত বকম বঙেব কথা আব মিষ্টি কথাব আসা যাওযা চলেছে দু জনেব মধ্যে।

উঠে গিয়ে স্কুলেব ফটক পাব হয়ে ডাকবাক্সেব ভিতব চিঠিটা ফেলে দিয়ে এসে সুধাদি বলেন—বলো এবাব তোমাদেব খেলাব খবব কি? হবিদাকে জব্দ কববাব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছ বোধহয়?

আমবা বলি—ভুলিনি সুধাদি, কিন্তু আজ আব কোন ভবসা নেই।

সুধাদি—কেন?

ভূতো বলে—হবিদা'ব বুড়ো এখন শহবেব বাইবে।

সুধাদি—তাহলে কি করবে আজ?

বলাই বলে—আজ আব না-ই বা খেললাম সুধাদি। কাঠবিড়ালীব পিছু পিছু ছুটে আব লাভ কি?

সুধাদি হাসেন—তা'হলে আমাব একটা কাজ কবে দাও ভাই।

ঘবেব ভিতব গিয়ে বাক্স খুলে একটা কাগজ নিয়ে এলেন সুধাদি। তাব মধ্যে অনেকগুলি ওষুধেব নাম লেখা।

সুধাদি আমাদেব হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন—এই ওষুধগুলি আমাকে এনে দাও।

আমি প্রশ্ন কবলাম—আপনার কি কোন অসুখ কবেছে সুধাদি?

সুধাদি—হ্যাঁ, ক'দিন থেকে জ্বর হচ্ছে। এখন থেকেই সাবধান না হলে আমাকে আবার সেই ম্যালেবিয়ায় ধববে। আব ।

বলাই বলে—আর কি সুধাদি?

সুধাদি হেসে হেসে বললেন—আর তোমাদেব সুধাদির চেহাবা হয়ে যাবে ঐ লছমনেব মায়ের মতো, ঝিবঝিবে জিরজিরে কাঠিকাঠি।

কথাগুলি হেসে হেসে বললেও সুধাদিব চোখ দুটো কেমন ছলছল কবছিল। ভূতো ঘাবড়ে গিয়ে বলে—আপনাকে কেউ নজর দেয়নি তো সুধাদি?

সুধাদি বেশ জোবে হেসে ওঠেন—তাই হবে, নিশ্চয় কেউ নজব দিয়েছে।

ভূতোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পাবি, ভূতো ভাবছে, কে নজব দিল সুধাদিকে? জানতে পাবলে তাকে আচ্ছা করে ইটিয়ে ।

আমি বললাম—দিন সুধাদি, ওষুধেব নাম লেখা কাগজটা দিন, এখনি ওষুধ এনে দিচ্ছি।

সারা বিকাল আর সন্ধ্যা শহরের সব ওষুধের দোকানে ঘুবেও সুধাদিব ঐ ওষুধগুলি পেলাম না। কেউ বললেন, দশ দিন পরে পাওয়া যাবে, কেউ বললেন, একমাস পরে নতুন চালানের সঙ্গে আসবে। একজন বললেন, স্টেশনের বাজাবে যে ফার্মাসি আছে, সেখানে এই সব ওষুধ পাওয়া যাবে।

কিন্তু এ যে একটা সমস্যা! কে যাবে স্টেশনেব বাজারে? এখান থেকে তেব মাইল দূরে রেল-স্টেশন, পথের উপর আবার একটা ভয়ানক জঙ্গল। কাল সকালে সার্ভিস বাসে চড়ে

অবশ্য স্টেশনে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাবে কে ? যাবার অনুমতিই বা বাড়ি থেকে পাবে কে ?

সুধাদির ঐ সুন্দর চেহারাকে সুন্দর করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তারই জন্য তো আমাদের এত উদ্বেগ আর এত পরিশ্রম। কিন্তু সবই যে ব্যর্থ হলো, সুধাদির এই উপকারটুকু আমরা করতে পারব না, এটা একটা দুঃখ বৈকি।

সন্ধ্যার শেষে ছোট স্কুলে ফিরবার সময় দেখলাম, হরিদা ফিরে এসেছেন। রান্না করছেন হরিদা। টাট্টু বুড়ো পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

মুখ ভেংচে ভুতো বলে, হুঁঃ, আমাদের সব চান্স নষ্ট করে এতক্ষণে এত রাত করে মহাবাজ ফিরে এসেছেন'

সুধাদির কাছে এসে বললাম, ওষুধ পেলাম না সুধাদি। এখানে পাওয়া যাবে না, যেতে হবে স্টেশনের বাজারে।

সুধাদিও যেন একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন—তাহলে উপায় ?

ভুতো হঠাৎ বলে—একটা উপায় হতে পারে সুধাদি। হরিদাকে বললে নিশ্চয়ই এ-কাজটা করে দেবেন।

সুধাদি বললেন—বলে দেখ।

আমাদের সব কথা চুপ করে শুনলেন হরিদা। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তার পরেই হাত বাড়িয়ে ওষুধের নাম-লেখা কাগজটা আর পাঁচটা টাকা আমাদের হাত থেকে নিয়ে পকেটে ফেললেন হরিদা। বললেন—এখনি যাচ্ছি।

আমি বলি—এখনি কি করে যাবেন হরিদা ? এখন তো কোন গাড়ি নেই ?

হেসে হেসে হরিদা বললেন—আমার বুড়ো আছে, ওর চেয়ে ভাল গাড়ি হয় না।

বলাই বলে—এই রাত্রে ঐ ভয়ানক জঙ্গল পার হতে আপনার ভয় করবে না হরিদা ?

হরিদা বলেন—একটুও না।

বলাই প্রশ্ন করে—কি করে এরকম নির্ভয় হলেন হরিদা, আমাদের বলুন না ?

অনুরোধ শুনে হরিদা হাসতে থাকেন। তারপর বলেন—আমার কাছে অ্যাকোনাইট নামে একরকম ওষুধ আছে, এক ড্রপ খেলেই অন্তত চারঘণ্টার মতো মৃত্যুভয় থাকে না।

ভুতো বলে—এখন তাহলে ঐ অ্যাকোনাইট খেয়েই আপনি টাট্টু চড়ে জঙ্গলের পথে ।

হরিদা বলেন—হ্যাঁ, এখনই যাব।

সবাই উৎফুল্ল হয়ে দৌড়তে দৌড়তে স্কুল-ঘরে ফিরে এসে সুধাদিকে শুভ-সংবাদ জানালাম। হরিদাকে যা বলেছি, আর হরিদা'র কাছ থেকে যা শুনেছি, সবই বললাম সুধাদিকে।

শুনে হেসে ফেললেন সুধাদি। বললেন—হরিদাকে আর এক রকমের জব্দ করা হলো, তাই না ?

তারপরেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং তারপরে বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন সুধাদি। বললেন, যাই বলো, এরকম করে লোকটাকে জব্দ করা উচিত হলো না। এই রাত্রে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবে, যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তবে . ।

সুধাদি হঠাৎ কিরকম একটা রাগের সুরেই বলে ওঠেন—লোকটাকে বারণ করা উচিত ছিল তোমাদের।

বারান্দায় থামের গায়ে হাত দিয়ে আরও কি সব ভাবতে থাকেন সুধাদি। তারপর নিজের

মনেই বলে ওঠেন—লোকটাই বা কি-রকম ? বলা মাত্র ছুটে চলল ?

সুধাদির মেজাজ দেখতে ভালো লাগছিল না আমাদের। বললাম—আসি সুধাদি।

বাড়ি যাবার জন্য আমরা তৈরি হতেই সুধাদি বললেন—আমি কি করে জানব, লোকটা নিরাপদে ফিরল কি না ?

আমি বললাম—সকাল হলেই খোঁজ নেব সুধাদি।

সুধাদি বললেন—না, এত খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। যাও, এখনি গিয়ে হরিদাকে বারণ করে দিয়ে বলে এস, ওষুধ আনবার দরকার নেই।

দৌড়ে গেল ভুতো, আর ফিরে এসেই বলল—চলে গিয়েছেন হরিদা।

সুধাদি রাগ করে বললেন—রাত হয়েছে, তোমরাও বাড়ি যাও এবার।

বাড়ি ফিরবার সময় অনেক চিন্তা করেও ঠিক বুঝতে পারলাম না, সুধাদি এরকম রাগারাগি করলেন কেন ? প্রথমে তো বেশ হেসেছিলেন।

মনে হয়, সুধাদির সম্মানে খুব লেগেছে। যে হরিদা একটা মানুষ নয়, যে হরিদা হলো লোকের হাসি আর জন্দের জিনিস, সেই হরিদা'র কাছ থেকে উপকার নিতে সুধাদির লজ্জা করবে বৈকি। পলাশতলা থেকে রঙিন চিঠি আসে সুধাদির কাছে, তার উপকার করবে জন গিলপিন হরিদা, এটাও তো ভালো কথা নয়।

যাক, কোন রকম বিপদ-আপদ হয়নি। মৃত্যুভয়হীন হরিদা সকাল হতেই ওষুধ নিয়ে হাজির হলেন, আর আমি এক দৌড়ে সেই ওষুধ সুধাদির হাতে পৌঁছিয়েও দিলাম।

একটু পরেই এলো ভুতো আর বলাই। সুধাদি হেসে হেসে বললেন—আজ তো চান্স এসে গিয়েছে।

হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল, সুযোগ আবার এসেছে। হরিদা'র বুড়ো টাট্টুকে নিশ্চয় আজ বিকালবেলা মাঠের মধ্যে পাওয়া যাবে। পেলে আজ আর রক্ষা নেই।

সুধাদির হাসি দেখে খুশি হয়ে, আর আমাদের প্রতিজ্ঞাটা সুধাদির কাছে আর একবার ঘোষণা করে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। আর, সন্ধ্যা হবার আগেই ছোট স্কুলের পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম।

দেখে রাগ হলো মাঠে ঘাস খাবার জন্য আসেনি হরিদা'র বুড়ো। দু' চারটে ছাগলছানা শুধু চরে বেড়াচ্ছে। ঘরের কাছে গিয়ে সুধাদিকে ডাক দিয়ে বললাম—আজও চান্স হলো না সুধাদি।

সুধাদি হেসে ফেললেন—তোমাদের ভাগ্যটাই এই রকম।

দেখলাম, ফস্ করে একটা রঙিন খাম ছিঁড়লেন সুধাদি। এক মিনিটের মধ্যে চিঠি পড়া শেষ করলেন। ঝট করে একটা কবিতার বই খুললেন। তার পর দু' মিনিটের মধ্যে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।

শুধু চিঠি আর চিঠি। দেখতে আর ভাল লাগে না আমাদের। যেন পলাশতলায় আর এখানে দুটো চিঠির কল বসে রয়েছে। চেনা নেই, জানা নেই, মুখ দেখাদেখি নেই, তবু দু'দিক থেকে কতগুলি রঙিন লেখার খেলা চলছে।

সুধাদি জিজ্ঞাসা করেন—হরিদা'র সঙ্গে দেখা হতেই কি বললেন ?

আমি বললাম—বললেন, তোমাদের সুধাদি কেমন থাকেন, তার জ্বর কমছে কি না, আমাকে মাঝে মাঝে জানিয়ে যেতে ভুলো না ভাই।

সুধাদি বলেন—বলে দিও, খুব ভাল আছি, ওকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

তার পরেই বলেন—থাকগে, ওসব কথা ওকে বলা উচিত নয়, বলার দরকার নেই।

ভুতো বলে—তবে কিছু একটা বলতে হবেই তো সুধাদি।

সুধাদি—বলো, ভাল আছেন সুধাদি, ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অনেকক্ষণ ধরে আনমনাভাবে স্কুলেরই মাঠের ফুলগাছের পাশে পাশে পায়চারি করলেন সুধাদি। খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল সুধাদিকে। আমরা আবার দুশ্চিন্তায় পড়লাম। মনে হচ্ছে, আজও আমাদের সঙ্গে কোন খেলায় মেতে উঠবেন না সুধাদি।

আমরা নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছিলাম সুধাদির আশেপাশে। হঠাৎ সুধাদি বলে উঠলেন—আর ভাল লাগে না এই ছাই চাকরি। পঁচিশ টাকা তো মাইনে। ছেড়েই দেব এই চাকরি।

সত্যিই বুক কেঁপে উঠল আমাদের! সুধাদি চলে যাবেন, তবে ছোট স্কুলের এই পাঁচিল আর এই সব খেলার উপর কি আর কোন মায়া থাকবে আমাদের? কখনই না।

চুপ করে রইলেন সুধাদি। আমরা ধীরে ধীরে সরে পড়লাম।—আসি সুধাদি। বেশ জোরে কথাটা বললেও সুধাদি কোন সাড়া দিলেন না।

সমস্যায় পড়লাম আমরাই। সুধাদির চলে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। মাইনে কিছু বেশি করে দিলে সুধাদি নিশ্চয়ই চলে যাবেন না। কিন্তু আমরা কি আর তাঁর মাইনে বেশি করে দিতে পারি?

তিনজনে মিলে আলোচনা করে শেষকালো একটা বুদ্ধি বের করলাম। এলাম হরিদা'র কাছে। বললাম—সুধাদি ভাল আছেন, আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সেই রকমই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হরিদা, যেন একটা স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন। জীবনে এই বোধহয় প্রথম ধন্যবাদ পেলেন হরিদা। সত্যই তো, স্বপ্নেও নিশ্চয়ই এতটা আশা করতে পারেন নি হরিদা।

আমরা বললাম—সুধাদি কিন্তু চলে যাবেন।

চমকে উঠলেন হরিদা—কেন?

ভুতো বলে—পঁচিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করতে পারবেন না সুধাদি।

শুনে চুপ করে আর চোখ দুটো বন্ধ করে বসে রইলেন হরিদা।

বলাই বলে—কিন্তু একটা উপায় তো বের করতেই হবে হরিদা।

হরিদা বলেন—হ্যাঁ, দেখি কি উপায় হয়।

জয় হোক হরিদা'র! মনে মনে হরিদাকে জীবনে প্রথম সম্মান জানিয়ে আমরা যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

কিন্তু মাত্র একটি দিন আমাদের মনে এই জয়ের আশা বেঁচেছিল, মরে গেল পরের দিনই।

উকি দিয়েছিলাম সতুদার ক্যারম খেলার ঘরে।

সতুদা বলেছিলেন—শুনেছিস তো হীরু, জন গিলপিন কি কাণ্ড করেছে, আর তার কি ফল হয়েছে?

হীরুদা বলেন—না।

সতুদা—মনভ্রমরার মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্য ছোট স্কুলের সেক্রেটারির কাছে গিয়ে কিসব আবোল-তাবোল কথা বলেছে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হীরুদা—সর্বনাশ, জন গিলপিনের পেটে পেটে এত ফন্দিও ছিল।

কানুদা বলেন—দুঃস্বপ্ন! হরিটা একটা অন্ধ।

সতুদা বললে—ফলও ফলে গিয়েছে।

হীরু—কি হয়েছে?

সতুদা—সেক্রেটারি চরণবাবু হরির গর্দানে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে তাঁর বৈঠকখানা থেকে সোজা বের করে দিয়েছেন হরিকে।

ভেবেছিলাম এই সব ব্যাপার সুধাদিকে কিছু জানাব না। কিন্তু হরিদা মার খেয়েছেন শুনে

মনটা এত খারাপ লেগেছিল যে, পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা গিয়ে সুধাদির কাছে সব বলে ফেললাম।

শুনে সুধাদি বড় বেশি রেগে উঠলেন আমাদেরই উপব। এ রকম শক্ত কথা বলতে আর এত ধমক দিতে কখনো তাঁকে দেখিনি।—বকাটে ছেলে সব, পবামর্শ করবাব আর লোক পেলে না? হরিদা'র কাছে এসব কথা বলতে গেলে কেন তোমবা? যে লোকটা একটা ইয়ে, যাব মাথার কোন ঠিক নেই, তার কাছে গিয়ে ।

বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়ে একেবারে চুপ কবে গেলেন সুধাদি। আমরাও ভয়ে একেবারে বোবা হয়ে গেলাম।

যেন একটা যন্ত্রণায় ছটফট কবে ধিক্কাব দিয়ে উঠলেন সুধাদি—ছি ছি ছি, শেষে লোকটাকে তোমবা মার খাওয়ালে?

তার পবেই সুধাদির সুন্দর মুখেব স্নিগ্ধ চোখ দুটো কি ভয়ঙ্কর দপ কবে জ্বলে উঠল।—কি ভেবেছেন চরণবাবু, সামান্য কারণে একটা মানুষকে অপমান করবেন আর মারবেন?

স্কুল-বারান্দার থামের গায়ে হাত দিয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। আস্তে আস্তে খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন—লোকটাই বা কি-রকম! কেন মিছামিছি পবের জন্য মাথা ঘামাতে গিয়ে গলা ধাক্কা খায়?

আলো জ্বেলে দিয়ে গেল স্কুলের মালী। সুধাদি তেমনি থাম ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আব বারান্দার উপর আমরা সব চুপ করে গুটিশুটি হয়ে বসে আছি। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, বাড়ি যাবার সময় সুধাদির কাছে ক্ষমা চাইব।

ফটক খোলার শব্দ শুনে ফটকের দিকে তাকালাম। বোধহয়, সন্ধ্যার ডাকপিযন চিঠি নিযে আসছে। কিন্তু আসছিলেন যিনি, তাঁকে দেখামাত্র আমবা এমন চমকে উঠলাম যে, কি যে করব কিছু ভেবে পেলাম না, থাকব, না যাব, কিংবা একটু দূবে সবে গিয়ে দাঁড়াব।

আসছিলেন শান্তিদা। হাতে ছোট একটা ক্যামেরা ঝুলিযে আর বঙিন শালে তাঁর শৌখিন চেহারা জড়িয়ে হাসিমুখে আস্তে আস্তে এগিযে আসছেন শান্তিদা।

আমরা তো চমকে উঠলাম, কিন্তু সুধাদি যে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিযে রয়েছেন। কি আশ্চর্য, সুধাদি কি শান্তিদাকে চিনতে পারছেন না?

সুধাদি আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে আসছেন, চেন তোমরা?

—সে কি সুধাদি? শান্তিদা আসছেন।

চমকে উঠলেন সুধাদি, শান্তিদাও কাছে এসে পড়েছেন, আর এসেই হেসে হেসে বললেন—বোধহয় ভাবতে পারনি, আমি এইভাবে হঠাৎ এসে তোমাকে একদিন চমকে দেব।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুধাদি। বোধহয় সত্যিই ভাবতে পারেন নি যে, চিঠির মানুষ একদিন এসে কথা বলবে। এত রঙিন কথার মানুষকে এত কাছে চোখে দেখার পর এত অচেনা ও অজানা বলে মনে হবে তাও বোধহয় আগে বুঝতে পাবেন নি সুধাদি।

আমরাই চেয়ার টেনে নিযে এসে শান্তিদাকে বসতে দিলাম। সুধাদি সেই রকমই কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শান্তিদা আমাদের দিকে তাকালেন, বোধহয় আমাদের বয়সগুলির দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তার পরেই সুধাদির দিকে তাকিযে বললেন—কলকাতা থেকে মা চেয়ে পাঠিয়েছেন তোমার একখানি ফটো।

উত্তর দিলেন না সুধাদি। যেন একেবারে অপরিচিত একটা মানুষ এসে সুধাদির সঙ্গে কথা বলছেন, তাই ভয় পেয়ে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছেন সুধাদি!

শান্তিদা হাসিমুখে বললেন—আজ শুধু জানিয়ে গেলাম, কাল আসব ফটো তুলতে। তারপর যা ব্যবস্থা করবার সবই করবেন মা।

সুধাদি বললেন—না, কাল আসবেন না।

শান্তিদা চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। সুধাদির কাছে এগিয়ে গিয়ে গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—না, আর দেরি করা উচিত নয়, আমি কালই এসে তোমার ফটো নিয়ে যাব। কেমন ?

হাঁ বা না, কোন উত্তরই দিলেন না সুধাদি। শান্তিদা কিন্তু হাসিমুখেই চলে গেলেন।

দু'হাতে কপাল চেপে বারান্দার মেজের উপর বসে পড়ে সুধাদি বললেন—তোমবা এবার বাড়ি যাও।

দিনটা ছিল রবিবার। সকাল হতেই শহরের পুবের পাহাড়ের মাথা অন্য দিনের মতো সেদিনও রঙিন হয়ে উঠল। চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে আমরা ছোট স্কুলের দিকেই ছুটে চললাম। পলাশতলার ক্যামেরা আসবে আজ সুধাদির ঘরে। সুধাদিও বোধহয় সেই বাসন্তী পূজার দিনের মতো চাঁপা রঙের শাড়ি পরে বড় সুন্দর হয়ে উঠবেন। ফোটা পলাশের রঙ আবার ছড়িয়ে পড়বে সুধাদির মুখের উপর। নানারকম আশায় ছট্‌ফট্‌ করছিল আমাদেব মন।

ছোট স্কুলের ফটকে ঢুকবার আগেই থমকে দাঁড়ালাম আমবা। বঙিন খড়ি দিয়ে ফটকেব পাশের দেওয়ালে লেখা রয়েছে—শান্তি-সুধা-শান্তি-সুধা।

কে লিখল এই কথা ? কে জেনে ফেলল পলাশতলাব বঙিন চিঠিব কথা ? আমবা তো কোনদিনই সতুদার কাছে কিংবা কোন দাদার কাছে শান্তিদা আর সুধাদিব চিঠিব গল্প কবিনি। তবে কি কাল সন্ধ্যাবেলা ছোট স্কুলের ফটক দিয়ে শান্তিদাকে ঢুকতে কিংবা বেব হয়ে যেতে কেউ দেখেছে ?

ভুতো বলে—এটুকুও বুঝতে পারলি না বোকা। যারা এতদিন ধবে জানবার চেষ্টা করছিল, তারাই জেনেছে আর লিখেছে।

এইবার বুঝলাম, এই রঙিন খড়িব লেখা কাদের হাতের কীর্তি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল, রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রঙিন খড়ির শান্তি-সুধাব দিকে তাকিয়ে রয়েছেন হবিদা। দু'চোখেব পলক পড়ছে না, পাথরের মতো চোখ নিয়ে দেখছেন হরিদা। তার পরেই মনে হলো, হরিদা'র পাথুরে চোখ দুটো যেন চিক-চিক করছে। ডাকলাম—ও হরিদা, কি দেখছেন ?

সাড়া দিলেন না হরিদা। শুনতে পেলেন কি না, তা ও বুঝলাম না।

যাক গিয়ে, হরিদা'র পাথুরে চোখ আর চোখের চিকচিক। সুধাদির চাঁপা রঙেব সাজ দেখবার লোভে তখন আমরা ছটফট করছি। ফটক পাব হয়ে সুধাদির ঘবেব কাছে এসে দাঁড়ালাম।

সুধাদি তখন তাঁর ঘরের ভিতর খাটের উপব বসে বই পড়ছিলেন। আমরা ডাক দিতেই বললেন—ভেতরে এস।

অসুখ হয়নি, কিন্তু কেমন অসুস্থর মতো দেখাচ্ছিল সুধাদির চেহাবাটা। হেসে হেসে বললেন সুধাদি—আমাকে আজ বাঁচাতে পারবে তো ?

মুখ কালো হয়ে গেল আমাদের—আপনার কি অসুখ হয়েছে সুধাদি ?

সুধাদি বললেন—অসুখ নয় ভাই।

ভুতো প্রশ্ন করে—তবে কি ?

উত্তর দিলেন না সুধাদি। বইটা বন্ধ করে অনেকক্ষণ আবার আনমনার মতো চোখ নিয়ে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—হরিদা'র খবর কি ? ভাল আছেন তো ?

আমরা চুপ করেই ছিলাম। সুধাদিই আবার ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন—কি ? হরিদা'র সঙ্গে তোমাদের কি আর দেখা হয়নি ?

বলাই বলে—এই তো এখনি ফটকের কাছেই দেখা হল হরিদা'র সঙ্গে। ডাক দিলাম, কিন্তু কোন সাড়াই দিলেন না।

উঠে বসলেন সুধাদি—কি রকম ? কি করছিলেন হরিদা ?

খুলে বলতে সত্যিই সঙ্কোচ হচ্ছিল আমাদের সবারই। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে পরামর্শ করছিলাম, সত্যিই ব্যাপারটা বলে ফেলব কি না ? বলাই বলল—তুই বল না ভুতো।

ভুতো বলে—ফটকের পাশের দেয়ালে কে যেন রঙিন খড়ি দিয়ে লিখে রেখে দিয়েছে।

সুধাদি—কি লিখেছে ?

ভুতো—শান্তি সুধা।

হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুধাদি চেঁচিয়ে ওঠেন— কে লিখল ? কোন মুখখু এসব মিথ্যা কথা লিখল ?

আমি বললাম—আমরা কি করে বলব সুধাদি।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সুধাদি। সত্যি যেন জ্বর হয়েছে, আর সেই জ্বরের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না। ছটফট করে বলে উঠলেন—কে জানে, তোমাদের হরিদাও বোধহয় এতক্ষণে ঐ মিথ্যা কথাটা দেখে ফেলেছেন।

ভুতো—হরিদা দেখে ফেলেছেন সুধাদি।

সুধাদি—ছি ছি ছি, কি ভাবল লোকটা।

আর একবার ছটফট করে ওঠেন সুধাদি। বলেন যাও এখনি গিয়ে লেখাটা মুছে দিয়ে এস।

রঙিন খড়ির লেখা মুছে ফেলবার জন্য আমরা দৌড় দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। পিছন থেকে সুধাদি ডাকলেন —শোন।

শোনবার জন্য ফিরে এলাম। সুধাদি আঁচল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—হরিদাকে গিয়ে বলো, তিনিই যেন ঐ লেখাটা নিজের হাতে মুছে দেন। বলো, আমি বলেছি

এক দৌড়ে ফটক পার হয়ে রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, হরিদা সেখানে আর নেই। চলে এলাম হরিদা'র ঘরের কাছে। কিন্তু এখানেও নেই হরিদা। দরজায় কোন তালাও ঝুলছে না, পেয়ারা গাছের তলায় বুড়ো টাট্টুটাও আর নেই। একেবারে খোলামেলা শূন্য হয়ে পড়ে আছে হরিদা'র ঘর। হরিদা'র সেই ছোট খাটিয়াও আর নেই।

খোঁজ নিলাম পাশের ঘরের দোকানী রতনলালের কাছে। রতনলাল বলে—চলে গিয়েছে হরি ডাক্তার, ঘর ছেড়ে দিয়েই চলে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করি—কোথায় গিয়েছেন ?

রতনলাল বলে— জানি না।

সুধাদির কাছে ফিরে এসে খবরটা দিতে কেন যেন বড় ভয় করছিল। ভীরু বলাইয়ের চোখটা তো প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল। তবু বলে ফেললাম —হরিদা চলে গিয়েছেন সুধাদি।

সুধাদি— কোথায় ? ডাক্তারি করতে ?

ভুতো বলে, না, একেবারে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন। রতনলালও জানে না কোথায় গিয়েছেন হরিদা।

চোখের তারা দুটো নিশ্চল করে তাকিয়ে রইলেন সুধাদি। যেন নিজের মনেই ভাঙ্গা নিঃশ্বাসের ব্যথার মতো অস্পষ্ট স্বরে বললেন—চলেই গেল মানুষটা, রঙিন খড়ির একটা বাজে লেখাও সহ্য করতে পারল না।

সুধাদির চোখ থেকে টপ করে বড় একটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল তার হাতের চুড়ির উপর। দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন সুধাদি। কাগজ কলম টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

আবার চিঠি? কার কাছে, কিসের চিঠি? বুঝতে পারছিলাম না কিছুই। লেখা শেষ করে একটা সাদা খামের ভিতর চিঠিটা পুরে খামের উপর নাম লিখলেন সুধাদি—হরিপদবাবু, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

তারপর আমাদের বললেন—এখনি যাও, সব জায়গায় খুঁজে দেখ। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক হরিদা, তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেখা পেলেই এই চিঠি হরিদা'র হাতে দেবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম—যদি দেখা না পাই সুধাদি?

সুধাদি চেঁচিয়ে উঠলেন—নিশ্চয় দেখা পাবে, এরই মধ্যে কোথায় পালিয়ে যাবেন তোমাদের হরিদা?

সকাল থেকে সারা দুপুর পর্যন্ত শহরের সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কোথাও দেখা পেলাম না হরিদা'র। মোটর বাস কোম্পানিতে এসে খোঁজ নিলাম। দারোয়ান বলল, হ্যাঁ, সকাল নটার মোটর বাসে চলে গিয়েছেন হরি ডাক্তার।

চকের কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে আমরা ভাবলাম, কি গতি করব এই চিঠিটার? হরিদা'র কাছে লেখা সুধাদির এই চিঠি, কি আছে এর মধ্যে কে জানে?

ভুতোর একবার ইচ্ছা হয়েছিল, চিঠি খুলে নিয়ে পড়া যাক। বাধা দিল বলাই—ছিঃ, গুরুজনদের চিঠি পড়তে নেই।

সুতরাং সকলে মিলে ঠিক করলাম, একটা ডাক টিকিট লাগিয়ে চিঠিটাকে ডাক-বাক্সেই ফেলে দেওয়া যাক। কে জানে কপালে যদি থাকে, তবে একমাস দু'মাস বা কয়েক বছর পরেও হয়তো হরিদা'র হাতে পৌঁছে যাবে এই চিঠি। এই রকম ঘটনার গল্পও তো কত শুনতে পাওয়া যায়।

বিকাল হবার পর ছোট স্কুলের পাঁচিলের দিকে যেতেই চোখে পড়ল, শান্তিদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুধাদির ঘরের বারান্দায়। আর সুধাদি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়। শান্তিদার হাতে ক্যামেরা ঝুলছে ঠিকই, কিন্তু সুধাদির গায়ে চাঁপা-রঙের শাড়ি তো দেখা যাচ্ছে না। বরং কি রকম আলুথালু চুল নিয়ে আর ধুতির মতো সরু পাড়ের একটা আধময়লা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন সুধাদি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সুধাদির আশেপাশে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। শান্তিদা তখন আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—কি বললে, আমাকে তুমি চেন না?

সুধাদি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কতটুকু পরিচয়ই বা আমি জানি? কিছুই জানি না।

রঙিন খামের চিঠির মস্ত বড় একটা মালা সুধাদির ঘরের দেয়ালে তখনো ঝুলছিল। সেই দিকে আঙুল তুলে শান্তিদা বললেন—তবে ওগুলি কি?

সুধাদি—কতগুলি রঙিন চিঠি।

শান্তিদা—কি আছে ঐ চিঠির মধ্যে, জান না?

সুধাদি—জানি, কি আছে।

শান্তিদা—কি আছে?

সুধাদি—কবিতা, গান, রঙ, কথা, ছবি।

শান্তিদা বললেন—শুনে সুখী হলাম। তাহলে তোমার আর কিছু বলবার নেই!

সুধাদি—আছে।

শান্তিদা—কি ?
সুধাদি—ক্ষমা করবেন।
শান্তিদা কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?
সুধাদি—বলুন।
শান্তিদা—বোধহয় আমাকে অপমান করবার জন্যই ইচ্ছে করে এরকম বিধবার মতো সাজ করেছ ?
চোখ দুটো শক্ত করে উত্তর দিলেন সুধাদি—আজ্ঞে না।
শান্তিদা—তবে ?
সুধাদি—বিধবা হয়েছি।
শান্তিদা ভ্রূকুটি করেন—কবে ?
সুধাদি—আজ।
শান্তিদা বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করলেন—আজ ক'টার সময় ?
চুপ করে রইলেন সুধাদি। শান্তিদা বিশ্রী রকমের চোখের দৃষ্টি তুলে তাকালেন সুধাদির দিকে—কি ? একটা বাজে কথা বলে চুপ করে গেলে কেন ? উত্তর দাও।
চট করে উত্তর দিয়ে দিল ভুতো—আজ সকাল ন'টার সময়।
চমকে ওঠেন শান্তিদা—তার মানে ?
ভুতো বলে—আজ সকল নটার গাড়িতে চলে গিয়েছেন হরিদা, আর ফিরে আসবেন না হরিদা।
পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছেন শান্তিদা।—ওঃ, এইবার বুঝলাম। ধন্যবাদ।
হন্ হন্ করে হেঁটে ফটক পার হয়ে চলে গেলেন শান্তিদা। সুধাদি ঘরের ভিতর ঢুকে খাটের উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে পড়ে রইলেন। আমরা একেবারে মন-মরা হয়ে পাঁচিলের উপর গিয়ে বসলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে আর ছোট একটা ভাঙা চাঁদও উঠেছে পশ্চিমের আকাশে।
ভাল লাগছিল না কিছু। নিঝুম হয়ে রয়েছে স্কুলঘর। বড় মাঠের বুকে হাওয়া খেলছে খুব, আর ঘাসের উপর চাঁদের আলোও পড়েছে। পাঁচিল থেকে নেমে আমরা মাঠের ঘাসের উপর গল্প করতে বসলাম।
হঠাৎ তীরের মতো বেগে আর খুটখুট শব্দ করে যেন একটা ছায়া ছুটে এসে আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল। দেখলাম, ছায়া নয়, হরিদা'র বুড়ো। বুড়োর পায়ে আজ আর দড়ির বাঁধন নেই। বুড়োর পায়ের বাঁধন খুলে বুড়োকে যেন একেবারে মুক্তি দিয়ে চলে গিয়েছেন হরিদা।
কিন্তু আমাদের কি চিনতে পারছে না বুড়ো ? যদি চিনতে পেরেই থাকে, তবে পালিয়ে যায় না কেন ?
কি আশ্চর্য, এক-পা দু-পা করে আস্তে আস্তে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসতে থাকে বুড়ো। সাহসী ভুতো ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে।—ওরে বাবা !
এক দৌড় দিয়ে ছুটে এসে স্কুলের পাঁচিলের উপরে আমরা উঠলাম। হরিদা'র বুড়ো সেই খোলা মাঠের হাওয়াতে বোঁ বোঁ করে একটা চক্কর দিয়ে ঠিক আবার আমাদের এই পাঁচিলের কাছেই এসে দাঁড়াল। আমাদের দিকে মুখ তুলে একেবারে স্থির ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুড়ো। আরও ভয় পেয়ে আর হুড়মুড় করে আমরা পাঁচিল থেকে নেমে সুধাদির ঘরের বারান্দায় এসে উঠলাম।

ঘরের ভিতর থেকে সুধাদি বললেন—কে ?

—আমরা ।

সুধাদি ভিতর থেকে বের হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন আবার পাঁচিলের কাছে গিয়ে কি কবছ তোমরা ?

—হরিদা'র বুড়ো আজ নিজেব থেকেই ধরা দিতে আসছে সুধাদি ।

কেঁপে উঠল সুধাদির চোখ দুটো । বললেন—থাক, কিছু বলো না ।

বড় শান্ত হয়ে গিয়েছেন সুধাদি । বড্ড আস্তে আস্তে কথা বলছেন । আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার শরীব ভাল আছে তো সুধাদি ?

সুধাদি বললেন—হ্যাঁ...এবার তোমরা বাড়ি যাও ।

—আসি সুধাদি । সুধাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম আমরা । বেশ বুঝতে পারছিলাম, ছোট স্কুলের পাঁচিলের মায়া আর খেলা এতদিনে শেষ হলো । আর খেলা কোনদিনই জমবে না । খেলা আর হবেই কিনা, ঠিক কি ? হরিদাকে জব্দ করবার আর কোন চান্স নেই ।

সুধাদি ডাকলেন—একটা কথা শুনে যাও ।

কাছে আসতেই হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার চিঠিটা কই ?

সাহসী ভুতো গলা কাঁপিয়ে বলে—ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছি সুধাদি ।

দু'হাতে মুখ ঢাকেন সুধাদি । আমরাও সরে এলাম । ছোট স্কুলেব ফটক পাব হয়ে বাস্তায় পা দেবার আগেই শুনতে পেলাম, গুন্‌গুন্ করে কাঁদছেন সুধাদি ।

ক্যারম খেলার শব্দ শুনে সতুদাদের ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম । উঁকি দেওয়া মাত্র শুনলাম, সতুদা বলছেন—শুনেছিস হীরু, মনভ্রমরার খবর ?

হীরুদা বলেন—কি খবর ?

সতুদা—কার ওপর মজেছে বল দেখি ?

হীরুদা—কার ওপর ?

সতুদা—শান্তিপদ নীলকমলে ।

আমার পাশে দাঁড়িয়েই জানালাব গরাধ ধরে ভুতো চেঁচিয়ে ওঠে ।—হরিপদ নীলকমলে ।

চমকে আর রেগে একটা লাফ দিয়ে উঠে এসে সতুদা খপ্ করে ভুতোর একটা কান ধরলেন । বল ছোঁড়া, এর মানে কি ?

ভুতো আর্তনাদ করে—আঃ, মানে হচ্ছে, হরিদা চলে গিয়েছেন, তাই সুধাদি গুন্‌গুন্ করে কাঁদছেন ।

ভুতোর কান ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে হীরুদা আর কানুদার মুখের দিকে বার বার ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে থাকেন সতুদা ।—এ কী বলছে রে হীরু ।

সতুদাই কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবেন । মুখ কালো করে বসে থাকেন । তার পরেই বলেন—আমারও কি-রকম মনে হচ্ছে হীরু ।

হীরুদা—কি মনে হচ্ছে ?

সতুদা—মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছে স্টুপিড ভুতোটা ।

কানুদা বলেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে ।

হীরুদা বলেন—আমারও তাই মনে হয় ।

সতুদা কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন, তারপরেই বলেন—তবে চল্, লেখাটা মুছে দিয়ে আসি ।

আত্মজা

উপেনবাবুর ছেলে নেই, একথা তাঁরা সকলেই জানেন যাঁরা উপেনবাবুকে জানেন। সন্তান বলতে শুধু দুটি মেয়ে আছে উপেনবাবুর।

নিকট আত্মীয় অথবা বন্ধুস্থানীয় যাঁরা উপেনবাবু সম্পর্কে আরও বেশি খবর রাখেন, তাঁরা জানেন যে, উপেনবাবুর মেয়ে হলো একটি এবং আর একটি হলো মেয়ের মতো।

রমা আর অম্বি। একটি হলো উপেনবাবুর আত্মজা, আর একটি হলো পালিতা : একটি মেয়ে এবং একটি মেয়ের মতো, এই দুই সন্তানকে নিয়ে সপত্নীক উপেনবাবু একটা বহু পর্যটনার সার্ভিস খাটতে খাটতে সারা ভারতের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডের জল-বাতাস উপভোগ করে এখন কলকাতায় এসে অবসর উপভোগ করছেন। পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে পুরনো বস্তি ভেঙ্গে যে নতুন রাস্তাটা হয়েছে, তারই পাশে উপেনবাবুর নতুন বাড়ি।

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যাঁরা নবাগত উপেন পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হননি, তাঁরা অনুমান করেন, এই দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে। দুজনেই মাথায় মাথায় সমান। দুজনেই বেশ দেখতে, মুখের ধাঁচে দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্যও দেখা যায় না। দুজনেরই চোখ দুটো একই রকমের টানা-টানা। তবে একজনের গায়ের রঙ হলো মায়ের গায়ের রঙের চেয়ে একটু বেশি উজ্জ্বল, এবং আর একজনের গায়ের রঙ মায়ের তুলনায় একটু কম ফরসা। কেমন একটা শ্যামল ছায়া দিয়ে মাখানো রঙ। বয়স দুজনের তো একেবারে সমানই মনে হয়, এবং স্বভাবও যে একই রকমের। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে সবচেয়ে নিন্দুক চক্ষুগুলিও দেখে খুশি হয়েছে, আলাপে আচরণে এবং চলায়-বলায় দু'জনেই বেশ শান্ত। যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। এত মিল যখন, তখন এ'দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে।

পরিচিত হবার পর প্রতিবেশিনীদের ভুল ভাঙ্গে। উপেনবাবুর স্ত্রী চারুবালাই আগন্তুকা আলাপকারিণীর ভুল ভেঙে দেন।

চারুবালা বলেন—রমা হলো আমার মেয়ে, আর অম্বিকে আমার মেয়ের মতোই মনে করতে পারেন।

প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল আর মুখের প্রশ্নগুলির সামনে রমা হাসিমুখে বসে থাকে, আর অম্বি মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আনমনার মতো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি।

প্রতিবেশিনীরা বললে—তাই বলুন! আমরা তো ভেবেই পেতুম না, দু'বোন হয়েও দু'জনের মধ্যে একটুও মিল নেই কেন।

রাজশাহীর পিসিমা প্রায় কুড়ি বছর পরে এলেন তাঁর ভাই উপুকে দেখতে। রমা পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে সামনে বসে থাকে, আর অম্বি পাখা হাতে নিয়ে পিসিমার মাথায় বাতাস দেয়।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—এটি কে রে উপু?

উপেনবাবু—ও হলো রমা, আমার মেয়ে।

পিসিমা—আর এটি কে?

উপেনবাবু—ওর নাম অম্বালিকা, আমার মেয়ের মতোই।

হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার মতো অম্বির হাতটা চমকে ওঠে, হাতের পাখা তুলে মুখ ঢাকা দেয় অম্বি। কে জানে, নিজের পরিচয় শুনে এভাবে চমকে উঠে অম্বি বুঝি ঐ পরিচয়টাকেই সহ্য করতে পারে না। কিংবা একটা অহেতুক লজ্জা? চারুবালা জানেন, অম্বির এই একটা বেয়াড়া

অভ্যাস।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—তোদের কাছেই মেয়েটা মানুষ হয়েছে বুঝি ?

উপেনবাবু—হ্যাঁ।

পিসিমা—নামটা ওরকমের কেন ?

উপেনবাবু—নামে কি আসে যায় বড়দি। মুখে একটা নাম চলে এল, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম, ব্যস্।

এর বেশি কিছু আর বড়দিকে জানাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না উপেনবাবু। কাউকেই এর বেশি কিছু কোনদিন বলেনওনি। উপেনবাবুর এই অল্প কয়েকটি কথাব ভিতর দিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগের যে-ঘটনার ছবি তাঁর মনের মধ্যে চকিতে উঁকি দিয়ে চলে গেল, সে ঘটনা শুধু জানেন উপেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী চারুবালা। অম্বালিকা, এই নামের ইতিহাসের সঙ্গে অম্বির জীবনেরই ইতিহাস মিশে রয়েছে। সে বড় পুরনো ইতিহাস, আজ সেটা নিছক একটা আষাঢ়ে কাহিনীর মতোই অবাস্তব বলে মনে হয়।

পূর্ব গোদাবরী জেলার ভিতর তখন যে নতুন রেল লাইন তৈরি করা শুরু হয়েছিল, তার তদারকের ভার ছিল রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুরই উপর। গোদাবরীর একটা শাখাস্রোতের ধারে রেল ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো। কুলিরা মাস ছয়েক বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে এসে বাংলোর বারান্দায় শুইয়ে দিল।

উপেনবাবু বিরক্ত হন—কার মেয়ে ? এখানে কেন ?

কুলিরা বলে—আপনার ট্রলিম্যানের মেয়ে।

উপেনবাবু—কোন ট্রলিম্যান ? সেই ভাল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা-মতন লোকটা ?

কুলিরা—হাঁ সাব।

উপেনবাবু—সে কোথায় ?

কুলিরা—কলেরায় মরেছে। ওর বউও মরেছে। দুজনকেই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু এই মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে ; কিন্তু এটাকে তো আব ভাসিয়ে দেওয়া যায় না সাব।

উপেনবাবু—নিশ্চয় না, কিন্তু এ সব ঝামেলা আমার এখানে কেন ? গাঁয়ের কোন লোকের বাড়িতে ওকে রেখে দিয়ে এস।

কুলিরা আক্ষেপ করে—এ জাতের মেয়েকে এই গাঁয়ের কেউ ঘরে রাখবে না সাব।

উপেনবাবু চুপ করে থাকেন। একটা কুলি বলে—ওকে তো শেয়ালে টেনে নিয়েই যাচ্ছিল। যদি আমরা ঠিক সময় মতো না পৌঁছে যেতাম, তবে এতক্ষণে ওর...।

ঘরের ভিতরে দু'মাসের রমাকে আয়ার কোলে তুলে দিয়ে চারুবালা বাইরে বের হয়ে আসেন।—শেয়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ? ঐ মেয়েকে ?

কুলিরা বলে—হাঁ, মেমসাব।

চারুবালা বলে—মেয়েটা রইল, তোমরা যাও।

কুলিরা চলে যায়, এবং আবার ঘরের ভিতরে এসে দু'মাসের রমাকে আয়ার কাছ থেকে নিজের কোলে নিয়ে চারুবালা বলেন—ঐ মেয়েটাকে এখনি গরম জল আর সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে একটা জামা পরিয়ে দাও আয়া।

কাজে বের হয়ে যান রেল ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবু। দশ মাইল দূরের অফিস-তাঁবু থেকে ট্রলি করে ফিরে এসে যখন আবার এই বাংলো-বাড়ির বারান্দায় উঠলেন উপেনবাবু, তখন রাত মন্দ হয়নি। বারান্দায় চেয়ারে বসে ধুলোমাখা বুটের ফিতা খুলতে খুলতেই চেঁচিয়ে

চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—মেয়েটা ঘুমিয়েছে নাকি ?

চারুবালা—কোন মেয়েটা ?

উপেনবাবু—ঐ যে, সেই মেয়েটা ! আজ সকালে যে অম্বালিকাটি এসেছে।

চারুবালা—হ্যাঁ, দুধ খেয়ে আয়ার ঘরে ঘুমিয়ে আছে।

যেমন আকস্মিক মেয়েটার আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক মেয়েটার নামকরণ। প্রায় কুড়ি বছর আগে ঐ ছয়-মাসের যে একটা প্রাণ শিয়ালেরও মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুর কোয়ার্টারের একটি ঘরে দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই প্রাণটাই আজ উপেনবাবুর নিজের মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছে।

এই মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো মনে করবার অথবা গড়ে তুলবার কোন ইচ্ছা ছিল না উপেনবাবুর, চারুবালারও না। শুধু একটা প্রাণকে ক'টা দিন আশ্রয় দিয়ে আর খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা, এইমাত্র। থাকুক কিছুদিন। আর এক বছর পরেই তো এদিকের কাজ শেষ হবে, নতুন সার্ভের কাজে গঞ্জামে বদলি হয়ে চলে যাবার আগেই এই মেয়েকে ওরই জাতের একটা লোকের হাতে সঁপে দিয়ে এবং কিছু টাকা দিয়ে চলে গেলেই হবে।

এক বছর পরেই, বদলি হবার আগে খোঁজ-খবর করায় মাইল দশেক দূরের এক গাঁ থেকে ক'জন জাতের লোকও এসেছিল। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেলেই তারা সেই মেয়েকে মানুষ করবার ভার নিতে রাজি আছে।

ঘরের ভিতর থেকেই চারুবালা বলেন—দূর কর, দূর কর ! কোত্থেকে কতগুলো অলক্ষুনে আপদ এসে জুটেছে।

লোকগুলির দিকে ভ্রূকুটি করে উপেনবাবুও বলেন—আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করবে।

চেয়ার থেকে উঠে সত্য সত্যই তাড়া দিলেন উপেনবাবু—ভাগো, ভাগো, ভাগো !

অমানুষগুলিকে তো ভাগিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু অম্বির মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারেননি উপেনবাবু, চারুবালাও। যদি এই মেয়ে এভাবে বড় হয়ে উঠতে থাকে, এবং যদি এভাবে কারও কাছে এ মেয়েকে তাঁরা ছেড়ে দিতে না পারতে থাকেন, তবে এই মেয়ের পরিণামই বা কি হবে ? সমস্যাটা কল্পনা করতে পেরেছিলেন উপেনবাবু। এ মেয়ে তাহলে যে বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠলে ক্ষতি কি ? কিসের ভয় ? এই প্রশ্নগুলিকেও দূরদর্শী উপেনবাবু বিচার করে দেখতে আর বুঝতে ভুলে যাননি।

ক্ষতি, মেয়েটারই ক্ষতি। মেয়েটার মনটা হয়ে যাবে এ-বাড়ির মেয়ের মন, অথচ বিয়ে দেবার জন্য খুঁজতে হবে এ-বাড়ির চেয়ে অনেক নীচের জাতের একটা বাড়ি। সে বাড়িকে তখন এই মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন করে ?

উপেনবাবু আর চারুবালার ক্ষতিটাই বা কি কম হবে ? একটা মমতার ভুলে মেয়েটাকে যদি একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো করে ফেলা হয়, তবে যার-তার হাতে আর যে-সে ঘরে মেয়েটাকে তুলে দিতেও যে মনটা কেমন কেমন করে উঠবে !

সতর্ক হয়েছিলেন, এবং একটা পরিকল্পনাও করেছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও সায় দিয়ে বলেছিলেন—তাই ভাল। গঞ্জামে থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা করে ফেললেই হবে।

গঞ্জামে থাকতে থাকতেই কোন একটা চাপরাশি বা ভেণ্ডারের ছেলের সঙ্গে অম্বির বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই রকম শিশু বয়সেই তো এ জাতের বিয়ে হয়। শুধু খোঁজ করে বের করতে হবে, ভাল একটা ছেলের বাপ। খেটেখুটে খেয়ে-পরে আছে, এই রকম একটি শ্বশুরের হাতে অম্বির ভাগ্যকে সঁপে দিতে পারলেই দায়মুক্ত হওয়া যাবে। মোটামুটি

এই ছিল উপেনবাবুর পরিকল্পনা।

আশ্চর্যের বিষয়, গঞ্জামের তিনটি বছরের মধ্যে একটি দিনও অম্বির জন্য পাত্র খুঁজবার চেষ্টা করেননি উপেনবাবু। চারুবালাও স্মরণ করিয়ে দেননি। গঞ্জাম থেকে বদলি হয়ে যাবার আগে উপেনবাবু বললেন—না, আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। সাসারামে গিয়েই একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। মেয়েটাকে আর বেশি ভদ্র করে তুলে লাভ নেই। বয়স অল্প থাকতে থাকতে, আর মনটা পেকে উঠবার আগেই রেল-অফিসের কোন ছোকরা পিওন-টিওনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।

চারুবালা বলেন—দিতেই হবে। একটু ভাল পণ দিলে ওরকম পাত্রও পেয়েই যাবে।

সাসারামে পাঁচ বছর কাটিয়ে ঝাঁসি যাবার সময় আক্ষেপ করলেন উপেনবাবু—এ যে বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠছে দেখছি। এখন কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

চারুবালা বলেন—রমার মাস্টার পড়াতে এলে রমার দেখাদেখি অম্বিও আজকাল মাস্টারের সামনে গিয়ে বসতে আরম্ভ করেছে।

উপেনবাবু—কেন ?

চারুবালা—লেখাপড়া শিখতে চায় অম্বি।

উপেনবাবু—না না, কোন লাভ নেই, মাস্টারকে আড়ালে বলে দিও, অম্বিকে যেন কিছু না শেখায়।

চারুবালা—আমি অম্বিকেই বারণ করে দিয়েছি।

উপেনবাবু—ভাল করেছ। একটু এ-বি-সি-ডি আর কবিতা শিখে লাভ তো কিছু নেই, উল্টে মেয়েটার না-এদিক না-ওদিক একটা অবস্থা হবে। মুটে-মজুরের ঘরকে ঘেন্না করবে অথচ কোন ভদ্রঘরে ঠাঁই পাবে না। সুতরাং...।

চারুবালা বলেন—ঝাঁসিতে থাকতে থাকতেই মেয়েটাকে পাত্রস্থ করার যাহোক একটা উপায় বের করতেই হবে।

বহু দূর অতীতের সে-সব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেনবাবু ও চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ করেই বড় হয়ে উঠেছে অম্বি : যে মেয়েকে বাড়ির মতোও মনে করতে চাননি উপেনবাবু, সেই মেয়েই আজ তাঁর নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, ঐ মেয়ের-মতো পর্যন্তই। ব্যস্, আর না, আর বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন থেমে গিয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে। রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বিরও বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বিও যেন রমার মতো, অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের মতো শখ আর মন না পেয়ে যায়। রমার জন্য যেরকম পাত্র পাওয়া যাবে সেরকম পাত্র তো আর অম্বির জন্য পাওয়া যাবে না। অম্বির জীবনটাই যে একটা সমস্যা। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে একটা পরিচয় তো আছে অম্বির। আর পরিচয়টা তো সুবিধার নয়। সুতরাং কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা আর অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের লোক ছাড়া ? তাই এবার একটু বেশি কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। যতই খারাপ লাগুক, অম্বির মন আর মনের শখগুলিকে একটু নীচু করিয়েই রাখতে হবে।

বাইরের চোখে রমা ও অম্বির মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মেয়ে আর মেয়ের মতো, এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা চোখে পড়বে তাদেরই, এ বাড়ির ভিতরে চোখ দিয়ে দেখবার সুযোগ যাদের আছে।

রমা লেখাপড়া শিখেছে। কলেজে পড়ে। এই তো থার্ড ইয়ার চলেছে। ইংরাজিতে অনার্স নিয়েছে। আর নিরক্ষরা অম্বি, কোনকালেই লেখা-পড়া শেখেনি, শেখানোও হয়নি। ও শুধু বই-এর ছবি দেখে বইয়ের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। তার বেশি কোন সাধ্য নেই।

রমার কাছে উপেনবাবু ও চারুবালা হলেন বাবা ও মা। কিন্তু ঠিক একরকমের সম্বোধনের অধিকার পায়নি অম্বি। অম্বির কাছে উপেনবাবু হলেন আপ্পি এবং চারুবালা হলেন আম্মি। কে জানে কবে থেকে, বোধহয় গঞ্জাম থেকেই এই সম্বোধনের ইতিহাসের শুরু।

রমা শোয় চারুবালারই ঘরে, তাঁর পাশের খাটের বিছানায়। আব অম্বি শোয় পাশের ঘরের একটা খাটে, মাঝে একটা দেওয়ালের ব্যবধান, যদিও দেওয়ালে একটা দরজা আছে এবং দরজাটা খোলাও থাকে।

এই মাত্র, এ ছাড়া রমাতে ও অম্বিতে আর কি পার্থক্য ? কিছুই না।

পার্থক্য বলাও ঠিক নয়, বলা উচিত, সতর্কতার ছোট একটা প্রাচীর। বাপ-মা'র মন নামে কতকগুলি দুর্বলতা আর মমতা দিয়ে তৈরি একটা জগতের কোথায় যেন একটা ভয় আছে। তাই সতর্ক না থেকে পারেন না উপেনবাবু আর চারুবালা।

এখনো এক একদিন নিভৃতে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়, এবং আলোচনাটাও শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় কি রকম যেন হয়ে যায়।

চারুবালা বলেন—সেই তো, সেই সমস্যাই দাঁড়াল। পবের মেয়ে নিজের মেযেব মতো হযে উঠল, অথচ. ।

উপেনবাবু—কি হলো ?

চারুবালা—কে এখন বিয়ে করবে এই মুখ্‌খু মেযেকে ?

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করেন উপেনবাবু। তারপর বলেন—ঠিক বলেছ, সমস্যাই বটে। তবে ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন ছেলে পাওয়া যায়, জাতে যা-ই হোক, লেখাপড়া কিছু শিখেছে আর ছোটখাট চাকরি বা দোকানদারি করে খেযে-পরে থাকবার মতো রোজগারও করছে . ।

চারুবালা—পাওয়া আর যাবে না কেন, খোঁজ করলেই পাওযা যাবে।

উপেনবাবু—যদি ভাল পণও দেওয়া যায়... ।

চারুবালা—তাহলে কোন আপত্তিই করবে না। অম্বির মতো মেয়েকে খুশি হযেই বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে।

—কিন্তু। উপেনবাবু কেমন যেন একটু চেঁচিয়ে এবং রুক্ষস্বরেই বলেন —কিন্তু অম্বি রাজি হবে কি ?

চারুবালাও রাগ করে বলেন—তা, আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ কেন ? দোষ তো তোমার। তুমি ভুল করেছ ; তাই।

উপেনবাবু—ভুল করেছ তুমি।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকেন। তারপর দু'জনেই শান্ত হয়ে আর বেশ গম্ভীর হয়ে আলোচনা করতে করতে একমত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলেন—যাতে রাজি হয় অম্বি, তাই করতে হবে। আর ভুল করলে চলবে না।

সত্যিই দেখা যাচ্ছে, আর ভুল করতে চান না চারুবালা আর উপেনবাবু। এবার থেকে তাঁরা দুজনেই আরও বেশি সতর্ক হয়েছেন।

কারণ, সেই সমস্যাটা এতদিনে এসে পড়েছে। রমার আর অম্বির বিয়ের জন্য ভাবতে হচ্ছে। রমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, বিয়ের খোঁজখবর চেষ্টা করলেই করা যাচ্ছে। কিন্তু অম্বির জন্যে যে কোন চেষ্টাও করা যাচ্ছে না।

আগে অনেক ভুল করলেও অম্বিও এইবার যেন বুঝতে পেরেছে, আর ভুল করলে চলবে না। সতর্ক হয়েছে অম্বিও। এখন তো সে আর গঞ্জামেব সেই চার বছর বয়সের একটা জেদী অবুঝ আর আবদেরে মেয়ে নয়। কুড়ি বছ্ব বযসের টানা-টানা দু'টি চোখের দৃষ্টি দিযে সে আজ আপ্পি আর আম্মির মনের সমস্যাটা সহজেই বুঝতে পাবে।

উপেনবাবু ডাকেন—অম্বি !

অম্বি উত্তর দেয়—যাই আপ্পি।

উপেনবাবু—রমা আর তুই তৈরি হয়ে নে তাড়াতাড়ি। পরেশনাথ মন্দিরে আরতি দেখতে যাব।

বের হবার আগে অম্বির সাজসজ্জার রূপ আর বকম দেখে রমা ভ্রূকুটি কবে—এ কি একটা বাজে শাড়ি পরে বেব হচ্ছিস ? কানপাশা দুটো খুলে রাখলি কেন ?

অম্বি বলে—ঠিক আছে। তুই বাজে বকিস না।

উপেনবাবু আর চারুবালা তাকিয়ে তাকিযে সবই দেখতে পান এবং কানেও সব শুনতে পান। কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য কবেন না। যেন এটাই তাঁদের ইচ্ছা। অম্বিকে একটা বাজে শাড়ি পরিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে তাঁদেব আপত্তি নেই। উপেনবাবু অন্যদিকে চোখ ঘুবিযে নেন, আর চারুবালা অন্য একটা দরকারেব কথা ব্যস্তভাবে ঘোষণা করেন—ফেববাব পথে একটা নতুন পঞ্জিকা কিনে আনবে, ভুলে যেও না যেন।

পঞ্জিকা কিনতে সেদিন ভুলেই গেলেন উপেনবাবু এবং ঘবে ফিবে হাতমুখ না ধুয়ে চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। চারুবালা জিজ্ঞাসা করেন—কি হলো ?

উপেনবাবু কিবকম বিদ্রূপের সুরে গম্ভীরভাবে বলেন—দেখা হলো তোমাব ছোটমামাব সঙ্গে।

চারুবালা—কি বললেন ছোটমামা ?

—রমাকে দেখেই বললেন, এইটিই বুঝি তোমার সেই পালিতা মেযে ?

চারুবালার কণ্ঠস্বরও তিক্ত হয়ে ওঠে— কিন্তু ওভাবে বাঁকা করে কথা শুনিয়ে আমাকে কি বোঝাতে চাইছ তুমি ?

উপেনবাবু অন্যমনস্কের মতো বলতে থাকেন—ছোটমামাব কথা শুনে অম্বি তো হেসে কুটিকুটি। সারা রাস্তাটাই হাসতে হাসতে এসেছে, বোধহয় এখনো হাসছে।

বলতে বলতে উপেনবাবুর গম্ভীর মুখটাই শুকনো হাসি হেসে ফেলে।

উপেনবাবু হাত মুখ ধুতে চলে যান। চারুবালা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয়, ছোটমামার প্রশ্নটা সত্যিই একটা কঠিন বিদ্রূপ। কিন্তু তারচেয়ে বড় বিদ্রূপ বলে মনে হয়, অম্বির ঐ হাসি। এবং এই বিদ্রূপ মনে মনে সহ্য করতে গিয়ে অম্বির উপর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিন্তু বেশি দুশ্চিন্তা করতে হয় না চারুবালাকে, উপেনবাবুকেও না। কাবণ, অম্বিই সতর্ক হয়ে যায়।

বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের মেলামেশার আসরও এক একদিন বেশ জমে ওঠে। রমা গান গায়। এলাহাবাদে থাকতেই গানের মাস্টারের কাছে সুব সেধে গলা মিষ্টি করেছে রমা। রমাব গান শুনে সকলেই প্রশংসা করে—বেশ গান, বেশ গলা।

আর, অম্বি যেন ঘুরে বেড়ায় এই গানের আশেপাশে। গানের কাছে আসতে চায় না। গানের স্বরলিপি বইটি রমার কাছে এনে দিয়েই সরে যায়। একটু দাঁড়িয়ে গান শোনে, তাব পরেই আরও দূরে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

রমা হঠাৎ বলে ফেলে—অম্বিও তো গাইতে পারে।

আতঙ্কিতের মতো এক দৌড় দিয়ে অন্য ঘরে পালিয়ে যায় অম্বি, রমার ডাকাডাকি শুনতে পেয়েও আর এমুখো হয় না।

আত্মীয়-স্বজনের মেলা ভাঙবার পর ভিতবের বারান্দায় একদিকে চুপ করে বসে থাকেন উপেনবাবু। কাছে এসে বসেন চারুবালা। শোনা যায়, পাশেব ঘবে একটা মুখচোরা সঙ্গীত যেন ভয়ে ভয়ে বাতাসের কাঁপন এড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে বেডাচ্ছে। গান গাইছে অম্বি।

উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন—এলাহাবাদে থাকতে গানের মাস্টাবেব কাছে অম্বিও কি গান শিখেছিল ?

চারুবালা বললেন—না।

উপেনবাবু বড করুণভাবে হাসতে থাকেন—এটা আবাব কিবকমেব একটা ব্যাপাব হলো ? শেখানো হলো না, তবুও শিখল !

উত্তর দেন না চারুবালা। শুধু বুঝতে পাবেন তাঁদেব কথাবার্তাব সাডা পেযে মুখচোরা সঙ্গীতটা চুপ কবে গিয়েছে, গান বন্ধ করে দিযেছে অম্বি।

অম্বিব এইসব সতর্কতা দেখে একটু খুশি হন উপেনবাবু, চারুবালাও।

সেদিন দুপুববেলা ভাঁডাব ঘবেব ভিতব হতে বিস্মিত হযেই ডাক দিলেন চারুবালা।—অম্বি অম্বি !

—যাই আম্মি।

অম্বি কাছে এসে দাঁডাতেই এক গাদা লেস হাত তুলে নিয়ে চারুবালা বললেন—একি ' এগুলি বুনলো কে ? তোরই কীর্তি নিশ্চয়।

--হ্যাঁ।

—তোকে কে শিখিয়েছে এসব বুনতে ? বমা ?

—না।

—বমার দেখাদেখি শিখেছিস ?

—হ্যাঁ।

—কি দরকাব তোর এসব শিখে আব মিছিমিছি সময় নষ্ট করে ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কিন্তু এইসব শিশি-বোতলের পেছনে এগুলি লুকিয়ে রেখেছিস কেন ? নিযে যা।

লেসেব গাদা হাতে নিয়ে নিজের ঘবের খাটের কাছে এসে দাঁডায অম্বি। এ লেস সহ্য করতে পারল না আম্মি, ভাবতে গিয়ে অম্বিব চোখ দুটো একবার চিকচিক করে ওঠে। এই তো সেদিন আম্মি নিজের হাতে রমার তৈরি লেস নিযে পাশেব বাড়ির বৌদিকে দেখাচ্ছিলেন। থাক সে কথা। লুকিয়ে বাখতেই তো চেযেছিল অম্বি। কিন্তু লুকোবার মতো জায়গা কই ?

সামনের আলমারিটার মাথাব উপর লেসের গাদা ছুঁডে ফেলে দিয়ে, বিছানার উপব গড়িয়ে পডে অম্বি। বুঝতে পারে অম্বি, আরও বেশি সতর্ক হতে হবে।

আপ্পি ও আম্মির সতর্কতা দেখে দুঃখ কবে না অম্বি। এসবেব জন্য কোন ভাবনা নেই অম্বির মনে। আপ্পি আর আম্মিকে সুখী করবার জন্য দুটো কানপাশা খুলে রাখতে, আর সব গান ও লেস লুকিয়ে রাখতে কষ্ট হলেও এমন কি কষ্ট ? ও ছাই কষ্ট খুব সহ্য করা যায়।

কিন্তু একটা ভয অম্বির ভাবনাগুলিকে মাঝে মাঝে অস্থিব করে তোলে। বিছানার উপর শুয়ে ছটফট করতে করতে কেঁদেই ফেলে অম্বি। কি হবে উপায়, আপ্পি আর আম্মি যদি একদিন বলে ফেলেন—তুই আর নিজেব হাতে খাবার জল-টল আমাদের দিস না অম্বি !

বাজার থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে চেয়ারের উপর বসবার পব আপ্পি যদি একদিন বলেই

দেন—থাক, তোর পাখার বাতাসে আর দরকার নেই ; অম্বির এই হাত দুটো যে তাহলে চিরকালের মতো অসাড় হয়ে যাবে।

সেই যে কবে, স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকে অম্বি, সেই যে বেবিলিতে থাকতে অসুখের সময় অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন আম্মি, তারপর আব কই ? ভাবতে গিয়ে অম্বির মাথাটাই যে তৃষ্ণার্ত হয়ে বালিশের এপাশে আর ওপাশে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কিন্তু এটা তো অম্বির জীবনের ভয় নয়। এটা দুঃখ বলা যেতে পাবে এবং সে দুঃখ গোপন করাব মতো শক্তি আছে অম্বির।

ভয় হলো সেই ভয়। আম্মির যখন মাথা ধরবে, আর আম্মির মাথা টিপে দেবাব জন্য যখন হাত বাড়াবে অম্বি, তখন যদি আম্মি মাথা সরিয়ে নিয়ে আপত্তি কবে বলে ফেলেন—সর সর, তোর হাতের সেবার দরকার নেই! তবে কি হবে উপায় ? আপ্পি আব আম্মির গা ছুঁযে পড়ে থাকবার অধিকারও যদি একদিন বন্ধ হযে যায়, তবে সে দুঃখ গোপন কবাব মতো মনেব জোর থাকবে তো ?

কেন থাকবে না ? একটা শান্ত হযে ভাবতে থাকে অম্বি। তা হলেও সহ্য কবতে হবে, আর আপ্পি ও আম্মি যেন একটুও বুঝতে না পাবেন, কত কষ্টে সহ্য কবেছে অম্বি সেই দুঃখকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। কাজ করতে হবে। কিন্তু কোন কাজ ? রমার সঙ্গে যেন কোন তুলনার মধ্যে না পড়তে হয়, সেই সব কাজ। রমা যেসব কাজ কবে না, সেই সব কাজেই এই হাত দুটোকে এবার উৎসর্গ কবে দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয় অম্বি। বমা থাক লেখাপড়া গান আর লেস নিযে। আর অম্বি থাকবে শুধু. ঐ তো দেখা যায আপ্পির জুতোগুলিতে একেবাবেই পালিশ নেই। মনে পড়ে, ঝিয়ের হাতের কাচা কাপড় দেখে একটুও যেন খুশি হন না আম্মি।

বিছানা থেকে উঠে কাজে মন দেয় অম্বি। এ ঘব থেকে ও ঘব ঘুবে ঘুবে হাত দুটোকে দিয়ে জুতো পালিশ কবিযে আর কাপড় কাচিযে যেন জীবনেব সেই ভযটাকে একেবারে ক্লান্ত করে দিতে থাকে অম্বি।

উপেনবাবু বললেন—ভাবতে ভালও লাগছে, আবাব আব একদিকে মনটা খাবাপ লাগছে।

চারুবালা—কেন ?

উপেনবাবু—রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের জন্য যদি প্রস্তাব করি, তবে অধীর আপত্তি করবে না বলেই মনে হচ্ছে।

চারুবালা—আমারও তাই মনে হয়।

উপেনবাবু—রমাকে নিয়ে তো আর সমস্যা নেই। কথা হলো, তারপর অম্বির জন্য কি উপায় হবে ? সেই জন্যই মনটা খারাপ লাগছে।

সম্পর্কে উপেনবাবুর আত্মীয়ই হয অধীব, এবং খুব বেশি দূরের সম্পর্কও নয়। বেশ ভাল ছেলে। গণিতের এম এ, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, এবং এক বীমা কোম্পানিতে আজ এক বছর হলো ভালো মাইনের একটা কাজও পেয়ে গিয়েছে। অধীরের খুড়িমাও এসে বলে গিয়েছেন—ভাল পাত্রী পেলে, এইবার ছেলেটাকে সংসারে বসিয়ে একবার কেদার-বদরী ঘুরে আসতেন।

এর মধ্যে অধীরও কয়েকবার এসেছে, পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে এই নতুন বাড়িতে। উপেনবাবু আর চারুবালার সঙ্গে গল্প করে চলে গিয়েছে অধীর। একটু তফাতে একটা সোফার উপর

পাশাপাশি বসে গল্প শুনেছে রমা ও অম্বি।

উপেনবাবু বলেছেন—ঐ, ওদের মধ্যে ঐটি হলো আমার মেয়ে রমা, আর ঐটি হলো অম্বি, আমার মেয়ের মতোই।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় অম্বি, যেন নির্মম এক বিদ্রূপের আঘাত ওর মুখের রং মুহূর্তের মধ্যে কালো করে দিয়েছে।

একদিন এসে, কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা রমার একটা প্রবন্ধের খুবই প্রশংসা করে অধীর। সুন্দর ভাষা এবং ইংরেজি কবিতা সম্বন্ধে এই সব নতুন নতুন কথা এত ভাল করে গুছিয়ে যে বলতে পারে, তাঁর মন ও মনের সুরুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

প্রশংসা শুনে রমা লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। উপেনবাবু ও চারুবালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উপেনবাবু বলেন—রমার গান তো তুমি এখনো শোন নি অধীর!

অধীর বলে—হ্যাঁ, একদিন এসে শুনতেই হবে।

অম্বি রমার কানে-কানে কি যেন বলে। চারুবালা ও উপেনবাবু দুজনেই উদ্বিগ্নভাবে ও ব্যস্তভাবে বলেন—কি? কি শেখাচ্ছে অম্বি?

রমা লজ্জিতভাবে বলে—এখনি গাইতে বলছে। কিন্তু..।

অধীর বলে—না, না, এত তাড়াহুড়োর কি আছে। আর একদিন হবে।

অধীর চলে যাবার পর চারুবালা অম্বিকে বলেন—বাইরের লোকের সামনে ছেলেমানুষি করিস না অম্বি।

দিন পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। ভাদ্রতাটা তো পার হতেই চলল। ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন উপেনবাবু আর চারুবালা। এইবার প্রস্তাবটা করে ফেলতেই হয়। অধীরের খুড়িমাকে হয় একবার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে, নয় তো নিজেরাই গিয়ে..।

ট্যাক্সির হর্নের শব্দে ফটকের দিকে তাকাতেই দেখা যায়, অধীরের খুড়িমা ধীরে ধীরে আসছেন।

উপেনবাবু উল্লাসের সুরেই বলেন—আপনার কথা চিন্তা করা মাত্র যখন আপনি এসে গিয়েছেন, তখন বুঝেছি নিশ্চয় সুসংবাদ আছে।

খুড়িমা হাসেন—হ্যাঁ, সুসংবাদ আছে। ছেলে বিয়ে করবে, পাত্রীও সে পছন্দ করে ফেলেছে। এখন তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলেই...।

আকস্মিক আনন্দে বিচলিত হয়ে চারুবালা বলেন—কোনই আপত্তি নেই। তবে উনি চাইছিলেন, পরীক্ষাটা হয়ে যাবার পরে কোন তারিখে যদি বিয়ের দিন .

খুড়িমা—কার পরীক্ষা?

চারুবালা—রমার।

খুড়িমা—রমার পরীক্ষা রমা দিক না। অম্বির তো আর কোন পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই!

চারুবালা চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বি?

উপেনবাবু প্রশ্ন করেন—আপনি কি অম্বির কথা বলছেন?

খুড়িমা—হ্যাঁ, অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

নীরব হয়ে গেলেন উপেনবাবু ও চারুবালা।

খুড়িমা বলেন—কি হলো? তোমাদের দিক থেকে কি কোন অসুবিধা আছে?

উপেনবাবু বলেন—না, আমাদের আর অসুবিধা কি? কিন্তু...।

খুড়িমা—আমিও কিন্তু কিন্তু করেছিলাম, কিন্তু ছেলে সে-সব আপত্তি শুনতে চায় না।

উপেনবাবু বলেন—কার মেয়ে, আর কি জাতের মেয়ে, সে-সব কথা অধীর যদি জানতে পেত, তবে বোধহয়...।

খুড়িমা—জানতে চাই না। আমি কি আর কথাটা তুলিনি মনে করেছ? কিছু বললেই বলে, এখন তো অম্বি উপেনবাবুরই মেয়ে।

চমকে ওঠেন দুজনেই। বোবার মতো তাকিয়ে থাকেন উপেনবাবু।

চারুবালা বলেন—অম্বি যে লেখাপড়া কিছুই শেখেনি।

খুড়িমা—তাও জানি, আর ছেলেও সব শুনেছে। তবুও...।

কি কঠিন ও নির্মম খুড়িমার মুখের এই কথাটা—তবুও। উপেনবাবু ও চারুবালার সারা-জীবনের সতর্কতার সাধনা ব্যর্থ করে আর মিথ্যা করে দিয়ে সংসারে একটা ভয়ংকর তবুও জেগে উঠেছে। তাঁদের সব সঙ্কল্প ও পরিকল্পনার পিছনে একটা বিদ্রূপের অম্বি যেন কুড়ি বছর ধরে আক্রোশ নিয়ে ছুটে ছুটে এসে এতক্ষণে চরিতার্থ হয়েছে।

চারুবালা খুড়িমার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমাদের কোনই আপত্তি নেই, অম্বি যদি আপত্তি না করে।

খুড়িমা উঠলেন—তাহলে তাই করো, অম্বিকে জিজ্ঞাসা করে তারপর খবর দিও।

চলে গেলেন খুড়িমা।

বার বার মনে পড়ে খুড়িমার মুখের ঐ ভযানক কথাটা—তবুও। উপেনবাবুব মনেব সব ভাবনা যেন ভয় পেয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এত বাধা-নিষেধ, তবুও। এত সতর্কতা, তবুও আজ কুড়ি বছর ধরে সব অরণ্যের বাধা ভেদ করে আর পাহাড়ের বাধা ছাপিয়ে গোদাবরীর সেই শাখাস্রোতের আত্মাটা ছুটে এসেছে, কেউ তার গতি রোধ করতে পারেনি।

—এ কি করে সম্ভব হয়? করুণ আক্ষেপের মতো উপেনবাবুর কথাগুলি কাঁপতে থাকে।

চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কি?

উপেনবাবু—এই যে রমাকে পছন্দ না করে অম্বিকে পছন্দ কবল অধীর।

চারুবালা—জানে তোমার ভগবান, আমি এ ছাই অনাসৃষ্টির কিছু বুঝি না।

—তাহলে কি...? কথাটা সমাপ্ত না করেই নীরব হয়ে রইলেন উপেনবাবু। যেন বিরাট একটা প্রশ্ন ভূমিকম্পের মতো তাঁর মনের অতলের ঢেউগুলিকে ছন্দহারা করে দিযেছে। তাহলে কি রূপ গুণ কুল মান ও শিক্ষা ছাড়াও এবং এসবের উপরেও কিছু আছে? কুযাশামাখা সূর্যের মতো রহস্যময় একটা কিছু। নইলে রমাকে পছন্দ না কবে অম্বিকে পছন্দ করে, এ কোন্ প্রেমের চক্ষু?

জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে উপেনবাবু বলেন—যাক, এসব ফিলসফি চিন্তা করে আর কোন লাভ নেই। অম্বিকে জিজ্ঞাসা করে অধীরের খুড়িমাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও। লেঠা চুকে যাক।

চারুবালা—অম্বিকে জিজ্ঞাসা করবার আর দরকারই বা কি? রাজি তো হয়েই আছে। এই কাণ্ডটি করবার জন্যই বোধহয় এ বাড়িতে মেয়ের মতো হয়ে ঢুকেছিল। খুব শিক্ষা দিল অম্বি। শত্রুতেও যেন আর পরের মেয়েকে আপন মেয়ের মতো করে না পোষে।

চারুবালার ক্ষোভ যেন থামতে চায় না। উপেনবাবুও শুকনো হাসি হেসে বলতে থাকেন—কি অদ্ভুত অদৃষ্ট! নিজেরই মেয়ের মতো, তবু ওর বিয়ের কথা শুনে আনন্দ কবতে পারছি না।

চারুবালা বলেন—বেরিলিতে থাকতে নিউমোনিয়া করে যে অম্বি আমাকে একটা মাস রাত জাগিয়ে হাড়-মাস কালি করে দিয়েছিল, সেই অম্বিই কি না আজ...।

বোধহয় বলতে চান চারুবালা, সেই অম্বিই আজ তার আম্নি আর আম্মির স্নেহমমতার ঋণ শোধ দিল এইভাবে? এই রকম অপমান করে আর সব সতর্ক পরিকল্পনা মিথ্যা করে দিয়ে?

আরও স্পষ্ট করে এবং হিসাব করে আজ উপেনবাবু অনুভব করতে পারছেন—আজ এই প্রথম নয় ; সেই গঞ্জাম থেকেই শুরু হয়েছে অম্বির জয়ের আর তাঁদের পরাজয়ের ইতিহাস। পরাজয়টা শুধু এতদিনে চরমে এসে পৌঁছেছে। মেয়ের মতো হয়েও অম্বি আজ কি জানি কিসের গর্বে তাঁদের নিজের মেয়েকে ছোট করে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সহ্য করতে কষ্ট হয়, ভাবতেও ভালো লাগে না। উপেনবাবু আর চারুবালার এই কুড়ি বছরের যত স্নেহ ও মমতার সব শ্রী ও গৌরব চূর্ণ করে দিল অম্বি।

—যাক অনেক ভুল হয়েছে, আর ভুল করতে চাই না। উপেনবাবু বেড়াতে বের হবার জন্য চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর শেষ সতর্কতার সংকল্প ব্যক্ত করেন—যাক, পরের মেয়েকে কুড়ি বছর ধরে পোষা আর নিজের মেয়ের মতো মনে করাই ভুল হয়েছে! এখন ভালোয় ভালোয় পরকে পরের মতোই বিদায় করে দাও।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ উপেনবাবু বারান্দার উপব আরাম-চেয়ারে শুয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন। পাশেব ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থেকে একটা করুণ শব্দ যেন বোবা হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ তো সেদিনের সেই মুখচোরা গানের শব্দ নয়, মুখচোরা কান্নার শব্দ।

ব্যস্তভাবে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন উপেনবাবু—কাঁদছে কেন অম্বি ?

চারুবালা—ও কাঁদছে ওর মনের শখে, আমি কি করব বলো ?

উপেনবাবু—বিয়ের কথা বলেছ ওকে ?

চারুবালা—হ্যাঁ!

উপেনবাবু—কি বললে অম্বি ?

চারুবালা—ঐ তো শুনতে পাচ্ছ, যা বলছে।

উপেনবাবু—এ তো কাঁদছে শুধু। হাঁ-না কিছু বলেনি ?

চারুবালা—না, কোন কথা বলেনি।

উপেনবাবু—তার মানে হলো, রাজি আছে।

চারুবালা অপ্রসন্নভাবেই বলেন—তাই তো, রাজি না হবাব কি আছে ?

অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এবং বিচলিতভাবে নিঃশ্বাসও ফেলছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও থেকে থেকে ছটফট করে উঠছিলেন। কিন্তু না, আর না, মনের দুয়ার বন্ধ করে এইবার বেশ একটু শক্ত হয়েই বসেছেন দু'জনেই। আর ভুল নয়। যে মেয়ে নিজের মেয়ে নয়, মেয়ের মতোও নয়, একেবারে আস্ত একটা পরের মেয়ে, তার কান্নার কাছে নিজেদের আর দুর্বল করে ফেলতে চান না উপেনবাবু আর চারুবালা।

—আপ্পি! দরজা খুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটা পাখা হাতে নিয়ে উপেনবাবুর সামনে দাঁড়ায় অম্বি। উপেনবাবুর ক্লান্ত শরীরের উপর বাতাস দেবার জন্য পাখা তুলতেই উপেনবাবু বলেন—থাক, পাখা রেখে দিয়ে বস।

চমকে ওঠে অম্বির হাত। অম্বির হাতের পাখা মেঝের উপর পড়ে গিয়ে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। উপেনবাবুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। এতদিনের সেই ভয়ের চাবুকটা এসে এইবার সত্যিই অম্বির মনের সব কল্পনাকে একটি আঘাতেই একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন সহ্য করার শক্তি খুঁজছে অম্বি। আপ্পি আর আম্মি যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন, অম্বিব মনের ভিতর কোন দুঃখ অভিযোগ আর বিদ্রোহ আছে।

অম্বিই দেখে আশ্চর্য হয়, আর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, আমি আর আম্মি বসে রয়েছেন মুখ করুণ করে, যেন দুটো শিশুর মুখ। কেউ যেন দু'জনকে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে আর ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই অভিমান।

উপেনবাবুর গায়ের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অম্বি। উপেনবাবুর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে অম্বি বলে—আমার বিয়ে দিও না আপ্পি।

উপেনবাবু—সে কি কথা !

অম্বি বলে—আমাকে পরের বাড়ি পাঠিও না। আমি চিবকাল এখানেই থাকব। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও বেঁচে থাকব।

চারুবালা বলেন—আবোল-তাবোল কথা বন্ধ করে শান্ত হয়ে বস অম্বি।

অশান্ত, দুরন্ত আর অবুঝ মেয়ের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে অম্বি —আমাব বিয়ে হবে, রমারও বিয়ে হবে, তারপর তোমাদের দেখবার জন্যে থাকবে কে ? আমি বিয়ে কবব না আম্মি।

চমকে ওঠেন উপেনবাবু আর চাকবালা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। একি বলে অম্বি, পূর্ব গোদাবরীর একটা পাতার ঘরের ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনা আর শেযালেব মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা অতি অন্ত্যজ একটা পরের মেয়ের প্রাণ ? এসব কথা কি একটা মেয়ের মতো মেয়ের প্রাণের উদ্বেগ ? না, মেয়ের-চেয়ে-বড় একটা সত্তার ব্যাকুলতা ?

চাকবালা বলেন—সে চিন্তা তোর কেন অম্বি ?

অম্বি—চিন্তা না করে পারছি না আম্মি।

উপেনবাবু বিচলিতভাবে বলেন—হেসে হেসে কথা বল অম্বি. নইলে আমি তোব কোন কথাই শুনব না।

অম্বি—হাসতে পারছি না আপ্পি। আমি যে তোমাদের . ।

চুপ করে অম্বি। ঘরের অন্তরাত্মা যেন ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'কান সজাগ বেখে একটা কথা শুনবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, যে কথা আজ পর্যন্ত অম্বিব মুখে কোনদিন শোনা যায়নি।

অম্বি বলে—আমি তো তোমাদের ছেলের মতোই। চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকব।

বুকের ভিতরে যেন একটা ধাক্কা লেগেছে, আবার চমকে ওঠেন উপেনবাবু ও চারুবালা। কুড়ি বছরের একটা নীরব বিদ্রোহ, একটা শান্ত অভিমান যেন এতদিনে মুখ খুলে ফেলেছে।

—আমাকে কথা দাও আম্মি। চারুবালার একটা হাত শক্ত করে দু'হাতে জড়িয়ে ধবে চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন চারুবালা।

অম্বির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন উপেনবাবু। অকস্মাৎ একটা বিস্ময়ের ঝড় এসে যেন তাঁর মনের যত ভুলের আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়ের-মতো তো নয়, তাঁদের আত্মারই মতো এই মেয়েটা আজ বিশ বছর ধরে তাঁদেব সব ভুলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। পরাজয় সম্পূর্ণ হলো এতদিনে, এবং এই পরাজয়েও এব আনন্দ ছিল ?

গলার স্বরের কাঁপুনি সংযত করে আস্তে আস্তে উপেনবাবু বলেন—তোর বিয়ে না দিয়ে পারব না অম্বি, তুই তো আমাদেরই... ।

চেঁচিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে অম্বি—বলো না, আর ওকথা বলো না আপ্পি। সহ্য করতে পারি না।

হেসে ফেলেন উপেনবাবু। —তুই তো আমাদেরই মেয়ে।

ঘরের বাতাস কয়েক মিনিট একেবারে নিস্তব্ধ হয়েই থাকে। চারুবালার কাঁধের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে বসে থাকে অম্বি। যেন বিশ বছরের একটা অভিযোগ এতদিনে শান্ত হলো।

উপেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চারুবালা বললেন—অধীরের খুড়িমাকে কালই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, তারপর...।

চারুবালার কথা শেষ না হতেই ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি।—আম্মি!

উপেনবাবু আর চারুবালা এক সঙ্গেই বিচলিতস্বরে বলতে থাকেন।—ছি ছি, ওরকম করতে নেই অম্বি। সব মেয়েরই বিয়ে হয়, আর বাপ-মাকে ছেড়ে থাকতেও হয়।

রুপো ঠাকরুনের ভিটে

খিদিরপুরের সঙ্গে এই ছোট জগৎপুরের কোন মিল নেই। জায়গাটাকে সত্যিই ছোটখাট একটা ভিন্ন জগৎ বলেই মনে হয়েছে শুক্তির। পাঁচ ক্রোশ দূরে রেললাইন, আর তিন ক্রোশ দূরে টেলিগ্রাফের লাইন। তবুও ভাল।

এই তো মাত্র তিনটি দিন পার হয়েছে। মস্ত বড় একটা পালকি রেলস্টেশন থেকে খিদিরপুরের মেয়ে শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে এসেছে এখানে। আট জোড়া বেহারার পা তিন ক্রোশ কাঁচা সড়কের ধুলো আর দু'ক্রোশ ডাঙ্গা আর জাঙ্গালের ধুলো মাখতে মাখতে ছোট জগৎপুরের ভিতর ঢুকতেই চাষীদের ঘরের আঙিনা থেকে চিৎকার করে ছুটে এল এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—বউরানী বউরানী। চলন্ত পালকির দরজার কাছে এগিয়ে এসে উকিঝুঁকি দিয়ে ছোট জগৎপুরের বউরানীকে দেখতে থাকে ছেলেমেয়ের দল। তারপরেই ব্যস্তভাবে পথের এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ, পালকির ঠিক পিছনেই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন রাজাবাবু। ঘোড়ার গলার ঘুঙুর বাজে ঝুম্‌ঝুম্ করে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে রাজাবাবুর, বউরানীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরছেন।

এরই মধ্যে একদিন বৌ-কথা-কও-এর ডাক শুনেছে শুক্তি। অনেক চেষ্টা করেছে পাখিটাকে দেখবার জন্য, কিন্তু দেখতে পায়নি। ঠিক বুঝতে পারা যায় না, কোন্ গাছের আড়ালে কোথায় বসে পাখিটা ডাকছে। মনে হয়, শুধু একটা ডাক এই বাতাসের মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়ে আকাশের এদিকে-ওদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। তিন দিনের মধ্যেই শুক্তির বড় বেশি ভালো লেগে গিয়েছে ছোট জগৎপুরের পাখির ডাক।

তিন দিন ধরে নহবতের স্বর অশ্রান্তভাবে বেজে বেজে আজ থেমেছে। কুটুম্ব-আত্মীয়রা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও সবাই বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। প্রজাবাড়ির যত ছেলেমেয়ে এসেছিল মেঠাই নেবার জন্য, তাদেরও হুল্লোড় থেমেছে, চলে গিয়েছে সবাই। বিকাল হবার আগে একদল চাষী-মেয়েও এসেছিল বউরানীর মুখ দেখবার জন্য। মুখ দেখে খুশি হয়েছে তারা, তারপর আধ সের করে চিঁড়ে পেয়ে আরও খুশি হয়ে সবাই চলে গিয়েছে।

তিন দিন ধরে মুখ দেখাতে দেখাতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শুক্তি। অমুক পণ্ডিতমশাই, অমুক গুরুঠাকুর, আর অমুক বড়ঠাকুর, দূরের এই গ্রাম আর সেই গ্রাম থেকে নানা ধরনের মানুষ এসেছে আশীর্বাদ করতে। শুধু মুখ দেখাতে দেখাতে নয়, প্রণাম করতে করতেও ঘাড়ে যেন ব্যথা ধরে গিয়েছে। তবুও ভালো, একটুও খারাপ লাগে না শুক্তির।

একটু হাঁফ ছাড়বার জন্যই, অথবা ছোট-জগৎপুরের আকাশটাকে একটু ভালো করে

দেখবার জন্যই বাড়ির ছাদের উপর এসে দাঁড়ায় শুক্তি। যতদূর দেখা যায়, দূরের ও নিকটের সব দৃশ্যগুলিকেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে থাকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে শুক্তি। দূরের ঐ নদীর পাশে গাছের ভিড়ের ভিতর থেকে সেই রকমের একটা মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়। চূড়ার উপর আবার ঠিক সেই রকমই একটা ত্রিশূলও যে রয়েছে! অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে আর মুখ কালো-কালো করে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

একটা অশান্ত হয়ে ওঠে শুক্তির মন। একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনের ভিতর বিঁধতে থাকে। ঐ দুঃসহ দৃশ্যটা যে চার বছর আগের একটা আর্তনাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়! শুক্তির এই নতুন জীবনের শান্তি ও আনন্দকে বিদ্রূপ করার জন্যই দৃশ্যটা যেন একটা হিংসুক চোরা-দৃষ্টির মতো দূর খিদিরপুরের গাছপালার ভিতর থেকে বের হয়ে, আর আড়ালে পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে এখানে ঠাঁই নিয়েছে। খিদিরপুরে আর ছোট-জগৎপুরে কোথাও কোন মিল নেই। সেকেলে দুর্গের মতো গড়ন এই বাড়িটার সঙ্গে খিদিরপুরের একেলে বাড়িগুলির কোন মিল নেই, তবে এক জায়গায় এই মিল আর এত কুৎসিত মিল কেন?

চার বছর আগের একটি সায়াহ্নের একটা ঘটনা মাত্র, বুদ্ধিহীন কয়েকটা মুহূর্তের ভুল মাত্র। খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে যেন দৃশ্যটার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আর পাশের একটা পরিচিত মুখের কাছ থেকে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠেছিল শুক্তি, সেই ধরনের একটা দৃশ্যকে যে এখানেও তৈরি করে রেখেছে ঐ নদীর তীর, গাছের ভিড়, মন্দিরের চূড়া আর ত্রিশূল। হাতধরা একটা লুব্ধ ও উন্মাদ অনুরোধের কাছ থেকে সরে যেতে পারেনি শুক্তি, যে ঘটনা মনে পড়তে কতবার মুখ কালো করেছে, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে কতদিন কেঁদেও ফেলেছে শুক্তি, যে ঘটনার কথা স্মরণ করে আজ চার বছর পরে নিজেকে ঘৃণা করেছে, অশুচি বোধ করেছে, আর হঠাৎ আতঙ্কে সুস্বপ্নও ভেঙে গিয়েছে শুক্তির, সেই ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ঠিক সেই ধরনের একটা দৃশ্য এখানে আবার কেন?

কিন্তু এটা তো খিদিরপুরের বাড়ির ছাদ নয়, ছোট-জগৎপুরের রাজবাড়ির ছাদ। তবে আর কিসের ভয়? মিথ্যা আর অকারণ ভয়। আনমনার মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, তা সে জানে না। হঠাৎ চোখে পড়ে, পুবের দিকের আকাশটা সত্যিই মেঘলা হয়ে উঠেছে। সেই রকমই একটা মেঘ ভেসে আসছে ঐ মন্দিরের দিকে। সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। পশ্চিমের আকাশ সেই রকমের লাল আর পুবের আকাশটা সেই রকমের কালো। ঐ মেঘটা মন্দিরের ত্রিশূলকে তো এইবার ছুঁয়েই ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ঝিলিক দিয়ে উঠবে সেই চার বছর আগের দিনটার মতো ও সেই রকমেরই একটা বিদ্যুৎ। সেই মুহূর্তে কানের কাছে বেজে উঠবে একটা ভয়ংকর অনুরোধ। তারপর. সে ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনো শিউরে ওঠে শুক্তি। মনে পড়ে, তার কিছুক্ষণ পরেই তৃপ্ত ও সফলকাম একটা সর্বনেশে পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি ধরে নিচে চলে গিয়েছিল। মাগো!

চোখের উপর আঁচল চেপে ছটফট করে, ঠিক চার বছর আগে খিদিরপুরের বাড়ির ছাদে যেভাবে চোখে আঁচল দিয়ে একটা ভুলের জ্বালা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল শুক্তি।

আস্তে আস্তে একটা শান্ত পায়ের শব্দ সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে, তারপরেই ব্যস্তভাবে যেন ছুটে এসে শুক্তির কাছে দাঁড়ায়।

শুভেন্দু বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েই বলে—এ কি, তুমি কাঁদছো শুক্তি?

চোখের উপর থেকে আঁচল তুলে নিয়ে হেসে ওঠে শুক্তি—কে বললে কাঁদছি? চোখে জল দেখছো?

শুভেন্দু হাসে—না। তবে চোখে আঁচল চেপে কি করছিলে?

শুক্তি—তোমার পায়ের শব্দ শুনছিলাম।

শুভেন্দু—কি করে বুঝলে আমার পায়ের শব্দ ? অন্য কারও পায়ের শব্দও তো হতে পারতো ?

শুক্তির মুখের হাসি হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিটাও কেমন করুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই হেসে অস্থির হয়ে মুখের উপর আঁচল চাপে শুক্তি—ধেৎ।

শুভেন্দু—কি হলো ?

শুক্তি—যা খুশি তাই বলা হচ্ছে, মুখে একটুও বাঁধছে না !

হাসিয়ে দেবার আর ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে শুক্তির ! শুভেন্দু সত্যিই প্রসন্নভাবে হাসতে থাকে। সে-হাসির ছোঁয়া লেগে শুক্তির এতক্ষণের যন্ত্রণাটাও যেন নিঃশেষে মুছে যেতে থাকে। ও ছাই একটা দৃশ্য দেখে এত বিচলিত হবার কোনই দরকার ছিল না। কবেকার কোন এক অন্ধকারের দাগ, পৃথিবীর কারও চোখে ধরা পড়েনি, কোনদিন কেউ জানতেও পারবে না। তবে বৃথা আর মনটাকে এত ভাবিয়ে তুলে লাভ কি ? শুক্তির মুখের হাসি দেখে যে ছোট জগৎপুবের মন এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছে, সেই ছোট-জগৎপুরকে চিরকাল এমনি করেই হাসিয়ে ও ভুলিয়ে বাখলেই তো হলো। শুক্তি জানে, সে ক্ষমতা তার আছে।

শুভেন্দুরও ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে, এই যে এত সুন্দর দেখতে একটি মানুষ—যার সঙ্গে জীবনে কোনদিন পরিচয় ছিল না, সে কি করে মাত্র সাতটা দিনের মধ্যে শুভেন্দুর সঙ্গে এত আপন হয়ে যেতে, আর শুভেন্দুকে এত আপন করে নিতে পারল ? অন্য মেয়ে হলে কি করত বলা যায় না, কিন্তু শুক্তি আশ্চর্য করেছে, এই ক'দিনের মধ্যে এই গেঁয়ো ছোট-জগৎপুরকেই ভালোবেসে ফেলেছে শুক্তি। ঝিঁ-ঝি-ডাকা সন্ধ্যা আর ফেউ-ডাকা রাত্রিকেও অবাক হয়ে জানালার ধারে বসে, চোখ মেলে দেখেছে শুক্তি। এতটা আশা করেনি শুভেন্দু। বরং একটু আশঙ্কাই ছিল, শহরের শিক্ষিতা মেয়ে ছোট-জগৎপুরের মতো এমন একটা জগৎছাড়া গ্রামকে ভাল লাগিয়ে নিতে পারবে কি না। কিন্তু সে আশঙ্কা মিথ্যা করে দিয়েছে শুক্তি। আজই সকালে, একটা বাচাল বউ-কথা-কওকে দেখবার জন্য ঘব থেকে বের হয়ে একেবারে দেউড়ির বাইরে গিয়ে, গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি, অনেকক্ষণ। ভুলেই গিয়েছিল শুক্তি, সে হলো এ বাড়িব বউ, নতুন বউ, আর জগৎপুরের বউরানী। তা ছাড়া, বাড়িতে এতগুলি কুটুম মানুষ যখন রয়েছে তখন. কিন্তু এই ছোট-জগৎপুবের আলোছায়া আর শব্দকে আপন করে নেবার টানে সে-সব ঘোমটা-ঢাকা নিয়মও ভুলে গিয়েছে শুক্তি।

আরও সুখের কথা, শুক্তিকে দেখে, তার চেয়ে বেশি শুক্তির ব্যবহার দেখে কুটুমেরা একটু মুগ্ধ হয়েই গিয়েছেন। এই তো চাই ! এরই মধ্যে যে-মেয়ে এত আপন করে নিয়েছে শ্বশুরবাড়ির জীবনকে, সে মেয়ে সুখী হবেই।

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন শুভেন্দুর মা। তাঁর ইচ্ছা, নতুন বউ যেন এক মুহূর্তের জন্যও মনে না করতে পারে যে সে পরের বাড়িতে আছে। এরই মধ্যে শুভেন্দুকে সাবধান করে দিয়েছেন মা।—বউ আমার হাসবে খেলবে আর ঘুরে বেড়াবে। বাড়ির মেয়ের মতো থাকবে। যা, কালই সকালে দু'জনে গিয়ে জগৎপুরের লক্ষ্মীর মন্দিরে পুজো দিয়ে আয়।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বলে—কাল তোমার একটা পরীক্ষা আছে।

শুক্তি—পরীক্ষা ? কিসের ?

শুভেন্দু হাসে—তুমি কত বড় লক্ষ্মী সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে।

চুপ করে কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবে শুক্তি। শুভেন্দু ঠাট্টা করে—কি, ভয় পেয়ে গেলে

নাকি ?

শুক্তি—ভয় ? ভয় করবার কি আছে ?

শুভেন্দু—না করলেই হলো।

শুক্তি—আমি ভয় করবার মানুষ নই। নইলে এখানে আসতাম না।

শুভেন্দুর হাত ধরে টান দেয় শুক্তি।—চল কোথায় যাবে ? কোথায় তোমার পরীক্ষা ?

শুভেন্দু হাসে—আজ নয়, কাল সকালে।

এখন তো কোন ভয় নেই শুক্তির মনে, এখানে আসবার আগেও খুব বেশি কিছু ছিল না। বরং ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন বাড়ির আর সবাই।—স্টেশন থেকে দশ মাইল ধুলো আর চোরকাঁটা ডিঙিয়ে তবে পৌঁছতে পারা যায় ছোটজগৎপুর, চিঠি পৌঁছয় তিন দিনে। এ তো প্রায় জগৎছাড়া একটা জায়গা!

মনের মধ্যে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়েই ছোট-জগৎপুরের পাত্র সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন বাড়ির সকলেই। পাত্র ভালই, ছোট-জগৎপুরের ষোল-আনার মালিক। বয়স আর চেহারার দিক দিয়ে পাত্র ভালই। লেখাপড়ার দিক দিয়েও। ঐ জেলারই সদর কলেজে পড়ত, বি-এ পাশ করেছে আজ চাব বছর হলো। তবে এটা বোঝা যায়, শহরের জীবন আর চালচলন থেকে ছেলেটি যেন একটু দূরেই সরে থাকতে চায়। কলকাতায় একটা ভালো চাকরি পেয়েও নেয়নি। দুটো ট্র্যাক্টর কিনেছে এবং মাইনে দিয়ে একজন পাশ-করা কৃষি ওভারশিয়ারকেও রেখেছে। ছেলেটির মতিগতি দেখে মনে হয়, নিজের রাজ্যে রাজাবাবু হয়ে আর ছোট-জগৎপুরের মাটি ঘেঁটে ঘেঁটেই সে তার জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। ভালই তো।

কিন্তু ভয় ছিল, শুক্তি পছন্দ করবে কি না এই বিয়ের প্রস্তাব। যে-রকম মুখচোরা মেয়ে, মনে আপত্তি থাকলেও মুখে কিছু বলবে না। আজ চার বছর ধরে কত প্রস্তাবই তো এল আর গেল, কিন্তু শুক্তির মুখ থেকে পছন্দ-অপছন্দেব একটা সামান্য হাঁ বা না, মুখের ভাবে আগ্রহ বা অনিচ্ছার সামান্য একটু ইঙ্গিতও কোনদিন দেখা গেল না। এই সম্বন্ধটা আবার একটু অন্য রকমের। একেবারে গাঁ-দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ, যে গাঁ-দেশের চেহারা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই শুক্তির। সুতরাং শুক্তির মনে আপত্তি থাকলে, এই বিয়ের অর্থ হবে মেয়েটাকে জোর করে বনবাসে পাঠানো।

কিন্তু মুখচোরা মেয়েই সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে মুখ খুলল।—এখানেই ভাল। হোক না গাঁ-দেশ, শহরের চেয়ে আর কত বেশি খারাপ হবে ?

এমনিতে দেখে মনে হয়, যেন কিসের একটা ঘেন্নায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে অশান্ত ও জনতাপীড়িত এই শহুরে জীবনের স্পর্শ থেকে বনবাসে চলে যাবার জন্যই একটা জেদ মনের মধ্যে পুষে নিয়ে চারটা বছর অপেক্ষা করছিল শুক্তি। যেই সুযোগ এল অমনি চলে গেল।

ছোট-জগৎপুরকে এত ভাল লেগে যাবে, এটাও কল্পনা করতে পারেনি শুক্তি। ভাবতে গিয়ে আরও আশ্চর্য হয় শুক্তি, ছোট-জগৎপুরকে চোখে দেখার আগেই যেন জায়গাটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। কবে, কোনদিন থেকে, তাও মনে করতে পারে শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের মানুষটির সঙ্গে পাঁচ মিনিটের আলাপের পরেই, এই তো মাত্র পাঁচ দিন আগে, মাঝ-রাতের বাসরঘর যখন নিরালা হলো, তখন।

বলেছিল শুভেন্দু—আমি তো ভেবেছিলাম, গাঁয়ের মানুষকে দেখেই ভয় পেয়ে তুমি মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

শুক্তি—আমিও তো ভেবেছিলাম, শহরের মেয়েকে দেখেই কে-জানে কি মনে করে তুমি চমকে উঠবে।

শুভেন্দু—আমি চমকে উঠেছিলাম ঠিকই, আমার এত সুন্দর ভাগ্য দেখে।

ছোট-জগৎপুরের একটা কৃতার্থ ও প্রসন্ন প্রাণ সেই যে শুক্তির হাত ধরল, কোথায় রইল শুক্তির ভয়। না-দেখা গাঁ-দেশ ছোট-জগৎপুরকে যেন সেই মুহূর্তে ভালবেসে ফেলেছিল শুক্তি।

ছোট-জগৎপুরই একটা ছোট জগৎ এবং বাড়ি বলতে এই একটি মাত্র বাড়ি, যার নাম রাজবাড়ি। আর সবই কুঁড়েঘর। পথে বের হয়ে শুক্তি অবাক হয়ে যায় গাঁয়ের চেহারা দেখে। এখানে-সেখানে ডোবা, এদিক-ওদিকে কাঁটার ঝোপ। এক জায়গায় ঘন সবুজ পাতায় ঠাসা হাজার হাজার বুনো লতা সাপের মতো দেহ জড়াজড়ি করে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুরকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। বুঝতে পারা যায় না, সাপগুলিই লতার মতো হয়ে গিয়েছে, না লতাগুলি সাপের মতো হয়ে গিয়েছে।

—ওটা কি? দূরে উঁচু ইটের ঢিবির মতো একটা জায়গা, তার সারা গায়ে জংলা গাছের সাজ। শুক্তির প্রশ্ন শুনে উত্তর দেন শুভেন্দু—ওটা একটা রাসমঞ্চ।

রাসমঞ্চের রূপ দেখে চক্ষু স্থির হয়ে যায় শুক্তির। হঠাৎ কতগুলি শালিক কর্কশ স্বরে ডেকে ডেকে উড়তে থাকে, আর রাসমঞ্চের জংলা ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া করে সাদা-কালো একটা জীব।

শুক্তি—ওটা আবার কি?

শুভেন্দু—বাঘডাঁস।

শুক্তি—অ্যাঁ?

শুভেন্দু হাসে—বাঘ নয়।

হেসে হেসেই পথ চলতে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে উঠলেও এরকমের ভয়কে একটুও ভয়াল বলে মনে হয় না শুক্তির, বরং ভালোই তো লাগে।

ছোট-জগৎপুরের রূপ আর প্রাণের পরিচয় বর্ণনা করতে থাকে শুভেন্দু। যেন এক আশ্চর্য দেশের মেয়েকে এক অদ্ভুত দেশের পরিচয় শোনাচ্ছে। শুনতে শুনতে কখনো চক্ষুস্থির হয়, কখনো বা হেসে ফেলে শুক্তি।

শুভেন্দু বলে—ঐ মৌজাটার অর্ধেকটাই হলো চাকরান, আর তার বাঁয়ে যেসব ক্ষেত দেখছো, ওর বেশির ভাগ হলো মহাত্রাণ। এদিকের সবই ব্রহ্মোত্তর আর মৌরসী-মোকররী। সবচেয়ে ভাল হলো ঐ যে, ঐ মেটে সড়কের দু'পাশে...

হাত তুলে যেন পৃথিবীর চারদিকে ছড়ানো মাটি জল ও বাতাসের উপর কতগুলি অদ্ভুত ও বিচিত্র স্বত্বের আর স্বামিত্বের গর্ব বর্ণনা করে শোনাতে থাকে শুভেন্দু। শুনতে মন্দ লাগে না, যদিও একবিন্দু অর্থ বোঝা যায় না, নীরবে শুধু হাসতে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু নিজের মনের উৎসাহেই বলতে থাকে—সবচেয়ে ভাল উসুল আর আদায় হয় ঐ দুটো বাজেয়াপ্তী আর খারিজ মহাল থেকে।

শুক্তি তার ধুলোমাখা পায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে—ধুলোও লাল রঙের হয় নাকি?

শুভেন্দু— হয় বৈকি। বাঘা-এঁটেলের রঙই হলো লালচে, কোনমতেই রবি ফলানো যায় না। তবে নদীর দিকে দু'হাজার বিঘের ওপর বেলে আর দোঁআশ আছে। ধান ফলে চমৎকার। এ ছাড়া ভাল মাটি বলতে ছোট-জগৎপুরে আর বিশেষ কিছু নেই। উত্তরে ওগুলি সবই হলো সাবেক পতিত, যত সব ঘাসি, কাঁকরে আর...।

হাসি থামাতে গিয়ে থেমে যায় শুক্তি। শাড়ির আঁচলটা শুভেন্দুর চোখের সামনে তুলে ধরেই শিউরে উঠতে থাকে—ইস্, কি বিশ্রী কতগুলো পোকা কাপড়টাকে কি-ভয়ানক কামড়ে

ধরেছে দেখ।

শুভেন্দু বলে—পোকা নয়, চিড়-চিড়ে ফল।

শুক্তি অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে—বেশ সুন্দর ফল তো, নামটা আরও সুন্দর।

সত্যিই, এই ঝোপঝাপ গাছপালা আর লতাপাতার নামগুলিই বা কি অদ্ভুত! চলতে চলতে শুভেন্দু আরও নাম শোনাতে থাকে। এগুলি হলো হাড়জোড়া লতা, ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দেয়। ওটা হলো একটা মাকড়া গাব। ঐ দেখ কাঁঠালের গাছটাকে কি ভয়ানক বাঁদরায় ছেয়ে ফেলেছে। আর ঐ যে একটা কাকডুমুরের জঙ্গল দেখছো, তার ওপাশেই হলো দীঘি। এগুলিকে বলে হাতিশুঁড়ো, ওগুলি শেয়ালকাঁটা। একটা কুকসীমের ঝাড় আব দুটো কেওঠেঙ্গার ঝোঁপের পাশ দিয়ে আঁচল বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে হেসে ফেলে শুক্তি—থাক্, এত সুন্দর সুন্দর নামগুলি আর শুনিও না, মনে রাখতে পাবব না।

শুভেন্দু বলে—ঐ যে জগৎলক্ষ্মীর মন্দির।

ভাঙাচোরা আর বট-অশ্বত্থের শিকড়ে জড়ানো একটা জীর্ণকায় পঞ্চরত্ন মন্দির। চারদিকের বনবাদাড়ে এখনো যেন অন্ধকার লুকিয়ে রয়েছে। মশার এক একটা ঝাঁক উড়ে যায় শব্দ করে। কি অদ্ভুত শব্দ! দিনের আলোকে চামচিকে ওড়ে অন্ধের মতো দিগ্বিদিক বোধ হারিয়ে। শুক্তি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে, এই কি জগৎলক্ষ্মীর মন্দিরের চেহারা?

মন্দিরের দরজা খুলে দিল পৈতে গলায় যে লোকটা, তার দিকেও হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি। লোকটা যেন এই কাঁটা-লতার ঝোপে পালিত একটা পাখির মতোই দেখতে। রোগা এইটুকু জীর্ণশীর্ণ দেহ নিয়ে জগৎলক্ষ্মীর পূজারী দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে, বুকের পাঁজরাগুলি হাঁপায়।

মন্দিরের ভিতরে কোন মূর্তি নেই। শুধু পাথরের উপর একটা ধুনুচি রযেছে, তাব মধ্যে ধুনো পুড়ছে অল্প অল্প ধোঁয়া ছড়িয়ে। পুজোর ডালা থেকে ফুল আর সিঁদুরের কৌটো তুলে ধুনুচির সামনে রাখে শুক্তি। পূজারী লোকটা ধুনুচির গায়ে সিঁদুবের কৌটাটা একবার ছুঁইয়ে আবার ডালার ভিতর রেখে দেয়। তার পরেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে শুক্তির হাতে তুলে দেয় শুভেন্দু। টাকাটা ধুনুচির কাছে রেখে একটা প্রণাম করে শুক্তি। পূজারী অস্ফুটস্বরে আর হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে কি যেন বলতে থাকে।

জগৎলক্ষ্মীর কাছ থেকে সরে এসে বাইরে দাঁড়িয়েই হাঁফ ছাড়ে শুক্তি।

—এ কি রকমের জগৎলক্ষ্মী, বুঝলাম না কিছু।

শুভেন্দু বলে—ঐ দীঘিটার ওপারে আরও মাইল দুয়েক উত্তরে যে গ্রামটা রয়েছে, তার নাম হলো বড়-জগৎপুর। সে গ্রামের কিছু আর এখন নেই। পুষ্করা লেগে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

শুক্তির স্থিরচক্ষুর কৌতূহল লক্ষ করে শুভেন্দু কাহিনীটাকে আরও তাড়াতাড়ি সারতে থাকে।—এ সব অনেক দিন আগের কথা। ছোট-জগৎপুরেরও পুষ্করা লাগাতে চলেছিল। মড়ক আর মরণ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল বড়-জগৎপুরের দিক থেকে এই দিকে। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল না, তবু এখানেই এসে ছোট-জগৎপুরের সব মানুষ দিনরাত পুজো দিত আর প্রার্থনা করত, পুষ্করার কোপ থেকে বাঁচবার জন্য।

পাশেই ঝোপের ভিতর কিরকম একটা ঝনঝনে শব্দ বেজে ওঠে। শুক্তি চমকে ওঠে—কিসের শব্দ?

শুভেন্দু বলে—বোধহয় শজারু।... যাক, একদিন মাঝ রাতে, সেদিন পূর্ণিমা, দেখা গেল লালপেড়ে শাড়ি পরে এক মেয়ে, হাতে একটা ধুনুচি নিয়ে ছোট-জগৎপুরের চারদিকে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। ধুনুচি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ধুনোর গন্ধে ভরে উঠল গ্রাম। তারপরের দিনই দেখা গেল, এই মন্দিরের ভিতরে একটি ধুনুচি রয়েছে এবং তার মধ্যে ধুনো পুড়ছে।

শুক্তি—তার মানে কি হলো ?

শুভেন্দু—তার মানে এই যে, স্বয়ং লক্ষ্মী নিজে এসে ধুনোব ধোঁয়া ছড়িয়ে ছোট-জগৎপুরকে পুষ্করার কোপ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

শুক্তি—এ তুমি বিশ্বাস কর ?

শুভেন্দু হাসে—বিশ্বাস করতে তো ভালোই লাগে।

শুক্তি—সত্যি হলে তো ভালোই ছিল।

শুভেন্দু—তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?

শুক্তি—না।

শুভেন্দু—যাক, কিন্তু মনে রেখো, তোমার একটা পবীক্ষা আরম্ভ হলো।

শুক্তি—কি ?

শুভেন্দু—এইবার ছোট-জগৎপুরের সমস্ত মানুষ জানতে পারবে, নতুন বউরানী কত বড় লক্ষ্মী।

শুক্তি— তার মানে ?

শুভেন্দু—ক'দিনের মধ্যেই এমন কোন ঘটনা ঘটা চাই, যাতে বোঝা যাবে যে তুমি একটি খাঁটি লক্ষ্মী।

চমকে ওঠে শুক্তি। —আমি কি করে ঘটনা ঘটাবো ?

শুভেন্দু—তোমার পুজোর ফলেই ঘটনা ঘটবে। যদি ছোট-জগৎপুরের মানুষ আব রাজবাড়ির জীবনে কোন নতুন সৌভাগ্য দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে যে, তুমি সত্যিই লক্ষ্মী।

শুক্তির কণ্ঠস্বরে হঠাৎ বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে—এ রকম কোন সর্ত আমি করেছিলাম না কি ?

শুভেন্দু হাসে—তুমি সর্ত করবে কেন ? এটা হলো এই ছোট-জগৎপুরেব সর্ত ? চিরকাল এখানে এই সর্তেই রাজবাড়ির নতুন বউরানীরা পরীক্ষা দিয়েছে।

শুক্তি—সবাই পাশও করেছে নিশ্চয় ?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, সে ইতিহাস মা'র কাছেই শুনতে পাবে।

কোন উত্তর দেয় না শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের এই সব কাঁটাভরা ঝোপ, সাপের মতো হিংস্র লতা, পোকার মতো ফল, জন্তুর মতো গাছপালা, বিদঘুটে শব্দ আর নানা রকমের অন্ধকারের মধ্যে কোনই ভয় ছিল না। হঠাৎ কোথা থেকে এক অদ্ভুত গা-ছমছম করা কাহিনীটা এসেই যেন এই প্রথম ভয় পাইয়ে দিল শুক্তিকে।

গম্ভীর মুখে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় শুক্তি। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপরেই হেসে ওঠে—আমার একটু দরকার আছে। আর একবার মন্দিরে চল।

একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না শুভেন্দু। —এখনই !

শুক্তি—হ্যাঁ।

চামচিকার দল আবার কিচমিচ শব্দ করে উড়তে থাকে। ধুনোর গন্ধেভরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে ধুনুচির কাছে মাথা উপুড় করে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে শুক্তি। শুক্তির কাণ্ড দেখে হতভম্বের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। যেন এক অজ-পাড়াগাঁয়েরই অসহায় ও দুর্বল একটা মেয়ের বিপন্ন আত্মার কাতর আবেদনের মতো পড়ে রয়েছে শুক্তি। কে জানে, কি প্রার্থনা করছে শুক্তি, দু'ঠোঁটের কাঁপুনিতে অতি ক্ষীণস্বরে ফিস-ফিস করছে যে ভাষা, তার

একটা কথাও শুনতে পায় না শুভেন্দু।

উঠে এসে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি—চল এবার।

আরও বিস্মিত হয়ে বেদনার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে শুক্তির চোখ!

শুভেন্দু বলে—গল্পটা বলে তোমাকে কষ্ট দিলাম মনে হচ্ছে।

শুক্তি হাসে—একটুও না।

•

একটা সাড়াই পড়ে গেল ছোট-জগৎপুরে। বউরানী লক্ষ্মী, বউরানী লক্ষ্মী। দু' পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জগৎপুরের শক্ত এঁটেল মাটির ক্ষেত ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে। এবার লাঙ্গল আর রোপাই আরম্ভ করে দিলেই হলো, আর কোন অসুবিধে নেই।

সদর থেকে খবর নিয়ে এসেছে উকিলের মুহুরী, তিন বছর ধরে ঝুলছিল যে মামলাটা, তার রায় বের হয়েছে এতদিনে। ষাট হাজার টাকার ডিক্রি পেয়েছে শুভেন্দু।

শাশুড়ি ডাক দিয়ে বলেন—বউমা, আজ হলো চতুর্দশী। আজই একবার গিয়ে হর্ষমতীর জল ছুঁয়ে এস। .ও শুভেন্দু, শুনেছিস।

শুভেন্দু বলে—হ্যাঁ শুনেছি, আজই যাব।

শুক্তি হাসি বন্ধ করে। হঠাৎ গম্ভীর হয়—হর্ষমতীর জল মানে?

শুভেন্দু—ঐ সেই দীঘিটা। ওর নাম হলো হর্ষমতীর সায়র।

শুক্তি—ওর জল ছুঁলে কি হয়?

হাসতে থাকে শুভেন্দু। শুক্তি তেমনি গম্ভীরভাবে বলে—আর একটা গল্প আছে বোধহয়?

শুভেন্দু—হ্যাঁ।

শুক্তি—আর একটা পরীক্ষা দিতে হবে নিশ্চয়?

শুভেন্দু—নিশ্চয়।

শুক্তি—আর পারি না! অপ্রস্তুতভাবেই আক্ষেপ করে অন্যদিকে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে শুক্তি। এইভাবেই কি অন্তকাল এখানে শুধু পরীক্ষা দিতে হবে? ছোট-জগৎপুরের নামে এই রাজ্যিছাড়া রাজ্যিটা তো দেখতে বড় নিরীহ। আসা মাত্র, একেবারে বউরানী বলে আদর করে আর মাথায় তুলে রাখতে চায়। কিন্তু এত অভ্যর্থনার ভিতরে আবার এইসব পরীক্ষা করার ষড়যন্ত্র কেন?

শুভেন্দু সান্ত্বনার সুরে বলে—কি হয়েছে, কতটুকুই বা হাঁটতে হবে? বরং একবার বেড়িয়ে এলে ভালই লাগবে তোমার।

শুক্তি—হাঁটতে ভয় পাই না। বেড়ানোও অভ্যেস আছে।

শুভেন্দু—তবে কিসের ভয়?

শুক্তি ভ্রূকুঞ্চিত করে—ভয়? ভয় কেন করব? কি পাপ করেছি যে একটা দীঘির জল ছুঁতে ভয় করব?

খুশি হয়ে শুক্তির হাত চেপে ধরে শুভেন্দু বলে—চলো, পথে অনেক নতুন জিনিস দেখাব তোমাকে।

দ্বিধা করে বা দেরী করে কোনও লাভ নেই। পরীক্ষাটার সম্মুখীন হবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে শুক্তি বলে—চলো।

মস্ত বড় একটা ডাঙ্গার উপর দিয়ে চলতে চলতে শুক্তির মনের ভার আস্তে আস্তে মিটে যেতে থাকে। ডাঙ্গার মাটি শক্ত, কিন্তু নরম ঘাসে ঢাকা। কাঁটার ঝোপ-ঝাপ সরিয়ে

ছোট-জগৎপুরের মনটা যেন এখানে বেশ খোলামেলা হয়ে উঠছে। মস্ত বড় একটা গাছের মৃতদেহ পাথরের মতো শক্ত ও মসৃণ হয়ে পড়ে রয়েছে ডাঙ্গার এক জায়গায়। শ্রান্ত হয়ে গাছের উপর বসে শুভেন্দু ও শুক্তি।

গল্প করে শুভেন্দু।—এটা কি বলতে পার ?

—গাছ বলেই তো মনে হচ্ছে।

—গাছ কি এ রকম পাথরের মতো হয় ?

—তবে কি এটা ?

—এটা হলো বকরাক্ষসের লাঠি। সেই যে ভীমের হাতে মার খেয়ে মরে গেল বক, সেই দিন থেকে তার লাঠিটা পড়ে আছে এখানে।

হেসে ওঠে শুক্তি। শুনতে ভালই লাগে। এ রকম হাজার গল্প হাজার মনের ভিতর পুষে রাখুক না ছোট-জগৎপুর। কিন্তু.. । কিন্তু হর্ষমতীর গল্পটাও কি এই রকমের ?

হর্ষমতীর সায়রের কাছে পৌঁছবার পর গল্পটা শুরু করে শুভেন্দু। দাম আর টোপা পানায় ভরা প্রকাণ্ড সায়র। ভাঙা ভাঙা এক-একটা ঘাটের শ্যাওলা-মাখা ইট ছড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে। তালগাছের উপর এই ভরা দুপুর অলস হাড়গিলা নিঃস্পন্দ হয়ে ঘুমোয়। যেমন নির্জন জায়গাটা, তেমনি একটা নিস্তব্ধতা যেন থমকে রয়েছে।

শুভেন্দু বলে—সে অনেক দিন আগেকার কথা। এই যে কলাইয়ের ক্ষেতটা দেখছো, এখানেই ছিল এক রাজার বাড়ি। রাজার বড় দুঃখ ছিল, কারণ রানী হর্ষমতী ছিলেন বন্ধ্যা।

শুক্তি হাসে—থাক, আর শুনতে চাই না। এ গল্প না শুনলেও চলবে।

শুভেন্দু—সায়রের জল ছুঁয়ে এই চতুর্দশীতে একবার মাথায় হাত না দিলে তো চলবে না।

শুক্তি—কেন ?

শুভেন্দু—এখানকার নিয়ম।

শুক্তি হাসে—অদ্ভুত নিয়ম, বেহায়া নিয়ম। .তুমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় শুক্তি। শুভেন্দু বলে—গল্পটা আগে শুনে নাও। ...একদিন স্বপ্নে শুনতে পেলেন হর্ষমতী... ।

থেমে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে শুক্তি—কি শুনতে পেলেন ?

—চোখ বুঁজে শুধু স্বামীর মুখ মনে করতে করতে এক চতুর্দশীর দুপুরে এই সায়রের জলে বার বার তিনবার ডুব দিয়ে পদ্মের শিকড় স্পর্শ করবি। তাহলেই তোর কোল-আলো-করা...

শুক্তি মুখ কালো করে তাকায়—এটাও দেখছি একটা পরীক্ষা। বার বার তিনবার স্বামীর মুখ স্মরণ করে জল ছুঁতে হবে। এই তো ?

শুভেন্দু—হ্যাঁ।

শুক্তি—যেন অন্য কোন মুখ ভুলেও মনে না আসে, এই তো ?

শুভেন্দু হাসে—হ্যাঁ।

শুক্তি মুখ ভার করে বলে—চলো বাড়ি যাই।

শুভেন্দু বিষণ্ণভাবে বলে—সামান্য একটা গল্পের উপর এত রাগ করছ কেন তুমি ?

চুপ করে ভাঙা ঘাটের হিংস্র দাঁতের মতো শ্যাওলা-মাখা ইটগুলির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি।

শুভেন্দুও আনমনার মতো দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপ করে যেন শুক্তির এই আপত্তির আঘাতটাকে সহ্য করবার চেষ্টা করছে শুভেন্দু। কিসের জন্য, কেন এ রকম করছে শুক্তি ! কি বলতে চায় শুক্তি ?

শুক্তি ডাকে—শুনছ ?

শুভেন্দু—কি ?

শুক্তি—আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

শুভেন্দু—কেন, কিসের এত ভয় ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হঠাৎ শুভেন্দুর হাত ধরে সাগ্রহে অনুনয়ের সুরে শুক্তি বলে—কিছু মনে করো না। তুমি এস, আমার মাথা ছুঁয়ে আমার কাছে দাঁড়াও, তবে আমি তিনবার জলস্পর্শ করতে পারব।

শুভেন্দুর মুখের বিষণ্ণতা কেটে যায়।—তাই বলো, এ তো রানী হর্ষমতীর চেয়েও এক ডিগ্রি বেশি চলে গেল।...চলো।

লক্ষ করে শুভেন্দু, সায়রের জল তিনবার মাথায় ছোঁয়ানো হয়ে যাবার পরেও আর একবার জল তুলে নিয়ে চোখ দুটোকেও ধুয়ে ফেলে শুক্তি।

ফেরবার পথে শুভেন্দু আর একবার জিজ্ঞাসা করে—এ সব গেঁয়ো নিয়ম-টিয়ম পালন করতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, শুক্তি ?

শুক্তি বলে—না, তুমি যতক্ষণ সঙ্গে আছ, কোন কষ্টই হবে না।

ছোট-জগৎপুরকে ভাল লাগে, ভাল লাগে ছোট-জগৎপুরের এই মানুষটিকে, কিন্তু ভয় করে ছোট-জগৎপুরের এই কাহিনীগুলিকে। কি ভয়ানক এক-একটা কাহিনী, যেন বুক চিরে পরীক্ষা করে দেখতে চায়, ভিতরে কিছু লুকোনো আছে কি না।

কিন্তু শুক্তির ক্ষুব্ধ মনের যত অভিযোগ আর আশঙ্কা শান্ত করে দিয়ে, আর শুক্তির জীবনে একটা নতুন ঘটনার সূচনা স-রবে ঘোষণা করে দিয়ে শাশুড়ির কণ্ঠস্বরের হর্ষ একদিন ধ্বনিত হয়, কারণ কৃপা করেছে হর্ষমতীর সায়র।—বউমা, এবার একদিন নাগেশ্বরতলায় গিয় ভয়নাশন করে এস।...ওরে শুভেন্দু, শুনেছিস্।

ছোট-জগৎপুরের গো-চর মাঠের পশ্চিমে মস্ত বড় একটা বৃদ্ধ অশ্বত্থ, তার গোড়ার দিকে একটা ফোঁকর। ফোঁকরের ভিতরে আছেন এক অতিবৃদ্ধ নাগ। সে নাগকে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ চোখে দেখেনি, তবুও তিনি আছেন, দ্বিতীয় এক অনন্ত নাগের মতো চিরকাল এখানে আছেন। ছোট-জগৎপুরের একশো বছর আগের বউরানীরও প্রথম সন্তানের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এই নাগেশ্বরতলায় এসে ভয়নাশন করে গিয়েছেন। এ অবস্থায় মনে কোন ভয় রাখতে নেই। ভয় থাকলে সন্তান ভীরু হয়।

শুক্তি একটু উৎসাহিতভাবেই প্রশ্ন করে—ভয়নাশনটা আবার কি ?

শুভেন্দু—ভয়নাশন পুজো। যে ভয়কে সবচেয়ে বেশি ভয় হয়, সেই ভয়ের কথা জানিয়ে দিতে হবে নাগেশ্বরকে। তাহলে জীবনে আর সে ভয় থাকবে না।

শুক্তি বলে—চলো।

চলতে দেরি হয়নি, পৌঁছতেও দেরি হয়নি। নাগেশ্বরতলায় এসে বুড়ো অশ্বত্থের গোড়ায় মাটির ভাঁড়ে দুধ রেখে দিয়ে প্রণাম করে শুক্তি।

অশ্বত্থতলার ধুলো লাগে কপালে, শুক্তি যেন কৃতার্থভাবে উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—নাগেশ্বর কৃপা করলেন কিনা কি করে বুঝব ?

শুভেন্দু—সূর্য ডুববার পরেই ফিরে এসে যদি দেখতে পাও যে, ভাঁড়ের সব দুধ খেয়ে চলে গিয়েছেন নাগেশ্বর, তবেই বুঝবে যে...

শুক্তি—সূর্য তো ডুবতে চলল।

শুভেন্দু—তাহলে চলো, একটু ঘুরে ফিরে তারপর এসে দেখবে।

ঘুরে ফিরে বিকেলের শেষটা পার করে দিয়ে প্রথম সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে বুড়ো অশ্বত্থের কাছে

ফিরে আসে শুভেন্দু আর শুক্তি। শুভেন্দু বলে—ঐ দেখ।

আনন্দে শুভেন্দুর হাত ধরে হাসতে থাকে শুক্তি। প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন নাগেশ্বর। ভাঁড়ে এক ফোঁটা দুধ নেই, কখন এসে নিঃশেষে সব দুধ পান করে অশ্বত্থের গহ্বরে আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

ফেরবার পথে শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করে—কোন্ ভয়ের কথা নাগেশ্বরকে জানালে ?

শুক্তি হাসে—তা কেন বলব ?

শুভেন্দু—আমিও একদিন নাগেশ্বরের কাছে এসে ভয়নাশন করে গিয়েছি।

শুক্তি হেসে লুটিয়ে পড়তে চায়—তোমার আবার ভয়নাশন কিসের ? তোমারও কি... ।

শুভেন্দু—হ্যাঁ, পুরুষরাও এসে এখানে ভয়নাশন করে। ছোট-জগৎপুরের নিয়ম আছে বিয়ে করতে যাবার আগে নাগেশ্বরের কাছে মনের ভয়ের কথা বলে ভয় দূর করে নিতে হয়।

শুক্তি—তুমি কোন্ ভয়ের কথা বলেছিলে ?

শুভেন্দু—তা বলব কেন ?

শুক্তি—বলো না, আমি শুনলে দোষ কি ?

শুভেন্দু—গেঁয়ো মানুষের মনের একটা বাজে ভয়ের কথা, সে কথা শুনে তোমারই বা লাভ কি ?

সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারেই শুক্তি দেখতে পায়, শুভেন্দুর চোখ দুটো কেমন অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শুক্তি বলে—নাগেশ্বর তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করেছিলেন তো ?

শুভেন্দু—ভাঁড়ের দুধ তো সব চেটেপুটে খেয়ে চলে গিয়েছিলেন।

শুক্তি—তবে আর ভাবনা কিসের ?

শুভেন্দু—তবুও ভাবনা হয়। সন্দেহ হয় নাগেশ্বর আমাকে ঠকালেন না তো ?

শুভেন্দুর চোখে সেই অদ্ভুত ভঙ্গি, আর দৃষ্টিটাও তেমনি। শুক্তি বলে—তোমার সন্দেহের কোন অর্থ-ই হয় না। নাগেশ্বর কাউকে ঠকাতে পারেন না।

শুক্তির সান্ত্বনার ভাষা ও ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে শুভেন্দু।—তুমি যখন বলছ, তখন বিশ্বাস করছি নাগেশ্বর আমাকে ঠকায়নি।

পথ চলার ছন্দ যেন দুজনেই আবার ফিরে পায়। আকাশে সন্ধ্যা-তারা একটু দূরে চাষীদের আঙিনায় ঘরে-ফেরা গরুর ডাক বাতাসে সাড়া জাগিয়ে তোলে। একটা মাটির দীপ জ্বলছে একেবারে নিকটেই। ঢিপির মতো একটা জায়গা, জংলা লতাপাতায় ঢাকা।

শুক্তি প্রশ্ন করে—এখানে আবার প্রদীপ জ্বলে কেন ?

শুভেন্দু—এই মাসটা প্রতি সন্ধ্যাতেই এখানে প্রদীপ জ্বলবে।

শুক্তি—কেন ?

শুভেন্দু—এটা হলো রুপো ঠাকরুনের ভিটা।

শুক্তি—এটাও গল্প বোধহয় ?

শুভেন্দু—হ্যাঁ। রুপো ঠাকরুন ছিলেন একজন সতীসাধ্বী... ।

পায়ে যেন হঠাৎ কি একটা ফুটেছে। বেদনার্তের মতো মুখ করে অন্য দিকে তাকিয়ে শুক্তি বলে—চলো, রাত হয়ে আসছে।

চলতে থাকে শুভেন্দু, কিন্তু রুপো ঠাকরুনের গল্পটা না বলে থাকতে পারে না।—রুপো ঠাকরুন ছিলেন গরীব বামুনের বউ। দেখতে পরমা সুন্দরী। এত গরীব যে দু'কড়ি খরচ করে সধবার সাধ একটু আলতা কেনবারও উপায় ছিল না রুপো ঠাকরুনের। এক দিন কোথা থেকে অচেনা-অজানা একটি মেয়ে এসে বলল, দুঃখ করো না রুপো ঠাকরুন, তুমি জল দিয়েই

আলতা পরো। যদি সতী হয়ে থাক, তবে তোমার পায়ে লেগে জলই আলতা হয়ে যাবে।

শুক্তি—তাই হলো নিশ্চয় ?

শুভেন্দু—হ্যাঁ, যতদিন বেঁচে ছিলেন রুপো ঠাকরুন, ততদিন জলের আলতাই পরতেন। জলের দাগ আলতার চেয়েও বেশি রাঙা হয়ে ফুটে উঠত রুপো ঠাকরুনের পায়ে।

শুক্তি বলে—বাঃ, চমৎকার গল্প।

শাশুড়ি ডাক দিলেন—ও বৌমা, প্রজাবাড়ির মেয়েরা এসেছে তোমার কাছে। শুনে নাও, কি বলছে ওরা ?

আশ্বিন মাস, ছোট-জগৎপুর এই মাসে একটা ব্রত করে, তার নাম সতী-সোহাগ। এ বছর নতুন বউরানীর পায়ে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ করবে প্রজাবাড়ির মেয়েরা, সেই কথা জানাতে এসেছে টগর কালী খাঁদি পটলী সীতা ফুলকুঁড়ি ধবধবী বুড়ি আর চন্দনা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা অস্থিসার কতগুলি রোগা-রোগা মেয়ে। আজ ওরা সিধে নিয়ে যাবে, কাল এসে আলতা পরিয়ে সতীসোহাগ করে যাবে।

প্রজাবাড়ির মেয়েদের প্রস্তাবটা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনল শুক্তি। আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসল শুভেন্দু। আধ সের করে চিঁড়ে সিধে নিয়ে চলে গেল প্রজাবাড়ির মেয়ের দল।

সন্ধ্যা হতেই শুভেন্দুর সঙ্গে একটা ঝগড়ার মতোই ব্যাপার করে ফেলল শুক্তি।—তোমাদের এই রাজ্যিছাড়া গ্রামটা কি শুধু কতকগুলি গল্প দিয়ে তৈরি ?

শুভেন্দু বলে—তাই তো দেখছি।

শুক্তি—পৃথিবীর কোথাও এমন সৃষ্টিছাড়া ব্রত আছে বলে তো শুনিনি।

শুভেন্দু—তাও সত্যি।

শুক্তি—সতীসোহাগ ব্রতটার অর্থ কি ?

শুভেন্দু—ঐ রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে গুলে পায়ে পবিয়ে দেবে।

শুক্তি—তাতে কি হয় ?

শুভেন্দু—অনেক কিছু ভাল হয়। আবার উল্টোটাও হয়। সে গল্প যদি শুনতে চাও তো বলি।

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের একটা অন্ধকারের দিকে তাকায় শুভেন্দু—ঐ বড়-জগৎপুরের ডাঙ্গাটা যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তারই পুবে আছে চোখটেরির খাল। এক চোখটেরি একবার গাঁয়ের একশো মেয়েকে মেঠাই মণ্ডা খাইয়ে খুব ঘটা করে সতীসোহাগ করিয়েছিল। চোখটেরির পায়ে টুকটুকে লাল আলতা পরানো মাত্রই আলতা জল হয়ে গেল। লোকে বললে, একি ব্যাপার ? একটু পরেই খবর এল, চোখটেরির স্বামী সাপের কামড়ে মরে গিয়েছে। ধরা পড়ে গেল চোখটেরির জীবনের লুকানো দোষ। আর সেই লজ্জা সহ্য করতে না পেরে শেষে ঐ খালের জলে ডুবে মরে গেল চোখটেরি।

শুক্তি—গল্পটা মোটেই ভাল নয়। চোখটেরির পাপে চোখটেরি মরল, ভালই হলো। কিন্তু চোখটেরির স্বামী বেচারা মরবে কেন ?

শুভেন্দু হাসে—মরে তো গেল, কি আর করা যাবে ?

কিছুক্ষণ পরে রাতটাও যেন কেমন-কেমন হয়ে গেল। কিছুতেই ঘুম আসে না শুক্তির। শুভেন্দুকেও ঘুমোতে দেয় না শুক্তি। ছোট-জগৎপুরের আজকের রাত্রিটাকে বড় ভয় করছে শুক্তির। এই রাতটা তো আর কিছুক্ষণ পরে ফুরিয়েই যাবে, তার পরেই সতীসোহাগের আলতা নিয়ে দেখা দেবে কি-ভয়ানক একটা সকালবেলা। শুক্তির সমস্ত আত্মাটাই যেন কিসের একটা ভয়ে ধুকপুক করছে।

শুভেন্দু বলে—আর কত গল্প শুনবে ? এবার ঘুমিয়ে পড় ।

শুক্তি—কি করে ঘুম হবে ? একটা গল্পেরও কি মাথামুণ্ডু কিছু আছে ! যত সব ভয়-দেখানো বিদঘুটে গল্প ।

বাস্তবিক, ছোট-জগৎপুরের প্রত্যেকটা ছায়া আর শব্দেরও যেন ইতিহাস আছে । যত সব অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তের শাস্তির আর প্রতিশোধের ইতিহাস ।

হুম্ হুম্ শব্দ করে একটা পেঁচা ডাকছিল এতক্ষণ । কিন্তু ওটা ঠিক পেঁচার ডাক নয় । শুভেন্দু বলে—অনেকদিন আগে এক ঘুমন্ত গেরস্থকে হত্যা করেছিল এক ডাকাত, তার নাম বেন্দা । সেই গেরস্থের বউয়ের অভিশাপে চিরকালের মতো পেঁচা হয়ে গিয়েছে বেন্দা ডাকাত । ঘুম নেই বেন্দার চোখে । আশ্বিনের ঠিক এই দিনটিতেই একবার ছোট-জগৎপুরের অন্ধকারে উড়ে উড়ে চোখের জ্বালায় ডাকতে থাকে বেন্দা—ঘুমো ঘুমো । চাষী ছেলেরা জেগে উঠে একটা আমগাছের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়, তার পরেই আর পেঁচাব ডাক শোনা যায় না ।

এখানেই বসে দেখা যায়, শ্মশানের মাঠের দিকে একটা আলেয়া এগিযে চলেছে । কিন্তু ওটা তো ঠিক আলেয়া নয় । শুভেন্দু বলে—ওটা হলো চিন্তেমণির জ্বালা । রোগী স্বামীর উপর রাগ করে চিন্তেমণি একদিন বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল । যেদিন ফিরল সেদিন স্বামীর চিতা জ্বলছে শ্মশানে । সেই যে চিন্তেমণি ঘর ছেড়ে চলে গেল, আব তাকে কোথাও দেখা গেল না । শুধু মাঝে মাঝে অনেক রাতে দেখা যায়, আলেয়া হয়ে শ্মশানের মাঠে স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চিন্তেমণি ।

অন্ধকার ছাপিয়ে কান্না মেশানো দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা ঝড়ের শব্দ অনেকদূর থেকে ভেসে এসে আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু ঝড় নয় ওটা । শুভেন্দু বলে—ওটা হলো ভোলা বেদের দীর্ঘশ্বাস । যখ হয়ে মাটির নিচে গুপ্তধন আঁকড়ে পড়ে আছে ভোলা । এক দেবমন্দির থেকে বিগ্রহের গায়ের সোনা চুরি করে ভোলা বেদে কুয়োর নিচে নেমেছিল লুকিয়ে রাখার জন্য, হঠাৎ কুয়ো ধসে সেই যে মাটি চাপা পড়ল তো পড়লই ।

শুক্তি বলে—রক্ষে করো । আর গল্প শুনতে চাই না ।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয় শুভেন্দু—একি, তুমি এতক্ষণ ধরে মুখ আড়াল করে শুধু কাঁদছ ?

শুক্তি—বড় ভয় করছে আজ ।

শুক্তির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে শুভেন্দু সমবেদনার সুরে বলে—ছিঃ, এত ভয় করতে হয় ?

শান্ত হয় শুক্তি ।

—কই গো বউরানী ? বউরানী কই ?

আঙিনার উপর এক পাল মেয়ের উল্লাস সকালবেলাটাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল । রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি নিয়ে সতীসোহাগ করতে এসেছে চন্দনা খাঁদি সীতা কালী পটলী ধবধবী টগর আর বুড়ি ।

ও-ঘর থেকে সন্ত্রস্তের মতো ছুটে এসে এঘরে শুভেন্দুর কাছে দাঁড়ায় শুক্তি ।

—ওদের চলে যেতে বলো লক্ষ্মীটি, পায়ে পড়ি তোমার ।

শুভেন্দু—ছিঃ, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এরকম করছ কেন ? মা শুনলে বড় রাগ করবেন ।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে শুক্তি । চোখের দৃষ্টি একটা আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁপছে ।

যেন কোন কথাই শুনতে পাচ্ছে না শুক্তি।

চুপ করে অনেকক্ষণ শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু। তারপর শুক্তির একটা হাত ধরে আস্তে আস্তে শুক্তিকে কাছে টেনে নিয়ে একেবারে চোখের উপর চোখ তুলে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কেন এত ভয় ?

শুক্তির সব চঞ্চলতা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীর স্থির ও শান্ত, গলার স্বর একটুও বিচলিত না করে শুক্তি আস্তে আস্তে বলে—তুমি তো সবই বুঝতে পার।

—ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু...।

—কিন্তু নয়, সত্যি।

—কবে ?

—চার বছর আগে।

শুক্তির হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায় শুভেন্দু। ঘরের ভিতর পায়চারি করে বেড়াতে থাকে।

হঠাৎ একবার থামে শুভেন্দু, শুক্তির মুখের দিকে একটা কঠিন ও উদাস দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে বলে ওঠে—নাগেশ্বরের কাছে আমি এই ভয়ের কথাই বলেছিলাম শুক্তি।

এক একটা মুহূর্ত যেন ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যে মরে চলেছে। শুক্তি দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ধীর স্থির ও শান্ত। এই রাজ্যিছাড়া ছোট-জগৎপুরের সব কাহিনীর ভ্রূকুটি-ভরা চোখগুলিকে আজ বুক চিরে দেখিয়ে দিতে পেরেছে শুক্তি। আর অস্থির হয়ে উঠবার, মুখ লুকোবার, আর চোখ ফিরিয়ে নেবার তো দরকার নেই।

শুভেন্দু বলে—যাও, ওরা ডাকছে, দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। শুভেন্দু আবার অনুরোধ করে—মাত্র একটা অভিনয় তো। যাও, সেরে দিয়েই চলে এসো, দেরি করে লাভ কি ?

ভাঙা ভাঙা নিঃশ্বাসের মতো স্বরে শুক্তি বলে—পারব না।

শুভেন্দু—কেন ?

শুক্তি—রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আমি সহ্য করতে পারব না।

শুভেন্দু—হর্ষমতীর জল সহ্য করতে পারলে, জগৎলক্ষ্মীর সিঁদুর সহ্য করতে পারলে, এটা আর সহ্য করতে পারবে না কেন ?

শুক্তি—না, আর পারব না !

দু'হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে ঘরের মেজের উপরেই বসে পড়ে শুক্তি।

শুভেন্দু এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে—কেন পারবে না ?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে শুভেন্দুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলে শুক্তি।—তোমার অমঙ্গল হবে।

চমকে ওঠে শুভেন্দু, ঠিক যেমন হঠাৎ আলোর ঝলক লাগলে চমকে ওঠে মানুষের চোখ।

শুভেন্দু—এই তোমার ভয় ?

শুক্তি—ঐ একটি ভয়।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায় শুভেন্দু। শুক্তির চোখ-বোঁজা মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে থাকে। ছোট-জগৎপুরের অমঙ্গলের জন্য যার এত ভয়, আর একমাত্র ভয়, সে বেচারারই চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে শাস্তি দিচ্ছে ছোট-জগৎপুরের কতকগুলি নির্মম গল্প।

আর একবার তাকায় শুভেন্দু। শুক্তির কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখতে অদ্ভুত লাগছে শুক্তির মুখটা। যেন শান্ত হয়ে আর মন ভরে ছোট-জগৎপুরের জন্য মঙ্গলের স্বপ্ন দেখছে দুটি ঘুমন্ত চক্ষু। না, কথাটা ঠিকই। নাগেশ্বর কখনো কাউকে ঠকাতে পারেন না।

হঠাৎ শুভেন্দুর সারা মুখে যেন একটা কৃতার্থ কামনার হাসি ঝক করে ফুটে ওঠে। পা টিপে টিপে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে আঙিনার উপর প্রজাবাড়ির মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় কি যেন একটা কৌতুকের নির্দেশ জানায়। পা টিপে টিপে আর আস্তে আস্তে ফিরে এসে শুক্তির নীরব নিঃস্পন্দ ও চোখ-বোঁজা শান্ত মূর্তিটার পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

হুড়মুড় করে ছড়া গাইতে গাইতে ঘরের ভিতর এসে ঢুকে পড়ে মেয়ের পাল। টগর চন্দনা খাঁদি আর ধবধবী বুড়ি সীতা ফুলকুঁড়ি আর কালী।

—রক্ষে করো। তুমি কোথায়? ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

শুক্তির মাথার উপর হাত রেখে শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলে—এই তো। পালিয়ে যাইনি।

ততক্ষণে দশ-বারোটা হাত একসঙ্গে হুটোপুটি করে রুপো ঠাকরুনের ভিটার মাটি আলতার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্তির দু'পায়ে মাখাতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আর শরীরটাকে যেন প্রাণপণে কঠিন করে নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে শুক্তি। সতীসোহাগের ছড়া আরও জোর গলায় বেজে উঠতে থাকে—

রুপো ঠাকরুনের পা গো
কি আশ্চর্যি মা গো।
জল হলো আলতে,
পা হলো লালতে।
কড়ি তুলসী কচি দুব্‌বো ধন্যি।
পতিসোহাগী সোনাপুতী কন্যি।

অন্য ঘর থেকে শাশুড়ির ডাক শোনা যায়—থাম্‌লি এবার, ওরে ও মেয়ের দল, বউমাকে আর বিরক্ত করিস নি, সিধে নিয়ে ঘরে যা এখন।

মিছার মা

নুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা আর পুঁটির মা। একই গাঁ থেকে ওরা এসেছে। একই বস্তির এক ঘরেতে একই সঙ্গে থাকে সবাই। তা ছাড়া আছে আর একজন। তার নাম হলো মিছার মা।

ঢাকুরিয়া স্টেশন ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে ডায়মন্ড হারবারের ট্রেন যেখানে একেবারে জোরে শিস ছেড়ে আর বেগ বাড়িয়ে দিয়ে চলতে শুরু করে, সেখানে রেল লাইনের বাঁ দিকে তাকালে দেখা যায় এই বস্তি। বর্ষার সময় বস্তির ঘরগুলি যেন জলের উপর ভাসে, আর গলে গলে পড়ে দেয়ালের মাটি।

একটি ঘরের মাটির মেজে মাত্র, লম্বায় দশ হাতের কিছু কম আর চওড়ায় দু'হাতের কিছু বেশি। ভাড়া দিতে হয় প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা! অর্থাৎ মাথা পিছু পাঁচ টাকা। মাটির মেজেটাকেই সমান সমান পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছে সবাই। লম্বায় তিন হাত আর পাশে দু'হাত জায়গার এক একটি ভাগ। রাত্রি হলে সারাদিনের গতর-খাটা জীবনের ক্লান্তিকে তারই মধ্যে টান করিয়ে শুইয়ে নিতে পারা যায়। কেরোসিনের যে কুপিটা জ্বলে, সেটাও ভাগের জিনিস। মাথা পিছু এক পয়সা করে চাঁদা ধরতে হয়েছে, কারণ মোট পাঁচ পয়সা হলো

কুপির দাম। ত্রিশটি রাত্রির উগ্রগন্ধ ধোঁয়া আর ময়লা আলোর জন্য মোট খরচ পড়ে পাঁচ আনা। সুতরাং, হিসেবে কোন গোলমাল হয় না। প্রতিমাসে মাথা পিছু এক আনা জমা করলেই কেরোসিনের খরচ কুলিয়ে যায়।

নুটুর মা, হরির মা, দাসুর মা, পুঁটির মা আর মিছার মা—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠিকা-ঝিয়ের কাজ করে জীবন কেটে যায় যাদের, তাদেরই পাঁচজন। পাঁচটা ছেঁড়া মাদুর, তার উপর এক-এক টুকরো চট, আর এক-একটা কাঁথা। একটি করে পেটরাও আছে প্রত্যেকের। ঐ মাদুর চট আর কাঁথা, আর পেটরার মধ্যে যা আছে, তাই নিয়েই হলো পাঁচজনের যথাসর্বস্ব। চোরের ভয় আছে, তাই কাজের ফাঁকেই, কিংবা কাজ ফাঁকি দিয়েই এক-একবার চলে আসে। দরজা খুলে ঘরে ঢোকে, পেটরা খুলে দেখে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়। তারপব আবার দরজার কুলুপ দিয়ে কাজে চলে যায়।

বর্ষার ভয় আছে, চোরের ভয় আছে, গ্রীষ্মের সময় আর এক রকম ভয় আছে। গতবছর এই যথাসর্বস্বও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বৈশাখের দুপুরে ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকি কয়েকটা ছুটে এসে পড়েছিল শুক্‌নো বিচালি-ছড়ানো চালের উপর। সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেছিল সবাই, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘর। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই ছাই-এর স্তূপ ঘেঁটে পাঁচটি পেটরার কোন চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পোড়া কপালের ছাইটুকুও চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোর। কপাল চাপড়ে একই সঙ্গে কেঁদেছিল সবাই—নুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা, পুঁটির মা, আর মিছার মা।

আবার নতুন চালা তুলে দিলেন বস্তির মালিক। কিন্তু ভাড়াও বাড়িয়ে দিলেন। এখন দিতে হয় মাথা পিছু পাঁচ টাকা, আব তখন দিতে হতো মাথা পিছু তিন টাকা, মাসে পনের টাকা।

আর একটা ভয়, সেই ভয় হল সবচেয়ে বড় ভয়। জ্বরের ভয়। যদি মাথাটা কেমন কেমন করে ওঠে, হাত-পাগুলি তেতে ওঠে আর কাঁপতে থাকে, নিঃশ্বাসের বাতাসটা জ্বলতে থাকে, তবেই হয়েছে। একদিন দু'দিনেব টানা উপোসে যদি জ্বর ছাড়ে তো ভাল, তা না হলে হয় পাগল না-হয় ভিখিরী করে ছাড়বে ঐ জ্বর। কাজে কামাই দিতে হবে আর মাইনে কাটা যাবে। তাই জ্বর গায়েই কাজে ছুটতে হয়।

আবার, সব বারেই কি জ্বর গায়ের জ্বালা নিয়ে যেতে পারা যায়? পারা যায় না। ঘরের অন্ধকারে মাদুরের উপর শুয়ে হঠাৎ মরণভয় চেপে বসে বুকের উপর। ঢাকুরিয়ার কবরেজের কাছে গিয়ে চার আনার পাঁচন কিনে আনতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তবু পেটরার ভিতর হাত দিতে ইচ্ছা করে না। চারটি আনা পয়সা মিছামিছি খুইয়ে দিয়ে লাভ নেই। বুঝতে পারে, মিথ্যে এই মরণভয়, এত সহজে মরণ হয় না। আর মরণ যখন সত্যিই আসবে, তখন কি আর চার আনার পাঁচনে তাকে ঠেকানো যাবে।—না গো নুটুর মা, তুমি কাজে যাও, পাঁচন কিনতে হবে না। হাঁপ ছেড়ে আবার পাশ ফিরে শুয়ে থাকে হরির মা।

মাঝে মাঝে, বছরে অন্তত তিন চার বার প্রত্যেকেরই জীবনে এইরকম পরীক্ষা দেখা দেয়। কোনবার নুটুর মা, আবার কোনবার হরির মা, দাসুর মা, আর পুঁটির মা, আর মিছার মা, এইরকমই মরণভয় সহ্য করে, কিন্তু পাঁচন কিনে চার আনা পয়সা নষ্ট করতে পারে না।

নুটু হরি দাসু আর পুঁটি—নেহাত কতগুলি নাম নয়, মাত্র কতগুলি কল্পনা নয়। ওরা সত্যিই আছে। ওরা বেঁচে আছে। যে-যার নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাবার খোরাক যোগাড় করার জন্যই পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এই রকমই এক একটা বস্তির মধ্যে ঠাঁই নিয়ে আছে সবাই এবং এই বস্তিতেই মাঝে মাঝে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। আসে দাসু, আসে হরি আর নুটু। আলতা পায়ে দিয়ে আর হাতে কাঁচের চুড়ি বাজিয়ে পুঁটিও

আসে তার বরের সঙ্গে।

সন্ধ্যাবেলা লেকের চারদিকে ঘুরে মসলা-মুড়ি ফেরি করে দাসু। নুটু যাদবপুরের এক মোটর বাসে খালাসীর কাজ করে, আর হরি হলো বড়বাজারের এক দোকানের চাকর। পুঁটি আর ঝি-এর কাজ করে না। তার বর বিড়ির দোকান দিয়েছে, আর দোকান চলছেও ভাল। মায়েতে ছেলেতে সুখ-দুঃখের কথা হয়, আবার ঝগড়াও বাধে। সব মা'র মন এক রকম নয়, সব ছেলের প্রকৃতিও একরকম নয়। হরি আসে শুধু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে। নুটু এসে কখনো একটা নতুন গামছা আর কখনো বা দু-চার আনা পয়সা দিয়ে যায় মাকে। দাসু এসে শুধু ঝঞ্ঝাট বাধায়, উল্টো দুটো টাকা চেয়ে বসে। দাসুর মা চিৎকার করে গালি দেয়—টাকা কোত্থেকে পাব রে, আর পেলেই বা তোকে কেন দেব রে গাঁজাখেকো মুখপোড়া। পুঁটি আর একদিন এসে একগাল হেসে বলে—আজ কাজে কামাই দে না মা!

—কেন লো?

—আজ মুগ খিচুড়ি রেঁধেছি, চল দুটি খেয়ে আসবি।

সবারই ছেলে বা মেয়ে আসে, আর এসে ঝগড়া করে, নয় হাসে, কিন্তু মিছ্যর মা'র মিছ্য কেন আসে না?

আসবার কথা নয়, কারণ ঐ নামটাই যে মিছ্য। মিছ্যর মা কারও মা নয়। একটা নাম ওর নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে নামটা এই বস্তির জীবনে এসে অনেকদিন আগেই অচল হয়ে গিয়েছে। নুটুর মা, হরির মা, দাসুর আর পুঁটির মা'ও আজ মনে করতে পাবে না যে, ওর নাম হলো মুক্তো, ওদেরই গাঁয়ের সেই ভানু দাসের বউ মুক্তো। মুক্তো হলো নিঃসন্তান। কিন্তু সবাই যখন অমুকের মা আর তমুকের মা, তখন মুক্তোই বা কারও মা হবে না কেন? যেন চার জনের নামের চাপে পড়েই মুক্তোর নামও হঠাৎ বদলে গেল একদিন। আজ কারও মনেও পড়ে না, মুক্তোকে মিছ্যর মা বলে কে ডাক দিয়েছিল প্রথম। ঠাট্টা করে নয়, সত্যই যেন একটা দবকারে পড়ে, যেন বস্তির এই চারজন সন্তানবতীর নামের আর গতরখাটা ঝি-জীবনের সঙ্গে মুক্তোকে মানিয়ে নেবার জন্যই ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। সন্তান নেই, হয়নি কোন দিন। তাই মুক্তো হলো মিছ্যর মা।

—কি হলো তোর, আজ কাজে যাবি নি মিছ্যব মা?

নুটুর মা'র ডাক শুনে বিরক্ত হয়, আর উত্তর দিতে গিয়ে যেন বিড়বিড় করে মিছ্যর মা'র মেজাজ—কিছু হয়নি, ইচ্ছে হয়েছে কাজে যাব না, তুই চেঁচাস কেন?

রোজ নয়, মাঝে মাঝে সমব্যথিনীব এই রকম মিষ্টি কথারও তেতো জবাব দেয় মিছ্যর মা। জবাবের ভাষা শুনে আর অকারণ রাগের রকম দেখে কখনো রাগ করে আবার কখনো হেসে চলে যায় নুটুব মা।

কারণটা কিন্তু কেউ অনুমান কববার কিংবা বুঝবার চেষ্টা করে না। মিছ্যর মা হয়ে পড়ে আছে মুক্তো, সহজ হয়ে গিয়েছে এই নামটা, কিন্তু তবু যেন মাঝে মাঝে এই নাম সহ্য করতে পারে না মুক্তো।

সেদিন ঠিক হলো, রথের মেলা দেখতে যাওয়া হবে। —তুই যাবি নাকি মিছ্যর মা? দাসুর মা'র কথার উত্তরে হেসে হেসেই জবাব দেয় মুক্তো—যাব বৈকি।

চুল বাঁধল, ধোওয়া শাড়ি পরল মুক্তো। আর, যাবার সময় হতেই ডাক দিল পুঁটির মা—চল মিছ্যর মা।

হঠাৎ যেন ফোঁস করে উঠল মুক্তোর নিঃশ্বাসের শব্দ। মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার পরেই ঝামটা দিয়ে বলে—তোরাই যা, আমি যাব না।

—তবে থাক, মেজাজ নিয়ে ধুয়ে খা।

তিন জন ছেলের-মা আর একজন মেয়ের-মা রাগ করে পাল্টা ঝামটা দিয়ে চলে যায়। ঘরের দাওয়ার উপর নিঃশব্দে একা বসে বিনুনি খুলতে থাকে মুক্তো, মিছার মা মুক্তো।

এই রকম প্রায়ই হয়, হয়ে আসছে আজ ক'বছর ধরে। নাম বদলে দিয়ে মুক্তোকে বেশ মানানসই করে এই ঘরের চার জনের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবু যেন ঠিক মিলে যেতে পারেনি মুক্তো। ঐ অকারণ বিরক্তি, মুখভার, ফোঁস করে ওঠা আর ঝামটা দেওয়া, একটা কি যেন এলোমেলো হয়ে রয়েছে মনের মধ্যেই। মনের দিক দিয়ে চার জনের মধ্যে বেশ একটা বেমানান হয়েই রয়েছে মুক্তো।

শুধু মনের দিক দিয়ে কেন, বস্তির সকলে তো স্বচক্ষে দেখতেই পায়, বয়েস ও চোখ-মুখের চেহারায় ঐ চারজন নারীর মধ্যে বেশ ভিন্ন হয়ে আর বেমানান হয়ে রয়েছে এই নারী, যার নাম মিছার মা। চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর মধ্যে মাত্র একজন, যার বয়স বেশ কাঁচা। পরিপাটি করে বিনুনি বাঁধে, যত্ন করে আলতা পরে, মিছার মা'র এই সব শখ ভাল চক্ষে দেখে না বস্তির মানুষ, যদিও মিছার মা দেখতে ভাল আর বিনুনিতে ও আলতাতে ওকে মানায়ও ভাল।

বস্তির আর সকলে যে চক্ষেই দেখুক, এই ঘরের চারজন প্রবীণা ও বর্ষীয়সীর কাছ থেকে বেশ একটু লাই আদর আর ক্ষমাই পেয়ে থাকে মিছার মা। সন্ধ্যাবেলা কাজের বাড়ি থেকে মিছার মা'র ফিরতে যদি একটু দেরি হয়ে যায়, তবে একটু ভয় পেয়ে আর উদ্বেগ নিয়ে দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে চাবজন, আর ফিবে আসার পর ধমক-ধামকও দেয়। —রাত করিস কেন, বয়স ভুলে যাস কেন লো বে-আক্কেলে ছুঁড়ি?

অভিভাবিকাদের ভাবনায় রকম দেখে হেসে ফেলে মুক্তো। —মানুষের ভুল কি শুধু রেতেব বেলাতেই হয় হরির মা, দিনের বেলাতেও তো হতে পারে।

হেসে ফেলে হবির মা— দোহাই তোর ঠাকুবের, রেতে হোক আব দিনে হোক, ভুলটুল করিস না মিছার মা।

—চুপ কর। রুক্ষস্বরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো। গম্ভীর হয়ে আর মুখ ভার করে হরির মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের ভাব দেখেই বোঝা যায়, ঠিক সেই, আবার ঠিক সেই রকম অকারণে হঠাৎ রাগ করেছে মুক্তো। কিন্তু আর কিছুই বলে না। আর বলবেই বা কেমন করে? নিজেও কি ঠিক বুঝতে পারে এ ছাই অদ্ভুত বাগ কেন দপ করে জ্বলে উঠে মেজাজ খারাপ করে দেয়!

দাসুর মা বলে—তোর মাথার মধ্যে কি সাপ লুকিযে আছে নাকি লো? এরকম হঠাৎ ফোঁস করে উঠিস কেন?

মুক্তোও আর কোন উত্তর না দিয়ে শান্তভাবেই ঘরের ভিতর ঢোকে।

এই ভাবেই জীবন চলে, রেল লাইনের পাশের এই বস্তিতে, চারজন বর্ষীয়সী সত্যিকারেব মা, আর কাঁচা-বয়সের এক মিছার মা'র ঘরের জীবনে এর চেয়ে বেশি কোন ঝঞ্ঝাট দেখা দেয না।

ঝঞ্ঝাট দেখা দিল একদিন।

কোথা থেকে মোটাসোটা আর কুচকুচে কালো চেহারার এক বছর বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে এল মুক্তো।

চিৎকার করে হরির মা—এটাকে কোত্থেকে নিয়ে এলি মিছার মা?

মুক্তো হেসে হেসে বলে—তেতলা বাড়িব দারোয়ান দিল।

হরির মা—কার ছেলে?

মুক্তো—দারোয়ানেরই মেয়ে-মানুষের ছেলে।

নুটুর মা—তা মুখপুড়ী মেয়েমানুষটা কই ?

মুক্তো—মরেছে।

দাসুর মা—কিন্তু তার জন্য তুইও মরবি না কি ?

মুক্তো—মরব কেন ? এটাকে পুষব।

পুঁটির মা বাগ করে একটু শান্তভাবেই বুঝিযে বলে—মানুষেব ছেলে পোষা কি চারটিখানি ঝঞ্ঝাট মিছার মা ? নিজের পেটের ধান্ধায় দু'বেলা ঘরের বাইরে খাটতে হয় যাকে, ছেলে পুষবার সময কই তার ?

মুক্তো—ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাব।

নুটুর মা ধমক দেয়—একা একা বদ্ধ ঘরের ভেতর ছেলে পড়ে থাকবে, আর তুই বাইরে বাইরে ধেই ধেই করে নাচবি, কেমন ?

হরির মা—ছেলে যে কেঁদে সারা হবে।

দাসুর মা—মনার মা'র সর্বনাশের কথা শুনিসনি ?

পুঁটির মা—বাচ্চাটার পায়ে দড়ি লাগিয়ে সেই দড়ি দাওযাব খুঁটোব সঙ্গে বেঁধে রেখে রোজ কাজে চলে যেত মনার মা। একদিন ফিবে এসে দেখে, বাচ্চাটাকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ে, মেরে বেখে চলে গিয়েছে।

মোটাসোটা কুচকুচে কালো বাচ্চাটাকে কোলের উপরেই জোরে চেপে ধরে আঁতকে ওঠে মুক্তো। তারপরেই কেঁদে ফেলে—এ কি সর্বনেশে কথা বলছিস, পুঁটির মা।

পুঁটির মা সান্ত্বনার সুরে বলে—বেড়ালের ছানা পুষলেও মাযা পড়ে যায় মিছার মা, তুই তো ইচ্ছা করে মায়া করবার জন্যেই এটাকে পুষবি। বাঁচবে কি মরবে কোন ঠিক নেই, যেচে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিস না মিছার মা।

হরির মা বলে—ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

দাসুর মা বলে—আমি বাপু এক কথা বলে দিচ্ছি, আমি ঘরের মধ্যে এসব নোংরামির বালাই সহ্য করব না।

ফোঁস করে ওঠে মুক্তো—তোর দাসু কি একেবারে সেয়ানা হযে জন্মেছিল নাকি লো ?

দাসুর মা—কিন্তু সে তো তোর ঘর নোংরা করতে যায়নি আঁটকুড়ি।

পুঁটির মা মাঝে পড়ে ঝগড়া থামিয়ে দেয। দাসুর মাও একটু শান্ত হয। তোমরাই বল, আমি চার বেলা নাওয়া-ধোওয়া করি, আমার একটু শুধু বাতিক আছে, এখন এই ঘরের ভিতর একটা অজাত-কুজাত ছেলের নাংরামি যদি. ।

নুটুর মা—না না, সেসব চলবে না। ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে আয় মিছার মা।

ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে মুক্তোর কোলের উপর। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল মুক্তো। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে ঘরের দাওয়ার উপর থেকে নেমে ধীরে ধীরে চলে গেল।

পুঁটির মা এগিয়ে গিয়ে মুক্তোর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বলে—ভুল করিস না মিছার মা। পরের ছেলেকে পরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চলে আয়। নিজের ছেলে হলে না হয়...।

চমকে ওঠে মুক্তো। পুঁটির মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় মুক্তো বলে—কি বললি পুঁটির মা ?

—কিছু না, তুই এই ঝঞ্ঝাট ফেরত দিয়ে আয় এখন।

নিজের ছেলে হলে না হয়...কি জানি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল পুঁটির মা। দাওয়ার উপর চুপ করে বসে আবোলতাবোল চিন্তা করে মুক্তো। ক'দিন থেকে কাজে বের হয়নি মুক্তো, আজও যাবে না।

ভানু দাসের বউ মুক্তো, কিন্তু কোথায় সেই ভানু দাস ? আজ দশ বছরের মধ্যেও তার কোন সাড়া নেই। সেই যে ধানের ক্ষেতে দাঙ্গা করল আর পুলিশ আসবার আগেই পালিয়ে গেল, তারপর থেকে সেই মানুষটার ছায়াও আর দেখা দিল না। লোকটা ভেসে গেল, কিন্তু মুক্তোকেও ভাসিয়ে দিয়ে গেল। নইলে গাঁয়ের চাষীর বউকে কি আজ শহরের এই বস্তিতে এসে ঢুকতে হয়, আর পেটের ভাতের জন্য পরের বাড়ির থালা-বাসন ধুয়ে বেড়াতে হয় ! আবাগা বেঁচে থাকলেও পুলিশের ভয়ে আর ফিরে আসবে না, মরে থাকলে তো ফিরবেই না। ঐ লোকটাই মুক্তোকে চিরকালের মতো মিছার মা করে রেখে সরে পড়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে মুক্তো। উপায়ও তো আছে! আজ একবছর হলো একটা অনুরোধ মরিয়া হয়ে ছায়ার মতো মুক্তোর পিছনে ঘুরছে। পয়সা আলো লোকটার। বাজারের কাছেই পথের উপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলুর দোকান সাজিযে বসে থাকে লোকটা। ওর নাম নন্দ।

নন্দর কোন কথার কোন উত্তর দেয়নি মুক্তো। ছায়ার মতো পিছনে পিছনে এসেছে নন্দ। রেল লাইনের কাছ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বলেছে—কিন্তু আমি যদি তোকে স্ত্রী মনে করি, তবে তুই আমাকে স্বামী মনে করতে পারবি না কেন মুক্তো ? .

চুপ করে শুনেছে, আর শুনেই রেল লাইন পার হয়ে বস্তিতে ঢুকেছে মুক্তো। নন্দব ছায়া কোন জবাব না পেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে শুকনো মুখ নিয়ে ফিরে চলে গিযেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বস্তির ঘরে ঘরে কুপি জ্বলছে। ট্রেনের ইঞ্জিনের লাল ধোঁয়া অন্ধকারে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবতে গিযে আনমনার মতোই বস্তির কাদামাখা সক পথের দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো, আর কি আশ্চর্য, যেন মুক্তোর মনের সব ধোঁযা ভেদ করে সেই কিন্তুর মূর্তিটাই একেবারে ঘরের কাছে এসে মুক্তোর চোখের কাছে দাঁডায।

নন্দ বলে—আমি কি বাঘ না ভালুক, এরকম করিস কেন মুক্তো ?

উত্তর দেয় না মুক্তো। এত দিন সত্যই বাঘ আর ভালুকের মতই মনে হযেছিল লোকটাকে। কিন্তু আজ কেন জানি মনে হয়, মানুষটা মানুষেরই মতো।

নন্দ বলে—তুই ঘরে ঘরে এঁটো বাসন ধুয়ে বেড়াবি, এ যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না মুক্তো।

মুক্তোর একেবারে চোখের কাছে এসে নন্দ বলে—এত ভাববার কি আছে মুক্তো ? আমি খাটব আর টাকা আনব, তুই শুধু সেজে বসে থাকবি ঘরে।

চকিতে নন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপরে সন্ত্রস্তের মতো চারদিকে তাকায মুক্তো। নন্দর কথার মধ্যে মস্ত বড় এক লোভের আশ্বাস বাজছে আর চারদিকে তেমনি কতগুলি কঠিন ধিক্কারও থমথম করছে। হ্যাঁ, একটি ছেলে কোলে নিয়ে ঘবের ভিতব সেজে বসে থাকতে চায় মুক্তো। কিন্তু সে কি করে সম্ভব ? তা হলে চিরকালের মতো এই ঘরের বার হযে যেতে হয়। গাঁয়ের নাম ডুবিয়ে দিয়ে, এই বস্তির ও এই ঘরের নাম ডুবিযে দিযে চলে যেতে হবে...তারপর. .।

নন্দ বলে—এত ভয় করবার কি আছে মুক্তো ? এই তল্লাটেই আর থাকব না আমরা। জাতের লোক, চেনা লোক, গাঁয়ের লোক, কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের। স্বামী-স্ত্রী হয়ে সুখে ঘর করব আর...।

মুক্তো হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে—তুমি এখন যাও।

নন্দ—তা হলে কথা রইল, একদিন এসে...।

মুক্তো—যাও যাও, এখন শিগগির চলে যাও।

চলে গেল নন্দ—সঙ্গে সঙ্গে হরির মা এসে ঘরের দাওয়ার উপরে ওঠে। প্রশ্ন

করে—আজও কি কাজে যাসনি মিছার মা ?

মুক্তো বলে—না যাইনি, আর কোনদিনও কাজে যাব না।

হরির মা বিস্মিত হয়—এ কেমন কথা ? কাজ করবি না তো খাবি কি ?

মুক্তো—কপালে যা আছে, তাই খাব।

হরির মা ভ্রূকুটি করে—তোর কথাবার্তা তো ভাল মনে হচ্ছে না মিছার মা।

নুটুর মা, পুঁটির মা আর দাসুর মা আসে। তারপর আরও প্রবল এবং আরও মুখর হয়ে ওঠে চারটি গতর-খেটে-বেঁচে-থাকা বর্ষীয়সীর মনের সন্দেহ। কাজে যাবে না আর খাটবে না, তবে খাওয়াবে কে এই মেয়েকে ? ও কি এই দাওয়ার উপর বসে বেণী দুলিয়ে আর আলতা রাঙানো পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাত-কাপড় গয়না রোজগার করতে চায় ? সে হবে না, কখনো না ! তার চেয়ে এখনই দূর হয়ে যাও। জাত-পাতের মুখে কালি দিয়ে, যে কোন নরকে চলে যাও। এখানে থেকে ওসব চলবে না।

হরির মা আক্ষেপ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলে—ওরে, তুই যে সম্পর্কে আমার জা হোস রে মিছার মা। তোর সোয়ামি ভানু যে হরির বাবার আপন মেসোর ভাইয়ের ছেলে।

পুঁটির মা ভয়ে কেঁপে ওঠে—ভানু যদি কখনও ফিরে আসে, তবে তোকে যে ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে হাড়িকাঠে ফেলে বলি দেবে লো।

অভিযোগের উত্তাপ আর ধিক্কারের বর্ষণ একটু শান্ত হবার পর মুক্তো হঠাৎ বেহায়ার মতো হেসে ওঠে।

পুঁটির মা বলে—আবার কি হলো ?

মুক্তো বলে—আমি যদি বিয়ে করি তবে কি দোষের হবে পুঁটির মা ?

পুঁটির মা চোখ বড় করে তাকায়।—বিয়ে ? তোর তো বিয়ে হয়েই আছে। আবাব বিয়ে কেমন করে হবে ?

মুক্তো—বিধবার তো বিয়ে হয়।

পুঁটির মা—তুই বিধবা নাকি ?

মুক্তো—হ্যাঁ, মানুষটা এতদিন মরেই গিয়েছে নিশ্চয়।

হরির মা চেঁচিয়ে ওঠে—তবে এতদিন কপালে সিঁদুর রাখলি কেন মুখপুড়ী ?

মুক্তো একটুও রাগ করে না। বরং খিলখিল করে হেসে ওঠে—আমি যেমন মিছার মা, তেমনি আমার ঐ মিছা সিঁদুর।

পুঁটির মা বুঝিয়ে বলে—ধর, বিয়েই না হয় করলি। তারপর, ভানু যদি ফিরে আসে ? কি হবে উপায় ?

মুক্তো—তখন না হয় গলায় দড়ি দেবো।

হরির মা বলে—এখুনি দে।

কিন্তু এত হুমকি আর উপদেশে কোন ফল হলো না। সত্যই আর কাজে গেল না মুক্তো। পেটরা খুলে পয়সা বের করে উনুন হাঁড়ি কাঠ আর চাল ডাল কিনে আনে মুক্তো। দাওয়ার একটি কোণ চট টাঙিয়ে আড়াল করে নেয়। সেইখানে বসে রান্না করে মুক্তো। কখনো দুপুরে কখনো বিকেলে, আর কখনো সন্ধ্যায়, মাত্র একটি বার এক ঘন্টার মধ্যে তড়বর করে রান্না সেরে নেয়, আর খেয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর পড়ে থাকে। মাদুরের উপর অলস একটা দেহ ছটফট করতে থাকে। যখন কেউ থাকে না ঘরে, তখন শিয়রের পুঁটলির উপর মুখ গুঁজে দিয়ে অবাধে কেঁদে নেয় মুক্তো। চমকে ওঠে এক একবার, মনে হয় নন্দর ছায়া এসে উঠেছে দাওয়ার উপর।

নুটুর মা দেখে আশ্চর্য হয়, হরির মা দেখে হাঁফ ছাড়ে আর আশ্বস্ত হয়, আর পুঁটির মা ও দাসুর মা দেখে কষ্ট পায়, এ আবার কোন্ রোগে ধরল মিছার মাকে। সত্যিই বেণী দুলিয়ে আলতায় পা রাঙিয়ে দাওয়ার উপর বসে না মুক্তো। বিয়ে-টিয়ে করবে বলে যে সব ফষ্টি-নষ্টি করল, তাই বা সত্য হলো কোথায়? বরং, কি যেন এক মরণ গোঁ ধরেছে, যার জন্য অষ্টপ্রহর মাদুরের উপর গড়াচ্ছে আর ছটফট করছে। এক মাসের মধ্যেই কি ভয়ানক কণিয়ে গেল ছুঁড়ি!

নুটুর মা মুক্তোর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়—তোর কি হয়েছে বল দেখি?

বলতে বলতে নুটুর মা মনের আর একটা ভয়ানক সন্দেহ দূর করার জন্য দু' চোখ নিয়ে মুক্তোর একেবারে গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে।

দাসুর মা বলে—যদি হয়েই থাকে, তবে ক'দিন লুকিয়ে রাখবে? ধবা তো পড়তেই হবে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুক্তো। শুনতে ভালই লাগে বুড়িদের ভীরু মনের আশঙ্কার কথা, আর গম্ভীর মুখের আলোচনা।

নুটুর মা—যাই করিস বাছা, ভুলেও নিজের এমন সর্বনাশটা করিস না।

—না গো না! বলতে গিয়েই ফুঁপিয়ে ওঠে মুক্তো।

কিন্তু মনে হয় মুক্তোর, এই সর্বনাশটা নেই বলেই খালি হয়ে রয়েছে বুকটা। নুটুর মাও যেন শান্ত করার জন্যই একটু আদর করার ভঙ্গিতে মুক্তোর মাথায় হাত দিয়ে ডাকে—মিছিমিছি কেন ইচ্ছে করে নিজের মনটাকে জ্বলিয়ে কষ্ট পাচ্ছিস মিছার মা। কপাল মেনে চলতে হবে তো।

উত্তর দেয় না মুক্তো। ফোঁপানিও থামে না। আর চার বর্ষীয়সী কোন কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে। এতদিনে যেন বুঝতে পেরেছে সবাই, মিছাব মা'ব এতদিনেব খেপা মেজাজের সব রহস্য। কিন্তু উপায় কি? মিছাব মা হযে তুব বেঁচে থাকা যায, কিন্তু জাত মান ডুবিয়ে দেওয়া যে মরণের বড় মরণ।

কেরোসিনের কুপি জ্বলে। ধোঁয়া-মাখা আলো মিটমিট করে দরজাব কাছে। বুড়িরা যে যার মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে, সারাদিনের ক্লান্ত এক একটা বাসন-মাজা, ঝাঁট দেওযা আর কাপড়-কাচা জীর্ণ-শীর্ণ জীবন। ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, শুধু মুক্তোর চোখে ঘুম আসে না। যেমন ভাল লাগে না মিছার মা নাম, তেমনি ভাল লাগে না বুড়িদের সন্দেহভরা চোখের সামনে এইরকম মিথ্যে পোয়াতির মতো মিছিমিছি কাতরাতে। মিটমিট কবে একটা স্বপ্ন জ্বলে মুক্তোর দু'চোখে। চমকে ওঠে মুক্তো, কেরোসিনের কুপির আলো যেন দাওযার উপব একটা ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ ছটফট করে উঠেছে।

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। দেখতে পায়, হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে।

নন্দ এসে দাঁড়িয়ে আছে। ফুঁ দিয়ে কুপিটা নিভিয়ে ঘবের বাইরে এসে দাঁড়ায মুক্তো। ফিসফিস করে বলে—যাব তোমার সঙ্গে, কাল রাতে এস, অনেক রাতে।

চলে যায় নন্দ।

ভোর হয়। সবার আগে মাদুড় ছেড়ে উঠে বসে নুটুর মা, আর দেখতে পায়, আরও আগে উঠে বসে রয়েছে মিছার মা, ঘুম-কাতুরে আলসে মিছার মা। কি আশ্চর্য! প্রশ্ন করে নুটুর মা—আজ কি কাজে বের হবি?

মুক্তো বলে—হ্যাঁ।

নুটুর মা—মনে রাখিস, আজ ঘরের ভাড়া দিতে হবে।

হ্যাঁ, মনে আছে মুক্তোর, এই ঘরের ভাড়া জীবনে শেষবারের মতো চুকিয়ে দিতে হবে

আজ।

কাছাকাছি দুটো বাড়িতে মুক্তোর প্রায় এক মাসের মাইনে বাকি পড়ে আছে। আর অনেকদিনের আগের দুটো বাড়ির কাছেও পাওনা আছে। সে প্রায় আজ দু'বছর আগের কথা। একটা বাড়ির গিন্নিমার কথার ঝাঁঝে অতিষ্ঠ হয়ে আর রাগ করে চলে এসেছিল মুক্তো। আর একটা বাড়ির গিন্নি পর পর তিন মাস মাইনে না দিয়ে শুধু মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখছে দেখে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল মুক্তো। যাব যাব করেও আজ দু'বছরের পাওনা টাকা আদায় করতে যেতে পারেনি মুক্তো।

কিন্তু আজ আদায় করে নিতে হবে। আজ যে এই তল্লাট ছেড়েই রাতের অন্ধকারে ভেসে চলে যেতে হবে চিরকালের মতো। ঘর ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে, আর কিছু কাপড়-চোপড় কিনে নিতে হবে। পেটরাতে আর একটি আনাও বোধহয় নেই। টাকার দরকার আছে।

দরকার নাই বা থাক, পাওনা ছেড়ে দেব কেন ? গেলাসের গায়ে ছাই-এর একটা দাগ লেগে থাকলেও যারা চেঁচিয়ে উঠেছে, তিন বার করে সেই গেলাস না ধুইয়ে যারা ছাড়েনি, তাদের কাছ থেকে পাওনা টাকা চেঁচিয়ে আদায় করে নেওয়াই তো উচিত। আর ভয় কিসের ! মায়াই বা কেন আসবে এই তল্লাটের জন্য, যেখানে না খাটিয়ে নিয়ে কেউ এক ঘটি তেষ্টার জল দেয় না ?

ঘর ছেড়ে বস্তির সরু রাস্তা, তারপর রেল-লাইন, রেল লাইনের পাশে শিউলি গাছ, তারপর ছোট মাঠটা পার হয়ে একটা পাকা সড়ক, সড়কের দু'পাশে নতুন নতুন দোতলা আর চারতলার ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায় মুক্তো। এক এক করে তার কাজের বাড়িতে ঢোকে, আর পাওনা আদায় করে নিয়ে চলে আসে।

একটা বাড়ির শেষ দিনের এক বেলার মাইনে কেটে নিল আর একটা বাড়ি মাইনের হিসাবটাই কেমন যেন এলোমেলো করে দিল। করুক, কোন ক্ষতি নেই। বাড়ির গিন্নি কথা শুনিয়েছে, তেমনি গিন্নিকেও কথা শুনিয়ে দিয়েছে মুক্তো। আর এই তল্লাটের কোন চোখ রাঙানি আর চেঁচানিকে ভয় করবার গরজ নেই মুক্তোর।

বাকি রইল পুরনো বাড়ি দুটো। এখান থেকে একটু দূরে, ট্রাম লাইনের কাছাকাছি সেই দুটো বাড়িতে সেই মানুষগুলি এখনো আছে কি না কে জানে। একটা বাড়ির সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা নেই, কারণ সেটা হলো বড়লোকের বাড়ি, আর নিজেদেরই বাড়ি, ভাড়া বাড়ি নয়। ওরা নিশ্চয় আছে, ওদের কাছ থেকে আদায়ও করা যাবে নিশ্চয়। দু'বছর আগের পাওনা, বাড়ির কর্তা আর গিন্নি হিসাব ভুলে গেলেও ভুলতে দেবে কেন মুক্তো ? চেঁচিয়ে বাড়ি আর পাড়া মাত করে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভালয় ভালয় পাওনা মিটিয়ে না দিলে আরও অনেক ছোটকথা শুনতে হবে, যতই না বড়লোক হও।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো, বড় বাড়ির কর্তা ও গিন্নি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না যে, ঝি মিছার মায়ের মাইনে বাকি পড়ে আছে। কিন্তু মিছার মা গলা খুলতেই মনে পড়ে গেল কর্তার, একুশ দিনের মাইনে বোধহয় দেওয়া হয়নি। মিছার মা বলে—একুশ দিন নয়, আটাশ দিন, আপনার মেয়ে-জামাই যেদিন এল আর গিন্নিমা আমাকে যাচ্ছেতাই বললেন, সেদিনের তারিখটা মনে করে দেখুন।

বাড়ির গিন্নি চেঁচিয়ে ওঠেন—ছোটলোক হয়ে এত বড় কথা..।

মুক্তো—ছোটলোকের পাওনা পয়সা ফাঁকি দিতে চান, কেমনতর বড়লোক আপনি ? ছোটলোকের চেয়েও...

বাড়ির গিন্নি হুংকার দেন—সাবধান :

কর্তা বলেন—যাক, আটাশ দিনের মাইনেই হিসেব করে দিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক ঠিক হিসাব করে টাকা দিলেন কর্তা, মুক্তোও চলে গেল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এসে আবার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মুক্তো, কারণ গেটের দরজা একেবারে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।—ঠগ ঠগ, তিনতলাওয়ালা ঠগ অচল নোট ধরিয়ে দিয়েছে।

পাঁচ টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে পথচারী ভদ্রলোকদের ডেকে ডেকে দেখায় মুক্তো।—দেখুন তো বাবু, এই নোট কি বাজারে চলবে ?

পথচারী ভদ্রলোক বলেন—না, এটা জাল নোট। কেউ বা জিজ্ঞাসা করে—কোথায় পেলে এ জাল নোট ?

হাত তুলে তিনতলা বাড়িকে দেখিয়ে দিয়ে চিৎকার করে মুক্তো—ঐ যে তিনতলাওয়ালা জালিয়াত দিয়েছে।

কিন্তু মুক্তোর চিৎকারে তিনতলা বাড়ির ফটকের লোহার গরাদ একটুও বিচলিত হলো না। মুক্তোই শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে, ক্লান্ত হয়ে আর অভিশাপ দিয়ে চলে গেল।

বাকি আর একটা বাড়ি। সেটা হলো ভাড়া-বাড়ি ; আশঙ্কা হয়, হয়তো সে বাড়িতে গিয়ে কতকগুলি নতুন লোকের মুখ দেখতে পাবে মুক্তো। ঝি-এর তিন মাসের মাইনে বাকি রেখেছে যারা, তারা কি আর চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রাখেনি, আর তারপর কি বাড়িওয়ালা না উঠিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তাদের ?

পথ চলতে থাকে মুক্তো, কিন্তু মনে হয়, সে বাড়ির লোকগুলি দেনার চাপে আর পাওনাদারের তাগিদে এতদিনে পালিয়েই গিয়েছে নিশ্চয়। কম তো নয়, তিন মাসের মাইনে ত্রিশটি টাকা পাওনা ছিল সেখানে।

মনে পড়ে সে বাড়ির লোকগুলির চেহারা। কর্তার বয়স অল্প, কিন্তু তবু টাক পড়েছে মাথায়। একটা মেয়ে আছে, আট-নয় বছর বয়স হবে। আর আছেন গিন্নি। বড় কাজের মানুষ, আর বড় বেশি মিষ্টি কথার মানুষ ঐ গিন্নি। লোকগুলি মন্দ ছিল না, কিন্তু শুধু মিষ্টি কথার জোরে মাসের পর মাস মাইনে ফাঁকি দেওয়াও তো ভদ্রলোকের কাজ নয়। মনে পড়ে, সে বাড়ির গিন্নিকে বৌদি বলে ডাকত মুক্তো। বয়স বেশি নয় গিন্নির।

সঙ্গে সঙ্গে তিন বছরের পুরনো স্মৃতির ছবি যেন চঞ্চল করে দিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ে যায় মুক্তোর, বৌদির তখন সাত-আট মাস চলছে। মুক্তো কাজ ছেড়ে চলে আসার সময় বৌদি বলেছিলেন, আর অন্তত একটা মাস থেকে যাও মিছার মা।

থাক এসব পুরনো কথা, আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই বাড়িটারই কাছে গিয়ে থামে মুক্তো। এই বাড়িরই নিচের তলার ভাড়াটে হলো সেই টাকপড়া দাদাবাবু আর সেই বৌদি। দেখতে পায় মুক্তো, দরজার সামনে সেই কচি সুপুরি গাছটা আছে, আর বেশ একটু বড়সড়ও হয়েছে। তিন বছরটা তো কম সময় নয়।

বাড়িতে ঢুকে খুশিই হলো মুক্তো। কলতলায় বসে এঁটো বাসন মাজছিলেন বৌদি। মুক্তোকে দেখতে পেয়েই আশ্চর্য হলেন আর হেসে হেসে বললেন বৌদি—এ কি মিছার মা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি ?

মুক্তো বলে—বেঁচেই ছিলুম গো বৌদি।

বৌদি—আমি কিন্তু মরতে চলেছিলুম।

মুক্তো—কেন ?

বৌদির বাসন মাজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বলেন—আগে একটু জিরিয়ে নাও আর চা খাও, তারপর বলছি।

শুনে খুশি হয় না মুক্তো, বরং একটু গম্ভীর হয়েই বসে থাকে। এই ভয়ই করছিল মুক্তো,

এবাড়ির এই সব মায়া-কথার আর মিষ্টি ভাষার ফাঁদে পড়লে পাওনা টাকাগুলিই মারা পড়বে। টাকা আদায় করতে এসে এই চালাক বৌদির ভাল ভাল কথার সঙ্গে মন মাখামাখি না করাই ভাল। আজ মনে মনে শক্ত সঙ্কল্প এঁটে এসেছে মুক্তো, যদি টাকা না দিতে পারেন বৌদি, তবে টাকার বদলে বৌদির হাতের একটা আংটি চেয়ে নেবে মুক্তো। ফরসা কাপড় পরবে, দু'কানে সোনাদানা চড়িয়ে বসে থাকবে, অথচ ঝি-এর মাইনে দেবার বেলায টাকা হয় না, এটাও একটা চালাকি নয় তো কি ?

চা খেল মুক্তো। বৌদি বলেন—তুমি তো আমাকে সেই অবস্থায় ফেলে চলে গেলে মিছার মা। তারপর সে কি দুর্দশা। নিত্যি মূর্ছা যাই আর তারপরেই শবীরের গাঁটে গাঁটে অসহ্য ব্যথা। যা হোক, হাসপাতালে তো গেলুম, ফাঁড়াও ভালয ভালয় কেটে গেল, কিন্তু বিপদে পড়লুম বাচ্চাকে নিয়ে।

চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তো—বাচ্চা কই বৌদি ?

বৌদি হাসেন—বাচ্চা এখন আর একেবারে বাচ্চা নয়। টুলুর বযস তো এখন প্রায় দু'বছর হয়েছে মিছার মা।

উঠে দাঁড়ায় মুক্তো—কই, টুলু কই ?

এইবার বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থাকেন বৌদি।—আজ মাস দুই হলো খুব অসুখে ভুগছে টুলু। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

বৌদির কোন নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে ব্যস্তভাবে ঘরের দিকে চলে যায় মুক্তো। এই ঘরের সবই চেনা। এ ঘরের প্রত্যেকটি কোণের ধুলো ঝাঁট দিযে সরিয়েছে যে, তার কাছে কিছুই তো নতুন নয়।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকতেই ঘরের ·চেহারাটা কেমন নতুন নতুন লাগে মুক্তোর চোখে। অনেক কিছু ছিল এই ঘরের মধ্যে, তার অনেক কিছুই এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেওয়াল ঘড়িটা নেই, বড় আয়না আর আলমারিটা নেই। বড় পালঙ্কটাও নেই। দেওয়াল আলমারিতে আরশির আড়ালে ঝক্ ঝক্ করত পাঁচটা থাকে সাজানো কাঁসা আর তামার বাসন। কতকগুলি ছোট ছোট রুপোর থালা বাটি পানদানি আর পুতুল ছিল। সেসব কিছুই আর নেই। আলনার দুটি পাট দাদাবাবুর ধুতিগুলিতেই ভরে থাকত। আজ সেখানে মাত্র একটি আধময়লা গেঞ্জি আর একটি ধুতি ঝুলছে। বৌদিব চেহারাটাও চোখে পড়ে। কানে দুল নেই, আংটিও নেই। আর সেই মেয়েটা, সেই রমা, ঢেঙ্গা হযেছে ঠিকই, কিন্তু কি রোগা !

তক্তাপোশের উপর বিছানায় শুয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা শিশু। তারই মাথার কাছে পাখা হাতে বসে আছে বৌদির বড় মেয়ে রমা। এগিয়ে যায় মুক্তো।

দুই চোখ অপলক করে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুক্তো ! তারপর সরে যায়। ঘরের ভিতর থেকে চলে এসে বারান্দার উপর বসে পড়ে। একটা হাঁপ ছেড়ে মুক্তো বলে—তোমাদের এ কি রকম দশা হলো বৌদি, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

বৌদি বলে—চাকরি না থাকলে যা হয়। তোমার দাদাবাবুটির কপালে যে কোন্ গ্রহের কোপ পড়েছে, জানি না। তিন বছর হতে চলল, শত চেষ্টা করেও কোন চাকরি পাচ্ছেন না, অথচ কি কাজই না জানেন। এখন শুধু এখানে ওখানে ছেলে পড়িয়ে যা আনছেন, তাতে... ।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন বৌদি। মুক্তো বলে—ছেলের ওষুধ-বিষুধ ঠিক চলছে তো, না তাও... ।

বৌদি বলেন—কেমন করে চলবে ? এই তো দেখ, আজ তিনদিন হলো এক বন্ধু ডাক্তার এসে ওষুধের নাম লিখে দিলেন, কিন্তু আজও ওষুধ আনতে পারা গেল না। পনেরটা টাকার

জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তোমার দাদাবাবু।

আবার চুপ করেন বৌদি। তারপরেই যেন একটা দুঃসহ আক্ষেপ চাপতে না পেরে হঠাৎ ছটফট করে ওঠেন—ছেলেটা এল, কিন্তু দুর্ভাগ্যই যে সঙ্গে করে নিয়ে এল মিন্টুর মা!

—ছি-ছি-ছি! বৌদির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে পাল্টা ধিক্কার দেয় মুক্তো।—তোমার মিষ্টি মুখ যে একেবারে তেতো হয়ে গিয়েছে বৌদি। এমন কথা কি বলতে হয়? তোমাদের পোড়াকপাল দিয়ে ছেলেটার প্রাণটাকে পোড়াচ্ছ তোমরাই, উল্টো ছেলের ভাগ্যির নামেই কুকথা, ছিঃ।

এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে কাজ করতে থাকেন বৌদি। ক্লান্ত ও অবসন্নের মতো চুপ করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বারান্দার উপর বসে থাকে মুক্তো অনেকক্ষণ।

যেন এই অবসাদ থেকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে একটা চেষ্টা করতে চায় মুক্তো। বলে—আমাকে আর এক বাটি চা দিতে পার বৌদি?

—নিশ্চয়।

যতক্ষণ চা তৈরি করেন বৌদি, ততক্ষণ চোখ বন্ধ করে যেন একটা স্বপ্ন খুঁজতে থাকে মুক্তো। বৌদির ডাকে যখন চমক ভাঙ্গে তখন চোখ মেলে তাকায় আর চা খায়। তারপরেই উঠে দাঁড়ায় মুক্তো। আর, বৌদির মুখের দিকে শক্তভাবেই তাকিয়ে বলে—ওষুধের নাম লেখা কাগজটা আমাকে দাও বৌদি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বৌদি। মুক্তো যেন ভয় দেখিয়ে চিৎকারের মতোই কর্কশ স্বরে বলে—দাও বলছি।

ওষুধের নাম লেখা কাগজটা নিয়ে এসে মুক্তোর হাত তুলে দেন বৌদি। মুক্তো তার শাড়ির আঁচলের এক কোণের একটা গিঁট খুলে নোট আর টাকাগুলি একবার গুনে নেয়। তারপরেই চলে যায়।

তারপর, দুপুর হবার আগেই এই নিচেরতলার টাক-পড়া দাদাবাবু ফিরে এসেছে, আর দুপুর হতেই আবার বের হয়ে গিয়েছে। রমা খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ বই পড়েছে, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আর, এক গাদা কাপড় কেচে, তারপর বারান্দার উপরেই ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন বৌদি।

বাড়ির মধ্যে শুধু জেগে থাকে একজন। ঘরের ভিতরে তক্তাপোশের পাশে পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে মুক্তো।

যেমন যেমন বলে দিয়েছেন বৌদি, সব মনে আছে মুক্তোর। টুলু জাগলেই ওষুধ খাইয়ে দেয়, আর মাথায় পাখার বাতাস দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। টুলুর ছোট্ট বুকের উপর থেকে চাদর সরিয়ে, আর ছোট জামাটার বোতাম খুলে মালিশের ওষুধ লেপে দেয় টুলুর বুকের উপর। টুলু আরামে ঘুমোতে থাকে। তুলতুলে ও ছোট একটা বুক নিঃশ্বাসের বাতাসে কাঁপে, যেন একটা স্পর্শের মায়ায় থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ে মুক্তোর বুক। টুলুর কপালে হাত বুলিয়ে, টুলুর কপালে চুমো খেয়ে আবার নিজেকে যেন কিছুক্ষণের মতো শান্ত করে রাখে মুক্তো।

সব মনে আছে মুক্তোর, বৌদি যেমন যেমন বলে দিয়েছেন। এক একবার টুলু হঠাৎ চোখ মেলে তাকায়। মুক্তো ডাকে—কি চাই বাবু?

টুলু বলে—মিষ্টি জল।

এক হাতে ওষুধের গেলাসে মিছরির জল ঢেলে নিয়ে টুলুর মুখের কাছে তুলে ধরে মুক্তো। আর এক হাতে টুলুর ছোট দেহটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে মুক্তো। মিষ্টি জল খেয়ে শুয়ে পড়ে টুলু, তারপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। আবার হাতে পাখা তুলে নেয় মুক্তো।

ঝন্ ঝন্। একটা শব্দ যেন হঠাৎ চমকে উঠল, বোধহয় বৌদির হাত থেকে পড়ে গিয়েছে একটা থালা। সেই সঙ্গে চমক ভাঙ্গে মুক্তোর, আর ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে তার বুকের ভিতরটা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এইবার যেতে হবে।

যেন এতক্ষণ ধরে একটা মূর্ছার মধ্যেই পড়েছিল মুক্তো। এইবার জ্ঞান হয়েছে। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় ডাক দেয় মুক্তো—বৌদি গো।

বৌদি এসে বলেন—কি ?

মুক্তো ছটফট করে—এবার আমায় যেতে দাও বৌদি।

বৌদি বিষণ্ণভাবে বলেন—আমি তোমাকে যেতে দেবার কে মিছার মা। তুমি যে উপকার করলে, সে কাজ...

মুক্তো—চুপ করো বৌদি। আমি যাই।

বৌদি—কাল আসবে তো একবার ?

মুক্তোর চোখ দুটো কাঁপতে থাকে ভীরু অপরাধীর মতো। —কাল ? হ্যাঁ, দেখি কিন্তু কাল কি আসতে পারব বৌদি ?

বৌদি—কাজের এক ফাঁকে চলে এস একবার।

বৌদির কথার উত্তর দেবার আগেই আব একটা শব্দ শুনে চমকে ওঠে মুক্তো।

—যাবে না। কচিগলায় এক অদ্ভুত আদেশের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে টুলুর দিকে তাকায় মুক্তো। দেখতে পায়, চোখ মেলে মুক্তোরই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে টুলু। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলেন বৌদি।

আবার দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে টুলুর বিছানার কাছে দাঁড়ায় মুক্তো। —কি বলছো বাবু ?

হাত বাড়িয়ে মুক্তোর শাড়ির আঁচল খপ্ করে ধরে ফেলে টুলু!

আবার সেই জ্বরে কাতর আর দুর্বল একটা শিশুকণ্ঠের স্বর বেজে ওঠে—যাবে না।

বৌদি ফিসফিস করে বলেন—আপত্তি করো না মিছার মা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক একটু, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে, তারপর যেও।

ঠিক বলেছেন বৌদি। এক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল টুলু। আস্তে আস্তে, অতি সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে ঘুমন্ত টুলুর মুঠো থেকে আঁচল ছাড়িয়ে নিল মুক্তো।

কিন্তু বৌদির দিকে তাকাতেই ছলছল করে ওঠে মুক্তোর চোখ। —জেগে উঠে আমাকে আবার খুঁজবে না তো বৌদি ?

বৌদি বলেন—খুঁজতে পারে, আশ্চর্য কি।

আর একমুহূর্তও দেরি করে না মুক্তো। দরজা পার হয়ে হনহন করে চলে যায়। যেন ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা একটি গভীর রাতে এক সিঁধেল চোরের মতোই এই ঘরের ভিতর ঢুকেছিল মুক্তো, কিন্তু হঠাৎ ভোর হয়ে গিয়েছে, তাই ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে হলো।

রাত্রির অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে রেল লাইনের পাশের বস্তি। একটি ঘরের ভিতর তখন একজন জেগে বসে আছে, আর কুপিতে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। একটি ছায়া এসে ওঠে সেই ঘরের দাওয়ার উপর।

ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে মুক্তো! নন্দ বলে—চল মুক্তো।

মুক্তো বলে—না।

নন্দ আশ্চর্য হয়—না ?

মুক্তো—আমি যাব না।

নন্দ—তবে মিছে কথা বলে আমাকে এভাবে ঠকালি কেন মুক্তো ?

মুক্তো—হ্যাঁ, সত্যিই মিছে কথা বলেছি আর ঠকিয়েছি। কিন্তু তুমি মাপ করে দাও।

নন্দ সন্দিগ্ধভাবে বলে—ব্যাপার কি, একটু খুলেই বল না মুক্তো ?

মুক্তো—ছেলে ফেলে রেখে চলে গেলে পাপ হবে।

নন্দ—তোর ছেলে আছে নাকি ?

মুক্তো—আছে।

নন্দ বলে—বেশ তো, ঘর ছেড়ে চলে আসতে না ই বা পারলি, কিন্তু ঘরে থেকেই তো মাঝে মাঝে .।

মুক্তোর গলার স্বর দপ্ করে জ্বলে ওঠে—আর কিন্তু টিস্ত নয়, সোজা চলে যাও, নইলে এখুনি হাঁকডাক করে পাড়া জাগিয়ে তুলব বলে দিচ্ছি।

দাওযার উপর থেকে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে সেই মুহূর্তে যেন টুপ করে ঝড়ে পড়ে আর সরে পড়ে নন্দর ছায়া।

কোন শোরগোল জাগল না, কিন্তু তবু অকস্মাৎ দাওযার উপর একটা রহস্যপূর্ণ ছায়ার উৎপাতেই যেন বিচলিত হয়ে ঘরের ভিতরের মানুষগুলির ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠল নুটুর মা, দাসুর মা, হরির মা আর পুঁটির মা।

নুটুর মা—কি লো মিছার মা, তুই এখনো জেগে রয়েছিস কেন ?

দাসুর মা—এখনো কুপি জ্বলছে কেন ?

কোন জবাব না দিয়ে হাসতে থাকে মুক্তো।

হরির মা বিরক্ত হয়ে বলে—বেশি রঙ ঢলাস্ নি মিছার মা।

কিন্তু মুক্তো সত্যিই হেসে হেসে চোখে মুখে রঙ ঢলিয়ে বেহায়ার মতো বলে—আমি মিছার মা নই গো হরির মা।

নুটুর মা—তবে তুই কি ? ছেলের মা ?

মুক্তো মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ে আর হাসে—তা তোকে বলতে যাব কেন ? তুই বুঝবিই বা কি ?

নুটুর মা চিৎকার করে—কি বললি ?

মুক্তো বলে—তুই এখন ঘুমো, আর আমাকেও একটু ঘুমোতে দে।

নিমের মধু

খোলার চাল, মাটির ভিত আর মেটে দেওয়াল, তার মধ্যে ছোট একটা জানালা, আর তারই উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে নিকটের একটা নিমগাছের ছায়া। দেখামাত্র ভবনাথের মনের এতক্ষণের একটা স্বপ্নই যেন তেতো হয়ে গেল।

মানুষের কল্পনার প্রাসাদ অনেক সময় ধূলিসাৎ হয়ে যায় আর ভবনাথের কল্পনার প্রাসাদটা ধূলিসাৎ না হলেও একটা কুঁড়ে-ঘর হয়ে গেল। সত্যই, ভবনাথের কল্পনার মধ্যেই এতক্ষণ ধরে এই সকালবেলার আলো ঝকঝক করছিল, প্রায় প্রাসাদের মতই বড়সড় চেহারার একটা বাড়ি। কিন্তু নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা ঐ ক্ষুদ্র আর দরিদ্র চেহারার মেটেময়লা বাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই যেন সে কল্পনার মাথায় বাড়ি পড়ল। ধুলোর মতোই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল ভবনাথের আশা-ভরসা।

এই কি শশী এভিনিউ-এর একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি ? কিন্তু আর প্রশ্ন করার ও সন্দেহ করারও কোন অর্থ হয় না। জানালাটার নিচে মেটে দেয়ালের গায়ে কয়লার আঁচড়ে একেবারে স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে, একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি।

পথের উপরেই কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ, আর ভাবতে থাকে, ফিরে যাওয়াই ভাল। এ হেন হাভাতে ঘরের কবাটের কড়া নেড়ে কোন লাভ নেই।

শুধু একটা হয়রানিই লাভ হলো, আর পকেটের মধ্যে শেষ সম্বল এক টাকা সাত আনা থেকে দশটা আনা একেবারে বাজে খরচে ব্যর্থ হয়ে গেল। বাড়িটা খুঁজে বেব কবতে অনেক সময় লেগেছে, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হযেছে, আব ট্রাম-বাস ও রিক্সার ভাড়া যোগাতে গিয়ে খরচ হয়ে গিয়েছে পুরো দশটা আনা।

এখন মনে হয়, ঠিকই বলেছিল কালীশ। কালীঘাটের চাযেব দোকানেব কালীশ।—এ কেসটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না ভব, রিস্ক নিযে লাভ নেই।

ভবনাথেরই রিস্কি-জীবনের এক অন্তবঙ্গ সুহৃদ কালীঘাটের চাযের দোকানের বয কালীশ কোন উৎসাহ দেযনি, কিন্তু তবু যেন অদ্ভুত এক উৎসাহেব নেশায অস্থিব হয়ে ছুটে চলে এসেছে ভবনাথ, কালীঘাট থেকে এতদূরে বেহালার কাছে এই বিশ্রী এক জায়গায় কুশ্রী এক পথেব উপর। শশী এভিনিউ-এর যা কিছু চটক তা হলো শুধু ঐ নামটার মধ্যেই। এবড়োখেবড়ো একটা কাঁচা রাস্তা, এখানে গর্ত ওখানে কাদা, গরু-মহিষের খাটাল দু'পাশে, আর মাঝে মাঝে দু'একটা নারকেল আর তাল, আর ধুলোয় বিবর্ণদেহ বাঁশঝাড়। এই হলো শশী এভিনিউ।

আজই ভোরে কালীঘাটের চায়ের দোকানে বসে খবরেব কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটা বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে ভবনাথের চোখে হঠাৎ দপ্ কবে জ্বলে উঠেছিল একটা কল্পনা। চটপট খবরের কাগজের সেই বিজ্ঞাপন থেকে ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে নিয়েছিল ভবনাথ। সেই কাগজটা চার ভাঁজ হয়ে ভবনাথেব হাতের মুঠোর মধ্যে রযেছে।

একটা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন। আজ তিন মাস হলো নিরুদ্দিষ্ট হযেছেন শ্রীযুক্ত সুশোভন রায়, বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, গায়ের রঙ বেশ ফরসা, মাথার চুল সাদা, বাম কানেব কাছে একটি আঁচিল, গরদের ধুতি-চাদর পরা অভ্যাস। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দেন, তবে সেই উপকাবের জন্য তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে ছায়া বায়, একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি, শশী এভিনিউ, বেহালা।

বলেছিল কালীশ, এই কেসটার মধ্যে এত মাথা ঘামাবার কি দেখলি ভব ? দশটা টাকাও পুরস্কার ঘোষণা করলে না হয় দেখা যেত যে ভাঁড়ারে কিছু আছে। রিস্কি নিস না ভব। না রে না, এ একেবারে ফাঁকা ভদ্দোরতা।

ভবনাথ বলে—উঁহু, বেশ কিছু আছে, আর দিতেও পাবে বেশ কিছু, তাই পুরস্কার-টুরস্কারের কথা চেপে গিয়েছে।

খবরের কাগজের দিকে আর একবার তাকায ভবনাথ। বিজ্ঞাপনের লেখাগুলি পড়তে থাকে। শশী এভিনিউ, সুশোভন রায, গাযের ফবসা রঙ, গরদের ধুতি-চাদর, ছাযা রায—প্রত্যেকটি কথাব মধ্যে যে বড়লোক-বড়লোক একটা অবস্থা জ্বলজ্বল্ করছে।

জ্বলজ্বল্ করে ভবনাথের কল্পনা।---আমি তোকেই চ্যালেঞ্জ কবছি কালীশ, মোটা মতন আদায় করে ট্যাক ভারি করে যদি ফিরে আসি, তবে তুই কি ফাইন দিবি বল ?

কালীশ বলে—কিছু না। তুমি বাবা বরং আগের কেসটার আমার পাওনা শেয়ার শোধ করে দিও।

ভবনাথ—কোন্ কেস ?

কালীশ—সেই চার থান সিল্ক।

ভবনাথ—সেগুলি তো আমি হাতড়েছিলুম।

কালীশ—আরে হ্যাঁ, তোর বাহাদুরি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি যে খদ্দের যোগাড় করে দিলুম তার জন্যে লাভের অন্তত চার আনা শেয়ারও কি আমাকে দিবি না?

হেসে ফেলে ভবনাথ—সবই ফুরিয়ে দিয়েছি মাইরি। কিন্তু আজ দেব তোকে, নিশ্চয় দেব। আর শোন, এখন চটপট ডবল ডিম ভেজে দে দেখি, খেয়ে-দেয়ে একটু তাজা হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু ঐ সেই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশেব সি, নিমেব ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিদ্রূপ। ডবল ডিমে ভাজা সেই আশা ও উৎসাহ এতক্ষণ ধবে ঘুবতে ঘুরতে আর শশী এভিনিউ-এর নোংরা চেহারা দেখতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। তার উপব ঐ বাড়ি, খোলার চাল আর মেটে দেওয়াল। এত চেষ্টার পর, শশী এভিনিউ নামে এই অপদার্থ একটা কাঁচা রাস্তার পাশে এই বস্তির মধ্যে বাড়িটার কাছে এসেও যেন ঠিকানা হারিয়ে গেল, পথভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ।

তার পরেই ছটফট করে চোখ দুটো। কি যেন চিন্তা করে ভবনাথ। দেখাই যাক না, শুধু কুঁড়ে ঘর দেখেই হতাশ হয়ে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদিও কুঁড়ে ঘব, কিন্তু ঘবের লোকগুলির নামগুলি ভদ্দোর। হয়তো সত্যিই ভদ্দোরলোক। আর ভদ্দরলোক যদি গরীব হয় তবে তো ভালই হয়। ভীতু ভীতু, সহজেই বিশ্বাস করে, একটুতেই কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে, ধার করেও পুজোর খরচ যোগাড় করে, ভাত খেতে না পেলেও পান খায়, দুয়াব থেকে ভিখাবী তাড়াতে পারে না, গরীব ভদ্দোরলোকগুলি সংসারের কেমন যেন অদ্ভুত জীব।

আর, ভবনাথই বা কি কম ভদ্দোর লোক। গায়ে সিল্কের কামিজ, হাতেব দুটি আঙ্গুলে আংটি, মাথার ঢেউ-খেলানো চুলগুলি একটু রুক্ষসূক্ষ, বছব পঁচিশ বযসের ভবনাথ দুপুরের কলকাতার পথে যখন ব্যস্তভাবে হেঁটে যেতে থাকে, তখন মনে হবে যেন কলেজেব ক্লাস কাট করে অত্যন্ত শিক্ষিত এক যুবক ম্যাটিনি শো-এর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে কোন সিনেমা হাউসেব দিকে চলেছে। ভবনাথের বাপ-মা ও ভাই-বোন এই বাংলাদেশের যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামটাও ভদ্রলোকের গ্রাম। সেই গ্রাম জানে, এক ভদ্রলোকের ছেলে ভবনাথ, সেই গ্রামেবই পাল বাবুদের দোকানে চুরি করে পালিয়ে গিয়েছে, ফেরার হয়ে গিয়েছে, ওয়ারেন্ট ঘুরছে তাকে সন্ধান করে। ভবনাথের এই ইতিহাস শুধু জানে তার অন্তবঙ্গ সুহৃদ কালীঘাটেব চায়ের দোকানের বয় কালীশ, আর সেই কালীশও যে আব এক গ্রামের আর এক ভদ্রলোকের ছেলে।

সুতরাং, এখনি গিয়ে যদি ঐ দীনহীন একশো ছত্রিশেব উনপঞ্চাশের সি-এর দরজা কাঁপিয়ে দিয়ে কড়া নাড়ে ভবনাথ, আর সেই শব্দে ঘরের ভিতর থেকে ছায়া, মাযা বা আর কেউ বেব হয়ে আসে, তবে ভবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে তারাও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না যে, ভবনাথ এখন আর সত্যি সত্যি ভদ্রলোক নয়। কেউ একবিন্দু সন্দেহও করতে পারবে না যে, ভবনাথ একটা ছদ্মবেশ, ভবনাথ একটা নিষ্ঠুর ভাঁওতা, ভবনাথ একটি অতিচতুর বাগ্‌জাল, সে এসেছে মানুষকে হঠাৎ মূর্খ করে দিয়ে আর কিছু হাতড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ার জন্য।

ভদ্রবেশী চোর তো অনেকেই আছে, কিন্তু ভবনাথ হুবহু সে-রকম নয়। ভবনাথের চুরিরও একটা ভদ্রবেশ থাকে, অতি পরিপাটি ভদ্রবেশ। পথচারীর পকেটে হাত দিয়ে আর ঘুমন্ত মানুষের ঘরে ঢুকে যারা রিস্কি নেয় আর রোজগার করে, তাদের সম্পর্কে ঘৃণাই আছে ভবনাথের মনে। ওসব নিতান্তই ছোটলোকের রীতি। সুহৃদ কালীশের কাছেই তার এই ঘৃণার কথা মাঝে মাঝে ঠোঁট বেঁকিয়ে ব্যক্ত করে ভবনাথ—তুই তো জানিস্ কালীশ, কিছু

লেখাপড়াও শিখেছি, কাজেই একটু বুদ্ধিসুদ্ধির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে আমি রিস্কি নিতে পারি না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত রিস্ক নেয় ভবনাথ। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।—এটা কি সুশোভনবাবুর বাড়ি? জোরে দরজার কড়া নেড়ে হাঁক দেয় ভবনাথ।

ঘরের ভিতর যেন কতগুলি পায়ের শব্দ দুর্‌দুর্‌ করে বেজে উঠেছে, শুনতে পায় ভবনাথ। হয় ভয় পেয়েছে, নয় আশার সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঘরের ভিতরের কতকগুলি মন। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভবনাথ।

কতকগুলি নয়, মাত্র দুটি। একশো ছত্রিশের ঊনপঞ্চাশের সি-এর নড়বড়ে কপাটের কাঠ কেঁপে উঠল। খুলে গেল কপাট। আর ভবনাথের মুখের দিকে আগ্রহে ও কৌতূহলে অস্থির দুই জোড়া চক্ষু তাকিয়ে রইল। এক প্রৌঢ়া ও এক তরুণী। বোধহয় মা ও মেয়ে, দেখে তাই তো মনে হয়।

ভবনাথ বলে—সুশোভনবাবু কি আপনাদের কেউ...

তরুণী বলে—হ্যাঁ, আমার বাবা হন তিনি।

ভবনাথ—সুশোভনবাবুর সন্ধান চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে ছায়া রায় নামে...।

তরুণী—আমিই ছায়া রায়, আর এই আমার মা।

ভবনাথ—বুঝলাম। এখন তাহলে সুশোভনবাবুকে আনবার ব্যবস্থা করুন।

অত্যন্ত ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন প্রৌঢ়া মহিলা।—বসো বাবা, বসো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমাব মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বেঁচে থাকো, বড় হও, সুখী হও বাবা।

ভবনাথ—মাপ করবেন, বসবার সময় নেই, আমাকে এখনি অফিস যেতে হবে। শুধু ঠিকানা জানিয়ে দিতে এসেছি, সেই ঠিকানায় আপনারা গিয়ে সুশোভনবাবুকে নিয়ে আসুন, কিংবা কোন লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।

ছায়া রায় ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে চলে যায় আর একটা বেতের মোড়া নিয়ে এসে দরজার কাছে রাখে। অনুরোধ করে ছায়া রায়—বসুন।

আপত্তি করে ভবনাথ—বসবার সময় নেই। ঠিকানাটা বলছি, লিখে নিন। কেয়ার অফ ডাক্তার তিনকড়ি মুখার্জি, বল্লবদাস কাটরা, এলাহাবাদ।

ঠিকানা শুনে শূন্য দৃষ্টি তুলে ভবনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—আমার কাকা তিনকড়ি মুখার্জি। এক পার্কের গাছের তলায় জ্বর গায়ে নিয়ে বসেছিলেন সুশোভনবাবু। আমার কাকা তাঁকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। এখন আপনাদের কর্তব্য।

কথা বলে না ছায়া রায় আর ছায়া রায়ের মা।

ভবনাথ বলে—হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলে ইন্টার ক্লাসের একটি টিকিট আর এলাহাবাদ থেকে হাওড়া পর্যত ইন্টার ক্লাসের দুটি টিকিটের দাম, তার ওপর পথের হাতখরচ বাবদ আর কিছু, এই নিয়ে বড়জোর টাকা সত্তর লাগবে, তার বেশি নয়। আজই কাউকে যদি পাঠিয়ে দেন তো ভাল হয়, কারণ সুশোভনবাবুর শরীরের অবস্থা ভাল নয়, তার ওপর মনের যা অবস্থা, কখন যে আবার কোথায় চলে যাবেন কোন ঠিক নেই।

কেঁদেই ফেললেন ছায়া রায়ের মা।

এইবার শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। তার মনের শেষ ভরসাও যেন কাঁদ-কাঁদ। এইবার ভেঙ্গে পড়তে চলেছে। টাকার কথা শুনেই কেঁদে ফেলেছে, এ যে একেবারে গতে ভদ্রলোকের বাড়ি। দেখতে পায় ভবনাথ, ছায়া রায়ের হাতে দু'গাছি প্ল্যাস্টিকের বালা

আর ছায়া রায়ের মায়ের হাতে দু'গাছি শাঁখা। এই মানুষগুলি জীবনে সত্তরটা টাকা দেখেছে কি না সন্দেহ।

ভবনাথ বলে—কান্নাকাটি করে আমাকে অপ্রস্তুত করবেন না।

কান্না থামায় ছায়া রায়ের মা। —তুমি বুঝতে পারছ না বাবা।

ভবনাথ—কি বুঝতে পারছি না ?

ছায়া রায়ের মা—সত্তর টাকা যোগাড় করা কি আমাদের মতো অবস্থাব মানুষেব পক্ষে ।

ভবনাথ—কি কাজ করতেন সুশোভনবাবু ?

—দোকানে খাতা লিখতেন।

—কত মাইন পেতেন ?

—দৈনিক দু'টাকা।

—তবে গরদের ধুতি চাদর পরার শখ কেন ?

—ওটা ওর ধর্মকর্মের শখ। সব সময়েই মনে মনে নাম জপ করেন। তাই সব সময়েই গরদ পরে থাকেন।

—ধর্মের বাতিক ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে গেলেন কেন ?

—এটাও তার এক বাতিক। যখন চাকবি থাকে না তখন ধর্মেব বাতিক বাড়ে, কিন্তু ঘবেই থাকেন। আর যখন আমাব ওপর বাগ কবেন, তখন একেবাবে ঘব ছেড়ে চলে যান।

—তাহলে এরকম ব্যাপাব আগেও অনেকবাব হয়েছে ?

—হ্যাঁ, কিন্তু চলে গেলেও দু-চাব দিনেব মধ্যেই ফিবে আসেন। কিন্তু এবাব তিন মাসেবও বেশি হয়ে গেল, তবু ফিরলেন না দেখে বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

বলতে বলতে আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন ছায়া রায়ের মা—কাগজে বিজ্ঞাপনেব জন্য আটটা টাকা যোগাড় করতে গিয়ে সামান্য কাঁসা-পেতল যা ছিল সবই বেচতে হয়েছে বাবা। এখন আরও সত্তর টাকা যোগাড় করতে হলে .

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে এইবার ছায়া রায়েব মা তাঁর মেয়েব মুখের দিকে তাকান।

ছায়া রায় বলে—দেখুন, সত্তরটা টাকা যোগাড় করার উপায় আছে, কিন্তু ।

দপ্‌ করে আবার আশার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে ভবনাথেব চক্ষে। —বলুন, কি অসুবিধে আছে ?

ছায়া রায়—কিন্তু মানুষ নেই।

ভবনাথ—তার মানে ?

ছায়া রায় বলে—এমন কেউ আপনজন নেই, যাকে আমাদের দুঃখেব কথা বললে দুঃখিত হবে, আর নিজের কাজ বন্ধ করে এলাহাবাদের মতো দূরের জায়গায় যাবে বাবাকে নিয়ে আসার জন্য।

চুপ করে ছায়া রায়। তারপর ভবনাথেবই মুখের দিকে আরও বেদনার্ত ভাবে তাকিয়ে ছায়া রায় বলে—তা ছাড়া, এমন বিশ্বাসী জনও কেউ নেই, যার হাতে বিশ্বাস করে সত্তরটা টাকা ছেড়ে দিতে পারি। বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য খবরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলেন যে চক্কোত্তি ঠাকুর, বাবারই বন্ধু, এত ভাল মানুষ চক্কোত্তি ঠাকুর, তিনিও ঐ সামান্য কাজের জন্য তাঁর খরচ বাবদ দু'টাকা নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও তিনি খুশি নন, আজ এসে আরও একটা টাকা চেয়ে গিয়েছেন।

হেসে ফেলে ভবনাথ—বেশ ভাল ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছেন দেখছি!

ছায়া রায় হাসে—কাজেই, এই উপকারটুকু করার ভার আপনাকেই নিতে হয়।

ভবনাথ—কি আশ্চর্য, আমাকেই এলাহাবাদে যেতে বলছেন সুশোভনবাবুকে আনবার জন্য ?

ছায়া রায়—হ্যাঁ।

ভবনাথ চোখ বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করে—অর্থাৎ আমিই আমার অফিস কামাই করে, সব কাজ ফেলে রেখে এখন এলাহাবাদ ছুটব ?

ছায়া রায়—অনেক উপকার আপনিই তো করলেন। আপনিই যখন বাবার খবর এনেছেন, তখন তাঁকে নিয়ে আসার ভার আপনিই নিযে শেষ উপকার করুন।

সফল হয়েছে কল্পনা, সার্থক হয়েছে রিস্কি-নেওয়া, দশ আনা খরচ আর সারা সকালের হয়রানি। বুকের উল্লাস কোনমতে চেপে চাপা চিৎকারের মতই স্বরে ভবনাথ বলে—দিন টাকা, তাহলে এখনি রওনা হয়ে যাই।

ছায়া রায় বলে—কিন্তু একটু দেরি হবে।

ভবনাথ—কতক্ষণ ?

ছায়া রায় বলে—বেশিক্ষণ নয়।

মাযের মুখের দিকে আবার যেন কি-রকম এক ভঙ্গিতে তাকায ছায়া রায। ছায়া রায়ের মা বলেন—একটু বসো, দুটো ভাত মুখে না দিয়ে যেও না বাবা।

এইবার সত্যই চিৎকার করে ওঠে ভবনাথ—না না, কখ্খনো না। আমার সময নষ্ট করবেন না।

ছায়া রায় হাসে—বেশি সময় নষ্ট হবে না। টাকা যোগাড় করে আনতে আমার যতক্ষণ সময় লাগবে, ততক্ষণে ডাল-ভাত রান্নাও হযে যাবে।

নিমগাছের ছায়া দোলে। আর ছায়া রায়েব হাতে প্লাসটিকের চুড়িতে যেন ছাযা রাযের মুখের হাসির ছায়া দোলে। বিশ্বাসে একেবারে মূর্খ হয়ে গিয়েছে আর গলে গিয়েছে কয়লার আঁচড়ে লেখা এই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি। মাত্র আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যস, তারপব . তারপর কালীঘাটেব চায়ের দোকানেব কালীশের শেযার চুকিযে দিয়ে, মুর্গির দো-পেঁয়াজী ভরপেট খেযে সিনেমাতে গিয়ে একটা বঙ্গিলা ছবি দেখে দূব ছাই, কি হবে সিনেমার ছবি দেখে। কালীশই তো কতবার বলেছে, তুই যে-রকম প্লে কবছিস ভব, সিনেমাব কোনো বেটা তারকারও সাধ্যি নেই যে ঠিক সে-রকমটি করতে পাবে।

ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছে ছায়া রায় আর ছায়া রাযের মা। বেতের মোড়ার উপর বসে নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর বিস্মিত হয় ভবনাথ। গাছ ভরে ফুল ফুটেছে। গাছের তলায় ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। তেতো করা বিস্বাদ যার পাতা আর ফল, সেই নিমগাছের সাদা সাদা ফুল। কিন্তু এ হেন তেতো ফুলের থোকার উপর মৌমাছির থোকা বসে রয়েছে। মাটির উপর গড়াচ্ছে যে ফুল, সেই ফুলের গায়ে গড়াচ্ছে মৌমাছি। তেতো নিমেরও মিষ্টি মধু হয় নাকি ? আর সেই মিষ্টি কি এতই বেশি মিষ্টি ?

হঠাৎ চমকে ওঠে ভবনাথ। একটা রঙিন শাড়ির আঁচল যেন হঠাৎ ভবনাথের গা ছুঁয়ে চলে গেল। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে, দরজা পার হয়ে আর ভবনাথেরই পাশ কাটিয়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে ছায়া রায়।

ভবনাথ—এ কি, কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

ছায়া রায় হাসে, কিন্তু তার প্লাসটিকের চুড়ির হাসির ছায়া দেখা যায় না। হাত দুটি যেন আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে।

ছায়া রায় বলে—আসছি এখনি।

চলে যাচ্ছিল ছায়া রায়। কিন্তু বিচলিতভাবে আর সন্দিগ্ধস্বরে প্রায় চিৎকারই করে ওঠে ভবনাথ—তাহলে আমিও চললাম।

থমকে দাঁড়ায় ছায়া রায়। অসহায়ের মতো তাকিয়ে আর আহতস্বরে বলে—বুঝতে পারছি, খুবই বিরক্ত হচ্ছেন আপনি। কিন্তু...।

ভবনাথ—কিন্তু আবার কি? আপনাদের কাণ্ডকারখানা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন!

ছায়া রায়—টাকার যোগাড় করতে।

ভবনাথ—কোথায়?

ছায়া রায়—স্যাক্‌রার দোকানে।

ভবনাথ—তার মানে, গয়না বেচতে?

ছায়া—হ্যাঁ।

ভবনাথ—দেখি, কি গয়না, কেমন গয়না?

আঁচলের আড়াল থেকে হাত বের করে ছাযা রায়। দেখা যায়, হাতের মুঠোয কাগজের ছোট একটা মোড়ক।

ভবনাথ—কি আছে এর মধ্যে?

ছায়া—এক গাছি সোনার রুলি।

ভবনাথ—কার রুলি?

ছায়া—আমার।

ভবনাথ—আর এক গাছি কই?

ছায়া—নেই, অনেক দিন আগেই বেচে দিতে হয়েছে।

মাটির উপর ধুলোমাখা নিমফুল আঁকড়ে পড়ে রয়েছে মৌমাছি। আনমনার মতো দুই চক্ষুর দৃষ্টি উদাস করে ধুলোমাখা নিমফুলের দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ, যেন এই সংসারেরই বাইরের একটা অদ্ভুত বস্তুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তার এলোমেলো মন, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ বলে ফেলে ভবনাথ—থামুন, কোথাও যেতে হবে না আপনাকে।

ছায়া—কিন্তু···।

বস্তি থেকে অনেক দূরে, যেন শশী এভিনিউ-এর শেষ প্রান্তের দিকেই তাকিযে হতাশ, ক্লান্ত ও হাঁপ-ধরা ভাঙা-ভাঙা স্বরে ভবনাথ বলে—সত্তরটা টাকা খরচ কবার সামর্থ্য আমাব নেই, তা তো সত্যি নয়, এটা আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন ছায়া রায়। আমি নিজের টাকাতেই এলাহাবাদে যেতে পারি, আর আপনার বাবার ট্রেন ভাড়ার টাকা দিতেও পাবি। কথা হলো, সেটা করা উচিত নয়, আর আপনাদের সম্ভ্রমের পক্ষেও সেটা ভাল নয়, ভাল দেখায় না।

ছায়া—আপনি ঠিকই বলেছেন, ইয়ে...আপনার নাম তো জানি না।

লজ্জিত ছায়া রায়ের মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ভবনাথ বলে—ভবনাথ মুখার্জি।

পর মুহূর্তেই অন্যমনস্কের মতো আবার অন্যদিকে তাকিয়ে ভবনাথ বিড়বিড় করে বলে—কি আশ্চর্য, নাম পর্যন্ত জানেন না, কিন্তু খুব তো বিশ্বাস করেন!

কিছুক্ষণ যেন স্তব্ধ হয়েই থাকে নিমগাছের ছায়া। প্রশ্ন নেই, উত্তরও নেই। বেতের মোড়া ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভবনাথ।

বিচলিতভাবে প্রশ্ন করে ছায়া রায়—তাহলে কি করব বলুন?

ভবনাথ—আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমি এখন আমার টাকা খরচ করেই এলাহাবাদে যাই। ফিরিয়ে আনি সুশোভনবাবুকে, তারপর একদিন সুবিধে মতো শোধ করে দেবেন টাকাটা।

ছায়া রায়ের শুকনো চোখে এইবার যেন একটু বাষ্পের আভাস ফুটে ওঠে।—এতটা আশা কবি না, এতটা উপকার দাবি করা উচিত নয়, তাই হ্যাঁ বলতে পারছি না ভবনাথবাবু।

ছটফট করে ওঠে ভবনাথের নিঃশ্বাস, ছায়া দেখে ভয়-পাওয়া শিশুর মতোই ভবনাথের চোখের চাহনিতে আতঙ্ক কাঁপে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে ভবনাথ।—তবে আমি রওনা হলাম ছায়া রায়, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে পারব না।

ছায়া রায়—মা যে আপনার জন্য রান্না শুরু করে দিয়েছেন, না খেয়ে যাবেন না।

ভবনাথ—না, তা হয় না। অসম্ভব।

নীরবে, শুধু একটু বিস্মিত হয়েই তাকিয়ে থাকে ছায়া রায়। মনে হয়, যেন জাত যাওয়ার ভয়ে অচেনা লোকের বাড়িতে খাওয়ার নাম শুনেই পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ভবনাথবাবু, এলাহাবাদের ডাক্তার তিনকড়ি মুখার্জির ভাইপো, যার হাতের দুই আঙুলে দুটি সোনার আংটি।

ছায়া রায় বলে—আমরাও ব্রাহ্মণ।

কিন্তু যেন প্রলাপ বলতে বলতেই এগিয়ে চললো ভবনাথ—বেশ তো...শুনে সুখী হলাম...ব্রাহ্মণ তো কতই আছে পৃথিবীতে...।

ছায়া রায় ডাকে—ভবনাথবাবু!

ভবনাথ মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়—তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে দিও ছায়া রায়, আমি বিদায় নিলাম।

আবার ডাকে ছায়া রায়—ভবনাথবাবু, কবে আন্দাজ ফিরছেন বলে যান।

থমকে দাঁড়ায় ভবনাথ। কি ভয়ানক মূর্খ এই একশো ছত্রিশের উনপঞ্চাশের সি! কিন্তু বেশি মূর্খ বলেই বোধহয় মমতা জাগে কঠোর তস্করতায় কঠিন ভবনাথের শুকনো হৃৎপিণ্ডের এক কোণে।

ফিরে আসেন ভবনাথ, আবার সেই নিমের ছায়ার নিচে শান্ত হয়ে দাঁড়ায়। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ভবনাথ—আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছি, আর তোমরাও ভুল করেছ ছায়া রায়।

বলতে বলতে আর একটা যন্ত্রণা চাপতে চাপতে কি-রকম যেন হয়ে যায় ভবনাথের মুখের চেহারা।

ছায়া রায়—কিসের ভুল?

ভবনাথ—এলাহাবাদে যে সুশোভনবাবুকে দেখে এলাম, তিনি সত্যই এ বাড়ির সুশোভনবাবু কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

ছায়া রায়—বাঁ কানের কাছে আঁচিল নেই?

ভবনাথ—না।

ছায়া রায়—সব সময় নাম জপ করেন না?

ভবনাথ—তা তো মনে হয় না।

ছায়া—খুব ফরসা আর লম্বা চেহারার মানুষ?

ভবনাথ—না, মোটেই ফরসা নন আর লম্বাও নন।

ঝর্ ঝর্ করে ছায়া রায়ের দু'চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে।—তবে আপনি মিছিমিছি কেন লেন?

ভবনাথ—হ্যাঁ, ভুল হয়ে গিয়েছে, এতটা ভেবে দেখিনি।

চুপ করে থাকে ছায়া রায়।

ভবনাথ বলে—এখন তবে তুমিই বলো ছায়া রায়, আমি কি করতে পারি!

ছায়া—আমার বাবাকে খুঁজে বের করুন।

ভবনাথ—কোথায় যেতে পারেন, কোথায় থাকার সম্ভাবনা, এ রকম কিছু একটু না জানা থাকলে কেমন করে কোথায় খুঁজব?

ছায়া রায়—বাবা গঙ্গায় স্নান করতে ভালোবাসেন, কালীঘাটের মন্দিরে আরতি দেখতে ভালোবাসেন।

ভবনাথ—গঙ্গার ঘাটে আর কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে তোমরাই খোঁজ কর না কেন?

ছায়া রায়—করেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি। আর রোজই তো যাওয়া যায় না, সাধ্যিও নেই। তাছাড়া, এসব খোঁজাখুঁজি আর নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ির কাজ কি মেয়েদের পক্ষে সম্ভব?

ভবনাথ—চেষ্টা করব আমি?

ছায়া রায়—করুন।

ভবনাথ—বেশ, এবার চলি ছায়া রায়।

ছায়া রায়—আসুন।

খুবই শান্ত স্বরে, একটুও বিস্মিত ও দুঃখিত না হয়ে ভবনাথকে বিদায় বাণী শুনিয়ে দিচ্ছে একশো উনপঞ্চাশের সি। একেবারে ধীর স্থির আর শান্ত হয়ে রয়েছে ছায়া রায়ের ছায়া। কোন উৎসাহ আর বাজে না ছায়া রায়ের কণ্ঠস্বরে, কোন আশা আর চমকে ওঠে না ছায়া রায়ের চোখে।

চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় ভবনাথ। কিন্তু ভবনাথের বুকের ভিতরেই কাঁটার আঘাতের মতো তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা লাগে যেন। একেবারে ব্যর্থ হয়ে আর হেরে গিয়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে ভবনাথকে। কিন্তু একেবারে কিছুই না নিয়ে গিয়ে এত ভয়ানক শূন্য হয়ে চলে যেতে চায় না মন। দাগী জীবনে না হয় আর একটা মিথ্যার দাগ পড়ুক, ঐ মাটির দেওয়ালে আঁকা কয়লার আঁচড়ের মতো একটা দাগ।

ছায়া রায়ের চোখ জলে ধোওয়া কাচের মতো চক্‌চক্ করে। আর ভবনাথ তাকিয়ে থাকে, আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকা মানুষের মতো অতিদূরের মোহে মুগ্ধ দুটি চক্ষু তুলে, ছায়া রায়ের মুখের দিকে। হঠাৎ প্রশ্ন করে ভবনাথ—তোমার বাবাকে যদি খুঁজে নিয়ে আসতে পারি ছায়া রায়?

ছায়া রায়—আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ভবনাথ—তার মানে?

উত্তর দেয় না ছায়া রায়। ভবনাথ যেন তার এই অন্ধকারে ঢাকা রিস্কি জীবনেরই পাথরে চাপা পড়া এক দুর্লভ লোভের ব্যাকুলতা সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—বলো ছায়া রায়!

ছায়া রায়—আপনি যা মনে করেন তাই।

ভবনাথ—ঠিক তো?

ছায়া—হ্যাঁ।

ভবনাথ—কোন আপত্তি নেই তোমার মনে?

ছায়া—একটুও না।

ভবনাথ—তোমার মা যদি আপত্তি করেন?

ছায়া—কেন আপত্তি করবেন মা ? আপনিও তো ব্রাহ্মণ।

আর কোন প্রশ্ন নেই। যেন ছায়া রায়ের এই শেষ কথার মধুরতা মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতরে লুকিয়ে ফেলেছে ভবনাথ, পাকা চোর যেমন সোনার হার গিলে ফেলে।

আর মুখ ফিরিয়ে একবার তাকায়ও না ভবনাথ। হনহন করে যেন এই পৃথিবীর কোন কাঁটার ঝোপে লুকিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্তভাবে চলে যায় ভবনাথ।

কালীঘাটের মন্দিরে আরতি যখন শেষ হলো, আর মন্দিরের বড় দরজা দিয়ে শেষ দর্শকও যখন বের হয়ে গেল, তখন আর একবার চমকে উঠলো ভবনাথ। ছায়া রায়ের নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে সত্যিই যে খুঁজতে এসেছে ভবনাথ। কি আশ্চর্য, এ আবার কোন্ মূর্খতার খেলা অকারণে একটা ছায়ার অনুরোধের জন্য এত সময় নষ্ট করা ? শুনলে কালীশ যে হো হো করে হেসে উঠবে।

কিন্তু কালীশ নিশ্চয়ই জানে না যে, নিমেরও মধু হয়, নিমের বিষতেতো বুকের ভেতরেও...যাক্ গে। এসব কথা কালীশকে বলে কোন লাভ হবে না, বেশা বিশ্বাসই করবে না।

কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে ভবনাথের। গিলে-ফেলা সোনার-হারের মতো একটা আশা যেন থেকে থেকে কচ্‌কচ্ করে কষ্ট দিচ্ছে গলার ভিতরটাকে। মনে হয়, এইভাবেই রোজ সন্ধ্যায় যদি এখানে আসা যায়, তবে নিশ্চয়ই একদিন আরতি আলোকে হঠাৎ দেখে ফেলবে ভবনাথ, ছায়া রায়ের বাবা সুশোভনবাবু, গায়ে গরদের চাদর জড়ানো লম্বা ফরসা সুশোভনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

যাই হোক, আজ এখানে কোন কাজ নেই। আবার কাল সন্ধ্যা। এখন বরং কালীশের কাছে গিয়ে, আর এক কাপ গরম চা দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়াই ভাল। কালীশটাও নিশ্চয় এতক্ষণে নানা দুশ্চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। চলতে থাকে ভবনাথ।

চায়ের দোকানে ভবনাথ ঢুকতেই কালীশ বলে—যাক, খুব বেঁচে গেলি ভব। আর একটু দেরী করলেই নির্ঘাৎ হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতিস।

ভবনাথ—ধরা পড়বো কেন রে বেটা !

চায়ের দোকানের টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে এসে কালীশ বলে—এই দেখ !

শূন্য দৃষ্টি তুলে খবরের কাগজেরই বুকের এক জায়গায় একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে ভবনাথ। ছায়া রায়ের আবেদন, সেই ছোট সন্ধান চাই, বিজ্ঞাপনটা ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করে কে যেন কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে।

ভবনাথ—এ কি ব্যাপার কালীশ !

কালীশ—হেডমাস্টার আশুবাবু ঐ বিজ্ঞাপন কেটে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁরই বাড়িতে আছে হারানো লোকটা। এতক্ষণে বোধহয় লোকটাকে একেবারে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েই ফেলেছেন।

চুপ করে বসে থাকে ভবনাথ।

কালীশ প্রশ্ন করে—চা খাবি ?

—না।

—কেমন দেখলি, বেশ বড় লোকের বাড়ি ?

—মোটেই না।

—কিছু হাতড়াতে পারলি ?

—কিচ্ছু না।
—তাহলে স্রেফ...।
—স্রেফ ঠকে এসেছি মাইরি।

সুনিকেতা

কলকাতার পল্লী। লেক দূরে নয়। কংক্রিটের 'নীলকমল'। বিবাট চাবতলা। কাঁচা দুধেব মতো রঙ। শেষ চৈত্রের সন্ধ্যা। গুলমোরের মাথায় দুরন্ত সোনা। ছোট ছোট ঝড় উড়ে যায়।

বেড়িয়ে ফেরে সেই মহিলা আর সেই ভদ্রলোক। মহিলার বয়স পঁচিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের বয়স কোনমতেই পঁয়ত্রিশের বেশি হতে পারে না। মহিলা দেখতে সুন্দর। কিন্তু ভদ্রলোক মহিলার তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। আজ প্রায় এক বছর ধরে প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক এই ভঙ্গিতেই দুজনে নিবিড়ভাবে দুজনের হাতে হাত বাড়িয়ে আর ধীরে ধীরে হেঁটে নীলকমলের ফটকের সামনে এসে থেমেছে।

ফটকের কাছে এত কড়া একটা আলো জ্বলে, কিন্তু সেই আলোকের অস্তিত্বই যেন ওরা স্বীকার করে না। মহিলার পিঠের উপর একটা হাত আদুরে ভঙ্গিতে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক চাপা গলায় কি যেন বলে। প্রত্যুত্তরে শুধু মৃদু একটি ভ্রূকুটি করে মহিলা। তারপরেই মহিলার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস ফিস স্বরে আরও কি-সব বলতে থাকে ভদ্রলোক। মনে হয়, ভদ্রলোকের দুই ঠোঁট যেন মহিলার কানের দুল ছুঁয়ে কথা বলছে।

ঝক্ করে হেসে ওঠে মহিলার চোখ। মাথা দিয়ে আস্তে একটা ধাক্কা দেয় ভদ্রলোকের কাঁধে। হো হো করে হেসে ওঠে ভদ্রলোক। মহিলা বেশ জোর গলা ছেড়েই বলে—হোপলেস! তার পরেই মুখের উপর রুমাল চেপে মহিলা তার নিজেরই মুখের হাসির উচ্ছ্বাসটাকে একটু লাজুক করে তোলে।

তারপরেই বাহুবদ্ধ দুটি পুলকিত মূর্তি তরতর করে নীলকমলের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে। এবং তারপরেই তিন তলার একটি ছোট ফ্ল্যাটের একটি ঘরে দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে। গোলাপী রঙের আলো।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাতের রেলিং-এর কাছে, এমন কি রাস্তার ওপারে দুটো বড় বড় দোতলা বাড়ির বারান্দায় সারি সারি সতর্ক ক্যামেরার মতো যে-সব জোড়া জোড়া চোখ এতক্ষণ ধরে ফটকের আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে লক্ষ করছিল, সে-সব চোখের কৌতূহলও এইবার উকিঝুঁকি দিয়ে আর গলা টান করে তিনতলার ফ্ল্যাটের গোলাপী রঙের আলোকে আলোকিত দৃশ্যটাকে দেখবার চেষ্টায় ছটফট করতে থাকে। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা যায় না, বোঝা যায় না, অনুমান করা যায় না। শুধু দপ্ করে আর একবার আলোর রঙ বদলায়। ফিকে বেগুনী রঙ।

কিছু বরং দেখা যায় আর বোঝা যায় রাস্তার এ ফুটপাথে না দাঁড়িয়ে ও ফুটপাথে দাঁড়ালে। দুটো গুলমোর মাথা উঁচু করে নীলকমলের তিনতলার ঐ রঙিন ঘরের জানালা দুটো প্রায় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের উপদ্রবে গুলমোরের মাথা এদিক ওদিক একটু কাত হলেই দেখা যায়, দেয়ালে দুটো রঙিন ফটো পাশাপাশি ঝুলছে, সাদা সরু ফ্রেমে বাঁধানো, বোধহয় হাতির দাঁতের ফ্রেম। মেহগনির একটা শীর্ণ ও ঋজু স্ট্যান্ডের উপর একটা কাশ্মীরী সুরাহি, পিতলের

উপর মীনার কাজ করা। তার মধ্যে রজনীগন্ধার লম্বা লম্বা ডাঁটা, ডাঁটার মাথায় ঘুমন্ত কুঁড়ি। কুঁড়িগুলি ফুটলেই ফটো দুদিকে ছুঁয়ে ফেলবে বোধহয়।

ঘরের মাঝখানে একটা খাট, খাটের উপর ঝকঝকে রঙিন সাটিনের ঢাকনা। তার উপর পৃথিবীর কোন মানুষ কোনদিন বসবে বলে বিশ্বাস হয় না, এমনই নিখুঁত যত্নে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে খাটের বিছানার কোমলতা। বড় মিররের বুকে আলো-ঝলসানো গুলমোরের সোনালী প্রতিচ্ছায়া কখনো কাঁপে কখনো দোলে। আরও আসবাব আছে এইটুকু ঘরের মধ্যেই। কিন্তু সবই যেন ছবির মতো আঁকা। নড়চড়-নেই, ওলটপালট নেই। প্রায় এক বছর ধরে ঠিক এইভাবেই সাজানো: কোন আগন্তুক এ ঘরের দরজার কড়া নাড়ে না, ঘবে প্রবেশও করে না। আজ পর্যন্ত তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে এ ঘরের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। মনে হয় ঐ দুজনেরই প্রাণের রঙে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এই ঘর, আর একটুও জায়গা নেই। তৃতীয় কোন প্রাণ প্রবেশ করলেই এই ঘরের সব রূপের ছন্দ এলোমেলো হয়ে যাবে।

যখন ঘরের পাখা খুব জোরে ঘোরে, তখন এ জানালার দিকে তাকালে দেখা যায়, রঙিন শাড়িব আঁচলেব একটুখানি অংশ ফুরফুর করে উড়ছে। আর ও জানালার দিকে তাকালে দেখা যায় সিল্কের কামিজের আধখানা আস্তিন এবং ঘড়ি বাঁধা একটা কব্জি। যেন এক অর্ধনারীশ্বরের মূর্তির ডান আর বাম দেহভাগের আভাস মাত্র দেখা যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, দুই জানালার মাঝখানে, ঐ দেয়ালটুকুর ওপাশে নিশ্চয়ই ভেলভেটে মোড়া ছোট একটা কৌচ আছে এবং সেই কৌচের উপর অতিঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে সেই ওরা দু'জন, যারা প্রতি সন্ধ্যায় একখণ্ড অতিনাটকীয় প্রগল্‌ভতার মতো বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফেরে এবং জড়াজড়ি আর ঢলাঢলি করতে করতে নীলকমলের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়।

প্রায় এক বছর হলো এই ফ্ল্যাটে রয়েছে ঐ মহিলা আর ঐ ভদ্রলোক, কিন্তু নীলকমলের কোন ফ্ল্যাটের কোন মানুষই ওদের পরিচয় জানে না। ভবনের দারোয়ান ছাড়া ওদের নামও বোধহয কেউ জানে না। এক বছর ধরে এই পাড়ার সবারই চোখে এত প্রত্যক্ষ হয়েও পাড়ার কাছে ওরা দুজনে আজ পর্যন্ত অপরিচিত রয়ে গিয়েছে। সত্যিই দুটি রঙিন ফটোই বাস করে তিনতলার এই ফ্ল্যাটের ঘরটিতে। এক বছরের মধ্যে এই ভবনের আর এই পাড়ার কোন মানুষের সঙ্গে ওরা দুজনের একজনও কখনও একবার ভুলেও আলাপ করেনি।

পাড়ার সকলেই অবশ্য এইটুকু জানে যে, মহিলা কোথাও চাকরি করেন। প্রতিদিন সকাল দশটার সামান্য কিছু আগেই একটা স্টেশন ওয়াগন এসে থামে নীলকমলের ফটকে। কোন বড় সদাগরী অফিসেরই গাড়ি বলে মনে হয়, কারণ ড্রাইভারের উর্দি বেশ জমকালো ধরনের। তিনবার হর্ন বাজাতেই মহিলা নেমে আসেন। গাড়ির ভিতর আরও কয়েকজন অফিসযাত্রিণী মহিলাকে সুসজ্জিত বেশে বসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এ মহিলা যেরকম জাঁকালো সাজে সেজে অফিসে যান, কোন রাজার বাড়ির বিয়ের উৎসবে যেতে হলেও সেরকম জাঁকালো সাজে সাজবার দরকার হয় না।

অফিসের গাড়ি আসামাত্র এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কৌতূহলী কতগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ দেখা যায় এবং গাড়ি স্টার্ট নেওয়া মাত্র চারদিকের বাতাসে ফিসফিস স্বরে একটা মন্তব্য ধ্বনিত হতে থাকে।—শাড়ির গাছ আছে বোধহয়।

মন্তব্যটা অহেতুক নয়। অনেকেই লক্ষ করেছে এবং আশ্চর্য হয়েছে আজ পর্যন্ত এ মহিলাকে এক শাড়ি পর পর দুদিন পরতে কখনো দেখা গেল না।

ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধেও একটা তথ্য এখন আর কারও অজানা নেই। ভদ্রলোক কিছুই করে না। সারা দুপুর ঘরেই থাকে।

তিনতলায় ফ্ল্যাটের ঐ একটি মাত্র ঘর। ভিতরের দিকে সরু এক ফালি বারান্দা। কিন্তু কি

তকতকে ঝকঝকে ও রঙিন একটি নীড় ! একেবারে নিখুঁত পারিপাট্য। ধোঁয়ার চিহ্ন এ ফ্ল্যাটে কখনো দেখা যায় না, কারণ রান্নাবান্নার কোন নোংরা ঝঞ্ঝাট এখানে নেই। দু'বেলাই হোটেল থেকে খাবার আসে। চাকর-বাকরও নেই। ভদ্রলোক সারা দুপুর ধরে ঘুমোবার পর, বিকেল হতে হতেই জেগে ওঠে এবং ঝাড়পোছ করে রঙিন নীড়ের নিখুঁত পারিপাট্য সজীব করে রাখে। মহিলা অফিস থেকে ফেরবার আগেই ভদ্রলোক একবার নীচে নেমে আসে। সিল্কের চীনা-কোট পায়জামা আর বাঘছালের চটি, এই সাজেই কত সুন্দর দেখায় ভদ্রলোককে। হেঁটে হেঁটে মাত্র রাস্তার ঐ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং ফিরে আসে রজনীগন্ধার একগুচ্ছ ডাঁটাসুদ্ধ কুঁড়ি নিয়ে। এ ছাড়া আর কোন কাজ করতে ভদ্রলোককে কেউ কখনো দেখেনি।

তারপর, মহিলা অফিস থেকে ফিরে আসার পর, বেড়াতে যাবার পর্ব। ভদ্রলোক শার্ট ট্রাউজার আর টাই পরে এবং মহিলা বিচিত্রা হয়ে ওঠে তার খোঁপার বৈচিত্র্যে। অফিস যাবার সময় যেমন শাড়িতে, বেড়াতে যাবার সময় তেমনি খোঁপাতে, দুটো দিন কখনো মহিলাকে একটি রকম হতে দেখা গেল না। কাল দেখা গিয়েছিল সরু স্প্রিং-এর মতো কি-একটা বস্তু দিয়ে খোঁপাটা জড়ানো। স্প্রিং-এর মুখগুলি হলো ফণাতোলা সাপের মুখ, শিউরে শিউরে দোলে। আজ দেখা গেল, মস্ত বড় একটা রুপোর প্রজাপতি খোঁপা কামড়ে পড়ে আছে। যেন পরাগ খুঁজছে প্রজাপতি, তারই আনন্দে পাখা দুটো কাঁপছে।

কে ওরা ? এই পাড়ার মধ্যে এটা একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রায় এক বছরের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। রহস্য, রহস্য হয়েই রয়েছে। মহিলার সিঁথিতে সিঁদুরের দাগও দেখা যায় না। এটাই বা কোন রহস্য ? এ কি শুধু একটা স্টাইল ?

কে জানে, প্রথম কে কথাটা বলেছিল, কিন্তু এখন এ পাড়ার সর্বত্রই কথাটা ভাল করেই রটে গিয়েছে যে, নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ ঘরে থাকে এক কিন্নর আর এক কিন্নরী।

দপ্ করে আর একবার আলোর রঙ বদলায়। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘর সবুজ হয়ে যায়। পাশের বাড়ির ছাদে রেলিং-এর কাছে অনেকগুলি ঘোমটা বেণী ও খোঁপা ব্যস্তভাবে আলোচনা করে—যারা স্বামী-স্ত্রী নয়, তাদেরই বলে কিন্নর আর কিন্নরী।

রাত আর একটু কালো হয়। আর একটু সাদা হয়ে ফোটে আকাশের তারা। একটা উতলা বাতাস। লেকের জলে আলো কাঁপে। গুলমোর চঞ্চল। তার চেয়ে আরও বেশি চঞ্চল আশেপাশের বাড়ির ছাদে নানা বয়সের চোখের তারা। তিনতলার ফ্ল্যাটের ঐ রঙিন ঘরের কৌচ থেকে উঠে ঝকমকে সাটিনে ঢাকা খাটের উপর এসে বসেছে সেই দুটি মূর্তি, যাদের নাম আজও কেউ জানে না।

নাম হলো, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়। আজ এক বছর হলো ওদের বিয়ে হয়েছে এবং বিয়ে হবার পর থেকেই নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই ঘরটিতেই রঙিন নীড় রচনা করে দু'জনে আছে। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছে কি না, এটুকু তাকিয়ে দেখবার গরজও যেন ওদের নেই। দু'জনের চোখ দু'জনের মুখ দেখে মুগ্ধ হবার জন্য সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার সময় কই, দরকারই বা কি ?

দুজনেরই জীবনে কল্পনা সত্য হয়েছে। যেন ধুলোবালির পৃথিবীতে দুটো অজাগতিকী কল্পনা তৃষ্ণার্ত চক্ষু নিয়ে মনের মতো সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সে-দুটি কল্পনার একদিন মুখোমুখি দেখা হলো। এবং কল্পনা সত্য হয়ে আর জীবন্ত হয়ে উঠতে আর বেশি সময় নিল না। তার প্রমাণ, তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙিন ঘরটি, বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের জীবনের নীড়।

স্বামী দেখতে সুন্দর হবে, এই ছিল বীথিকার মনের সবচেয়ে বড় দাবি। সেই যখন কলেজের পড়া শেষ হয়নি, তখন থেকেই। বিয়ের প্রস্তাব এসেছে অনেকবার, কিন্তু

প্রত্যেকবারই সে প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে, বীথিকা তার জীবনের একমাত্র স্বপ্নের মতো সেই একনিষ্ঠ দাবিকে একটুও ছোট করতে রাজি হয়নি। পাত্রের চেহারা ভাল নয়, ও চেহারা চলবে না, স্পষ্ট করে প্রতিবাদ জানিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি বীথিকা। তিন বছর আগে শেষবারের মতো একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন বড়দা ; এই চাকরিটা তখন সবেমাত্র শুরু করেছে বীথিকা। সেই প্রস্তাবও অনায়াসে একটি কঠিন ভ্রূভঙ্গির আঘাতে আর মুখ ঘুরিয়ে তুচ্ছ করেছিল বীথিকা। সেই শেষ, বড়দা আর কখনো বীথিকার বিয়ের কথা উচ্চারণও করেননি।

বড়বৌদি একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন—জয়ন্তের চেহারাও তোমার ভাল লাগছে না ? জয়ন্ত দেখতে খারাপ ? আশ্চর্যই করলে তুমি !

বীথিকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—ওরকম চেহারা হাটে-বাজারে অনেক দেখা যায়।

বড়বৌদি—শুধু চেহারাই কি সব ? গুণ-চরিত্র রোজগারও তো দেখতে হয়।

বীথিকা—ওসব কিচ্ছু দেখতে চাই না।

একথা শোনার পর বড়বৌদি বীথিকার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ করেই গিয়েছিলেন। কে জানে, এই মেয়ের চোখের মধ্যে কোন পিপসা লুকিয়ে রয়েছে ! পৃথিবীর হাটে-বাজারে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না এমনই এক দুর্লভ রূপের পুরুষকে জীবনের সঙ্গী করতে না পারলে এই মেয়ের ঐ দুই বাঁকা ভুরুর কঠিন ভঙ্গি কখনো শান্ত হবে না। কিন্তু এত বড় স্বপ্ন পুষে লাভ কি ? এমন রূপসী তুমি নও যে রূপেশ্বরেরা তোমার জন্য তপস্যায় বসে আছে। তোমার চেয়ে অনেক বেশি রূপসী পৃথিবীতে আছে, কলকাতার এই পাড়াতেই আছে, ঢের ঢের আছে।

বড়বৌদির নীরব অভিযোগটা যেন বড়বৌদির তাকাবার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারে বীথিকা এবং তার জীবনের সবচেয়ে বড় দাবির উপর পরের মনের এই উপদ্রবের একটা হেস্তনেস্ত করে দেয় সেই মুহূর্তেই। —আমার স্বামী হবার মতো মানুষ খুঁজে নেব আমি। পাই ভাল, না পাই তাও ভাল। তোমরা আর খোঁজাখুঁজি করো না।

পরিমল রায়ের কল্পনাও ঠিক এমনটিই চেয়েছিল।

শুধু বড়লোকের একমাত্র ছেলে বলতে যে গুণ বোঝায়, সেই গুণ তিন বছর আগে পরিমল রায়েরও ছিল। বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণের গৌরবও শেষ হয়েছে। হাই স্কুলের মাত্র কয়েকটা ক্লাশ পর্যন্ত বিদ্যাটা এগিয়েছিল পরিমলের, তারপরেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সব অনেক বছর আগের কথা। দু'বছর আগে পরিমল রায়ের বাপের-দেওয়া বাড়িটা যেদিন দেনার দায়ে নিলামে বিকিয়ে গেল, সেদিন পরিমলকে দেখতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল বন্ধুর দল। সেদিনও চাকরে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল পরিমলকে। কাজ করে হাত-পা'কে কষ্ট দিতে শেখেনি পরিমল। ও অভ্যাসটা পরিমলের বংশমর্যাদাতেই বাধে।

কিন্তু বন্ধুদের মেসে বন্ধুদেরই করুণার গলগ্রহ হয়ে একটি বছর পার করে দিতে পরিমল রায়ের বংশমর্যাদায় অবশ্য কিছুই বাধেনি।

বন্ধুরা অনুযোগ করত—এক বছর ধরে চেষ্টা করে একটা কাজ যোগার করতে পারলে না, এ কেমন কথা হে ?

পরিমল বলে—চেষ্টা করতেই জানি না ভাই। তা ছাড়া, যা তা একটা কাজ নিয়ে ফেললেই তো হয় না। প্রেস্টিজ বলেও তো একটা বস্তু আছে !

বন্ধুরা বিস্মিত হয়, সহ্যও করে এবং একদিন বিদ্রূপ করেই বলে, তুই কোনমতে একবার হলিউডে চলে যা।

—কি হবে গিয়ে ?

—লুফে নেবে তোকে, ঐ রকম একটা চেহারা হলিউডে দেখতে পেলে কি আর রক্ষে আছে ?

বন্ধুদের ঠাট্টা বুঝতে পারে পরিমল, কিন্তু এটাও বিশ্বাস করে যে, নেহাত মিথ্যা বলেনি বন্ধুরা। চেহারা আছে পরিমলের, এবং সে চেহারা তাকিয়ে দেখবার মতো। রূপই তো একটা গুণ, আর পরিমলের মুখের দিকে তাকালে মনে হবে শ্রেষ্ঠ গুণ ! পরিমলের রূপের খুঁত অনেক খুঁজে বের করতে হয়। বন্ধুরা জানে, এবং পরিমলও এখনো ভুলে যায়নি, পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা পরিমলকে অ্যাপোলো'দা বলে ডাকে। চাঁপার কলির মতো নয়, চাঁপার কলির চেয়েও সুন্দর-গড়ন আঙুল যদি দেখতে হয়, তবে দেখতে হবে পরিমলের আঙুলকে। আঙুলের রূপের গুণে আংটিটাও কত সুন্দর দেখায়। পরিমল জানে, সে কত সুন্দর। এবং আশ্চর্য হয়, তার চেহারার উপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা দেবাব মতো একটাও প্রাণ নেই এই পৃথিবীতে। এমন সম্পদ থাকতেও কি একটা কাজের চাকর হয়ে জীবন কাটাতে হবে ? এই শ্যামল, বিধুভূষণ আর দেবব্রতের মতো ?

পরিমল বলে—পাঁচ হাজার টাকা দাও, এখনি হলিউডে চলে যাচ্ছি।

বন্ধুরা বলে—হলিউড কি শুধু আমেরিকাতেই থাকে ? এই কলকাতার পথে পথেই আছে। দোহাই তোমার, তুমি মেসের এই ঘর ছেড়ে পথে একটু বের হও দেখি।

পরিমল—তাতে কি লাভ হবে ?

বন্ধুরা বলে—খুব হবে, একদিন না একদিন কোন হলিউডের চোখে পড়ে যাবে, এবং তারপরেই নির্ঘাৎ... ।

পরিমল—তোমাদের রসিকতা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বন্ধুরা তাদের রসিকতার রহস্য এইবার বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। —তাবপর আর কি ? হলিউডই খাওয়াবে পরাবে, রাজার চেয়ে বেশি মজার হালে থাকবে।

গম্ভীর হয় পরিমল। বন্ধুরা রসিকতার ছলে যেন তার মনের সবচেয়ে বড় দাবির স্বপ্নটাকেই চেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নোংরা করে দিচ্ছে। এ স্বপ্ন যে তার সত্তার মধ্যে মিশে রয়েছে। পৃথিবীর এক নারী পরিমলের এই রূপধন্য পৌরুষকে যেচে বরণ করে তাবই ঘরে নিয়ে যাবে। আর কোন ভাবনা থাকবে না পরিমলের জীবনে। সব ভার তার, সেই প্রেমিকা নারীর। কাজের চাকর হয়ে থাকার বদলে রূপের দেবতা হয়ে থাকা সে-জীবনের গর্ব ও গৌরব ও পৌরুষ তার কল্পনার বুকে কান রেখে অনুভব করতে পারে পরিমল। কিন্তু যাক, কল্পনার কথা বন্ধুদের রূঢ় ভাষায় আলোচনা থেকে দূরে রাখা আর গোপন রাখাই ভাল।

কিন্তু বন্ধুদের একটি অনুরোধ রক্ষা করেছিল পরিমল। মাঝে মাঝে মেসের ঘর থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়াত, তারপর যতটুকু হাঁটতে এবং যেখানে যেতে ভাল লাগত, তার বেশি ঘোরাফেরা না করে মেসে ফিরে আসত। এই ভাবেই একদিন এবং অকস্মাৎ চোখে দেখার ছোট একটা ঘটনা শুধু ঘটে গেল। বীথিকা আর পরিমলের সাক্ষাৎ। সে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, এবং তার পরের ক'দিনের ইতিহাস মাত্র ওরা দুজনেই জানে। তারপরেই বিয়ে, যথারীতি বৈবাহিক রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করে, সাক্ষী রেখে, আইন অনুসারে। এবং তারপরেই নীলকমলের তিনতলার ফ্লাটের এই রঙিন ঘর।

বীথিকা রায় আর পরিমল রায়। রূপের আর কামনার জীবনকে সুন্দর করে আর অনন্ত করে রাখার এক অপার্থিব শিল্প যেন ওরা জানে। ধুলো কাঁটা আর সমস্যায় ভরা এই পৃথিবীর কোন কুঞ্জে চিরবসন্ত জেগে থাকে কিনা কে জানে, কিন্তু বীথিকা রায় আর পরিমল রায়ের হাসিতে নিঃশ্বাসে ও দৃষ্টিতে চিরবসন্তের আমোদ এসে বাসা বেঁধেছে। ওরা দুজনেই সত্যিই

বিশ্বাস করে, ওদের জীবনের এই রঙ কখনো ফিকে হবে না, ফুরোবে না, ঝরে পড়বে না। দু'জনে প্রতিমুহূর্তে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুগ্ধ হয়ে এ-জীবনকে এক খণ্ড হলিউড করে রাখবে।

গুলমোর শান্ত। লেকের জলে তারার ছায়া। চারদিকের শব্দ প্রায় লুকিযে পড়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ যেন চমকে ওঠে, এবং পরমুহূর্তে মহিলার কাছ থেকে বেশ তফাতে সরে গিযে, মহিলার মুখের দিকে তাকিযে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হযে থাকে।

পাশেব বাড়ির ছাদে আর সামনের বাড়ির বারান্দার উপব সতর্ক চক্ষুর ক্যামেরাগুলি বিব্রত হয, বিস্মিত হয় এবং বিরক্ত হয়। এ আবার কোন দৃশ্য! আজ প্রায় এক বছরের মধ্যে কোন দিন কোন মুহূর্তও ঐ কিন্নর আর কিন্নরীকে তো এতটা তফাত হয়ে যেতে, আর ঐ ভঙ্গিতে স্তব্ধ হযে থাকতে কখনো দেখা যায়নি। নিতান্তই আকস্মিক, অভাবিত এবং বিসদৃশ। চোখের ক্যামেরাগুলি আশাভঙ্গের বেদনা নিয়েই ঘুমোতে চলে যায়।

বীথিকা বলে— ওরকম করে চমকে উঠলে কেন? ওভাবে বোবার মতো তাকিয়ে থেকেই বা কি লাভ হচ্ছে? ছিঃ।

পবিমল—-শুনতে ভাল লাগল না তোমার কথাগুলো।

বীথিকা—আমার কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল না? আশ্চর্য!

পরিমল—আজ ওসব কথা নাই বা আলোচনা করলে। কাল ব'লো। কারণ আমি এখনি কি বলব, ঠিক ভেবে পাচ্ছি না।

বীথিকা—তুমি ভাববে কেন? তোমাকে ভাবতে বলছেই বা কে? আমি শুধু জানতে চাইছি, এরকম কোন ডাক্তার তোমার জানা আছে কি না?

এক টান দিয়ে গলার রঙিন টাইটার গেরো ফস্ করে খুলে ফেলে পরিমল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে।

বীথিকা—উত্তর দিচ্ছ না যে?

পরিমল—জানা আছে, এন্টালির প্রকাশ ডাক্তার এসব করেন বলে শুনেছি।

বীথিকা—তাহলে প্রকাশ ডাক্তারকেই কাল ডেকে নিয়ে এসো।

পবিমল—তার জন্য এখনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠছ কেন? আর দু'একটা দিন ভাল করে ভেবে দেখ, তার পরেও যদি বোঝ যে.. ।

বীথিকা—ভেবে দেখবার আর কি আছে? যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভাল।

আর একবার চমকে ওঠে পরিমল। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিযে এবং মুখে হাসি টেনে নিয়ে বলে—গান গাইবার সময় তুমি হঠাৎ এ কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে? এখন ওসব কথা থাক। নাও, এসরাজটা নিয়ে বসো।

এসরাজটা তুলে নিয়ে এসে বীথিকার কোলের উপরেই তুলে দেয় পরিমল। অন্যমনস্কের মতো এক হাতে এসরাজটাকে ধরে কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে পাশে রেখে দেয় বীথিকা। অপ্রস্তুত হয়ে আর ভীতভাবেই তাকিয়ে থাকে পরিমল। বীথিকার মুখ-চোখ আর চিবুকের গড়নটাই যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়েছে। ঐ নিবিড় দুটি ভুরুর মধ্যে কেমন একটা কঠিনতা আগেও দেখেছে পরিমল, কিন্তু এখন দেখে মনে হয়, যেন ইস্পাতের দুটি ছোট ছোট বাঁকা ফলকের মতো কঠিন দুটি ভুরু। যেন জগৎ-ছাড়া এক সংকল্পের মেয়ে। আজ এক বছরের মধ্যে বীথিকাকে কোনদিন দেখে এরকম মনে হয়নি, দেখতে এরকমও লাগেনি।

পরিমল অনুনয়ের সুরে বলে—চুপ করে রইলে কেন বীথি ? কথা বলো। তুমি জান, তুমি গম্ভীর হলে আমার কত খারাপ লাগতে পারে।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে আমি ছয়-সাত মাসের ছুটি নিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চটাই আর একটা প্রমোশন নষ্ট করি ?

পরিমল—এ কি কখনো আমি চাইতে পারি ?

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, আমি এই বয়সেই শরীরের রক্ত খুইয়ে কতগুলো হাড আর কাঠ হয়ে যাই ?

পরিমল এগিয়ে এসে বীথিকার একটা হাত ধরে—বড় ভুল প্রশ্ন করছ বীথি। তোমার মুখ শুকনো হয়ে গেছে, এ দৃশ্য আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলেও বোধহয় সহ্য করতে পারব না।

বীথিকা—তুমি কি চাও যে, এরই মধ্যে আমাদের জীবনের সব ফুর্তি বন্ধ হয়ে যাক ?

পরিমল—কখনো বন্ধ হতে দেব না। তুমি অনর্থক একটা আতঙ্ক কল্পনা করছ বীথি।

বীথিকা—তোমাকে ভালবেসেছি, একমাত্র তোমাকে নিয়েই চিরকাল বেঁচে থাকবার জন্য।

পরিমল—তোমার ভালবাসার তুলনা হয় না বীথি। তুমি আমাকে এত আপন ও এত নিশ্চিন্ত করেছ বলেই তো আমি নিজেকে নিয়ে গর্ব করি। পৃথিবীতে ক'জনের এমন স্ত্রী আছে দেখাক তো কেউ ? তুমি তো আমার গর্ব।

বীথিকা—তুমিও তো আমার গর্ব। তবে আমার নিজস্ব গর্ব এই যে, তোমাকে সুখে রাখবার জন্য টাকা-পয়সার সব চিন্তা, সব ভার আর সব দায় আমি মেয়েমানুষ হয়েও সব সহ্য করছি, আর চালিয়েও যাচ্ছি।

পরিমলের উজ্জ্বল চক্ষু হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে, যেন হঠাৎ একটা ধোঁয়া এসে লেগেছে। কুণ্ঠিতভাবে বলে—সেকথা এত স্পষ্ট করে কেন আর বলছ ? বলতেই বা হবে কেন ? একশোবার স্বীকার করি, তোমার তুলনা নেই।

বীথিকা—যাক, কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। মোট কথা হলো, এমন সুখের জীবনে যেন কোন ঝঞ্ঝাট না আসে। শুধু তুমি আর আমি, এর মধ্যে কোন ঝঞ্ঝাট আমি আসতে দেব না।

পরিমল—ঝঞ্ঝাট কেন আসবে ! ঝঞ্ঝাটের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর্তনাদের মতোই শোনায় পরিমলের কণ্ঠস্বর। আবার উঠে গিয়ে একটু তফাতে বসে, তারপরেই পায়চারি করে, জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়, গুলমোরের মাথার দিকে নিষ্পলক চক্ষে তাকিয়ে থাকে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকায় পরিমল। খাবার সময় হয়েছে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে এক হাতে কপাল টিপে ধরে আর মিররের দিকে তাকায়। তারপরেই বীথিকার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—শুনছ ?

—কি ?

—তুমি খেয়ে নাও। আমার আজ আর কিছু খাওয়া উচিত হবে না। কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছি।

—কিসের অস্বস্তি ?

—মাথা ধরেছে, আর কেমন একটা বমি-বমি ভাব।

—তা হলে খেও না।

স্নানের ঘরে গিয়ে সাজ বদল করে আর ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আলমারিতে রাখা হোটেলের খাবার খেয়ে, আবার রঙিন ঘরের ভিতরে ঢুকল বীথিকা।

জানালার কাছে একটা মোড়ার উপর স্থির হয়ে বসেছিল পরিমল, যেন নিঃশব্দে গুলমোরের

কাছে একটু বাতাস প্রার্থনা করছে। কিন্তু গুলমোর বড় শান্ত।

দপ্ করে ঘরের আলোর রঙ বদলায়। সুইচ টিপেছে বীথিকা। ঘনঘোর মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোর মতো অন্ধকার-মাখানো একটা থমথমে কালো রঙের আলো।

একটা বালিশ জড়িয়ে খাটের উপর এলিয়ে পড়েই বীথিকা বলে—তাহলে কথা রইল, তুমি কালই একবার এন্টালির ডাক্তার প্রকাশের খোঁজ নেবে।

—না, পারব না।

অত্যন্ত গম্ভীর ও উত্তপ্ত এক কণ্ঠের গর্জন। প্রত্যুত্তর দেয় পরিমল।

উঠে বসে বীথিকা।—কি বললে? আবার এত জোর গলা করে বললে? লজ্জা করে না ওভাবে ধমক দিয়ে কথা বলতে? তোমার ঐ ধমকের দাম কত?

উত্তর দেয় না পরিমল। শোনা যায়, পাশের ফ্ল্যাটের দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিকটিক করে এই রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করছে।

বীথিকা বলে—তাহলে শুনে রাখ, আমিই প্রকাশ ডাক্তারের খোঁজ নেব।

কোন উত্তর দেয় না পরিমল। বীথিকাও আর কোন কথা বলে না। মোড়ার উপরেই চুপ করে বসে থাকে পরিমল, আর বীথিকা আবার বালিশ আঁকড়ে খাটের উপর পড়ে থাকে। বালিশটা অনেক রাতে ক্ষীণ কান্নার মতো শব্দ করে একবার। কিসের কান্না কে জানে।

সকাল বেলার খবরের কাগজ বলে, হলিউডে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের এই রঙিন ঘরের ইতিহাসেও কি এক বছর পরে আজ হঠাৎ মাঝরাত্রি হতে না হতেই আগুন লেগে গেল? থমথমে কালো আলো, যেন বহু যত্নে সাজানো একটা সেট অঙ্গারমাখা হয়ে পড়ে রইল সারা রাত। সকাল হবার পর সেই কালো আলো নিভল।

রোদের ঝাঁজ বড় বেশি। পথের ধুলোর ঘূর্ণি ওড়ে মাঝে মাঝে। গুচ্ছ ভাঙ্গা গুলমোর মাটিতে ঝরে পড়ে ঝুরঝুর করে। জানালা বন্ধ।

বীথিকা গিয়েছে অফিসে। পরিমল আছে ঘরে। ঘরের আবছায়ার মধ্যে বন্দী একটা ছায়া যেন ছটফট করে।

জীবনে এই প্রথম যেন নিজেকে দেখতে পেয়েছে পরিমল। এক নারীর প্রতিমুহূর্তের ইঙ্গিতের ক্রীতদাস, একটা চেহারা মাত্র সে, একটা ভাড়াখাটা পৌরুষ। রোজগেরে গৌরবে গরবিনী এক নারীর করুণার পোষ্য। এমন মানুষের ধমকের দাম কত? সত্যিই তো, কোন দাম নেই।

কিন্তু কি ভয়ানক বীথিকার কথাগুলি। একটা খুনের কথাও এরকম হেসে হেসে বলতে পারে মানুষ? জীবনের কল্পনাগুলি সত্যিই বোধহয় কতগুলি ফুলের স্তবক, কখনো কখনো সন্দেহই হয় না যে, ফুলের আড়ালে একটা সাপও লুকিয়ে থাকতে পারে। পরিমলের ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডে যেন হঠাৎ একটা সাপের ছোবল পড়েছে। এটাও এর আগে বুঝতে পারেনি পরিমল, তার এই চেহারার ভিতরে একটা হৃৎপিণ্ড আছে, আর সে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে আবার একটা গর্ব ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ যেন একটা বিষের কামড় খেয়ে জ্বলে উঠেছে এই গর্ব। পরিমল সহ্য করতে পারছে না বীথিকার কথাগুলি।

গুণবতী ও শিক্ষিতা এক নারীর কাছে সে একটা সুন্দর ফটো মাত্র, স্বামী নয়। ফটোর ধমক গ্রাহ্য করবে কেন মানুষ? যে ফটো মানুষের স্বামী হতে পারে না, সে ফটো মানুষের বাপ হবে কেমন করে?

মাথার উপরে জোরে পাখা ঘোরে, কিন্তু কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে পরিমলের। আবর্জনা, বীথিকার কাছে সেই আগন্তুক প্রাণটা শুধু একটা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়।

পরিমল নামে মাত্র একটা চেহারার মানুষকে স্বীকার করে বীথিকা, তার মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে না। নইলে, যে-মানুষের দুই বাহুর বন্ধনে আত্মহারা হয়ে যাবার জন্য বীথিকার চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে জ্বলজ্বল করে, সেই মানুষের সৃষ্টির আত্মাটা বীথিকার কাছে একটা আবর্জনা হয়ে যায় কি করে ? কি ভয়ানক ঘৃণায় শিউরে উঠেছে বীথিকা ! পরিমল যেন তার দেহের শোণিত দূষিত করে দিয়েছে।

চোখ-মুখ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, হাত-পা আলগা আলগা, পরিত্যক্ত মন্দিরের এক জীর্ণ পাথুরে মূর্তির মতো চেয়ারের উপর সুস্থির হয়ে বসে থাকে পরিমল। নিদারুণ এক অপমানের বাজ পড়ে তার জীবনের বহুদিনের লালিত সেই রূপের গর্বটা এতদিনে যেন চূর্ণ হয়েছে।

সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ে। ছাই উড়ে পরে রঙিন ঘরের মেঝেতে, আসবাবের গায়ে। রজনীগন্ধার বাসিডাঁটার মাথায় ফোটা কুঁড়ি নেতিয়ে পড়ে।

কিন্তু এ ঘরে আর একটা রাত্রিও থাকতে যে ভয় করে। আবার তো সেই একই অভিনয়ের পালা। সেই দুটি বিহ্বল নারীচক্ষুর দৃষ্টির ইঙ্গিতকে আর মত্ত দুটি ওষ্ঠের সঙ্কেতকে প্রতি মুহূর্তে সেবা করা। ভাবতে গিয়ে নিজের এই শরীরটার উপরেই ঘৃণা বোধ করে পরিমল। কিন্তু বীথি কি এই এক বছরের অভিনয়ের নিয়ম থেকে দূরে সরে থাকবার সুযোগ দেবে পরিমলকে ? সেই পাউডার-ছিটানো একটা গলা আর স্নো-মাখানো একটা চিবুক পরিমলের মুখের উপর লুটিয়ে পড়ার জন্য কাছে এগিয়ে আসছে, কল্পনা করতে আজ শিউরে ওঠে পরিমলের অভিশপ্ত মন। দুঃসহ, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিতে পারবে কি পরিমল ? আর সরিয়ে নিলে বীথিই বা কি সেই অপমান সহ্য করবে ?

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা চোখ-মুখ আর আলগা আলগা হাত-পাগুলি যেন হঠাৎ জোড়া লেগে শক্ত হয়ে ওঠে। এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পরিমল। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে হবে কি ? কি দরকার ? একটা ছায়া চলে যাবার সময় তো কথা বলে না, চিঠিও লিখে রেখে যায় না। এখনি এভাবেই এই রঙিন ঘরের কাছে কোন কথার কৈফিয়তও না রেখে, শুধু দারোয়ানের কাছে চাবি রেখে দিয়ে সরে যাওয়াই ভাল।

দরজা খুলে বের হয় পরিমল, দরজার বাইরের কড়ায় তালা লাগিয়ে চাবিটি হাতে নিয়ে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি নেমেও আসে পরিমল। কিন্তু কি অদ্ভুত দুর্বলতা ! বুঝতে পারে, পা দুটো কি রকম ভারি হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোও ভেজা-ভেজা লাগে। কিসের যেন একটা ইচ্ছা, যেন ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকেই একটা অন্ধ মমতার অনুরোধ তার হাত দুটো ধরে ঘরের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। চলে গেলে আর কি হলো ? অন্ধকারে ঢাকা একটা অঙ্কুর, সূর্যের আলো দেখবার আশায় যার প্রাণ তৈরি হয়ে উঠেছে, তাকে বাঁচাবে কে ? এভাবে রাগ করে চলে গেলে সেই শিশু প্রাণটাও যে আবর্জনা হয়ে যাবে।

আবার তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেই পরিমল অসহায়ের মতো ছটফট করতে থাকে। কিন্তু থেকেই বা কি হবে। উপায় কি ? এন্টালির প্রকাশ ডাক্তারকে ঐ সিঁড়ির উপর থেকেই গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবার শক্তি কই তার ? সারাজীবন চাকরে তেল মাখিয়ে আর স্নান করিয়ে এই শরীরটাতে যে পক্ষাঘাত ধরিয়ে দিয়েছে ! আজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে পরিমল, এই দু'হাতে দু'মুঠো সোনার মোহর নিয়ে বীথির সামনে দাঁড়ালে, বীথির মতো মেয়েমানুষ তার ধমকের দাম বুঝত নিশ্চয়। শুধু ধমকের দাম কেন ? বীথি তার নিজের দেহের ভিতরে ঘুমন্ত সেই অঙ্কুরের দামটাও বুঝত। ধমক দেবারই দরকার হতো না।

কাজ ? কাজ কাকে বলে তাই জানে না পরিমল। চেষ্টা কাকে বলে তাও জানে না। কাজ দেবেই বা কে ? কাজ করার যোগ্যতাই বা কোথায় ?

উপায় ? চিন্তা করতে করতে পরিমলের চেহারাটা কি রকমের যেন হয়ে যায়। যেন একটা

চোরের ছায়া, ধূর্ত অথচ অত্যন্ত কর্মঠ ও কঠোর। অকর্মণ্য হাত দুটোর পেশীগুলি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন একটা সিঁদকাটা পরিকল্পনার দিকে পরিমলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে তাকিয়ে আছে। একটা অকাজের পরিকল্পনা। বুদ্ধি নয়, ছোট একটা দুর্বুদ্ধি। সামান্য একটু অকাজের কৌশলে যদি মস্ত একটা সুকাজ হয়ে যায়, হোক না। বীথিকা বাঁচবে, বীথিকার ছেলে বাঁচবে, কাঁচা খুনের রঙ লাগবে না এই রঙিন ঘরে।

কিন্তু তারপর? তার পরের কথা আর চিন্তা করতে পারে না পরিমল। বুকের পাঁজরগুলি হঠাৎ একবার দুর দুর করে কেঁপে ওঠে। আর বেশি দেরি করলে এন্টালির প্রকাশ ডাক্তারের পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে উপরে উঠে আসবে।

শুধু গেঞ্জি ও পায়জামা, একটা জামাও গায়ে দিতে ভুলে গেল পরিমল। আলনা থেকে একটা আদ্দির চাদর কাঁধে ফেলে, যেন একটা জ্বর-বিকারের জ্বালায় ঘর থেকে বের হয়ে, দরজার তালা বন্ধ করে, চৈতী দুপুরের তপ্ত পথের ধুলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালো পরিমল।

এ ফ্ল্যাটে আর ও ফ্ল্যাটের জানালায় কতকগুলি বিস্মিত চক্ষু উঁকিঝুঁকি দেয়। তিনতলার ফ্ল্যাটের কিন্নরকে এমন অসময়ে পথে বের হতে এই প্রথম দেখা গেল। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। আরও দুর্বোধ্য বিস্ময় হলো ঐ সাজ। গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে, অদ্ভুত চেহারা করে, যেন একটা ছেলেধরার মতো চোখ করে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে লোকটা কোথায় চলে গেল।

লেকের দিকে কোকিল ডাকে, চাঁদ ওঠে আকাশের পুবে, ডায়মন্ডহারবারের ট্রেন সিটি বাজিয়ে দূরে চলে যায়। বেড়িয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়।

আজ রবিবার। এবং রবিবার ছাড়া আর কোনদিন দুজনের একসঙ্গে বেড়াবার উপায় নেই। কারণ রঙিন ঘরের জীবনটা ছন্দ বদল করেছে।

একটা কাজ পেয়েছে পরিমল। বিখ্যাত এক ইংরাজ কোম্পানির নতুন কারখানা হয়েছে বজবজের কাছে। এই কারখানার ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে পরিমল। পরিমলেরই ছেলেবেলার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং কাজটা পেতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি পরিমলের। বন্ধুর সুপারিশে খুব সহজেই কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মাইনে হলো ছ'শো দশ টাকা। বছর খানেক পরে কোম্পানিরই খরচে মাস দুয়েকের জন্য বিলেতে গিয়ে একটা ট্রেনিং নিয়ে ফিরতে হবে, তারপর মাইনে হবে আটশো পঁচিশ।

বীথিকা অফিস যায় সকাল দশটায়, পরিমল বের হয় সকাল এগারটায়। ফিরে আসতে বেশ রাত হয় পরিমলের। কাছাকাছি তো নয় বজবজ, ট্রেনে যেতে হয়, ট্রেনে ফিরতে হয়। সন্ধ্যাবেলাগুলি তাই নিতান্ত উৎসবশূন্য, একেবারেই শূন্য মনে হয় বীথির, একমাত্র রবিবারের সন্ধ্যা ছাড়া।

পরিমলের সার্ভিসের মাত্র দশটি দিন পার হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র দুটি রবিবারের সন্ধ্যাকে ওরা দুজনে একসঙ্গে ধরতে পেরেছে। আজ হলো দ্বিতীয় রবিবার।

এই দশটি দিনের আগের দুটি রাত্রির কথা কোন প্রসঙ্গে আর তুলতেই চায় না বীথি। সেই প্রথম রাত্রিটা, জানালার ধারে মোড়ার উপরে বসে পরিমল, আর খাটের উপর বালিশ আঁকড়ে বীথি যে রাতটা ভোর করে দিল। তারপরেই সেই দ্বিতীয় রাত্রিটা। দু'জনে ঘরের দুদিকে দু' চেয়ারে বসেই রাত কাটিয়ে দিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে বীথিকা দেখছিল, গেঞ্জির উপর চাদর জড়িয়ে আর চেয়ারের উপর শক্ত একটা চেহারার মতো বসে গুলমোরের শোভা দেখছে পরিমল। দেখামাত্র সেই

যে রাগ করেছিল বীথি, সেই রাগ সারারাত বীথিকে একেবারে বোবা করে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে রেখে দিল। পরিমলের দিকে একবার তাকিয়েই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল বীথি। মূর্তিমান একটা অকর্মণ্যতা যেন শুধু রূপের বড়াই নিয়ে বীথিকার ভালবাসার জগৎটাকে অশ্রদ্ধা করার জন্য বসে রয়েছে। কে ভেবেছিল, ঐ চওড়া বুকের ভিতর এত অকৃতজ্ঞতা লুকিয়ে থাকতে পারে ? বীথিকার এই বয়সের সব আনন্দ অকালে ডুবিয়ে দেবার এই অভিসন্ধিই যদি ছিল লোকটার, তবে কেন....।

একটা অভিমান জ্বলে উঠেছিল বীথিকার বুকের ভিতর। তবে কেন ভালবাসার এত ভান করল লোকটা এই এক বছর ধরে ? বিশ্বাস করে বীথিকা, এ মানুষ অন্তরে অন্তরে ভালবাসে তার একটা ছা-পোষা শখকে, বীথিকাকে নয়, বীথিকা ওর কাছে গৃহস্থালির একটা সামগ্রী মাত্র।

কিন্তু এতই যদি শখ ছিল, তবে...। তবে কি ? ভাবতে পারে না বীথি, একেবারে পিছনের দেয়ালের দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। সহ্য হয় না এই বোবা জ্বালা !

সকাল হয় বেশ একটু মেঘলা হয়েই। কতগুলি বৃষ্টির ফোঁটা গুলমোরের মাথা ভিজিয়ে দেয়। আর দরজার কড়া বেজে ওঠে।

চেয়ার থেকে উঠে দরজা খোলে পরিমল। কোন এক অফিসের পিয়ন সেলাম করে মস্ত বড় একটা লেফাফা পরিমলের হাতে তুলে দেয়। পিয়নবুক সই করে পরিমল। পিয়ন সেলাম করে চলে যায়।

লেফাফাটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ব্যস্তভাবে স্নানের ঘরে চলে যায় পরিমল। যখন ফিরে আবার ঘরে ঢোকে তখন বীথিকা ছেঁড়া লেফাফা আর একটা চিঠি হাতে নিয়ে পরিমলের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে—এ কি ? এ আবার কি কাণ্ড করেছ ?

পরিমল অতি মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলে—ও কিছু নয়, রেখে দাও।

—কোথাও বের হবে নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

হেসে ফেলে পরিমল।—আগে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনদিন কথা বন্ধ করবে না, তবে বলব।

বীথিকাও হেসে ফেলে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পরিমলের কাছে দাঁড়ায়। পরিমলের হাতের উপর হাত রেখে বলে—সত্যিই প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো কথা বন্ধ করব না। তবে তুমি অমন করে ধমক দিও না লক্ষ্মীটি।

পরিমল তার কাজের আর কাজের চেষ্টার কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়েছিল। শোনাতে বেশি সময় লাগেনি। এই রবিবারের দশ দিন আগের সেই মেঘলা সকালের এক পশলা বৃষ্টি আগের দুটি কালরাত্রির সব অভিযোগের জ্বালা ধুয়ে দিয়েছিল।

নীলকমল ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সেই দু'রাত্রির ঘটনাগুলিকে এখন একটা স্বপ্নে দেখা আতঙ্কের মতো নিতান্ত অসার বলেই মনে হয় বীথির। শুধু সন্দেহ হয়, মাথাটা দুটো দিন খারাপই হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। নইলে...ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় বীথি !

দপ্ করে আলো জ্বলে ওঠে তিনতলার ফ্ল্যাটের ঘরে। সাদা আলো। ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ মাত্র দাঁড়িয়ে থেকে তারপরেই দু'জনে আলোর বাইরে চলে যায়। ভিতরের বারান্দার অন্ধকারের মধ্যেই রেলিং-এ হেলান দিয়ে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করে। পাশের বাড়ির ছাদ আর সামনের বাড়ির বারান্দা রঙিন ঘরের কিন্নর ও কিন্নরীকে দেখতে না পেয়ে আবার বিস্মিত হয়।

বীথিকা বলে—তুমি আজকাল যেন কেমন হয়ে যাও মাঝে মাঝে। ডাকলেও শুনতে পাও না। এত কি ভাবো বলো তো ?

চমকে ওঠে পরিমল। তার হাত দুর্বল সিঁদেল-চোরের হাতের মতো রেলিং-এর উপর আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে ঘষা খায়, রেলিংটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারে না। বুকের ভিতর সব নিঃশ্বাস যেন মরতে বসেছে, শিরদাঁড়াটা থর থর করে কেঁপে ওঠে।

বীথিকা আবার বলে—দেখ কাণ্ড, আবার সেই রকম চুপ করে কি যেন ভাবতে আরম্ভ করেছ !

মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা নিশ্বাসের জোরে নিজেকে শক্ত করে নিযে জিজ্ঞাসা করে পরিমল—কি বলছ ?

—এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবছিলে বলো।

হঠাৎ দু'হাতে বীথির মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের উপব টেনে নেয় পরিমল। বীথির কপালের উপর মুখ ছুঁইয়ে দিয়ে ব্যাকুলভাবে বলে—একটা কথা আমাকে দিতে হবে বীথি। এখনি শুনব। একেবারে স্পষ্ট করে শুনব।

—বলো, কি শুনতে চাও ?

—এন্টাসিব ডাক্তার-ফাক্তারকে কখনো কোনদিন ডাকা হবে না।

পরিমলের বুকের উপর মাথা গুঁজে দিয়ে নীরব হয়েই রইল বীথি, অনেকক্ষণ। পরিমলের কামিজের বুক আর আস্তিন ভিজিয়ে দিল বীথির দুই চোখ। টিপটিপ করছে পরিমলেব বুকের ভিতর একটা শব্দ। সে শব্দের অর্থ যেন এতদিনে বুঝতে পেরেছে বীথি। একটা অন্ধ স্নেহের উদ্বেগ যেন টিপটিপ করছে এই বুকের ভিতর। এতদিন যেন তার এই পাথুরে দুল-পরানো কান দুটোতে এ শব্দের অর্থ বুঝবার মতো শক্তিই ছিল না।

—বীথি ?

– বলো।

—বলো, ডাক্তারের দরকার নেই।

—না নেই। তুমি যখন ডাক্তার আনতে চাও না, তখন আমিও চাই না।

আর একটি রবিবার। বীথিকা আবার অভিযোগ করে বসে—তবুও তুমি কি যে ভাবো, বুঝতে পারি না।

মিথ্যা বলেনি বীথিকা। পরিমলের মনের ভিতর একটা প্রচণ্ড অভিপ্রায়ের পরিকল্পনা যেন লুকিয়ে রয়েছে ; একটা প্রাণের অঙ্কুরকে সর্ব আপদ থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা। কথা দিয়েছে বীথি, কিন্তু সে কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারেনি পরিমল। নিজেব ইচ্ছাকে নয়, পরিমলেরই একটা ইচ্ছাকে সম্মান দেবার জন্য দশ মাসের যাতনা স্বীকার করবে বীথি। এই তো তার প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

চুপ করে মাঝে মাঝে অন্যমনস্কের মতো পরিমল যা ভাবে, পরিমলই জানে যে, সে ভাবনা চুপ করে সহ্য করা কত কঠিন ! মাটির মূর্তি তো নয়, জীবন্ত এক নারীর মূর্তিকে কি চক্ষুদান করা যায়, আর সে চোখে কি আবার স্বপ্ন দান করতে পারা যায় ? তাই দুশ্চিন্তা না করে পারে না পরিমল, নিজেকে প্রশ্ন করে চেতনার চোখ কবে পাবে বীথিকা ?

পরিমল হেসে হেসে বলে—আজকাল তোমার চোখমুখের চেহারা কি রকম হয়ে গিয়েছে, খোঁজ রাখ কিছু ?

আতঙ্কিত হয় বীথি—তার মানে ?

পরিমল—জীবনে কোনদিন বোধহয় তুমি আজকের মতো এত সুন্দর ছিলে না।

বীথি হেসে ফেলে—আমার মুখের গুণে নয়, তোমার চোখের গুণে এই মুখকে আজ এত

বেশি সুন্দর দেখছ।

পরিমল—আমার চোখের গুণে নয়, তোমার কোলে যে আসছে, তার গুণেই তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠেছ।

মাথা হেঁট করে বীথি, জীবনে বোধহয় এই প্রথম একটা কথার কাছে মাথা হেঁট করল। প্রস্তুত ছিল না এমন কথা শোনবার জন্য। ভাবতেও পাবেনি বীথি, শোনা মাত্র মাথাটা এভাবে ঝুঁকে পড়বে।

বোঝা যায় না, ঘরের মেঝের দিকে না তার নিজেরই কোলের দিকে তাকিয়ে আছে বীথি। যেন নিশ্চল ও নিস্পন্দ এক অভিবাদনের ভঙ্গি আঁকা রয়েছে এ ঘবেব বাতাসে। যেন ছোট হাত-পায়ের খেলায় ভরা একটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে বীথিকার বুকের সব নিঃশ্বাস আর চোখের সব বিস্ময়।

পরিমল ডাকে—বীথি!

বীথি মুখ তুলে তাকায়। উঠে গিয়ে পরিমলের হাত চেপে ধরে—তুমি আজ আমাকে একটা কথা দাও।

—বলো, কি কথা চাও।

—তুমি আব কখনো ওরকম চুপ কবে কিচ্ছু ভাববে না।

এক মহান সাফল্যের হাসি হো হো কবে হেসে পরিমল বলে—আব ওরকম কবে নিশ্চয ভাবব না। এবাব আমি নিশ্চিন্ত।

সফল হয়েছে পরিমলের প্রচণ্ড অভিপ্রাযেব পবিকল্পনা। বীথিকাব চোখ স্বপ্নদান কবা হয়ে গিযেছে। ভাবনার ভার নেমে গিয়েছে পরিমলের।

এই রবিবারের সন্ধ্যাটা রঙিন ঘরের জীবনে যেন একেবারে নতুন একটা জ্যোৎস্না ঢেকে দিযে চলে গেল। তারপর থেকে প্রতিদিনই একটা না একটা ন:ূন পবিণাম দেখা দিযে অপার্থিব এই রঙিন ঘরটাকে পার্থিব করে তুলতে হবে।

হোটেলের খাবার আনা বন্ধ হলো একদিন। বীথি বলে—তুমি যখন সন্ধ্যাবেলাটা থাকই না, আর বেড়াতে যাওয়াও হয় না, তখন রেঁধে বেঁধেই সন্ধ্যাটা কাটিযে দেব। আর সকালবেলা? সেটাও এমন কি সমস্যা। আর একটা স্টোভ থাকলেই খুব তাড়াতাড়ি সকালের রান্নাও সেরে ফেলতে পাবব।

আর একদিন, একটু বেশি রাত করে পবিমল ঘবে ফিরতেই বীথিকা বলে—তোমাকে বলি-বলি করেও একটা কথা এখনো বলতে পারিনি। ভয় হয, বললে আবার কি ভেবে বসবে।

—কি কথা?

—তোমার চেহারা এই ক'টা দিনের মধ্যে বড় বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এতটা শুকিযে গেলে কেন?

একটু উদ্বিগ্নভাবেই আরও প্রশ্ন করতে থাকে বীথি—খাটুনিও কি খুব বেশি? অফিসেব টিফিন কি রকমের? খেতে পার তো?

পরিমল হাসে—টিফিনটা মন্দ নয়।

ভিতর বারান্দায় টেবিলের উপর খাবারের প্লেট আর বাটি সাজাতে সাজাতে বীথিকা বলে—আর একটা কথা। আমি একটা লম্বা ছুটির জন্য দরখাস্ত করেই দেব ভেবেছি। তুমি কি বলো?

—এখনই ছুটি না নিলেও চলতে পারে। আর কিছুদিন পরে দরখাস্ত করো।

খাওয়ার পাট শেষ হবার পর বীথি আবার প্রশ্ন করে—হ্যাঁ, আর একটা কথা। বলে হঠাৎ

চুপ করে যায় বীথি। তখনি বলতে পারে না, কথাটা কি। মুখ ঘুরিয়ে যেন লাজুক হাসি লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে বীথি।

পরিমল—বলো, কি বলছিলে ?

বীথি—এই ফ্ল্যাটে আর বেশি দিন থাকা উচিত হবে কি ? এই একটুখানি একটা ঘর, আর এই ফালির মতো বারান্দা, এর মধ্যে কি করে যে জায়গা হবে, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

পরিমল—এ ঘরে থাকা আর চলবে না বলেই বুঝতে পারছি। অন্য জায়গা খুঁজতে হবে।

বীথিকার চিন্তাগুলিই যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। ফস্ করে বলে ফেলে বীথি—ছোট একটা দোলনা দুলবে, এমন একটু জায়গাও এখানে নেই।

পরিমল মুখ টিপে হাসে—কি বললে ?

বীথি অপ্রস্তুত হয়েও বলে—বলেছি, বেশ করেছি।

এঁটো প্লেট ও বাটিগুলিকে একটা থালার উপর তুলে নিয়ে জলের ট্যাপের নীচে রাখে বীথি। হাত ধুতে ধুতে বলে—এ ছাই চাকরিই ছেড়ে দেব। আর ভাল লাগে না। তোমার যখন একটা ভাল কাজ হয়েই গিয়েছে, তখন আর কেন ।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকায় পরিমল। যেন সিঁদেল চোরের একটা ছায়ার বড় বড় দুটো চোখ পালিয়ে যাবার পথ ঠাহর করে রাখছে।

বৈশাখী সন্ধ্যা ঘনায় লেকের জলের আশেপাশে, বুড় বড নারকেলের মাথায়, আর আকাশে। পোড়া বাতাস একটু একটু ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছাড়ে। সারা দুপুর আর বিকালের মূর্ছা থেকে মানুষের কলরবগুলি এতক্ষণে আবার জেগে উঠেছে। আর এক রবিবার।

বেড়িয়ে ফেরে বীথিকা রায় ও পরিমল রায়। এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালাগুলি, সামনের বাড়ির বারান্দা আর পাশের বাড়ির ছাদ দেখে অবাক হয়ে যায়, কিন্নব ও কিন্নরী আর হাত জড়াজড়ি করে বেড়ায় না, ফটকের আলোর কাছে দাঁড়িয়ে সেই লজ্জার মাথা-খাওয়া লীলাকলাও আর দেখা যায় না। দেখা যায়, কিন্নরীর হাতেই একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। দপ দপ করে ঘরের রঙিন আলোও আজকাল আর খেয়ালের আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করে না। কি আশ্চর্য, আজকাল ফ্ল্যাটের ভিতর বারান্দা থেকে ধোঁয়া উড়তেও দেখা যায়। রান্নাবান্না করে না কি কিন্নর আর কিন্নরী ?

নীলকমলের সিঁড়ি ধরে এই বৈশাখী সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারের মতোই শান্ত দুটি মূর্তি গল্প করতে করতে উপরে ওঠে। দুই চোখ ভরা এক অদ্ভুত হাসির ঝলক তুলে বীথি পরিমলের দিকে তাকায়।—তোমার প্রথম মাসের মাইনেটা প্রথম কিসে খরচ করবে বলো ?

হঠাৎ পা দুটো যেন টলে ওঠে পরিমলের। দেয়াল ধরবার চেষ্টা করে। নিঃশ্বাস বিচলিত হয়। আস্তে আস্তে হেসে পরিমল উত্তর দেয়—তুমি যাতে যেভাবে খরচ করতে চাও, তাই করব।

ঘরের ভিতরে ঢুকে কাশ্মীরী সুরাহির ভিতরে রজনীগন্ধার গুচ্ছ সাজিয়ে রাখতে রাখতে বীথি বলে—একটা কথা।

পরিমল—বলো।

বীথি—চাকরিটা ছেড়েই দেব ঠিক করেছি।

কথা বলে না পরিমল। আয়নার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে যেন তার চোখেরই একটা ভীরুতাকে জোর করে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

বীথি বলে—মন লাগিয়ে অফিসের কাজ আর করতে পারছি না, কাজে ভুলও হচ্ছে,

সুপারিন্টেন্ডেন্ট ধমক-ধামকও দিচ্ছেন।

কোন মন্তব্য করে না, উত্তর দেয় না পরিমল।

বীথি বলে—শরীরটাও কেমন হাঁসফাঁস করে। এখন থেকেই সাবধান না হলে ভুল হবে।...না, আর অফিস যাওয়াই সম্ভব হবে না।

একটা বইয়ের ভিতর থেকে টাইপ-করা একটা চিঠি বের করে বীথি। পরিমলের কাছে এসে হাসতে হাসতে বলে—যে কথাটা তোমাকে এখনো বলিনি। আর অফিসে যাব না, চাকরির ইতি করে দিলাম, কালকেই বাই-পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেব এই চিঠি।

আতঙ্কিতের মতো দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত করে হঠাৎ চিঠিসুদ্ধ বীথির হাত চেপে ধরে পবিমল।

বীথি বিস্মিত হয়—তুমি আপত্তি করছ?

পরিমল—হ্যাঁ।

যেন একটু অভিমান মেশানো ক্ষোভের সুরে বীথি বলে—কেন? তুমি থাকতে আমার আবার চাকরি করবার দরকার কি?

—আমি নেই, আমি নেই, আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি ভুল করো না বীথি।

বলতে বলতে একেবারে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পরিমল। পাগলের মতো দুটো চোখ নিয়ে সিঁড়ির দিকে একবার তাকায়। যেন এই মুহূর্তে দরজার এই চৌকাঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য তৈরি হয়েছে একটা বিকারের রোগী।

সন্ত্রস্তের মতো তাকিয়ে বীথি বলে—এ কি? কি বলছ তুমি? কিসের ভুল?

পরিমল—আমি ভুল, আমার চাকরি ভুল। ঐ বজবজের কারখানা, ঐ চাকরির চিঠি, ঐ পিয়ন আব পিযনবুক, ঐ ছ'শো-দশ টাকা মাইনে, সবই ভুল।

চিৎকার করে ওঠে বীথি—তবে ওগুলো কি?

পরিমল—আমার জোচ্চুরি।

বীথি—এ শয়তানি কেন করলে?

পরিমল—শয়তানের ছেলেকে প্রকাশ ডাক্তারের বিষ থেকে বাঁচাবার জন্য। বুঝতে পেরেছিলাম, ছ'শো দশ টাকার অনুবোধ তুমি না মেনে পারবে না।

বীথিরই দু'চোখে বিষের ধোঁয়া জ্বলতে থাকে।—তুমি মুখ্যু, কালই তোমারই চোখেব সামনে প্রকাশ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসব, তারপর...।

যাত্রা-নাটকের দানবের ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে ওঠে পরিমল—পারবে না বীথি, কখ্‌খনো পারবে না। সে সাধ্যি এখন আর তোমার নেই!

খাটের উপর লুটিয়ে পড়ে বীথি। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে ছটফট করতে থাকে। মিথ্যে বলেনি শয়তান। তার সারা দেহের শোণিত যে আর কয়েকমাস পরেই মধুর এক আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। তার সারাক্ষণের ভাবনাগুলি যে এরই মধ্যে পীযূষময় হয়ে উঠেছে, অনাগত এক তৃষ্ণার্তকে কোলের উপর তুলে নেবার আশায়।

গুলমোরের মাথা দুলিয়ে দিয়ে বৈশাখী সন্ধ্যার একটা ঝড়ো বাতাস ঘরের ভিতর ঢোকে। হঠাৎ-ই শান্ত হয়ে যায় বীথি। কি কথা ভাবতে গিয়ে মনের রাগগুলি হঠাৎ যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতি সুন্দর চেহারা আর অমন অকর্মণ্য জীবনের অভিশাপ নিয়ে যে লোকটা, তাকে ঘৃণা করতে গিয়ে কেমন একটা মমতাও এসে পড়ে। জোচ্চুরি করেছে লোকটা, কিন্তু কি করুণ জোচ্চুরি! বীথিকে অ-মাতা হবার কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যই জোচ্চুরি করেছে ঐ লোকটার বুকের ভিতর লুকানো একটা স্নেহান্ধ শখ।

কিন্তু কত ধূর্ত একটা জোচ্চুরি! বীথিকার চোখের দৃষ্টি আবার হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে দুঃসহ

একটা লজ্জার ভিতর ছটফট করতে থাকে। জোচ্চুরিটা কত সহজে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বীথিকে। মানুষের স্ত্রী নয় বীথি, ছ'শো দশ টাকার স্ত্রী ; হৃদয়ের অনুরোধে নয়, টাকার অনুরোধে আর টাকার ধমকে শান্ত হয় যারা।

কিন্তু ঐ লোকটা যে টাকাও নয়, একেবারে ভুয়ো, ধূর্ত একটা টাকার গল্প মাত্র। লোকটাকে কি আর এ জীবনে শ্রদ্ধা করতে পারা যাবে ? আবার একটা যন্ত্রণা করে ওঠে মাথার ভিতরে। দুর্ভাগ্যটা যেন ক্ষতের মতো মনের ভিতরে জ্বলতে থাকে। স্বামী থেকেও তার স্বামী নেই। আর লোকটারও কি দুর্ভাগ্য ! স্ত্রী থেকেও স্ত্রী নেই। ঐ অকেজো জীবনের একটা মূর্তি, কোনদিন নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যটাকে চিনতে শিখবে না, সম্মান চাইবে না ; পাবেও না, শুধু পুরুষের একটা ফটোর মতো এই দরজার চৌকাঠে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, সহ্য করাও যাবে না, এ অভিশাপ কতকাল সহ্য করবে বীথিকা ?

বালিশটাকে একটা ঠেলা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে, খাটের উপর বসে বীথিকা। পরিমলের দিকে তাকাতেই আবার চোখ জ্বলে ওঠে।—তোমার লজ্জা করছে না ?

—করছে বৈকি।

—তবে আর ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকছো কেমন করে ?

—যাবাব জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি ।

—কি বললে ?

—শুধু একটি কথা বলে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

—কি কথা ?

—ছেলেকে বেনামী করে দিও না।

কটমট করে তাকায় বীথি—তার মানে ?

পরিমল—তার আগেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খোঁজ করো, আমিই এসে ছেলেকে নিয়ে যাব।

চমকে ওঠে বীথি। পরিমলের কথাগুলি শুধু নয়, গলার স্বরটাও অদ্ভুত। শান্ত অথচ কঠিন এক কণ্ঠের ভাষা। মনে হয় ঐ সুন্দর চেহারাটা নিজের গর্বে শেষবারের মতো কতগুলি সুন্দর কথার ছলনা রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় ? ঐ রূপের চেহারা কি নতুন করে কোন ঠাঁই পেয়ে গেল ? সন্দেহ হয় বীথির। কি দুঃসহ এই সন্দেহ।

খাটের উপর থেকে নেমে, আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পরিমলের চোখের সামনেই শক্ত হয়ে দাঁড়ায় বীথিকা।—চাকরিটা তো ভুয়ো। তবে রোজ রোজ কোথায় যাও, আর কেনই বা যাও ?

উত্তর দেয় না পরিমল, বাইরের সিঁড়ির দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বীথিকার মুখের দিকে যেন আর তাকাতে চায় না পরিমল।

বীথিকা বলে—জায়গাটার নামটা বলতে দোষ কি ?

উত্তর দেয় না পরিমল। নিঃশব্দে যেন এই এক বছরের রঙিন বন্ধন তুচ্ছ করে চলে যাবার জন্য একটা মুক্তিপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরিমলের বুকের ভিতরের একটা প্রতিজ্ঞা।

বীথিকা বলে—সে জায়গাটা বুঝি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ?

মুখ ফিরিয়ে বীথিকার দিকে তাকায় পরিমল।—সে জায়গাটা হলো একটা দোকান।

—দোকান ? দোকানে গিয়ে জায়গা নিয়েছ ? কেন ?

—নিতে হলো, নিতে হয়।

—কতদিন থেকে ?

—এইতো তিনদিন হলো বিশটা দিন ঘুরে ঘুরে তবে পাওয়া গেছে।

দপ্ করে বীথিকার সন্দেহটারই রঙ বদলে যায়। বিস্ময়ের সুরে চেঁচিয়ে ওঠে বীথিকা—কিন্তু দোকানে বসে কি করো তুমি ?

উত্তর দেয় না পরিমল।

পরিমলের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে বীথি। এত ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমলের মুখের চেহারা জীবনে বোধহয় কোনদিন লক্ষ করেনি বীথি। অনেক ময়লা হয়ে গিয়েছে পরিমলের মুখের রঙ। কপালের উপর যেন রোদে-পোড়া একটা বিবর্ণতার ছাপ। হাড় দেখা দিয়েছে গলার দু'পাশে। হাত দুটোর মধ্যেও যেন পাথরঘষা একটা কর্কশতা ফুটে উঠেছে।

দরজার পথ আটক করে দাঁড়ায় বীথিকা। পরিমলের একটা হাত দু'হাতে শক্ত করে ধরে। দুঃসহ কৌতূহলে অস্থির দু'চোখের তারা সুস্থির করে পরিমলের উদাস মুখের কাছে প্রশ্ন করে।—বলো, দোকানে বসে কি করো তুমি ?

পরিমল—কাজ করি। আশি টাকা মাইনে।

আস্তে আস্তে নত হয়ে আসে বীথিকার মাথা। কিসের ভারে অথবা কিসের ঝোঁকে, বুঝতে পারে না বীথিকা। পরিমলের একটা হাতের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে অলস ও অবসন্নের মতো পড়ে থাকে বীথিকার মাথা। উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সব আক্ষেপ ও অভিযোগ মিটে গিয়ে শুধু একটা তৃপ্তি যেন পড়ে আছে।

পাশের ফ্ল্যাটে দেয়াল ঘড়ি টিক্ টিক্ করে। মাথা তোলে না বীথি, তুলতে ইচ্ছাও করে না। বীথি নিজেই বুঝতে পারে না, এ কোন্ চেহারার গায়ে জীবনে এই প্রথম এরকম প্রণামের ভঙ্গিতে সে আজ মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে।

—বীথি ! বিচলিতভাবে ডাক দেয় পরিমল।

মুখ তুলেই বীথি জিজ্ঞাসা করে।—দোকানে বুঝি থাকবার জায়গা আছে ?

—দোকানের কাছেই আছে।

—কেমন জায়গা ?

—একতলার একটা ছোট ঘর।

একটা সুন্দর প্রতিধ্বনি যেন আছড়ে এসে পড়ে বীথিকার অন্তরাত্মার উপর। একটা ছোট ঘর ! স্বামীর সঙ্গে থাকবার মতো ঘর ! এতদিন ধরে ঘর চিনতে দেয় নি, ঘর করবার রীতি শিখতে দেয়নি বন্ধ্যা নাগিনীর মতো যে বিষাক্ত একটা সাধের ভুল, সে ভুলটা যেন নিজের লজ্জায় জ্বলে-পুড়ে মরে যায় এই ছোট একটি প্রতিধ্বনির স্পর্শে।

সব নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্য সংযত করে মুখের উপর সূক্ষ্ম একটা দুষ্টু হাসির ছায়া ছড়িয়ে বীথি প্রশ্ন করে—তাহলে সেই ঘরেই যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

—আমাকে নিয়ে যাবে না ?

—তুমি তো যেতে পারবে না।

—পারবো, যদি একটা কথা দাও।

—বলো।

গুলমোরের মাথা থেকে একটা ঝড়ো বাতাস ঘরের ভিতর আছড়ে এসে পড়ে। থর থর করে কেঁপে ওঠে বীথিকার তিরিশ-বছর বয়সের ভঙ্গি-মনোহর সুকঠিন ভ্রূলতা। হীরা-গলানো বেদনার মতো দুটো বড় বড় স্বচ্ছ ও তপ্ত জলের ফোঁটা টলমল করে ওঠে দু'চোখের কোণে।

বীথি বলে—বলো, চিরকাল আমাকে ঘেন্না করবে, আর ছেলেকে ভালবাসবে ?

দপ্ করে আলো...কি আশ্চর্য, আলো নিভে যায়। যাঃ, লোকটা ঝট্ করে সুইচ টিপে দিয়েছে। পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের বাড়ির দোতলায় এতগুলি দর্শক-চক্ষু হঠাৎ হতাশ হয়ে যায়। এত কাছাকাছি দুটো ব্যাকুলতা চরম মীমাংসা খুঁজতে গিয়ে এই রঙিন ঘরটাকেই যেন হঠাৎ মিথ্যা করে দিল আর অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল।

সকালের আলো দেখা দিতে আরও মিথ্যা হয়ে গেল নীলকমলের তিনতলার ফ্ল্যাটের রঙিন ঘর। এরই মধ্যে কে জানে কখন এসে ঘর, ঘরের ফার্নিচার আর ঘরের চাবির জিম্মা নিয়েছে দারোয়ান। ভদ্রলোক আর মহিলা নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন ফটকের কাছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি, কেরিয়ারে জিনিসপত্র বাঁধা।

এ ফ্ল্যাট আর ও ফ্ল্যাটের জানালায়, পাশের বাড়ির ছাদে আর সামনের দোতলার বারান্দায় অনেকগুলি নারীচক্ষুর সমাবেশ কৌতূহলে ছটফট করে। কি আশ্চর্য, মহিলার সিঁথিতে যে সিঁদুর দেখা যায়! তার উপর আবার মাথায় কাপড়! এতদিন পরে ? কি মনে করে ?

ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির ছাদ বলে ওঠে—স্বামী-স্ত্রী, নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী !

তিনতলার ফ্ল্যাটের জানালা দুটো বন্ধ। গুলমোরের মাথায় বাসি রজনীগন্ধার একটা গুচ্ছ আটকে পড়ে রয়েছে। তার উপর পড়েছে পুব আকাশের একটুখানি আলো। দেখলে সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না, যেন কোথাকার এক বর-বধূ এসে ঐ রঙিন ঘরে মাত্র একটা বাসররাত কাটিয়ে দিয়ে, সকাল হতে না হতেই নতুন ঘরে চলে গেল।

মায়া মানিক

মানিক আর মানিক স্টোর্সের বয়স সমান। একই দিনে মানিক আর মানিক স্টোর্সের জন্ম। কিন্তু বয়সটা কত ?

মাত্র তিন বছর। বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু করে বড় হয়ে মানিক আজ চার বছরে পা দিল। আজ মানিকের জন্মদিন।

কিন্তু মানিস স্টোর্সেরও কি জন্মদিন ? বিগত তিনটি বছরের বাতাসে একটু একটু করে কেমনতর হয়ে শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গেল মানিক স্টোর্স, সে কথা আপাতত থাক।

আজ আবার সেই এগারই চৈত্রটি দেখা দিয়েছে, আজ থেকে তিন বছর আগে যেদিনে মানিক আর মানিক স্টোর্স দেখা দিল পৃথিবীতে।

তিন বছর আগের সেই অদ্ভুত একটা দিনের ইতিহাসই সবার আগে বলে নিতে হয়। এই পাড়ার এবং এই ঘরেরই জানালার কাছে বসে তিন বছর আগের সেই এগারই চৈত্রকে দু'চোখের বিস্ময় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিল নরেন, এবং বুঝতেও পেরেছিল।

আকাশের রঙটা যেন কেমন-কেমন মনে হয়; মল্লিকবাবুদের বাগানে মস্ত বড় অশ্বত্থের মাথায় বুকে ও কোলে লক্ষ লক্ষ নতুন পাতা ঝিরঝির করে। দেখা যায়, ঘুঁটেওয়ালির ঘরের চালা ছাপিয়ে মালতীর লতা নরেনের বাড়ির উঠোনের উপর এসে নেমে পড়েছে। বাতাসের গা থেকে দুপুরের জ্বালা পালিয়ে যায়, হঠাৎ কেমন মিষ্টি মিষ্টি আর ফুরফুরে হয়ে ওঠে। বড় অদ্ভুত এই দিনটা। আর অদ্ভুত, অশ্বত্থের এই লক্ষ লক্ষ কচি পাতার ভিড়। যেন লক্ষ লক্ষ

শিশুপ্রাণের কতগুলি পিপাসী ওষ্ঠ। যেমন কোমল, আর রঙটাও তেমনি, নতুন শোণিতের আভার মতো।

হঠাৎ শাঁখের শব্দ বেজে ওঠে পাশের ছোট ঘরটার ভিতর। সে শব্দে রঙিন হয়ে ওঠে নরেনের মুখ। ঐ শাঁখের শব্দে এগারই চৈত্রের সমস্ত আলো ছায়া আর শব্দগুলি যেন একটা ফুল হয়ে ফুটে উঠল।

ছোট বাড়ি, ছোট দুটি ঘর, এবং ছোট একটা উঠোন। পাড়াটাও ছোট, এবং প্রতিবেশীরাও ছোট ছোট মানুষ। কিন্তু এইসব ছোটতার মধ্যেই মুহূর্তের ভিতরে মস্ত বড় একটা জগতেব গর্ব এনে দিল ঐ শাঁখের শব্দ।

ছোট ঘরের ভিতর প্রতিবেশিনী মেয়েদের ভিড়। উঠান ভরা কলরব আব চাঞ্চল্য। সব শব্দের স্নায়ুজাল জড়িয়ে একটা নবাগত প্রাণের কান্না থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

ধাই এসে ডাক দেয়—কই গো ছেলের বাপ? ছেলের কপালে সোনা ছুঁইযে মুখ দেখে যাও।

বাক্স হাতড়ে সোনা খোঁজে নরেন। সত্যিই তো, এই আনন্দকে সোনা ছুঁইয়ে অভ্যর্থনা করাই তো উচিত।

আরও বেশি আহ্লাদের সুর ছড়িয়ে ধাই ছড়া কাটে—মানিক এল ঘবে। এ মানিক যেমন তেমন নয়, মানিকের ছোঁযা লেগে ধুলো সোনা হয়।

ধাইয়ের ছড়া বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করতে পারে নরেন। মনে হয়, একটুও বাড়িয়ে বলেনি ধাই। ছেলের কপালে সোনা ছুঁইয়ে ঘরের বাইরে এসে এক বাব দাঁড়ায় নবেন, যদিও আব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছিল না। কারণ, আজ তাব জীবনেব আব একটা সোনা-ছোঁয়ানো আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠার দিন।

এই ছোট পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বাজারের দিকে অনেকখানি এগিযে যাবাব পব, পথের পাশে সারি সাবি অনেকগুলি টিনের একচালা ঘর দেখা যায। এব মধ্যে একটি একচালা ঘর ভাড়া নিয়েছে নরেন। নরেনের দোকান। রকমারি পুতুল, লেস, ফিতা, আলতা, এসেন্স, বিস্কুট, লজেন্স ও চকোলেটের সম্ভাব রাধাবাজাবের মহাজনেব আড়ত থেকে চলে এসেছে। মহাজনের লোক এবং মুটে অনেকক্ষণ থেকে দোকানী নরেনেব প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট একটি মাটির গণেশ, কিছু ফুল এবং একটি ধূপদান হাতে নিয়ে একচালা ঘবের কাছে এসে থামল নরেন। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে মহাজনের লোককে বিদায় দিল। ধূপ জ্বালিয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ের কাছে সোনার একটা কুচি এবং ফুল রেখে প্রণাম কবে নবেন। খেরো বাঁধানো একটা খাতার উপর চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বার বার তিনবাব প্রণাম করে।

টিনের চালা এবং কাঁচা ইটের দেয়াল, ছোট্ট এই দোকান ঘরকে ভরে তুলতে খুব বেশি জিনিসের দরকার হয় না। সব জিনিস সাজিয়ে ফেলতে খুব বেশি সময়ও লাগে না।

দোকান সাজান হলো। হ্যাঁ, আর একটি কাজ বাকি আছে। দোকানের একটা নামকবণ। খুব পয়া নাম দিতে হবে, যে নামের দৈবী প্রভাবে নরেনের জীবনের সব দীনতা ঘুচে যাবে। ভাগ্যের দুয়ার খুলে যাবে যে নামের অমোঘ গুণে, সেইরকম একটি সোনামাখানো নাম চাই। যে নাম নরেনের কারবারী আকাঙ্ক্ষাকে লাভে-লাভে সোনা করে দেবে, সেইরকম একটি সর্বশুভ নাম।

এগারই চৈত্রের আত্মাটা যে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে, সেই আনন্দেই কে যেন নরেনের বুকের ভিতরে মুখ এগিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেল—ওর নাম মানিক।

জ্বলন্ত ধূপকাঠি সৌরভ ছড়ায়। চুপ করে ভাবতে থাকে নরেন। তার পরেই প্যাকিং-বাক্স

থেকে একটা তক্তা খুলে নিয়ে তার উপর আটা দিয়ে সাদা কাগজ সেঁটে দেয়। নীল-লাল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখে—মানিক স্টোর্স।

ছেলের নাম মানিক এবং দোকানের নাম মানিক স্টোর্স। নরেনের জীবনে দুটি সৌভাগ্যের আবির্ভাব-দিবস হলো এই এগারই চৈত্র। দুটি সোনা-ছোঁয়ানো ঘটনার নামকরণের দিবস হলো এই এগারই চৈত্র।

মানিক আর মানিক স্টোর্স যেন দুটি যমজ ভাই। ভূমিষ্ঠ হয়েছে একই দিনের এক সকালে, একই সোনা-ছোঁয়ানো আশার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে। সত্যি সত্যিই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নরেন, সুখের দিনের শুরু হলো এবার। না হয়ে পারে না। নইলে, দুটি সম্পদের আবির্ভাব কেন এমন করে প্রায় লগ্নে লগ্নে মিলে যায়?

মানিক স্টোর্সও দেখতে মানিকের মতোই, ছোট্ট অথচ বড সুন্দর করে সাজানো। সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বেলে মানিক স্টোর্সের রঙিন রূপের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় নরেন। কত জিনিস ধরেছে এইটুকু জায়গার মধ্যে! পাঁচ টাকা দামের চীনে মাটির ফুলদান থেকে শুরু করে এক পয়সা দামের রাংতার রিস্টওয়াচ। রঙিন রবারের বেলুন দুলতে থাকে, দার্জিলিং পাথরের রঙিন মালা ঝুলতে থাকে, কাগজের বাঘের লাল জিভ লক্‌লক্ করে। রাত হলে বাতি নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরবার জন্য তৈরি হয় নরেন, তখন মনটাও কেমন যেন একটু ভার ভার বোধ হয়। ছোট্ট মানিক স্টোর্সকে এভাবে সারা রাত একা একা অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে যেতে ভাল লাগে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখতে পায় নরেন, মানিক তার ছোট্ট নরম বিছানার উপর ঘুমিয়ে রয়েছে।

মানিক আর মানিক স্টোর্সের মধ্যে মায়ার পার্থক্য করতে চায়নি নরেন। করবার দরকারই বা কি? ওরা হলো নরেনের জীবনের একই লগ্নে আবির্ভূত একই ভাগ্যের দুটি আশীর্বাদ।

ভবিষ্যতটাকেও খুব সহজে হিসাব করে বুঝতে পারে নরেন। খুব বেশি করে নয়, খুব কম করেই লাভের অঙ্কগুলিকে কল্পনা করে। প্রথম বছরের বিক্রিতে লাভ যা হবে, তাতে শুধু খরচটাই উঠে আসবে। এর বেশি আশা করা উচিত নয়। দ্বিতীয় বছরটায় ভাল লাভ হবেই হবে। মাসে অন্তত এক মণ বিস্কুট কেটে যাবেই, এবং তাতে লাভের হিসাবে প্রতি মাসে চলে এল কুড়ি-বাইশ টাকা। এই রকমের আরও তো পঁচিশটি বড় রকমের চলতি মাল রয়েছে। রকম পিছু যদি মাসে দশ টাকা করেও লাভ আসে, তবে সারা মাসের লাভ হবে গিয়ে...ভালই তো হবে।

হবেই হবে, কোন সন্দেহ নেই নরেনের মনে। মানিক স্টোর্স, তার জীবনের সবেচেয় সুন্দর ও সুপ্রসন্ন দিবসের আত্মার নামে, তার ছেলের নামে নাম দেওয়া হয়েছে এই দোকানের। লাভ হবেই হবে, ঐ মানিক নামের মধ্যেই সব সাফল্য ও উন্নতির যাদু লুকিয়ে রয়েছে।

—কমলা, কমলা, ও ছেলের মা! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

চেঁচিয়ে ডাক দেয় নরেন। কমলা কাছে আসতেই নরেন বলে—আর ভাবনা করি না।

কমলা—কিসের ভাবনা?

নরেন—টাকা-পয়সার ভাবনা।

কমলা—বড়লোক হয়েই গেছ নাকি?

নরেন—হইনি, হবো।

কমলা—হও।

নরেন—হবোই তো।

গলার স্বর একটু নামিয়ে ফিসফিস করে নরেন বলে—আমার কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে কমলা, মানিকের নামে যখন দোকানের নাম দিয়েছি, তখন লাভ হবেই। এ দোকান জমে উঠবেই।

কমলা বলে—আমারও তাই মনে হয়।

মানিক স্টোর্সের প্রথম পাঁচ মাসেব বিক্রিব হিসেব করতে গিয়ে অনেক যোগ-বিয়োগ আর গুণ-ভাগের অঙ্কে খাতা ভরে ফেলল নরেন। বোঝা গেল, লাভ তেমন কিছু হয়নি, ক্ষতিও তেমন কিছু নয়। কিন্তু প্রথম পাঁচ মাসে এর.চেয়ে আর কি বেশি আশা করা যায়?

এক গুচ্ছ ধূপকাঠি জ্বালিযে এবং মাটির গণেশের চার দিকে ধুনোর ধোঁয়া বার বার ছড়িয়ে নরেন তার খেরো বাঁধানো খাতাটার উপর বার বার মাথা ঠেকায়। মনে পড়ে, পূজা আসতে আর বেশি দেরি নেই। এইবার বাজার জমবে। বিক্রির জোর খুব বেশি হলে একটা চাকব না রেখে পারা যাবে না।

পাশের দোকানে আলুওয়ালা অমূল্যকে ডাক দিয়ে নরেন প্রশ্ন কবে—ও অমূল্যদা, একটা লোক দিতে পার? শুধু সকাল আর সন্ধেটা আমাকে একটু সাহায্য করবে।

অমূল্য আশ্বাস দেয়—লোকের আর অভাব কি?

কিন্তু পূজাও এল, এবং পূজার বাজারও জমল। তবে মানিক স্টোর্সকে তার জন্য একটুও ব্যস্ত হবার কারণ দেখা দিল না। এদিকে নয়, এ রাস্তাতেও নয়, পূজার সাড়া জাগল গিয়ে একেবারে ঐদিকে, মোড় পার হয়ে, বড বড় নতুন স্টলের লাইনে।

ছোট মানিক স্টোর্সে গ্যাসবাতি জ্বলে অনেক বাত পর্যন্ত। অনেক ধূপকাঠি পোড়া এবং ধুনোর ধোঁয়াতে ছোট দোকান-ঘরের বাতাস বড় বেশি পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু কোন গ্রাহকের পদধ্বনি এ দোকানের কাছে এসে থামে না। পথচারীর দল যেন সন্ন্যাসীর মতো নির্বিকার দৃষ্টি দিয়ে মানিক স্টোর্সের এত রঙিন সমারোহের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়। সবারই লক্ষ ঐ মোড়ের দিকে। সেই বড় বড় স্টল, যেখানে রেডিও বাজে, পাখা ঘোরে, এবং জিনিস তো নয়, জিনিসের পাহাড় যেন থরে থরে সাজানো রয়েছে।

কিন্তু এক পূজাতেই তো বাজারের ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। আসছে বছরও পূজা আসবে। মানিক স্টোর্সের এই ছয় মাসের পরিণামকেই ভাগ্যের চরম বলে মেনে নিতে রাজি নয় নরেন। দুর্বল নয় নরেন। আশা করবার সাহস এত সহজে ফুরিয়ে দেবার মানুষ নয় নরেন।

আর এক পূজা আসবার আগেই এগারই চৈত্র দেখা দিয়ে চলে গেল।

বড় হয়েছে, এবং আরও ফুটফুটে হয়েছে মানিক। এবং মানিক স্টোর্স আর একটু রঙিন হয়েছে, ধারে কেনা নতুন নতুন রাধাবাজারী মনোহারী সম্ভারে। জন্মদিনের উৎসবে চন্দনেব ফোঁটা পড়েছে মানিকের কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইনবোর্ডে।

লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখেছে নরেন। হিসাবের অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে যদিও বিষণ্ণ হয়েছে, তবুও আশা ছাড়েনি, বরন আরও বেশি করে ধূপকাঠি জ্বালিয়েছে। বিশ্বাস করে নরেন, এ লোকসানের বিভীষিকা আর বেশি দিন থাকবে না।

লোকসানের বিভীষিকাকে দূরে সরিয়ে দেবার একটা উপায়ও অনেক চিন্তা করে খুঁজে বের করেছে নরেন। এবার থেকে প্রতিদিন সকালে মানিককে কোলে করেই দোকানে নিয়ে আসে। দোকানের মাঝখানে ছোট একটা বাক্সের উপর মানিককে বসিয়ে রাখে। একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলা করে মানিক। ঘণ্টাখানেক পরে ঘুঁটেওয়ালি এসে মানিককে কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যায়।

বিশ্বাস করে নরেন, মানিক এসে এইভাবে একবার এই দোকানের বাতাস স্পর্শ করে গেলে, দোকানের বিক্রি বাড়বে। এবং বিশ্বাসের পরীক্ষাতেই আরও একটা বছর কেটে গেল। আবার এগারই চৈত্রের সকালবেলায় মানিকের কপালে এবং মানিক স্টোর্সের সাইনবোর্ডে চন্দনের ফোঁটাও পড়ল।

কিন্তু বিক্রি বাড়েনি। দোকান ভাড়া বাকি পড়েছে। মহাজন কড়া তাগিদ দিয়ে গিয়েছে। মহাজনের একটা কিস্তি শোধ করতে গিয়ে কমলার গলার হারটা বেচে দিতে হয়েছে।

আজকাল আর মানিককে সঙ্গে নিয়ে আসে না নবেন। কিন্তু আজকাল আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নরেন। ভোর হতে না হতে এসেই দোকানের ঝাঁপ খুলে ধূপ জ্বালে। দিনে দু'বার করে ধুলো-ময়লা মুছে মানিক স্টোর্সকে আরও তকতকে এবং ঝকঝকে করে রাখে। রোগী শিশুর পিতা যেমন মনের উদ্বেগে ঘুমোতে পারে না, প্রায় সেইবকমই দশা হযেছে নরেনের। ছোট বঙিন মানিক স্টোর্স, শিশুর মতোই তো দেখতে, এবং বোগেও ধরেছে। উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ ও ব্যস্ত না হয়ে পারে না নরেন।

কিন্তু কি নিষ্ঠুর রোগ! মুক্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধারের উপর ধার বেড়েই চলেছে। মহাজন মামলার ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। বাড়িওয়ালা অপমান করেছে। কমলার গায়ের সোনা এক এক করে বেচে দিয়ে কোনমতে আজও মানিক স্টোর্সকে রঙিন করে রাখবার খরচ যুগিয়ে চলেছে নরেন। আলুওয়ালা অমূল্যদাও বিরক্ত হয়ে বলে—ও নরেন, এমন দোকান কি না রাখলেই নয়?

কি আশ্চর্য, তবুও মানিক স্টোর্সের উপর একটুও রাগ হয় না নরেনের। দোষ মানিক স্টোর্সের নয়। কোথায় যেন একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছে, তারই জন্য মানিক স্টোর্সের এই দুর্ভাগ্য। যে বিশ্বাসটা বলতে গেলে এতদিন ধবে নরেনেব বুকের প্রতি অস্থি জড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, সেই বিশ্বাসটাই ভাঙতে আরম্ভ করেছে। তাই সন্দেহ, মানিক স্টোর্সের ভাগ্যের সঙ্গে একটা অপয়া স্পর্শ মিশে রয়েছে নিশ্চয়, নইলে...নইলে এমন করে সব আশা চূর্ণ হয়ে যাবে কেন?

সন্দেহটাই ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতর প্রশ্ন জাগায়—কিসের অপয়া স্পর্শ? কার স্পর্শ? কালো ছায়া দিয়ে তৈরি একটা কুৎসিত মুখ যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলে—নিজের ছেলে হলে হবে কি? ঐ তোমার ছেলেটিই যে অপয়া। হিসেব করে দেখ, সেই এগারই চৈত্রের পর থেকে আজ পর্যন্ত কপাল তোমার পুড়েই চলেছে। ক্ষতি আর ক্ষতি, লোকসান আর লোকসান। ছেলের নামে দোকান করেছ, ঐ নামটা যে অপয়া।

ভাবতে গিয়ে কপাল টিপে ধরে নরেন। কি দুর্ভাগ্য, এমন সন্দেহও মানুষেব হয়! মাঝে মাঝে নিজের মাথাটাকেই সন্দেহ করে নরেন, খারাপই হয়ে গিয়েছে বোধহয়।

তবু, এমন সন্দেহের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলাই উচিত। আবার এক দিন মানিককে কাজলের টিপ পরিয়ে আর মুখে পাউডার মাখিয়ে দোকানে নিয়ে গেল নরেন।

রঙিন মানিক স্টোর্স। একটু নতুন জগতের আস্বাদ পেয়ে নতুন করে চঞ্চল হয়ে উঠল মানিকের কৌতূহল-দুরন্ত দুটি চোখের দৃষ্টি আর দুটি ছটফটে হাত। প্রথমেই নাটাই-করা লালরঙা রিবন আর ফিতেগুলিকে খুলে তছনছ করে মানিক। তারপরেই সোনালী রঙের কাগজে জড়ানো লজেন্সের বয়ামের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। মানিকের চঞ্চল হাত ক্ষান্ত হয় না। তাকের উপর থেকে কতগুলি টিনের বাঁশি এক থাবা দিয়ে ঠেলে নিচে ফেলে দিল মানিক। নিষ্পলক ও সতর্ক দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে নরেন লক্ষ করতে থাকে, কোন্ কোন্ জিনিস স্পর্শ করছে মানিকের হাত, ঐ মিষ্টি মিষ্টি এবং মায়াকোমল দুটি কচি কচি হাত।

ঘুঁটেওয়ালি এসে মানিককে নিয়ে যায়। সারাদিন ধরে দোকানদারি করে নরেন। সন্ধ্যা পার হলো, রাতও বেশ হলো। এইবার তার সন্দেহের হিসাবটাও বেশ সাবধানে যাচাই করে নিল নরেন। ঠিকই হয়েছে, কোন ভুল নেই। যে জিনিসগুলি মানিক আজ সকালে ছুঁয়ে দিয়ে গিয়েছে, ঠিক সেই জিনিসগুলিই আজ বিক্রি হয়নি। এক পয়সার একটা টিনের বাঁশিও বিক্রি হয়নি। এইটুকু ছেলের কতটুকু দুটো হাত, কিন্তু ভয়ানক হাত।

ঝাঁপ বন্ধ করার আগেই বাড়িওয়ালা ও রাধাবাজারের তিন মহাজন দোকানের সামনে উগ্রমূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়। মহাজান গালি দিয়েই বলে—একে দোকানদারি বলে, না চুরিবাজি বলে ? মহাজনের টাকা আটক করে কারবার ফলাচ্ছ, এ কেমন ধারা কারবার হে ?

নরেন বলে—টাকা নেই তো দেব কেমন করে ?

মহাজন—তবে মাল ফেরত দাও।

নরেন—তাই দেব।

মহাজন—কবে ?

নরেন—কাল সকালে। খুব সকালে।

আলো নিভিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার সময় শো-কেসের কাঁচটা চিক্‌মিক্ করে উঠতেই মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকায় নরেন। পার্কেব মাঝখানে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, তার উপর একটা ভাঙা চাঁদ, এবং তারই জ্যোৎস্না এসে ছুঁয়েছে মানিক-স্টোর্সেব শো-কেসের কাচ। বাস্, এই তো শেষ। মানিক-স্টোর্সের জীবনকে আর কোন রাতের জ্যোৎস্না ছুঁতে আসবে না।

চাঁদটাও চেনা-চেনা। আজ তারিখটা কত ? এক মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়, আজ হলো দশই চৈত্র এবং চাঁদটা হলো সেই এগারই চৈত্রের আগের রাতের চাঁদ।

রাত ফুরোতেই দেখা দিল সেই প্রত্যাশিত কাল! চৈত্র মাসের এগার। কমলাকে কোন কথা না জানিয়ে, এবং সূর্য ওঠবার আগেই বের হয়ে গেল নরেন।

রাধাবাজারের তিন মহাজন এবং বাড়িওয়ালা আবও ভোরেই এসে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দ ও ঘুমন্ত মানিক-স্টোর্সের সম্মুখে। ঝাঁপ খুলে দোকানে ঢুকেই দু'হাত দিয়ে হিড়হিড় করে জিনিসসুদ্ধ একটা তাক নামিয়ে ফেলে নরেন।

মহাজন বলে—আহা, এলোমেলো করো না। আমরাই লিস্টি করে ফেলেছি, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ।

জিনিসপত্রের লিস্টি করতে এবং দামের হিসাব করতে খুব বেশি সময়ও লাগল না। তিন মহাজন ও বাড়িওয়ালা হিসেব করে মাল ভাগাভাগি করে ফেলে। বাড়িওয়ালা বলে—তাহলে নরেন, এইবার তোমার কাছে পাওনা গিয়ে দাঁড়ালো মোটমাট বাষট্টি টাকা বারো আনা।

উত্তর দেয় না নরেন। তাকিয়ে দেখে 'মানিক-স্টোর্স' সাইনবোর্ডটা ঝুলছে। যেন চিতায় চড়ানো মানুষের মুখটা এখনো দেখা যাচ্ছে, পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি। এক লাফ দিয়ে একটা টুলের উপর উঠে দাঁড়ায় নরেন। এক টান দিয়ে সাইনবোর্ডটাকে খুলে নিয়ে মাটির উপর ছুঁড়ে দেয়। সাইনবোর্ডের লোহার আংটাটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে দূরে ছিট্‌কে পড়ে।

আলুওয়ালা অমূল্যদা ডাকে—ও নরেন, এখানে এসো বসো।

বসল না নরেন, বাড়ির দিকেই ফিরে চলল। যেন জীবনের এক রঙিন আকাঙ্ক্ষার শব চিতায় তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যায় এক শোকার্তের মূর্তি।

ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর মাদুর পেতে শুয়ে পড়লো নরেন।

কমলা কাছে এসে বিস্মিতভাবে বলে—শরীর খারাপ হলো না কি ?

নরেন—শরীর খুব ভালো।

কমলা—তবে ওঠো ?

নরেন—কেন ?

কমলা হাসে—কেন, মনে পড়ছে না ?

নরেন—না।

শুয়ে শুয়েই পাশ ফিরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নরেন।

কমলা বলে—মানিকের জন্য নীল রঙের একটা কামিজ কিনে নিয়ে এস।

নিরুত্তর নরেনের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে কমলা আবার বলে—আর, আধ সের বাতাসা।

নরেন ঘাড় ফিরিয়ে তিক্তস্বরে প্রশ্ন করে—কিসের জন্য ?

কমলা বিস্মিতভাবে বলে—আজ তোমার মানিকের জন্মদিন।

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। কমলার দিকে আর একবার তীব্রভাবে তাকিয়ে বলে—আজ হলো আমার মানিক-স্টোর্সের মৃত্যুদিন।

আর্তনাদ করে নরেনের হাত চেপে ধরে কমলা—কি হয়েছে, বলো। বাড়িয়ে বলো না।

নরেন—দোকান উঠে গেল।

আস্তে আস্তে চলে গিয়ে রান্নাঘরে উনানের কাছে এসে বসে কমলা। হাঁটুর উপর কপাল চেপে চুপ করে বসে থাকে। উনানের উপর হাঁড়িতে জল ফুটতে থাকে টগবগ করে। চাল ছাড়তে হবে, একেবারেই মনে পড়ে না। উঠানের দিকে তাকিয়ে কমলার উদাস চোখের দৃষ্টিটাও যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপরেই কেঁদে ফেলে কমলা।

যেন কাঁদছে এগারই চৈত্র। ছেলে-হারানো মায়ের কান্নার মতোই করুণ।

ওদিকে উঠানের উপর ঘুরে ফিরে নিজের মনে খেলা করে মানিক। ঘুঁটেওয়ালির মালতী লতা ধরে একবার ঝাঁকুনি দেয়। প্রজাপতি আর ফড়িং ছটফট করে পাতার আড়াল থেকে উড়ে পালিয়ে যায়। দাওয়ার উপর খাঁচার ভিতর থেকে পোষা টিয়া কর্কশস্বরে মানিককে ধমক দেয়—ওরে ও ছেলে ! খবরদার !

যেন একটা অপয়া অলক্ষুনে দিনকে কর্কশ স্বরে ধমক দিচ্ছে খাঁচার টিয়া। মাদুরের উপর শুয়ে শুধু ছটফট করে নরেন, যেন গাড়ির চাকায় চাপা পড়া একটা আহতের শরীর ছটফট করছে। সেই এগারই চৈত্রকে ভালবাসার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না নরেন, যে এগারই চৈত্রের মায়ালী বাতাস সোনালী স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছিল নরেনের চোখে।

বেলা বাড়ে। রোদ তেতে ওঠে। এতক্ষণে কান্না থামিয়েছে কমলা। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে এই বাড়ির বাতাস। যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে এগারই চৈত্রের বুকের ভিতর, তাই তার সব মায়া ফুটো বেলুন-খেলনার বাতাসেব মতো বের হয়ে গিয়েছে। মল্লিকবাবুদের অশ্বত্থ ঝিরঝির করে, তবু কোন উৎসবের ইচ্ছা যেন জেগে উঠতে পারছে না নরেনের চোখের দৃষ্টিতে।

ওঘর থেকে মাঝে মাঝে কমলা উঠে এসে একবার এই ঘরের মাদুরের কাছে দাঁড়ায়। কোন কথা বলে না কমলা, নরেনও কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারে না। চলে যায় কমলা।

বিকেল হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যেতে চলেছে এগারই চৈত্রের দিনের আলোক। যেন এই বাড়ির বিষাদ দেখে ভয় পেয়ে চুপ করে দূরেই সরে রয়েছে মানিকের জন্মদিনের আনন্দ। নরেন আর কমলা, রাধাবাজারী খেলনারই মতো দুটি প্রাণ ভাগ্যের ফাঁকি সহ্য করতে না পেরে যেন এইবার নিজেকেই ফাঁকি দিয়ে মিথ্যে করে রাখবার চেষ্টা করছে। নাই বা হলো মানিকের জন্মদিন। না হলে ক্ষতি কি ? আর হলেই বা লাভ কি ?

মাদুরের উপর উঠে বসে নরেন। যেন নিজেরই বুকের ভেতরে একটা লজ্জার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে নরেন। একটা দোকানকে ছেলের মতো ভালোবেসে আর ছেলেকে দোকানের মতো ভালোবেসে একি একটা যাচ্ছেতাই মনের অবস্থা হয়েছে, বুঝতে পেরে নিজেরই উপর রাগ করে নরেন।

কিন্তু এমন রাগেই বা লাভ কি ? এমন একটা মিষ্টি শব্দও বাজে না এই ঘরের বাতাসে যে, নরেনের মনের এই অদ্ভুত রাগগুলিকে হাসিয়ে দিতে পারে। খাঁচার টিয়াটাও বোধহয় ঝিমোতে শুরু করেছে।

ইচ্ছা করে নবেনের, এখনি উঠে গিয়ে হৈ হৈ করে কমলাকে ব্যস্ত করে তুলতে, আব মানিকের জন্মদিনের আয়োজন করতে। চন্দন ঘষতে, ফুল আনতে আর বাতাসা দিয়ে পায়েস তৈরি করতে। কিন্তু কেমন যেন একটা বিশ্রী অভিমানে মনের ইচ্ছাটাই শক্তি হারিযে অবসন্নের মতো পড়ে রযেছে। বড় অস্বস্তি। ঘর থেকে বের হযে ক্লান্তের মতোই ভিতরেব দাওয়ার উপর এসে বসে থাকে নরেন।

চমকে ওঠে নরেনের চোখ। দাওযার উপব এক কোণে বসে খেলা কবছে মানিক। কিন্তু ও কি রকম খেলা ' এগারই চৈত্র যেন ঠাট্টা করে নরেনের মনের বাজে শোকগুলিকে একেবারে হাসিয়ে দেবার জন্য খেলা জমিযে বসেছে। খাঁচার টিয়াও হঠাৎ চিৎকার করে—ওরে ও ছেলে, ওকি ?

টুক্‌রো-টুক্‌রো কাগজ, কতগুলি দেশলাইয়ের খোল, কতগুলি কাঁকর, মালতীলতার কতগুলি পাতা, দুটো ইট এবং আরও পাঁচ-সাত রকমের আবর্জনা সাজিয়ে বসে আছে মানিক।

চুপ করে দাঁড়িযে দেখতে থাকে নরেন। তার পরেই গলা-ভাঙ্গা স্বরে প্রশ্ন করে নবেন—এ কি হচ্ছে মানিক ?

মানিক উত্তর দেয়—আমার দোকান।

হাসতে গিয়ে চোখে হাত দেয় নরেন। মানিক আবার বলে—ভাল চকোলেট আছে বাবা।

নরেন বলে—দাও, দু'পয়সার চকোলেট দাও।

দুটো কাঁকর নরেনের হাতে তুলে দিয়ে মানিক বলে—খাও।

খাওয়ার ভঙ্গি করে নরেন বলে—খেযেছি।

মানিক প্রশ্ন করে—মিষ্টি ?

নরেন বলে--খুব মিষ্টি বাবা।

চোখের কোণ দুটো মুছবার জন্য হাত তুলেই দেখতে পায় নরেন, কমলা এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলার বিষণ্ণ মুখ সুস্মিত হয়ে ওঠে।—এ আবার কোন্ খেলা হচ্ছে ?

নরেন বলে—দোকান দোকান খেলছি।

তারপরেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে নরেন। এলোমেলোভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিক যায় আর আসে। জামার পকেটে হাত দেয়।

কমলা আস্তে আস্তে বলে—বোধহয় ভুলেই গিয়েছ যে...।

নরেন বলে—মোটেই ভুলিনি। কি-যেন কি-রঙের জামার কথা বললে তুমি ? নীল রঙের ?

কমলা বলে—হ্যাঁ।

মানিকের কপালে জন্মদিনের আনন্দ এঁকে দেবার জন্য চন্দন খোঁজে কমলা, আর নীল-রঙের জামা কিনতে চলে যায় নরেন।

রামগিরি

—ঐ যে রামটেক পাহাড়, ওর আসল নামটা বলতে পার ?

—না।

প্রশ্ন করে ফরসা ছিপছিপে ছোকরা বয়সের যে মানুষটি, সে হলো এই স্টেশনের তার-বাবু।

আর উত্তর দেয়, দেখতে বেশ সুন্দর যে মেয়েটি, সে হলো স্টেশনমাস্টারের মেয়ে।

নাগপুর থেকে কিছু দূর উত্তরে সুলতানপুর নামে এই স্টেশনে প্রথম চাকরি নিয়ে এসেছে অনুপম। এই তো মাত্র মাস চারেক হলো এসেছে এখানে, টেলিগ্রাফি পাশ করে বছর খানেক ঘরে বসে থাকার পর।

স্টেশনমাস্টার পরেশবাবু সপরিবারে এখানে আছেন এক বছরেরও বেশি সময়। বদলি হবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টার কোন ফল হয় না। বাংলা দেশের কাছাকাছি অঞ্চলের দিকেই বদলি হবার ইচ্ছা। কারণ, মেয়ের বিয়ে দেবার দরকার দেখা দিয়েছে, বয়স হয়েছে মেয়ের।

বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকলে, ঝট করে একটা দিন কলকাতায় গিয়ে দু'একটা সম্বন্ধের খোঁজ-খবর আনা যায়। এমন কি, দরকার হলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ধীরেনের বাড়িতে একটা দিন থাকাও যায়, আর পাত্রপক্ষ এসে মেয়ে দেখেও যেতে পারে।

পরেশবাবু আর একটু দুশ্চিন্তিত হয়েছেন, ঐ ছোকরা তারবাবু অনুপম এখানে আসার পর থেকে। ছেলেটা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু. .কিন্তু প্রশ্ন হলো এত অল্প মাইনের একটা মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রথম মেয়ে রেণুর বিয়ে ? না, সম্ভব নয়।

অনুপমের সঙ্গে রেণুর বিয়ের কথাই বা তাঁর মনে আসে কেন ?

মনে না এসে পারে না। কারণ, দুজনের মধ্যে বেশ একটা ভাব হয়েছে বলে মনে হয়।

পরেশবাবু জানেন, এ রকম ভাবের ব্যাপার ঐ বয়সে আপনা হতেই এসে যায়। শুধু একটু চোখে চোখে রাখতে হয়, যেন মাত্রার বাইরে না চলে যায়। রূঢ়ভাবে বাধা দিতে গেলে ফল ভাল হয় না। সবচেয়ে ভাল হলো, ভালয় ভালয় এবং যত শীঘ্র সম্ভব অন্য কোথাও সরে যাওয়া। কিছুদিন অ-দেখার পর এই ধরনের ভাব আপনা হতেই আবার অ-ভাব হয়ে যায়।

অফিস ঘর থেকে বাইরে এসে পরেশবাবু দেখতে পান, হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে কি জানি কি দেখছে!

সন্ধ্যা হবার ঠিক আগে রেণু বেড়াতে বের হয়ে যাবার আগে একবার এখানে এসে এই প্ল্যাটফর্মের উপর কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করত। একটু পরেই পার্সেল-ক্লার্ক যোশির চারটে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসত রেণুর কাছে। রেল-ডাক্তার নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা হাততালি দিয়ে রেণুকে ডাকত। রেণু তার দল নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেত। তারপরেই নাইডুর কোয়ার্টারে মেয়েদের আড্ডা জমে উঠত। এমন কি ওভারসিয়ার যশোবন্তর মা'ও এক জোড়া তাস হাতে নিয়ে চলে আসতেন,.এবং আড্ডার গল্প নষ্ট করে দিয়ে খেলা জমিয়ে তুলতেন।

এই তো ছিল রেণুর প্রতি সন্ধ্যার নিয়মিত অভ্যাস। কিন্তু এ নিয়ম ভেঙে গিয়েছে এবং অভ্যাসও বদলে গিয়েছে ঐ ছোকরা তারবাবু আসবার পর থেকে। নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী ও বোনেরা শুধু তাকিয়ে থাকে। হাততালি দিয়ে রেণুকে আর ডাকে না।

পরেশবাবু চুপ করে রামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর অফিসঘরের ভিতর থেকে একটা চেয়ার তুলে আনতে বললেন হেডকুলিকে। অডিটরের জরুরি চিঠির ফাইলটাকেও অফিসঘরের টেবিল থেকে আনিয়ে নিয়ে চেয়ারের উপর বসেন পরেশবাবু।

ফাইলটা কোলের উপরেই পড়ে থাকে। পরেশবাবুর চোখের দৃষ্টি থাকে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো দুটি মূর্তির দিকে। সূর্য ডুবে আসছে। রামটেকের মাথাটা দেখায় জমাট মেঘের মতো, আর দু'পাশে লাল আলোকের ছটা দিয়ে তৈরি দুটো ডানা। কি দেখছে ওরা? এত মুগ্ধ হয়ে কি দেখছে? আর মুগ্ধ হলেও এতক্ষণ ধরে এত কথাই বা কি আছে বলবার মতো আর শুনবার মতো?

শুধু অনুমানই করতে পারেন পরেশবাবু, কিন্তু শুনতে পান না নিশ্চয়ই, কি কথা বলছে অনুপম আর রেণু।

অনুপম বলে—ঐ রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি। সেই কালিদাসের সময়ের রামগিরি, ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগে।

রেণু—রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কালিদাস?

অনুপম—হ্যাঁ, কালিদাস। মেঘদূত পড়েছ?

রেণু—না।

অনুপম—ঐ রামগিরিতে থাকত এক যক্ষ। মেঘের কাছে তার মনের ব্যথার কথা বলত।

রেণু—যক্ষের মনে ব্যথা ছিল কেন?

অনুপম হাসে—প্রিয়াকে দেখতে না পেয়ে।

হঠাৎ অন্য দিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে কালিদাসের যুগ থেকে একেবারে রেলের যুগে এসে পড়ে অনুপম। কথাগুলি অবশ্য রেলের যুগেরই কথা, কিন্তু চোখের মধ্যে কালিদাসের যুগের বা তারও আগের কালের সেই মেঘের দিকে তাকিযে থাকা দুটি চক্ষুর ব্যথাই যেন দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম প্রশ্ন করে—পরেশবাবু কি সত্যিই দূরের কোন স্টেশনে বদলি হযে যাবার চেষ্টা করছেন?

রেণু বলে—হ্যাঁ।

অনুপম—তাহলে?

কোন উত্তর দেয় না রেণু। আনমনার মতো রামটেক পাহাড়ের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। জমাট মেঘের মতো দেখতে রামটেকের মাথার উপর দিয়ে যেন শ্বেতহংসের পালক দিয়ে তৈরি একটা মেঘ আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। ডুবন্ত সূর্যের গায়ের রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো আভা এসে পড়েছে সাদা মেঘের উপর।

অনুপম বলে—তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল রেণু।

উত্তর না দিয়ে রেণু আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পুবের পাহাড়টার দিকে তাকিযে থাকে। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেন অদৃশ্য একটা রুষ্ট মেঘ গর্-গর্ শব্দ করছে। ছুটে আসছে ডাউন এক্সপ্রেস। ইঞ্জিনের ধোঁয়া একটা ক্রুদ্ধ লালরঙা আলেযার মতো দপ দপ করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে।

অনুপম বলে—দেখা হয়েছিল, কিন্তু কথা না হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

রেণু হঠাৎ বলে—আপনি আমার উপর রাগ করেন কেন? বাবাকে বললেই তো পারেন।

অনুপম—বলতে পারি, যদি তুমি সাহস দাও।

রেণু—বলুন, কি সাহস দেব ?

অনুপম—বলো, তোমার একটুও আপত্তি নেই।

রেণু—আপনার কি মনে হয় যে, আমার আপত্তি আছে ?

অনুপম—আমার এই পঁচাশি টাকা মাইনের চাকরি, তার ওপর এখনো পার্মানেন্ট হইনি !

রেণু—ওসব কথা আমার মনেই আসে না।

অনুপম—বলো, সত্যিই আমাকে তোমার ভাল লাগে ?

রেণু—বলবো না। যদি এখনো না বুঝে থাকেন, তবে বললেও কোনদিনই বুঝতে পারবেন না।

রেণুর একটা হাত ধরবার জন্য অনুপমের হাতটা হঠাৎ চঞ্চল হয়েই আবার শান্ত হয়ে যায়। চোখে পড়ে, অফিসঘরের বাইরে প্ল্যাটফর্মের উপরেই চেয়ারে বসে আর ফাইল হাতে নিয়ে পরেশবাবুও যেন রামটেক পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্য এইদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অনুপমের ডিউটির সময়ও হয়ে এসেছে, বড়জোর আর পাঁচ মিনিট বাকি।

বিব্রতভাবে অফিসঘরের দিকে ফিরে আসতে থাকে অনুপম। ওদিকে নাইডুর কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে নাইডুর স্ত্রী অনেকক্ষণ থেকে রেণুকে ঘুসি দেখিয়ে ঠাট্টা করছিল। ছোট ওভারব্রিজের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে, বেড়াতে বেড়াতে নাইডুর কোয়ার্টারের দিকে চলে যায় রেণু।

এসেছেন ডিভিসনাল ডেপুটি, সুলতানপুর স্টেশনের জীবন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে স্টেশনমাস্টার পরেশবাবু পর্যন্ত সকলেই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠ, পরিচ্ছন্ন পোশাক, সময়-নিষ্ঠ ও কর্মব্যস্ত।

ডিভিসনাল ডেপুটি সাহেব হলেন মিস্টার মিটার অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মিত্র। বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। দেখতে সত্যিই বেশ সদাশয়। বেশ হেসে হেসেই কথা বলেন, চোখে অফিসারী-ভ্রূকুটি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্রকে উদারচেতাও বলা যায়। নিজের থেকেই ব্যবস্থা ক'রে নাইডু, যশোবন্ত আর যোশিকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় ব্যাডমিন্টন খেললেন। এবং নিজের থেকেই যেচে নেমন্তন্ন নিয়ে পরেশবাবুর বাড়িতে রাত্রিবেলা ভাত খেলেন। ডিভিসনাল ডেপুটি মিস্টার মিটারের আচরণে উপরওয়ালা অহমিকা একেবারে নেই বললেন চলে।

সুতরাং, পরেশবাবু তাঁর দাবি একটু মন খুলে বলতে সাহস পেয়ে গেলেন—বড়ই অসুবিধায় পড়বো, যদি আমাকে তাড়াতাড়ি, অন্তত খড়্গপুরের কাছাকাছি কোথাও বদলি না করে দেন।

—বদলি হবার জন্যে এত ব্যস্ততা কেন আপনার ? খড়্গপুরের কাছাকাছিই বা যেতে চাইছেন কেন ?

—বড় মেয়েটি অনেক বড় হয়ে উঠেছে, এইবার বিয়েটা আর না দিলেই নয়। পাত্রের খোঁজখবর নেওয়া অথবা মেয়ে-দেখানো, এই সব ঝঞ্ঝাটগুলো একটু সহজেই সেরে ফেলতে পারতাম, যদি বাংলাদেশের একটু কাছাকাছি জায়গায় থাকতে পেতাম।

হেসে ফেললেন শ্রীযুক্ত মিত্র—তাই বলুন।

ট্রের উপর চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট সাজানো, দু'হাতে ট্রে ধরে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে ঢুকে শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে ট্রে নামায় রেণু। তারপরেই হাত তুলে শ্রীযুক্ত মিত্রকে নমস্কার জানিয়ে পরেশবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরেশবাবু বললেন—এই হলো আমার বড়মেয়ে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই হাত তুলে রেণুকেও একটা ছোট নমস্কারে পাল্টা অভিবাদন জানান।

চা খেতে খেতে কেমন যেন হয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। কখনো মনে হয়, একেবারে আনমনা হয়ে রয়েছেন, কখনো চিন্তাকুল। পরেশবাবু একটা প্রসঙ্গ তুলতেই কথার মাঝখানে দু'একবার হাসলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, কিন্তু হাসিটাও যেন নিতান্ত খামকা একটা লজ্জায় এলোমেলো হয়ে গেল।

রেণু অন্য ঘরে চলে যাবার পরেও শ্রীযুক্ত মিত্র অনেকক্ষণ বসে রইলেন, পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ উপভোগ করার জন্যই নিশ্চয়। কিন্তু আলাপটাই বাদ পড়ল সবচেয়ে বেশি। দু'বার জল চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র। চাকরে এসে জল দিয়ে গেল। আর একবার সামান্য একটু মশলা চাইলেন শ্রীযুক্ত মিত্র—এই একটা এলাচ আর দুটো লবঙ্গ হলেই হবে। পরেশবাবুর ছোটমেয়ে বুলি এসে মশলার কৌটা শ্রীযুক্ত মিত্রের সামনে রেখে দিয়ে চলে গেল।

ঘরের দরজার দিকে শ্রীযুক্ত মিত্রের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ এক একবার যেন তৃষ্ণার্তের মতো ছুটে যায়। কখনো বা একেবারেই আনমনা হয়ে যেন নিজের মুগ্ধ মনের একটা কল্পনার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। দুটি বড় বেণী, বেণীর প্রান্তে নার্গিসের কুঁড়ি, একটা সুন্দর মুখ আর চোখের বড় বড় পাতা, আসমানী নীল একটা শাড়ি, আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে রেশমী জালির একটা ওড়না জড়ানো গায়ে। কল্পনাকেও মুগ্ধ করে দেবার মতো একটি মূর্তি বটে।

ওঠবার সময় শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—মনে রইল আপনার অনুরোধের কথা।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমারও একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। কিন্তু আজ আর কিছু বলতে চাই না। আমাকে এখনি রওনা হতে হবে, এই প্যাসেঞ্জারেই নাগপুর পৌঁছে দুপুরের আগেই একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।

এক সপ্তাহ পরেই আবার সুলতানপুরে দেখা দিলেন ডিভিসনাল ডেপুটি শ্রীযুক্ত মিত্র। এবার এসে ব্যাডমিন্টনও খেললেন না, এবং একটা ফাইলও স্পর্শ করলেন না। সারাটা দিন ইনস্পেকশন বাংলোর ভিতরে বসে আর শুয়েই কাটিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হবার আগেই বেড়াতে এলেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ডাক দিলেন পরেশবাবুকে এবং কিছুক্ষণ বেড়াবার পর প্ল্যাটফর্মের উপরেই দু'জনে দুটি চেয়ারে বসলেন গল্প করবার জন্য।

শ্রীযুক্ত মিত্র বললেন—সেই অনুরোধের কথাটাই বলতে চাইছি।

—বলুন।

—আপনাকে এখান থেকে বদলি না করেও যদি আপনার মেয়ের বিয়ের একটা সুযোগ এনে দিই, তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে?

—কিছুই না।

—আপনি কি জানেন যে, পাঁচ বছর হলো আমার স্ত্রী বিগতা হয়েছেন।

—না, তা তো জানতুম না।

—আমার কোন ছেলেপিলেও নেই।

—তাহলে দেখছি আপনি নিতান্তই একেবারে নিতান্তই একটা বেদনার মধ্যে রয়েছেন।

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আর এভাবে থাকতে চাই না।

—থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি।

—তাই অনুরোধ, আমার সঙ্গে যদি আপনার মেয়ের বিয়ে দিতেন, তাহলে আমি সুখী হতাম।

পরেশবাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন—আপনি অনুরোধ বলছেন কেন, এ আপনার অনুগ্রহ। আমি সত্যিই এতটা আশা করতে পারিনি। আমার কোনই আপত্তি নেই, থাকতেও পারে

না।

শ্রীযুক্ত মিত্র—আপনার মেয়ের কি কোন আপত্তি থাকতে পারে ?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েন পরেশবাবু। কুণ্ঠিতভাবে বলেন—আমার তো মনে হয় না যে, রেণুর মনে কোন আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু...।

হঠাৎ যেন ভাষা হারিয়ে চুপ করে রইলেন পরেশবাবু। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে, পাওয়ার হাউসটাও ছাড়িয়ে মস্ত বড় দেওদারের ছায়ার মধ্যে যে কালো পাথরটা পড়ে রয়েছে, সেই দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে পরেশবাবুর।

কালো পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূর্তি, ঠিক সেই রকমই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বামটেক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে। ছোকরা তারবাবু অনুপম, আর স্টেশনমাস্টারের বড়মেয়ে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র প্রশ্ন করেন—চুপ করে গেলেন কেন ?

পরেশবাবু বলেন—না না, রেণুর মনে কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। আমার মেয়ে সে রকমের মেয়ে নয়। তবে...।

শ্রীযুক্ত মিত্র—আবার চুপ করলেন যে ?

পরেশবাবু—তবে, এইমাত্র কিছুদিন হলো একটি ছেলের সঙ্গে রেণুর আলাপ-পরিচয় হওয়ায় মাঝে মাঝে আমি দুশ্চিন্তা বোধ করেছি। যদিও ব্যাপারটা কিছুই নয়, সামান্য আলাপ-পরিচয় মাত্র, মনের ব্যাপার কিছু ঘটেনি।

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখটা হঠাৎ বড় বেশি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—সে সব তো আপনারই হাত, আপনি ইচ্ছে করলেই তো আলাপ-পরিচয়ের সুযোগটা বন্ধ করে দিতে পাবেন।

পবেশবাবু—পারতাম, কিন্তু পারিনি এই ভেবে যে, মিছিমিছি বাধা দিলে, যেটা চাইছি না সেটাই হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শ্রীযুক্ত মিত্র—এটাও ঠিক বলেছেন।

পরেশবাবু—আর আলাপ-পরিচয়ের যে সুযোগ বন্ধ করে দেবার কথাটা বললেন, সেটার উপর আমার চেয়ে আপনারই বেশি হাত।

বিস্মিত হন শ্রীযুক্ত মিত্র—কি রকম ?

পরেশবাবু—ছেলেটি হলো, সুলতানপুর স্টেশনেরই সিগন্যালার ক্লার্ক।

শ্রীযুক্ত মিত্র—নামটা কি ?

পরেশবাবু—অনুপম বসু।

শক্ত একটি অফিসার-সুলভ ভ্রূকুটি নির্মম ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে শ্রীযুক্ত মিত্রের কপালের চামড়া কুঞ্চিত করে দিয়ে। তারপরেই বলেন—তিন দিনের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তিন দিন পরেই ডিভিসনাল অফিস থেকে অর্ডার এল, সিগন্যালার ক্লার্ক অনুপম বসুকে বদলি করা হয়েছে মথুরাগঞ্জ। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মথুরাগঞ্জে এসে কাজে যোগ দিতে হবে। জরুরী অর্ডার। মথুরাগঞ্জ হলো সুলতানপুর থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরের এক স্টেশন।

রওনা হবার আগে, এবং এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠবার আগে প্ল্যাটফর্মের উপর অনেকক্ষণ ছটফট করেছিল অনুপম। একটা কথা বলে যাবারও সুযোগ পাওয়া গেল না। কাল রাতেই রেণুকে সঙ্গে নিয়ে নাগপুর চলে গিয়েছেন পরেশবাবু, ডাক্তারের কাছে রেণুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। কিন্তু চোখ পরীক্ষা করিয়েও আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তো অনায়াসে ফিরে আসতে পারতেন। যা কল্পনা করতেও পারছে না রেণু, এসে দেখবে তাই সত্য হয়ে গিয়েছে। না

বলে-কয়ে বিশ্বাসঘাতকের মতো লোকটা চলে গিয়েছে। জরুরি অর্ডার এসে গিয়েছে। কি হিংস্র অর্ডার।

এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরে বসেও নিজেকে শান্ত করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে অনুপমের। নাগপুরের দিক থেকে আগন্তুক প্যাসেঞ্জার ট্রেনটাও হু হু শব্দে এক্সপ্রেসের পাশ কাটিযে সুলতানপুরের দিকে চলে গেল। একবার শুধু চমকে উঠেছিল অনুপম। রেশমী জালিব ওড়না গায়ে জড়ানো একটা মূর্তি কি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটা কামরার আলোর সঙ্গে চকিত বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়ে উধাও হয়ে গেল ? চোখ পরীক্ষা করিয়ে নাগপুর থেকে ফিরে যাচ্ছে রেণু ? তাই তো মনে হলো। ইস, যদি আর তিনটে ঘন্টা আগে ট্রেনটা সুলতানপুবে ফিরত !

যাই হোক্, মথুরাগঞ্জ থেকে অনুপমকে আর সুলতানপুরে ফিরে আসতে হয়নি। সপ্তাহ পরে নয়, এক মাসের মধ্যেও নয়। এসেছিল প্রতি সপ্তাহে একটি করে চিঠি, সে চিঠির সদ্‌গতিও করে দিযেছেন পরেশবাবু, ছিড়ে কুচি কুচি করে আর পায়ের পাশে বাজে-কাগজেব ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

অপরাহ্ণ বেলায় প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশেব বুকে আস্তে আস্তে ভেসে-যাওয়া সাদা মেঘ আর কালো মেঘগুলিকে আবও দেখেছে রেণু। একদিন দুদিন তিনদিন। তারপর আব নয়। মেঘগুলিও তার নাগাল পাবে না, বোধহয এমনই একটা দূবের জগতে গিয়ে বসে আছে মানুষটা ? সহ্য করছেই বা কি করে ? কালিদাসেব যক্ষও তো মেঘের কাছে মনের কথা না বলে থাকতে পাবেনি। কিন্তু এই মানুষটা নিজেকে এত নীরব করে রাখতে পারছে কেমন করে ? এত সহজে আর এত শিগগির সবই ভুলে গেল, একটা চিঠিও যে লিখতে পারল না, সে মানুষ মেঘদূতেব গল্প বলে কি আনন্দ পেত, এ রহস্য এখন আব বুঝে উঠতে পাবে না রেণু।

জরুবি অর্ডাবি এল, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চলে যেতে হবে,—এটাই বা কোন রহস্য ? চিন্তা করে রেণু।

এক মাস, দু'মাস, তিন মাস। এরই মধ্যে ঘটনাগুলি একে একে বদলে যেতে শুরু করে। শ্রীযুক্ত মিত্র প্রতি মাসেই অন্তত দু'বার করে এসেছেন। পবেশবাবুব সঙ্গে অনেক আলোচনা আর অনেকবার আলোচনা হয়েছে তাঁর। এর মধ্যে বেশিব ভাগই বেলের কাজের বাইবেব বিষয় নিয়েই আলোচনা।

রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরেও আর মেঘ দেখা যায় না। নাইড়ুর কোয়ার্টারে মেযেদেব তাস খেলাব আসর আবার জমে ওঠে। রেণুকে দেখা যায সেই আসরে। সুলতানপুরেব সন্ধ্যাগুলি সেই অনেকদিন আগের মতোই এদিক-ওদিক বেড়িয়ে ঘোরার আনন্দে কেটে যেতে থাকে। এবং পরেশবাবু দেখে খুশি হন, রেণুর মনের ভিতরে কোন মেঘ যদি আগে দেখা দিয়েও থাকে, তবুও সে মেঘ এখন আর নেই। রামটেক পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড আকাশ ক'দিন থেকে একেবারে ঝকঝকে ও পরিষ্কার।

আর বেশিদিন দেরি হয়নি। এই আশ্বিনটা ফুরিয়ে যাবার আগেই, সুলতানপুরের স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টার ফুল আর পাতা দিয়ে একদিন সাজানো হলো। সারারাত আলো জ্বলল। ভাড়াটে বাঁশিওয়ালা দিনরাত বাঁশি বাজিয়ে সুলতানপুর স্টেশনের হৃদয়ে উৎসব জাগিয়ে তুলল। তারই মধ্যে বরবেশে দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত মিত্র, এবং বধূবেশে তাঁর পাশে বসল পরেশবাবুর বড়মেয়ে রেণু।

বিয়ের রাত ভোর হতেই শ্রীযুক্ত মিত্র প্রসন্ন মনে তাঁর নবপরিণীতা রেণুর মুখের দিকে

মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বলেন—চলো, আজ এই সকালেই রামটেক পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

রেণু বলে—চলো, কিন্তু বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নাও।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—জিজ্ঞাসা করেছি।

রেণু—কি বললেন বাবা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বললেন, হ্যাঁ, রেণুও রামটেক পাহাড়ের শোভা দেখতে খুব ভালোবাসে।

রেণু হাসে—আশ্চর্য, বাবা দেখছি এখনো মনে করে রেখেছেন। কিন্তু তবে কেন...।

কি বলতে গিয়ে আর কি-যেন ভেবে চুপ করে গেল রেণু। মুখের হাসিটাও অন্য রকমের হয়ে যায়।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—কি বললে রেণু?

রেণু—তবে কেন বাবা বদলি হতে চেয়েছিলেন?

শ্রীযুক্ত মিত্র হাসেন—ভাগ্যিস আমি ওঁর বদলি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

রেণু—বদলি করা বা না-করার কর্তা কি তুমিই?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—চলো রেণু, আর দেরি না করে...

আরও কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রের হাতের আঙুলে হীরে-বসানো দুটো আংটির দিকে দুটো নিষ্পলক চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ চোখের তারা দুটো চমকে ওঠে, যেন অদ্ভুত একটা কিছু এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে রেণু।

আর কোন সন্দেহ নেই, বোঝা গেল এতদিনে, জরুরি অর্ডারের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ঐ হীরার আংটি পরানো আঙুলগুলির মধ্যে। ঐ হাতেই সই করেছে সেই ভয়ানক জরুবি অর্ডার, যে অর্ডারে রামটেক পাহাড়ের মাথার উপরে আকাশের সব রঙিন মেঘ শুকিয়ে উবে গেল। যাক্...। ব্যস্তভাবেই রেণু বলে—না, আর দেরি করেই বা লাভ কি?

রামটেক পাহাড়ে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হয়নি, আর উপরে উঠতে পা ব্যথা করলেও চারদিকের চোখ-ভোলানো শোভায় সে ব্যথাও ভুলে যেতে পারল রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামটেক পাহাড়ই হলো রামগিরি।

চমকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রেণু।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—এই রামগিরিতেই তপস্যা করতো শম্বুক। সে গল্প জান তো রেণু?

রেণু—একটু জানি।

শ্রীযুক্ত মিত্র উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করতে থাকেন।—বেচারা শম্বুক এখানেই তপস্যা করতো। এই মাত্র তার অপরাধ যে, সে শুধু তপস্যা করতো। মাত্র এই অপরাধেই রামচন্দ্র শম্বুককে একদিন হত্যা করলেন।

চুপ করে শুনতে থাকে রেণু। শ্রীযুক্ত মিত্রও কিছুক্ষণ যেন ভাবাভিভূত অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আবার নিজের মনের উৎসাহেই বলতে থাকেন।—উঃ, ছেলেবেলায় দেখা সেই যাত্রা-গানের কথাই মনে পড়ছে, কি করুণ সেই কথাগুলি!

রেণু—কার কথা?

শ্রীযুক্ত মিত্র—শম্বুকের কথা। রামের বাণে আহত হয়ে মরে যাবার আগে শম্বুক বলেছে—দোষী নাহি জানিল কি দোষ তাহার!

রেণু বলে—চলো, এবার নেমে যাই।

শ্রীযুক্ত মিত্র আরও উৎসাহিত হয়ে বলেন—কিন্তু রামগিরি আজও শম্বুকের সেই ব্যথার চিহ্ন লুকিয়ে রেখেছে।

হাতের স্টিক দিয়ে পাহাড়ের গায়ের মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে থাকেন শ্রীযুক্ত মিত্র। মাটির একটা বড় ঢেলা উপড়ে আসতেই দেখা যায়, কাঁচা আলতার মতো লাল রঙে মাখা রয়েছে রামটেক পাহাড়ের ভেজা-ভেজা মাটি।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—লোকে বলে, শম্বুকের রক্ত এখনো রামটেক পাহাড়ের মাটিতে লেগে রয়েছে, এখনো শুকিয়ে যায়নি!

শ্রীযুক্ত মিত্রের মুখের দিকে গভীর কৌতূহলের একটি দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে বেণু। তার মধ্যে শাণিত একটা প্রশ্নের তীক্ষ্ণ মুখ যেন চিকচিক করে জ্বলছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বেণু—তুমি কি এই গল্পটা বিশ্বাস কর?

অপ্রস্তুতভাবে শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন—গল্প হলো গল্প, এর মধ্যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কি আছে?

বেণু—গল্পটা ভাল না মন্দ?

শ্রীযুক্ত মিত্র—বড় করুণ।

বেণু—বলতে বেশ কষ্ট হয়?

শ্রীযুক্ত মিত্র—হ্যাঁ।

বেণু—তবে বলতে পারলে কি করে?

বিব্রতভাবে প্রশ্ন করেন শ্রীযুক্ত মিত্র—অ্যাঁ? কি বললে?

বেণু বলে—চলো নেমে যাই।

ভাট তিলক রায়

ভাট তিলক রায়ের কথা আমরা এখনো ভুলে যাইনি। তাকে আমরা ভাল করে চিনতাম, তার মুখে অনেক গান শুনেছি। মাঝে কিছুদিন সে বহুরূপীর পেশা ধরেছিল। সে সময়ের একটা ঘটনা আজও মনে পড়ে। গয়লানী সেজে তিলক রায় ব্রজবাবুর বাড়ির বারান্দায় এক হাঁড়ি দই নিয়ে এসে বসেছিল, আমরা পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে জটলা করে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। ব্রজবাবুর মত গম্ভীর রাশভারী মানুষের কাছে এত বড় একটা ফস্টি নিয়ে তিলক রায় কোন্ সাহসে এসে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে দরদস্তুর করলেন, দই চেখে দেখলেন, তারপর এক সের দই কিনলেন। দামটা হাতে নিয়েই সেই কৃত্রিম গয়লানী এক টানে তার মাথার পরচুলা আর নাকের নথ ফেলে দিয়ে তিলক রায়ের মূর্তিতে দেখা দিল। হাত পেতে বকশিশ চাইলো। ব্রজবাবু হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা প্রচণ্ড খুশির উচ্ছ্বাসে তাঁর জমাট গাম্ভীর্য ধুলো হয়ে উড়ে গেল। একটি দশ টাকার নোট তিলক রায়ের হাতে ফেলে দিলেন।

বিষুয়া পরবের সময় ভাট তিলক রায় গেরুয়া পাগড়ি পরে কালীবাড়ির চত্বরে এসে বসতো। ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু ছড়া কেটে আর গান গেয়ে পার করে দিত তিলক রায়। গানের ভাষাটাও ছিল অদ্ভুত—না ভাখা না ঠেট হিন্দী, না খাড়ি বোলি, না বাংলা, না মগহি। মনে হতো ঐ সব ভাষা মিলিয়ে যেন তিলক নিজস্ব একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা মুগুারী কুরুম্ কারুমও থাকতো। আজ তিলক রায় বেঁচে থাকলে তার কাছে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করার মতো একটা উপাদান পাওয়া যেত। এমনও হতে

পারে, তিলক রায়ই আমাদের দেশের সেই অখ্যাত মনস্বী, যে প্রথম এই বহুবচনাবৃত ভারতের উপযোগী একটা এস্পারান্টো তৈরি করেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারলো না। তিলক যখন মাঝে মাঝে কাঁচা হিন্দী ও বাংলা মিলিয়ে তার গাথাগুলির ভাষ্য করে আমাদের বোঝাতো, তখন আমরা সবই বুঝতে পারতাম আর মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ভাট তিলক রায়ের গানের মধ্যে কী না ছিল ? বুনডুটুক্কুরু গুহার রাজার ছেলে মুলটুংলা এক হরিণীর প্রেমে পড়ে সারা অরণ্য ঢুঁড়ে ফিরছে—চোখে ঘুম নেই, মুখে জল নেই। দূর্বা ঘাসের পোশাক গায়ে দিয়ে নদীর ধারে চুপ করে শুয়ে থাকে—যদি ভুলে ভুলে সেই ছলনাসুন্দরী হরিণী একবার কাছে চলে আসে। রাজা হাতির দাঁতের কুডুল নিয়ে সদলবলে বের হয়েছেন। হয় সে হরিণী, নয় এই উদ্‌ভ্রান্ত কুপুত্র—দু'জনের একজনকে পেলেই হবে—নিজের হাতে সংহার না করে তিনি আর শান্ত হবেন না।

ভাট তিলক রায়ের গানের এই রূপকথার আস্বাদ আমাদের তখন কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করে দিত। তিলকের গানের সেই চরম অবাস্তব কত সত্য বলে মনে হতো। তার মধ্যে ভেবে দেখবার মতো কোন প্রশ্নই থাকতো না। তিলকের গান আর ছড়ার প্রতিটি পদের সঙ্গে আমাদের বিস্ময় এক ইন্দ্রজালের জঙ্গলে দিশেহারা হযে ঘুরে বেড়াতো। আমবাও যেন মনে মনে ঘাসের পোশাক পরে সঙ্গে সঙ্গে নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকতাম, কতক্ষণে সেই হরিণী এসে পৌঁছয়। বুনডুটুক্ কুরু কথাগুলি এক একটি টোকা দিয়ে আমাদের বোধরাজ্যের কুযাসার মধ্যে যেন ছোট ছোট এক-একটি সূর্য জ্বালিয়ে দিত।

আজ বড় হয়ে ভাট তিলক রায়ের রূপকথার একটা অর্থ বুঝতে পাবি। বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। তিলক রায় কি সেই প্রাগৈতিহাসিক বেদের শ্রুতিধর, যখন মানুষ আর পশু একই অরণ্যের জঠরে প্রতিবেশীর মতো থাকতো ? তিলক কি সেই পুরাকল্পের মানুষের সংসারে প্রথম বিজাতীয় এই প্রণয়ের কাহিনীটি শুনিযেছিল ? বুনডুটুক্কুরু গুহার যুবরাজ মুলটুংলা কি সে যুগের ওথেলো আর সেই শৃঙ্গবতী হরিণী কি তার ডেসডেমোনা ? আজ অবশ্য অনেক মাথা ঘামিযে—এথ্‌নোলজী আর সাইকো-এনালিসিসের প্রযোগ বিয়োগ করে এই তত্ত্বটা বুঝে খুশি হচ্ছি। কিন্তু প্রথম যখন শুনেছিলাম, তখন ভাট তিলক রায় ছিল হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা আর আমরা ছিলাম ছেলের দল।

আমাদের মুগ্ধাবস্থা হঠাৎ চম্‌কে উঠতো। তিলক অন্য একটা গাঁথা গাইতে শুরু করে দিত। এটা আবার অন্য ধরনের। এই গাথার কথা কাহিনী ও সুরে সেই নিশির ডাকের মতো আহ্বান ছিল না। কথাগুলি আমাদের হাতে হাতে যেন এক একটি তলোয়ার ধরিতে দিত।—কানহিল ডালটন সাহেবের পল্টন পালামৌ কেল্লা ঘিরে ধরেছে। মুহুর্মুহু তোপ পড়ছে। ফটকের মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এক একটা শওয়ারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ফটকের ওপর। কালো কালো কোল তীরন্দাজ আর তলোয়াররাজ রাজপুতেরা দলে দলে ফটকের মুখে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হটবে না। খাড়া দাঁড়িয়ে লড়ছে আর মরছে।

মিউটিনির সর্দার রাজার খুড়ো। থুড়থুড়ে বুড়ো। ফটক সামলাতে যখন আর কেউ নেই, কানহিল ডালটন যখন পল্টন নিয়ে কেল্লায় ঢুকতে চলেছে, ঠিক সেই সময় সমস্ত কেল্লাটা যেন শেষ বারের মতো হুঙ্কার ছাড়লো। দেখা গেল, এক আশি বছরের লোলচর্ম বুড়ো রাজপুত তার মাথার পাগড়িটাকে ঢালের মতো এক হাতে তুলে আর এক হাতে তলোয়ার ঘুরিয়ে মত্ত সিংহের মতো যেন কেশর ফুলিয়ে, নাচতে নাচতে, হুঙ্কার দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যেন একটা মৃত্যুর হোলি খেলে নিয়ে রাজার খুড়ো, থুড়থুড়ে বুড়ো, সেইখানে ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে রইলো।

ভাট তিলক রায় মারা গেছে অনেকদিন। আজ মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে যেন ইতিহাসের

প্রেতাত্মাটি সরে গেছে। যুগে যুগে কত ঘটনা দেখা দিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক মানুষ আমরা, ইতিহাসের জীব হয়েও আমরা তার খপ্পরে থাকি না। আমরা বদলে যাই : আজ যে ব্যথায় আমরা কাঁদছি, কাল তা শুধু স্মৃতি হয়ে যায়, পরশু সেই স্মৃতি হয়তো আমাদের শুধু হাসাতে থাকে।

কিন্তু ভাট তিলক ছিল যেন এক নিদ্রাহীন যখ। অতীতের যত পাপ-তাপ, আনন্দ-বিষাদ, প্রেম প্রণয় ও লজ্জা, শত্রুতা প্রতিহিংসা ও প্রতিজ্ঞাকে সতর্ক পাহাড়ায় সে আগলে ছিল। যা বিস্মরণীয়, তাকে সে ভুলতে দেয়নি। যা ক্ষমার্হ, আজও সে তাকে ক্ষমার যোগ্য হতে দেয়নি। যে গ্লানি আমরা ভুলে গেছি, সেই গ্লানিকে তিলক বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেই কবেকার সভ্যতার হরিণী-প্রেমবিধুব বনবাসের লজ্জা আর এই সেদিনের কার্নহিল ডালটনেব হাতে রাজপুত বিদ্রোহীর চরম শাস্তির জ্বালা—তিলক রায় এক মৃত যুগের শবাধার থেকে প্রেতের মতো উঁকি দিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

আমরা আর একটু বড় হয়েছি তখন, শুনতে পেলাম তিলক রায় শহর ছেড়ে দেশে চলে গেছে। আমবা শুনেছিলাম লাল্‌কি নদীর ওপর একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরি হচ্ছে, নিমিয়াঘাটের কাছে। তিলক রাযের বাড়ি নিমিয়াঘাট থেকে কিছু দূরে। টাট্টু ঘোড়ায চড়ে গেলে মাত্র আধ ঘন্টার সফর।

কলকাতার একটা কোম্পানী জ্যাকব এন্ড জ্যাকব, সেই বাঁধটাব কন্ট্রাক্ট নিযেছে। জায়গাটার জরিপ হয়ে গেছে। মালপত্র আসছে, কুলি কারিগর আর ইঞ্জিনিযাবেবা আসছে। তিলক রায়ের মনের মধ্যে সজীব ইতিহাসের প্রেতটা বোধহয় সতর্ক হযে উঠলো। বহুরূপীর পেশা ছেড়ে দিল তিলক। শহরে ছড়া গাইতে আর আসে না, নিমিযাঘাটের আশেপাশে যত গাঁ আছে, সব জনপদেব কানে কানে তিলক এক সাবধান বাণী শুনিযে বেড়াতে লাগলো।—ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরি করতে যারা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি ? বাঁধ তৈরি কি এমনিতেই হয়, লাল্‌কি নদীর ঢল সামলাবে সিমেন্ট আর লোহার কযেকটা দরজা ' কেউ বিশ্বাস করো না। একশোটি নরবলি না দিলে লাল্‌কি নদী কখনই তুষ্ট হবে না। ছেলেধরার দল ঘুবছে, বাঁধ-কোম্পানী টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন মাঝরাত্রে হাত-পা বেঁধে বলি দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। ঐ যে একটা নতুন থাম তৈরি করেছে, ঐখানেই বলি দেওয়া হয়। বলির আগে আফিং খাইযে দেয়, কেউ বুঝতেও পাবে না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কি পরিণাম হবে।

নতুন নতুন ছড়া বেঁধে তিলক রায় তাব বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগল।—ইঞ্জিন এসেছে, কত রকমের কলকব্জা আসছে। কিন্তু কী সাধ্য আছে তাদের লাল্‌কি নদীর ঢল বেঁধে দেবে ? আগে নরবলি হবে, তবেই কল চলবে। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই। অতএব সব গাঁয়ের মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে যাও। কেউ কুলির খাতায় নাম লিখিও না, সোনার মোহর মজুরি দিলেও না।

এসব খবর আমরা তিলকের মুখেই শুনেছিলাম। বিষুয়া পরবেব দিন একবার শহরে আসতো তিলক। তিলকের চেহারাটাও কেমন পাগলা গোছের হয়ে গিযেছিল। চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা সংশয়ে উদ্বেল হয়ে থাকতো। চুপি চুপি বলতো—ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে খোকাবাবু। নিমিয়াঘাটে লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরি হচ্ছে। কখন যে গরীবের প্রাণটা চলে যায় ঠিক নেই !

আমরা বলতাম—কেন ?

তিলক—এক একটি থাম উঠছে, আর পাঁচটা মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

আমরা—কেন ?

তিলক—নরবলি দিতে হচ্ছে, নইলে মাটিতে থাম ধরবে কেন ? লাল্‌কি নদীর রাগ কি এমনিতেই শান্ত হবে ?

তিলক একটা ছড়া গেয়ে শোনালো। এই গাথা সে কোন উত্তরাধিকার হিসাবে পায়নি, এটা তার নিজেরই রচনা। তিলক রায়ের গাথার ঝুলিতে যুগ-যুগান্তের ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে। এইবার নতুন একটা ক্ষোভ তার সঙ্গে যোগ হলো।

আমরা গল্প শুনেছিলাম, গ্রান্ড কর্ড লাইন যখন তৈরি হয়, তখন কিছু দিন হাতির উপদ্রবে ট্রাফিক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। হাতিরা তাদের জঙ্গলে এই কলকব্জার অনধিকার প্রবেশ ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তারা দল বেঁধে লাইনের ওপর বসে থাকতো, কখনো বা এসে শুঁড় দিয়ে লাইন উপড়ে ফেলে দিত।

তিলক ভাট যখন তার সেই বড় বড় চোখ কুঁচকে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল, তখন আমাদের এই হাতিদের রাগের গল্পটা একবার মনে পড়েছিল। তিলক রায়ের চোখে যেন সেই রকম একটা আক্রোশ।

তার কিছুদিন পরে আমরা শুনে শিউরে উঠলাম, নিমিয়াঘাটের কাছে কোন্ একটা গাঁয়ে তিনটে ছেলে-ধরাকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কারা মেরে ফেলেছে। একটা পুলিশ ফৌজ নিয়ে এস-পি সেই দিনই নিমিয়াঘাট রওনা হয়ে গেলেন।

তার দু'দিন পরে শুনলাম ছেলেধরা নয়, তিনটে কুলি-রিক্রুটারকে মেরেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সদরে আনা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই কেমন একটা বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল—এই প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্রে তিলক রায়ও থাকতে পারে। তাই স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা সেসন জজের আদালতের ভিড়ের মধ্যে এসে ভিড়ে পড়তাম। উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতাম, আসামীদের মধ্যে তিলক আছে কি না। না, তিলক রায় নেই। চার-পাঁচজন গাঁয়ের লোক তারা, তাদের কাউকে আমরা চিনি না।

তিলক রায়কে আসামীদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে আমাদের একটা উদ্বেগ শান্ত হতো, একটু খুশি হতাম। কিন্তু ঘটনাটা আবার একটু কেমন পানসে হয়ে যেত আমাদের কাছে। এর মধ্যে তিলক রায় থাকলেই যেন ভাল হতো। হিরো হিসাবে তিলক রায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে একটু খাটো হয়ে যেত।

আরও বড় হয়েছি। তিলক রায়কে আরও কয়েকবার দেখেছি। তখন লাল্‌কি নদীর বাঁধ রচনার মধ্যপর্ব আরম্ভ হয়েছে। বড়মামার সঙ্গে নিমিয়াঘাটের অফিস কোয়ার্টারে থাকি। সারদিন ঘুরে ফিরে বাঁধের কাজ দেখতাম। স্মৃতি থেকে সেদিনের অনুভবের কিছুটা, আর আজকের বিচার দিয়ে তার পরিশিষ্টের কিছুটা বলতে পারা যায়।

তিলক রায়ের বাণী ব্যর্থ হয়নি। নিমিয়াঘাটের কাছাকাছি কোন গাঁ থেকে কোন কুলি তখনো এই বাঁধ তৈরির কাজে খাটতে আসেনি। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তখনো তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে। কিন্তু তিলক রায় আসে মাঝে মাঝে। গুপ্তচরের মতো যেন সে ছদ্মবেশে বাঁধের কীর্তি দেখে যায়। দেশী মজুর কেউ নেই, সবই ছত্রিশগড় থেকে এসেছে। কেরানীরা সবাই বাঙালী। ইঞ্জিনিয়ারেরা বেশির ভাগ সাহেব। মিস্ত্রী আছে সব জাতের লোক—পাঞ্জাবী পাঠান আর চাটগেঁয়ে। তিলক রায় সবার সঙ্গে খাতির জমায়, নানারকম প্রশ্ন করে। তার সন্দেহ দূর হয় কিনা বোঝা যায় না। এমনি করেই মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দেয় তিলক—তারপর আবার চলে যায়।

আমাকে একদিন দেখতে পেয়ে চিনতে পারলো তিলক। তিলক খুশি হয়ে ও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। —আপনি এখানে কেন দাদাবাবু?

—বড়মামা এখানে আছে যে।

—আপনার বড়মামা? তিলক চিন্তিতভাবে তার স্মৃতি হাতড়ে বড়মামার পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো।

আমিই সাহায্য করলাম। —লালকুঠির জিতেনবাবুকে মনে নেই, তিনিই আমার বড়মামা।

তিলক খুশি হয়ে উঠলো। —ওঃ হো, চিনতে পেরেছি। চলুন দাদাবাবু, তাঁকে একটা আদাব জানিয়ে আসি।

বড়মামাকে অভিবাদন জানিয়ে তিলক রায় মেজের ওপর বসে পড়লো। তারপর বললো—একটা কথা আমার মতো বোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন বড়বাবু, এই বাঁধ তৈরি হয়ে কি হবে? কারও কোন ভাল হবে কি?

উত্তরে বড়মামা যা বললেন, তাতে তিলক শুধু হাঁ করে রইল, যেন গিলতে পারছে না কিছু।

—বলিস কি তিলক? দশ বছর পরে নিমিয়াঘাটকে আর চিনতে পারবি? এখান থেকে চারটে পাকা সড়ক বের হবে—চোস্ত ম্যাকাডাম করা সড়ক। মীটার-গেজ রেললাইন বসবে। এরই মধ্যে সিমেন্টের কারখানা খোলার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গেছে। বাঁধটা একবার শেষ হয়ে নিক তো, তখন বিরাট একটা পাওয়ার স্টেশন হবে এখানে। তিনটে জেনারেটর বসবে, সঙ্গে এক জোড়া টারবাইন। ছেষট্টি হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুটে যাবে এখান থেকে দশ মাইল পর্যন্ত—ডবল সার্কিট ট্রাঙ্ক লাইন ধরে।

বড়মামার কথার মধ্যে ভবিষ্যতের এক সুখী ও সম্পন্ন উপনিবেশের বিচিত্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল। তিনি আরও জাঁকালো করে শুনিয়ে দিলেন। —কত কারখানা খুলে যাবে দেখবি। বাঁশের জঙ্গল পড়ে রয়েছে, কাগজের মিল বসবে। একটা কাঁচের কারখানা খুলবে—এই যে পড়ে রয়েছে টন টন সাদা বেলে পাথরের ধুলো, এসব তখন গলে গিয়ে স্ফটিক হয়ে যাবে রে তিলক।

আমরা ছেলেবেলায় যেভাবে সম্মোহিতের মতো তিলক রায়ের গান শুনতাম, তিলক নিজেই আজ যেন সেইরকম একটা কিশোর কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে বড়মামার কথাগুলি শুনছিল। মনে হচ্ছিল, বড়মামাই একজন ভাট, তিলক একজন শ্রোতা মাত্র। আধুনিক যুগের এক ভাটের মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনছে স্বয়ং তিলক। তবুও তিলকের মুখে একটা বেদনার্ত ছায়া পড়েছিল যেন। ইতিহাসের প্রেতটা যেন ভবিষ্যতের এই ঔদ্ধত্য দেখে মনের দুঃখে মুস্‌ড়ে পড়ছে। তিলক চলে গেল।

তিলক আবার একদিন এল। জ্যাকব এন্ড জ্যাকবের নিমিয়াঘাট বারেজ কনস্ট্রাকশনের একটা প্রস্পেক্টাস হাতে নিয়ে বড়মামা তিলক রায়কে নানা তথ্য পড়ে পড়ে শোনালেন। তিলক কি বুঝলো তা সেই জানে। বড়মামা পড়ছিলেন নিজের আগ্রহের আবেগে। নিজেকে উৎফুল্ল করার জন্যই যেন তিনি নতুন ধরনের একটা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছিলেন। কারণ আছে, বড়মামা কিছু শেয়ার কিনেছেন।

আজ তিলককে দেখে কেমন একটু শান্ত মনে হলো। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সব রোষ সংযত করে লাল্‌কি নদীর বাঁধকে যেন সে একটু সুনজরে দেখবার চেষ্টা করছে।

তারপরেই একদিন তিলক রায় এল। সেদিন সে আর একা নয়। শ'চারেক গাঁয়ের কুর্মি আর জোলা তার সঙ্গে এসেছে। সবাই সুবাধ্য ছেলের মতো কুলি আফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নাম লেখালো। নম্বরের চাক্‌তি আর কোদাল হাতে নিয়ে দল বেঁধে নতুন একটা মাটির

ধাওড়াতে গিয়ে সবাই উঠলো। আগামীকাল থেকেই ওদের কাজ শুরু হবে। শুধু আজকের দিনটা ওরা জিরিয়ে নিচ্ছে। শুকনো পাতা পুড়িয়ে বড় বড় হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে ওরা খেল। তখনো ওদের মনের সন্দিগ্ধ ভাবটা বোধহয় একেবারে কেটে যায়নি। এই নতুন ঘরের সুখ আজ ওরা অস্বীকার করতে পারছে না; তবু চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন যেন ঘনিয়ে আছে—এই সুখ সইবে তো?

লাল্‌কি নদীর বাঁধটা সত্যিই একটা কীর্তি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার ওপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিতান্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে এক-একটা কংক্রীটের চাঙড় তুলে নিচ্ছে—পরমুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনের ওপর স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটার নদীর ওপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটি আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখে একটা শাণিত দন্তুর হাসি। সমস্ত যন্ত্রযূথ যেন হাসছে।

ইঞ্জিনিয়াব ওভারসিয়ার আর সার্ভেয়ারের সংখ্যাই হবে একশোর ওপর। তাছাড়া ফিটার টার্নার লেদমিস্ত্রী, ওস্তাগর, বয়লারম্যান, ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কুলিমজুর সব নিয়ে হবে হাজারের ওপর। দূর ছত্রিশগড় থেকে এসেছে রোগা রোগা পুরুষ কুলি আর বেঁটে মজবুত চেহারার মেয়ে কুলি।

নিমিয়াঘাটের এই বেলেমাটির তেপান্তরে লাল্‌কি নদীর ধারে এক বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনী ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। পরেশনাথের ডাকবাংলোতে বসে নীচের দিকে তাকালে এই কুয়াশায় ঢাকা জনপদ অল্প অল্প দেখা যায়—নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রের মতো যেন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে; কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে।

সত্যি কথা, এও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটির জড়ত্বের বিরুদ্ধে। লাল্‌কি নদীর চওড়া খাত ধরে প্রতি মুহূর্তে এক বেগময় সলিলসম্ভার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুক্‌নো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক্‌চিক্ করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলেমাটির পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গেছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুরটি এইখানে জলবাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গেছে।

মানুষের বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে—আবাদ করলে ফলতো সোনা। নিমিয়াঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লাল্‌কি নদীর খামখেয়াল শান্ত করে দিতে হবে—এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রীটের বাঁধ দিয়ে। পনেরটি খিলান করা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌসুমী বৃষ্টি এই লাল্‌কি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, ফাল্গুনে হাজার মাইল দূরের হিমগিরির বরফগলা জল গড়িয়ে আসে কিন্তু সবই বৃথা হয়। এক অন্ধ বেগ সব জলভার লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙ্গা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গড়ে উঠছে বাঁধ—আট কোটি টাকার স্কীম। দেশবিদেশের মহাজনেরা সাত দিনে সাগ্রহে সব ডিবেঞ্চার লুটে নিয়ে গেছে।

এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, কম করে, সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গেছে, ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলের রহস্য জানা হয়ে গেছে। এই খাল দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে—উর্বরতার অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ

হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে, এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এইখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থজগতের বিরুদ্ধে—সমস্ত নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করে বুদ্ধির দাস করে রাখতে।

এরই মধ্যে বেনেদের জুয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে নয়, দূর কলকাতা ও লন্ডনের এক একটি দালালী হৌসে নিমিয়াঘাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাট্‌কা শুরু হয়ে গেছে। বেতারে খবর বিলি হয়—কাজ কত দূর এগিয়েছে। শেয়ার নিয়ে হানাহানি চলে। নতুন এক ঘোড়দৌড়ের জুয়ার আস্বাদে নিখিল বিশ্ব দালালী মস্তিষ্কে নেশা জমে এসেছে।

স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। নিমিয়াঘাটের এই সুন্দর ইষ্টাপূর্ত রূপ হঠাৎ বীভৎস হয়ে গেছে। সংগ্রামের সেই বুদ্ধির ঐক্য ঘুচে গেছে, দীপ্তি নিভে গেছে। এক আত্মবিচ্ছেদের বিষে শিবিরের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। শুনলাম, কন্ট্রাক্টর জ্যাকব এন্ড জ্যাকবের ক'জন অফিসার, গোটা দশেক ইঞ্জিনিয়ার আর বড়মামা ছাড়া সবাই ধর্মঘট করেছে। দশদিন থেকে কাজ বন্ধ।

সেদিনের ঘটনাগুলি আজও খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ে। দশদিন ধরে সেই ময়দানবের পুরী যেন নিঝুম হয়ে রইল। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে মাঠের উপর একটা গুর্খা ফৌজ ডেরা নিয়েছে। সাহেবের ফুলবাগানে রোজ একটা জটলা দেখা যায়। তার মধ্যে অফিসারেরা আছে, কয়েকজন মিস্ত্রী, ট্যান্ডেল আর সর্দারও আছে। বোধহয় মীমাংসার জন্য একটা বৈঠক বসে সেখানে।

বড়মামার কাছে শুনতাম, স্ট্রাইক তাড়তাড়ি না মিটলে একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে। আর মিলিটারী নাকি আসছে। নতুন লোক যোগাড়ের জন্য রিক্রুটারেরা বেরিয়েছে। কী বেয়াদব আর বেইমান এই মজুর মিস্ত্রী আর কেরানীগুলি! এমন ঠেঙ্গানি দিয়ে হাত পা ভেঙে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোথাও যেন আর রোজগার করবার আশা না থাকে, এখানে তো নয়ই।

কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজকে বড়মামা গালাগালি দিলেন। এই স্ট্রাইকের খবরটা তারা এরই মধ্যে রটিয়ে দিয়েছে। শেয়ারগুলির উঠতি ভ্যালু এরই মধ্যে ইনডিফারেন্ট হয়ে পড়েছে। এর পর নামতে আরম্ভ করবে। আমারও মনে হতো, এই স্ট্রাইক একটা বড় বেশি গোঁয়ার্তুমি। সামান্য কয়েক আনা মজুরির রেটের দাবী গ্রাহ্য হয়নি বলেই একেবারে কাজটা নষ্ট করে দিতে হবে, এ কী রকম ব্যবহার? একটু কৃতজ্ঞতা নেই? এক-এক সময় ভাবতে খুবই খারাপ লাগতো, এত বড় একটা কীর্তি অসমাপ্ত থেকে যাবে। এত বড় একটা উন্নতির স্কীম এইখানে এই জঙ্গলের মাঝখানে জল বালি আর পাথরের ওপর মরচে পড়ে থাকবে। কোনারকের মন্দির দেখেছি—একটা অসম্পূর্ণতার ব্যথায় সেই মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে আছে। কিন্তু সেটা খুব বেশি দুঃখ দেয় না। কোনারকের স্থাপত্যগরিমা যৌবন পর্যন্ত উঠেছিল, তার পরেই কোন্ এক দুর্ভাগ্যে শুধু তার রূপসজ্জা পূর্ণ করার সময়টুকু আর হয়নি। ভগ্নস্তূপও কত দেখেছি, গোয়ালিয়রের প্রান্তরে উজ্জয়িনীর গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কাঁটার ঝোপে ছেয়ে গেছে। দেখে তবু খুব বেশি দুঃখ হয় না। এক বৃদ্ধের কঙ্কালের মতো মনে হয়—জীবনের সব ভোগের মুহূর্ত পার হয়ে আয়ুক্রমের শেষ পরিচ্ছদে পৌঁছে তার মৃত্যু হয়েছে। এমন কিছু শোকাবহ ব্যাপার নয়। কিন্তু নিমিয়াঘাট ব্যারেজ লাল্‌কি নদীর বাঁধ যদি আজ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের কোন সার্ভেয়ার সত্যিই দুঃখে চমকে উঠবে—এক বিরাট কীর্তির শিশুদেহের এই চূর্ণাস্থি দেখে। অভিশাপ দেবে অতীতের এই মূঢ়দের যারা এই বাঁধকে অকালে হত্যা করলো—এই স্ট্রাইকওয়ালা মজুরদের।

স্ট্রাইকটা আমারও ভাল লাগছিল না। একটা দুর্বুদ্ধির চক্রান্ত বলেই মনে হতো। তারপর সত্যি করে একদিন আমিও বড়মামার মতো একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন ছটফট করে

উঠলাম। কারণ, যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্ষমার অবকাশ রইল না। হোক না মজুর আর কেরানী, যতই গরীবই হোক না কেন—ওদর বুদ্ধিতে পাপ ঢুকেছে। দেখলাম দুটো গার্ড তিলক রায়কে কাঁধে তুলে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে নিয়ে এল। তিলকের গায়ের জামাকাপড় সব রক্তে ভিজে গেছে—মাথায় একটা পটি বাঁধা। ধর্মঘটীরাই তিলককে মেরেছে। এই সর্ববিভাগীয় ধর্মঘটে শুধু তিলক রায়ের কুলির দল যোগ দেয়নি। যোগ দেবে কেন ? তিলক রায়ের দল খুশিই ছিল। দিন ছ'আনা হিসাবে তারা হপ্তা পায়, মেঠাই কাপড় কেনে, দৌড়ে দৌড়ে ঘন ঘন বাড়ি যায়, ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। বাড়ি থেকে পুঁটুলি বেঁধে চিঁড়ে নিয়ে আসে। কাজ করতে করতে যখন একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়, তখনি শালপাতা ভেঙে ঠোঙা তৈরি করে নেয়। লাল্কি নদীর বালি খুঁড়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বার করে। খেতে খেতে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির তোয়াজে ওরা নিজেরাও যেন চিঁড়ের মতো ভিজে যায়। তিলক রায়ের দল এই মজুরির দাবির লড়াইয়ে সামিল হয়নি। সিটি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠিক নিয়ম মতো কোদাল নিয়ে কাজে নেমে পড়ে।

কোম্পানীর গার্ডেরা আর একটি লোককে ধরে নিয়ে এল। একে আমরা আগে কখনো দেখিনি। ভদ্রলোকের ছেলে, বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না, চোখে চশমা আছে, গায়ে খদ্দরের চাদর।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন—তুমি কে হে জেন্টেলম্যান ? কোত্থেকে এসেছ ?

যুবকটি উত্তর দিল—আমি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমার পেশা। এখানে আমার বহু পেসেন্ট আছে।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার—আমাদের এখানে বুঝি ডাক্তার নেই ? তুমি এখানে ট্রেসপাস করতে এসেছ কেন ?

যুবক—আপনি চীফ জাস্টিস্ নন যে আমার বিচার করতে আরম্ভ করেছেন। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে পুলিশে খবর দিন। আদালতেই বিচার হবে আমি ট্রেসপাস করেছি কিনা।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটা বেত দেখিয়ে বললেন—আপাততঃ এইটাই হলো আদালত। এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করো আর কখনো আমার এলাকায় ঢুকবে না।

যুবক—আমার রোগী দেখতে আমি আসবই।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার—অল রাইট !

ডাক্তারকে গার্ডেরা ধরে কোথায় নিয়ে গেল বুঝলাম না। সমস্তদিন একটা আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো। সন্ধ্যাবেলা বড়মামাকে বললাম—কি ব্যাপার বড়মামা ?

বড়মামা—ওই ছেলেটাই এই স্ট্রাইকটা করিয়েছে।

রাত্রিবেলা একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামাকে একটা চাপরাশী ডাকতে এল। মজুরেরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলো ঘিরে ফেলছে। ইট আর পাথর ছুঁড়ছে। থেকে থেকে সেই ক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়ছে—ডাক্তারবাবুকো ছোড়্‌দো।

বড়মামা গিয়ে চিৎকার করে জনতাকে আশ্বাস দিলেন—ডাক্তারবাবু আমার কাছে আছে, ভাল আছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বিশ্বাস করো।

মাঠের দিক থেকে গুর্খা ফৌজের বিউগলের শব্দ শোনা গেল। বড়মামা হাতজোড় করে জনতাকে বললেন—ডাক্তারবাবুর জন্য আমি তোমাদের কাছে জামিন রইলাম। আমার কথা শোন, এখনি সরে পড় সব।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর ফটকটা আর কয়েকটা ফুলের টব ভেঙে দিয়ে ধর্মঘটি জনতা একটু মনের ঝাল মিটিয়ে সরে গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত একটা মানসিক উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। সকালবেলা উঠতে একটু দেরি হলো। একটা খবর শুনেই কিন্তু মনটা হাল্কা হয়ে গেল। স্ট্রাইক মিটে গেছে। বড়মামা সালিশী করে সব নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। চার আনা নয়, মজুরির রেট দু'আনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি আর কখনো এদিকে আসবেন না। ধর্মঘটি মজুরদের আর একটা দাবি স্বীকৃত হয়েছে—তিলক রায়ের কুলির দল নতুন রেটে মজুরি পেতে পারবে না। যা আগে পাচ্ছিল, তারা তাই পাবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এই সর্ত মেনে নিয়েছেন।

তিলক রায় লোকটা আর তার ভাগ্যটা চিরকালই হেঁয়ালির মতো। এইখানে একটু দুঃখ রয়ে গেল। আমাদেরই ছেলেবেলার ভাট তিলক রায়। ওর মনের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তা ছিল। তাই বড়মামার ব্যবস্থাটা ন্যায়োচিত মনে হলো না। বড়মামা আমার আপত্তি শুনে হেসে ফেললেন—তিলকটা একটা গবেট, ঠিক হয়েছে।

বাঁধের কাজ জোরে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার আগেই পিলারের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুনলাম, নতুন একটা এক্সক্যাভেটার এসেছে। বড়মামা খুব প্রসন্ন, শেয়ারের দাম চড়েছে।

ক'দিন পরেই তিলক রায় এসে মুখভার করে বললো—বড়বাবু, আমাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বড়মামা—হ্যাঁ, আর তোমাদের দরকার নেই। নতুন মেশিনটা এসে গেছে, এখন ফালতু লোক ছেটে ফেলতে হবে।

তিলক—আমরা তো মাত্র এই ক'টি দেশী কুলি। সবারই কাজ রইল, শুধু আমাদের থাকবে না কেন বড়বাবু?

বড়মামা—ওরে বাবা, তোর মতো চার হাজার গেঁয়ো কুলির কাজ করে দেবে ঐ একটা এক্সক্যাভেটার। তারপর তোদের কত রকম মরজি আছে, স্ট্রাইক করবি, ঘুমোবি, ছুটি চাইবি। কিন্তু এক্সক্যাভেটার তা করে না। তাকে বিশ্বাস করা যায়। তোদের করা যায় না। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন ছিলি। এইবার তোদের ছুটি।

তিলক—আমরা তো কখনো স্ট্রাইক করি নাই বড়বাবু।

বড়মামা—করতে পারিস তো। হঠাৎ মতিচ্ছন্ন হতে কতক্ষণ?

তিলক রায়কে দেখতাম, সমস্ত দিন ছুটাছুটি করে বেড়ায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর বাইরে বটগাছটার ছায়ায় সকাল বিকেল বসে থাকতো তিলক। বড় সাহেবের কাছে একবার ধর্না দেবে—এই তার উদ্দেশ্য।

আর একদিন এসে তিলক বড়মামার কাছে প্রায় কেঁদে পড়লো—বড়বাবু আজ আমাদের চাকতি আর কোদাল কেড়ে নিয়ে গেল।

বড়মামা—মিছামিছি পড়ে আছিস্ কেন তোরা? কতবার তো তোকে বলেছি এইবার তোদের চলে যাওয়া উচিত। যা ঘরে গিয়ে ক্ষেতখামার দেখ। একদিন তো যেতেই হতো।

তিলক—বিনা দোষে কোম্পানী আমাদের সর্বনাশ করে দিল বড়বাবু।

বড়মামা—কি বলছিস তিলক? তোরাই তো ভবিষ্যতের রাজা। এই খালগুলি দিয়ে যখন জল ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন তোদের জমির দাম কোথায় গিয়ে উঠবে, ভাবতে পারিস? তোদের মাটিকে কোম্পানী যে সোনা করে দিল রে মূর্খ।

তিলক মাত্র আর একদিন এসেছিল। সেদিন ধাওড়া খালি করে দেবার জন্য ওদের ওপর

অর্ডার হয়েছে। জোলা কুলিরা প্রায় সবাই তখনই এলাকা ছেড়ে গাঁয়ের পথে মেলা দিয়েছে। কুর্মিরা কিছু কিছু রয়ে গেছে। ধাওড়ার সামনে একটা পাকুড়গাছের তলায় একটা পাঁঠা বলি দিল কুর্মিরা। মাংস রাঁধলো, হাঁড়ি ভরে ভরে পচাই মদ কিনে আনলো। দুপুর থেকেই মাদল পিটিয়ে বিদায় উৎসবকে মাতিয়ে তুললো।

রাত্রিবেলা গার্ডদের চিৎকার দৌড়োদৌড়ি আর জলস্রোতের শব্দে আবার একটা অতিপ্রাকৃত কোন কাণ্ড ঘটেছে মনে হলো। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন। জেগে বসে আছি। প্রায় শেষ রাত্রে বড়মামা ফিরলেন।

বড়মামা বললেন—তিলক রায় খতম।

—কি হলো ?

বারুদ দিয়ে একটা পিলার ব্লো করে দিয়েছে তিলক। বাঁধের একটা সাইডে ভয়ানক জলের চোট এসে লাগছে। আজ সারা রাত কাজ হবে।

—তিলক কোথায় ?

—মরে পড়ে আছে, একেবারে থেঁতলে গেছে।

ভাট তিলক রায়ের জীবনী এইখানে শেষ। ভারতবর্ষের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, আজ এতদিন পরে তিলক রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে গেল। ভাট তিলক যেন সত্যিই ইতিহাসের প্রেতের মতো। যখের মতো অতীতের যত অভিমান পাহারা দিত। বহুরূপী হয়ে সে আমাদের বর্তমানকে ব্যঙ্গ করতো। ভবিষ্যতকে সে সইতে পারলো না। তার সংশয়টাকে শেষ পর্যন্ত সে চরম সত্য বলে জেনে গেল। তিলক রায় যেন সেই প্রচণ্ড বন্য আত্মা—ক্যাপিটাল আর ইন্ডাস্ট্রির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে যে ফুরিয়ে গেল।

রূপনগর

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেলেন 'ফুলের রাণী'।

আর যাঁরা প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ পুরস্কার পেলেন যথাক্রমে, উৎসবের সাজে সাঁওতাল মেয়ে, কাঁখে গাগরি রাজস্থানী বধূ, আর ঐতিহাসিক মোগল হারেমের এক সুন্দরী।

চমৎকার সাজ, একেবারে নিখুঁত সাজ। ছদ্মবেশের এইসব রূপের কাছে একেবারে খাঁটি ও অকৃত্রিম রূপও হার মেনেছে। রঙিন রেশমী কাপড়, জরির ঝালর, ফুলের স্তবক আর তীব্র বিজলী বাতির মালা দিয়ে সাজানো ওই মঞ্চের উপর যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হলো ফ্যান্সি ড্রেসের আসর। ছদ্মসাজে বিচিত্ররূপিণী হয়ে যাঁরা এখন ওই আসরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা কোন বিচিত্র সংসারের মানবিকা নন। তাঁরা রায়গড় নামে এই ছোট জনপদের যত অফিসারের গৃহিণী আর দুহিতা। কিন্তু কার সাধ্যি আছে, দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে থেকেও বলে দিতে পারে, কে মিসেস কাপুর, কে শ্রীমতী মনিকা দাশগুপ্ত, কে মিস নিয়োগী, আর, কে-ই বা গীতা, চন্দ্রা ও জাহানারা ?

যাঁরা এই প্রতিযোগিতা বিচার করে নম্বর দিলেন, তাঁরাও কি কাউকে চিনতে পেরেছেন ? না, মিস্টার কাপুরও চিনতে পারেননি যে, তাঁরই গৃহিণী, যাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তিনিই এখন ওই মঞ্চে ঐতিহাসিক মোগল হারেমের এক তরুণী সুন্দরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বুড়ো মানুষ খোসলা সাহেবও চিনতে পারলেন না যে, তাঁরই নাতনী গীতা, যার বয়স ষোল বছর পার হয়নি, সে এখন এই বিচিত্র সাজের আসরে থুড়থুড়ি এক সন্ন্যাসিনী বুড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর মালা জপছে। খোসলাসাহেব চোখ টান করে বলে উঠলেন, বুঝেছি, নিশ্চয় চন্দ্রাকি দাদী এই সন্ন্যাসিনী সেজেছেন।

তিন বছর আগে এই রায়গড়ের এখানে মানুষের কোন বসতি ছিল না। ছিল শুধু জওয়ার ভুট্টা আর অড়হরের ক্ষেত। আর, খেজুরের জঙ্গল। কৃষির যন্ত্রপাতি তৈয়ারির একটি কারখানা, আর ট্র্যাক্টর ট্রেনিং-এর একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সরকার এখানে দেড় কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন বলেই পুরনো গেঁয়ো রায়গড় এখন একটি আধুনিক জনপদে পরিণত হয়েছে। চীফ এঞ্জিনিয়ার খোসলা সাহেব ডাক বিভাগের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছেন, পোস্ট অফিসের নাম রায়গড় না রেখে রূপনগর করা হোক। অফিসারদের সকলেরই ইচ্ছে, এই ছোট্ট কারখানা শহরটির নাম রূপনগর হোক। আগ্রা রোড ধরে সেকেলে ইতিহাসের সুন্দর বিলাসপুর সেই মাণ্ডু যাবার পথে এই নতুন কারখানা শহরটিকে দেখতে পাওয়া যায়। রুক্ষ বিন্ধ্যগিরির মাথার উপরে যখন কালো মেঘ আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে ওঠে, সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হয়, আর বৃষ্টির ধারা ঝরে পড়তে থাকে, তখন এই শহরের শত শত বিজলী বাতির আলোও যেন ধারাস্নানের আনন্দে গলে গিয়ে হাসতে থাকে। তখন সত্যিই যে শহরটিকে একটি অবাস্তব জগতের রূপনগর বলে মনে হয়।

তবু নিতান্ত বাস্তব ধুলো মাটি আর পাহাড়ের শহব। কারখানার ফার্নেস ধক-ধক করে তাপের জ্বালায় জ্বলে, লোহা গলে। যন্ত্রের অস্ত্রে লোহার চাপ কেটে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, কঠিন লোহাব আর্তনাদও বড় অদ্ভুত হযে বাজে। তার উপর আছে, ওদিকের ট্র্যাক্টরের কঠোর স্বরের হর্ষনাদ।

এরই মধ্যে দেখা যায়, অফিসারদের বাংলোর ফটকে রঙিন বুগেনভিলিয়া দুলছে, আর, একটু দূরে খেজুরবনের নিরালাতে ট্রানজিস্টর বেডিওতে গজলগান উৎসারিত হয়ে ঝর্নার জলের শব্দের সঙ্গে ছুটোছুটি করছে। বোধহয় গীতা আর ওর দুই ভাই এই রেডিও বাজিয়ে ওখানে ছুটোছুটি করছে।

অফিসারদের কাজের জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে অবসর থাকে, সে অবসর বেশ ভাল করে সার্থক করে নেবার একটা ব্যবস্থা তাঁরা নিজেরাই করে নিয়েছেন। মাণ্ডু বেড়াতে যাওয়া, খেজুরবনে পিকনিক আর বছরে তিনবার এই ফ্যান্সি ড্রেসের আসর।

পুরনো মাণ্ডু আজ একেবারে নীরব হয়ে তার যত মহল চবুতরা আর টলমলে জলের বউলি নিয়ে নিরালার সমাধির মতো পড়ে আছে, তবু দেখতে কত সুন্দর। পাথরের হিন্দোলা মহল সত্যই যেন দুলছে বলে মনে হয়। চম্পা বউলির জল মাথায় ছিটিয়ে গীতা কলকল করে হেসে ওঠে, সত্যিই যে এই জলে চাঁপা ফুলের গন্ধ!

সত্যিই কি মাণ্ডুর সেই সুন্দরী নারী, বাজবাহাদুরের প্রেমের নায়িকা সেই রাজপুতানী রূপমতীর খোঁপার চাঁপার গন্ধ এই জলে আজও মিশে আছে? এই বউলির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন রূপমতী। আর, ওই তো রূপমতীব চবুতরা। এখানে দাঁড়িয়ে আজও দেখা যায়, রূপমতী যেমন দেখতেন, নীচের সবুজ সমতলের বুকের উপর দিয়ে নর্মদার প্রবাহ রূপোর অজগরের মতো এঁকেবেঁকে গড়িয়ে গিয়েছে।

রূপমতীর গল্পটি বড় চমৎকার, বেশ মিষ্টি করুণ গল্প। রূপমতী নামটিও বেশ। অফিসারেরা তাই বোধহয়, গেঁয়ো রায়গড়ের এই কারখানা শহরটিকেও রূপনগর নাম দিয়ে একটু শখের ঐতিহাসিকতা করতে চাইছেন। কে জানে জলে ডুবে মরণ-বরণ-করা রাজপুতানী সুন্দরী সেই রূপমতী আর রাতের বৃষ্টির জলে ভেজা এই রায়গড়ের মধ্যে রূপের

কী মিল থাকতে পারে!

ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতা এই নতুন রায়গড়ের জীবনে, তার মানে রূপনগরের জীবনে একটি বিপুল খুশির উৎসব! এই উৎসবের হর্ষ সবচেয়ে বেশি মত্ত হয়ে ওঠে তখন, যখন মিসেস খোসলা একে একে নামগুলি ঘোষণা করতে থাকেন। অর্থাৎ, ছদ্মবেশিনীদের পরিচয় প্রকাশ করে দেন।

প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে, সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে ফুলের রাণী! মিসেস খোসলা আসরের এক পাশে দাঁড়িয়ে নাম ঘোষণা করে দিলেন—চন্দ্রা নিয়োগী, ফুলের রাণী, ফার্স্ট!

হাততালি বাজে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হই-হই করে লাফিয়ে ওঠে। কাপুর সাহেব ঘাড় দুলিয়ে হাসতে থাকেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে ওঠেন—ওয়ান্ডারফুল!

দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থের নামও ঘোষণা করা হয়ে যায়। সবই যেন এক-একটি বিস্ময়ের ঘোষণা। সভার মানুষ সকলেই খুশি হয়ে বলতে থাকেন—চমৎকার, চমৎকার!

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, সবচেয়ে চমৎকার হলো ওই ফুলের রাণী। এবং সত্যিই একটি অভাবিত বিস্ময়। এই রূপনগরের অফিসারদের ঘরে ঘরে এত সুন্দরী মেয়ে থাকতে চন্দ্রা নিয়োগী ফুলের রাণী সাজতে সাহস করেছে! আর, সেই সাহসের জয়ও হয়েছে। এই ফুলের রাণীর রূপের কাছে মোগল হারেমের সুন্দরীর রূপও সেকেন্ড হয়ে গিয়েছে।

অথচ চন্দ্রা নিয়োগী দেখতে একটুও সুন্দর নয়। স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর মেয়ে চন্দ্রা দেখতে বেশ কালো, কপালটাও বেশ চাপা, আর নাকের গড়নও বেশ মোটা। মিসেস খোসলা চন্দ্রাকে খুব বেশি ভালোবাসেন বলেই একটা কথা বলেন—চন্দ্রার মুখের হাসিটি কিন্তু খুব সুন্দর।

এ কথার সরল অর্থ এই যে, চন্দ্রা মোটেই সুন্দর নয়। এই সত্য চন্দ্রাও যে বুঝতে পারে না, তা নয়। কিন্তু সেজন্যে চন্দ্রার জীবনে যেন কোন দুর্ভাবনা নেই।

অথচ আর সকলেই ভাবছেন। ভাবছেন চন্দ্রার বাবা আর মা। ভাবছেন চন্দ্রার মামার বাড়ির মানুষগুলি। এমন কি এই রূপনগরের মিসেস খোসলাও ভাবেন, চন্দ্রাকে পছন্দ করে বিয়ে করবে, এমন কোন ভাল পাত্র কি সত্যই পাওয়া যাবে?

কলকাতায় মামাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েও সে সুযোগ ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছে চন্দ্রা। আই. এ পরীক্ষাটাও দিল না। তা ছাড়া, কলকাতায় থাকলে চন্দ্রার জন্যে পাত্রের খোঁজ নেওয়া, পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখানো, সবই আগের মতো চলতে পারতো। কিন্তু চন্দ্রা মেয়েটা নিজেই যেন হঠাৎ অশান্ত হয়ে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, বড়মামার কথা অগ্রাহ্য করে এই রূপনগরে চলে এল। চন্দ্রার মা-র কাছে বড়মামী চিঠি লিখেছিলেন, চন্দ্রা কেন যে এভাবে ছটফটিয়ে পালিয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না।

সত্যিই, বড়মামীর মনে হয়েছিল, মেয়েটা যেন কলকাতার জীবনের মধ্যে একটা দুঃসহ শাস্তি কিংবা ভয় দেখতে পেয়ে ওভাবে ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ একদিন রূপনগরে চলে গেল। মানুষ এভাবে কোথাও চলে যায় না, পালিয়ে যায়।

প্রায় দু'বছর হয়েছে রূপনগরে আছে চন্দ্রা। এখানে এসে বিন্ধ্যগিরির মাথার উপরে মেঘের ঘটা দেখে কলকাতার আকাশের কোন মেঘের কথা এই মেয়ের মনে পড়ে কি! চন্দ্রার বাবা আর মা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছেন, কলকাতায় যাবার জন্যে চন্দ্রার মনে কোন আগ্রহ নেই।

তাঁরা আশ্চর্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু বুঝতেও পেরেছেন, কেন এই রূপনগরের আলো-ছায়ার সঙ্গে মনে-প্রাণে মিশে গিয়েছে চন্দ্রা। প্রথম একটু সন্দেহ হয়ে ছিল, কিন্তু পরে বুঝে নিতে আর কোন অসুবিধে ছিল না, কেন চন্দ্রার মনে কলকাতাতে ফিরে যাবার কোন চাড় নেই।

আজ শুধু চন্দ্রার বাবা আর মা নন, মিসেস খোসলাও জানেন, এমন কি ওই গীতাও জানে, তাছাড়া ডাক্তাব দাশগুপ্ত আর কাপুর সাহেবও জানেন, চন্দ্রা কেন কলকাতায় ফিবে যেতে চায় না।

এখানে আসবার ঠিক এক মাস পরে কলকাতায় ফিবে যাবার জন্যে তৈবি হয়েছিল চন্দ্রা। রওনা হবার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল না চন্দ্রা। মিসেস খোসলা জানেন, ওই ছোকরা বাঙালী এঞ্জিনিয়ার অরুণ মজুমদাব এখানে সার্ভিস নিয়ে যেদিন এল, ঠিক সেদিনই চন্দ্রা বলেছিল—আমার বোধহয় এখন কলকাতা যাওয়া হবে না।

গীতা খোসলা কতবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছে, নিয়োগীবাবুর বাংলোর দিকে তাকিয়েছে, আর মুখ টিপে টিপে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। দেখতে পেয়েছে গীতা, অরুণ মজুমদার ওদিক থেকে আসছেন, আর চন্দ্রাদি বাড়ির বারান্দায় বেলিংযের কাছে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

অরুণ মজুমদার বলে—কেমন আছেন ?

চন্দ্রা হাসে—ভাল।

অরুণ মজুমদার—কি করছেন ?

চন্দ্রা আবার হাসে—কিছু না।

অরুণ মজুমদারও হেসে ফেলেন—ভাল।

চলে যান অরুণ মজুমদার। গীতা খোসলা ছুটে এসে চন্দ্রার কাছে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।—আমি বাংলা বুঝি চন্দ্রাদি।

বুঝতে কি আর সত্যিই কিছু বাকি আছে ? চন্দ্রা নিয়োগীর মুখের হাসিটি খুব সুন্দব, মিসেস খোসলার কথাটা বোধহয় খুবই বিশ্বাস করে চন্দ্রা। তা না হলে, রোজই সকাল বিকেল ও সন্ধ্যায় এমন একটি সুস্মিত অভ্যর্থনার মূর্তি হয়ে আব বারান্দার রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে অরুণ মজুমদারের যাওয়া-আসার পথের উপব চোখ বাখবে কেন চন্দ্রা ?

নিশ্চয় আশা করে চন্দ্রা, এই অভ্যর্থনা একদিন সফল হবে। সত্যিই একদিন থমকে দাঁড়াবেন অরুণ মজুমদার, আর, ওই দুটি কথাব সঙ্গে অন্য কোন কথাও বলে ফেলবেন।

মিসেস খোসলার কাছে দুঃখ কবে অনেক কথা বলেছেন চন্দ্রাব মা—হলে তো ভালই হতো। আমার মেয়ে শুধু দেখতে কালো, তাছাড়া আর তো কোন খুঁত নেই। অরুণ মজুমদার আমার মেয়েকে বিয়ে করলে নিশ্চয় সুখী হতেন।

মিসেস খোসলা বলেন—নিশ্চয়, আমিও এই কথা একশো বার বলবো। কিন্তু কথা হলো, একজনের আশাতে তো কিছু হবে না। মজুমদাবও যদি আশা কবতো যে ।

ডাক্তার দাশগুপ্ত একদিন কাপুর সাহেবকে বলেছেন—আমি মজুমদারের কাকাকে চিঠি লিখেছিলাম। কাকা জবাব দিয়েছেন, হ্যাঁ, মেয়ে যদি সুন্দর হয় তবে বিয়ের কথা তুলতে পারি। কিন্তু আমাদের চন্দ্রা তো.. ।

মিস্টার কাপুর বলেন—আমিও একদিন মজুমদারকে একটু বাজিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি। মনে হলো, চন্দ্রার জন্য মজুমদারের মনে কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই।

সেজন্যে মজুমদারকে দোষ দেওয়া যায় না। এখানে এসে অন্তত দশবার মাণ্ডু বেড়াতে গিয়েছেন অরুণ মজুমদার। রূপমতীর প্রেমের গল্পও শুনেছেন। রূপমতীর খোঁপাব ফুলের গন্ধ আজও চম্পা-বউলির জলে ভাসছে, সেই ইতিহাসের দেশে এসে চন্দ্রা নিয়োগীর মতো মেয়ের মুখে রূপ দেখতে পাওয়া কঠিন বইকি। অসম্ভবও বলা যায়।

তাই অরুণ মজুমদারকেও বিস্মিত হতে হয়েছে, মিসেস খোসলা যখন নাম ঘোষণা করলেন—চন্দ্রা নিয়োগী, ফুলের রাণী, ফার্স্ট।

সত্যি কথা ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে ওই ফুলের রাণীর দিকে তাকিয়ে অরুণ মজুমদারের মনে রাজপুতানী সুন্দরী রূপমতীর কথাই বার বার মনে পড়েছে। মস্ত বড় একটা পদ্মস্তবকের গায়ে চিবুক ছুঁইয়ে বসে আছে ফুলের রাণী। অসম্ভব নয়, রাজপুতানী রূপমতীও হ্রদের জলে স্নান করতে নেমে ঠিক এভাবে ফোঁটা পদ্মফুলের গায়ে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কী অদ্ভুত হাসি, আর চোখের পাতার মধ্যে কী নিবিড় স্বপ্নালুতার আবেশ। অরণ মজুমদার নিজেও ফুলের রাণীকে দশের মধ্যে দশ নম্বর দিয়েছেন।

কিন্তু এতক্ষণে জানতে পারা গেল, এ এক নিদারুণ ছলনা। স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর মেয়ে চন্দ্রা নিয়োগীই হলেন এই ফুলের রাণী।

এই দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম নয়, আরও কয়েকবার ঠিক এভাবেই চন্দ্রা নিয়োগীর নিখুঁত ছদ্মবেশের আর রূপ-ছলনার কীর্তি দেখতে পেয়েছেন অরুণ মজুমদার। বিস্মিত হয়েছেন, প্রশংসা করেছেন অরুণ মজুমদারও। সেবার তপোবনের শকুন্তলা হয়ে ফার্স্ট প্রাইজ নিয়েছিল যে, সে এই চন্দ্রা নিয়োগী। আর একবার অজন্তার পুরনারী হয়ে এই চন্দ্রা নিয়োগীই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিল। চন্দ্রা যেন রূপসী সাজতেই পছন্দ করে। আর কি আশ্চর্য, দেখতে একটুও ভাল নয় এমন একটা মেয়ে নিজেকে কী নিখুঁত রূপসীই না করে তুলতে পারে!

কিন্তু ওতে কি আসে যায়? অরুণ মজুমদার খুশি হয়ে যাকে বেশি নম্বর দেন, সে তো একটা মিথ্যার সুন্দরসাজ। অরণ মজুমদার তাঁর কারখানা আর অফিস যাবার পথে রোজ যাকে দেখতে পান, সে মেয়ে হলো স্টোরবাবুর মেয়ে চন্দ্রা; বেশ কালো, কপালটা বেশ চাপা, আর নাকটাও বেশ একটু মোটা।

বুঝতে কি আর কোন অসুবিধে আছে, ওরকমের নকল রূপসীপনা করে কার চোখে রঙ ধরিয়ে দিতে চাইছে চন্দ্রা?

সত্যি কথা, অরুণ মজুমদার মনে মনে বেশ একটু বিরক্তও হয়েছেন, কারণ চন্দ্রা নিয়োগীর চোখের ভাষাটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। বুঝবার যেটুকু বাকি ছিল, সেটা ডাক্তার দাশগুপ্ত আর মিস্টার খোসলার ভালমানুষী কথাবার্তার রকম-সকম দেখেই বুঝে নিতে পারা গিয়েছে।

গীতার শাসনের হুমকি দেখে চন্দ্রা নিয়োগী সাবধান হয় না। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, অরুণ মজুমদার খুব সাবধান হয়ে গিয়েছেন। দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রা নিয়োগী, অরুণ মজুমদার পথ হেঁটে চলে যান। কিন্তু আর ভদ্রতা করে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। এমন কি চন্দ্রার দিকে তাকাতেও কুণ্ঠা বোধ করেন অরুণ মজুমদার। বোধহয় বুঝিয়ে দিতে চান অরুণ মজুমদার, যা কখনো হবে না, যেটা সম্ভব নয়, সেটার জন্য মিথ্যে একটা গল্প সৃষ্টি করে লাভ নেই। অরুণ মজুমদার রূপনগরে এসে একটু স্বস্তিতে থাকতে চান।

কাপুর সাহেব একদিন অরুণ মজুমদারের সঙ্গে কথায় কথায় বেশ একটু স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন—আমাদের নিয়োগীবাবুর মেয়ে চন্দ্রা সত্যিই খুব ভাল মেয়ে।

অরুণ মজুমদার হাসেন—নিশ্চয়।

কাপুর সাহেব বলেন—আপনি তো ব্যাচিলর মানুষ।

অরুণ মজুমদার—হ্যাঁ।

কাপুর সাহেব—তবে বলুন।

হাসতে চেষ্টা করেন অরুণ মজুমদার, কিন্তু হাসতে পারেন না। বরং একটা ক্ষুব্ধ আপত্তির স্বর বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—ফ্যান্সি ড্রেস তো একটা আনরিয়্যালিটি; তাকে হাততালি দিয়ে খুশি করা যায়, ভাল নম্বর দেওয়া যায়। কিন্তু...।

২

অরুণ মজুমদার যদি চোখ তুলে তাকাতেন তবে দেখতে পেতেন যে, স্টোরবাবু বলাই নিয়োগীর বাড়ির বারান্দার কাছে শুধু একা বুগেনভিলিয়া দুলছে, তার কাছে চন্দ্রা নিয়োগীর ছায়াটাও নেই। তাকান না, তাই বুঝতে পারেন না, চন্দ্রা নিয়োগী ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকে না। পুরো ছ'টি মাস পার হয়ে গিয়েছে, চন্দ্রাকে এ বাড়ির বারান্দায় কোন সকালে বিকালে বা সন্ধ্যায় পায়চারি করতে গীতাও দেখতে পায়নি। গীতারও সন্দেহ হয়েছে, কি যেন ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

চোখেও দেখতে পেয়েছে গীতা, চন্দ্রাদি যেন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রাদির মুখে সেই হাসিটাই আছে, কিন্তু চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের উদাস হয়ে কোন দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বেশ চিকচিকও করে।

অরুণ মজুমদার কিন্তু এ পথে হাঁটতে গিয়ে বেশ একটু সাবধান হয়ে চলেন। নিয়োগীবাবুর বাড়ির এই বারান্দা কিংবা জানালার দিকে ভুলেও তাকান না। ওখানে সত্যিই কেউ নেই, কিন্তু অরুণ মজুমদার মনে করেন, সত্যিই কেউ একজন বড়-বড় দুটো অপলক চোখ তুলে অরুণ মজুমদারকে যেন একটা পিপাসা দিয়ে গ্রাস করবার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন গীতা খোসলার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল, তাই তাকাতে হলো। এই গীতা মেয়েটার চোখে সব-সময় যেন একটা ধূর্ততার মতলব হাসছে। গীতাই হঠাৎ বলে উঠল—ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন অরুণদা, কী চমৎকার বুগেনভিলিয়া ফুটেছে।

তাকিয়ে দেখলেন অরুণ মজুমদার। হ্যাঁ, সত্যিই ফুলের ভারে বেগুনি বুগেনভিলিয়ার ডাল নুয়ে নুয়ে দুলছে।

কথাটা বলেই চলে গিয়েছে গীতা। কিন্তু অরুণ মজুমদার তবু এক মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন আর দেখলেন, শুধু বুগেনভিলিয়া, আর কেউ সেখানে নেই। চমকে ওঠেন নি, কিন্তু একটু আশ্চর্য হলেন অরুণ মজুমদার। নিয়োগীবাবুর বারান্দাটা যে সত্যিই শূন্য হয়ে গিয়েছে।

তারপর রোজই, একবার না একবার তাকিয়ে দেখতেই হয়, কেউ ওখানে আছে কিনা। শুধু একা বুগেনভিলিয়া, কিংবা তার সঙ্গে একটা মেয়ের মূর্তি।

না, পুরো একটি মাস পার হতে চললো, তবু আর কোন মুহূর্তে ওই বারান্দায়, কিংবা, জানালায়, অথবা ফটকের কাছে চন্দ্রা নিয়োগীকে দেখতে পেলেন না অরুণ মজুমদার।

একদিন মাণ্ডুর পুরনো রাজপ্রাসাদ জাহাজ-মহলে এসে অফিসারের দল আর তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যার দল একটা চায়ের মজলিস করে আর হৈ হৈ করে চলে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, চন্দ্রা নিয়োগী আসেনি।

আরও অদ্ভুত কাণ্ড, এবারের ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হলেন এক কাশ্মীরি মেয়ে মাঝি, অর্থাৎ অহল্যা নিগম, সার্ভেয়ার বিজয় নিগমের স্ত্রী।

ছদ্মরূপের প্রতিযোগিনীদের নাম ঘোষণা করলেন মিসেস খোসলা। তাই বুঝতে পারা গেল, চন্দ্রা নিয়োগী নেই। এই প্রথম, চন্দ্রা নিয়োগী এই ছদ্মরূপের আসর থেকে দূরে সরে গিয়ে কোথায় যেন নিজেকে একেবারে একলা করে রেখে দিয়েছে।

রূপমতীর গল্পটা বেঁচেই আছে, নতুন রূপনগরও আছে। সবই আছে। বিন্ধ্যগিরির মাথার কালো মেঘ আর দূরের নর্মদার আঁকাবাঁকা প্রবাহের সাদা রেখাটি, সবই ঠিক আছে। কিন্তু অরুণ মজুমদারের মনে তবু একটা অস্বস্তি, চন্দ্রা নিয়োগীর মতো মেয়ে এত অন্যরকম হয়ে যায় কেমন করে?

দেখতে পেয়েছে গীতা খোসলা, আর আড়ালে মুখ টিপে হেসেছে, অরুণ মজুমদার আজকাল এই পথ দিয়ে যাবার সময় বড়ই আস্তে আস্তে হাঁটেন। বার বার নিয়োগীবাবুর বাড়ির বারান্দার দিকে তাকান। আর, তাকাতে গিয়ে যেন অনেকদিনের চেনা একজনের মুখ দেখবার একটা আশা ভদ্রলোকের চোখে ছটফট করে।

ব্যর্থ আশা। কোনদিনও চন্দ্রা নিয়োগীকে দেখতে পান না অরুণ মজুমদার। কম দিন তো নয়, ন'টা মাস পার হয়ে গিয়েছে, রূপনগরের প্রায় সবারই সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে। কিন্তু ওই একজন, শুধু একা চন্দ্রা নিয়োগী নামে একটা মেয়েকে দেখতে পেলেন না অরুণ মজুমদার।

রূপমতী নয়, ঠিক তার উল্টো, নিয়োগীবাবুর পঁচিশ বছর বয়সের এই কালো মেয়ে এইবার যেন জীবন দিয়ে রূপমতীর গল্পের মতো একটা গল্প হয়ে উঠতে চাইছে। রূপমতী জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল, আর চন্দ্রা নিয়োগী নামে এই মেয়ে যেন আড়ালে লুকিয়ে থেকে মিথ্যে হয়ে যেতে চাইছে। অরুণ মজুমদার এই পথে যাবার সময় বার বার তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই কি চন্দ্রা আজও ওখানে নেই ?

একদিন, সেদিন কোথা থেকে একটা ঝড়ের হাওয়া এসে রূপনগরের যত বুগেনভিলিয়ার ডালপালাকে উতলা করে দিল। ওয়ার্কশপ থেকে নিজের বাংলোতে ফিরছেন অরুণ মজুমদার।

সন্ধ্যা এখনও হয়নি, তবু নিয়োগীবাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। আর, ঘরের দরজায় একটা রঙিন রেশমী কাপড়ের পর্দা খুশি পতাকার মতো ফুরফুর করে উড়ছে।

চমকে উঠলেন অরুণ মজুমদার। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে টেবিলের ফুলদানিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কে ? ও কি চন্দ্রা নিয়োগী ? হতেই পারে না। অসম্ভব। নকল রূপমতী সাজতে পারে, ফ্যান্সি ড্রেসের আসরে দাঁড়িয়ে নকল রূপসীপনা দিয়ে চমৎকার ছলনা জাগিয়ে তুলতে পারে, সে মেয়ে এ-রকমের একটা সাদা-সিধা সাজে এমন গরবিনীর মতো বসে আছে কেন ?

কিন্তু বুঝতে অসুবিধে নেই, সত্যিই সে চন্দ্রা নিয়োগী। ঘাড়ের উপর রুক্ষ চুলের রাশ এলিয়ে দিয়েছে, কুমকুমের একটা টিপ পরেছে। শাড়িটা রঙিন নয়, গায়ের জামাটাও একেবারে ধবধবে সাদা। আর, চিকচিক করছে কালো চোখ দুটো। কী ভয়ানক ফ্যান্সি সাজ !

বুঝতে পারেন না অরুণ মজুমদার, বুকের ভেতরটা কেন দুরুদুরু করছে। চন্দ্রা নিয়োগীকে আজ এত অদ্ভুত রকমের সুন্দর, আর অদ্ভুত রকমের নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে কেন ?

কোথা থেকে ছুটে এসে অরুণ মজুমদারের দিকে তাকিয়ে আর দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসতে থাকে গীতা খোসলা।

অরুণ মজুমদার বললেন—কি হলো ? হাসছো কেন গীতা ?

গীতা বলে—কি দেখছেন ?

অরুণ—মিস নিয়োগী বসে রয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

গীতা—হ্যাঁ। কিন্তু...।

অরুণ মজুমদার—কি ?

গীতা—ফ্যান্সি ড্রেস নয়।

অরুণ মজুমদার হাসতে চেষ্টা করেন। —তবে কি ?

গীতা—কলকাতা থেকে দু'জন বাঙালীবাবু এসেছেন, রেস্টহাউসে আছেন।

—কেন ?

—চন্দ্রাদিকে দেখতে এসেছেন।

—কেন ?

—চন্দ্রাদির বিয়ের কথা চলছে!

—কেন ? অরুণ মজুমদারের প্রশ্নটা যেন নিদারুণ একটা আর্তনাদ হয়ে বেজে ওঠে।

গীতা বলে—আমি কেমন করে বলি ? আপনি বুঝে দেখুন।

অরুণ মজুমদারের নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন জ্বলতে শুরু করেছে। গীতা খোসলাকেই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন অরুণ মজুমদার।—কি ভেবেছেন তোমার চন্দ্রাদি ? উনি সত্যিই একটি রূপমতী ?

গীতা বলে—সে কথা চন্দ্রাদিকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন ?

—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করব। জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আমার আছে। বলতে বলতে এগিয়ে যান, নিয়োগীবাবুর বাড়ির বারান্দার সেই বুগেনভিলিয়ার ছায়া পার হয়ে একেবারে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ; তারপর সত্যিই একেবারে চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে কথা বলে ফেলেন অরুণ মজুমদার।

—আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বলে তুমিও আমাকে ভুল বুঝবে কেন ?

চন্দ্রা মাথা হেঁট করে হাসে—না, ভুল বুঝিনি।

অরুণ মজুমদার—তবে এই যে শুনলাম, কলকাতা থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, রেস্টহাউসে আছেন ; তোমাকে ওঁরা দেখবেন।

চমকে ওঠে চন্দ্রা—কে বললে ?

—গীতা।

—তবে গীতাকেই জিজ্ঞেস করুন, কেন এ রকম একটা অদ্ভুত মিথ্যে কথা বলল।

কিন্তু কোথায় গীতা ? গীতা তখন সার্ভেযাব বিজয নিগমেব বাংলোব বাবান্দায দাঁডিযে অহল্যার সঙ্গে গল্প করছে আর মুখ টিপে হাসছে।

ব্রততী

সকলেই জানেন, মিসেস সেনের মতো একজন বড় দিদিমণি ছিলেন বলেই এই মেয়ে-স্কুলের এত উন্নতি হয়েছে। আট বছরের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা আটগুণ বেড়ে গিয়েছে। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট শৈলেশবাবু এখন ভাবছেন, আর একটু চেষ্টা করলে, আর চারটে নতুন ঘর তুলে ফেলতে পারলে, আরও ভাল হয়। তখন সরকারের গ্র্যান্ট আরও বেশি করে পাওয়া যাবে। হাই স্কুল হবার মতো আরও দুটো ক্লাশ বাড়িয়ে ফেলতে পারা যাবে।

বড় দিদিমণি মীরা সেন এখন কিন্তু এই মেয়ে-স্কুলের কেউ নন। একটানা আট বছর ধরে কাজ করবার পর আজ তিনি সরে গিয়েছেন।

না, ঠিক অবসর গ্রহণের ব্যাপার নয়। মীরা দিদিমণি রিটায়ার করেননি। তিনি শুধু কাজ ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়েছেন। কিন্তু সকলেই জানেন, মীরা সেন এখনও এই মেয়ে-স্কুলের সব খবর রাখেন। উন্নতির খবর শুনলে খুশি হন। কোন অসুবিধার, কিংবা কোন নিন্দার কথা শুনলে দুঃখিত হন।

এই তো সেদিন, শুনতে পেয়েছিলেন মীরা সেন, ইনস্পেকট্রেস এসে ইংরেজীর টিচাব লতিকাকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। ছাত্রীরা ইংরেজীতে খুবই কাঁচা, কোন

ছাত্রীই ছত্রিশের বেশি নম্বর তুলতে পারেনি। খবর শুনে, বেশি দুঃখিত হয়ে, লতিকাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন মীরা সেন। কিন্তু যায়নি লতিকা।

না যাবার কারণ এই নয় যে, মীরা সেনের সম্পর্কে লতিকার মনে কোন তুচ্ছতার ভাব আছে। শুধু লতিকা নয়, টিচারদের সকলেই স্বীকার করে মীরাদির মতো খেটে পড়াবাব শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু স্কুলের জন্য এত খাটতে গিয়েই তো মীরাদি তাঁর নিজের জীবনের এমন ভয়ানক একটা ক্ষতি ডেকে নিয়ে এসেছেন।

মীরা সেন এখন এই মেয়ে-স্কুল থেকে প্রায় এক মাইল দূরের এক হাসপাতালের যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে থাকেন। স্কুলের সেই বাগান আজও আছে, সে বাগানের সব ফুল গাছে মীরাদি নিজের হাতে জল ঢালতেন। মীরাদির আদরের রঙ্গন আজও স্কুলের বাগান ভরে ফুটে থাকে ; বাগানের রোদও যেন লালচে হয়ে হাসতে থাকে।

যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে মীরাদির ঘরের সামনে এক টুকরো ঘেসো জমি। ঘাসের ছোট ছোট সাদাটে আর নীলচে ফুলের উপর মৌমাছি বেড়ায়। তার পরেই মেহেদির বেড়া। হাসপাতালের মালী মেহেদির এই বেড়াকে ছেঁটে-কেটে বেশ পরিচ্ছন্ন করে রাখে। বেড়ার উপর বসে দুপুরের বুলবুল বেশ চমৎকার শিস দেয়।

কতই বা বয়স মীরাদির ? সেক্রেটারি শৈলেশবাবুর স্ত্রী মনোরমা আর মীরা সেন, দু'জনেই ভাগলপুরের মেয়ে ; দুজনেই এক স্কুলের এক ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। মনোরমার বয়স এখন যদি পঁয়ত্রিশ হয়, তবে মীরা সেনের তেত্রিশের বেশি হতে পারে না।

শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে বেশ একটু অনুযোগের সুরে কথাটা বলেন বলেই মনোরমা, সেই সঙ্গে আরও কেউ-কেউ, মীরা সেনকে একবার দেখে আসবার জন্যে হাসপাতালে যক্ষ্মা-ওয়ার্ডে যান। কিছু ফল, কিছু ফুল, দু তিনটে গল্পের বইও তাঁরা নিয়ে যান।

শৈলেশবাবু বলেন—কী আশ্চর্য, মহিলা একেবারে একা-একা অসহায়ের মতো যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটা ঘরে পড়ে রয়েছেন। তোমাদের কি মাঝে মাঝে মহিলাকে একটু দেখে আসা উচিত নয় ? আমাদের মেয়ে-স্কুলের জন্যেও যিনি এত খাটলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের একটু কর্তব্য আছে তো ?

শৈলেশবাবুর স্ত্রী মনোরমা, তাঁর সঙ্গে বেনুর কাকিমা সুনন্দা, দুজনেই গিয়েছেন। দুজনেই দেখে খুশি হয়েছেন, আর বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছেন। মীরা সেন বেশ হেসে হেসে কথা বলছেন—না ভাই মনো, আমার কখনও মনে হয় না যে, আমি একা।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করেন—মিস্টার সেনের চিঠি পেয়েছেন ?

মীরা—না।

মনোরমা—তবে ?

মীরা সেনের সাদাটে শীর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা পরাভবহীন গর্বের হাসি ঝির ঝির করে কাঁপতে থাকে।—তাতে কী এসে যায় ? সে তো আছেই। কাছে না হোক কোথাও তো আছে। তাহলেই হলো।

মনোরমা জানেন না, সুনন্দাও জানেন না, মীরার স্বামী এখন কোথায় আছেন ! কিন্তু মীরাও কি জানে ? না, মীরাও জানে না। দু'বছর আগে মীরার স্বামী একবার এসেছিলেন, এসে এই শহরের একটা হোস্টেলে উঠেছিলেন ! রোজই একবার স্কুল-বাড়িতে গিয়ে মীরার সঙ্গে দেখা করতেন। মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন, বাগানের রঙ্গনের একটা কুঞ্জের কাছে দাঁড়িয়ে মীরা ওর স্বামী সুধাকর সেনের সঙ্গে গল্প করছে।

কিন্তু এ কেমন সম্পর্ক ? এক বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু স্বামী ভদ্রলোক যে স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

মনোরমার কাছে কথাটা গোপন রাখেনি মীর সেন। —তোমার কাছে লুকোতে চাই না মনো। ডাক্তার সন্দেহ করেছে, আমার বুকে যক্ষ্মার দোষ লেগেছে। তাই আমি ইচ্ছে করেই ওর কাছ থেকে সরে এসে এই স্কুলের কাজ নিয়েছি।

—কেন ?

—ওর ক্ষতি হোক, এটা আমি চাই না। ওর কাছে থাকলে, আমার এই ভযানক রোগেব ছোঁয়াচ ওকে স্পর্শ করে ফেলতে পারে। পারে না কি ? তুমিই বলো, স্ত্রী হয়ে স্বামীর এমন ক্ষতি কি কেউ করতে পারে ?

—মিস্টার সেন কি বলেন ?

—উনি তো প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি আমার জেদ ছাড়িনি।

—কিন্তু এরপর ।

মনোরমা তাঁর মনের কথাটা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে না পেরে আমতা-আমতা কবেন। মীরা সেন তখুনি হেসে ফেলেন। —বুঝেছি কি বলতে চাইছো !

—কি ?

—তুমি বলতে চাও, মিস্টাব সেন কি চিবকাল এভাবে একা হয়ে পড়ে থাকেবেন ?

সুনন্দা বলেন—সেটা কি একটা কথা নয় ?

মীরা সেন—খুব ঠিক কথা। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, তুমি বিয়ে কবো, একা থেকো না।

মনোরমা—মিস্টাব সেন কি বললেন ?

মীরা—বললেন, না, কখ্খনো না।

কিন্তু এহেন প্রতিজ্ঞার মিস্টার সেন এই চার বছবেব মধ্যে একবাবও আব মীবাকে দেখতে আসেননি। মীরাও বলতে পাবে না, কেন আসেননি। মীবা জানেও না, মিস্টাব সেন এখন কোথায় আছেন।

এস ডি ও মহীতোষবাবু খুব সুপারিশ করেছিলেন, আর শৈলেশবাবুও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, তাই হাসপাতালেব যক্ষ্মা-ওযার্ডেব একটি কেবিন ফ্রী পেযে গিয়েছেন মীবা সেন। তা ছাড়া স্কুল কমিটি মাসিক পনেবো টাকা সাহায্য দিয়ে থাকেন। মীব সেনেব জীবন আর রোগজীর্ণ রক্তহীন শরীরটা তাই একটা আশ্রয় পেয়ে গিযেছে। মীবা সেন বলেন, ভাল আছি। ডাক্তার এসে যখন মীরা সেনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে আতঙ্কিতের মতো তাকান, তখনও মীরা সেন বলেন, আমি ভাল আছি।

ডাক্তার—কিন্তু আপনার এই অবস্থায় এখানে এভাবে একা-একা পড়ে থাকা

মীরা সেন হাসতে চেষ্টা কবেন। —আমি তো নিজেকে একা মনে করি না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার—না, আমি বলছিলাম, আমার স্বামী যদি এখন একবার এসে. ।

মীর সেন—না এলেই বা কি ? তবু আমি মনে করবো না, আমি একা হয়ে গিয়েছি।

২

যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের সামনে এক টুকরো ঘেসো জমির উপর ফড়িং উড়ে বেড়ায়। মেহেদি গাছের বেড়ার ওদিকেও বেশ বড় একটা ঘেসো জমি। সেখানে দু'সারি ঘরও আছে, পুরুষদের যক্ষ্মা-ওয়ার্ড।

গির্জাটাও বেশি দূরে নয়। মীরা সেনের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলাতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, গির্জার ঘরের ভিতরে পুলপিটের উপর বড বড মোমবাতি জ্বলছে।

কিন্তু গির্জার গা ঘেঁষে ওই যে ছোট বড় যত সমাধির আঙিনা, সেটা না থাকলেই ভাল ছিল। শুধু সন্ধ্যাবেলাতেই নয়, দুপুরেও ওই নীরব সমাধিভূমির সারি সারি যত গম্ভীর ক্রুশগুলি চোখে পড়লে চোখের দৃষ্টিটা যেন ছমছম করতে থাকে। সমাধির আঙিনাটা যেন গম্ভীর হয়ে এই যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনেকদিন পর আজ আবার এসেছেন মনোরমা আর সুনন্দা। শৈলেশবাবুকে খবর দিয়েছিলেন ডাক্তার, মীরা সেনের অবস্থা ভাল নয়। লক্ষণ খুব খারাপ।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই জানেন, এরই মধ্যে একটা ঘটনার খবর পেয়ে গিয়েছে মীরা। মীরা যা চেয়েছিল, তাই হয়েছে। কাজেই মীরার পক্ষে অভিযোগ করবার কিছু নেই।

মীরার স্বামী সুধাকর সেন বিয়ে করেছেন। ভাগলপুরের প্রতাপবাবুর চিঠিতে জানতে পারা গিয়েছে, তিনি মীরাকেও এখবর জানিয়ে দিয়েছেন।

সুধাকর সেন এখন রেলওয়ের চাকরি করছেন। নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দানাপুরে থাকেন।

একটা কথা না লিখলে ভালই করতেন প্রতাপবাবু। স্টেশন মাস্টার মল্লিকবাবুর মেয়ে নমিতার সঙ্গে সুধাকরের চেনা-শোনা হয়েছিল। একবছর ধরে মেলামেশার পর বিয়ে হয়েছে। ভালই হয়েছে। কিন্তু এসব কথা মীরাকে না জানালেই ভাল করতেন প্রতাপবাবু।

আজ তাই সন্দেহ করছেন মনোরমা আর সুনন্দা, এসব খবর জানতে পেরেছে বলেই হয়তো মীরার অসুখ হঠাৎ এত খারাপের দিকে এগিয়েছে। যতই মনের জোর থাকুক, আর যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করুক, এ খবর শুনে দুঃখিত না হয়ে পারবে কেন মীরা? আজ কি ঠিক আগের মতো হেসে-হেসে বলতে পারবে মীরা, আমি একা নই?

স্বামী দূরে ছিল, তবু তো ছিল। মীরারই স্বামী সুধাকর, আর কারও স্বামী নয়। কিন্তু আজ যে সত্যিই একা হয়ে গিয়েছে মীরা। চার বছর ধরে স্ত্রীকে দেখতে যে স্বামী এল না, সে আজ অন্য নারীর স্বামী হবার পর মীরাকে মনে রেখেছে কিনা সন্দেহ।

কি আশ্চর্য, মনোরমা আর সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন মীরা সেন। মীরার চোখের কোটরের হাড় ঠেলে উঠেছে, কিন্তু চোখে কাজল দিতে ভুলে যায়নি মীরা। সত্যিই, মীরার চোখ দুটো দেখতে খুব সুন্দর। দুই হাতে দু'গাছা করে নীল কাঁচের মোটা চুড়ি। হাতের আঙুলগুলি শুকিয়ে গিয়েছে, তবু কত নরম বলে মনে হয়। ভাঙা গাল, চিবুকটা চুপসে গিয়েছে। তবু মীরার মুখটা কত সুন্দর দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, বুঝতে পারা যায়, মুখটাকে যেন সাবান-জল দিয়ে ঘষা-মাজা করেছে মীরা। খোঁপার মধ্যে একটা সাদা ফুলও গোঁজা রয়েছে। গলার নালীটা ধুকধুক করে কাঁপছে; কিন্তু চোখে পড়েছে মনোরমার, মীরার গলায় পাউডারের গুঁড়ো লেগে রয়েছে।

মীরা সেন বললেন—বুঝেছি, তোমরা খবরটা শুনেছ।

মনোরমা—হ্যাঁ।

মীরা—ভালই হলো।

সুনন্দা বললেন—আপনি কি তাই মনে করেন?

মীরা—নিশ্চয়। আমার মতো একটা মিথ্যে মানুষের জন্যে মায়া করে সে যদি চিরকাল একা-একা পড়ে থাকতো, তবে সেটা কি ভাল হতো?

মনোরমা—তুমি তাহলে...।

মীর—আমি খুশি হয়েছি। আমি নিজেকে একটুও একা মনে করি না। যেখানেই থাকুক আর যার সঙ্গেই থাকুক, সে মানুষটা ভাল থাকলেই হলো।

ঘেসো জমির ওপারে মেহেদির বেড়ার কাছে পায়রার দল হুটোপুটি করছে। চমকে ওঠে মীরা সেনের চোখ। গলা টান করে তাকিয়ে থাকেন মীরা সেন।

মেহেদির বেড়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে কে-যেন একজন তাঁর ঠোঙ্গা থেকে ছোলা তুলে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর লোভী পায়রার দল হুটোপুটি করে খুঁটে খুঁটে ছোলা খাচ্ছে।

জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, গলায় কম্ফোর্টার জড়ানো, পরনে ফ্লানেলের পায়জামা, চোখে চশমা, এক ভদ্রলোক মেহেদির বেড়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।

কোন সন্দেহ নেই, ভদ্রলোক পুরুষ যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের একটি মানুষ।

মীরা সেনই বলে ওঠেন—ওই ভদ্রলোকের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ।

মনোরমা—কি বললে ?

মীরা সেন—জমাদারনীর কাছে শুনেছি ওই ভদ্রলোক সপ্তাহে অন্তত তিন দিন রক্ত বমি করেন।

সুনন্দা—কে ভদ্রলোক ? বাড়ি কোথায় ?

মীরা সেন—তা জানি না। তবে রোজই দেখতে পাই, কখনও সকালবেলা, কখনও বা সন্ধ্যাবেলা ওই বেড়ার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর পায়রাকে ছোলা খাওয়াচ্ছেন।

মনোরমা আর সুনন্দা, দুজনেরই চোখের দৃষ্টি করুণ হয়ে ওঠে। সত্যিই তো, ভদ্রলোক যেন এই পৃথিবীর সব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শেষবারের মতো একটা মায়ার খেলা খেলে নিচ্ছেন।

মীরা সেন বলেন—ভদ্রলোক ছবি আঁকতে জানেন। এক-একদিন ওই মাঠেব ওপব চেয়ারে বসে আর ছবি আঁকার সরঞ্জাম হাতেব কাছে নিযে

মনোরমা—গির্জার ছবি আঁকেন ?

মীরা হাসেন—না।

সুনন্দা—হাসপাতালের ছবি ?

মীরা—না।

মনোরমা—গাছপালার ? পায়রার ? আকাশের ছবি ?

মীরা—না।

সুনন্দা—তবে ?

মীরা—কে জানে কিসের ছবি আঁকেন, বুঝতে পারি না। আমি শুধু চুপ করে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই এইবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলেন—আজ তাহলে চলি !

মীরা—হ্যাঁ এস, কিন্তু একটা মজার কথা কি জানো ?

মনোরমা—কি ?

মীরা—আমার মনে হয়, ওই ভদ্রলোক শেষ হবার আগে আমিই শেষ হয়ে যাব।

মীরা সেনের চোখের তারা ঝিকঝিক করছে। মনোরমা বলেন—চলি।

৩

পয়লা বৈশাখ। বৎসরের প্রথম দিন। শৈলেশবাবু বলেছেন, যাও মনো, মহিলাকে আজকের দিনে কিছু ফুল দিয়ে আর দুটো ভাল কথা বলে এস। শত হোক, আমাদের স্কুলটার জন্যেই তো উনি এত খেটেছিলেন।

তাই এসেছেন মনোরমা। এসেছেন সুনন্দা। মনোরমার হাতে ফুল। সুনন্দার হাতে

সন্দেশের প্যাকেট আর ফলের ঠোঙা।

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। মেহেদির বেড়ার ছায়ার উপরে পায়রার দল নিঝুম হয়ে বসে আছে। পায়রাদের এত মায়া করে ছোলা খাওয়ান পুরুষ যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের যে ভদ্রলোক, তিনি এখনও আসেননি।

মীরা সেনের ঘরের দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে উঁকি দিলেন মনোরমা। ডাকও দিলেন—মীরা!

কিন্তু সাড়া দিলেন না মীরা সেন। বিছানার মাঝখানে একটা বালিশকে রেখে, সেই বালিশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে বিছানার উপর নিথর হয়ে পড়ে আছেন মীরা সেন।

কি আশ্চর্য, মীরার হাতের সেই নীল কাঁচের চারটে চুড়ির মধ্যে তিনটেই ভেঙে গিয়েছে। ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলি বিছানার উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। খোপা ভেঙে রুক্ষ চুলের ভার এলিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, রোদের কষ্টে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করেছে মীরা। তাই এখন অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

—মীরা!

ডাক শুনে বিছানার উপর উঠে বসেন মীরা সেন।

দেখেই বুঝতে পারা যায়, মীর সেন তাঁর ভেজা চোখ দুটোকে বিছানাতে বেশ ভাল করে ঘষে ঘষে শুকনো করে দিয়েছে।

—কি হলো মীরা? শরীর খারাপ? খুব কষ্ট হচ্ছে?

মনোরমার প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়েন মীরা সেন।—না। ভালই আছি।

সুনন্দা বলেন—এবার আপনার খবর বলুন।

মীরা—একটা খবর আছে।

মনোরমা—কি?

মীরা—সেই ভদ্রলোক আর নেই।

চমকে ওঠেন মনোরমা আর সুনন্দা।—অ্যাঁ, কে? পায়রাগুলোকে ছোলা খাওয়াতেন যে ভদ্রলোক?

মীরা—হ্যাঁ। ওই শুনুন, গির্জার ঘন্টা বাজছে।

মনোরমা—হ্যাঁ, শুনছি। কিন্তু—।

মীরা—বুঝলে না? ওই ভদ্রলোক খ্রীস্টান মানুষ। এই তো, মাত্র এক ঘন্টা হলো, এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, পুরুষ-ওয়ার্ডের গেট দিয়ে কফিনের গাড়িটা চলে গেল।

সুনন্দা—কোথায় গেল?

মীরা—প্রথমে গির্জাতে, তারপরে ওই সমাধির আঙিনাতে।

মনোরমা জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।—এই তো মানুষের জীবন! আচ্ছা, আজ আমরা এখন চলি, মীরা! কেমন?

মীরা সেন—এস।

দরজার দিকে এগিয়ে যান মনোরমা আর সুনন্দা, কিন্তু চমকে ওঠেন, থমকে দাঁড়ান, পিছন ফিরে তাকান। মীরা সেনের ধুকপুকে বুকের একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস যেন ডুকরে উঠেছে।

—কি হলো মীরা? ওরকম করছো কেন? মীরা সেনের কাছে এসে প্রশ্ন করেন মনোরমা।

মীরা সেন বলেন—সত্যি মনো, বড্ড একা-একা বোধ করছি। একটুও ভাল লাগছে না।

মনোরমা আর সুনন্দা দুজনেই মীরা সেনের সেই শীর্ণ সাদাটে করুণ মুখটার দিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে থাকেন। তারপরই বললেন—আমরা এবার যাই।

তৃষিত মরু

তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, যাচ্ছেন কনখলে তাঁর আশ্রমে, অথচ একজনের অনুরোধের চাপে পড়ে মধুপুরেই ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। আর, নেমে পড়েই হেসে ফেললেন—এঃ, এবকম যে একটা ট্রেন-দুর্ঘটনায় পড়তে হতে পারে, সেটা তো কখনও মনে হয়নি, শিবনাথ। আগে মনে হলে, এই লাইনের ট্রেনে উঠতাম না।

প্রতি বছর সাগর-স্নানের পর কলকাতা থেকে কনখলের আশ্রমে ফিরে যাবার সময় স্বামী পূর্ণানন্দ গয়া লাইনের ট্রেন ধরেন। এই প্রথম, হয় ভুল কবে নয় তাড়াতাড়িতে, এমন এক এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট কিনে ফেলেছিলেন, যে ট্রেন সীতারামপুর থেকে ঘুরে যায়। তাবপর মধুপুর হয়ে চলে যায়।

শিবনাথও হাসেন—আপনার পক্ষে ট্রেন-দুর্ঘটনা হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে তো নয়। আমি তো বলবো, এটা আমার একটা হঠাৎ-সৌভাগ্যেব ঘটনা।

অভাবিত একটা বিস্ময়, হঠাৎ দেখতে পাওয়া একটা সৌভাগ্যের ঘটনা বইকি। ট্রেনের কামরাতে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে শিবনাথ যেন তাঁর আধ-জাগা ঢুলু-ঢুলু চোখেই তিরিশ বছ্ব আগের একটা চেনামুখের ছবি দেখতে পেযে চমকে উঠেছিলেন। তারপর ভাল করে চোখ মেলে আর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখেছিলেন, ওদিকের সীটের এক কোণে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। বেশ বয়স হয়েছে সন্ন্যাসীর, সত্তর না হোক অন্তত পঁয়ষট্টির কম নয়। গায়ে ঢিলে-ঢালা গেরুয়ারঙের আঙরাখা, তেমনি গেরুযারঙের একটি চাদর দিয়ে গলাটা জড়ানো, চোখে চশমা। খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছেন সন্ন্যাসী। মনে হয়, এ বয়সেও এই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিশক্তির জোর তেমন কিছু কমে যায়নি। তা না হলে, ট্রেনের এই ঝাঁকুনিতে আব এরকম মিটমিটে আলোতে বই পড়া সম্ভব হতো না। পাতার পব পাতা উলটিযে বই পড়ে চলেছেন সন্ন্যাসী।

উঠে গিযে একেবারে সন্ন্যাসীর সীটেব মুখোমুখি সীটের উপব বসে শিবনাথ এইবার তাঁর চোখ দুটোকে আরও বড়-বড় করে নিযে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু আর কি চিনতে কোন অসুবিধে আছে? আর কি বেশি তাকিয়ে দেখবার কোন দরকার আছে?

বইটা বন্ধ করে রাখবাব পর সন্ন্যাসীও শিবনাথের মুখেব দিকে একবার তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়েই তখুনি আর-একবার তাকালেন। তারপব অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন।

যেন পাহাড়ের চূড়া তাকিয়ে আছে একটা পুকুরের জলেব দিকে; আর পুকুবের জল একটা পাহাড়ের চূড়াব দিকে তাকিয়ে আছে। ওখানে ওই সীটে একজন বুড়ো সন্ন্যাসী মানুষ, আর এখানে এই সীটে একজন মাঝবয়সী কেবানী মানুষ। কাছাকাছি হয়েও দুজনের জীবনের মধ্যে যে দুস্তর দূরত্ব দিয়ে গড়া একটা কঠিন ব্যবধান। কেউ কারও আপন হতে পারে না।

কিন্তু শিবনাথ ভুলবেন কেমন করে, ইনি যে সেই মণিকাকা,—মণিনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি শিবনাথের ছেলেবেলার জীবনে আপনজনের চেয়েও বেশি আপন একজন ছিলেন। শিবনাথের বাবার পিসতুতো ভাই মণিনাথ, এই মণিকাকাই যে একদিন বলেছিলেন, ঘোড়া চড়তে শিখবি, শিবু? তাহলে পুজোর ছুটিতে রায়গঞ্জে চলে আসিস। আমার ছোট ঘোড়াটাকে তোর জন্যে ছেড়ে দেব। খুব শান্ত মেজাজের ঘোড়া, চমৎকার দুলকি চালে

চলতে পারে।

কী না ছিল মণিকাকার! রায়গঞ্জে অত বড় দালান বাড়ি ছিল। দীঘি, পুষ্করিণী বাগান আর খামার, সবই ছিল। বাপের এক ছেলে মণিকাকা, এম. এ. পাস করেছিলেন, আইন পাস করেছিলেন। কিন্তু বিয়ে করেননি, যদিও মণিকাকার বিয়ে দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন মণিকাকার জ্ঞাতি-কাকা কেষ্টবাবু। মণিকাকার বিয়ের জন্যে চিন্তা করবার মতো কাছাকাছি মানুষ তখন ওই একজনই ছিলেন, রায়গঞ্জের কেষ্টবাবু। মণিকাকার বাবা আর মা দুজনের কেউই তখন বেঁচে ছিলেন না।

শিবনাথের গাঁয়ের বাড়ির পুকুরটার একটা সুনাম ছিল; এত বড় আর এত লালচে চেহারার মিরগেল এই জেলার কোন বড় দীঘিতে পাওয়া যায় না। রায়গঞ্জ থেকে বিরামপুর, কতই বা দূর? ঘোড়া চড়েই চলে আসতেন মণিকাকা, আর, সেই বিখ্যাত পুকুরের মিরগেল ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

—না রে শিবু, দিনের বেলাতে মাছ ধরে কোন সুখ নেই। মাছ ধরবো রাত্রিবেলা। দেখবি, কেমন মজা হয়।

রাত্রিবেলা পুকুরের জলে ছিপ ফেলে বসে থাকতেন মণিকাকা। আর শিবনাথ বসে থাকতো তাঁর পাশে। ফাত্‌নার মাথায় একটা জোনাকিকে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন মণিকাকা। আর বলতেন,—বসে বসে দেখ শিবু, আমি বিনা চারেই কত বড় মিরগেল তুলছি। চার ফেলে মাছ ধরা তো এমন কিছু বাহাদুরী ব্যাপার নয়।

শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে আর এক মস্ত একটা লগি হাতে নিয়ে যখন দুপুরবেলায় আমবাগানের ভিতর ঘুরে বেড়াতেন মণিকাকা, তখন তাঁর অমন ধবধবে ফর্সা মুখের রঙ যেন খুশি হয়ে আর লালচে হয়ে টুকটুক করতো। মনে আছে শিবনাথের, লগি তুলে উঁচু ডালের একটা পাকা আমের নাগাল না পেয়ে সেদিন কী কাণ্ড করেছিলেন মণিকাকা।—আমি গাছের গোড়ায় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছি, শিবু। তুই আমার কাঁধের উপর চড়ে আর বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়া। তারপর লগি দিয়ে ঐ আমটাকে বেশ জোরে একটা খোঁচা দিবি। নে, ওঠ, উঠে পড়।

সেই মণিকাকা একদিন সবার চোখের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। সবই শুনতে জানতে আর বুঝতে পেরেছিলেন সেদিনের সেই ছেলেমানুষ শিবনাথ। অনেক দূরে কোথায় যেন বেড়াতে বের হয়েছিলেন মণিকাকা। দু'মাস পরে রায়গঞ্জে ফিরে এলেন। তারপর মাত্র একটা মাস তাঁকে দেখতে পেয়েছিল রায়গঞ্জের মানুষ। সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে আর রায়গঞ্জ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন মণিকাকা। তার কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিলেন শিবনাথ, সেদিনের সেই ছেলেমানুষ শিবু, বিরামপুরের পুকুরে আর মিরগেল ধরতে আসবেন না মণিকাকা। একদিন রায়গঞ্জ থেকে বিরামপুরে ফিরে এসে এবাড়ি সে-বাড়ির সবাইর কাছে একটা আশ্চর্যের খবর জানালেন বাবা—সম্পত্তি বিক্রির সব টাকা কনখলের একটা আশ্রমকে দান করে দিয়েছে মণি, আর নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে সেই আশ্রমেই আছে।

তিরিশ বছর আগে পনের বছর বয়সের চোখ দিয়ে দেখা একটি মানুষকে আজ দেখেই চিনতে পারা তো চারটিখানি স্মৃতিশক্তির কথা নয়। তবু যে চিনতে পেরেছেন শিবনাথ, সেটা শুধু স্মৃতির জোরে নয়। মণিকাকার একটা কানের নীচে নীলরঙের একটা আঁচিল ছিল। মণিকাকার ডান ভুরুর উপরে ছোট্ট একটা কাটা-দাগ ছিল। ঘোড়া থেকে একবার পড়ে গিয়ে মণিকাকার ডানভুরুর উপরের কাছে ছুঁচলো একটা ইট-খোয়ার টুকরো বিঁধে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুটো চিহ্ন না থাকলেই বা কি হতো? মণিকাকার চল্লিশ বছর বয়সের সেই মুখটা তো ভিন্ন রকমের কোন রূপ ধরে ফেলেনি। সেই টিকালো নাক, সেই বড়-বড় চোখ, আর সেই ধবধবে লালচে-ফর্সা রঙ, সবই আছে। সারা রাতের শিশিরে ভিজে গিয়ে ফুলের চেহারা যে-রকম

হয়, মণিকাকার মুখের চেহারাতে শুধু সেরকমের একটা পরিবর্তন দেখা যায়। সবই ঠিক আছে, শুধু একটা স্নিগ্ধ শিথিলতার প্রলেপ পড়েছে।

কিন্তু সন্ন্যাসী মানুষের প্রায় সত্তর বছর বয়সের চোখ দুটোরও দৃষ্টির অদ্ভুত জোব আছে বলতে হবে। তা না হলে আজ এই ট্রেনের কামবাতে এত মিটমিটে একটা আলোর মধ্যে বসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের শিবনাথের মুখের মধ্যে তিরিশ-বছব আগের দেখা একটা ছেলেমানুষের মুখটাকে চেনা-চেনা বলে সন্দেহ করলেন কি করে? আব বলবেনই বা কেন—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি?

চমকে ওঠেন শিবনাথ—দেখেছেন বই কি, কিন্তু মনে করতে পারছেন না বোধহয়।

—তা মনে করতে অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই। আব। হঠাৎ হেসে ফেললেন সন্ন্যাসী।—আর মনে কবেই বা লাভ কি?

শিবনাথ চমকে ওঠেন।—কিন্তু আমি যে সবই মনে কবতে পাবছি। আমাব ভুল হচ্ছে না বোধহয়।

—কি মনে করতে পারছেন?

শিবনাথের গলার স্বর কাঁপে।—আপনি যদি মণিকাকা হন, তবে আমি সেই শিবু, বিরামপুরের শিবনাথ।

চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। স্নিগ্ধভাবে হাসলেন, তারপর আবার হাতেব বইটা খুলে নিযে পড়তে শুরু করলেন।

কী বই পড়ছেন সন্ন্যাসী? ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য। ট্রেনের থার্ড ক্লাসেব এই কামবাতে মিটমিটে আলোতে বাক্স তোরঙ্গ পেটরা পুঁটুলি ঝুড়ি-ঝোড়া-বস্তাব এত কাছে, আব যাত্রীদেব এত মুখরতার মাঝখানে কত শান্ত হয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসী। ব্রহ্মসূত্রেব শাঙ্কবভাষ্যেব মধ্যে যেন তাঁরও জীবনের সব ভাষ্য মিশিযে দিযেছেন।

কিন্তু শিবনাথের চোখদুটো যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছে, বিবামপুবেব পুকুবে ছিপ ফেলে বসে আছেন মণিকাকা। শিবনাথ ডাকেন—মণিকাকা।

চমকে উঠলেন, বোধহয একটু অপ্রসন্নও হলেন সন্ন্যাসী। কিন্তু তাবপবেই হাতেব বইটা বন্ধ করে দিয়ে হাসলেন—ও নামে আমাকে এখন আর ডাকতে নেই।

শিবনাথ—আজ্ঞে, আমি যে আপনাব নতুন নামটা জানি না।

—পূর্ণানন্দ।

শিবনাথ—আজ্ঞে, আমার পক্ষে আপনাকে এরকম শুধু একটা নাম ধবে ডাকা কি উচিত হবে? আমি যে আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আপনি যে আমার গুরুজন।

পূর্ণানন্দ আবার হাসেন।—এঃ, তুমি সত্যিই যে আমাকে বিপদে ফেললে। আমি কি তোমার সুবিধার জন্যে ট্রেনের এই শুধু কয়েক ঘন্টার দরকারে সেই পুবনো নামটা ধরবো? তা হয় না শিবনাথ।

শিবনাথ কুণ্ঠিতভাবে বলেন—তা আপনি যদি আপত্তি করেন, তবে না হয পুরনো নামে আর ডাকবো না, সাধুকাকা।

এইবার বেশ জোরে মাথা দুলিয়ে হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ।—এ নামটা মন্দ নয়। একটা কম্প্রোমাইজ। যাই হোক, কিন্তু, তোমাকে তো জিজ্ঞাসা করবাব মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

হঠাৎ যেন বেশ কঠিন একটা ফাঁপরে পড়ে গেলেন পূর্ণানন্দ। সত্যিই তো, শিবনাথের কাছে আজ আর তাঁর বলবার মতো কী কথা থাকতে পারে? বিরামপুরের সেই আমবাগানে এখনও যদি সেই রোদ আর ছায়া থেকেও থাকে, তবু তাঁর মনের কাছে তো নেই। এসব

রোদ আর ছায়া যে পূর্বজন্মের একটা জগতের মতো ক্ষণিকতার ছবি, কনখল আশ্রমের পূর্ণানন্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শিবনাথ বল্লেন—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন সাধুকাকা ?

পূর্ণানন্দ—যাচ্ছি কনখলে, আমার আশ্রমে।

শিবনাথ—কিন্তু মধুপুরে অন্তত একটি দিনও কি থেকে যেতে পারবেন না ?

পূর্ণানন্দ—কেন ? মধুপুরে আমার কি আছে ?

শিবনাথ—আপনার কিছু নেই, সাধুকাকা। আমার আছে।

—কি আছে তোমার ?

—সবই আছে। একটি বাড়ি আছে। স্ত্রী ছেলে-মেয়ে আছে। আমি এখন মধুপুরের স্কুলে মাস্টারি করি।

—বেশ তো, ওর মধ্যে আমাকে ডেকে লাভ কি ?

—আপনার কোন লাভ নেই। আমাদের আছে।

—তোমাদেরই বা কি লাভ ?

—আপনার গল্প যে সেদিনও ছেলে-মেয়েদের কাছে বলেছি। সেই লগি দিয়ে আম পাড়বার গল্প, ফাতনাতে জোনাকি গেঁথে রাত্রিবেলা মিরগেল ধরবার গল্প, আপনার সেই ঘোড়া-চড়া আর বেহালা বাজাবার গল্প। আপনার বিদ্যের গল্প।

পূর্ণানন্দ এইবার একটু কুণ্ঠিতভাবে, যেন একটু লজ্জিতভাবে, হাসলেন—ওসব তোমার মণিকাকার গল্প। আমার গল্প নয়।

শিবনাথ—আজ্ঞে আমার কাছে তো আপনিই মণিকাকা।

পূর্ণানন্দ এইবার তার চোখ থেকে চশমাটাকে খুলে নিলেন। গেরুয়া চাদরের একটা কোণ তুলে নিয়ে চোখ দুটো আর কপালটাকে আস্তে আস্তে মুছলেন। মনে হয় একটু চিন্তিত হয়েছেন। কিংবা, সত্যি একটু ভয় পেলেন নাকি পূর্ণানন্দ ? পূর্ণানন্দের এই শান্ত প্রাণের ভিতরে কোথাও খুব গোপন হয়ে একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাস বোধহয় ছটফট করছে। শিবনাথের কিন্তু মনে হয়, সাধুকাকার খুব তেষ্টা পেয়েছে। বুড়ো মানুষ সাধুকাকা, এতক্ষণ ধরে বই পড়ে পড়ে তাঁর জিভটা বোধহয় একটু শুকিয়ে গিয়েছে। শিবনাথ বল্লেন—জল খাবেন সাধুকাকা, ঠাণ্ডা জল !

—হ্যাঁ।

ট্রেনটা তখন একটা স্টেশনে থেমেই ছিল। কাজেই চেঁচিয়ে পানিপাঁড়েকে ডাক দিয়ে এক গেলাস জল জোগাড় করতে শিবনাথের কোন অসুবিধাও হয়নি। জল খেয়ে নিয়ে পূর্ণানন্দও পরিতৃপ্তভাবে আর আস্তে একটা হাঁপ ছাড়লেন।

শিবনাথ বল্লেন—বাড়ির সবাই আপনাকে দেখলে যে কত খুশি হবে, সেটা আর আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না, সাধুকাকা। আমার প্রার্থনা, মধুপুরে অন্তত একটি দিনের জন্য থেকে যান।

পূর্ণানন্দ এবার মুখ টিপে হাসেন—বুঝেছি শিবনাথ, তুমি আমাকে একটা রিপ-ভ্যান-উইংকল পেয়েছো। আমাকে দেখে সবারই একটা মজার আশ্চর্য মনে হবে। তাই না ?

শিবনাথ—না না না, কখ্‌খনো না। আপনার পায়ের ধুলো পেলে একটা ভাগ্যি মনে করবে সবাই। সত্যিই, একটা পুণ্যি ছিল নিশ্চয়, তা না হলে হঠাৎ এভাবে আপনার দেখা পেয়ে যাব কেন ?

এরপর আর মাত্র পনের মিনিট সময় লেগেছিল। মধুপুরে পৌঁছে গেল ট্রেন। বইটাকে

ঝোলার ভিতরে রেখে দিলেন পূর্ণানন্দ। আর, শিবনাথ নিজেই ব্যস্ত হয়ে পূর্ণানন্দের কম্বলটাকে গুটিয়ে নিয়ে হাতে তুলে নিলেন।

মধুপুরের স্কুলের মাস্টার শিবনাথের বাড়ি। সে বাড়ির চারদিকে ফণীমনসার বেড়া। আর, বারান্দাতে ওঠবার সিঁড়ির কাছে একটা লতানে গোলাপ বাঁশ বেয়ে টালির চালার উপর উঠেছে। বড় বড় হলদে গোলাপের পাপড়ি সিঁড়ির উপরেও ঝরে পড়েছে।

হলদে গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো সেই সিঁড়ির উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন পূর্ণানন্দ। আর, শুনে শুনে চমকে ওঠেন, ঘরের ভিতরে ঢুকে কী ভয়ানক চিৎকার করে কথা বলছে শিবনাথ—শুনছো, শিগগির দেখবে এস, আমাদের সেই মণিকাকা এসেছেন। শুনছিস নীলি, শিগগির দেখবি চল, মণিকাকা এসেছেন।

বের হয়ে আসে প্রীতিকণা, শিবনাথের স্ত্রী, কোলে একটা বাচ্চা, যার নাম ডাকু। ব্যস্ত হয়ে মাথার কাপড় টানে প্রীতিকণা। বের হয়ে আসে নীলিমা, শিবনাথের মেয়ে, এবছরেও স্কুল ফাইন্যাল ফেল করে আবার মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছে। ছুটে এসে পূর্ণানন্দের মুখের দিকে তাকায় সাধু, শিবনাথের বড় ছেলে, পনের বছর বয়স, নীলিমার চেয়ে তিন বছরের ছোট।

সকলেই একসঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে আর হাত বাড়িয়ে পূর্ণানন্দকে প্রণাম করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই পূর্ণানন্দ চমকে ওঠেন, দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সরে দাঁড়ান—না না, আমি কারও প্রণাম নিই না, এসব করলে আমি কিন্তু বেশ বিরক্ত হব শিবনাথ।

শিবনাথ—ঠিক আছে। বুঝেছি সাধুকাকা, আপনাকে আর বলতে হবে না। এই নীলি...এই শুনছো...তোমরা সরে যাও।

এরপর শিবনাথের বাড়ির বারান্দায় উঠে একটা বেতের মোড়ার উপর বসলেন পূর্ণানন্দ। ঝোলাটাকে নামিয়ে মেজের উপর রাখলেন। আর, বেশ শান্ত-গম্ভীর স্বরে একটা কথা বললেন—রাত্রিবেলা আমি কিন্তু মেপে চার মুঠো যবের ছাতু ছাড়া আর কিছু খাই না, মনে রেখ শিবনাথ।

শিবনাথ ব্যস্তভাবে বললেন—যে আজ্ঞে, আমাদের মধুপুরের বাজারে বেশ ভাল যবের ছাতু পাওয়া যায়। আমি এখনই কিনে আনছি।

মাত্র একটি দিন মধুপুরে থাকবেন। তারপর কনখল আশ্রমে চলে যাবেন পূর্ণানন্দ। শিবনাথের এই অনুরোধ যেন পূর্ণানন্দের পূর্বজন্মের জগৎটারই একটা করুণ মিনতির ক্ষণ-আহ্বান। অনিচ্ছা থাকলেও প্রত্যাখ্যান করেননি পূর্ণানন্দ।

কিন্তু এই একটি দিনের থাকা যেন একটা ঝড়ের মধ্যে থাকা। সে ঝড়ের এলোমেলো যত পীড়ন আঘাত আর উপদ্রব সহ্য করতে করতে যেন হয়রান হয়ে গেলেন, হাঁসফাঁস করলেন আর হাঁপিয়ে পড়লেন পূর্ণানন্দ।

সকালবেলাতে বাইরের বারান্দাতে যখন কম্বলটা পেতে নিয়ে বসলেন আর একটু স্বস্তি বোধ করলেন পূর্ণানন্দ, তখনই আবার একটা অস্বস্তিতে তাঁর এত শান্ত চোখদুটোও ছটফট করে ওঠে। পূর্ণানন্দ ডাকেন—শিবনাথ তুমি কোথায়? এদিকে একবার এস আর দেখে যাও।

স্বস্তি এই যে, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি। শিবনাথের বাড়িটা ছেলেপুলের বাড়ি হয়েও খুব বেশি চেঁচামেচির বাড়ি নয়। ঘরের জানালাগুলিও বেশ বড় বড়; ঘরে খুব হাওয়া ঢুকতে পারে। তা ছাড়া, এই ঘরটাও অন্য সব ঘরের লাগোয়া একটা ঘর নয়; একটু দূরের ঘর। মাঝে বেশ চওড়া এক টুকরো জমি বেশ ভাল একটা ব্যবধান হয়ে পড়ে আছে। সে জমিতে শুধু উঁচু দূর্বাঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। দেখতে অনেকটা কনখলের আশ্রমবাড়ির দক্ষিণ

দিকের সেই ঘরের সামনের জমিটার মতো, যে ঘরের মেজেতে পূর্ণানন্দের বিছানার একটি সতরঞ্চি আর দুটো কম্বল পড়ে থাকে।

শেষ রাতে যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখনও পূর্ণানন্দ বেশ শান্তি আর বেশ স্বস্তি বোধ করেছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তের সেই গভীর মৌন এখানেও বসে অনুভব করতে কোন অসুবিধে হয়নি। সত্যিই কোথাও কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। গাছের মাথায় একটা পাখিও উসখুস করে সামান্য একটা শব্দও জাগিয়ে তোলেনি।

খোলা জানালার কাছে বসে পুবের আকাশে সূর্য উঠতেও দেখেছিলেন পূর্ণানন্দ। দেখতে কোন অসুবিধে হয়নি, কনখলের আশ্রমবাড়ির সেই ঘরের জানালার কাছে বসে যেমন দেখা যায়, প্রথমে কয়েকটা লাল রেখা ফুটে উঠলো আকাশে, তারপর, সত্যিই জবাকুসুমসংকাশ আভা ছড়িয়ে পড়লো। তারপর দেখতে দেখতে জ্যোতি ফুটে উঠলো।

কিন্তু তারপর থেকে বারান্দাতে এই বেতের মোড়ার উপর বসে থাকতে, কিংবা বই পড়তে খুবই অসুবিধে বোধ করেছেন পূর্ণানন্দ। এ রকম করে এক-একটা বাধা দেখা দিতে থাকলে আনন্দগিরির টীকা একটু মন দিয়ে পড়বার আনন্দটুকু আর পাওয়া যাবে না।

একটি বাচ্চা ছেলে, এটি নিশ্চয় শিবনাথের সেই ছেলেটি, যাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শিবনাথের স্ত্রী ; সে বাচ্চাটা মাঝে মাঝে তড়বড় করে হামা দিয়ে বারান্দার ওদিকের কিনারার একেবারে কাছে চলে যাচ্ছে। বারান্দার নীচে ওখানে একগাদা ভাঙা টালির টুকরো পড়ে আছে। নিতান্ত কচি একটা বাচ্চা, ও কি করে বুঝবে যে, কোথায় ভয় আছে বা বিপদ আছে ? ধুপ করে যদি পড়ে যায় বাচ্চাটা, তবে তো একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে। নাকে মুখে চোখে কিংবা মাথায় ভয়ানক চোট লাগবে ; চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবে। সে একটা দুঃসহ অস্বস্তির উপদ্রব হয়ে পূর্ণানন্দের এই সকালবেলার মনের শান্তি নষ্ট করবে। পূর্ণানন্দ আবার ডাকেন—শিবনাথ শুনছো, এদিকে একবার এস। এই বাচ্চাটিকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

ঘরের ভিতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে আসেন শিবনাথ। এসেই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—এই পাজি ছেলে ! এই ডাকু ! খবরদার !

বলতে বলতে আরও এগিয়ে এসে শিবনাথ ওই হামা-দেওয়া ডাকুর একটা ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে আর ঝুলিয়ে কাঁধের উপর তুলে নিলেন। পূর্ণানন্দের চোখ দুটো হঠাৎ একটু কুঁচকে যায়। পূর্ণানন্দ বলেন—আঃ, কী করছো শিবনাথ !

শিবনাথের স্ত্রী প্রীতিকণাও একবার এক পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে পূর্ণানন্দর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই চা খেয়েছেন পূর্ণানন্দ। কিন্তু আবার কেন এসে সামনে দাঁড়ায় শিবনাথের স্ত্রী ?

প্রীতিকণা বলেন—আপনাকে সামান্য একটু খাবার এনে দিই, সাধুকাকা।

—খাবার ? এখন আবার খাবার কিসের ? পূর্ণানন্দের গলার স্বরে বেশ স্পষ্ট একটা বিরক্ত ভাব ফুটে ওঠে। বেশ জোরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানান পূর্ণানন্দ—এ সময়ে আমি কিছুই খাই না। আমার জন্যে দুপুরবেলাতে শুধু দু'মুঠো আতপ চালের ভাত আর একটু দুধ রেখে দিও, তাহলেই যথেষ্ট।

প্রীতিকণা চলে যেতেই ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন শিবনাথ।—দেখুন তো, লুচি ভেজেছে আর আলু-পটোলের একটা ডালনাও তৈরি করে ফেলেছে প্রীতি। এখন আবার উল্টো চাপ দিচ্ছে।

পূর্ণানন্দ—কি হয়েছে ?

শিবনাথ—এখন বলছে, সাধুকাকার জন্যে যে খাবার তৈরি করলাম, সে খাবার তো আর কাউকে খেতে দেওয়া চলবে না। ফেলে দেওয়াও খুব খারাপ হবে।

পূর্ণানন্দ আশ্চর্য হন—কি বলছো তুমি ?

শিবনাথ হাসতে চেষ্টা করেন।—সাধু মানুষের প্রসাদ হবে বলে আশা করে যে-খাবার তৈরি করা হলো, সেটা তো এখন আর যাকে-তাকে দেওয়া চলবে না।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু আমি তো লুচি-টুচি আশা করিনি। তোমাদের অসুবিধে কোথায় ?

শিবনাথ—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক কথা। প্রীতিরই একটা আশা ছিল যে..।

পূর্ণানন্দ বোধহয় আবার একটা বিরক্তভাব চাপতে চেষ্টা করেন।—তোমরা যদি আশা কর যে, আমার উপর একটা উপদ্রব করলে ভাল হয়, তবে তো আমাকে এখনই...।

—না না, কখ্খনো না সাধুকাকা। আপনি একটুও ভাববেন না। শিবনাথ যেন ক্ষমা চাইবার একটা আকুলতা নিয়ে কথা বলেন।—আমি এখনই নিজেই ওই খাবারকে আপনারই প্রসাদ মনে করে খেয়ে ফেলবো। প্রীতিও আর একটিও বাজে কথা বলতে পারবে না।

পূর্ণানন্দ এইবার হাসেন।—তোমাদের এই জায়গাটাকে আমি দেখবাব আগেই সন্দেহ করে যতটা ভয় পেয়েছিলাম, ততটা ভয় করবার কিছু নেই।

শিবনাথ—হ্যাঁ, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—বোধহয় টাউন থেকে খুব কিছু দূবে নয তোমাব এই বাড়িটা ?

শিবনাথ—আজ্ঞে না।

পূর্ণানন্দ—তবু বেশ নিরিবিলি বলে মনে হয। তা ছাড়া হইহল্লা গোলমালও নেই বলে মনে হয়।

শিবনাথ—আজ্ঞে না, একটুও না।

পূর্ণানন্দ—তাই তো আমার বিশেষ কোন অসুবিধে হলো না। বুঝতেই তো পার, একটু নিরিবিলি জায়গা না হলে, একটা শান্ত নীরব পরিবেশ না থাকলে আমাব মতো মানুষের পক্ষে স্বস্তিবোধ করা তো সম্ভব নয়।

শিবনাথ—খুব সত্যি কথা। কিন্তু সাধুকাকা .।

পূর্ণানন্দ—কি ?

শিবনাথ—আপনি যদি আরও দুটো দিন থাকেন, তবে আরও বুঝতে পাববেন, এখানে আপনার কোন অসুবিধে নেই। আপনার একটুও অস্বস্তি বোধ করতে হবে না।

পূর্ণানন্দ হাসেন—ব্রিচ অব প্রমিস ! এটা ভাল কথা নয় শিবনাথ। যা কথা হয়েছে, তাই হবে। আমি আজই সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হব।

শিবনাথ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন আর মাথা চুলকোতে থাকেন—তাহলে, তাহলে তো আমার আর কিছুই বলবার সাহস থাকে না।

দুপুরবেলাতে কুয়োতলার কাছে যখন স্নান করতে বসলেন পূর্ণানন্দ, তখন শিবনাথ আবার ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন।—আপনি চুপ করে বসুন সাধুকাকা, আমি এই বালতি করে আপনার গায়ে আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিই।

পূর্ণানন্দ বলেন—তুমি যাও, শিবনাথ। বিরক্ত করো না।

একটা মগ হাতে তুলে নিয়ে বালতি থেকে জল তোলেন আর গায়ে ঢালেন পূর্ণানন্দ, আর মনে মনে সেই প্রিয় স্তোত্রটাও আবৃত্তি করেন।—ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা...।

দু' মুঠো আতপ চালের ভাত, আর একটু দুধ, পূর্ণানন্দের জীবনের দুপুরবেলার সেই সামান্য আহারের শান্তিটা আবার নষ্ট হয়ে যেত, যদি ঠিক সময়ে সাবধান না হতেন শিবনাথ। ভিতরের বারান্দার মেঝের উপরে একটা আসনে বসে সবেমাত্র ভাতের ছোট থালাটার দিকে তাকিয়েছেন পূর্ণানন্দ, তখুনি তাঁর চোখ দুটো চমকে উঠেই স্থির হয়ে যায়। ভাতের থালার

দিকে যেন আর হাত এগিয়ে নিতে চান না পূর্ণানন্দ। আবার একটা অস্বস্তি যেন তাঁর এই হাতের উপর একটা ভার হয়ে চেপেছে। কারণ একটা পাখা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে শিবনাথের স্ত্রী প্রীতি।

কিন্তু শিবনাথ তখনি চোখের ইসারায় প্রীতিকে সরে যেতে বলেন। আর এদিকে এগিয়ে না এসে ঘরের ভিতরে চলে যায় প্রীতি। তারপর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায় আর চুপ করে দেখতে থাকে, দুধ-ভাত খাচ্ছেন সাধুকাকা। একটুও পরিপাটি করে খেতে জানেন না। ছোট্ট ছেলেমানুষের মতো কেমন যেন এলোমেলো করে কিছু ভাত দুধ দিয়ে মাখলেন আর খেলেন, কিছু ভাত এমনিই শুকনো-শুকনো খেলেন। বাটির তলায় থিতানো দুধটুকুও এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে তারপর মিছিমিছি আরও কয়েকটা চুমুক দিলেন।

শিবনাথ বলেন—আপনার বোধহয় দুপুরে একটা ঘুমোবার অভ্যেস আছে সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ হাসেন—ঠিক অভ্যেস নয়, তবে শরীরের যেদিন যেমন অবস্থা হয়—হয় ঘুমিয়ে পড়ি, নয় জেগে বসে বই পড়ি। কিন্তু...।

শিবনাথ—বলুন।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু কোন হই-হল্লার উৎপাত থাকলে ঘুমিয়ে পড়াও হবে না, আর বই পড়াও অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি করবো বলো? এটা যে আমার একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছে। তিরিশটি বছর ধরে নিরিবিলি শান্তির মধ্যে থাকবার অভ্যেস।

শিবনাথ—হ্যাঁ সাধুকাকা। কিন্তু এখানেও কোন হই-হল্লা আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না। আমি তবে আছি কি করতে?

কিন্তু কি আশ্চর্য, যেন শিবনাথের এই প্রতিজ্ঞার কথাটাকে একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্যেই এই দুপুরে যত ফেরিওয়ালার হাঁকডাক ছুটে ছুটে আসছে। চাই গয়ালী থালা বাটি ঘটি। চাই মোটিয়া চাদর। চাই গুলাবছড়ি তিলকুট আওর দেওঘরকা পেড়া!

বার বার ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন শিবনাথ। ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়ান। ফিসফিস করে কথা বলে ফেরিওয়ালাকে বুঝিয়ে দেন, চেঁচিও না, ওদিকে যাও; সাধুজীর শান্তির ঘুম নষ্ট করে দিও না।

পূর্ণানন্দ আজ দুপুরে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েননি। ঘরের জানালার কাছে চুপ করে বসে শুধু বই পড়েছেন। তবু মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছেন, শিবনাথ ঘর থেকে বের হয়ে আর ছুটে গিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়াচ্ছে, আর, হাঁকমুখর যত ফেরিওয়ালাকে নানাকথা বলে বলে নীরব করিয়ে দিচ্ছে, সরিয়েও দিচ্ছে।

বই পড়া বন্ধ করে ডাক দিলেন পূর্ণানন্দ—একবার এদিকে এসে শুনে যাও, শিবনাথ।

কে জানে কেন, শিবনাথের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পূর্ণানন্দ। তারপর বললেন—তুমি না বলেছিলে, তুমি এখানে একটা স্কুলের মাস্টার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সাধুকাকা।

—আজ কি তবে কাজ কামাই করলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি দরকার ছিল?

—দরকার ছিল বই কি। আমি স্কুলে যাই, আর এদিকে যত উপদ্রব এসে আপনাকে বিরক্ত করুক, তা কি কখনও হয়?

—না না, বিরক্ত হবার মতো তেমন কোন উপদ্রব তো দেখলাম না। একটা দিন তোমার এখানে আমার বেশ ভালই কাটলো।

—কিন্তু আমার যে এই একটা দিন কত ভাল কাটলো, সেটা আপনি বোধহয় বুঝতে

পারছেন না।

পূর্ণানন্দ হাসেন—তোমার আবার এত ভাল লাগবার কি আছে।

শিবনাথ—বলেন কি ? আপনাকে যখনি দেখছি, তখনই মনে পড়ছে, এই তো আমাদের সেই মণিকাকা। মিরগেল ধরবার জন্যে রাত জেগে যাঁর সঙ্গে বসে পুকুরে ছিপ ফেলে..।

পূর্ণানন্দ—আঃ, তুমি আর ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটিবে না শিবনাথ।

শিবনাথ—আমার কিন্তু একটু দুঃখ রয়ে গেল সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—কিসের দুঃখ ?

শিবনাথ—আপনার তেমন কিছু যত্ন করতে পারলাম না। আপনিই আপত্তি করলেন বলে..।

পূর্ণানন্দ—থামো শিবনাথ। যত্নের কি আর বাকি রাখলে ? আমিই বা আপত্তি করলাম কোথায় ?

শিবনাথ—ওই যে, আপনার স্নানের সময় নিজের হাতে আপনার গায়ে একটু জল ঢেলে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আপত্তি করলেন। অথচ. ।

পূর্ণানন্দ—কি ?

শিবনাথ—আমার যে এখনও মনে আছে, আমিই তো এক দিন বাঁদরের মতো ধুলোমাখা পায়ে আপনার কাঁধেব উপর দাঁড়িয়ে আর লগি নেড়ে আম পেড়েছিলাম।

পূর্ণানন্দ এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—এই কথা ! তোমার কি ধারণা যে তোমার সেই ধুলোমাখা পায়ের দাগ আমার গায়ে এখনও লেগে আছে ? তুমি কি আমার গায়ে জল ঢেলে দিয়ে সে দাগ ধুয়ে দিতে চাও ?

হাসছেন সাধুকাকা, কিন্তু তাঁর মাথাটা যেন বড় বেশি কাঁপছে। শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে তাঁর চোখের চাহনিটা।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, আমার মনে ওরকমের কোন বাজে ধারণা থাকতেই পারে না। জল ঢেলে দিয়েই কি সবকিছু ধুয়ে দেওয়া যেতে পারে ? পাবে না।

শিবনাথ যেন একটা বাচাল প্রতিধ্বনি। ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলছে শিবনাথ। পূর্ণানন্দের দুই কান বোধহয় শিউরে উঠেছে। দুই চোখের চাহনিও শিথিল হয়ে গিয়েছে। পূর্ণানন্দেব গলার স্বর ঘড় ঘড় করে।—এখন ক'টা বেজেছে, শিবনাথ ?

শিবনাথ—চারটে বেজেছে বোধহয়। সাড়ে চারটের বেশি নয় নিশ্চয়।

পূর্ণানন্দ—তা হলে তো আমাব রওনা হবার সময় হয়ে এল।

শিবনাথ—আজ্ঞে না, এখনও প্রায় আড়াই-ঘন্টা বাকি। আপনার ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়।

পূর্ণানন্দ—ওই একই কথা। আর মাত্র দুই আড়াই ঘন্টা।

শিবনাথ—আপনি কি যাবার আগেও একটু কিছু মুখে দেবেন না ?

হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ—তুমি দেখছি, সত্যিই আমাকে খুব ভয়-ভয় করে কথা বলছো ? মুখে দেবো বইকি। অন্তত এক পেয়ালা গরম চা তো খাব।

শিবনাথ—আর একটু...।

পূর্ণানন্দ—না শিবনাথ, লুচি-টুচি আমার সহ্য হবে না।

শিবনাথ—তাহলে একটু মুড়ি-টুড়ি...।

পূর্ণানন্দ—তোমাদের এখানে মুড়ি পাওয়া যায় নাকি ?

শিবনাথ—খুব পাওয়া যায়। আরও মজার ব্যাপার, এখানকার মুড়ি ঠিক আমাদের বিরামপুরের মুড়ির মতো খুব মিহি চালের মুড়ি, জুঁইকুঁড়ির মতো সাদা।

পূর্ণানন্দ—সে মুড়ির শেষ চেহারা তো তিরিশ বছর আগে দেখেছিলাম, তারপর আর নয়। তোমার মনে নেই যে, সেদিন...।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন পূর্ণানন্দ। শিবনাথ বলেন—আমার নিশ্চয় মনে আছে।

পূর্ণানন্দ—মনে আছে কি, তোমাদের বাড়ির পুকুরঘাটে বসে একদিন বিকেলবেলা একটা ডালা ভরতি করে বিরামপুরের সেই মুড়ির সঙ্গে কচি শশার টুকরো মিশিয়ে ।

শিবনাথ—হ্যাঁ, মা এসে আবার একগাদা নারকেল বরফিও দিয়ে গেলেন। মনে আছে বইকি, ভুলবো কেন?

হঠাৎ যেন সাবধান হয়ে আর জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বিরামপুরের গল্পের সব মুড়ি উড়িয়ে দিলেন পূর্ণানন্দ। একবার চশমাটাকে খুলে নিয়ে হাত দিয়েই মুখটাকে মুছে নিলেন। তারপর বেশ নিবিড়-শান্ত স্বরে কনখল আশ্রমের কথা বলেন।—চমৎকার জায়গা। এমনই নিস্তব্ধ একটা জায়গা যে, নিজের মনের কথাগুলিরও যেন শব্দ শোনা যায়। অবশ্য তোমাদের এখানকার বিকেলবেলার মতো ওখানেও বিকেলবেলার পাখি ডাকে। তবে সে-পাখির ডাক শুনতে একেবারে অন্য রকমের লাগে। এখানেই তো শুনছি, ওই তো, ময়নার মতো দেখতে একটা পাখি তখন থেকে ডাকছে; কিন্তু কই? এই ডাকে তো সেই সুর নেই।

চা নিয়ে আসে প্রীতিকণা। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা ডালা ভরতি করে মুড়ি। আর সেই বাচ্চাটা, যার নাম ডাকু, সেটাও প্রীতিকণার পিছু পিছু হামা দিতে দিতে চলে আসে।

পূর্ণানন্দ যেন চমকে ওঠেন, আর বেশ একটু বিরক্তি-বিচলিত স্বরে কথা বলেন—আঃ, তুমি এটা কি করছো বউমা? মুড়ির ডালা রেখে দিয়ে বাচ্চাটাকে আগে একটু ধর; কোলে নাও।

চায়ের পেয়ালা আর মুড়ির ডালা পূর্ণানন্দের কাছের জানালাটার তাকের উপর রেখে দিয়ে বাচ্চা ডাকুকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেয় প্রীতিকণা।

চা খান পূর্ণানন্দ; মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে ডালা থেকে মুড়ি তুলে নিয়েও খেতে থাকেন।

ডাকুকে কোলে নিয়ে প্রীতিকণাও পূর্ণানন্দের চোখের সামনে যেন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রীতিকণার মুখে অদ্ভুত এক খুশির হাসি। কে জানে কিসের খুশির এত হাসি!

পূর্ণানন্দও হঠাৎ হেসে ফেলেন।—আমি বলেছিলাম কিনা, শিবনাথ?

শিবনাথ—আজ্ঞে?

পূর্ণানন্দ—তোমার এখানে এলে আমাকে সবার চোখে একটা রিপ ভ্যান উইংকল বলে বোধ হবে?

শিবনাথ—বলেছিলেন তো, কিন্তু কত ভুল কথা বলেছিলেন।

পূর্ণানন্দ—একটুও ভুল বলিনি। এই দেখ, বউমা কেমন করে তাকিয়ে আমার খাওয়া দেখছে।

শিবনাথ—প্রীতি আবার কি দেখবে? ও আর আপনার খাওয়ার কতটুকু দেখেছে? প্রীতি তখন ছিল কোথায় যে দেখবে?

এইবার প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে শিবনাথ—তুমি তো দেখনি প্রীতি, এই মণিকাকা লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন রায়গঞ্জ থেকে ঘোড়া চড়ে আমাদের বিরামপুরের বাড়িতে আসতেন। আর, মা বাটি ভরতি করে ক্ষীরের পুলি এনে মণিকাকার পাতে ঢেলে দিতেন। এক বাটি, দু'বাটি, তিন বাটি; মণিকাকা আর না করতেন না। মা শেষে ক্ষীরপুলির হাঁড়িটাকেই নিয়ে এসে মণিকাকার পাতের কাছে রেখে দিতেন।

প্রীতি বলে—কিন্তু সেই মণিকাকা আজ এ কী করছেন? শুধু দুটো মুড়ি চিবিয়ে চলে যাচ্ছেন। আমার একটুও ভাল লাগছে না।

পূর্ণানন্দ—আহা, তুমিও এরকম একটা ভুল কথা বলে ফেললে, বউমা। আমি কি আজ সেই মানুষ, না আমার আজ সেই বয়স ? তা-ছাড়া আমার মনেও কি আর সেই পুরনো জীবনের কোন লোভ-টোভ আছে ?

সাধুকাকার এই কথার উপর তো আর প্রশ্ন চলে না। চুপ করে প্রীতিকণা। কিন্তু প্রীতিকণার এই নীরব মুখটা একটুও গম্ভীর নয়। প্রীতির সারা মুখে যেন অদ্ভুত এক খুশির হাসি থমথম করছে।

পূর্ণানন্দ বলেন—আমার খাওয়া হয়ে গেছে বউমা, তুমি এবার যাও। তোমার তো অনেক কাজ-টাজ আছে।

প্রীতি—কাজ-টাজ তো রোজই আছে, রোজ থাকবেও।

শিবনাথ—কিন্তু আপনাকে তো আর রোজ দেখতে পাবে না। এই তো, বড়জোব আব দেড় ঘণ্টা।

পূর্ণানন্দ হাসেন—যাই হোক, তুমি এখন এস, বউমা। আমি শিবনাথেব কাছে শেষ বাবেব মতো আবোল-তাবোল আরও দুটো কথা শুনে নিই। কিন্তু তুমি আবাব শিবনাথেব মতো বলো না যেন, মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল।

প্রীতি—না, বলবো না। আপনি তো আমাকে বউমা বলে ডেকেই ফেলেছেন।

এইবার প্রীতিরই মুখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণানন্দ স্নিগ্ধ চোখ দুটো একেবারে উদাস হযে যায়। এ যেন আর-একটা বাচাল প্রতিধ্বনি। কনখলের তিবিশ বছরেব আশ্রমিক এক সন্ন্যাসীর সতর্ক অন্তরাত্মা কোন্ মুহূর্তে যে অসতর্ক হযেছে আব জব্দ হযে গিযেছে, সেটা তো তিনি বুঝতেই পাবেন নি।

ছটফট কবেন পূর্ণানন্দ।—না শিবনাথ, আর ঘবেব ভিতব বসে থাকতে ভাল লাগছে না। আমি বাইবের বাবান্দায় বসি।

শিবনাথ—তাই ভাল।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু আর বসেই বা কি হবে ? সময তো হযে এল। এখন বওনা হলেই বা মন্দ কি।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, একটু অপেক্ষা করুন। সন্ধ্যাব আলো না জ্বেলে আপনাকে চলে যেতে দিতে খুব খারাপ লাগবে।

বারান্দায় মোড়ার উপর চুপ করে একলা হয়ে বসে রইলেন পূর্ণানন্দ। ঘবেব ভিতবেব যত কাজ সামলাতে চলে গেল প্রীতি। আর, শিবনাথ চলে গেলেন কুযোতলাব কাছে, হয জল তুলতে, নয় ঘাসের উপর মেলে-দেওয়া যত কাচা কাপড়-জামা তুলে আনতে।

কিন্তু পূর্ণানন্দ যেন হাঁসফাঁস করেন। এভাবে একটা বেতের মোড়াব উপব চুপ করে বসে থাকতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন পূর্ণানন্দ। সত্যিই তো, এ যে একটা শাস্তিব মতো ব্যাপার। এই বাড়ির সন্ধ্যাদীপের একটা আশার কাছে বন্দীর মতো পড়ে থাকবাব কোনো দরকার ছিল না। সে সন্ধ্যাদীপ জ্বালবে তবে ছাড়া পাবেন পূর্ণানন্দ ? শিবনাথের দাবিটা যে বড় বেশি সাহস করে বসে আছে।

বোধহয় বুঝতে পারেননি পূর্ণানন্দ, তাঁরই চোখের সামনে বিকেলেব শেষ বোদের আভা কখন ফুরিয়ে গিয়েছে আর সন্ধ্যা দেখা দিয়েছে।

ভিতরের ঘরে হঠাৎ কে যেন একটা আলো জ্বেলে দিল। কী ভয়ানক চমকে উঠলেন পূর্ণানন্দ। এ আলো যে একটা সংকেত। শিবনাথের এই বাড়ির বারান্দা থেকে এইবার স্বচ্ছন্দে নেমে চলে যেতে পারবেন পূর্ণানন্দ। আর তাঁকে দেরি করিয়ে দিতে সাহস করবে না কোন বাধা।

ঘরের ভিতরে কারা যেন কথা বলছে। সে কলরবের কিছু ভাষা পূর্ণানন্দের কানের কাছেও ভেসে আসে। শিবনাথের বউ প্রীতি যতই আস্তে কথা বলুক না কেন, শুনতে পেয়েছেন পূর্ণানন্দ।—উনি আমার খুড়শ্বশুর। আমি আগে কখনও দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম; কখনও ভাবতেই পারিনি যে, কোনদিন দেখতে পাব। উনি তো আর ঠিক এ-জগতের কেউ নন।

একজন মহিলার গলার স্বর বেশ স্পষ্ট করে প্রীতিকে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছে—কিন্তু মাত্র একটি দিন থেকেই চলে যাচ্ছেন কেন?

—কি করে বলি? আমরা তো খুব চেষ্টা করেছি, যাতে সাধুকাকার কোন অস্বস্তি না হয়। কাউকে চেঁচামেচি করতে, একটা টু শব্দ করতেও দিইনি। নীলি আর মাধুকে বলে দিয়েছি, তোরা আজ নেপুদের বাড়িতে গিয়ে পড়গে যা। এখানে এত চেঁচিয়ে পড়া চলবে না।

—তুমি নিজে একবার বলে দেখলে পার।

—আর বলবার সময় কোথায়? এখনি চলে যাবেন। যাবার সময় পিছু ডেকে কি ভাল হবে?

প্রতি বছর সাগর-স্নানে যাবার সময় ট্রেনের ভিড়ের মধ্যে বসেও কত রকমের ভাষায় কলরব শুনতে পান পূর্ণানন্দ। কিন্তু সেই শোনা তো পূর্ণানন্দের কানের কাছে এসেই শেষ হয়ে যায়। সে কলরবের আওয়াজ যত তীব্র হয়ে বেজে উঠুক না কেন, পূর্ণানন্দের মনের ধারে-কাছে এসে সামান্য একটা ভাবনাও সৃষ্টি করতে পারেনি! কিন্তু শিবনাথের বাড়ির এই সন্ধ্যার এই চাপা-স্বরের ভাষা যেন ভিন জগতের একটা উপবনের ঝড়ের শব্দ; পূর্ণানন্দের বুকের ভিতরে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে।

কিন্তু বুঝতে পারল না পূর্ণানন্দ, শিবনাথের স্ত্রী মিছিমিছি এরকমের আক্ষেপ করে কেন? কনখল আশ্রমের এক বুড়ো সন্ন্যাসীকে পিছু ডেকে আরও দুটো দিন এখানে থামিয়ে রেখে দিয়ে এদের লাভ কি?

কিন্তু শিবনাথ আর শিবনাথের স্ত্রী, দুজনেই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছে। পূর্ণানন্দ যেন মঙ্গলগ্রহের একটা মানুষ, এই মধুপুরের কাছে একটা ভয়ানক স্ট্রেঞ্জার! আশ্চর্য! তা না হলে এ ধারণা ওদের কেন হয় যে, ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ শুনে পূর্ণানন্দ একেবারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবেন?

পূর্ণানন্দ ডাক দিলেন—বউমা, তুমি কি একবার এদিকে আসতে পারবে?

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে প্রীতি—কি সাধুকাকা!

পূর্ণানন্দ—কাল যে আরও দুজনকে দেখলাম, তারা কোথায়?

প্রীতি—কারা?

পূর্ণানন্দ—তোমারই ছেলে আর মেয়ে বলে যাদের মনে হলো?

প্রীতি—হ্যাঁ, আমার মেয়ে নীলি আর ছেলে মাধু।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু কোথায় ওরা? বলতে গিয়ে পূর্ণানন্দের এই প্রায়-সত্তর বছর বয়সের গলার স্বরে যেন বেশ কঠোর একটা ধমক ফুটে ওঠে।

প্রীতি—ওদের ওদিকে সরিয়ে দিয়েছি।

পূর্ণানন্দ—বুঝেছি। আর এইমাত্র শুনেছিও, তুমি ঘরের ভিতরে একজন মহিলাকে যে-কথা বললে।

ভয় পায় প্রীতি—আমি কি ভুল করে কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেছি, সাধুকাকা?

পূর্ণানন্দ—ভুল করেছ বইকি। নিশ্চয় অন্যায় করেছো। কে তোমাকে বললে যে, ওরা এখানে ঘরে বসে ওদের পড়া পড়লে আমার অস্বস্তি হবে?

নীরব হয়ে শুধু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি ।

পূর্ণানন্দ—কোথায় ওরা ?

প্রীতি—ডাকবো ওদের ?

পূর্ণানন্দ—ডাকা তো আগেই উচিত ছিল । আমার কাছে ওদেব একবাব আসতে দেওযা উচিত ছিল ।

প্রীতি—আপনি কিছু মনে কববেন না, আমি নীলিকে আব মাধুকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি ।

শিবনাথ একটা দৌড দিয়ে এসে বাবান্দায় উঠলেন—এঃ, সত্যিই যে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পডতে শুরু কবলো ।

পূর্ণানন্দ—বৃষ্টি ? হঠাৎ বৃষ্টি ? এ কী ব্যাপাব ? এখন বৃষ্টি হলে তো চলবে না ? হলেই বা কি ? আমাকে এখনই বেব হতে হবে ।

শিবনাথ—তা তো হবেই , বেশি সময়ও তো আব নেই যে, অপেক্ষা কবা চলবে ।

প্রীতি—অন্তত আব আধ ঘণ্টা তো অপেক্ষা কবতে হবে ।

শিবনাথ—মোটেই না । আর অপেক্ষা করা চলবেই না । বঘু বললে; ছ'টা বেজেছে । এখনই হাঁটা দিলে আব খুব তাডাতাডি হাঁটলেও স্টেশনে পৌঁছতে অন্তত পঁচিশ মিনিট লাগবে ।

প্রীতি—কিন্তু সাধুকাকা যে নীলিকে আব মাধুকে দেখবেন ।

শিবনাথ—আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন—তা হলে কি কবে হয ? বঘু যদি এখনই ওদেব ডেকে আনতে যায়, তবে ওদেব এসে পৌঁছতেও তো অন্তত চল্লিশ মিনিট সময় লাগবে । —আপনি একটা বুদ্ধি দিন সাধুকাকা ।

পূর্ণানন্দ—আব বুদ্ধি দিয়েছি ? আমিই যে ভুল কবে একটা ঝোঁকেব মাথায নির্বুদ্ধিব কাণ্ডটা করে বসে আছি । যাক । বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন পূর্ণানন্দ—তোমাদেব মনে যা ছিল, তাই হলো ।

শিবনাথ—আজ্ঞে ?

পূর্ণানন্দ—সাড়ে ছ'টার পর কি আর কোন ট্রেন নেই ?

শিবনাথ—আছে, রাত্রি দশটায় ।

পূর্ণানন্দ—তবে সেই ট্রেনেই যাব । এখন এখন এক পেযালা গবম চা দাও দেখি বউমা ।

ঘরের ভিতবে চলে গেল প্রীতি । আর বাইরের গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন শিবনাথ—বৃষ্টিটা বোধহয় বন্ধ হয়েই গেল ।

পূর্ণানন্দ হেসে ওঠেন—এখন তো বন্ধ হবেই । কাজ হাসিল হয়ে গেছে কিনা, পিছু ডেকে আমার যাত্রা দেবি করিয়ে দেবার জন্য যা যা দবকাব ছিল, তার সব হলো । কিন্তু, আব পিছু ডেক না, শিবনাথ ।

শিবনাথ—না সাধুকাকা, ইচ্ছে থাকলেও আব পিছু ডাকবো না ।

পূর্ণানন্দ—তোমার তো ওই একটি মেয়ে আব দুটি ছেলে ?

শিবনাথ—হ্যাঁ ।

পূর্ণানন্দ—দেশের খবর-টবর বোধহয় কিছুই রাখ না ।

—কিছু কিছু রাখি । আমাদের সেই দালানবাডিটা অবশ্য আছে, কিন্তু ওটা আর আমাদের কেউ নয় ।

—কেন ?

—বাবার তো অনেক দেনা ছিল, তার উপর কঠিন অসুখের চিকিৎসায় জলের মতো টাকা খরচ করতেও হলো। বাড়িটা বিক্রি না করে দিয়ে কোন উপায় ছিল না।

—তা হলে তুমি এখন. ।

—আমি এখানেই আছি, একরকম আছি, চলেই যাচ্ছে।

—চলে গেলেই হলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাস্টারি করে যা পাই তাতে ডাল-ভাত কোনমতে হয়ে যায বটে। সেজন্য কোন ভাবনা করি না। তবে ওই একটা চিন্তা , আমার নীলি তো বেশ বড হয়ে উঠেছে। বিয়ে দিতে হলে কিছু টাকার দরকার তো হবেই।

—বিয়ের চেষ্টা দেখছো তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ ভাল দুটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছিলাম। তার মধ্যে একটিব সঙ্গে কোন কথাই চললো না। বড় বেশি দাবি। আর একটির সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হযে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে পাঁচ ভরি সোনার ব্যাপার নিযে সম্বন্ধ ভেঙে গেল।

—কিরকম ?

—আমরা দশ ভরি পর্যন্ত রাজি হয়েছিলাম , প্রীতি ওর বিয়েতে পাওয়া বার ভরির মধ্যে ওই দশ ভরিকে এখনও কোনমতে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওবা বললেন, পনের ভরির সোনার গহনা দিযে মেয়েকে সাজিয়ে না দিলে আত্মীয-কুটুম্বদের কাছে ওঁদের অসম্মান হবে। কিন্তু আর পাঁচ ভরি সোনা দেবার মতো আমাব সামর্থ্য ছিল না।

—এখন সামর্থ্য হযেছে তো ?

—আজ্ঞে না সাধুকাকা। কি করে হবে ?

—তবে ?

—তবে আর-একটি পাত্রের খোঁজ পেয়েছি। এদের সোনা নিয়ে দাবি-দাওয়ার ব্যাপার নেই। এরা মেয়ে দেখেই খুশি হয়েছে। কিন্তু বলছে, বরযাত্রীর সংখ্যা কিছু বেশি হবে। সেটাও তো যেমন-তেমন খরচের ব্যাপার নয়, সাধুকাকা।

—কেন ? তোমাব যা সামর্থ্য তাই করবে। চা-সিঙাড়া খাইয়ে দেবে, বাস্।

—তা হয় না, সাধুকাকা। শেষে এই নিয়ে গণ্ডগোল বাধবে। অপমান হতে হবে।

—কিন্তু একটা উপায় তো করতে হবে। এই পাত্রকেও তো হাতছাড়া করা চলবে না।

—অগত্যা, কিছু ধার-কর্জের চেষ্টা দেখতে হবে।

—ধার-কর্জ ? একি ? এইতো ওরা এসেছে। কাছে এস দেখি। তুমি বুঝি নীলিমা ?

—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—আর তুমি বুঝি মাধু ?

—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—বাস্, আর কোন কথা নয়। এখন দিদি আর ভাই দুজনে পড়তে বসে যাও। আমি তোমাদের পড়া শুনবো।

নীলিমা ঘরের ভেতর থেকে একটা মাদুর টেনে নিয়ে এসে বারান্দার মেজেতে পাতে। মাধু নিয়ে আসে একটা ল্যাম্প, তারপর দুজনেই বইয়ের দুটি স্তূপ হাতে তুলে নিয়ে এসে পড়তে বসে।

বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করে ঘুরে বেড়ান পূর্ণানন্দ।—বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়, যেন আমি শুনতে পাই।

শিবনাথ—আপনার রাত্তিরের খাওয়া কি কালকেরই মতো শুধু চার মুঠো যবের ছাতু...।

পূর্ণানন্দ হাসেন—তোমাদের ইচ্ছেটা কি ?

শিবনাথ—রুটি, একটু ডাল সেদ্ধ আর একটু পায়েস যদি করা হয় তবে. . ।

—হ্যাঁ, করো। তবে বউমাকে বলে দাও, পায়েস যেন বেশি মিষ্ট না হয়।

চলে গেলেন শিবনাথ। আর, পূর্ণানন্দ শুধু বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে নীলি আর মাধুর কাছে এসে দাঁড়ান। নীলি চোখ তুলে পূর্ণানন্দর মুখের দিকে তাকায়। বড় বেশি কালো আর চকচকে দুটি চোখ।

পূর্ণানন্দ হাসেন—এখনই কি-যেন একটা কথা তুমি পড়লে নীলিমা ? আর একবার পড় তো, শুনি।

নীলিমা—ভারতের ঋষিদের উপলব্ধির বাণী এই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এক দিন.. ।

পূর্ণানন্দ—তোমার বই একটু ভুল করেছে নীলিমা। ও কথাটা ভাবতের কোন ঋষির বাণী নয়। ওটা হলো ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত ভিক্টর কুঁজা'র বাণী।

নীলিমা চোখ বড় বড কবে তাকায—তাহলে আমি এখন কি কবি সাধুদা ?

পূর্ণানন্দ—আমি যা বললাম সেটা বইয়ের পাতার একপাশে লিখে বেখে দাও।

আবার পায়চারি করেন পূর্ণানন্দ, আবাব হঠাৎ থমকে দাঁডান। মাধুব দিকে তাকিযে বলেন—কি বললে মাধু ? উত্তমাশা অন্তরীপ ?

মাধু—হ্যাঁ, সাধুদা।

পূর্ণানন্দ মাধুব কাছে এগিয়ে আসেন—তবে শোন, একটা গল্প বলি। পর্তুগীজ নাবিক যখন প্রথম ওই অন্তরীপ আবিষ্কার করেন, তখন জায়গাটাকে দেখে হতাশ হযেছিলেন। সমুদ্রের অবস্থা খুব অশান্ত। তেমনি সব সময় ভয়ানক ঝড়। তাই অন্তরীপেব নাম বাখা হলো, হতাশ অন্তরীপ। কিন্তু পতুর্গালের রাজা বললেন, না, ওর নাম হোক, উত্তমাশা অন্তবীপ। অশান্ত সমুদ্র দেখে হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

মাধু হাঁ করে, খুব আশ্চর্য হযে, আর যেন একটু মুগ্ধ হয়েও পূর্ণানন্দর মুখেব কথাগুলি শুনতে থাকে। তারপবেই বই বন্ধ করে দেয়।—আপনি আর-একটা গল্প বলুন সাধুদা।

পূর্ণানন্দের মুখের হাসিটা এইবার যেন গলে পড়ে—এই সেরেছে। মাধুকে তো খুব চালাক বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তখনি বেশ ক্লান্তভাবে মোড়ার উপর বসে পড়েন পূর্ণানন্দ।—আর গল্প বলা হবে না, মাধু। আর হবে না। আমি তোমাদের গল্প-বলা দাদু নই। কিন্তু, ও শিবনাথ, তুমি কোথায় ?

শিবনাথ আসতেই পূর্ণানন্দ যেন ছটফট করে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ান।—আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে শিবনাথ, রাত দশটার ট্রেনটাও বোধহয় ধরতে পারা যাবে না।

শিবনাথ—খুব পারা যাবে। এখনও একঘণ্টা সময় আছে।

পূর্ণানন্দ—থাকুক একঘণ্টা সময়। এখনই রওনা হয়ে যাওয়া ভাল।

ঘরের ভিতর থেকে প্রীতি যেন একটা উতলা-মূর্তি হয়ে বের হযে আসে ; আর বেশ রাগ কবেই কথা বলে এখনই যাব-যাব করলে চলবে না, সাধুকাকা। আমি এইমাত্র পাযেস চড়ালাম।

প্রীতির মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে পূর্ণানন্দর দুই চোখ যেন ভীক ভীক হযে শেষে একেবারে করুণ হয়ে যায়। বিড়-বিড় করে কথা বলেন পূর্ণানন্দ—আমারই ভুল হযেছে, বউমা। তুমি কিছু মনে করো না।

কিন্তু পারলেন না পূর্ণানন্দ। শিবনাথের বাড়ির এক কঠোর অভিমানের ভর্ৎসনার কাছে যেন আরও অসহায় হয়ে পড়লেন। প্রীতিকণা বলে ওঠে—কিছু মনে না করে পারবো কেন সাধুকাকা ? আমি এত দৌড়োদৌড়ি করে, তিনবার শ্যামবাবুর বাড়ি গিয়ে, ওঁদের চাকর রঘুকে

গয়লাবাড়ি পাঠিয়ে দুধ জোগাড় করলাম, আর আপনি বলছেন... ।

নীলিমা উঠে এসে পূর্ণানন্দর চোখের সামনে দাঁড়ায়—আপনি না খেয়ে যাবেন না, সাধুদা ।

মাধু উঠে এসে পূর্ণানন্দর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—ট্রেনেতে শেষে ক্ষিধের চোটে আপনার ঘুম হবে না, সাধুদা ।

পূর্ণানন্দকে সত্যিই যে ভিন জগতের কতগুলি অদ্ভুত ছায়া ঘিরে ধরেছে। দেখতে ছায়া বটে, কিন্তু যেন লোহার মতো শক্ত ওদের কায়া। চলে যাবার আর সরে যাবার মতো একটা ফাঁক খুঁজে পাচ্ছেন না পূর্ণানন্দ। পূর্বজীবনের সব লোভ-টোভ তো কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। তবে কেন, কিসের ভুলে শিবনাথের বাড়ির পায়েস খেতে চেয়ে ফেলেছে, এ কী ভয়ানক এক গোপনচর লোভ !

পূর্ণানন্দ বলেন—তবে আর কি বলবো ? কিন্তু দেরি করিয়ে দিও না, বউমা ! একটু তাড়াতাড়ি কর ।

চলে যায় প্রীতি—খুব তাড়াতাড়ি করছি, সাধুকাকা । আপনি একটুও ভাববেন না ।

নীলিমা আর মাধু আবার পড়তে বসে। মোড়াটাকে হাতে নিয়ে বারান্দার একেবারে ওদিকে চলে যান পূর্ণানন্দ। শিবনাথ বলেন—বলেন তো একটা মাদুর এনে পেতে দিই, সাধুকাকা। অন্তত কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারবেন ।

পূর্ণানন্দ—না। আমি যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ, শেষে একটা ধার-কর্জ কি করতেই হবে ?

শিবনাথ—নীলির বিয়ের কথা বলছেন ?

পূর্ণানন্দ—তবে আর বলছি কি ?

শিবনাথ—আজ্ঞে, টাকা ধার করা ছাড়া তো উপায় নেই। ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাওয়া যেতে পারে, যদি আমার এই বাড়িটাকে বন্ধক রাখা হয় ।

পূর্ণানন্দ—তবে তাই করো। লোকে তো কত বাজে কাজে ভিটে বাড়ি সম্পত্তি বেচে দেয় ; তুমি না হয় নীলির বিয়ের জন্যে বাড়িটাকে বাঁধা রাখলে !

শিবনাথ—আমিও তো তাই ভেবে রেখেছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন বুদ্ধি দিতে পারেন কি, সাধুকাকা ?

—বুদ্ধি দেব আমি ? হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ।—আমার বুদ্ধি তো তিরিশ বছর আগে গঙ্গাজলে ভেসে গিয়েছে, শিবনাথ ।

আবার হাসতে গিয়ে পূর্ণানন্দর মাথাটা দুলে ওঠে ; আর গলার স্বর যেন কেঁপে কেঁপে দূরের ঢেউয়ের শব্দের মতো মিলিয়ে যায় ।

কে জানে সামান্য একটু পায়েস তৈরি করতে গিয়ে কী কাণ্ড করছে প্রীতিকণা। রান্নাঘর থেকে এত ধোঁয়া বের হয়ে আসছে কেন ? তবে কি দুটো উনান জ্বেলেছে প্রীতি ? সাধুকাকার রুটি আর ডালসেদ্ধ কি এখনও হয়নি ?

ডাকু জেগেছে ! ওর কান্নার স্বর শোনা যায়। শিবনাথ বলেন—এই সেরেছে !

পূর্ণানন্দ—কি হলো ?

শিবনাথ—একে তো এমনিতেই আপনার খাবার তৈরি করতে এত দেরি করে ফেলেছে প্রীতি, তার ওপর ডাকু জেগেছে। রক্ষে নেই। এখন দু'দিক সামলাতে গিয়ে প্রীতি শেষে একটা কাণ্ডই করবে বলে মনে হচ্ছে ।

পূর্ণানন্দ—না না, আর যেন দেরি না হয় শিবনাথ। তুমি বরং ডাকুকে তুলে নিয়ে এসে এখানে বসো ।

শিবনাথ—ওকে এখানে নিয়ে এলেও কি ওর কান্না থামবে ? আপনার খুব অস্বস্তি হবে,

সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—হোক। বউমাকে তাড়তাড়ি কাজ সারতে বলে দাও।

ঘরের ভিতরের বিছানা থেকে ডাকুকে কোলে করে তুলে নিয়ে এসে আবার ঠিক পূর্ণানন্দর সামনে এসে দাঁড়ায় শিবনাথ। ডাকুর কান্না শান্ত করতে চেষ্টা করে।

রান্নাঘরের ধোঁয়া, বাচ্চা ডাকুর কান্না, নীলি আর মাধুর পড়ার গলার স্বর, শিবনাথের গলায় ঘুমপাড়ানি গান, আর প্রীতিকণার ছটফটে ছায়াটার উঁকিঝুঁকি। পূর্ণানন্দ যেন একটা চমৎকার ক্ষণছলনার জগতের মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, উনি কে? শ্যামবাবু নাকি? চমকে উঠলেন শিবনাথ। ঠিক, একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আগে আগে হেঁটে চলেছে শ্যামবাবুর অফিসের চাপরাশি, হাতে কাগজপত্রের ফাইল আর খাতা। পিছনে শ্যামবাবু। তবে কি সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে? সাড়ে ন'টার আগে তো কোনদিনই বাড়ি ফিরতে পারেন না শ্যামবাবু।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে, সাধুকাকা, বোধহয় বেশ দেরিই হয়ে গেল। বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে বলেন শিবনাথ।

পূর্ণানন্দ চমকে ওঠেন—ক'টা বেজেছে?

শিবনাথ—শ্যামবাবুকে বাড়ি ফিরতে দেখে মনে হচ্ছে, সাড়ে ন'টা হয়ে গিয়েছে।

পূর্ণানন্দ তাঁর দুই চোখ টান করে শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর, কথা বলতে গিয়ে তাঁর এতক্ষণের ধৈর্য যেন বেশ রুক্ষ একটা গলার স্বর নিয়ে গরগর করে ওঠে—খুব অন্যায়। বউমা কি আমাকে সোনার বাটিতে করে সিংহীর দুধের পায়েস খাওয়াবে? এত দেরির কোন মানে হয়! ছিঃ!

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে প্রীতি।—সত্যি, দেরি হয়ে গেল। আর একটু দেরি হবে। কিন্তু ইচ্ছে করে দেরি করছি না, সাধুকাকা। আপনি রাগ করবেন না।

পূর্ণানন্দ—অনিচ্ছা করেও কি এত দেরি হতে পারে?

শিবনাথের দিকে তাকিয়ে প্রীতি আক্ষেপের স্বরে একটা অদ্ভুত কথা বলেন—গয়লাবাড়ি থেকে রঘুয়া যে দুধ এনে দিল, সেটা জ্বাল দেওয়া মাত্র কেটে গেল।

শিবনাথ—অ্যাঁ! সে কি?

প্রীতি—কাজেই, ঘরের বাটিতে যেটুকু দুধ ছিল, এখন তাই দিয়ে...।

পূর্ণানন্দর চোখে ভয়ানক দুরন্ত একটা ভ্রূকুটি শিউরে ওঠে।—কি বললে বউমা? ঘরের বাটির দুধ মানে কি? সেটা তো এই বাচ্চাটার জন্য তুলে রাখা দুধ। নয় কি? সত্যি করে বলো।

প্রীতি—হ্যাঁ, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—তোমাদের সঙ্গে আমার আর একটা কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না, বউমা। মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে একটা মহাপুরুষ ঠাউরেছো। আমি বুঝতে পারিনি যে, বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে তোমরা আমাকে শেষে এরকম একটা অপমান করবে। তোমাদের এখানে আর জলস্পর্শ করতেও আমার ইচ্ছে নেই। ... হ্যাঁ, শিবনাথ? ট্রেনের সময় আছে কি নেই, ঠিক করে বলো?

শিবনাথ—এই ট্রেনের সময় আর নেই, সাধুকাকা।

পূর্ণানন্দ—তবে কোন্ ট্রেনের সময় আছে?

শিবনাথ—ভোরের ট্রেন। ভোর পাঁচটার ট্রেন।

পূর্ণানন্দ—তা হলে, আমি চলি।

প্রীতিকণা প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠে—সাধুকাকা!

শিবনাথ ডাকেন—সাধুকাকা !

নীলি আর মাধু উঠে এসে ডাক দেয় । —সাধুদা !

পূর্ণানন্দ—কি বলতে চাও, তোমরা !

প্রীতি—আপনি খেয়ে-দেয়ে, আর এই রাতটার মতো এখানে কোনমতে...

শিবনাথ—একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দিন, সাধুকাকা । তারপর... ।

পূর্ণানন্দ—আমার খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই । তোমার ওই পায়েস আমি মুখে দেব না, বউমা ।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি । কেঁদে ফেলবে নাকি প্রীতি ? তা না হলে ওরকম ছটফট করে কাঁপছে কেন প্রীতির চোখের তারা দুটো ?

পূর্ণানন্দের গলার স্বরের রুক্ষ কঠোরতা হঠাৎ যেন চুপসে যায়—পায়েস কি তৈরি হয়েছে, বউমা ?

—হয়েছে । আপনার রুটি আর ডালসেদ্ধও হয়ে গিয়েছে ।

—তবে নিয়ে এস । হেসে ফেলেন পূর্ণানন্দ ।

এই বারান্দাতেই মাদুরের উপরে যেন মন-প্রাণ-শরীরের সব জোর নিয়ে আর শক্ত হয়ে বসেন পূর্ণানন্দ । রুটির টুকরো দিয়ে মুড়ে মুড়ে ডাল সেদ্ধ খেতে থাকেন ।

পূর্ণানন্দ যা বলে দিলেন, তাই করে প্রীতি । পূর্ণানন্দর সামনের থালাতে দু'চামচ পায়েস তুলে দেয় প্রীতি । আর পূর্ণানন্দর পাশেই মাদুরের উপর ডাকুকে বসিয়ে রেখে, ডাকুর মুখে একটু-একটু করে পায়েস তুলে দেয় ।

পূর্ণানন্দ বলেন—কই নীলি, কই মাধু, তোরাও আয় । ওদেরও একটু একটু দাও, বউমা ।

জল খেয়ে, হাত ধুয়ে তারপর একটা হাঁফ ছেড়ে উঠে পড়লেন পূর্ণানন্দ—বাস্, আর কিন্তু আমি একটি কথাও বলবো না । তোমরা আমাকে আর একটিও কথা বলবে না । না, আর... ।

কি-যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন পূর্ণানন্দ । তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেই ফেললেন । —আর কেউ যেন আমার কাছে আসে না ।

লণ্ঠনটা নিজেই হাতে তুলে নিলেন পূর্ণানন্দ । আস্তে আস্তে হেঁটে একটু দূরের সেই ঘরের দিকে চলে গেলেন, যে-ঘরের নিভৃতে একলা হয়ে থেকে মধুপুরের এই রাত্রির মুহূর্তগুলিকে শুধু জেগে জেগে ক্ষয় করে দিতে হবে । আর ঘুমোতে চান না পূর্ণানন্দ । ভোরের ট্রেন ফেল করলে যে মাথার উপরের ওই আকাশে একটা ঠাট্টার অট্টহাসির ঝড় ছুটে চলে যাবে ।

ঘুমোতে পারেন না পূর্ণানন্দ । ঘুমোবার জন্য পূর্ণানন্দের চোখে কোন চেষ্টাও নেই । ঘরের বাইরে লণ্ঠনটাকে রেখে দিয়ে, ঘরের ভিতরের মেজেতে কম্বলের উপর চুপ করে বসে থাকেন পূর্ণানন্দ । যেন শেষ ধ্যান সেরে নিচ্ছেন পূর্ণানন্দ ।

তখনো ভোর হয়নি । মধুপুরের আকাশের কোন তারা নিবেও যায়নি । উঠে পড়লেন পূর্ণানন্দ । কম্বল গুটিয়ে নিলেন । ঝোলাটাকে হাতে তুলে নিলেন । শব্দহীন অন্তর্ধানের একটি ব্যস্ত ছায়ার মতো এগিয়ে চললেন । কিন্তু শিবনাথের বাড়ির বারান্দার সিঁড়ির পাশে সেই লতানে গোলাপের কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন । কি আশ্চর্য, এই শেষরাতেও সিঁড়ির উপর হলদে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে ।

পূর্ণানন্দর শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে । শুধু চোখ দুটো নয়, মনটাও যেন ছটফট করছে । এভাবে একলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যেন দুঃসহ একটা অস্বস্তি বোধ করছেন পূর্ণানন্দ ।

পূর্ণানন্দ ডাকেন । —শিবনাথ, আমি চললাম ।

শিবনাথ নিশ্চয় জেগেই ছিলেন। তা না হলে পূর্ণানন্দর এক ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসবেন কেন শিবনাথ—তা হলে, সত্যিই চললেন সাধুকাকা !

পূর্ণানন্দ—হ্যাঁ শিবু, সত্যিই যাচ্ছি।

শিবনাথ—হ্যাঁ, আমিও নিশ্চয় আপনার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাব ; আপনার আপত্তি নেই তো সাধুকাকা ?

পূর্ণানন্দ—না। সেইজন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম।

শিবনাথ—চলুন তবে।

পূর্ণানন্দ তবু দাঁড়িয়ে থাকেন।—হ্যাঁ, চল। কিন্তু ওবা সব কোথায় ? ওদের একবাব ডাক। তা না হলে যাই কি করে ?

শিবনাথের ডাক শুনেই চলে আসে প্রীতি। প্রীতির কোলে ডাকু, সেটাও জেগেই আছে।

চলে আসে নীলি আর মাধু। নীলি ওর দুই কালোচোখ বড কবে পূর্ণানন্দেব মুখের দিকে তাকিযে থাকে ; আর মাধু ভাল করে তাকাবার জন্যে হাত তুলে ওর ঘুমকাতর দুই চোখ ঘষতে থাকে।

পূর্ণানন্দ বলেন—ডাকুর কিন্তু খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, বউমা। অনেকবাব ওকে হাঁচতে দেখেছি। তুমি বুঝতে পেবেছো কিনা জানি না। সরষের তেল গরম করে ওব দুই পাযেব তলায় খুব ভাল কবে ঘষে দিও।

প্রীতি বলে—দেবো।

নীলিমাব মুখেব দিকে তাকান পূর্ণানন্দ—নীলি ইংরেজিতে একটু কাঁচা আছে, শিবনাথ। তুমি নিজে ওকে একটু দেখিয়ে-বুঝিযে দিও।

শিবনাথ—তা দেবো।

পূর্ণানন্দ হাসেন—মাধুর উত্তমাশা অন্তরীপও কেমন গোলমেলে মনে হলো। মুখস্ত কবে কিন্তু মনে থাকে না বোধহয়। তুমি একটু মন দিযে ভূগোল পড়বে, মাধু। কেমন ?

মাধু—হ্যাঁ।

পূর্ণানন্দ—হ্যাঁ, চল শিবনাথ।

রওনা হলেন পূর্ণানন্দ। রাস্তার উপরে এসেই দুই চোখ তুলে একবার আকাশেব চেহারাটা দেখে নিলেন। শিবনাথ বলেন—এই তো যাকে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত, তাই না সাধুকাকা ?

পূর্ণানন্দ—হুঁ।

শিবনাথ—এ সময়ে আমাদের মধুপুরের আকাশটাও বেশ চমৎকার শান্ত পবিত্র ।

পূর্ণানন্দ হাসেন—থাম শিবনাথ। এরকম পবিত্র শান্ত আকাশ আমি অনেক দেখেছি। চোখ বন্ধ করেও দেখেছি। কিন্তু ।

শিবনাথ—আজ্ঞে।

পূর্ণানন্দ—কিন্তু নীলির বিয়েতে যেন কোন গণ্ডগোল না হয, শিবু। বিশেষ কবে বরযাত্রীদের খাওয়ার কোন ত্রুটি যেন না হয়। সক চামরমণি চালেব পোলাও, দু'রকমেব ডাল, একরকমের ভাজা হলেই চলবে ; কিন্তু মিষ্টি হরেকরকমের হলেই খুব চমৎকার হবে।

কথা থামিয়ে রেখে আস্তে একটা হাঁপ ছাড়েন পূর্ণানন্দ। তারপর হাতের ঝোলাটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে কথা বলেন—তোমার বাড়ির পুবদিকে ওই যে ঘেসো জমিটা, ওখানেই ছোট একটা সামিয়ানা টানিয়ে লোকজনের বসবার জায়গা করে দিও। কিন্তু কিন্তু ভোর যে হয়ে এল, শিবু। একটু তাড়তাড়ি হেঁটে চল।

কোন কথা না বলি

সকলেই জানেন, ওই বাড়িটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনের বাড়ি। কিন্তু এরই মধ্যে একটা ঠাট্টার কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ওটা একটা ক্লাব-বাড়ি।

শহর নয়, ছোট একটি জনপদ, যার নাম পিটারপুরা। পিটার নামে এক ইংরেজ সাহেব প্রায় আশি বছর আগে এদিকের জঙ্গলের ভিতরে প্রথম কয়লা খনি চালু করেছিলেন। আজ এই অঞ্চলের এদিকে ওদিকে অনেক কয়লাখনি। আর পিটারপুরাও অনেক দোকানপাট নিয়ে ছোট একটি জনপদ।

এই পিটারপুরার ওভারসিয়ার জয়ন্তবাবুর বাড়িটাকেই ঠাট্টা করে ক্লাববাড়ি বলা হয়ে থাকে। সন্ধ্যা হতেই এবাড়ির বারান্দায় মস্ত বড় সতরঞ্চি পাতা হয়। খুব কড়া আলোর বাতি জ্বলে। কখনও তাস, কখনও দাবা, কখনও গ্রামোফোনের বাজনা। মাঝে মাঝে হারমোনিয়ামও বাজে, সেই সঙ্গে গান। জয়ন্তের পরিচিত আর আমন্ত্রিত মানুষের একটি ভিড় এবাড়ির বারান্দাতে যেন একটি উৎসব সৃষ্টি করে, আর চলে যায়। কোন সন্ধ্যায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। হ্যাঁ, শীতকালে মাঝে-মাঝে বাইরের ঘরের ভেতরেই এই উৎসবের যত হর্ষ আর মুখরতা আকুল হয়ে বাজতে থাকে।

এই সান্ধ্য আসরের আনন্দ আরও বিচিত্র, আরও রঙীন হয়, যখন জয়ন্তের স্ত্রী নীরজা নিজের হাতেই একটা ট্রে নিয়ে এই ঘরের ভিতরে বা এই বারান্দাতে এসে দাঁড়ায়। ট্রে থেকে এক এক করে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নীরজা। তারপরেই চলে যায়।

কিন্তু যেতে গিয়েও, থমকে দাঁড়াতে হয়, কারণ কেউ একজন হয়তো বলে উঠেছে, আমার কিন্তু আর এক কাপ চা চাই, মিসেস রায়।

—আমার চায়ে আর একটু চিনি চাই।

—আমাকে আধ-কাপ গরম জল দেবেন।

—আমার এক টুকরো লেবু পেলে ভাল হতো।

তাসের খেলার ব্যস্ততা হঠাৎ থমকে গিয়ে এইভাবে নানা দাবির আবেদন হয়ে নীরজাকে ব্যস্ত করে দেয়। নীরজা তেমনই হেসে হেসে ভিতরে চলে যায়। আর, আবার এসে যার যত দাবির সামগ্রী এনে আর রেখে দিয়ে চলে যায়।

কেউ ডাকে বউদি, কেউ বলে মিসেস রায়, কেউ বা নীরজা রায় বলে ডাক দিতেই ভালবাসে। নয়ন গুপ্ত একদিন নীরজা বলেই ডাক দিয়ে ফেলেছিল।

সে ডাক শুনে কিন্তু নীরজার চোখে কোন বিরক্তির ভ্রূকুটি কেঁপে ওঠেনি, নীরজা শুধু চকিতে একবার নয়ন গুপ্তের দিকে তাকিয়েছিল, আর স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলার সে আসর রঙীন হয়ে উঠবেই বা না কেন ? নীরজা যখন ট্রে হাতে নিয়ে এই তাস, দাবা, হারমোনিয়াম আর গ্রামোফোনের আসরের কাছে এসে দাঁড়ায়, নীরজার রঙীন শাড়ির আঁচল যে সত্যিই লতিয়ে লতিয়ে দুলতে থাকে, নীরজার গলার হার চিকচিক করে, ঝিক-ঝিক করে কানফুলের পোখরাজ। আর, এক-এক সন্ধ্যায় সত্যিই নীরজার গায়ের শাড়ি থেকে সামান্য দু'-ফোঁটা সেন্টের হালকা সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়েও পড়ে।

ওভারসিয়ার জয়ন্ত খুবই মিশুক স্বভাবের মানুষ। নিতান্ত এক ঘন্টার পরিচিত মানুষকেও বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ফেলতে পারে জয়ন্ত। আর সারাদিনের খাটুনির পর এই বারান্দার

সান্ধ্যা আসরের হইহই উল্লাস আর কলরব যেন জয়ন্তের জীবনের একটা সান্ত্বনা। জয়ন্ত নিজেই বলে, এরকম একটু আনন্দের হল্লা না থাকলে এই জঙ্গলের ভেতরে বেঁচে থাকবো কি করে ?

কিন্তু এই পিটারপুরাতে আরও তো কত বাড়ি আছে, সে-সব বাড়িতে জয়ন্তের মতো ভদ্রলোকেরাই থাকে, আর তাঁরা বেঁচেও আছেন, যদিও সে-সব বাড়ির বারান্দাতে প্রতি সন্ধ্যায় এরকমের কোন বিচিত্র রঙীন উল্লাসের আসর বসে না। কিন্তু এটাও কোন যুক্তি নয়। যার মনে যেমন অভিরুচি, তার মন তেমনই তৃপ্তি দাবি করবে। জয়ন্তের প্রাণ যে-ভাবে বাঁচতে চায়, সেভাবেই তো বাঁচবে।

ঠাট্টাটা কিন্তু এই জন্য নয়। আর ওই ঠাট্টাটা ঠিক সহজ, সরল একটা ঠাট্টাও নয়। এ ঠাট্টার ভিতর যেন খুব সূক্ষ্ম একটা ভর্ৎসনা কথা বলছে। সন্ধ্যাবেলাতে একগাদা চেনা অচেনা আর আধ-চেনা মানুষকে নিয়ে অন্য কোথাও তাস-দাবার আসর বসালেই তো পারে জয়ন্ত। বাড়িতে কেন ? জয়ন্তের বিচার-বুদ্ধি কিংবা কাণ্ডজ্ঞান যদি বেশ ঢিলে না হয়ে যেত, তবে নিশ্চয় বুঝতে পারতো জয়ন্ত, যে-বাড়িতে নীরজার মতো সুন্দরী স্ত্রী আছে, আর দ্বিতীয় কোন বয়স্ক বা বয়স্কা ব্যক্তি নেই, সে-বাড়িতে জয়ন্তের পক্ষে এরকম ভিড় ডেকে আনা উচিত নয়।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ছবি দেবী বলেন, ওভারসিয়ার জয়ন্তবাবু না হয় একটু কম বুদ্ধির মানুষ, কিন্তু নীরজা কি ? নীরজার তো আপত্তি করা উচিত। নীরজার কি একটু ভয়ডরও নেই ? কি আশ্চর্য, আপত্তি করা দূরে থাকুক, নীরজা নিজেই এই একগাদা পুরুষমানুষের আড্ডার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে আর হাসবে। খুব ভুল করছে নীরজা।

নীরজার কানেও কি এই সব মন্তব্য, সমালোচনা আর ঠাট্টার কোন কথা পৌঁছয় না ? পৌঁছয় বইকি। কয়েকবার বেনামী চিঠিও এসেছে নীরজার নামে,—একটু সাবধান হবে। আপনার ভাল'র জন্যেই বলছি। জয়ন্তবাবু বেচারা অত্যন্ত ভাল মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত বোকা মানুষ। উনি সরল বিশ্বাসে আর বন্ধুভাবে সবাইকে ডাকেন। কিন্তু যারা আপনার বাড়িতে গিয়ে ভিড় করে, তাদের অনেকেই বন্ধুভাবে যায় না, তারা সরল মানুষ নয়।

নীরজা কিন্তু বেনামী চিঠি পড়ে হেসে ফেলে। ঠিক কথাই লিখেছে বেনামী চিঠি। কিন্তু তবু তার মধ্যে একটি ভুল কথা লিখেছে। বুঝতে পারে না নীরজা, নীরজাকে কিসের সাবধান হতে এত অনুরোধ করছে এই চিঠি ? নীরজা কি অসাবধান ? কেউ কি কখনও দেখেছে যে, ওই সন্ধ্যার সময়টুকু ছাড়া আর কোন সময়ে কোন সরল বা অসরল উদ্দেশ্যের মানুষ জয়ন্তের বাড়িতে এসেছে আর তার সঙ্গে গল্প করছে নীরজা ?

না, কেউ দেখেনি। শুধু একবার দেখা গিয়েছিল, নয়ন গুপ্ত তার মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে এসে এক দুপুরবেলায় জয়ন্তের বাড়ির কাছে থামলো। জয়ন্ত বাড়িতে নেই।

নয়ন গুপ্ত ডাকে—আমি, নয়ন এসেছি। আপনি কোথায় ?

জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা।—উনি তো এখন বাড়ি নেই।

নয়ন—তা জানি, কিন্তু আপনি এখন কি করছেন ?

নীরজা—সেলাই করছি।

নয়ন—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল।

নীরজা—বলুন।

নয়ন—ওভাবে ঘরের ভিতরে জানালার কাছে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি এখানে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে কথা বলবো ?

নীরজা—তাই বলুন না ! অসুবিধের কি আছে ?

নয়ন—তুমি সব বুঝেও এ কিরকম কথা...।

নীরজা হাসতে থাকে—আপনার, মনে হয়, অসুখ করেছে।

নয়ন—কে বললে ?

নীরজা—বোধহয় মাথার গোলমাল হয়েছে।

নয়ন—কে বললে ?

জানালাটাকে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয় নীরজা।

এরপর আর নয়ন গুপ্তকে অবশ্য জয়ন্তর বাড়ির সন্ধ্যার আসরেও কোনদিন দেখা যায়নি। কিন্তু দেখা গিয়েছে, রমেশ সরকার নামে নতুন একজন এসেছে। খুব ভাল গাইতে পারে রমেশ সরকার।

নয়ন গুপ্ত থাকে চার মাইল দূরের এক কয়লাখনির একটি কোয়ার্টারে। গুখরা কোলিয়ারির ওভারম্যান নয়ন গুপ্ত যখন দু'মাসের মধ্যে একটি সন্ধ্যাতেও এবাড়ির উল্লাসের আসরে দেখা দিল না, তখন জয়ন্ত নিজেই ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর নিয়েছিল, কেন আসে না নয়ন গুপ্ত। চন্দ্রপুরা স্টেশনে একদিন নয়ন গুপ্তর সঙ্গে জয়ন্তের হঠাৎ দেখাও হয়ে গিয়েছিল। নয়ন গুপ্ত বলে—পায়ে একটা ব্যথা, মোটরবাইক চালাতে অসুবিধে হয়। তাই আর আপনার ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠে না, জয়ন্তবাবু!

শুনে দুঃখিত হয়েছে জয়ন্ত।—তা হলে আর কি বলি ? তবু একদিন যদি কোনমতে যেতে পারেন, তবে খুব খুশি হব ; আর আপনিও রমেশ সরকারের গান শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। অদ্ভুত, অপূর্ব, চমৎকার গাইতে পারেন রমেশ সরকার।

রমেশ সরকার যেসব গান গেয়ে এই সন্ধ্যাবেলার আনন্দের আসরটিকে মুগ্ধ করে দেয়, তার সবই প্রেমের আকুলতার যত গান। আর কী আশ্চর্য, রমেশের গলার গান যখন মূর্ছনাময় একটা আবেশ ঘনিয়ে তুলেছে, ঠিক তখন চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে আসরের কাছে এসে দাঁড়ায় নীরজা। রমেশের গান যেন এই আবির্ভাবের সাড়া পেয়ে আরও মিষ্টি হয়ে যায়।

রমেশ সরকার থাকে পালুডি কোলিয়ারিতে ; রেজিং কন্ট্রাক্টর রমেশ সরকার। নতুন কেনা একটা চকচকে মোটর গাড়িকে সেই পালুডি থেকে বারো মাইল রাস্তা ছুটিয়ে নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এই বাড়িতে উপস্থিত হতে কোনদিন ভুল করে না রমেশ সরকার।

এই রমেশ সরকার একদিন হঠাৎ সকালবেলাতেই উপস্থিত হলো আর হাঁক দিল—আমি রমেশ।

জানালাতে দাঁড়িয়ে কথা বলে নীরজা—উনি চন্দ্রপুরা গিয়েছেন।

রমেশ হাসে—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে জয়ন্তবাবুর পথেই দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কোনদিনও একটু ভাল করে কথা বলবার সুযোগ পেলাম না।

নীরজা হাসে—বলুন।

রমেশ—আপনি তো রোজই আমার গান শুনছেন। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পেরেছেন ?

নীরজা—আমি তো লেখাপড়া একটু জানি, বুঝবো না কেন ?

রমেশ হাসে—না, বুঝতে পারেননি। গানগুলি সবই আমার রচনা।

নীরজা হাসে—এটা অবশ্য বুঝতে পারিনি।

রমেশ—কিন্তু বুঝতে তো পেরেছেন, কার জন্যে, কার কথা মনে করে এসব গান লিখেছি ?

নীরজা—তা বুঝবো কেমন করে ?

রমেশ—এখনও যদি সেটা না বুঝতে পেরে থাকেন, তবে বুঝবো, আমারই দুর্ভাগ্য।

নীরজা—কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিলেই তো বুঝে ফেলতে পারি।

রমেশের চোখের চাহনি জ্বলজ্বল করে—আপনারই জন্যে লিখেছি। এখন আপনি বলুন, ভুল করেছি কি ? আপনি বলুন, শুনে ভাল লেগেছে আপনার ?

নীরজা আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করে দেয়। রমেশের নতুন গাড়িও যেন সেই মুহূর্তে আতঙ্কিতের মতো ছটফটিয়ে ওঠে আর ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে যায়। আর, কোনদিনও জয়ন্তের বাড়ির এই সান্ধ্য-আসরে পালুড়ির রমেশ সরকারকে দেখতে পাওয়া গেল না।

জয়ন্ত নিজেই একদিন নীরজাকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি কখনও ওদের কাউকে...তার মানে ভুল করে এমন কোন ব্যবহার...তার মানে অভদ্রতা বলে মনে হতে পারে, এমন ব্যবহার... ।

নীরজা অদ্ভুতভাবে হাসে—পোকামাকড়ের সঙ্গে একটু অভদ্রতা করাই নিয়ম। তবু আমি... ।

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়—তুমি কি বলছো, বুঝতে পারছি না।

নীরজা হাসে—পোকামাকড়কে ঝাঁটা দিয়ে সরিয়ে দেওয়াই নিয়ম। তবু আমি সেটা করি না, করিওনি। ওরা নিজেরাই সরে যায়। তা ছাড়া... ।

জযন্ত—কি ?

নীরজা—পোকামাকড়কে আমি ভয়ও করি না।

জয়ন্ত লজ্জিতভাবে হাসে—এঃ, তুমি মানুষগুলোকে ভযানক বেশি তুচ্ছ করে কথা বলছো। আমার ভয় হয়, তুমি হয়তো একদিন অধীরবাবুকেও .. ।

চমকে ওঠে নীরজা। জয়ন্তের কথাটা যেন প্রচণ্ড একটা মিথ্যের চিৎকার। আজ পর্যন্ত এবাড়ির সন্ধ্যাবেলার হই-হল্লার বৈঠকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে ওই একটি মানুষকে বলা যায় সত্যিকারের ভালমানুষ। অধীরকে তুচ্ছ করবার কিংবা অশ্রদ্ধা করবার কোন কথা উঠতেই পারে না। জয়ন্তের বাড়ির সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে রোজই আসে অধীর। আসরের একপাশে বেশ শান্ত হযে বসে থাকে, মাঝে মাঝে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজায়, চা খায়, আর চলে যায়।

এই অধীরই একমাত্র অভ্যাগত, যে একদিন বেশ কুণ্ঠিত আর লজ্জিত হয়ে, তবু বেশ হাসিমুখে আর শান্তস্বরে নীরজার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আপনি কেন কষ্ট করে আমাদের এই আজেবাজে গণ্ডগোলের কাছে আসেন ? আপনার চাকরকে বলে দিন, যখন দরকার হবে, চা দিয়ে যাবে।

সার্ভেয়ার অধীর পিটারপুরা থেকে দুই মাইল দূরের পাত্রাতু কোলিয়ারীতে কাজ করে। তাস খেলতে, দাবা খেলতে, গান গাইতে একেবারেই জানে না অধীর। এমনি কি, চেঁচিয়ে হাসতেও পারে না। এমন মানুষ কেন যে এই হাসি-হল্লার আসরে এসে বসে থাকে, কিছু বোঝা যায় না।

জয়ন্তেরই অনুরোধ—আসতেই হবে অধীরবাবু।

অধীর—কিন্তু আমি তো আপনাদের বৈঠকে একটা সাইফার মাত্র, আমার দ্বারা তো আপনাদের কোন কাজ হবে না।

জয়ন্ত—তবু, ওই একটু বসেই থাকবেন। তাতেও আড্ডাটা জমে।

সাইফার হয়েই সান্ধ্য আসরের একপাশে বসে থাকে অধীর। শুধু হই-হল্লা যখন একটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন কথা বলে—আঃ, আপনারা একটু আস্তে কথা বলুন।

একদিন এভাবে আপত্তি করতে গিয়ে অধীর এই উচ্ছল হাসি-মুখর আসরটাকে কিছুক্ষণের মতো বড় গম্ভীর করে দিয়েছিল। দু'চার জনের চোখে অপ্রসন্ন ভ্রূকুটিও শিউরে উঠেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য, জয়ন্ত বেশ একটু শক্ত স্বরে অধীরের কথার প্রতিবাদ করেছিল। —আপনি

কিন্তু অকারণে এরকম একটা বাজে কথা বলে ফেললেন, অধীরবাবু।

মোটরকারের এজেন্ট শৈলেন চক্রবর্তী, দু'মাস তিনমাস পর পর পিটারপুরা ঘুরে যাওয়া তার কারবারেরই কাজের নিয়ম। সেই শৈলেন চক্রবর্তী বেশ চেঁচিয়ে এমন একটা ছড়া আবৃত্তি করেছে, যার ভাষার মধ্যে শালীনতার ছিটে-ফোঁটাও নেই।

অধীর বলে—এটা জঙ্গল নয় শৈলেনবাবু, ভদ্রলোকের বাড়ি। ওসব ছড়া এত চেঁচিয়ে বলতে আপনার একটুও লজ্জা হলো না ?

শৈলেন চক্রবর্তী—আপনি কি মনে করেছেন যে, আমি সামান্য একটু ড্রিঙ্ক করেছি বলে একেবারে কমনসেন্স হারিয়ে ফেলেছি ?

অধীর—তাই তো মনে হচ্ছে।

শৈলেন—মনে হচ্ছে, আপনি যেন কাউকে ফ্ল্যাটার করবার জন্যে এসব কথা বলছেন।

অধীর—হ্যাঁ।

অধীরের মতো শান্ত মেজাজের মানুষ কী ভয়ানক কঠোর স্বরে কথা বলতে পারে !

জয়ন্ত চেঁচিয়ে ওঠে। —না না, অধীরবাবুর কথায় আমি ফ্ল্যাটার্ড হবার মানুষ নই !

কিন্তু ঘরের ভিতরে মুখ টিপে হেসে ফেলে নীরজা। তখুনি আবার গম্ভীর হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে।

একদিন ঘরের ভিতরে চুপ করে, আর, যেন মন-প্রাণ উৎকর্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকে নীরজা। একটু আগেই ঘরের দরজার পর্দার এক ফাঁকে দেখতে পেয়েছে নীরজা, রেকর্ড বাছাই করছেন অধীরবাবু। কি গান বাজাতে চান অধীরবাবু ? একগাদা রেকর্ডের ভিতর থেকে একটা দুটো ভাল গান বেছে নিতে এত দেরীই বা হচ্ছে কেন ? আর বাছবারই বা কি আছে ? আজ যে রেকর্ডের বাক্সটা ওখানে রয়েছে, তার মধ্যে সবই তো লয়লামজনুর প্রেমের গান।

রেকর্ড বাছতে বাছতে শেষে কি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন অধীরবাবু ? দরজার পর্দার ফাঁকে আব একবার উঁকি দিয়ে দেখতে পায় নীরজা, চুপ করে আর হাত গুটিয়ে বসে আছেন অধীরবাবু।

এত কুণ্ঠা কেন ? লয়লামজনুর প্রেমের একটা গানের রেকর্ড বাজিয়ে দিলে কি এই বাড়ির সন্ধ্যাবেলার আলো বাতাস একেবারে উতলা হয়ে যাবে ? এত ভয়ই বা কিসের ?

কিন্তু না। আশা করা বৃথা। অধীরবাবুর শুধু চোখ আছে, কিন্তু তাকাতে জানেন না। মন আছে, কিন্তু বুঝতে জানেন না।

এই তো এই কিছুক্ষণ আগে, অধীরবাবু যখন তাসের হল্লা থেকে একটু দূরে সরে বসে গ্রামোফোনে দম দিলেন, তখন নীরজা নিজেই চাকর ফেলুকে বলেছে, ওখান থেকে সব রেকর্ড তুলে নিয়ে চলে এস।

ফেলুকে রেকর্ড তুলে আনতে দেখেই আশ্চর্য হয়েছে অধীর—রেকর্ডগুলো নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

ফেলু—মা বলেছে।

ওগুলি সবই, যত ভজন আর কীর্তন গানের রেকর্ড। রেকর্ডগুলিকে আলমারির মাথার উপর তুলে দিয়ে আবার ফেলুর হাত দিয়ে এই দশটা গানের রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছে নীরজা, লয়লামজনুর প্রেমের গানের রেকর্ড।

কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েই বা কি হলো ? রেকর্ডগুলি বোবা জঞ্জালের মতো অধীরের চোখের সামনেই পড়ে রয়েছে। ঠিকই, সেদিন বেশ একটা মিথ্যে কথা বলেছিলেন অধীরবাবু ; একেবারে মিথ্যে, কাউকে ফ্ল্যাটার করার ইচ্ছে নেই এই অধীরবাবুর মনে।

কিন্তু ভুলে গেলেন কেমন করে অধীরবাবু, এরই মধ্যে তো অন্তত পাঁচটি দিন নীরজা যে এতগুলি মানুষের মধ্যে বেছে বেছে অধীরবাবুকেই ফ্ল্যাটার করেছে। —আপনাকে আর এক

কাপ চা এনে দিই, অধীরবাবু ?

আর কারও প্রাণে আরও এক পেয়ালা চায়ের পিপাসা আছে কিনা, একথা তো প্রশ্ন করে জানতে চায়নি নীরজা। শুধু ওই একজনেরই পিপাসার কথা জানতে চেয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটা গানের রেকর্ড বাজাতে এত কুণ্ঠা কেন অধীরবাবুর ? প্রশ্নটা যেন নীরজার নিঃশ্বাসের মধ্যে ছটফট করতে থাকে।

না, আজ থাক। বরং কাল সন্ধ্যাবেলা যখন এই হল্লার আসর ভাঙবে, আর অধীরবাবু যখন তাঁর সাইকেলের ল্যাম্পটাকে জ্বালাবার জন্যে জানালার কাছে এই অপরাজিতার বেড়াটার কাছে দাঁড়াবেন, তখন একবার নিজের মুখেই বলে দিলে হবে, একটা কথা বলবার আছে অধীরবাবু, কাল দুপুরে কিংবা বিকেলে কি একবার আসতে পারবেন ?

অধীরকে কী কথা জিজ্ঞাসা করবে নীরজা ? শুধু এই একটি কথা, আপনি আজ গানের একটা রেকর্ডও বাজালেন না কেন ? লয়লামজনুর প্রেমের গানগুলি কী অপরাধ করেছে ?

কিন্তু কেঁপে উঠেছে নীরজার শরীর। চোখ দুটো ভয় পেয়ে একেবারে পাথরের চোখের মতো নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। শাড়ির আঁচলটাকে শক্ত মুঠো করে ধরে নিয়ে মুখটাকে চেপে ধরে নীরজা ; যেন একটা কথাও শব্দ করে ফুটে উঠতে না পারে।

সন্ধ্যার আসর ভাঙে। একে একে চলে যাচ্ছে সবাই। অধীরও চলে যাবে। অপরাজিতার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ল্যাম্পটা জ্বালতে থাকে অধীর।

জয়ন্তকে ডাক দেয় নীরজা—শোনো।

জয়ন্ত—বলো।

নীরজা—তুমি অধীরবাবুকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দাও।

জয়ন্ত—বলো, কি বলবো ?

নীরজা—অধীরবাবু আর যেন এখানে না আসেন।

জয়ন্ত চমকে ওঠে।—ছিঃ, এরকম একটা অভদ্রতার কথা কি বলা যায় ?

নীরজা—বলতে হবে।

জয়ন্ত—তুমি তো কোনদিনও কাউকে এভাবে তাড়িয়ে দেবার কথা বলনি ? আজ হঠাৎ...।

নীরজা—কাউকে তাড়িয়ে দেবার দরকার হয়নি। তাই বলিনি।

জয়ন্ত—শেষে বেচারা এই অধীরবাবুকে তাড়িয়ে দেবার দরকার হলো !

নীরজা—হ্যাঁ।

জয়ন্ত—কেন ?

নীরজা হাসে—সামান্য পোকামাকড় হলে তাড়িয়ে দেবার দরকার হতো না।

জয়ন্ত হাসে—তবে কি অধীরবাবু একটা অসামান্য বাঘ-সিংহ ?

নীরজা—হ্যাঁ।

জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বলে—সত্যি কি তুমি ভয় পেলে ?

নীরজা—খুব ভয় পেয়েছি।

জয়ন্ত—কিন্তু বলবো কি করে ? বলতে যে ভয়ানক লজ্জা করছে।

নীরজা ভ্রূকুটি করে তাকায়—লজ্জা করলে মরবে। যাও, দেরি করো না, এখনই গিয়ে বলে দাও।

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে জয়ন্ত। এগিয়ে গিয়ে অপরাজিতার বেড়ার কাছে দাঁড়ায়। জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে শুনতে পায় নীরজা—উঃ, কত স্পষ্ট করে বলে দিল জয়ন্ত, আপনি আর এখানে আসবেন না, অধীরবাবু, প্লীজ।

দেখতে পায় নীরজা, কোন কথা না বলে চলে গেল অধীর।

জীবনে তোমার পরিচয়

এই ট্রেনের কামরার কোন সীটে বসবার মতো খালি জায়গা আর নেই। কিন্তু সুধাকর আর একটু পরেই যখন নেমে যাবে, তখন রজতের পাশেই একজনের মতো একটি জায়গা খালি হয়ে যাবে।

রজত আর সুধাকর, দুই বন্ধু এই ট্রেনেই টাটানগর থেকে আসছে। ট্রেন এখন ঘাটশিলা স্টেশনে থেমে রয়েছে। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। বড়জোর আর মিনিট দুই-তিন সময় বাকি আছে।

রজত যাচ্ছে কলকাতা , সুধাকর এই ঘাটশিলাতেই নামবে, মাত্র একদিনের জন্য ঘাটশিলাতে থেকে কয়েকটা দোকানকে পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিয়ে তারপর আবার টাটানগর ফিরে যাবে।

সুধাকরের সঙ্গে কোন বিড়ম্বনার বোঝা নেই, একটা হাতব্যাগও না। হাতে শুধু সিগারেটের একটা টিন। কাজেই নেমে যাবার জন্য সুধাকরের তাড়াহুড়ো নেই। ট্রেন যদি হঠাৎ চলতেও শুধু করে, তবু কোন অসুবিধে নেই। টুপ করে নেমে পড়তে পারবে সুধাকর। আর, এইভাবে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, ততটুকু সময় বন্ধু রজতের সঙ্গে বরং একটু গল্প করে নেওয়াই ভাল।

গার্ডের হুইসিল বাজেনি, ট্রেনও চলতে শুরু করেনি, তবু সুধাকরকে নেমে পড়তে হলো। কারণ, এক তরুণী ব্যস্তভাবে এই কামরাতেই উঠেছেন। তরুণীর সঙ্গে আরও যে দুই ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁরাও ব্যস্তভাবে বলেন, শুধু একজনের বসবার মতো জায়গা পেলেই তো হতো ; এই যে দেখছি...... !

বুঝতে অসুবিধে নেই, এই দুই ভদ্রলোক এই ট্রেনের যাত্রী হতে আসেননি। এঁরা শুধু এই তরুণী যাত্রিণীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। কাজেই, এরপর সুধাকরের পক্ষে মিছিমিছি একটা জায়গা দখল করে বসে থাকা আর সম্ভব নয়। উঠে দাঁড়ায় সুধাকর। —আমি নেমে যাচ্ছি। আপনি এখানে বসতে পারেন।

বসতে তো হবেই। একটা জায়গা যে পাওয়া গেল, এটাই একটা ভাগ্যের কথা। যাত্রিণী তরুণী বেশ খুশি হয়েই বসে পড়লেন। আর, তাঁর সঙ্গের দুই ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে ও হাঁপ ছেড়ে কামরা থেকে নেমে গেলেন।

সুধাকরও নেমে যায়। প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে কামরার জানালার দিকে তাকিয়ে হাসে আর কথা বলে—এইবার ট্রেন ছাড়ছে। আমি চললাম, যথাসময়ে কলকাতায় পৌঁছে যাব।

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। তরুণীর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, সেই দুই ভদ্রলোকও কামরার জানালার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—কলকাতায় পৌঁছেই কিন্তু চিঠি দিও। ভুলে যেও না।

ঘাটশিলার স্টেশন আর দেখা যায় না। অনেক দূর চলে এসেছে ট্রেন। ট্রেনের এই কামরার পাশাপাশি দুটি জানালা দিয়ে দুটি মুখ উঁকি দিয়ে শুধু মাঠ বন আর পাহাড়ের চেহারা দেখতে থাকে।

দু'জনের কাছে ট্রেনের এই কামরার ভিতরটাই বরং একটা অপরিচিত জগৎ। একটি মুখও

চেনামুখ নয়। এই সীটের এখানে পাশাপাশি যে দুজন বসে আছে, তারও কেউ কারও পরিচিত নয়।

এই তরুণী, যার নাম মলয়া, সেও কলকাতাতেই যাচ্ছে। রজত আর মলয়া, দু'জনে যেন দুটি নির্বিকার ও অবান্তর অস্তিত্ব হয়ে পাশাপাশি বসে থাকে, যদিও ট্রেনটা ভয়ানক ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। কামরার ভিতরে একটা ঘটি গড়িয়ে গড়িয়ে ওদিকে চলে গেল। একটা বাক্সের উপর থেকে ছোট একটা ঝুড়ি ধুপ করে পড়ে গেল। উল্টে পড়ে গেল এক যাত্রীর টিফিন কেরিয়ার। কিন্তু এরা দু'জন একটুও বিচলিত নয়। কেউ কারও সঙ্গে সামান্য দু'একটা মুখের কথায় একটু আলাপ করতেও চায় না। ইচ্ছেই হয় না।

ট্রেনের দুরন্ত দোলা আর ঝাঁকুনিতে কামরার ভিতরে যা-কিছু যেভাবে যত এলোমেলো হয়ে যাক না কেন, রজত আর মলয়ার মনের কামরার কোন জিনিস এলোমেলো হয়ে যায় না। শাড়ির আঁচলটাকে এক হাতে টেনে নিয়ে বেশ শক্ত হয়ে বসে আছে মলয়া। আর রজতও একটি শান্ত-সুস্থির মূর্তি নিয়ে যেন নিজেরই কল্পনার জগতের একটি ঠাঁই নিয়ে অবিচল হয়ে বসে আছে।

রজতের মনের প্রতিক্ষণের কল্পনা আসন্ন একটি উৎসবের ছবি দেখছে। সেই উৎসবের দিন-ক্ষণ সবই ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাকা লিখেছেন, তুমি অন্তত এক মাসের ছুটি নেবে রজত। আর বিয়ের তারিখের অন্তত সাতদিন আগে কলকাতায় পৌঁছে যাবে।

রজতের জীবনের সঙ্গিনী হবার জন্য যে-মেয়ে আজ এই আসন্ন উৎসবের নেপথ্যে এখন দাঁড়িয়ে আছে, সে-মেয়ে রজতের চোখের অচেনা হলেও অজানা নয়। বড়দি লিখেছেন, রুণুর মতো সুন্দর চেহারার মেয়ে, হাজারেও একটা চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ। কাকিমা লিখেছেন, আমরা ঠিক যেমন মেয়ে চেয়েছিলাম, ঠিক তেমন মেয়েরই খোঁজ পেয়েছি। সব দিকে ভাল। অচেনা অজানা ঘরের মেয়ে নয়, রুণু হলো আমারই সেজকাকার বড়মেয়ে সুচারুর মেয়ে।

শুধু কি বড়দির চিঠি আর কাকিমার চিঠি ? তাও কি আবার দুই-তিনটি চিঠি ? বোধহয় এই ছ'মাসের মধ্যে তিরিশটি চিঠি পেয়েছে রজত, আর সে-সব চিঠিকে দু-তিনবার করে পড়তেও হয়েছে। সব চিঠিই যেন রুণুর জীবনের যত রূপকথার কলরবে মুখর হয়ে রজতের বুকের ভিতরে অদ্ভুত এক মধুরতার গুঞ্জন ভরে দিয়েছে। এক-একদিন সত্যিই মনে হয়েছে রজতের, রুণুকে যেন চোখের কাছেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুই চোখে নিবিড় এক বিস্ময়ের আবেদন নিয়ে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রুণু। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল রুণু, আর মাথাটাকে একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রুণুর খোঁপাতে সাদা ফুলের একটা স্তবক দেখতে পাওয়া যায়।

কাকিমা লিখেছেন, আমরা জানি, খুব শিক্ষিতা মেয়ে না হলে তোমার মতো ছেলের সঙ্গে একটুও মানাবে না। তাই রুণুকে আমাদের আরও পছন্দ হয়েছে। তোমাকে তো আগের চিঠিতেই জানিয়েছি যে...।

হ্যাঁ, আগের আরও তিনটি চিঠিতে জানিয়েছেন কাকিমা, রুণু হিস্ট্রিতে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এম-এ পাশ করেছে! রুণু খুব ভাল গান গাইতে পারে। রুণুর হাতের বাটিকের কাজ তিনবার এগজিবিশন কমিটির সার্টিফিকেট পেয়েছে।

রুণু যে একটুও যেমন-তেমন স্বভাবের মেয়ে নয়, এই সত্যটাকেও নানাকথায় একেবারে স্পষ্ট করে আর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন বড়দি।—আমি তো সবই জানি, আমি রুণুকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। আগে সিঁথিতে আমাদেরই পাশের বাড়িতে রুণুরা থাকতো। এখন অবশ্য রুণুর বাবা পার্কসার্কাসে মস্ত বড় বাড়ি করেছেন। রুণু এত লেখাপড়া শিখেছে, বয়সও

ছাব্বিশ পার হয়ে সাতাশে পড়েছে কিন্তু বিয়ের কথা শুনলে আঁচল তুলে মুখ ঢাকা দেয়, রুণু হলো এইরকম স্বভাবের মেয়ে। বলতে গেলে, বেশ একটু ভীরু স্বভাবের মেয়ে। খুব মনখোলা মেয়ে। কোন পছন্দ-অপছন্দ গোপন করে রাখবার মতো মেয়ে নয়। রুণুর বিয়ের জন্যে বিয়ের সম্বন্ধের খোঁজ এই প্রথম ; তোমারই সঙ্গে বিয়ের কথা উঠলো, আর সবাই তখনি রাজি হয়ে গেল। আর সবচেয়ে যেটা ভাল কথা, সেটাও তোমাকে বলেই দিচ্ছি। রুণুও খুব খুশি। এটা শোনা কথা নয়, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আর নিজের কানে শুনেছি। রুণু শেষ পর্যন্ত কোন লজ্জা না করে আর হেসে হেসে বলেই দিয়েছে, আমি তো শাঁখের শব্দ শোনার জন্যে কান পেতেই রয়েছি, আপনারা বাজাতে এত দেরি করে দিচ্ছেন কেন বউদি ?

ট্রেন এখনও ঝাড়গ্রাম পৌঁছয়নি। খুব জোরে ছুটে চলছে ট্রেন। কামরার জানালা দিয়ে বাতাসের এক-একটা ঝাপটা ঢুকে রজতের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনের মুখটা দপদপ করে রাঙিয়ে দিচ্ছে। রঙীন হয়ে যাচ্ছে রজতের মুখটাও। মনে পড়েছে রজতের, সেদিন বড়দির এই চিঠির কথাগুলি রজতেব নিঃশ্বাসের বাতাসে যেন রঙীন আবীর ছিটিয়ে দিযেছিল। কল্পনা কবে দেখতে গিযেই যেন চোখে দেখতে পেয়েছিল রজত, রুণুর মুখের হাসিটা যেন দুর্বার এক অভিমানে রঙীন হযে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে—এর পরেও তুমি দেরী করবে ? কোনোদিন দুই চোখে দেখনি বলেই কি ভালবাসতে পারছো না।

বড়দিকে আর কাকিমাকে চিঠি দিতে আর দেরি করেনি রজত—আমি একমাসের ছুটির দরখাস্ত করে দিয়েছি। তোমরা দিন ঠিক করতে আর দেরি করো না।

২

শাড়ির আঁচলটাকে এত শক্ত করে ধরে, আব এত স্তব্ধ হয়ে বসে কী ভাবছে মলয়া ?

মামলার তারিখ পড়েছে আজই সন্ধ্যার ট্রেনে ঘাটশিলা থেকে চাইবাসা রওনা হবেন বড়মামা আর ছোটমামা। তা না হলে আজ মলয়াকে ট্রেনেতে শুধু তুলে দিয়েই দু'জন চলে যেতেন না, অন্তত ছোটমামা নিশ্চয় মলয়ার সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত আসতেন।

ছোট মামী নিজেই বেশ একটু রাগ করে বলেছেন, তোমাদের মামলা কবে মিটবে না মিটবে, সেজন্যে কি মেয়েটা এখনও এখানে পড়ে থাকবে ? ওর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন ওকে নিয়েই তো যতো কাজ। ওর বাড়ির মনও যে কত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও কি বুঝতে পার না ? তা ছাড়া, মলয়ার নিজের মন বলেও তো কিছু আছে। ওর এখন আব এখানে থাকতে ভাল লাগবে কেন ?

কাজেই শেষ পর্যন্ত মলয়াকে একাই পাঠাতে হলো। এতে আর দুশ্চিন্তা করবার কি আছে ? এই ট্রেনই তো সোজা গিয়ে হাওড়াতে থামবে। টেলিগ্রাম করেই দেওয়া হয়েছে। মলয়াদের বাড়ির গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে অপেক্ষায় থাকবে। মলয়ার পক্ষে একা কলকাতা ফিরে যাওয়া তো এমন কিছু সমস্যার ব্যাপার নয়।

পুরো একটা মাস ঘাটশিলাতে কাটিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়া, ঘাটশিলার মহুয়ার ছায়ার জন্য মলয়ার মনে একটু আকুলতা আজ জেগে উঠতো বই কি; যদি সে আকুলতার ঠাঁই হবার মতো একটু খালি জায়গা মনের এক কোণেও থাকতো। আজ মলয়ার মনের সব ঠাঁই জুড়ে শুধু একটি কল্পনার ছবি হাসছে। এই ছবিও একটি আসন্ন উৎসবের ছবি। সে উৎসবের আঙিনাতে মলয়ার পাশে এমনি একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, যাকে মন-প্রাণ দিয়ে আপন করে নিতে আর একটুও লজ্জা করতে ইচ্ছে করে না। চোখের চেনা নয়, তবু মনে হয় কত দিনের চেনা। মেজবউদির চিঠির ভাষার তো কোন মাত্রা নেই। কলমের মুখে যা

এসেছে তাই লিখে দিয়ে বসে আছেন মেজবউদি। লিখেছেন, তুমি যা চাও, তাই পেতে চলেছো। তোমাকে যার সঙ্গে চমৎকার মানায়, তারই সঙ্গে তোমার জীবনের গাঁটছড়া পড়তে চলেছে। এতদিন যে তোমার ওপর কারও চোখ পড়েনি, আর, কারও ওপর তোমারও চোখ পড়েনি, সে আক্ষেপ তুমি এবার পুষিয়ে নিতে পারবে। টুলুবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালে তোমার ওই ভীরু চোখ দুটিও দু'মিনিট ধরে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু আবার এরকম একটা চিঠি লিখে মলয়াকে অশান্ত করবার কোন দরকার ছিল না মেজবউদির। মেজবউদিও তো শুনেছেন, সেদিন আলিপুরের উমাদিকে কী কথা একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল মলয়া। মলয়া তো তৈরি হয়েই আছে, রাজি হয়েই আছে। মলয়া শুধু চায় যে, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ কি? টুলুবাবু নামে সেই মানুষটি যখন রূপে গুণে আর স্বভাবে এতই সুন্দর তখন মলয়াকে তো আর কোন কথা বলবার দরকার হয় না।

জার্মানী থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী নিয়ে, তারপর দু'বছরেব ট্রেনিং নিযে দেশে ফিবেছে আর রাউরকেলার স্টীল-প্ল্যান্টে ভাল কাজ পেযেছে যে, সে মানুষের বিদ্যে বুদ্ধি আর শিক্ষা-দীক্ষার কথা নিয়ে প্রশ্ন করবার তো কিছু নেই। দেখতে খুবই ভাল, বিশেষ করে মেজবউদির মতো মানুষের চোখ যেটা স্বীকার করছে, তখন তো সে ভদ্রলোকের রূপের এত বিবরণ শোনবার কোন দরকার হয় না। মেজবউদির চোখ ভয়ানক খুঁত ধরবার অভ্যেসের চোখ। একজন বেশ সুশ্রী মানুষকে দেখা মাত্রই বলে দেন মেজবউদি, ভদ্রলোকের কপালটা কেমন যেন চাপা, একটু বাঁকা। এহেন মেজবউদি যখন বলতে পেরেছেন, টুলুবাবু দেখতে চমৎকার, তখন আর বেশি চমৎকারিতা দাবি করবার কোন মানে হয় না। মলয়ার কল্পনাতে খুব বড় কোন দাবিও ছিল না। ভাল লাগবে, ভালবাসতে কোন বাধা হবে না, শুধু এইটুকু রূপ-গুণ স্বভাব থাকলেই হলো! কোনদিনও এর চেয়ে বেশি আশা কবতে চায়নি মলযা।

তাই ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে বইকি। যার জীবনের সঙ্গে মলযার জীবন মিলিযে দেবার জন্যে একটি লগ্ন আর একটি রাখীডোর অপেক্ষায় রযেছে, সে যে মলয়াব কাছে আশার দাবির চেয়েও বড একটি প্রাপ্তি। তাকে এখনই একবার দেখতে ইচ্ছে কবে। কি আশ্চর্য, মেজবউদি তো বুদ্ধি করে একটা ফটো পাঠিয়ে দিতে পারতেন। চেষ্টা করলে কি ভদ্রলোকের একটা ফটো যোগাড় করা বাড়ির এতগুলো মানুষের মধ্যে কারও পক্ষে সম্ভব হতো না? মা একদিন অবশ্য হেসে-হেসে একটা ফটো দেখিয়েছিলেন, হাজারিবাগের একটা পাহাড়ের কাছে তোলা একটা গ্রুপ ফটো। সেই গ্রুপ ফটোর মধ্যে বারো বছর বয়সের একটা ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন মা, এই, এই হলো টুলু।

একরকম ভালই হয়েছে; রাউরকেলার ইঞ্জিনিয়ার টুলুকে একদিনও দেখবাব সুযোগ হয়নি। এই অদেখার সব ফাঁকি একদিন একটি পরমক্ষণের চরম দেখার মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যাবে। সে দিনটাও তো এসেই পড়েছে। আর মনটাকে এত ছটফট করিযে লাভ কি?

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কল্পনা মলয়ার মনের এই ভাবনাটাকে যেন একটা ঠাট্টা করে হাসিয়ে দেয়। এই যে পাশে বসে আছেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক, ঠিক এইরকমই সেই ভদ্রলোকও যদি এখানে এই ট্রেনের কামরাতে দেখা দিতেন? তবে, মলয়া নিশ্চয় একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আর দেখে নিয়েই বুঝে ফেলতো ইনি কে। চিনতে আর জানতে একটুও ভুল হতো না মলয়ার।

আরও একবার মনে মনে হেসে ফেলে মলয়া, কি আশ্চর্য, সে ভদ্রলোক কিন্তু এখন স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না যে, মলয়া এখন তারই কথা ভাবছে আর তাকেই দেখবার জন্য ছটফট করছে।

ঝাড়গ্রাম। ট্রেন এখানে যে আর কতক্ষণ থেমে থাকবে কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

লাইন খারাপ হয়েছে নাকি !

ট্রেনের যাত্রীরাও অদ্ভুত। ট্রেনের প্রায় অর্ধেকটা খালি করে দিয়ে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নেমেছে; ঘুরছে, বেড়াচ্ছে আর গল্প করছে। মনে হচ্ছে ট্রেন ছাড়বার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিংবা আরও অনেক দেরিতে ট্রেন ছাড়বে।

তবে তো হাওড়া পৌঁছতে মাঝরাতও পার হয়ে যাবে। ড্রাইভার রামলালও শেষে ধৈর্য হারিয়ে আর শূন্য গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে না তো ? তাহলে তো একটা বিপদেই পড়তে হবে। কাউকে একটু জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে হতো, ট্রেন এখানে এতক্ষণ ধরে থেমে আছে কেন ? কিন্তু কা'কে জিজ্ঞাসা করা যায় ? পাশে বসে আছেন যে ভদ্রলোক, তিনি কি কিছু বুঝেছেন ? ভদ্রলোক তো কামরা থেকে নামলেনও না, শুধু চুপ করে আর একেবারে সুস্থির হয়ে সিগারেট খেয়ে চলেছেন।

মলয়া যেন প্ল্যাটফর্মের একটা আলোর দিকে তাকিয়ে আর বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলে—কিছু যে বুঝতে পারছি না ! এখানেই এত রাত হয়ে গেল . ।

রজত বলে—আপনি কোথায় যাবেন ? কলকাতা ?

মলয়া—হ্যাঁ।

রজত—হাওড়া পৌঁছতে কিন্তু বেশ রাত হয়ে যাবে।

চমকে ওঠে মলয়া—তাহলে তো খুবই অসুবিধেয় পড়তে হবে।

রজত—কেন বলুন তো ?

মলয়া—বাড়ির গাড়ি যদি আর অপেক্ষা না করে চলেই যায় তবে . ?

রজত হাসে—না, চলে যাবে কেন ? খোঁজ নিয়ে জানতে পারবে যে, ট্রেন কত ঘণ্টা লেট হয়ে পৌঁছচ্ছে। তা ছাড়া, আপনার চিন্তা করবার কিছু নেই। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে... ।

মলয়া—কি করে হবে ?

রজত—হাওড়া স্টেশন থেকেই বাড়িতে ফোন করবেন। একটু অপেক্ষা করবেন। তারপর আপনার বাড়ির গাড়ি চলে আসবে।

মলয়া হাসে—ধন্যবাদ, আপনি একটা উপায় বলে দিলেন। আমি কিন্তু ভাবতেই পারছিলাম না। ... কিন্তু ট্রেন এখানে থেমে আছে কেন ?

রজত—ওই যে শুনলেন, টিকিট চেকার বলে গেল।

মলয়া—কই ? কখন বললেন ? আমি কিছুই শুনতে পাইনি তো।

রজত—মিলিটারীর দুটো স্পেশাল ট্রেন আসছে। সেগুলি আগে পাস করবে, তারপর আমাদের ট্রেন ছাড়বে।

মলয়া—কিন্তু কখন পাস করবে ?

হেসে ফেলে রজত—সেটা জানা থাকলে তো বলাই যেত আমাদের ট্রেন কখন ছাড়বে।

মলয়া—তার মানে, কত দেরি হবে তার কোন ঠিক নেই।

রজত—তাই তো।

চুপ করে মলয়া। কিন্তু চুপ করে থাকলেই মনের অস্বস্তিটা যেন আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। একটা অনিশ্চয় মুহূর্তের অপেক্ষায় এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেও ভয়-ভয় করে। প্ল্যাটফর্মের আলোও যেন হিমেল বাতাসের ছোঁয়া লেগে নেতিয়ে পড়েছে। মাসটা তো মাঘ মাস। এত রাতের বাতাসে এমন একটা হিমেল ভাব জেগে উঠবেই বা না কেন ?

জানে না মলয়া, কতক্ষণ এভাবে শুধু প্ল্যাটফর্মের একটা আলোর দিকে চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। হঠাৎ চমকে ওঠে মলয়া, পাশের ভদ্রলোক কি যেন বললেন।

মলয়া—আপনি কি আমাকে কিছু বললেন ?

রজত—হ্যাঁ। আপনি চা খেতে চান তো বলুন, চা-ওয়ালাকে ডেকে দিচ্ছি।

বেশ কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকে মলয়া—আপনি ডেকে দিলে অবিশ্যি...না থাক...চা আর নাই বা খেলাম।

রজতও হাসে—আপনি তো আপনার সঙ্গের খাবার-টাবারও খেলেন না। আর খাবেন কখন ?

মলয়ার মনে পড়েছে, রজতও দেখতে পেয়েছে যে ছোট্ট একটা খাবারের বাস্কেট মলয়ার পাশে সীটের উপরে রয়েছে।

মলয়া—আপনি তো আমাকে বলছেন, কিন্তু আপনিও তো ..।

রজত—আমি ট্রেনে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ কিছু খেতেই পারি না। অসম্ভব। ইচ্ছেই করে না। শত খিদে লাগলেও না।

মলয়া—তা হয় না।

রজত—কি বললেন ?

মলয়া হাসে—আমার বেশ খিদে পেয়েছে। না খেয়ে পারবোও না। কিন্তু...

বাস্কেট খুলে দুটো সন্দেশ হাতে তুলে নিয়েই রজতের হাতের কাছে বাস্কেট এগিয়ে দেয় মলয়া—আপনি খান।

রজত—মাপ করবেন। কিছু মনে করবেন না। আমাকে দেবেন না।

কিন্তু হাতে সরিয়ে নেয় না মলয়া। খাবারের বাস্কেটটাকে রজতের হাতের কাছে তুলে ধরেই রাখে। তারপর বিড়বিড় করে বলেই ফেলে—আপনি এরকম করছেন কেন ?

রজত তবু কুণ্ঠিত। হঠাৎ আনমনার মতো হয়ে আর পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করে রজত।

মলয়া—ও কি, আবার সিগারেট ধরাচ্ছেন কেন ? আগে খেয়ে নিন।

যেন শুনতে পায়নি রজত। আনমনার মতই প্রশ্ন করে—কি বললেন ?

মলয়া—আপনি বুঝছেন না কেন, আপনি না খেলে আমারও...।

—সে কি ? না না, আপনি খাবেন না কেন ? চেঁচিয়ে ওঠে রজত।

হেসে ফেলে মলয়া—একটু চক্ষুলজ্জা থাকতে খাব কি করে ?

মলয়ার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আর দ্বিধা করে না রজত। বাস্কেটটাকে হাতে নিয়ে কয়েকটা মিষ্টি তুলে নেয় আর খেতেও থাকে। তখুনি কামরা থেকে নেমে যায় রজত।—যাই, একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আসি।

চা-ওয়ালা আসে। কিন্তু চা-ওয়ালার হাত থেকে গরম চায়ের পেয়ালা নিজেই তুলে নিয়ে মলয়ার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় রজত। মলযা হাসে—আপনি খান।

রজতও হেসে ফেলে—দাই নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।

মলয়া—এখন তো এটা বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু এই একটু আগে আমি যখন আপনার হাতের কাছে খাবার এগিয়ে দিলাম, তখন তো আপনার মনে হয়নি যে, আমিও একথাটা বলতে পারি।

রজত—আপনার কি তাই মনে হয়েছিল ?

মলয়া—মনে হলেই বা কি ? আপনি তো বুঝতে পারেননি। যাক্ গে, মিলিটারির স্পেশালটা কি কোথাও ঘুমিয়ে পড়লো ?

রজত—আর বেশি দেরি হবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না।

মলয়া—সত্যি ঠাণ্ডা লেগেছে। কিন্তু আপনার এ সন্দেহ কেমন করে হলো ?

রজত—সন্দেহ নয় ? চোখেই দেখতে পাচ্ছি, আপনার চোখ কেমন ছলছল করছে। আপনার গরম কোট এইবার গায়ে দিয়ে ফেলুন।

মলয়া—তা তো দিতেই হবে। এত ঠাণ্ডা সত্যিই আমার সহ্য হয় না।

রজত—আমার খুব সহ্য হয়।

মলয়া—এটা একটা চালাকির কথা বললেন।

চমকে ওঠে রজত—আপনি হঠাৎ এরকম একটা কথা ।

মলয়া—আপনার সঙ্গে গরম আলোয়ান নেই তাই, যেন আমি আপনার কোন ভুল না ধরতে পারি, তাই আগেভাগে একটা কৈফিয়ত শুনিয়ে রেখে দিলেন।

রজত—ঠিকই, ভুল হয়ে গিয়েছে। আলোয়ানটাকে টাটানগরে আমার বন্ধু সুখকরের বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছি।

মলয়া—আপনি আর ওখানে প্ল্যাটফর্মের ওপরে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভেতরে এসে বসুন।

কামরাতে ঢুকে আবার নিজের সীটের উপর বসে রজত। কিন্তু আর তো নিজেকে একটা একলা মানুষ বলে মনে হয় না। পাশে বসে আছে এক অপরিচিতা সঙ্গিনী, যার জীবনের কোন পরিচয় জানা নেই, তারই সম্পর্কে মনের ভিতরের একটা বিস্ময় যেন হঠাৎ চমকে চমকে উঠছে, এই মেয়েকে যে হঠাৎ-পাওয়া একটি আপনজন বলে মনে হয়। গরম আলোয়ান সঙ্গে নেই বলে ধমক দেয়। রজত খাবার না খেলে নিজে খেতে পারে না। বাঃ, বেশ একটা কাণ্ড করে বসে রইল এই অপরিচিতা।

মলয়া বলে—এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়নি, ভালই হয়েছিল। এখন কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না।

রজত—কেন ?

মলয়া—এই যে বললাম ; আপনি ঠাণ্ডাতে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আমার কিছুই করবার উপায় নেই। আমার সঙ্গেও কোন আলোয়ান কিংবা চাদর নেই যে..।

রজত—এটা আপনি একটু বেশি বাড়িয়ে ভাবছেন। বাইরে অবশ্য ঠাণ্ডা আছে, কিন্তু এই কামরার ভিতরে তেমন কিছু ঠাণ্ডা নেই।

মলয়া—ট্রেন চলতে শুরু করলেই বুঝবেন, কেমন ঠাণ্ডা।

রজত—এসব কথা এখন বাদ দিন তো। গল্প করতে হলে অন্য কথা বলা যায়।

মলয়া হাসে—হ্যাঁ, গল্পই তো। আপনি কি ভাবছেন যে, আমি খুব সিরিয়াসলি বলছি !

রজত—না না, আমাকে সিরিয়াসলি কিছু বলবার তো কথা নেই ! আপনি বলবেনই বা কেন ? অনেক দিন আগে আমি একবার এই লাইনে নাগপুর গিয়েছিলাম। সে-সময় দেখেছিলাম, এই ঝাড়গ্রামে ঝুড়ি ভর্তি করে চাঁপা ফুল বিক্রি হচ্ছে।

মলয়া—ফুল কিনেছিলেন ?

রজত—না।

মলয়া—কেন ?

রজত হাসে—তখন দরকার ছিল না !

মলয়াও হাসে—এখন দরকার আছে বোধহয় !

রজত—না, এখনও দরকার হয়নি।

মলয়া—ভাল কথা ! আমি অবশ্যি এই লাইনে আগে আর কখনও যাইনি। এই প্রথম ঘাটশিলাতে গিয়ে একমাস ছিলাম। সত্যি ঘাটশিলা খুব সুন্দর জায়গা, যদিও এখনও মহুয়া ফুল ফোটেনি।

রজত—কিন্তু তাতে মহুয়াবনে বেড়াতে তো কোন অসুবিধে নেই।

মলয়া—না, খুব বেড়িয়েছি। একা একাই বেড়িয়েছি। একা বেড়াতেই ভাল লাগে আমার।

রজত—একা একা ট্রেনে যেতেও ভাল লাগে নিশ্চয় ?

মলয়া—না, সেটা ঠিক নয়। মামার সময় হলো না বলেই আমাকে একা একা যেতে হচ্ছে। কিন্তু...

রজত—কি ?

মলয়া—আপনি আজ না থাকলে সত্যিই আমার এখানে এভাবে একা বসে থাকতে বেশ ভয় করতো।

রজত—ভয় কিসের ? কামরাতে এত মানুষ বয়েছে। মহিলারাও আছেন। আপনার ভয়-ভয় করবার কোন মানে হতো না।

মলয়া—তবু। আপনাকে তো ঠিক ওদের মতো মনে হচ্ছে না।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে মলয়া, বোধহয় নিজের মুখের কথাবই শব্দটাকে শুনে আশ্চর্য হয়েছে। নিবিড় হয়ে গিয়েছে মলযাব দুই চোখের কালো তারা দুটো। আব, চমকে উঠেছে রজতের বুকের ভিতরটা ; হঠাৎ এক কি-কথা বলে ফেলেছে এই অপবিচিতা মহিলা। এই ট্রেনের কামরার ভিড়ের মধ্যে বেছে বেছে শুধু একজন মানুষকেই সত্যি করে কাছের মানুষ বলে মনে করে ফেলেছে, ক্ষণকালের একটা মায়ার কাছে মনেব কথা মুখ খুলে বলে ফেলেছে।

রজত বলে—আমারও তো তাই মনে হতে পারে।

রজতের চোখের চাহনিটাকে ভয় পায় না মলয়া। আর রজতের মুখের এই কথা শুনেও মুখ ফিরিয়ে নেয় না। মলয়া যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে।—তা তো মনে হতেই পারে। মনে হলেই বা আপনাকে দোষ দিচ্ছে কে ?

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। রজত বলে—না, আপনি আর জোব করে জেগে থাকতে চেষ্টা করবেন না। আপনি চোখ বন্ধ কবে যতটুকু পারেন ঘুমিযে নিন।

মলয়া যেন রাগ করে কথা বলে—আপনি বললেই আমার ঘুম এসে যাবে, না ?

উত্তর দেয় না রজত। ঝাড়গ্রাম পার হয়ে রাতের অন্ধকারে, যেন দূর আকাশের তারার দিকে লক্ষ করে ট্রেন তখন ছুটে চলেছে।

চুপ করে জেগেই বসে আছে দু'জনে, রজত আর মলয়া। ক্ষণকালের এই সান্নিধ্যের ভয়ানক এক বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে আবার একলা হয়ে যাবার জন্য দু'জনের নিঃশ্বাসের ভিতরে যেন একটা সংগ্রাম চলেছে। ট্রেনের দোলানির সঙ্গে আর দুলতে চায় না মলয়ার মাথার খোঁপাটা, আর ট্রেনের ঝাঁকুনিতে চমকে উঠতে চায় না রজতের হাতের সিগারেট। শুধু কয়েকবার, বোধহয় তিনবার হঠাৎ দু'জনের মুখের দিকে দু'জনে তাকিয়ে ফেলেছে। সেই মুহূর্তে দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

হাওড়া স্টেশন। অনেক রাতে ট্রেন থেমেছে। কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই হেসে ফেলে মলয়া।—ওই যে, ড্রাইভার রামলাল দাঁড়িয়ে আছে।

উঠে দাঁড়ায় রজত। হাসতে চেষ্টা করে বলে —তাহলে আমি আসি। আপনিও যান।

মলয়া—হ্যাঁ। কিন্তু...।

রজত—বলুন।

মলয়ার মুখটা খুবই গম্ভীর।—সত্যিই ভাল লাগছে না।

রজত—সত্যি কথা বলছেন ?

মলয়া—হ্যাঁ।

রজত—কিন্তু আর কি কখনও... ।

মলয়া—না, আর দেখা হবে না। দেখা হলেই বা কি হবে ?

রজত—আমিও এই কথা ভাবছিলাম। তবে.. ।

মলয়া—বলুন।

রজত—কি বলবো, বুঝতে পারছি না। ভুলে যাবেন না যেন।

মলয়া—না, ভুলবো না। কিন্তু থাক, আর কিছু বলবেন না। বলে লাভ নেই।

বিদায় নিয়ে চলে গেল মলয়া। রজতও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর চলতে থাকে।

৩

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে, অনেক রাতের একটি মুহূর্তে, যখন মলয়া ওর একলা ঘরের নিভৃতে একটা সস্তির হাফঁ ছেড়ে চেয়ারেব উপর বসেছে, আর টেবিল ল্যাম্পের ঢাকাটা আর একটু টেনে নামিয়ে দিয়েছে, তখন মেজবউদি এসে ঘরে ঢোকেন, আর হেসে-হেসে মলয়ার কানের কাছে ফিসফিস করেন—আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়েছে, আসছে মঙ্গলবার। কিন্তু তার আগেই, পরশুদিন টুলুবাবুকে চা খেতে নেমন্তন্ন করা হবে, যদি অবিশ্যি টুলুবাবু আজ কিংবা কালকের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে গিয়ে থাকেন।

মলযা হাসে--একথাটা তো আমাকে কাল সকালেও বললে চলতো। সে জন্যে তোমার এত রাতে উঠে আসবার কোন দরকার ছিল না। অদ্ভুত !

মেজবউদি—বলতে এলাম এই জন্যে যে, তোমার ভাল ঘুম হবে।

মলয়া—ভাল ঘুম হবে না ছাই হবে !

মেজবউদি—কেন ?

মলয়া—ট্রেনে যা বিশ্রী ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হলো, তার জের মিটতে বেশ ক'দিন লাগবে।

ঘাটশিলা থেকে হাওড়া, সেই দুঃসহ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তিটা শরীরে আর নেই, কিন্তু মনের ভিতরে এখনও যেন আছে। তাই দুটো দিন পার হয়ে গেলেও আর বেশ ভাল ঘুম হলেও মলয়ার মনের ভিতরে যেন একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস বার বাব ছটফট করে ওঠে।

কিন্তু সে অস্বস্তির নিঃশ্বাস যে এমন একটা চকিত বিস্ময়ের দখিনা বাতাসে ভরে যাবে, সেটা মলয়ার স্বপ্নেরও অগোচর একটা বাস্তব সত্য।

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আজকের সকালবেলাটা যার আগমনের অপেক্ষা করে করে এতক্ষণে একটা বিপুল কলরব তুলে হেসে উঠেছে, সে এসেছে। বাইরের ঘরে বসে আছে। মলয়ার মা এসে বলে গেলেন—টুলু এসেছে।

মেজবউদি এসে বললেন—তুমিই টুলুবাবুকে চা দেবে। আমি অবিশ্যি তোমার সঙ্গেই থাকবো।

মলয়া—আমাকে দিয়ে এ কাণ্ডটা না করালেই কি ভাল ছিল না !

মেজবউদি—তবে কেন বলেছিলে যে, একবার দেখতে পেলে ভাল ছিল।

আর মুখ লুকোতে চাইলে হবে কি ? একথা সত্যিই যে মেজবউদির কাছে একদিন বলে ফেলেছিল মলয়া। কাজেই, জীবনের আগ্রহ যখন একটা অঙ্গীকার হয়েই গিয়েছে, তখন আর এত কুণ্ঠা করবার দরকার কি ?

মেজবউদির সঙ্গেই এগিয়ে যায় মলয়া। বাইরের ঘরের ভিতরে ঢুকেই কিন্তু থমকে

দাঁড়ায়। মেজবউদির একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। তারপর মেজবউদিরই পিঠের আড়ালে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। মলয়ার সুন্দর মুখ থেকে যেন একটা সপ্নলোকের বিস্ময়ের ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে। হাসতে গিয়ে মলয়ার সারা মুখে যেন একটা ভোরবেলার লালচে আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

রজত চমকে ওঠে, আর হাসতেও থাকে—এ কী ব্যাপার! এ যে দেখছি, আরব্য উপন্যাসের মতো কাণ্ড!

মেজবউদি—কি হলো!

রজত—আমরা যে দুজনে এক সঙ্গে একই ট্রেনে একই কামরাতে বসে সেদিন হাওড়াতে পৌঁছলাম।

মেজবউদির মুখের হাসিটা উতলা হয়ে ওঠে।—তাহলে তো ট্রেনেই দু'জনের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

রজত—হ্যাঁ, হয়েছে।

মেজবউদি—তা হলে আমি আব এখানে কেন থাকি? হাসতে হাসতে আর ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন মেজবউদি। আব, পার্ক সার্কাসেব বাড়িব সব মানুষেব মনে আর মুখে এই হাসিব ছোঁয়া ছড়িয়ে দিল একটি অদ্ভুত ঘটনাব খবব, ট্রেনেতেই টুলুব সঙ্গে কণুব দেখা হয়েছে।

ট্রেনের কামবা নয়। পার্ক সার্কাসেব একটি বাড়ির বাইরেব ঘব, যে ঘবে কল্পনার একটি মেয়েকে দেখতে এসে রজত এখন এক পরিচিতা মেয়েব মুখ দেখতে পাচ্ছে।

মলয়া যাকে দেখছে, সে একজন অদেখা অচেনা কল্পনাব মানুষ নয।

মলয়া বলে—আমার কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ।

রজত হাসে—লজ্জা করছে?

মলয়া—হ্যাঁ।

রজত—আমারও কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হতো।

মলয়া—কেন বলুন তো?

রজত হাসতে চেষ্টা কবে—তা তো বলতে পারছি না। এত তাড়াতাড়ি কি বলতেও পাবা যায়?

মলযা হাসে।—আপনি নিশ্চযই এখানে কণুকে দেখতে এসেছেন।

রজত—তাই তো জানি।

মলয়ার চোখ কাঁপে—কিন্তু সেটা কি উচিত হলো?

রজতও গম্ভীর হয়—আপনিই বা রজতের সঙ্গে দেখা কবতে এখানে এলেন কেন? আপনারও কি এটা উচিত হয়েছে?

মলয়া—না।

রজত—আমি তাহলে উঠি।

মলযা—কিছু মনে করবেন না।

রজত হাসে—মনে করবাব কি আছে? কেউ কাউকে ঠকাতে পাবলাম না, এটাই তো ভাল হল। নয় কি?

মলযা—হ্যাঁ।

গুহামানব

শতাব্দীর সভ্য জীবনের এই রাজপথের এক প্রান্তে, তার মানে, দমদম এয়ারপোর্টের এলাকা ছাড়িয়ে ওদিকে মাত্র আধমাইল এগিয়ে যেতে হবে, যশোর রোডের একপাশে, যে জায়গাটার নাম রায়বাগান, যেখানে মস্ত বড় এক শীট মেটাল কারখানার টিনের শেড রূপোলী পেন্টের প্রলেপ নিয়ে ঝকঝক করে সেখানে একজন আদিমকালীন গুহামানবের ঘর দেখতে পাওয়া যায়। একথা চেঁচিয়ে বললেও অনেকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রায়বাগানের অনেকেই বিশ্বাস করে। ওই মেটাল কারখানার স্টোরের সেকেন্ড ক্লার্ক শ্রীকালীপদ দত্তের বাড়িটাকেই বলা হয়—একটা গুহামানবের বাড়ি। হেসে হেসে নয়, ঠাট্টা করেও নয়, খুবই রাগ করে আর উত্তেজিতভাবে কথাটা রায়বাগানের অনেক ভদ্রলোকের মুখে কঠোর ধিক্কারের জ্বালা হয়ে বেজে ওঠে। কথাটা সবার আগে বলেছিল, হর্ষবাবুর বড়ছেলে সেই শিশির, যে আজ দু'বছর হলো এম-এ পাস করবার পর সমাজবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে।

কে জানে, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার শিশির রায়বাগানের এই কালীপদ দত্তকে কেন গুহামানব বলে মনে করেছিল? রায়বাগানের ভদ্রলোকেরা কিন্তু ধরেই নিয়েছেন যে, আদিমকালের সেই গুহামানব নিশ্চয় এই কালীপদ দত্তের মতো মানুষ ছিল। বাইরের জীবনের চেহারাটা মানুষ-মানুষ কিন্তু ভিতরের জীবনটা পশু-পশু। ঘরের বাইরে কালীপদ দত্তকে দেখলে মেটাল কারখানার স্টোরের সেকেন্ড ক্লার্ক বলেই মনে হবে, যদিও খুব কম কথা বলেন, এদিক-ওদিক কোন দিকে চোখ তুলে তাকাতেই চান না; আর কাজের ছুটি হলে হাতের ছাতাটিকে খুলে মুখটাকে লোকের চোখের দৃষ্টি থেকে প্রায় আড়াল করে রেখে ও ব্যস্তভাবে পা চালিয়ে চলে যান।

রায়বাগানের এপাড়া আর ওপাড়ার জীবনে মাঝে মাঝে উৎসবের মতো ঘটনা দেখা দিয়ে থাকে। মেয়ের বিয়ে, ছেলের বউভাত, অন্নপ্রাশন আর শ্রাদ্ধ। কিন্তু এসব সামাজিক উৎসব আর অনুষ্ঠানে কালীপদ দত্তের নিমন্ত্রণ থাকে না। পাড়ার হয়েও কালী দত্ত সত্যিই একটি ভয়াবহ অস্তিত্ব। প্রায় সকলেই মনেপ্রাণে কামনা করে, কালী দত্ত এই রায়বাগান ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও, কিংবা যে-কোন রসাতলে চলে যাক।

পাড়ার মধ্যে নয়, পাড়ার একদিকে, একটু তফাতে, বেশ ময়লা আর দীনহীন চেহারার ছোট্ট একটা বাড়ি যেন গাছের ছায়ার আড়ালে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে। এটাই কালীপদ দত্তের বাড়ি। এ বাড়ির সব জানালা সব সময় বন্ধ থাকে। এ বাড়ির সামনের দরজার কপাট কখনও একটুও ফাঁক হয় না! সন্ধ্যায় কিংবা রাতে এ বাড়ির কাছে দাঁড়িয়েও কেউ বুঝতে পারবে না যে, ভিতরে কোন আলো জ্বলছে কিনা। কান পেতে থাকলেও এ বাড়ির ভিতরের কোন শব্দ শোনা যাবে না। যেন মূক ও বধির জীবনের একটা গুহা।

কিন্তু সকলেই জানে, এহেন গুহাঘরের মধ্যে কালী দত্ত একা থাকেন না। কালী দত্তের স্ত্রীও থাকেন। রায়বাগানের এপাড়া আর ওপাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ পিছনের দুয়ার দিয়ে হঠাৎ এবাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে বলেই জানতে পারা যায়, একা নন কালী দত্ত, কালী দত্তের স্ত্রীও আছেন। আর জানতে পারা যায় সেদিন, মেটাল কারখানার চাপরাশি সনাতন এসে হঠাৎ হরিসাধানবাবুর বাড়ির বারান্দায় উঠে যেদিন চেঁচিয়ে ওঠে—কালীবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন।

অগত্যা হরিসাধনবাবুকে একটু বিচলিত আর ব্যস্ত হতেই হয়। পাড়ার মহিলারা খবর শুনে চমকে ওঠেন। পরিতোষ রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে—লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। ক্ষোভ

ধিক্কার আতঙ্ক ও আক্ষেপের এই শোরগোলের মধ্যেই পাড়ার কয়েকজন ছেলে কোমরে গামছা বেঁধে আর বাঁশের খাটিয়া নিয়ে কালীদত্তের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সেদিন সেই সময় কালী দত্তের এই গুহ্য ঘরের সামনে দরজার কপাট কিছুক্ষণের মতো খোলা হয়ে পড়ে থাকে।

কেউ জানে না, কী হয়েছিল কালী দত্তের স্ত্রীর, কারখানার অফিসেরও কেউ আগে শোনেনি, জানতেও পারেনি, কবে থেকে কিসের অসুখে ভুগছিলেন কালী দত্তের স্ত্রী। শুধু পরিতোষের রুক্ষ গলার স্বর যখন প্রায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা কবে, তখন আস্তে আস্তে বিড়-বিড় করে জবাব দেন কালী দত্ত, জ্বর'হয়েছিল, প্রায় একমাসের জ্বর, নাগের বাজারের কবরেজের কাছ থেকে ওষুধ আনা হয়েছিল। মাঝে দু'দিন শ্যামবাজারের ডাক্তার বসুও এসে দেখে গিয়েছিলেন, ত্রিশটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। কিন্তু. ।

আর কথা বলেন না কালী দত্ত। কালী দত্তের কৈফিয়তের কথাগুলিকে এরা কেউই বিশ্বাস করেন না। মিথ্যে কথা। শ্যামবাজারের ডাক্তার বসুর মতো এত বড় ডাক্তার রায়বাগানের এপাড়াতে এসে থাকলে সে-ঘটনা কি কারও অদেখা হয়ে থাকতে পারতো?

কালী দত্তের শুকনো খটখটে চোখে একবিন্দুও সজলতা নেই। খাটের বিছানার উপর এক নিষ্প্রাণ নারীর স্তব্ধ শরীর চাদর ঢাকা হয়ে পড়ে আছে; শুধু মুখের উপর কোন ঢাকা নেই। তাই দেখতে পাওয়া যায়, কেউ যেন বেশ যত্ন করে আর পরিপাটি করে সেই নারীর এলোমেলো চুলের গুচ্ছগুলিকে খোঁপা করে বেঁধে দিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুরও আছে, টাটকা সিঁদুর বলেই তো মনে হয়। আর কী আশ্চর্য, পায়েও টাটকা আলতার দাগ।

শুনতে পাওয়া যায়, রুগ্ণ বিড়ালের মতো করুণ মিউ মিউ স্বরে কথা বলে বলে কে যেন কাঁদছে। কে? কে আপনি? পাশের ঘরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পরিতোষ। কিন্তু তখুনি চিনে ফেলতেও পারে, কাঁদছে ভানুর মা, সেই প্রায়-অন্ধ বুড়িটা, মাঝে মাঝে পাড়ার এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরে ঝি-এর কাজ খোঁজ করে যে বুড়ি।

ভানুর মা কাঁদে—গীতাদিদি গো, তুমি এমন করে চলে গেলে কেন গো।

পরিতোষ বলে—থামো, ভানুর মা। তোমার গীতাদিদিকে সাজিয়ে দেবার কাজ আরও কিছু বাকি আছে নাকি?

ভানুর মা বলে—তোমরা বুঝে নাও গো বাবা। আমি যে অন্ধ মানুষ বাবা, আমি আর কত করবো বলো?

কোমরে গামছা-বাঁধা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বলে—ওঠাও, আর দেরি করার কোন মানে হয় না।

কালী দত্ত এগিয়ে আসেন। গায়ের কামিজের পকেট থেকে কৌটা বের করে এক টিপ নস্যি তুলে নেন। নস্যির টিপ নাকে গুঁজে দিয়ে কত জোরে দুটো টান দিলেন কালী দত্ত। কড়া নস্যির ঝাঁঝালো গন্ধে ঘরের বাতাস যেন শিউরে উঠেছে। কিন্তু এমন কড়া নস্যির ঝাঁঝেও কালী দত্তের চোখ ছলছল করে না। শবযাত্রার এই ছোট্ট মিছিলের পিছনে যেন নির্লিপ্ত এক পথচারীর মতো চুপ করে চলতে থাকেন কালী দত্ত।

আজ জানতে পারা গেল, কালী দত্তের এই স্ত্রীর নাম গীতা। এর আগে এই এগার বছরের মধ্যে রায়বাগানের ছেলেরা কালী দত্তের এই গুহ্যঘর থেকে একজন নীহারকণা, একজন শান্তিলতা, আর একজন পারুলবালাকে, মোট তিনবার তিনজনকে খাটের উপর থেকে তুলে নিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিয়ে এসেছে! গীতা হলো কালী দত্তের স্ত্রীদের মধ্যে চতুর্থা; ঠিক গীতারই মতো কালী দত্তের ওই তিন স্ত্রীর নামও কেউ আগে শুনতে বা জানতে পারেনি। জানতে পারা গিয়েছে ঠিক এইভাবে, হঠাৎ যেদিন খবর পাওয়া গেল যে, কালীদত্তের বউ

মরেছে, আর শচীন ডাক্তারের কাছ থেকে মৃত্যুর সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে !

হরিসাধনবাবুর স্ত্রী ঠিক কথাই বলেন—এ পোড়া বাংলা দেশে পান চুন থেকে শুরু করে চোদ্দ ক্যারেট সোনা পর্যন্ত সবই মাগ্‌গি, শুধু মেয়ে সস্তা। তা না হলে কালী দত্তের মতো মানুষও পটপট করে যখন খুশি তখন বিয়ে করতে পারবে কেন ?

রতনবাবুর স্ত্রী বলেন—পাঁটিবেচা বাপেরও মনে দরদ আছে। যার-তার হাতে মেয়েকে সঁপে দেয় না। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি, গীতা নামে এই মেয়েটার বাপ কত বড় হতচ্ছাড়া পাষাণ বাপ !

দোজবরে তেজবরেও নয়, একেবারে চারবরে একটা মানুষ, বয়স তো নিশ্চয় পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে, আর রোজগার তো ওই সামান্য একটা কেরানীগিরির মাত্র দেড়শটি টকা ! এহেন কালী দত্ত এই তিন বছর আগে একমাসের ছুটি নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল আর বিয়ে করে ফিরে এল। গীতার পাষাণ বাপ বোধহয় সেদিন একটু খোঁজ করে দেখবারও দরকার মনে করেনি যে, মেয়েটাকে সত্যিই কোন অভিশাপের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো কিনা।

কালী দত্তের স্বভাবের নিয়মটাও রায়বাগানের সবাই বুঝে নিয়েছেন। প্রত্যেক বারই দেখা গেল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর কয়েকটা মাস সত্যিই একলা থাকেন কালী দত্ত। কিন্তু বড়জোর ছ'মাস বা সাতমাস। তারপরেই একমাসের ছুটি নেন। রায়বাগানের মানুষের মন সন্দেহ আর আতঙ্কে ভরে যায়, আবার বুঝি বিয়ে করবেন কালী দত্ত। কিন্তু মিথ্যে সন্দেহ নয়, মিথ্যেও আতঙ্কও নয়। ছুটির এক মাস রায়বাগান থেকে অদৃশ্য হয়ে তারপর একেবারে সস্ত্রীক হয়ে রায়বাগানে ফিরে আসেন।

পাড়ার মহিলারা কালী দত্তের নতুন বউকে দেখবার জন্যে আর একটুও উৎসাহিত হন না।

যেমন নীহারকণা, তেমনি শান্তিলতাও পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করতে বা পরিচিত হতে চায়নি। একদিন আরতির মা সাহস করে কালী দত্তের বাড়ির খিড়কির দুয়ারের কড়া নেড়েছিলেন। কিন্তু খিড়কির দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে শুধু একটা কথা বলেছিল নীহারকণা—অনেক বেলা হয়েছে। শান্তিলতাও অনুরূপ বলেছিল—সন্ধে তো হয়ে এল !

নীহারকণা মারা গেল, শান্তিলতাও মারা গেল তারপর ; একমাসের ছুটির মধ্যে করে নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে, তার মানে পারুলবালাকে সঙ্গে নিয়ে কালী দত্ত তাঁর এই বাসাবাড়ির খিড়কির দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালেন, সেটাও কেউ জানতে পারেনি। কানুর ঠাকুরমা শুধু একবার বলেছিলেন, কাল অনেক রাত্তিরে মনে হলো, একটা রিক্সা এসে কালী দত্তের বাড়ির খিড়কির দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে।

তার মানে আর-একটা নারীর প্রাণবলির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। হিমাদ্রিবাবু আক্ষেপ করেন—ছি ছি। পরিতোষ রাগ করে—আমাদেরও দোষ আছে ; আমরা এসব সহ্য করছি বলেই লোকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

হিমাদ্রিবাবু বলে—আমি ভাবছি কালী দত্তের বউগুলোই বা কেমন ! ওরা কেন এরকম ভয়ানক একটা শাস্তির জীবন চুপ করে সহ্য করে ?

এটাও একটা প্রশ্ন বটে। যদি সত্যিই কালী দত্তের কোন বউ একদিন ওই গুহাঘরের কঠিন শাসনের মাথায় বাড়ির দিয়ে, কিংবা চেঁচিয়ে কেঁদে ছুটে পালিয়ে এসে হরিসাধনবাবুর স্ত্রীর কাছে বলে দিত, রক্ষা করুন মাসীমা, এই কালীয় নাগের বিষের জ্বালা থেকে আমাকে বাঁচান, তবে রায়বাগানের ভদ্রলোকেরা আর ভদ্রমহিলারা একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারতেন।

একবার একটা ঝড়ের রাতে সত্যিই কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল। কালী দত্তের গুহাঘরের ভিতরে কেউ যেন গলার স্বর চেপে চেপে কাঁদছে। সে-সময় পারুলবালা ছিল কালী দত্তের

স্ত্রী। পরিতোষ ও রতনবাবু সে-রাতে লাঠি আর লণ্ঠন হাতে নিয়ে বের হয়েই পড়েছিলেন। কালী দত্তের বাড়ির কাছেও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু হলো, না, কালী দত্তের ঘরের ভিতরে কেউ তো কাঁদছে না। মেটাল কারখানার পাশে ফাঁপা বাঁশের একটা গাদার মধ্যে ঝড়ের বাতাসটা যেন কান্নার বাঁশির মতো কঁকিয়ে কঁকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ ছাড়ছে।

কালী দত্ত কি তুকতাক জানে ? তা না হলে কালী দত্তের এই গুহাঘরের এক একটি বন্দিনী নারীর দুঃখী প্রাণের অভিযোগ কেন শব্দ করে বেজে ওঠে না ? এক বছর, দু'বছর বা তিন বছর, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এক-আধমাসের জ্বরের জ্বালায় ধড়ফড়িয়ে মরে যেতে হবে, এই তো কালী দত্ত নামে অদ্ভুত লোকটার স্ত্রী হবার অবধারিত পরিণাম। সব জেনে-শুনেও কালী দত্তকে বিয়ে করতে রাজী হয়, কেমন মেয়ে ওরা ? সন্দেহ হতে পারে, মেয়ে আর মেয়ের বাপ-মা, কেউই বোধহয় আগে জানতে পারে না যে, কালী দত্ত একজন ভয়ানক বিপত্নীক।

কিন্তু রতনবাবুর সঙ্গে একদিন কালীঘাটের এক বাড়িতে কালী দত্তের চতুর্থা স্ত্রী গীতার এক কাকার হঠাৎ দেখা হয়েছিল, আলাপও হয়েছিল। গীতার কাকা বলেছিলেন—জানি জানি, সবই জানি।

—কবে জানলেন ? বিয়ের আগে ?

—আজ্ঞে না। বিয়েব পরে।

—তারপর ?

তারপর আর কি ? এখন মেয়ের অদৃষ্ট, যা হবার তাই হবে।

—কি আশ্চর্য, জেনেও আপনাদের একটু ভয় হয় না ?

—না, মশাই না। গীতাব কাকা বেশ চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন।

বাঃ, কালী দত্ত তাহলে কি তুকতাক করে মেয়ের কাকা-বাবা-দাদ'গুলোর বুদ্ধি নাশ কবে দেয় ?

হিমাদ্রিবাবু একবার তাঁর অফিসের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় কালী দত্তেব তৃতীয়া স্ত্রী পারুলবালার মামার বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলেন। পারুলবালার মামাকে চিঠি লিখেছিলেন হিমাদ্রিবাবু, যদি আপনাদের মেয়ের জীবনের জন্য বিন্দুমাত্রও মায়া আপনাদেব থেকে থাকে, তবে একবার এখানে এসে নিজের চোখে সব ব্যাপার দেখে যান। আপনারা ভুল করে মেয়েকে একটা রাক্ষুসে অদৃষ্টের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন।

পারুলবালার মামা অনাথবাবু পত্রপাঠ ব্যস্ত হযে আর খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রায়বাগানে এসেছিলেন। কালী দত্তের ওই ভয়ানক গুহাঘরের ভিতরে ঢুকবার আগে অনাথবাবু বুদ্ধি কবে হিমাদ্রিবাবুরই বাড়িতে এসেছিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন অনাথবাবু।

হিমাদ্রিবাবুও একেবারে স্পষ্ট ভাষায় কালী দত্তের জীবনের ভয়ানক ইতিবৃত্ত শুনিয়ে দিয়েছিলেন।—ওটা তো মানুষের বাড়ি নয় অনাথবাবু ; ওটা হলো...পরিতোষ যাকে বলে, একটা ভয়ানক গুহামানবের বাড়ি। কালী দত্তের বউ বাঁচে না, বাঁচা সম্ভব নয় ; কিন্তু তবু দেখুন, কী জঘন্য মনোবৃত্তি। বউ মরলেই ছয়-সাত মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করে।

অনাথবাবুর জলভরা চোখেও যেন আগুন জ্বলতে থাকে—কিন্তু বউগুলো মরে কেন বলতে পারেন ? মারধর করে বুঝি ?

—কিছু জানি না মশাই। এ এক ভয়ানক রহস্য, কালী দত্তের ঘরের ভেতরের খবর বোধহয় ভগবানও জানতে পারেন না।

হন হন করে হেঁটে কালী দত্তের বাড়ির দিকে চলে গেলেন অনাথবাবু। দেখে মনে হলো, ওই গুহাঘরের ভিতর ঢুকেই কালী দত্তের গলা টিপে ধরবেন অনাথবাবু।

কিন্তু বৃথা আশা করেছিলেন হিমাদ্রিবাবু। পরের দিন সকালবেলা যখন কালী দত্তেব বাড়ি

থকে বেব হয়ে বড সডকেব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন অনাথবাবু, ঠিক তখন হিমাদ্রিবাবুর মুখোমুখি দেখা হযে গেল। হিমাদ্রিবাবুকে দেখেই অন্যদিকে মুখ ফিবিযে নিলেন অনাথবাবু, ভাব দেখালেন, যেন হিমাদ্রিবাবুকে দেখতেই পাননি। বেশ নিশ্চিন্ত, অনাথাবাবু সত্যিই আকাশেব দিকে তাকিয়ে সিগাবেট খেতে খেতে চলে গেলেন। হিমাদ্রিবাবুব সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।

হেডক্লার্ক নিশানাথবাবু কতবাব কত ভাল কথা বলে কালী দত্তকে বুঝিয়েছেন, আপনি মশাই খামকা বিয়ে করেন। আপনাব স্ত্রী অল্পায়ু হবেন আব হঠাৎ মাবা যাবেন, এটা যখন আপনাব বিধিলিপি, তখন আব এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যান কেন? এবার ক্ষান্তি দিন মশাই।

কিন্তু বৃথা অনুবোধ। কালী দত্ত তাঁব দ্বিতীযা স্ত্রী শান্তিলতাব হঠাৎ-মৃত্যুব পব থেকে আজ পর্যন্ত এবকমেব অনুবোধেব কথা অন্তত ত্রিশবাব শুনেছেন। কিন্তু তবু তো দেখা গেল, আবও দু'বাব বিযে কবলেন কালী দত্ত। আবও দুটি নাবীব প্রাণ কালী দত্তেব অন্তবাত্মাব আডালে গোপন কবা এক নিষ্ঠুব পুরুষবাতিকেব কাছে বলি হলো। পারুলবালা গেল, তাবপব আজ গীতাও গেল।

হর্ষবাবু বলেন—কালী দত্তেব বিযেব বাতিক বন্ধ কবতে পাবে, এমন কোন আইনও তো নেই।

কিন্তু এত নিন্দা, ধিক্কাব ও ভৎসনাব কোন দবকাব হতো না, যদি কালী দত্ত এখান থেকে চলে যেতেন কিংবা বিযে কববাব বাতিক চাপা দিযে বেখে একলামানুষ হযে যেতেন। তবে বাবলিব মতো এই ভযানক কাণ্ড চোখে দেখতে হতো না তবে নিশ্চিন্ত হতো বাযবাগানেব ... াব বছবেব উদ্বিগ্ন আব ক্ষুব্ধ মন।

বাযবাগানেব ভদ্রলোক আব ভদ্রমহিলাদেব আব-একটা আক্ষেপেব কথা এই যে, সত্যিই একমাত্র মানুষ, যিনি ইচ্ছে কবলে একটা উপায় কবতে পাবেন, তিনি বোধহয কিছু কবতে চান না। তিনি ইচ্ছে কবলে কালী দত্তকে এই স্টোবকেবানী চাকবি থেকে তাডিয়ে দিতে পাবেন। তিনি অন্তত একটু শক্ত কবে কথা বললে বা ভয দেখালে কালী দত্ত নিশ্চয় ভয় পেতে বাধ্য হবেন। হিমাদ্রিবাবু আব বতনবাবু, তাছাডা আবও তিন ভদ্রলোক প্রায় ডেপুটেশনেব মতো একটা চেষ্টাব কাণ্ড কবেছেন, একবার নয়, তিন চাব বাব। কিন্তু যাঁব কাছে ডেপুটেশন, তিনি ভদ্রলোকদেব সঙ্গে প্রথমে কথা বলতেই চাননি। শেষে শুধু একটি কথা বলেছিলেন—আমি তো পাবিই, কিন্তু সেটা কি আপনাদেব পক্ষে খুব সম্মানেব ব্যাপার হবে?

ডেপুটেশনেব ভদ্রলোকদেব কাবও মুখেব দিকে তাকিযে নয, তিনি তাঁব হাতেব বইযেব খোলা পাতাব লেখাগুলিব দিকে তাকিযে আব খুব গম্ভীব স্ববে এই কথা বলেছিলেন। তিনি বাযবাগানেব এই গোটা পাঁচেক ভদ্রলোককেও যেন সত্যিকাবেব মানুষ বলে গ্রাহ্য কবতে পাবছিলেন না।

যেমন আজ কালী দত্তেব চতুর্থা স্ত্রী গীতাব মৃত্যুব বিকেল বেলায খুব বৃষ্টি হযে গেল, সেবাবও ঠিক তেমনি কালী দত্তের দ্বিতীযা স্ত্রী শান্তিলতার মৃত্যুব বাত্রিবেলাতে খুব বৃষ্টি হযেছিল। শুধু কি বৃষ্টি? যেমন বৃষ্টি, তেমনই ঝড, আব তেমনই বিদ্যুতেব চমকেব সঙ্গে বাগী মেঘেব গবগবে ডাক। সত্যিই সে বাতে খুব ভয পেয়ে বাযবাগানেব মানুষেব বুকও কেঁপে উঠেছিল। বাতটা যেন শান্তিলতাব চিতাব ছাই বৃষ্টিব জলে ধুয়ে দিযেও বায়বাগানকে ক্ষমা কবতে পারছে না। কালী দত্তেব মতো একটা পাপের কালীয নাগকে পুষে বেখেছে যে বাযবাগান, তাকে ক্ষমা করতে না পেরে গরগর করছে নিকষ কালো আকাশেব মেঘ।

সে-বাতে বৃষ্টি থামতেই হিমাদ্রিবাবু ও বতনবাবু দু'জনে টর্চ হাতে নিয়ে, আর প্রায আধ

মাইল পথ জলের উপর দিয়ে ছপছপ করে হেঁটে এই মানুষটিরই কাছে এসে অভিযোগ করেছিলেন—আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, এটা মৃত্যু নয়, এটা একটা হত্যা।

যাঁর কাছে অভিযোগ, তাঁর চমৎকার সুন্দর মুখের ফরসা রঙ সেই মুহূর্তে যেন লাল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। কুঁচকে গিয়েছিল তাঁর দুই চোখের বড়-বড় দুটি বাঁকা ভুরু, যেন দুঃসহ একটা ঘৃণা শিউরে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তিনি বলেছিলেন—এটা আপনাদেরই পক্ষে লজ্জার কথা।

—আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলে।

—আমি তো পারিই, কিন্তু আপনারা কেন পারছেন না? ছিঃ।

হিমাদ্রিবাবু আর রতনবাবু সে-রাতে এইরকম একটা পাল্টা অভিযোগের ভাষার কাছে প্রায় ধিক্কৃত হয়ে ফিরে এসেছিলেন ও হতাশ হয়েছিলেন। আর, কালী দত্তের নিষ্ঠুর পাপের সৌভাগ্যটা দেখে আশ্চর্য বোধ করেছিলেন। যিনি আজ ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে কালী দত্তের এরকমের একটা গুহায়িত নির্মম রহস্যের জীবনকে ভয় পাইয়ে দিয়ে শায়েস্তা করতে পারেন, তিনিও কেমন যেন একটা ঘৃণার রাতিকে চুপ করে থাকতে চান।

কালী দত্তের তৃতীয়া স্ত্রী পারুলবালার মৃত্যুর পরে শুধু একা হরিসাধনবাবু গিয়ে এঁরই কাছে সব কাহিনী শুনিয়েছিলেন। শুনে তাঁর সুন্দর মুখের চেহারা অদ্ভুত রকমের করুণ হয়ে গিয়েছিল। আর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর একটা অদ্ভুত কথাও বলেছিলেন—আমি কিন্তু একটা কথার কোন মানে বুঝতে পারি না, কাকাবাবু। ওরা সময় থাকতে সরে যায় না কেন?

তার মানে, কালী দত্তের স্ত্রী হয়ে এই যে তিন তিনটে মেয়ে এসে এই ভয়ানক গুহাঘরে ঢুকেছিল, তারা কালী দত্ত নামে একটা রাক্ষুসে পুরুষ চরিত্রকে তুচ্ছ করে আর ঘৃণা করে পালিয়ে গেল না কেন? ঠিকই তো, মাঝরাতে কালী দত্ত যখন ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তখন খিড়কির দরজার কপাট নিঃশব্দে খুলে ফেলতে কতটুকু সময় লাগে? কালী দত্ত যখন মাঝ-দুপুরে কারখানার স্টোরের ঘরে বসে সীসার ওজনের হিসেব লেখে, তখন ওই বাড়ির সামনের দরজার কপাট খুলে পথে বের হয়ে আর একটা রিকশা ডাকতে অসুবিধা কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন হরিসাধনবাবু। তিনি, আর রায়বাগানের প্রায় সকলেই জানেন যে, না, ওরা পারে না, পারেওনি। কালী দত্তের ঘরের নারী যে সাপের ফণার সম্মুখে অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়া এক একটা ধড়ফড়ানো মুমূর্ষু পাখির প্রাণ। কিন্তু ইনি, যাঁকে হরিসাধনবাবু এসব কথাও কয়েকবার বলেছেন, তিনি কথাগুলিকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই বেশ একটু ক্ষুব্ধ-রুষ্ট স্বরে বলেছিলেন—আপনি যা-ই বলুন, কাকাবাবু, বউগুলোরও দোষ আছে। দোষ না হোক, ভুল।

হরিসাধনবাবু—যা-ই হোক, এখন তুমি যদি একটু।

—আমি তো ইচ্ছে করলে একটা ব্যবস্থা করতে পারিই, কিন্তু বুঝতে পারি না, কেন করবো।

আজ, গীতার মৃত্যুর এই বিকেল বেলার বৃষ্টিটা থেমে যাবার পরেও রায়বাগানের এ-বাড়ি আর সে বাড়ির ঘরে ঘরে শুধু এই অক্ষম ক্ষোভের গুঞ্জন বাজতে থাকে। না, কিছুই করা গেল না, কিছু করাও যাবে না।

ঘাটের কাজ সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে পরিতোষ। কিন্তু রোজ মাঝরাতে যেমন, আজকের এই রাতেও তেমনই বুঝতে পারা যায়, গুহামানব কালী দত্ত অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির বাইরের পাতকোর কাছে স্নান করছেন। কালী দত্তের হাতের ঘটি আর বালতি শব্দ করছে। ছরছর করে ঢালা জলের শব্দ আছড়ে পড়ছে।

এই শব্দটাও রায়বাগানের রাতের জীবনে যেন বারোমেসে ঘেন্না আর আতঙ্কের শব্দ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষারি কোন রাতও বাদ যায় না, যে-রাতে এইভাবে অন্ধকারের এই পাতকো'র কাছে স্নান না করেন কালী দত্ত। পরিতোষ বলতে পারে, এটা আদিমকালের গুহামানবের স্বভাব কি না।

কালী দত্তের বুকে পিঠে বড় বড় কর্কশ রোঁয়া গিজগিজ করছে কি না, সেটা কারও জানবার কথা নয়। কিন্তু এটুকু সবাই জানে যে, লোকটা দাঁত দিয়ে কাঠ কাটে না, আর নখ দিয়ে গাছের ছালও ছাড়ায় না। কালী দত্তের বাড়ির সামনে কাঁচা-খাওয়া খরগোসের ছাল আর ভেড়ার শিং-ও পড়ে থাকে না।

কিন্তু গায়ের ফরসা রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছে, কবজির চওড়া হাড়ের উপর নীল-নীল রগ ফুলে রয়েছে, কালী দত্তের এই চেহারা পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়েও যেন একটা হট্টা-কট্টা কঠোরতা। মাঘ মাসের রাতে আদুড় গায়ে পাতকো'র কাছের জঙ্গল কাটছেন কালী দত্ত, এ-দৃশ্যও কারও কারও চোখে পড়েছে। কিন্তু কোন মুহূর্তেও কালী দত্তের সামান্য একটা হাঁচি-কাশির শব্দ কেউ শুনতে পায়নি। পরিতোষ মাঝে-মাঝে বলে—ওই শক্ত চোয়ালের অদ্ভুত গড়ন দেখেই বোঝা যায়, ওটা আধুনিক কালের মানুষের পক্ষে বেশ একটু অস্বাভাবিক।

বুড়ো মানুষ হরিসাধনবাবু, এমনিতেই ঘুম ভাল হয় না। তার উপর এত রাতে কালী দত্তের এই স্নানের জল-ঢালার ছরছর শব্দ ; হরিসাধনবাবুর ঘুম আর সম্ভব নয়। এই অবস্থায়, শুধু সেই পুরনো দুর্ভাবনাটাই মনের ভিতর ছমছম করে। কালী দত্ত কি সত্যিই আবার বিয়ে করবে ?

২

এই কারখানার মালিক যিনি, তাঁর নাম এম সামন্ত। এখানে তাঁর বিপুল কর্মজীবনের ইতিহাসের সব কথা অনেকেই জানে না। রায়বাগানের হরিসাধনবাবু কিন্তু অনেককিছু জানেন, কারণ তিনিও এককালে হাজারিবাগের জঙ্গলে ঢুকে ভাগ্যের পরীক্ষা করবার জন্য অভ্রের খাদের লীজ নিয়েছিলেন। হরিসাধনবাবুর অভ্রের খাদ থেকে শুধু কাঁকর মেশানো দুধে মাটি উঠেছিল, অভ্রের ছিটেফোঁটাও সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু এম সামন্ত যখনই যে খাদের বুকের সামান্য গভীরে বারুদ ফুটিয়েছেন, তখনই সে খাদের পাথুরে পাঁজর থেকে রুবি অভ্রের স্তবক ঝরে পড়েছে। এক বছরেই লক্ষপতি হয়েছিলেন এম সামন্ত।

সেই এম সামন্ত আজ অবশ্য আশি বছরের কাছাকাছি বয়সের এক বৃদ্ধ। কিন্তু সেজন্য তাঁর কারবারী আকাঙ্ক্ষাটাও বুড়িয়ে যায়নি। প্রায় বারো বছর হলো এই মেটাল কারখানা চালু করেছেন, এখানেই মস্ত বড় এক বাড়ি করেছেন। সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে, সে মেয়ে এখনও এম সামন্তের এই বাড়িরই মানুষ। বিয়ে করেননি তরুলতা সামন্ত, যদিও বয়স কবেই চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ের কাছে এক জমিদার তাঁর বিদুষী মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্যে একটি মেয়ে-কলেজ করেছেন—রানী লীলাবতী কলেজ। তরুলতা সেই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কাজেই, বছরের বারো মাস একটানা এখানে এই রায়বাগানে থাকেন না তরুলতা ; কলেজের ছুটিতে এখানে আসেন, ছুটি ফুরোলেই আবার চলে যান।

রানী লীলাবতীর মেয়ে দময়ন্তী আর এম সামন্তের মেয়ে তরুলতা, দু'জনে এককালে লখনউ-এর একই কলেজের দুই সহপাঠিনী বান্ধবী ছিলেন। একদিন দুই বান্ধবীর জীবনের

বিশেষ একটা জেদ প্রায় একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠেছিল।

লখনউ-এর সেই মেয়ে-কলেজের হোস্টেলের দিদি চারুমতী নিগম একদিন সন্দেহ করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ছি ছি, তোমরা দু'জনেই এত মন দিয়ে এসব বাজে বই পড়ছো কেন ? তোমরা কি সত্যিই বিয়ে করতে চাও না ?

সন্দেহ না করে পারবেন কেন দিদি চারুমতী ? পড়বার মতো এত কাব্য নাটক পৃথিবীতে থাকতে, এই দুই ছাত্রী গাদা গাদা এমন বই পড়ছে, যেগুলি বলতে গেলে মেয়েলী সন্দেহের একটা বিদ্রোহের শাস্ত্র।

সে প্রতিজ্ঞা যে নিতান্ত একটা খেয়ালী শখের প্রতিজ্ঞা ছিল না, সেটা স্বীকার করতেই হয়। দময়ন্তীও বিয়ে করেননি। মিস দময়ন্তী সিন্‌হা শুধু ছবি এঁকে জীবনের দিনগুলি পার করে দিচ্ছেন। সেই সব ছবিতে জগতের সব রূপেরই কিছু না কিছু থাকে ; রামধনু মরুকুঞ্জ আর বর্ষার নদী ; পাখি ফুল আর হরিণ, স্নানঘাটের মেয়ে আর মেষপালিকা গুজর তরুণী। কিন্তু পুরুষ-চেহারার সামান্য ছায়াও সেসব ছবির কোন ছবিতে নেই।

এ তো আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা, তরুলতা সামন্ত যখন মাত্র আঠার বছর বয়সের আর খুবই শান্ত স্বভাবের এক ছাত্রী। সেই তরুলতা আজও যখন রায়বাগানের এই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে কোচের উপর বসে সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে দিয়ে কারখানার ম্যানেজারের অফিস থেকে পাঠানো ফাইলগুলিকে পড়তে থাকেন, তখন আর তাঁকে নিশ্চয় ছাত্রী বলে মনে হয় না : তখন তাঁকে সত্যিই এই মেটাল কারখানার সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান আর ভাল-মন্দের এক বুদ্ধিময়ী কর্ত্রী বলে মনে হয়। কলেজের ছুটির যে-সময়ে রায়বাগানের এই বাড়িতে থাকেন মিস তরুলতা সামন্ত, সে সময়টা কারখানার ম্যানেজার চক্রবর্তীর জীবনটাও উদ্বেগে উতলা হয়ে থাকে। সব সময় সতর্ক থাকেন চক্রবর্তী, কে জানে কখন মিস সামন্তের কাছ থেকে কড়া ভাষার নোট হাজির হবে। হয়তো রোজের ক্যাশবুকের হিসাবের অঙ্কগুলিকে লাল পেন্সিলের দাগে দাগে ভরে দিয়ে, আর মন্তব্যের ঘরে মস্ত বড় একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

এম সামন্তের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা দেখেছেন আর অনেক ঘটনার কথা শুনেছেন বলেই বুড়ো হরিসাধনবাবু তরুলতাকেও কিছুটা বুঝতে পারেন। পনের বছর আগে, এম সামন্ত যখন কানপুরে, তখন তাঁর একটা চিঠি পেয়ে এই হরিসাধনবাবু পাটনা থেকে কানপুরে গিয়েছিলেন। এম সামন্ত বললেন, এ বিয়ের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো, হরিসাধন, তরু রাজি হলো না।

এত বড় পদস্থ এঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট বলেও বেশ সুনাম আছে, বয়সে স্বাস্থ্যে চেহারাতে সুশ্রীতার কোন অভাব নেই, এমন মানুষকেও বিয়ে করতে রাজী হলো না তরু, এ যে সত্যিই ভয়ানক এক অহংকারের অসম্মতি। এই নিয়ে মোট দশটি ভাল-ভাল বিয়ের প্রস্তাব তরুলতার আপত্তি আর তুচ্ছতায় মিথ্যে হয়ে গেল। এম সামন্ত সেদিন হরিসাধনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খুবই ছটফট করেছিলেন ; যেন চরম আশাভঙ্গের কষ্টটাই ছটফট করেছিল।

হরিসাধনবাবুও দেখেছিলেন, এঞ্জিনিয়ার ছেলে সেই ধীরাজ মিত্র যখন অনেক আশার ব্যস্ততার মতো সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে এম সামান্তের কানপুরের বাড়িতে দেখা দিলেন, তরুলতা তখন ধীরাজের দিকে হাত তুলে একটা শুকনো সৌজন্যের ভঙ্গীও না করে ঘরের ভিতর সরে গেল। আশ্চর্য হয়েছিলেন হরিসাধনবাবু, ধীরাজের মতো ছেলেকেও এভাবে তুচ্ছ করতে পারে কোনো মেয়ে ? সে মেয়ে যতই সুন্দরী আর শিক্ষিতা হোক না কেন ?

শুধু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেননি হরিসাধনবাবু। তাই এম সামন্তকে তিনিও শুধু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন—কি আর করবেন বলুন ? তরুর মনে যদি কোন

আগ্রহ না থাকে, তবে আমাদের চেষ্টা করবার মানে হয় না।

সেই তরুলতার নিজের নিঃশ্বাসের বাতাসও কোনদিনও চেষ্টা করেনি। মেয়ে-কলেজের টিচারের চাকরি নিয়েছেন, দিন মাস আর বছর পার হয়েছে। তারই মধ্যে একদিন সেই মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপ্যালও হয়ে গিয়েছেন তরুলতা সামন্ত।

কলেজের ছুটির সময়ে রায়বাগানে এসে বাপের সম্পত্তি, এই কারখানার হিসাব-পত্রের খাতা পরীক্ষা করাও তরুলতার একলাসুখী প্রাণের কালহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। জলের ধারার মতো বয়সের ধারাও যেন শুকনো বালুর বুকের উপর দিয়ে অনেক দূর গড়িয়ে এসেছে, এইবার নিশ্চয় শুকিয়ে যাবে আর ফুরিয়েও যাবে। কিন্তু সেজন্য তরুলতা সামন্তের মনে কোন আক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না।

কারখানার হিসাবের খাতা আর চিঠির ফাইলের দিকে তাকিয়ে তরুলতা যখন তাঁর হাতের কলমটিকে আস্তে আস্তে দোলাতে থাকেন, তখন তাঁর কপালের কাছে আর কানের উপরে কালো চুলের ছোট্ট দুটি স্তবক আংটির মতো দুটি বৃত্ত হয়ে দুলতে থাকে ; তার সঙ্গে দু'চারটে সাদা চুলের রেখাও জড়াজড়ি হয়ে কাঁপতে থাকে। সোনার ফ্রেমের চশমার কাচের উপর বাগানের শিমূলের মাথার রঙীন ছায়াটাও যেন ছোট্ট একটা রক্তচন্দনের ফোঁটার মতো ফুটে ওঠে। টিকালো নাক, টানা-টানা চোখ, সুডোল চিবুক ; তরুলতা যেন মূর্তিমতী মেধা। হিসেবের একটা স্টেটমেন্টের দিকে একবার তাকিয়েই তিনটে ভুল ধরে ফেলতে পারে, এমনই চকচকে আর উজ্জ্বল তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি।

রতনবাবু তাই একদিন হরিসাধনবাবুর কাছে না বলে পারেননি—সত্যি হরিদা, মিস সামন্ত সত্যিই একটা অদ্ভুত পার্সোনালিটি। আমার মনে হয়, এই জন্যেই...।

এই জন্যেই বোধহয় মিস তরুলতা সামন্ত বিয়ে করতে পারলেন না। রতনবাবুর ধারণা, মেয়েদের মধ্যে এরকমের প্রখর ব্যক্তিত্বময় চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।—সত্যি কথা হরিদা, মিস সামন্তের চোখের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এরকম পার্সোনালিটির পুরুষ আই সি এস-দের মধ্যেই বা ক'জন পাওয়া যাবে ?

বুড়ো হরিসাধনবাবু অবশ্য দু'বার কেশেছিলেন, আর কুণ্ঠিত স্বরে একটা কথা বলেছিলেন—হতে পারে।

মিস তরুলতা সামন্ত ; ইনিই সেই পার্সোনালিটি, যার কাছে রায়বাগানের যতো অনুরোধ আর আবেদনের ডেপুটেশন এসেছে আর হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে। সকলেই দেখতে পেয়েছেন, সমস্যার কথাটা শুনেই তরুলতার চোখেমুখে যেন ঘেন্নায় ভরা একটা অস্বস্তির ভাব ছটফট করে উঠেছে। কিন্তু প্রতিকারের জন্য তিনি সামান্য একটু চেষ্টা করতেও রাজি হননি। পথের উপর মরা ইঁদুর পড়ে আছে দেখলে লোকের চোখের চাহনিটা যেমন ঘেন্না পেয়ে শিউরে ওঠে, নাক কুঁচকে যায়, অথচ একটা লাঠির খোঁচা দিয়ে ঘৃণার বস্তুটাকে সরিয়ে দিতেও ঘেন্না হয়, তরুলতার মনের ঘৃণাও প্রায় সেই রকমের একটা ঘৃণা।

কালী দত্তের রাক্ষুসে গুহাঘরের নারীবলির সেই চতুর্থ ঘটনার পর, তার মানে গীতার মৃত্যুর পর শুধু ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া রায়বাগানের প্রাণে আর কোন উদ্বেগ ছিল না—কালী দত্ত সত্যিই কি আবারও বিয়ে করবে ?

দিন যায় মাস যায়। সাত আটটা মাস ফুরিয়েও যায়। রায়বাগানের দুশ্চিন্তা একটু একটু করে থিতিয়ে আসতেও থাকে। কিন্তু বৃথা স্বস্তি ; রায়বাগানের কারও আর জানতে বাকি রইল না, এক মাসের ছুটি নিয়েছেন কালী দত্ত।

সত্যিই বৃথা স্বস্তি। একদিন বৃষ্টি থামতেই আকাশ জুড়ে একটা রামধনু ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মাথার উপরে এত সুলক্ষণে একটা আকাশে থাকতেও রায়বাগানের পক্ষে আর নিরাতঙ্ক

হওয়া সম্ভব নয়। কালী দত্তের নতুন বউ এসেছে। সে বউ এখন ওই গুহাঘরের ভিতরেই আছে। দুর্ভাগ্যের বলি, সেই নারীর চেহারা এই পাড়ার মানুষের চোখে চকিত ছবির মতো একবার দেখাও দিয়েছে। কালী দত্তের বাড়ির একটা জানালা যেন বাতাসের হঠাৎ আঘাতে একবার খুলে গিয়েছিল, তাই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, রঙীন শাড়ি পরা একটি মূর্তি ঘরের ভিতরে ঘুর ঘুর করছে।

ঠিক সেইদিনই একটা চিঠি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, শেষে কেঁদেই ফেললেন ভবানীর মাসি। রায়বেরিলি থেকে চিঠি লিখেছেন ভবানীর মাসির মাসতুতো দিদি—আমার তমালীর বিয়ে হয়েছে তোমাদেরই বায়বাগানের কালী দত্তের সঙ্গে, তমালীর খোঁজখবর একটু নিও।

বেশি দেরি করেননি ভবানীর মাসি। রায়বেরিলির সেই চিঠি হাতে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। একরকম ছুটে ছুটেই হেঁটে গেলেন। যিনি ইচ্ছা করলেই একটা প্রতিকার করতে পারেন, এ ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁরই কাছে এসে ফুঁপিয়ে উঠলেন ভবানীর মাসি—রক্ষে করুন দিদি। আমার তমালীর সর্বনাশ করেছেন আপনার অফিসের কালী দত্ত।

—কে? তমালী? কথাটা তরুলতা সামন্তের ওই শান্ত ঠোঁট দুটোকে যেন থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে বেজে উঠলো।

তরুলতার কাছে তমালী যে সত্যিই একটা চেনা নাম। তমালী মেয়েটার সেই চেহারাও যে স্পষ্ট মনে পড়ে। তরুলতার ছাত্রী সেই তমালী, কতবার রাগ করে আর শক্ত ভাষায় ধমক দিয়ে তমালীর হাসি থামিয়েছেন তরুলতা। ক্লাসের পড়ার মধ্যেই হেসে হেসে হুটোপুটি করতো তমালী, কবিরাজ গোবিন্দবাবুর মেয়ে সেই তমালীকেই কি বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে রাক্ষুসে পুরুষ ওই কালী দত্ত?

ভবানীর মাসি বলেন—হ্যাঁ, আমারই গোবিন্দ মেসোর মেয়ে তমালী।

তমালী মাত্র তিনটে মাস ওই রানী লীলাবতী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে পড়েছিল। তারপর আর আসেনি তমালী। তমালীর নাম কেটে দেবার অনেক দিন পরে জানতে পেরেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল তরুলতা, গোবিন্দ কবিরাজ এখন আর প্রতাপগড়ে নেই, কে জানে কোথায় চলে গিয়েছেন। প্রায় দশ বছর আগের কথা, তবু এখনও সবই মনে করতে পারেন তরুলতা। তমালীকে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না তরুলতার, কালো মেয়ের চেহারাও এত চমৎকার হয়। তমালীর ডানচোখের কোলের উপর মস্ত বড় একটা তিল ছিল। ওই তিলটারই জন্যে কী ভয়ানক দুষ্টু আর চালাক দেখাতো মেয়েটাকে। হিসেব করলেই বুঝতে পারা যায়, সেই তমালীর বয়স আজ তিরিশের বেশি ছাড়া কম হবে না। কিন্তু দুষ্টুমি আর চালাকির ওই তিল থেকেও কী লাভ হলো? তমালীর ভাগ্যটা যে একেবারে নিরেট আহম্মক হয়ে একটা জহ্লাদ পুরুষ-রাতিকের কুৎসিত ঘরে এসে ঢুকেছে।

ভবানীর মাসি বলেন—তমালী বাঁচবে না, দিদি, যদি একটা ব্যবস্থা।

তরুলতা সামন্তের দুই চোখ শক্ত হয়ে যেন একটা কঠিন কল্পনার দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয়, তরুলতাও বিশ্বাস করেছেন, ঠিকই বাঁচবে না তমালী, যদি না তমালীকে।

তরুলতা বলেন—কিন্তু লোকটাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিলে আপনাদের তমালীর কি সুবিধে হবে? কালী দত্ত কি তমালীকে সঙ্গে নিয়েই আবার অন্য কোথাও একটা গুহাঘরে।

ভবানীর মাসি—তাহলে আর তমালীর বাঁচা হবে কেমন করে? আপনি তমালীকে বাঁচান।

তরুলতা বলেন—একটু ভাবতে দিন। দেখি কি করতে পারি।

শুধু ভবানীর মাসি নয়, এতদিনে রায়বাগানের প্রাণ আশ্বস্ত হবার মতো একটা আশার ভাষা শুনতে পেল, স্বস্তিই পেল।

কিন্তু বৃথা স্বস্তি। দিনের পর দিন, আর মাসের পর মাস পার হয়ে গেল। তরুলতা সামন্ত তাঁর কলেজ করতে সেই কোন্ দূরের এক প্রতাপগড়ে চলেও গেলেন। তিনটি মাস পরে ফিরেও এলেন। কিন্তু তমালীর মুক্তি কোথায়? তরুলতা সামন্তের মতো মূর্তিমতী মেধা, ক্ষমতা আর পার্সোনালিটিও যেন ভেবে ভেবে শুধু হয়রান হয়ে যাচ্ছেন, কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

তবে কি তমালীও মরবে!

৩

শিমূলের মাথা ক'দিন হলো আরও লাল হয়ে টুকটুক করছে। বাড়ির বাইরের বারান্দার চেয়ারে বসে আর হেসে হেসে যার সঙ্গে কথা বলছেন তরুলতা সামন্ত, তার হাসির শব্দে শিমুল গাছের কাকও চমকে গিয়ে উড়ে যাচ্ছে। খুড়তুতো ভাই বিকাশের সঙ্গে কথা বলছেন তরুলতা। —তুই টোকিও থেকে ফিরে এসেছিস, জানি। কিন্তু কোথায় আছিস এখন?

—মুঙ্গেরের টোবাকো ফ্যাক্টরীতে আছি।

—বিয়ে করবি?

—করবো বইকি! সবারই তো আর তোমার মতো একলা তপস্বিনী হয়ে থাকবার মতো মনের জোর...।

—চুপ কর। আমি যদি মেয়ে পছন্দ করে দিই, তবে অপছন্দ করবি না তো?

বিকাশ—কখখনো না। কিন্তু সে'ও আমাকে পছন্দ করবে তো?

তরুলতা—নিশ্চয় পছন্দ করবে।

বিকাশ—বাস্, তবে আর কুছ-পরোয়া নেই। তুমি চেষ্টা কর।...আচ্ছা, আজ তবে আসি।

তরুলতা বলেন—আজই সন্ধ্যাবেলা একবার আসতে পারবি?

—পারবো। মুখভরা চুরুটের ধোঁয়া উগরে দিয়ে চলে যায় বিকাশ।

তরুলতা কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকেন না। —গাড়ি বের কর, পরেশ! ব্যস্তস্বরে ডাক দিলেন তরুলতা। তরুলতার মনের গভীরে যেন একটা প্রতিজ্ঞা উতলা হয়ে উঠেছে। টানা টানা চোখের কালো তারা দুটোও হাসছে। এটাও নিশ্চয় একটা উতলা আশার হাসি।

ঠিক যখন বিকেলের রোদ লালচে হয়ে রায়বাগানের বাঁশের ঝাড়ের মাথার উপর এলিয়ে পড়েছে, তখন রায়বাগানের এপাড়ার সব ঘরের মানুষ হঠাৎ মোটর গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে চমকে ওঠে। শব্দ তো নয়, যেন নিয়তির তূর্যনাদ। তরুলতা সামন্তের গাড়ি এসে গুহামানব কালী দত্তের বাড়ির সামনে থেমেছে।

গাড়ি থেকে নামলেন তরুলতা। সিল্কের শাড়ির দোলানো আঁচলটাকে টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিলেন। তরুলতার চশমার সোনার ফ্রেম যেন আগুনের রঙ নিয়ে জ্বলছে। কালী দত্তের বাড়ির সামনের দরজার কড়া নাড়লেন তরুলতা। কী অদ্ভুত শব্দ করে বেজে উঠলো কালী দত্তের বাড়ির ওই দরজার মরচেধরা কড়া।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা নিজের নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উসখুস করেন। মহিলারা জানালার গরাদের উপর মাথা রেখে আর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন। এবার একটা হেস্তনেস্ত হয়েই যাবে।

—তমালী! ডাক দিলেন তরুলতা। সে ডাকও যেন নিয়তির আহ্বান। খুব মৃদু স্বরে কথা বলা যাঁর অভ্যাস, তাঁরই গলার স্বরে কী অদ্ভুত একটা আক্রোশের ঝঙ্কার! তরুলতার

কানের হীরার ফুলও ঝিকঝিক করে যেন একটা জ্বালা ঠিকরে দিয়ে কাঁপছে। দেখে মনে হয়, ভয়ানক এক ঘৃণার জ্বালার দুটো বিদ্যুতের ফুলকি ঝরে পড়ছে।

তরুলতার এক ডাকেই কালী দত্তের বাড়ির সেই বন্ধ দরজার কপাট খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো যে মূর্তি, সেটা তমালীর মূর্তি নয়। বের হয়েছেন কালী দত্ত। নেমন্তন্ন-বাড়িতে ব্যস্ত কাজের মানুষের সাজ যে-রকমের হয়, কালী দত্তের সেই মূর্তির সাজও প্রায় সে-বকমেব ; গায়ে গেঞ্জি, ধুতিটা ছোট করে আর আঁটসাট করে পরা, হাতে একটা তোয়ালে।

তরুলতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললেন—আপনি সবে যান, আপনাকে ডাকিনি।

সেই মুহূর্তে সরে গেলেন কালী দত্ত, আবার ঘরের ভিতরেই চলে গেলেন। আর হঠাৎ-ঝড়ের বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার রঙীন গুচ্ছ যেমন ছিটকে এসে লুটিয়ে পড়ে, রঙীন সাজের এক তরুণী নারীর চেহারাও তেমনি ঘরের ভিতর থেকে যেন ছিটকে এসে তরুলতার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো। তরুলতার একটা হাত ধরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো তমালী—তরুদি! আপনি!

তরুদি—হ্যাঁ, আমি সেই তরুদি।

তমালীর প্রাণটাই যেন একটা বিস্ময় হয়ে ছটফট করছে। তরুলতাব হাত ধরে টান দেয় তমালী—ভেতরে চলুন তরুদি।

—না। তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়?

—আমার বাড়িতে। চা খাবে।

—চলুন। বলতে গিয়ে তরুলতার গায়ের উপর আবার লুটিয়ে পড়তে চায় তমালী। তমালীর নির্বাসিত ভাগ্যটাই বোধহয় মুক্তির সুখে নরম হয়ে গলে পড়তে চাইছে।

—চল। গাড়িটার দিকে একবার তাকালেন তরুলতা ; তারপর তমালীর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিন্তু চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তরুলতা। ঘরের ভিতরটার দিকে আর একবার তাকালেন। —ওখানে ওটা আবার কি?

তমালী শুধু মাথা হেঁট করে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তরুলতাও কোন প্রশ্ন না করে আস্তে আস্তে, এক-পা দু-পা করে এগিয়ে, কী আশ্চর্য, কালী দত্তের সেই ভয়ানক গুহাঘরের ভিতরেই ঢুকলেন।

ঘরের ভিতরের দেয়ালে টানানো একটা ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তরুলতা। তমালীরই ছবি। খোঁপাতে সাদা ফুলের মালা জড়ানো, তমালীর চেহারার একটা অয়েল পেন্টিং।

তরুলতা ডাকেন—কোথায় গেলেন আপনি? কী যেন আপনার নাম!

—আজ্ঞে। সাড়া দিয়ে ভিতরের বাবান্দার দিক থেকে এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়ালেন কালী দত্ত।

তরুলতা—এ ছবি কোথায় পেলেন আপনি?

কালী দত্ত হাসেন—তমালী ওর একটা ফটো দিয়েছিল, সেটাকে কলকাতাতে পাঠিয়ে এই ছবি করিয়ে আনা হয়েছে।

কালী দত্তের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই ঘরের চারিদিকের চেহারার দিকে

চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন তরুলতা।

টেবিলের উপর এক গাদা গল্পের বই। তরুলতার চোখের শক্ত ভ্রূকুটি যেন আরও বিরক্ত হয়ে কুঁচকে যায়।—আপনি আবার বই-টই...।

—আজ্ঞে না, আমি না। এগুলো তমালীরই শখ।

তরুলতা—তমালীর বাবার নামটা যেন কী?...হ্যাঁ, গোবিন্দ কবিরাজ। তিনি এখন কোথায়?

—তিনি নেই। তমালীর মা অবিশ্যি বেঁচে আছেন। কিন্তু টি-বিতে ভুগছেন। কাজেই...।

তরুলতার কানের ফুলের হীরা ঝিকঝিক করে জ্বলে ওঠে।—কাজেই মানে কি? কি বলতে চান আপনি!

—কাজেই তমালীর শখের বই-টই ছবি-টবি সবই তো এখন আমি ছাড়া আর কেউ..

তরুলতার চোখ দুটি এইবার সত্যিই জ্বলতে থাকে।—আপনার এ ঘরের দেয়ালে তো আরও চারটে মেয়ের ছবি থাকবার কথা।

—ছিল। সে-সব ছবিকে বাক্সে তুলে রাখতে হয়েছে। আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমার ভাগ্যটা যে অদ্ভুত একটা...।

তরুলতা—কি বললেন?

—একটা সাংঘাতিক পরীক্ষা!

তরুলতা—তার মানে?

—সবাই এক-এক করে চলে যাবে, অথচ যাবার আগে দিব্যি দিয়ে বলে যাবে, একা থেকো না।

তরুলতা—কিন্তু চলে যায় কেন?

—আপনিই বলুন, কেন চলে যায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।

তরুলতা—কিন্তু আপনি কেন একলা থাকতে চান না?

—একলা থাকতে পারি না।

তরুলতার গলার স্বর যেন দুঃসহ একটা ঘৃণার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে কাঁপতে থাকতে।—কেন পারেন না?

কালী দত্তেরও গলার এতক্ষণের মৃদু মিনমিনে আওয়াজ যেন ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের মতো গুমরে ওঠে।—একলা থাকতে ভাল লাগে না, তাই একলা থাকতে পারি না।

তরুলতা—খুব কুৎসিত আর ভয়ানক আপনার বাতিক।

—সেজন্যে তো আপনার কিংবা আর কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

তরুলতা—কিন্তু চার-চারটে মেয়েকে মরতে হয়েছে।

—কিন্তু সেজন্য তো আপনাকে কিংবা আর কাউকে কাঁদতে হয়নি।

তরুলতা—আপনি কেঁদেছিলেন?

কালী দত্ত এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন।—আপনি...আপনি সত্যিই ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলছেন।

—আপনি তো আমাদের মেটাল কারখানার স্টোরে কাজ করেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওরকম চেঁচিয়ে হাসবেন না।

কালী দত্ত কিন্তু হাসতেই থাকেন, আরও উচ্চকিত হাসি—আপনি বরং তমালীর সঙ্গে কথা বলুন।

ঠিকই, শুধু তমালীর সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল। কালী দত্ত নামে এই অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে একটা কথাও বলা উচিত হয়নি। তরুলতার চোখের ভ্রূকুটি হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়।

কিন্তু না, তমালীর সঙ্গেও এখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবার দরকার নেই। তমালীকে এই অভিশাপের ঘর থেকে সরিয়ে একটা মুক্তির আঙিনাতে নিয়ে গিয়ে নতুন আলোর মুখ দেখিয়ে দিতে হবে। বিকেল তো প্রায় শেষ হতেই চলেছে। বিকাশ বোধহয় এতক্ষণে এসেই গিয়েছে, ড্রইংরুমে বসে আছে।

কিন্তু তমালীকে যে সত্যিই একটি তাজা রঙীন অয়েল পেন্টিং ছবির মতো দেখাচ্ছে। এই গুহাঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে পড়ে থেকেও কেমন করে ওরকম একটা ফুল্লতার ছবি হয়ে উঠলো তমালী? তমালী কি হাঁড়ি ঠেলে না? উনানের আঁচের ধারে-কাছেও যায় না? সামান্য কাজটাজও করে কি? না, সব সময় ওরকম সাজেশ্বরী হয়ে শুধু বসে থাকে?

চোখে পড়ছে তরুলতার, ঘরের ভিতরে একটা টেবিলের উপর চাদর পেতে তার উপর রেশমী সুতোর লেসের একটা ব্লাউজকে কে-যেন খুব যত্ন করে অর্ধেক ইস্তিরি করে রেখে দিয়েছে। ওদিকে মেজের উপরে জুতোর কালি আর একটা ব্রাশ পড়ে রয়েছে। দু'পাটি জুতোর শুধু একটা পাটিকে পালিশ করা হয়েছে, আর এক পাটির পালিশ বাকি। কিন্তু. সত্যিই যে দু'পাটি মেয়েলী জুতো। বিছানার কাছে একটা কাঠের টুলের উপর একটা গেলাস, সরবতের গেলাস। সরবতের অর্ধেকটা খাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কে খাচ্ছিল এই সরবত?

জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল না, তবু কথাটা যেন তরুলতার এই কঠিন গম্ভীর দাঁতচাপা মুখের ভিতর থেকে নিজের জোরেই ছুটে বের হয়ে এল।—কে খাচ্ছিল এই সরবত?

—আমি নয়। হাসতে থাকেন কালী দত্ত।

তরুলতা—আপনার তো ঝি-চাকর নেই, কিন্তু এই সব কাজ, এত নানারকমের কাজ কে করে?

—আমিই করি।

তরুলতা—তমালী করে না?

—করতে চায়, কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বলি, কী দরকার; যতদিন বেঁচে আছ ততদিন একটু আয়েস করে নাও। কোন ঠিক তো নেই, হঠাৎ করে একদিন এই খাঁচা ছেড়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যাবে।

হেসে ফেলেন তরুলতা।—শুনে তমালী কী বলে?

—সবাই যা বলেছে, তমালীও তাই বলে, ওই একই কথা।

তরুলতা—কি কথা?

—বলে, তাই তো চাই। তার চেয়ে সুখের মরণ আর কি হতে পারে?

তরুলতা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। তারপর, তাঁর মৃদু গলার স্বর আরও মৃদু হয়ে, যেন চাপা ভয়ের ভাষার মতো বিড়বিড় করে—কিন্তু তমালীকে আপনি বাইরে যেতে দেন না কেন? সব সময় একটা কয়েদীর মতো ওকে ঘরের ভিতরে আটক করে রাখা, এটা কি ।

বাধা দিয়ে হেসে ওঠেন কালী দত্ত—ছি-ছি, আমি আটক করে রাখবো কেন? এই তো, আপনার সঙ্গে এখনই যাচ্ছে তমালী, আমি কি কোন আপত্তি করেছি? তমালী নিজেই বাইরে যেতে চায় না।

তরুলতা—কেন?

—বাইরে বের হলেই তো ওই একই কথা, আমার নামে যত ভয়ানক নিন্দের কথা শুনতে

হবে। কিন্তু আসল সত্যি কথাটা কি জানেন?

তরুলতা—কি?

—বাইরের মেলামেশা ডাকাডাকি আর নেমন্তন্নকে দূরছাই করতেই ভালবাসে তমালী। বলে, ঘরেই সবকিছু থাকতে বাইরে যাব কেন? আপনিই বলুন, এটা একটু বেশি অহংকারের কথা নয় কি?...কিন্তু আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। একটা চেয়ারকে টেনে নিয়ে তরুলতার কাছে এগিয়ে দিলেন কালী দত্ত।

চেয়ারে বসেন তরুলতা। সত্যি, ঘরের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ফাল্গুন মাসের বিকালে রায়বাগানের কোন পাখাওয়ালা ঘরের ভিতরটা বোধহয় এত স্নিগ্ধ হয় না।

কালী দত্ত বলেন—বসলেনই যখন, তখন একটু চা খেয়ে যান।

রুমাল দিয়ে কপালের একটা ঘামের ফোঁটা মুছে নিয়ে কালী দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তরুলতা। তরুলতার গলার স্বর আরও মৃদু হতে গিয়ে একেবারে নিবিড় হয়ে যায়।—না না, আপনি এরকম অনুরোধ করে আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

বিপদ? কিসের বিপদ? তরুলতা কি ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলছেন? নইলে একথার যে কোন মানেই হয় না।

কোন মানে হয় না, এমন একটা কথার কি মানে বুঝলেন কালী দত্ত, তা তিনিই জানেন। চা তৈরি করতেই বারান্দার দিকে চলে গেলেন কালী দত্ত।

তরুলতা সামন্ত বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়েছেন ' তাই এই ঘরের ঠাণ্ডাব মধ্যে গভীর এক স্বস্তির স্বাদ পেয়েছেন। তা না হলে চোখ দুটো বন্ধ করে এই চেয়ারের উপর ওভাবে একেবারে নীরব হয়ে বসে থাকবেন কেন?

তবু নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন তরুলতা, ভিতরের বারান্দার দিক থেকে কাপ-ডিশ আর চামচের ঠুং-ঠাং শব্দ ভেসে আসছে। তরুলতা সামন্তের চেষ্টার প্রাণ একটা সান্ত্বনার শব্দ শুনছে।

চোখ মেলে দরজাব বাইরের দিকে তাকালেন তরুলতা। ওঃ, তমালী বেচারা যে অনেকক্ষণ ধরে ওখানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তমালীকে বলে দিলেই তো হয়, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না তমালী, তুমি বরং আর দেরি না করে এখনই আমার বাড়িতে চলে যাও; আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকি।

—কালীবাবু! শুনছেন? হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর প্রায় একটা চাপা চিৎকারের মতো শব্দ করে ডাক দিলেন তরুলতা।

কালী দত্ত আসতেই হাসতে চেষ্টা করেন তরুলতা—না কালীবাবু, প্লীজ, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি চা খাব না।

ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন তরুলতা। আর, তমালীর কাছে এসে একটা হাত ধরে তমালীকে ঘরের ভিতরে যেন ঠেলেই দিলেন।—তোমার আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই তমালী। তুমি ঘরেই থাকো।

রায়বাগানের পাড়ার মানুষ শুধু আশ্চর্য হয়ে আর হতাশ হয়ে দেখতে থাকে, তমালী সেই গুহাঘরের ভিতরেই ঢুকে পড়লো, আর তরুলতা সামন্তকে নিয়ে সেই মস্ত গাড়িটা ছুটে চলে গেল। হর্নের শব্দ নেই, শুধু ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে গাড়িটা।

কি হলো, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু জানতে পারা গেল, সন্ধ্যা হবার আগেই তরুলতা সামন্ত ট্রেন ধরবার জন্যে দমদম চলে গিয়েছেন। ছুটি এখনও ফুরোয়নি, প্রতাপগড়ের মেয়ে-কলেজ এখনও খোলেনি, তবু চলে গেলেন? কী আশ্চর্য, কিছুই যে বোঝা যায় না।

বহুরূপী

হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম, শুনেছেন, হরিদা, কী কাণ্ড হয়েছে ?

উনানের মুখে ফুঁ দিয়ে আর অনেক ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে হরিদা এইবার আমাদের কথার জবাব দিলেন—না, কিছুই শুনিনি।

—জগদীশবাবু যে কী কাণ্ড করেছেন, শোনেনি হরিদা ?

হরিদা—না রে ভাই, বড় মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেমন করে শুনবো ? আমাকে বলবেই বা কে ?

—সাতদিন হল এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন। খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী। হিমালয়ের গুহাতে থাকেন। সারা বছরে শুধু একটি হরীতকী খান ; এ ছাড়া আর কিছুই খান না ! সন্ন্যাসীর বয়সও হাজার বছরের বেশি বলে অনেকেই মনে করেন।

হরিদা—সন্ন্যাসী কি এখনও আছেন ?

—না, চলে গিয়েছেন।

আক্ষেপ করেন হরিদা—থাকলে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম।

—তা পেতেন না হরিদা ! সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস। শুধু ওই একা জগদীশবাবু ছাড়া আর কাউকে পায়েব ধুলো নিতে দেননি সন্ন্যাসী।

হরিদা—কেন ?

—জগদীশবাবু একজোড়া কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ধরলেন। তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী পা এগিয়ে দিলেন, নতুন খড়ম পরলেন আর সেই ফাঁকে জগদীশবাবু পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন।

হরিদা—বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যাপার !

—হ্যাঁ, তা ছাড়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দেবার সময় জগদীশবাবু এক'শো টাকার একটা নোট জোর করে সন্ন্যাসীর ঝোলার ভেতরে ফেলে দিলেন। সন্ন্যাসী হাসলেন আর চলে গেলেন।

গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা কী বলছি বা না বলছি, সেদিকে হরিদার যেন কান নেই।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে : আমাদের চায়ের জন্য এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল নামিয়ে দিয়েই হরিদা তাঁর ভাতের হাঁড়িটাকে উনানে চড়ালেন।

শহরের সবচেয়ে সরু এই গলিটার ভিতরে এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর ; আর আমাদের চারজনের সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। চা চিনি আর দুধ আমরাই নিয়ে আসি। হরিদা শুধু তাঁর উনানের আগুনের আঁচে জল ফুটিয়ে দেন।

খুবই গরীব মানুষ হরিদা। কিন্তু কাজ করতে হরিদার প্রাণের মধ্যেই যেন একটা বাধা আছে। ইচ্ছে করলে কোন অফিসের কাজ, কিংবা কোন দোকানের বিক্রীওয়ালার কাজ পেয়ে যেতে পারেন হরিদা ; কিন্তু ওই ধরনের কাজ হরিদার জীবনের পছন্দই নয়। একেবারে ঘড়ির কাঁটার সামনে সময় বেঁধে দিয়ে আর নিয়ম করে নিয়ে রোজই একটা চাকরির কাজ করে যাওয়া হরিদার পক্ষে সম্ভব নয়। হরিদার উনানের হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে, ভাত ফোটে না। এই একঘেয়ে অভাবটাকে সহ্য করতে হরিদার আপত্তি নেই, কিন্তু একঘেঁয়ে কাজ করতে ভয়ানক আপত্তি।

হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে। আর, সেটাই যে হরিদার জীবনের পেশা। হরিদা মাঝে-মাঝে বহুরূপী সেজে যেটুকু রোজগার করেন, তাতেই তাঁর ভাতের

হাঁড়ির দাবি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে সত্যিই উপোস করেন হরিদা। তারপর একদিন হঠাৎ আবার এক সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বিচিত্র ছদ্মবেশে অপরূপ হয়ে পথে বের হয়ে পড়েন। কেউ চিনতে পারে না। যারা চিনতে পারে এক-আনা দু-আনা বকশিশ দেয়। যারা চিনতে পারে না, তারা হয় কিছুই দেয় না, কিংবা বিরক্ত হয়ে দুটো-একটা পয়সা দিয়ে দেয়।

একদিন চকের বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল। একটা উন্মাদ পাগল; তার মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে, চোখ দুটো কটকটে লাল। তার কোমরে একটা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো, গলায় টিনের কৌটার একটা মালা। পাগলটা একটা থান ইট হাতে তুলে নিয়ে বাসের উপরে বসা যাত্রীদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠছে যাত্রীরা, দুটো একটা পয়সা ফেলেও দিচ্ছে।

একটু পরেই বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ ধমক দেয়।—খুব হয়েছে হরি, এই বার সরে পড়। অন্যদিকে যাও।

অ্যাঁ? ওটা কি একটা বহুরূপী? বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয়; কেউ আবার বেশ বিস্মিত। সত্যিই, খুব চমৎকার পাগল সাজতে পেরেছে তো লোকটা।

হরিদার জীবন এইরকম বহু রূপের খেলা দেখিয়েই একরকম চলে যাচ্ছে। এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী হরিদা। সন্ধ্যার আলো সবেমাত্র জ্বলেছে, দোকানে দোকানে লোকজনের ব্যস্ততা আর মুখরতাও জমে উঠেছে। হঠাৎ পথের উপর দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দ ঝমঝুম করে বেজে-বেজে চলে যেতে থাকে। এক রূপসী বাঈজী প্রায় নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। শহরে যারা নতুন এসেছে, তারা দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দোকানদার হেসে ফেলে—হরির কাণ্ড।

অ্যাঁ? এটা একটা বহুরূপী নাকি? কারও কারও মুগ্ধ চোখের মোহভঙ্গ হয়, আর যেন বেশ একটু হতাশস্বরে প্রশ্ন করে ওঠে।

বাঈজীর ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি। মোট আট টাকা দশ আনা পেয়েছিলেন। আমরাও দেখেছিলাম, এক-একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই রূপসী বাঈজী, মুচকি হেসে আর চোখ টিপে একটা ফুলসাজি এগিয়ে দিচ্ছে। দোকানদারও হেসে ফেলে আর একটা সিকি তুলে নিয়ে বাঈজীর হাতের ফুলসাজির উপর ফেলে দেয়।

কোনদিন বাউল, কোনদিন কাপালিক। কখনও বোঁচকা কাঁধে বুড়ো কাবুলীওয়ালা, কখনও হ্যাট-কোট-পেন্টলুন-পরা ফিরিঙ্গী কেরামিন সাহেব। একবার পুলিশ সেজে দয়ালবাবুর লিচু বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন হরিদা, স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরেছিলেন। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল ছেলেগুলো; আর স্কুলের মাস্টার এসে সেই নকল পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন—এবারের মতো মাপ করে দিন ওদের। কিন্তু আটআনা ঘুষ নিয়ে তারপর মাস্টারের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সেই নকল-পুলিশ হরিদা।

পরদিন অবশ্য স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের জানতে বাকি থাকেনি, কাকে তিনি আটআনা ঘুষ দিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই একটুও রাগ করেননি। বরং একটু তারিফই করলেন—বা, সত্যি, খুব চমৎকার পুলিশ সেজেছিল হরি!

আজ এখন কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হরিদা এত গম্ভীর হয়ে কী ভাবছেন। সন্ন্যাসীর গল্পটা শুনে কী হরিদার মাথার মধ্যে নতুন কোন মতলব ছটফট করে উঠেছে?

ঠিকই, আমাদের সন্দেহ মিথ্যে নয়। হরিদা বললেন—আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাবো।

—আমাদের দেখিয়ে আপনার লাভ কি হরিদা? আমাদের কাছ থেকে একটা সিগারেটের চেয়ে বেশি কিছু তো পাবেন না।

হরিদা—না, ঠিক তোমাদের দেখাবো না। আমি বলছি তোমরা সেখানে থেকো। তাহলে দেখতে পাবে।

—কোথায়?

হরিদা—আজ সন্ধ্যায় জগদীশবাবুর বাড়িতে।

—হঠাৎ জগদীশবাবুর বাড়িতে খেলা দেখাবার জন্যে আপনার এত উৎসাহ জেগে উঠলো কেন?

হরিদা হাসেন—মোটা মতন কিছু আদায় করে নেব। বুঝতেই তো পারছো, পুরো দিনটা রূপ ধরে ঘুরে বেড়িয়েও দু-তিন টাকার বেশি হয় না। একবার বাঈজী সেজে অবিশ্যি কিছু বেশি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওতেই বা কি হবে?

ঠিকই বলেছেন হরিদা। সপ্তাহে বড়জোর একটা দিন বহুরূপী সেজে পথে বের হন হরিদা। কিন্তু তাতে সাতদিনের পেট চলবার মতো রোজগার হয় না।

হরিদা বলেন—নাঃ, এবার আর কাঙালের মতো হাত পেতে বকশিশ নেওয়া নয়। এবার মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার। একবারেই যা ঝেলে নেব তাতে আমার সারা বছর চলে যাবে।

কিন্তু সে কী করে সম্ভব? জগদীশবাবু ধনী মানুষ বটেন, কিন্তু বেশ কৃপণ মানুষ। হরিদাকে একটা যোগী সন্ন্যাসী কিংবা বৈরাগী সাজতে দেখে কত আর খুশি হবেন জগদীশবাবু? আর খুশি হলেই বা কত আনা বকশিশ দেবেন। পাঁচ আনার বেশি তো নয়।

হরিদা বলেন—তোমরা যদি দেখতে চাও, তবে আজ ঠিক সন্ধ্যাতে জগদীশবাবুর বাড়িতে থেকো।

আমরা বললাম—থাকবো, আমাদের স্পোর্টের চাঁদা নেবার জন্যে আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশবাবুর কাছে যাব।

২

বড় চমৎকার আজকের এই সন্ধ্যার চেহারা। আমাদের শহরের গায়ে কতদিন তো চাঁদের আলো পড়েছে, কিন্তু কোনদিন তো আজকের মতো এমন একটা স্নিগ্ধ ও শান্ত উজ্জ্বলতা কখনও চারদিকে এমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেনি।

ফুরফুর করে বাতাস বইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বাগানের সব গাছের পাতাও ঝিরঝিরি শব্দ করে কী যেন বলতে চাইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বারান্দাতে মস্ত বড় একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোর কাছে একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন জগদীশবাবু। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি, সৌম্য শান্ত ও জ্ঞানী মানুষ জগদীশবাবু। আমরা আমাদের স্পোর্টের চাঁদার খাতাটিকে জগদীশবাবুর হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

চমকে উঠলেন জগদীশবাবু। বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জগদীশবাবুর দুই বিস্মিত চোখ অপলক হয়ে গেল।

আমরাও চমকে উঠেছি বইকি। আশ্চর্য হয়েছি, একটু ভয়ও পেয়েছি। কারণ সত্যিই যে বিশ্বাস করতে পারছি না, সিঁড়ির কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে, সে কি সত্যিই হরিদা? ও চেহারা কি সত্যিই কোন বহুরূপীর হতে পারে?

জটাজুটধারী কোন সন্ন্যাসী নয়। হাতে কমণ্ডলু নেই, চিমটে নেই। মৃগচর্মের আসনও সঙ্গে নেই। গৈরিক সাজও নেই।

আদুড় গা, তার উপর একটি ধবধবে সাদা উত্তরীয়। পরনে ছোট বহরের একটি সাদা

থান।

মাথায় ফুরফুর করে উড়ছে শুকনো সাদা চুল। ধুলো মাখা পা, হাতে একটা ঝোলা, সে ঝোলার ভিতরে শুধু একটা বই, গীতা। গীতা বের করে কি-যেন দেখলেন এই আগন্তুক। তারপর নিজের মনেই হাসলেন।

আগন্তুক এই মানুষটি যেন এই জগতের সীমার ওপার থেকে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন। শীর্ণ শরীরটাকে প্রায় অশরীরী একটা চেহারা বলে মনে হয়। কী অদ্ভুত উদাত্ত শান্ত ও উজ্জ্বল একটা দৃষ্টি এই আগন্তুকের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে।

উঠে দাঁড়ালেন জগদীশবাবু—আসুন।

আগন্তুক হাসেন—আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড় ?

জগদীশবাবু কিছু ভেবে বলেন- কেন ? কেন ? আপনি একথা কেন বলছেন মহারাজ ?

আমি মহারাজ নই, আমি এই সৃষ্টির মধ্যে এককণা ধূলি।—কিন্তু আপনি বোধহয় এগার লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড় বলে মনে করেন। তাই ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, নেমে আসতে পারছেন না।

সেই মুহূর্তে সিঁড়ি ধরে নেমে যান জগদীশবাবু।—আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি রাগ করবেন না।

আগন্তুক আবার হাসেন—আমি বিরাগী, রাগ নামে কোন রিপু আমার নেই। ছিল একদিন, সেটা পূর্বজন্মের কথা।

জগদীশবাবু—বলুন, এখন আপনাকে কিভাবে সেবা করবো ?

বিরাগী বলেন—ঠাণ্ডা জল চাই, আর কিছু চাই না।

ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়েন বিরাগী। এদিকে ভবতোষ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে।—না না, হরিদা নয়। হতেই পারে না। অসম্ভব ! হরিদার গলার স্বর এরকমেরই নয়।

বিরাগী বলেন—পরম সুখ কাকে বলে জানেন ? সব সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া !

ভবতোষের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে অনাদি বলে—শুনছো তো ? এসব ভাষা কি হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে ?

জগদীশবাবু ততক্ষণে সিঁড়ির উপরে বসে পড়েছেন। বোধহয় বিরাগীর পা স্পর্শ করবার জন্যে তাঁর হাত দুটো ছটফট করতে শুরু করেছে। জগদীশবাবু বলেন—আমার এখানে কয়েকটা দিন থাকুন বিরাগীজী। আপনার কাছে এটা আমার প্রাণের অনুরোধ। দুই হাত জোড় করে বিরাগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশবাবু।

বিরাগী হাসেন—বাইরে খোলা আকাশ থাকতে আর ধরিত্রীর মাটিতে স্থান থাকতে, আমি এক বিষয়ীর দালান বাড়ির ঘরে থাকবো কেন, বলতে পারেন ?

—বিরাগীজী ! জগদীশবাবুর গলার স্বরের আবেদন করুণ হয়ে ছলছল করে।

বিরাগী বলেন—না, আপনার এখানে জল খেয়েছি, এই যথেষ্ট। পরমাত্মা আপনার কল্যাণ করুন। কিন্তু আপনার এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জগদীশবাবু—তবে অন্তত একটু কিছু আজ্ঞা করুন, যদি আপনাকে কোন...।

বিরাগী—না না, আমি যার কাছে পড়ে আছি, তিনি আপনার চেয়ে কিছু কম নন। কাজেই আপনার কাছে আমার তো কিছু চাইবার দরকার হয় না।

জগদীশবাবু—তবে কিছু উপদেশ শুনিয়ে যান বিরাগীজী, নইলে আমি শান্তি পাবো না।

বিরাগী—ধন জন যৌবন কিছুই নয় জগদীশবাবু। ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি

বঞ্চনা। মন-প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুধু সেই একজনেব আপন হ্তে চেষ্টা করুন, যাঁকে পেলে এই সৃষ্টির সব ঐশ্বর্য পাওয়া হয়ে যায়। আচ্ছা আমি চলি।

জগদীশবাবু বলেন—আপনি একটা মিনিট থাকুন বিবাগীজী।

সিঁড়িব উপরে অচঞ্চল হয়ে একটা মিনিট দাঁড়িয়ে বইলেন বিবাগী। আজকেব চাঁদেব আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ হয়ে অদ্ভুত এক জ্যোৎস্না যেন বিরাগীর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। ভবতোষ ফিসফিস করে—না না, ওই চোখ কী হরিদার চোখ হতে পাবে? অসম্ভব।

জগদীশবাবুর হাতে একটা থলি। থলির ভিতরে নোটের তাড়া। বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে বেখে দিয়ে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা কবেন জগদীশবাবু—এই প্রণামী, এই সামান্য একশো এক টাকা গ্রহণ কবে আমাকে শান্তি দান করুন বিবাগীজী। আপনার তীর্থ ভ্রমণেব জন্য এই টাকা আমি দিলাম।

বিরাগী হাসেন—আমার বুকের ভিতবেই যে সব তীর্থ। ভ্রমণ কবে দেখবাব তো কোন দবকাব হয় না।

জগদীশবাবু—আমার অনুবোধ বিবাগীজী।

বিবাগী বলেন—আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িযে চলে যেতে পাবি, তেমনই অনাযাসে সোনাও মাড়িযে চলে যেতে পাবি।

বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিবাগী। একশো এক টাকাব থলিটা সিঁড়িব উপবেই পড়ে রইল। সেদিকে ভুলেও একবার তাকালেন না বিবাগী।

৩

—কি কবছেন হরিদা? কি হলো? কই? আজ যে বলেছিলেন জবব খেলা দেখাবেন, সে-কথা কি ভুলেই গেলেন। আজকেব সন্ধ্যাটা ঘবে বসেই কাটিযে দিলেন কেন?

বলতে বলতে আমবা সবাই হরিদাব ঘবেব ভিতবে ঢুকলাম।

হরিদাব উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। উনানেব উপব হাঁড়িতে চাল ফুটছে। আব, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হরিদা চুপ কবে বসে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই লজ্জিতভাবে হাসলেন।

—কি আশ্চর্য। চমকে ওঠে ভবতোষ।—হরিদা, আপনি তাহলে সত্যিই বের হয়েছিলেন। আপনিই বিবাগী?

হরিদা হাসেন—হ্যাঁ রে ভাই।

ওই তো সেই সাদা উত্তরীয়টা পড়ে রয়েছে মাদুরের উপর, আর সেই ঝোলাটা আর সেই গীতা।

অনাদি বলে—এটা কি কাণ্ড করলেন, হরিদা? জগদীশবাবু তো পাঁচশো টাকা সাধলেন, অথচ আপনি একেবাবে খাঁটি সন্ন্যাসীব মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন?

হরিদা—কি করবো বল? ইচ্ছেই হলো না। শত হোক।

ভবতোষ—কি?

হরিদা—শত হোক, একজন বিবাগী সন্ন্যাসী হয়ে টাকা-ফাকা কি কবে স্পর্শ করি বল? তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।

কী অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা। হরিদাব একথার সঙ্গে তর্ক চলে না। আর, বুঝতে অসুবিধে নেই, হরিদার জীবনের ভাতেব হাঁড়ি মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটিয়েই সাবা হবে।

অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।

অনাদি বলে—কিন্তু আপনি কি জগদীশবাবুর কাছে গিয়ে আর কখনও... ।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হরিদা—যাবই তো। না গিয়ে উপায় কি ? গিয়ে অন্তত বকশিশটা তো দাবি করতে হবে ?

—বকশিশ ? চেঁচিয়ে ওঠে ভবতোষ। সেটা তো বড়জোর আট আনা কিংবা দশ আনা।

হরিদা বিড়ি মুখে দিয়ে লজ্জিতভাবে হাসেন—কি আর করা যাবে বল ? খাঁটি মানুষ তো নয়, এই বহুরূপীর জীবন এর চেয়ে বেশি কি আশা করতে পারে ?

উচলে চড়িনু

তেঁতুলিয়া মাঠের ঘাসের রঙ বার মাস সবুজ। অনেক দিন আগে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই দিনেশ বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছিল। তেঁতুলিয়া মাঠে লাল কৃষ্ণচূড়ার ভাঙা ভাঙা ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল কোথা থেকে। আজ আবার ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে—তেঁতুলিয়া মাঠের সবুজে হঠাৎ কোন উত্তুরে হাওয়ায় রক্তিম তুষারের ফুল কতকগুলি এসে ছড়িয়ে পড়েছে। একদল ইরানী বেদের মেয়ের—মাঠের এককোণে পড়েছে তাদের তাঁবু।

পরনে খাট খাট লাল ঘাগরা, হাঁটবার সময় কেঁপে দুলতে থাকে। মনে হয় ওটা বুঝি ওদের গায়ের পালক। নিটোল খালি পা—গোলাপী মোমের প্রলেপ দেওয়া। রুক্ষ বেণীগুলি কোমর পর্যন্ত ঝোলে। গায়ে বেগুণী রঙের জামা, চুড়িদার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত। মাথায় কপাল চেপে কমালের ফেট আর তার নীচে লালচে মুখ, টিকালো নাক আর তার দু'পাশে জোড়া জোড়া চোখ যেন কাস্পিয়ান নীলিমায় টলমল।

মাঠের অন্যদিকে হল্লা আর হর্‌রা চলেছে খুব। বেদিয়া যুবকেরা ছোট ছোট জুয়ার বৈঠক বসিয়েছে। বাজারের বহু উৎসাহী জুয়াড়ী সেই ব্রাহ্মমুহূর্তেই এসে ভীড় করেছে গন্ধে গন্ধে—ভাগ্যের সঙ্গে প্যাঁচ কষে নিচ্ছে এক হাত। অথবা রাত্রেই শুরু হয়েছিল—হারজিতের টানাপোড়েনে মাত করে আর মার খেয়ে দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেছে।

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দত্ত কোম্পানীর আফিসে এতক্ষণ ধর্ণা দিয়ে ঘরে ফিরেছে দিনেশ। মাত্র পাঁচটা টাকা এ্যাডভান্স, তাও চেয়ে পাওয়া যায়নি। তবে শুধু খালি হাতে ফিরতে হয়নি।

পথে ফিরতে বিলাসী কোত্থেকে এসে তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কয়েকটা টাকা—'ধারই দিলাম বাবু। যখন পার শোধ করে দিও।'

খনির মজুরণী বিলাসী, এ বয়সেই পাঁচবার সাঙ্গা তালাক করেছে। নামকরা নেশাড়ী সুপেশল কালো কঠিন চেহারা। মুখ ও বুকের ছাঁদে নারীত্বের কোমলতাটুকু অটুট আছে। গতরভাঙা পরিশ্রমে পুরুষ মজুর ওর কাছে হার মানে।

বিমর্ষ দিনেশ ঘরের বাইরে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হিস্টিরিয়ার মতো শরীরে একটা তীব্র কম্পন আর অবসাদ নেমে আসে। কিসের বিরুদ্ধে যেন তার একটা অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

বছর দু'এক আগের কথা, কলেজের বার্ষিক উৎসবে দিনেশ তার রোমান রিংয়ের খেলা দেখিয়েছে। বাঘের চামড়ায় আঁটসাঁট জাঙ্গিয়া, খোলা গা। দোলায়মান রিংয়ের ওপর

কসরত। লীলায়িত পেশীপুঞ্জের রক্তরাগে ফুটে ওঠে প্রাণের সম্মানলিখা। করতালির বরষা আর শত শত দর্শকের বিমুগ্ধ দৃষ্টির আশীর্বাদ। গ্যালারি থেকে কনভেন্টের মেয়েদের রুমালের উৎক্ষেপ আর হর্ষের কাকলি। কোথায় মিলিয়ে গেল সে ছবি!

বাঙালী সমাজে কানা খোঁড়ার জীবনেও বিয়ের ফুল ফোটে। ভবিষ্যপুরুষের ধমনীতে তারা সঁপে দিয়ে যায় শুধু কতকগুলি পঙ্গু বীজাণুর প্রবাহ। তাতেও দোষ নেই। যত বিচার আর ব্যতিক্রম শুধু দিনেশের অদৃষ্টে। বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। পাত্রের যা রোজগার—এক সপ্তাহের পেটের খোরাক যোগাতেই নিঃশেষ। কন্যাপক্ষ আতঙ্কে পিছিয়ে যায়।

এদিকে দত্ত কোম্পানী আবার মাইনে কাটে। দিবারাত্রি দু'দফা সিফট চলে। খনি হাতড়ে মাল ওঠে না। এটাও যেন তারই অপরাধ। এর চেয়ে সাত সাগর ছেঁচে মুক্তো আনাও বোধহয় সহজ।

দিনেশের অন্তরাত্মা হিংস্র হয়ে ওঠে। তার চেয়ে ভাল ফ্যাকাসে তোবড়া একটা মুখের ভেতর দু'পাটি পোকাপড়া দাঁত—সোনা দিয়ে বাঁধানো। অস্থিসার একটা নড়বড়ে শরীরে অজীর্ণ আর অম্লশূল—কাশ্মীরী শালে ঢাকা। যে কোন ঘটক দেখলেই খুসিতে আটখানা হয়ে যাবে। যেন ঐ সোনা আর শালের ঔরসে জন্ম নেবে জাতিধর আর বংশধরের দল।

আরো মুশকিল হয়েছে ভদ্রলোক হয়ে লেখাপড়া শিখে। জীবনের দুর্ধর আবেগ টেনে নিয়ে যায় পাতালের দিকে। বিলাসীকে নিয়ে যে জনরব গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে সেটা সত্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু রুচিতে বাধে। পদে পদে ভদ্রযানার নিষেধভীরুতা। অভাবে স্বভাব নষ্ট হবে, এ হতে পারে না।

আবার মনে হয় সমাজ সংসার মিছে সব। এই জঙ্গল আর পাথরের চটান। চুনা পাথরের ধস নেমে গেছে নদীর গড়খাই পর্যন্ত—অগণ্যকোটি কীটের চূর্ণাস্থি। এই সেই গণ্ডোয়ানা ভূমি যেখানে গলিত প্রস্তরের নিশ্বাস শূন্যে মিলিয়েছে একদিন। যে পরমাণুর যজ্ঞে সৃষ্টি হলো হীরা, পান্না, পোখরাজ, নীলা, পদ্মরাগ। প্রথমে প্রেমে মরণাহত কত অতিকায় গোধিকার চুম্বন আঁকা আছে এই পাষাণে পাষাণে। দিনেশের ইচ্ছে হয়, অবচীন বিংশ শতাব্দীর এই সংকুচিত জীবনের জঞ্জাল ঠেলে দিয়ে বিলাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আত্মনাশের আনন্দ।

কিন্তু তা হয় না।

ঘরে চোর ঢুকেছে। দিনেশের ঘুম ভেঙে গেল। খুট্‌খাট্ শব্দ।

বড় ভুল করেছে চোর। দিনেশ ভাবতে গিয়ে নিজেই লজ্জিত হলো। এ ঘরে চুরি করার মতো কিছু নেই। কি নেবে চোর? পাশের ঘরে আছে একটা রুটি সেঁকার তাওয়া, বেলুন, চাকি, খুন্তি আর এলুমিনিয়ামের ডেকচি। বারান্দায় আছে এঁটো থালা আর গেলাসটা। উঠোনে একটা পাইখানা যাবার পেতলের গাড়ু। পশ্চিমের ঘরে শুধু একটা এনামেলের গামলা—ছোলা ভেজান আছে। এর মধ্যে কোন্ জিনিসটি চোরের পক্ষে লোভনীয় হতে পারে?

একটু দূরেই তো ছিল দত্ত কোম্পানীর অভ্রের স্টোর। হাঁপানী রুগী কুঁজো মুকুটধারী সিং বন্দুক ঘাড়ে পাহারায় রয়েছে। চোর যদি তার সামনে গিয়ে একটু জোরে কাশে তবে বন্দুক খসে পড়বে হাত থেকে নির্ঘাত। তারপর কাঠের বাক্সগুলি ভেঙে ফেললেই হলো—হাজার পাঁচ তো পাবেই। কিন্তু গবেট চোরগুলোর চোখে সোজা রাস্তা তো পড়ে না। এসেছে ওভারম্যান দিনেশের ঘরে।

আরও ভুল করেছে চোর। সে জানে না এখানে থাকে দিনেশ চৌধুরী—যে সাড়ে পাঁচ

ফুট লম্বা, পুরো দম টানলে যার বুকের বেড় বেলুনের মতো ফুলে আটচল্লিশ ইঞ্চি হয়, আধ ইঞ্চি পুরু ও আড়াই ইঞ্চি চওড়া লোহার পাত যে চিটেগুড়ের মতো দুমড়ে মুচড়ে দেয়। দৈবাৎ যদি চোরের হাত দিনেশের ঐ লোহার পাঞ্জায় ধরা পড়ে, কি হবে পরিণাম ? একটি হ্যাঁচকা টানে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে খুলে আসবে না কি ?

সত্যি চোর ঢুকেছে, এ ব্যাপার জেনেও দিনেশ আবার গায়ে চাদরটা টেনে নিল। ঘুমের আরামটুকু নষ্ট করে লাভ নেই। চোরের যা সাধ্যি থাকে করুক।

কিন্তু মনে পড়লো বড় আয়নাটা, রূপোর ফ্রেমে বাঁধা ; ঘরে দেয়ালে টাঙ্গান আছে। কমিশনার সাহেবের মেম কসরৎ দেখে খুশি হয়ে এটি উপহার দিয়েছিলেন। পঁচিশজন গুরুভার মানুষে বোঝাই একটা গরুর গাড়ীর চাকা ঘাড়ের ওপর দিয়ে পার করেছিল দিনেশ, যার জন্যে আজও একটা ঘাড়ের রগ মাঝে মাঝে টনটন করে।

এখন মাসের শেষ। একটা গামছা দিয়ে ঢাকা আছে আয়নাটা। খোরাকের কমতি পড়েছে এখন, তাই ডন বৈঠক মেহন্নতও বাদ পড়েছে। এখন চলেছে শুধু ঝিঙের তরকারি আর ভাত। এই খোরাকে এক্সারসাইজ করলে ক্ষতি হয় শরীরের—দম ঢিলে হয়ে আসে, পেশিগুলো রুক্ষ হয়ে কুঁচকে যায়। একটুতে ক্লান্তি বোধ হয়।

পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। তবু মাসের প্রথম ক'টা দিন প্রতি নিঃশ্বাসে, মাংসপেশীর প্রতিটি লীলায়িত নৃত্যের মধ্যে দিনেশ প্রাণের আস্বাদ পায়। পেট ভরে রুটি-তরকারি, একপো ঘিয়ের ফোঁড়ন দেওয়া অড়হরের ডাল, একটু সুরুয়াদার মাংসের কারি, সকালের দিকে মোষের দুধ, বিকেলে বাদামের সরবত। ডনবৈঠক আর বারবেল ভাঁজার পর তেলে মাজা শরীরে স্নান সেরে দিনেশ এই আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, আয়নার বুকে সেই অপার স্বাস্থ্য মহিমার প্রতিচ্ছায়ার পায়ে তার মন অনুরাগের আবেশে নুয়ে পড়ে।

আয়নাটা গেলে ক্ষতি হবে। দিনেশ বিছানা ছেড়ে উঠলো।

দিনেশের পায়ের শব্দে একটা চোরের ছায়ামূর্তি ঘরের ভেতর থেকে ছিট্‌কে বারান্দায় এসে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো দিনেশের লোহার মতো দুটি বাহুর পাকে। মুহূর্তের মধ্যে চোরের শরীর নরম নতুন বালিশের মতো চেপ্টে যেন এতটুকু হয়ে গেল।

দুড় দুড় আওয়াজ। আরও ক'জন চোর উঠোনের পাঁচিল ডিঙিয়ে খিড়কির দোর খুলে পালিয়ে গেল।

বন্দী চোর হাঁপাচ্ছে। দিনেশের কানের কাছে চোরের কাতর স্বর বেজে উঠলো, অতি করুণ এক আবেদন—'উঃ, গায়ে ফোড়া আছে, বড় লাগছে।'

আচম্‌কা শিথিল হয়ে পড়লো দিনেশের বাহুবন্ধন। দ্বার খোলা পিঞ্জরের পাখীর উল্লাসের মতো চোর একবার মরীয়া হয়ে ছটফটিয়ে উঠলো মুক্তির জন্যে। কিন্তু দিনেশ তার ভুল বুঝে সামলে নিল।

আর একবার কেঁপে উঠলো দিনেশ। চোর তার বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে হিংস্র কামড়—নির্বিষ সাপের ছোবলের মতো একটু চিন্ চিন্ করে উঠলো শুধু। স্প্রিংয়ের মতো পেশিতে দাঁত বসাতে পারে না—চামড়াটা শুধু ছড়ে যায় সামান্য। দিনেশ আর একবার কষে দিলে তার নিদারুণ আলিঙ্গন গ্রন্থি। নিপিষ্ট চোরের দম ফেটে এক পরম হতাশার আক্ষেপ ফুঁপিয়ে বেজে উঠলো।

কিন্তু ধীরে শিথিল হয়ে আসছে দিনেশের হাত অলস অবসাদে। রেশমের মতো নরম চুলেভরা চোরের মাথা দিনেশের চিবুকে ঘষা খেল একবার। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিতেই চোরের মাথার বেণীটা চাবুকের মতো দিনেশের কাঁধের ওপর সাপটে পড়লো। তার ওপর মিঠে ফুলের গন্ধ, বেণীতে গোঁজা ফুল, টাটকা সুলতান চাঁপা।

একটা স্বেদাক্ত মসৃণ মুখ মাছরাঙা পাখীর মতো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিনেশের মুখের ওপর। জেলির মতো কোমল দুটি অদৃশ্য অধরের বিহ্বল চুম্বন। অগোচরের এই স্পর্শ তিলে তিলে গ্রাস করে নিচ্ছে তার পরিচয়। শরীরের প্রতি কণিকা যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কাঠিন্য হারিয়ে।

বাইরের অন্ধকার থেকে মৃদু ঝড়ের স্রোতে ভেসে আসছে অতি করুণ একটা শব্দের কম্পন—ফাটা বাঁশির আওয়াজের মতো। শত শত সাপ যেন ফনা তুলে শিষ দিয়ে ডাকছে সঙ্গিনীকে। দিনেশের হাত দুটি ঝুলে পড়লো।

এক মিনিট মাত্র। অবসাদের ঘোর কাটিয়ে উঠেই দিনেশ দেশলাই জ্বালালো। হাতে চকচকে ছুরি—একটি ইরানী বেদে মেয়ে—হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুঁজছে। এরাই এসেছে তেঁতুলিয়া মাঠে।

বাইরে আর একবার সাপের শিষের ঝড় শিউরে উঠলো একসঙ্গে। চোর খিড়কির দবজা দিয়ে চকিতে পার হয়ে চলে গেল।

দত্ত কোম্পানীর অভ্রের খনি। ওভারম্যান দিনেশ ডিউটি দিতে নেমে চললো সুড়ঙ্গেব পথে। হাতে টর্চ আর বেঁটে একটা লাঠি। চওড়া ঢালু পথ নেমে গেছে—গাছেব ডাল দিয়ে সিঁড়ি কবা, পা ঠেকা দেবার জন্যে। মাথার ওপরটা যেন এক বিবাট পাষাণেব চন্দ্রাতপ—গাঁইতার মারে চেঁচেছুলে খিলান করে দেওয়া হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে ফাটল—ভূভারের আক্রোশ যেন ভ্রূকুটি করে রয়েছে। কাঁচা গাছেব তক্তা দিয়ে খিলানটা এক প্রস্থ তালি মারা হয়েছে—পচে ছিঁড়ে গেছে আর্ধেক কাঠ। তারই ফাঁকে চুঁয়ে পড়ছে ভুস্‌কো মাটি, কাদাজল আর কাঁকর। একটা শিমূলেব শেকড় সাপের লেজেব মতো ঝুলছে। ঢালু সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে—ছাতটা সেখানে পাকা ফোডাব মতো ফুলে উঠেছে। এক ভয়ংকর পরিণামের আশঙ্কায় টনটন করছে জায়গাটা। দুর্বল আশ্বাসের মতো কয়েকটা কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে।

নামতে নামতে দিনেশ এসে দাঁড়ালো ঢালুর শেষে—জায়গাটা প্রায় সমতল। দুধে মাটির কাদায় পা ডুবে যায়। দুপাশে স্তরে স্তরে কেওলিন গলে রয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা খাড়া চানকের মুখ মাথার অনেক ওপরে, বহিঃপৃথিবীর আলোয় রাঙা দিনমানের একটি বুদ্বুদের মতো ভেসে রয়েছে।

এখান থেকে তিন দিকে তিনটে সুঁদ চলে গেছে। দু'পায়ে গুঁড়ি মেরে আর দু'থাবার হেঁটে দিনেশ চললো—টর্চের আংটাটা দাঁতে কামড়ে। ধারালো কোয়ার্টসের নুড়িতে হাঁটু ছড়ে যায়। ঘাড় টাটিয়ে উঠলেও মাথা তোলা যায় না। মাথার ওপরে এবড়ো খেবড়ো পাথর—পাতাল দানবেরা দাঁত মেলে পড়ে আছে। বেসামাল হলেই মাথার খুলি ঠুকে যায়, ভেঙে যেতেও পারে। সরীসৃপের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে বুকে হেঁটে দিনেশ চলেছে ডিউটি দিতে—পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরি।

নুড়ি ভরা পথটা শেষ হয়েছে। তারপর হঠাৎ একটা ঢালু। দিনেশ ঝুপ করে পড়ে গেল।

যেন একটা স্প্রিংয়ের গদি, একটা রামার গাদি। খনিকরের উপেক্ষিত কালো অভ্র রামা। রামা কালো বলেই অকেজো, কেউ ছোঁয় না। এ জায়গাটা তবু একটু সুপরিসর—চারটে দিক ঠাহর করা যায়। নইলে সুঁদের পথে একবার ঢুকলে মনে হয়—এ জগৎ যেন আয়তনতত্ত্বের বাইরে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু অশরীরী একটা প্রাণ অচরিষ্ণু পাথরের স্তর দীর্ণ করে এগিয়ে চলে—চাকরি

করতে।

দিনেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পাগুলো একবার টেনে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেন মেরুদণ্ডের আশ্রয়ে বসিয়ে দিল। সুঁদের পথ এবার আরও গভীরে ডানদিকে ঘুরে খাড়া নেমে গেছে। গুমোট বড় বেশি—কাছে কোন চানক নেই। টর্চ জ্বাললেও পথ পরিষ্কার দেখা যায় না। কোটি কোটি অভ্ররেণু স্তব্ধ ঝড়ের মতো পথ জুড়ে রয়েছে।

অনেকটা ঝুলে ঝুলে নামতে হয়। একটা দড়ি খুঁটোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, গতির বেগে দেহের ভার যেন আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। পাশে একটা চওড়া খুপরি। রেড়ির তেলের একটা পিদিম নিভে রয়েছে। একটা শূন্যগর্ভ তাড়ির ভাঁড়—কয়েকটা ভাঙ্গা গালার চুড়ি। নামার পথে দিনেশ এখানে রোজই একবার জিরিয়ে নেয়।

এই খুপরিটা যেন পাতালপুরীর একটা পান্থশালা। শুধু মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ী মানুষের নখবের আঁচড় নয়—প্রাণময় মানুষের কামনার শিলালিপিও লেখা রয়েছে এখানে।

দড়ি ধরে ধরে দিনেশ নীচে নেমে চললো। এই ধূলি ধাতু ও পাষাণের সংসারে সেও যেন পরমাণুর মতো লঘু হয়ে আসছে। মর্ত্যলোকের যত পাপ পুণ্যের সংস্কার এই অতল অন্ধকারের শাসনে খসে পড়েছে একে একে। মৃত্যু এখানে কত ঘনিষ্ঠ—তাকে প্রাণের মতই এখানেই অনুভব করা যায়।

গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধ। দিনেশের চাকুরির আস্তানা এগিয়ে আসছে। সুঁদের একটা সংকীর্ণ বাঁক—একটা কুঁয়োর মতো গর্তের মুখে এসে শেষ হয়েছে। হুম হুম হুম—একটানা একঘেয়ে একটা শব্দের গমক। পাষাণের হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন অন্ধকারের নিঃশ্বাস ছাড়ছে। আবার মনে হয়, লক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা ঘূর্ণি পাথরের পেটে বন্দী হয়ে আছে—ক্ষেপে ফেটে পড়তে চায়।

কুঁয়োর মুখে এসে ঝুঁকে তাকাতেই এই শব্দ তাণ্ডবের যেন একটা ছন্দোবদ্ধ অর্থ পাওয়া গেল। খনিমজুর বানিয়াতিদের গান। মেয়েকুলি ধারিদের কলহাস্য। খান হাতুরির আছাড়ের গুরু গুরু ধ্বনি। নুড়ির স্তূপের ওপর ছপ ছপ করে বেলচার টান পড়ছে। একেবারে নীচে একটা পিদিম—একটা আলোদানার চক্ষু যেন নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দিনেশ অন্ধ অজগরের মতো লাফিয়ে পড়লো হাত তিনেক নীচে—সাত নম্বর দরজা, দিনেশের ডিউটিস্থল।

বানিয়াতিদের গান আর খান ছেনির উদ্দাম সংঘর্ষ বন্ধ হলো। পিদিমে আরও খানিকটা তেল ঢেলে সলতে উস্কে দেওয়া হলো। জেলেকনাইটের ধোঁয়া ধূলা আর ঘোলা আলোর সেই নীহারিকার মধ্যে দিনেশের চোখে প্রথম ধরা দিল একটা হাসি হাসি মুখ—প্রতীক্ষমান এক জোড়া চোখের সার্থক দীপ্তি—বিলাসী।

বিলাসী একটা বেলচা কোলের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।—'আজ বড় দেরি হলো বাবু?'

বিলাসীর দিকে একবার তাকালো দিনেশ—হ্যাঁ, পাতালপুরীর মেয়েই বটে। ধূলায় রুক্ষ চুলের ওপর অজস্র অভ্রের কুচি চিক্‌চিক্ করছে—যেন একটা চুমকির জালি দিয়ে ঘেরা। নোংরা শতছিন্ন কালো রঙে ছোপানো একটা ধূলিকীর্ণ শাড়ি—রসাতলের এক তপস্বিনীর মূর্তি! ওরা হাড় দিয়ে পাথর ভাঙে। মর্ত্যলোকের নারীর মতো ওদের দেহ লালিত্যে লতিয়ে ওঠেনি। ধরিত্রীর এই তমসাবৃত জঠরলোকে ওদের অয়স্কান্তির কঠিন লাবণ্য কত নয়নাভিরাম তা এখানে না এলে কেউ বুঝবে না। এই পাষাণের ছন্দে ওদের যৌবন বাঁধা। যে কোন ক্লিওপেট্রাকে এখানে কুৎসিত প্রেতিনীর মতো মনে হবে!

কিন্তু দিনেশের মন আজ ছন্দ হারিয়েছে। বিলাসীর কথার উত্তর না দিয়ে কাজের হিসেব

নিতে মন দিল।

দুটো মেয়ে ধারি বেলচায় মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে আর ঘুমের ঘোরেই থুথু ফেলছে মাঝে মাঝে। মেয়ে দুটোর কণ্ঠনালি রবারের থলির মতো এক-একবার ফুলে উঠছে—বমির তোড় আটকাচ্ছে দাঁতে দাঁত দিয়ে।

বীভৎস। দিনেশ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিলাসী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। দিনেশ সরে গেল।

বানিয়াতি লোটন বললো, 'ওদের আজ হুঁস নাই বাবু। মানা করলাম তবুও শুনলো না। নেশা করেছে।'

দিনেশের-মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠলো, 'আর কে কে? নাম বল তো।'

'—আর চমন। একবার ঐদিক তাকিয়ে দেখ বাবু।' লোটন হেসে ফেললে।

চমন পাথরের গায়ে একটা খুপরির মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে রেখে চোখ বুঁজে ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। পাতালপুরীর কোন ভাস্কর যেন এক অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্তি রেখেছে খোদাই করে।

তিনজনের হাজরি কেটে দিয়ে দিনেশ আবার কাজের কথাই পাড়লো, 'একি? এতখানি ছাড় রেখে বিঁধ দিয়েছিস কেন?'

লোটন মুচকে হেসে বললো, 'বাবু, আর একজনের হাজরি কাটতে হয় তা হলে।'

দিনেশ—'আর কে?'

বিলাসীর মাথাটা নেশায় দুলছিল। দিনেশের মেজাজী গলার স্বর শুনে, মুখে আঁচল চাপা দিল ভয়ে। লোটন তেমনি মুচকে হেসে কাজের কথার উত্তর দিল, 'ওটা বাজা পাথর বাবু। বিঁধে কিছু হবে না। মিছা বারুদ নষ্ট হবে।'

টর্চের আলো ফেলে দিনেশ চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কোন দিকে কোন ভরসার চিহ্ন নেই। আজ সাত দিন ধরে কাজ হচ্ছে, দশ সের মালও ওঠেনি। জেলেকনাইটের করাল বিস্ফোরণে এই অন্ধ পাথরের বুক ফেটে এক-আধটু ধুলো চাপড়া ঝরে পড়েছে শুধু। মালিকের পয়সা নষ্ট হচ্ছে, এর পরিণাম কি হবে তা সেই জানে। এই পাতাল ঘেঁটে তাকে বার করতে হবে কোথায় অভ্রের রেতি—রত্নকায় সরীসৃপের মতো কোয়ার্টসের বুকে লুকিয়ে আছে। নইলে মাইনে ও মজুরী মুন্সীজীর খাতায় কালির আখরেই লেখা থাকবে, হাতে আর আসবে না।

দিনেশের মেজাজ ধারি ও বানিয়াতিদের কাছে আজ একটু অন্যরকম লাগলো। হুমকি হুকুমবাজি তো এখানে অচল। তা ছাড়া দিনেশবাবু অতি দিলদার লোক। ধারি বানিয়াতি আর ওভারম্যানের ধর্ম এখানে একই সঙ্গে সমাহিত ছিল পাতালিক প্রীতি বন্ধনে। আজ এই ব্যতিক্রম কেন?

আর বিলাসী? সে তো বেশ ভাল ফাক্‌নিক কাজ জানে, কারখানায় বসে অভ্র কাটলে রোজগার অনেক বেশি হতে পারে। তবু ধারি হয়ে ঝুড়ি ও বেলচা নিয়ে নেমেছে এই মৃত্যুময় অভ্রমরীচিকার গহ্বরে। যে সিফ্‌টে যত নম্বর দরজায় ওভারম্যান দিনেশের ডিউটি থাকে, বিলাসীও সেখানে থাকবে। খনিমহলে কথাটা আরও অবিদিত নেই। প্রত্যেক শ্রমিক ও শ্রমিকার কাছে ঐ দুজনের গল্প অনেকটা রূপকথার মতো, আলোচনা করতে বেশ মজাই লাগে। এর মধ্যে কিছুই অশোভন, কিছুই অসুন্দর নেই।

সেই দিনেশবাবু আজ কেমন যেন বিসদৃশ হয়েছে। বিলাসীর সঙ্গে একটা কথাও হলো না। লাঠি ও টর্চ হাতে দিনেশ আবার সিঁড়ির তলায় এসে দাঁড়ালো। '—তোরা আবার একটা বিঁধ দিয়ে আওয়াজ কর। দেখ, কপালে যদি কিছু থাকে। আমি ওপাশের ছোট গাড়াটা

একবার দেখে আসি।'

সিঁড়ি ধরে একটু ওপরে উঠে আসতেই দিনেশ পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বিলাসী।

'—একি ? তুই আসছিস কোথায় ?'

'—তোমার সঙ্গে।'

'—না, নিজের কাজে যাও।'

বিলাসী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল নিথর অভিমানের শিলীভূত মূর্তির মতো।

'—তালা নেবে ! খুব সস্তা ; খুব মজবুত। চোরে ভাঙতে পারে না, বউ পালাতে পারে না।'

দিনেশ চমকে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো—একটা ইরানী বেদে মেয়ে, যাদের তাঁবু পড়েছে তেঁতুলিয়া মাঠে। একটা বড় চামড়ার পেটি ঝুলছে কাঁখের ওপর—রকমারী পণ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

'—দেখছো কি ? তালা নেবে কি না বল ?' মেয়েটা সরাসরি দাওয়ায় উঠে একেবারে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো।

দিনেশ তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, এই সেই মেয়ে। সেই রেশমী চুলের বেণী—মাথায় সুলতান চাঁপা গোঁজা। হতভম্ব হয়ে ধরা গলায় দিনেশ আস্তে আস্তে বললো, 'কত দাম ?'

মেয়েটা এদিক ওদিক দু'বার তাকালো। ভুরু কুঁচকে কি ভাবলো। ছোট একটা পেতলের তালা তুলে ধরে বললো, 'দাম দশ টাকা।'

ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দিনেশ আর কোন কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে থেকে মেয়েটা আর একবার চেঁচিয়ে বললো, 'আচ্ছা, পাঁচ টাকা। না হয়, দু'টাকা। জিনিস চেন না বেকুব ?'

দিনেশের কানে কোন কথাই পৌঁছল না।

দুপুরের রোদ মাথার ওপর তেতে উঠেছে। দিনেশ তবু দাওয়ায় বসে আছে। আজকাল রোজই এইরকম হয়। বসে বসে দেখে তেঁতুলিয়া মাঠের চারদিকে তাতারসি কাঁপে—তৃষ্ণার ছবির মতো। বেদে মেয়েটা হন্তদন্ত হয়ে রোজই এ পথে তাঁবুতে ফেরে।—'পেলে টাকা ?' যাবার সময় জিজ্ঞাসা করে যায়।

দিনেশের ইচ্ছে হয় একবার ডেকে প্রশ্ন করে নামধামগোত্র। কেমন এই পথিক মানুষের দল, মেরুমরালের পাখার মতো পথের প্রেমে যাদের স্নায়ু শিরা সতত চঞ্চল। মহাদেশের গিরিদরিবন ধরে যায় আর আসে। ভাষা গান উৎসব সবই পথ থেকে কুড়িয়ে নেয়। যেখানে পায় তুলে নেয় নতুন পাপপুণ্য, নতুন রক্ত, নতুন ব্যাধি। দিনেশের জানতে ইচ্ছে হয়, ওরা কাঁদতে জানে কিনা। না শুধু হাসির ফুৎকারে জীবন উড়িয়ে নিয়ে যায় আয়ুর সীমানায়, ডাকতে সাহস হয় না দিনেশের।

'—আচ্ছা, এক টাকা। সস্তা করে দিলাম। এইবার রাজি হয়ে যাও।' নির্লিপ্তভাবে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মেয়েটা চলে যায়। দিনেশও আর বড় বিচলিত হয় না। যাযাবরীর এই নিত্য চতুরালি গা সহ্য হয়ে আসছিল।

গলায় চুনীর মালা আর ঘাঘরার শব্দে দিনেশকে সচকিত করে মেয়েটা এক দিন সামনে এসে ভালমানুষের মতো চুপ করে বসলো। মুখ ঘুরিয়ে নিল দিনেশ। শীগ্‌গির চলে গেলে হয়। এ সব অপ্রাকৃতিক জীব—ঘনিষ্ঠ না হওয়াই ভাল। কিন্তু বড় সুন্দর।

'—কি ? তাকাতে ভয় পাচ্ছ বুঝি ? কোন ভয় নেই, যত খুশি তাকাও।'

কথার মধ্যে কোন আবেগ নেই, তবু মোহ্ এসে পড়ে। দিনেশ তাকালো লজ্জা সত্ত্বেও।

'—একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার মেহেরবান!' মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

ক্লান্ত হবার কথা। দু'পায়ে পুরু ধুলোর ঢাকা পড়েছে। এই রৌদ্রে কতদূর ঘুরে এসেছে কে জানে। দিনেশ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো জলের জন্য। এক দুরন্ত বনহরিণী দোরে এসে তৃষ্ণার জল চাইছে তার কাছে।

গেলাসে জল নিয়ে বাইরে আসতেই দিনেশ দেখলো মেয়েটা নেই। রাস্তা ধরে নিজের মনে চলে যাচ্ছে। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েই খিলখিল করে হেসে উঠল।

দিনেশ সেদিন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে আজ ডেকে ওর পরিচয় নেবেই। রবিঅভ্রের মতো অমন সুন্দর চেহারা। ওর মধ্যে মানুষীর হৃদয় থাকবে না, এ কি করে হয়?

'—এই শোন, কাজের কথা আছে।' দিনেশ সহজস্বরে ডাকলো।

নকল ত্রাসে চোখদুটো বড় বড় করে মেয়েটা বললো, 'ওরে বাবা, যাব না। জুলুম করবে।'

দিনেশের প্রতিজ্ঞাটা যেন কিসের সংকোচে এলোমেলো হয়ে গেল, কিন্তু প্রত্যুত্তর তৈরী হবার আগেই মেয়েটা সটান চলে এল। বললো, 'আমাব নাম সারা, তুমি একটাও তালা কিনলে না। কত করে বললাম।'

হাসি মুখেই দিনেশ বললে, 'তোমার তালা কিনবার মতো লিয়াকৎ আমার নেই। আমি গরীব।'

সারার উদ্ধত দৃষ্টি যেন নরম হয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি কর। রোজগার কর না?'

'—অভ্রের খাদে কাজ করি।'

'—খাদে? ভেতরে নাম তুমি?'

'—হ্যাঁ, রোজই।'

'—তুমি আদমি নও। তুমি সাপ, নইলে গর্তে ঢোক কি করে?'

সত্যি এদের কথাবার্তার চালচুলো নেই। দিনেশ একটু বিরক্ত হয়েই চুপ করে গেল।

কতক্ষণ আনমনা হয়েছিল দিনেশ জানে না। হঠাৎ চোখে পড়লো সারা একাগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখছে—দুটি শান্ত মেয়েলী চোখের দৃষ্টি। দিনেশ খুশি হলো। সারার কণ্ঠস্বরে সত্যই মমতার আমেজও ফুটে ওঠে। বললো—'তোমার বিবি নেই?'

'—না।'

'এমন নওজোয়ান তুমি। বিবি নেই? আজব তোমার কাণ্ড!'

দিনেশের সাহস বেড়েছে, 'তুমি বিবি হবে!'

'—হব। বুড়া হলে কিন্তু পালিয়ে যাব।'

'—আর তুমি বুড়ি হবে না বুঝি?'

সারা ততক্ষণ উঠে ঝোলাঝুলি পিঠে তুলে তর্‌তর্ করে নেমে গেছে দাওয়া থেকে। ভুরু কুঁচকে মুচকি হেসে বলে গেল,—'এত দিল্লগী ভাল নয়। সাপ কাঁহাকা।'

আর একদিন সারা বললো—'তোমার সঙ্গে বসে বসে শুধু গল্প আর গল্প। আর পারবো না। আমার রোজগার খারাপ হয়ে গেছে। মালিক আমায় জবাই করে ছাড়বে, যদি জানে..।'

দিনেশ—'কি?'

সারা—'যদি জানে তোমার সঙ্গে মোহব্বৎ হয়েছে।'

দিনেশ চমকে উঠলো। —এ কি কথা বলে? মোহব্বতের কথা যাযাবরীর মুখে? হিমনদের মতো নিরাবেগ যাদের জীবনে হাসি কান্না উষ্মা অভিমান। পথে তুলে নেওয়া আর পথে ফেলে যাওয়া যাদের আনন্দ?

সারা—হ্যাঁ, মালিকদের কানে পৌঁছে গেছে। আমাকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছে। এ বেইমানীর সাজা কি জান তো? নেড়া করে তাড়িয়ে দেবে দল থেকে। বলবে—'যা তোর মাশুকের কাছে যা!' ওকে তো চেনো না, একটা কুর্দকসাই।'

সারার চোখ ছলছল করছে। হিমনদের গহনে অন্তঃশীল প্রবাহের কলক্রন্দন। সারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সারাই কথা বললো। গলাটা যেন একটু ধরে এসেছে। ওদের ভাষায় মিনতি নেই, চোখে দেখে বুঝে নিতে হয়। —'তুমি চল।'

'—কোথায়?'

'—আমার কাছে, আমার তাঁবুতে।'

'—তারপর?'

'—তারপর আর কি? থাকবে, ঢোলক বাজাবে।'

প্রস্তাব শুনে দিনেশ হেসে চুপ করলো। সারা বিস্ময়ের সুরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ কি হাসছো? জবাব নেই?'

দিনেশ তেমনি একটা ভারিক্কি হাসি হেসে বললো, 'আচ্ছা সে হবে হবে।' যেন কোন দোজবরে বাঙ্গালী স্বামী তার দ্বিতীয় পক্ষের একটা ছেলেমানুষী বায়না মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা করছে।

সারার দৃষ্টিও প্রখর হয়ে এল। আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'কি, জবাব দিলে না?'

আবার সেই ন্যাদারে ভালমানুষী হাসি। দিনেশ শুধু বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় জবাব দেব।'

সারা মাঠের পথে নেমে পড়লো।

সারা ভালবেসেছে। এতদিন পরে সত্যিকারের ট্রফি লাভ হয়েছে দিনেশের। জীবনের সবচেয়ে বড় বঞ্চনার ক্ষতে এতদিনে যেন একটু জ্বালাহর প্রলেপ পড়লো। তার পৌরুষের তোরণে এসে ইরাণী যাযাবরীর চিত্ত সকল উদ্‌ভ্রান্তি ঘুচিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। নতুন করে যেন মধ্য এশিয়া জয় করলো সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

মনে পড়লো বিলাসীর কথা। ওর ওপর মমতা হয়। দু'দিকের দুই আহ্বান। বিলাসী ডাকে মৃত্যুর গহনে, আর সারা ডাকছে জীবনের খরস্রোতে। সারার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে এক স্বর্গঙ্গার কলরোল শুনতে পায় দিনেশ, শুধু ভেসে চলে যাবার আহ্বান। কিন্তু বিলাসীর কালো চোখ তাকিয়ে আছে নিঃসঙ্গ ভোগবতীর অতল থেকে, যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে যেতে ডাকছে বার বার।

সারা এসে বিষণ্ণভাবে বললো, 'কেমন আছ? আমাদের দিন ফুরিয়ে এল। এবার তাঁবু উঠবে। আর কি? এবার একদিন এসে শেষ সেলাম জানিয়ে যাব।'

দিনেশের বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে সারা কোন মতে হাসি চেপে রাখলো।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দিনেশ সেদিনের মতো ঘরোয়া কথা পাড়লো, যার ঘর নেই তার সঙ্গে। '—তোমার বাড়ি কোথাও একটা ছিল তো? সে কোথায়? ইরাণ?'

'—আমি ইরাণী নই। আমি জহান-কি-রানী।' খিলখিল করে হেসে উঠলো সারা।

তারপর সহজভাবে ভাটের ছড়ার মতো নিরর্গল কথার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চললো

দিনেশকে। 'আমি তাজিকের মেয়ে, বাবা আমাকে বেচে দেয় এক খোরাসানী সদাগরের কাছে। হিন্দুস্থানে আসতে আজাদ এলাকার তোচিখেল বদমাসেরা আমাদের লুট করে। বড় বেইজ্জত হয় আমার। আমাকে তারা ধরে নিয়ে যায়। তারপর পেশোয়ার বাজার।'

সারার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেছে। ঘাঘরার ধুলোর মতো সমস্ত স্মৃতিভার সে যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে কথা বলে বলে।

—পেশোয়ারে বাজারে আমাকে তারা বেচে দিলে পাঁচ আফগানীর বদলে—মিয়াঁওয়ালী বেদিয়াদের কাছে। তারপর কানপুর। অসুখে ভুগে খোঁড়া হয়ে গেলাম। মিয়াঁওয়ালীরা বেচে দিল কঞ্জরহাটিদের কাছে—একটা মুর্গীর দামও তারা পায়নি। রোগা শুকনো খোঁড়া মেয়েমানুষ, কিই বা তার দাম হতে পারে? সেই থেকে আমি এই কঞ্জরহাটির তাঁবুতে। তারা নাচিয়ে নাচিয়ে আমার খোঁড়ামি ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। আর ভাল লাগে না, তবে বেইমানি করে চলে যেতেও পারি না। ভাল লোক যদি কেউ আবার কিনে নিত।'

একটা আপসোসের শব্দ করে সারা চুপ হলো।

'—তুমি আমায় কিনে নাও। যতদিনের জন্য ইচ্ছে কিনে নাও। যেদিন খুশি ছেড়ে দিও। কিছু টাকা দিলে মালিককে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি।' উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠলো সারার মুখ।

এ প্রখর অনুরোধের আঘাতে দিনেশের নিরেট ভালমানুষী ভীরুতা একটু নাড়া খেল যেন। অধৈর্যে কাতর সারার গলার স্বর। —'তবু তুমি ভাবছো? না হয় পরে আমায় আবার বেচে দিও। এমন নওজোয়ান মরদ, টাকা জোগাড় করতে পার না? ইচ্ছে করলে এক রাত্রে তুমি হাজার টাকা আনতে পার। আমি চললাম। সেলাম।'

সারা উঠতেই দিনেশ তাকে ধরে বসাতে গেল। সারা দু'পা পিছিয়ে বললো—'ব্যস, ছুঁয়ো না। আমাকে ছোঁবার কোন হক্ নেই তোমার।'

দিনেশ—'এই তোমার মোহব্বত?'

সারার গলার স্বর যেন কাতরতায় আকুল হয়ে উঠলো—'তুমি বোঝ না অন্ধ। এই মোহব্বতের জন্য আমায় সাজা পেতে হবে। প্রাণ যেতেও পারে। রোজগার নষ্ট করে তোমার সঙ্গে দোস্তি করেছি। মালিক সব কথা জানে। আমায় বাঁচাও।'

'—ভয় নেই সারা। আমি টাকা আনছি দু'তিন দিনের মধ্যেই। পাকা কথা দিলাম।'

'—জিতা রহো মাশুক মেরা! আমায় উদ্ধার করো। মালিকের দেনা শোধ করে দিয়ে আমি চলে আসি তোমার কাছে।'

সারার মুখ কৃতার্থতার হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ বিদায় নেবার সময় দিনেশকে একটা ছোট সলজ্জ আদাব জানিয়ে গেল। পথে নেমে চামড়ার ঝোলা থেকে বার করলো একটা নাসপাতি। গুন গুন করে চাপা গলায় গান ধরে, নাসপাতি খেতে খেতে তেঁতুলিয়া মাঠের পথে হেলেদুলে চলে গেল।

টাকা চাই। কন্যাপণ। এই পরম নির্বন্ধের জন্যই দিনেশের নির্বাসিত যৌবন অপেক্ষায় বসে ছিল শুধু। বরপণের দেশে তাইতো সে পুরুষের মর্যাদা পায়নি।

ভালই হয়েছে। বীর্যশুল্কা যাযাবরীর চিত্তজয়ের আমন্ত্রণ এসেছে তারই কাছে। মধ্যযুগের ক্ষত্রপ প্রেমিকের মতো আত্মপ্রসাদে দিনেশ যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

বিলাসী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সেদিনের আচরণের কথা স্মরণ করে দিনেশ অনুতপ্ত।

'—আয় বিলাসী, তোকে ছাড়া কাজ চলবে না আমার। একটা শক্ত কাজ আছে।'

এই আহ্বানের জন্যই বিলাসীর অন্তরাত্মা উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। অনেকদিন আগেই এ আহ্বান শোনার দাবী ছিল তার। যার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে থাকতে চায় সে, তারই কাছে।

আর কারও কাছে নয়। যার হাত ধরার জন্য রোজগার, কুলমান, কুটীরসুখ ও আলো-বাতাসের মায়া ছেড়ে নেমে এসেছে এই অতলতার অমারাজ্যে, যেখান মরণ ও মিলন মিশে আছে একাকার হয়ে।

যে সিঁড়ির কাছে সেদিন বিলাসীকে থামিয়ে দিয়েছিল দিনেশ, সেখান থেকেই আজ আবার শুরু হলো যাত্রা। কোথায় কোন্ লক্ষ্যে, বিলাসী তা জানে না। তার জানবার প্রয়োজন নেই।

দিনেশের প্ল্যান ঠিক ছিল। বেলচা, শাবল, গুল্‌লা টোপি আর রেড়ির তেলের পিদিম নিয়ে তারা অগ্রসর হলো।

ছোট বড় নানা সুঁদের বাঁক ঘুরে ঘুরে একটা ছোট খাদের কাছে এসে দিনেশ ও বিলাসী দাঁড়ালো। টর্চের আলো ফেলে ধীরে ধীরে চারদিকে দেখে নিল। বিলাসীর বেলচা দিয়ে দিনেশ ক'বার আঘাত দিতেই একটা ফাটল ধরা পাথরের চাপ খসে পড়লো ঝুপ করে।

উৎকট উল্লাসে দিনেশ চেঁচিয়ে উঠলো—'দেখছিস বিলাসী ?"

—'হ্যাঁ'

বিলাসী দিনেশের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের তারা দুটো তারই দিকে স্থির নিবদ্ধ, লুব্ধক জ্যোতি জ্বলজ্বল্ করছে।

'—এই দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। খুব সাবধান বিলাসী। কেউ যেন না জানে। মাত্র তিনটে বিঁধে খসে পড়বে হাজার টাকার মাল। পশ্চিমের চানক দিয়ে তুই মাল পার করে দিবি। ওপরের জঙ্গলে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। উপায় নেই বিলাসী, করতেই হবে, আমার টাকা দরকার।'

সারি সারি গোরিয়া পাথর যেন ভরসার স্তরের মতো এখানে এসে পৌঁছেছে। দেখা যাচ্ছে কাজরা পাথরের চাপ—তিল-চিহ্নখচিত সুলক্ষণা গোরী ললনার গালের মতো। তারপব এই যোগিনিয়া পাথরের তিলকুট—রাঙা পাষাণীর কটাক্ষে রত্নলোকের ইসারা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। '—এই নে গুল্‌লা টোপি। বিঁধে ফেল্ বিলাসী।' দিনেশ পকেট থেকে জেলেকনাইটের মোড়কটা নামালো।

শাবল দিয়ে একটা জায়গা বিঁধে আওয়াজ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফিউজের বাতিটা ধীরে ধীরে পুড়ে ক্ষয় হচ্ছে। একটা ভূমিকম্পের বীজ যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে মহাপরিণামের দিকে।

দিনেশ ডাকলো, 'আমার কাছে সরে আয় বিলাসী। এবার আওয়াজ হবে।'

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আর্ত প্রস্তরপুঞ্জের শিহর আর ধোঁয়ার উৎপাত থামলো। দশটা মিনিট দিনেশ আর বিলাসীর কাটলো মূহ্যমান অবস্থায়। দিনেশ উঠে দাঁড়াতেই তার হাতটায় টান পড়লো। বিলাসী ধরে আছে।

আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে দিনেশ বিঁধের দিকে তাকালো—দুই চোখে তীব্র ঔৎসুক্যের জ্বালা। দিনেশের গলা থেকে আর একটা উন্মাদ আনন্দের বিস্ফোরণ ফেটে পড়লো। 'ঐ দেখ্ বিলাসী।'

কাজরা পাথরের একটা চাপ খুলে গিয়ে অভ্রের টিকরি ঝক্ ঝক্ করছে—প্রাক্ পুরাণিক কোন কুবেরের রত্নীভূত পাঁজর সাজানো রয়েছে স্তরে স্তরে।

'—চললাম বিলাসী। আজ সন্ধেয় চানকের মুখে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। তুই অন্তত দুটো বোঝা পার করে দিস্। আমি বন্দোবস্ত করতে চললাম।'

বিলাসী দাঁড়িয়ে রইলো নির্বোধের মতো। দিনেশ সত্যিই চলে যায় দেখে ডাকলো, 'বাবু!'

'—কি ? না আর দেরি করিস্‌নি।'

'—ও চানক পার হব কি করে বাবু!'

'—খুব পরিষ্কার রাস্তা। খাড়া উঠে যাবি।

দিনেশের টর্চের আলো সুঁদের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'—ও চানকে গ্যাস আছে বাবু।' কিন্তু বিলাসীর এই আর্তস্বরের আবেদন দিনেশের কানে পৌঁছল না।

টাকার তোড়াটা তোরঙ্গে রেখে দিনেশ ঘরের বাইরে একবার পায়চারি করে গেল। তেঁতুলিয়া মাঠে ঢোলকের বাজনা মেতে উঠেছে। লণ্ঠনগুলোতে ঝড়ের আঁচ লেগে দপ দপ করছে, যেন কতগুলি আগুনের কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ।

বিলাসী গ্যাস লেগে জখম হয়েছে খুব। সংজ্ঞাসীন অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। হয়তো এই শেষ, আর চোখ মেলে তাকাবে না বিলাসী। এ খবর শুনেছে দিনেশ, খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। এটা যেন অবধারিত সত্য ছিল।

দুঃখ পেয়ে গেল বিলাসী নিজের দোষে। ওর অন্ত্যজ অনুরাগের মধ্যে যেন একটা সহমরণের তৃষ্ণা লুকিয়ে ছিল। বিংশ শতাব্দীর রুচিমান দিনেশ চৌধুরী অত নীচে নামতে পারে না। নিশ্চিহ্ন হতে পাবে না। বিলাসীর জন্যে দুঃখ হয়, অন্য সময় হলে বোধ হয় কান্নাও আসতো।

কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে নেশার মতো একটা সুখাবেশ স্নায়ুজালে জড়িয়ে ধরেছে আজ। বাহিরের মৃদুঝড়ে বাসক রাত্রি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সারার আসবার সময় হলো। মুক্তির মুহূর্ত আসছে এগিয়ে। প্রতি দণ্ড পল অনুপল গুণছে দিনেশ।

খুটখাট শব্দ। চোর এসেছে। ঘস্ ঘস্ ঘাঘরার শব্দ। চুণীর মালাটা বেজে উঠছে ঘুমন্ত পাখীর কলালাপের মতো। দিনেশের কায় মন প্রাণ সার্থক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার ওপর নিস্পন্দ হয়ে বসে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে—নিষ্পলক চোখে।

চোরের আবছায়া মূর্তিটা ঘরে ঢুকলো—মাজরীর মতো পদশব্দহীন। তোরঙ্গের ডালাটা কঁকিয়ে উঠলো একবার। কচ্‌কচ্ করে উঠলো টাকার তোড়াটা। দিনেশ চোখ দুটো একবার রগড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে অনেকগুলি সাপের শিষের সংকেত তীব্র শব্দের শিহর তুলে বেজে উঠলো একসঙ্গে। চোরের আবছায়া মিলিয়ে গেল ধোঁয়া হয়ে।

কতটুকু ক্ষতি

আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন হন্তদন্ত হয়ে স্বাক্ষর পত্রিকার অফিসে ঢুকলো। শ্রীমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবু বুঝলেন—পর্ব্বতো বহ্নিমান্। এই রুচিমান শিল্পীর নিষ্ঠার পর্বতে কোন্ বহ্নির স্পর্শ দাবানল সৃষ্টি করেছে, অভিজ্ঞ সম্পাদক অক্ষয়বাবুর কাছে সে রহস্য অজানা ছিল না। আর্টিস্ট শ্রীমন্তকে তিনি আজ চার বছর ধরে এই মূর্তিতেই দেখে আসছেন। মিষ্টি কথার বর্ষা নামিয়ে এই উত্তপ্ত মূর্তিকে কিভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে পারা যায়, সেই কৌশল তাঁর কাছে চার বছরের নিয়মিত চর্চায় এখন নিছক একটা অবলীলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যতই রাগে গর্জন করুক্, ভয় দেখাক্, অনুরোধ করুক—সম্পাদক অক্ষয়বাবু বিচলিত হন না কিছুতেই। কিন্তু আর্টিস্টি শ্রীমন্ত এত বিচলিত হন কেন? কেন

আজ চার বছর ধরে একটা বিক্ষোভের ঝড়ে তার মনের শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে আছে ?

শ্রীমন্ত আর্টিস্টের বিদ্রোহী মূর্তিটা একটা চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবুকে যেন চ্যালেঞ্জ করলো।—আবার আপনি ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তের তোলা একটা লক্কড় ফটো ছেপেছেন ! বিজয় ফটোগ্রাফারের এলবামটাকে যদি আপনি একটি রত্নদীপ মনে করে থাকেন, তবে তাই করুন ; কিন্তু আমাদের বাদ দিন। প্রতি মাসে ঐ এলবাম থেকে এক একটি ঘুঁটে পোড়ানো রত্ন দিয়ে আপনার স্বাক্ষরকে সাজিয়ে বার করুন। আর্টিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিন। বাস্—স্বাক্ষরকে যদি রাখতে হয়, তবে এক নৌকায় পা দিতে শিখুন। তেলে জলে মেশাবার চেষ্টা করবেন না। হয় আর্টিস্ট নয় ফটোগ্রাফার—এর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। বলুন।

উত্তরে সম্পাদক অক্ষয়বাবু মৃদু হেসে যথাসৌজন্যে শুধু সিগারেটের ডিবেটা শ্রীমন্তের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন।—আসুন।

একটা সিগারেট অবশ্য তুলে নিল শ্রীমন্ত, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে প্রসঙ্গ থেকে সহজে রেহাই দিল না।—না অক্ষয়বাবু, আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই আপনার উদ্দেশ্য কি ?

উদ্দেশ্য ? অক্ষয়বাবু তাঁর সম্পাদকীয় জীবনে এই প্রথম একটা অদ্ভুত কথা শুনলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যেন একটা প্রচণ্ড ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছে। উদ্দেশ্য ? সম্পাদকের উদ্দেশ্য ? পত্রিকার উদ্দেশ্য ? আজ চার বছর ধরে স্বাক্ষরের মতো বাংলা পত্রিকার অন্তর্লোকে আনাগোনা করেও যে-মানুষ এখনো পত্রিকার উদ্দেশ্য জানবার কৌতূহল রাখে, তার জন্য কার না দুঃখ হয় ? সত্যি, শ্রীমন্তের জন্য বড় দুঃখে হাসছিলেন অক্ষয়বাবু।

শ্রীমন্ত বললো—সমাজ সাহিত্য ও শিল্প প্রচারেব পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন, অথচ একটা নীতি, একটা লক্ষ্য, একটা রুচি...... ।

একটা সমবেদনাব উচ্ছ্বাসেই বাধা দিয়ে অক্ষয়বাবু বললেন—আছে আছে, সব আছে শ্রীমন্তবাবু।

শ্রীমন্ত—ফটোর নীচে আবার লিখে দিয়েছেন—ফটোশিল্পী বিজয় গুপ্ত। ছি ছি, কী ভাল্গারিজ্ম্ মশাই। ফটোগ্রাফার হলো শিল্পী। আরশুলা হলো পক্ষী ? কুত্তার নাম বাঘা ? কানাব নাম পদ্মলোচন। মোষের নাম মহাশয় ?

অক্ষয়বাবু—চা খাবেন ? তার সঙ্গে টোস্ট ? মরিচ দিয়ে ? কেমন ?

বহ্নিমান্ শ্রীমন্ত একটু স্তিমিত হয়ে এল। অনুযোগের সুরে বললো—না, এসব বড় অন্যায় করছেন অক্ষয়বাবু। না দেখছেন পত্রিকার প্রেস্টিজ, না দেখছেন আমাদের মানসম্মান ! কী পদার্থ আছে ঐ ফটোতে ? বিজয় গুপ্তের তোলা ফটো, তার নাম আবার—'ফাগুন লেগেছে বনে বনে।' হাসালেন অক্ষয়বাবু !

অক্ষয়বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—অবশ্য আপনাকে জানাতে বাধা নেই, ঐ ফটোটার খুব demand হয়েছে। নিউ-ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি আজই এসে ফটোগ্রাফারের ঠিকানা নিয়ে গেছে—ওরাও ফটোটা ছাপাতে চায়।

শ্রীমন্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে উঠলো—এই তো ! এইখানেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের দেশের যা-কিছু বিদ্ঘুটে, বিদেশীদের কাছে তারই আদর বেশি। আজগুবি না হলে ওরা পছন্দই করবে না। নইলে ধরুন, 'বন্যমাজরীর প্রেমাবেশ' নামে মিস্ তরুলতা মজুমদারের এমন উঁচুদরের নৃত্যটা বিদেশীদের কাছে কোন আদরই পেল না। অথচ, জংলী সাঁওতালী নাচ দেখে ওরা মগ্ন হয়ে যায়। বিদেশী রুচির কথা আর বলবেন না। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ওরাই বিজয় গুপ্তকে চিনেছে।

অক্ষয়বাবু কিছু একটা বলবার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট আবার

প্রশ্ন করলো—একটা ফটোর জন্য কত দক্ষিণা দেন বিজয় গুপ্তকে ?

অক্ষয়বাবু—সাড়ে চার টাকা।

শ্রীমন্ত বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকালো। —সাড়ে চার টাকা ! লোকে তিন আনা পয়সা খরচ করে ষোল নম্বর বাসে চড়ে গড়িয়া পৌঁছে একটা খালের ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালেই স্পষ্ট দেখতে পাবে—ফাগুন লেগেছে বনে বনে। তার জন্য সাড়ে চার টাকা ? অপব্যয়।

ফটোর মূল্য সাড়ে চার টাকা শুনে মনে মনে একটু খুশি হয়ে উঠছিল শ্রীমন্ত। অক্ষয়বাবু কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানছিলেন এবং দুঃখ করছিলেন—বিজয় গুপ্তকে গুণে গুণে দশটি টাকা দিতে হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় স্ট্র্যাটেজি নামে একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল আছে। দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি দ্বন্দ্বী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগ্রহের ওপর প্যাঁচ দিয়ে একটি তত্ত্বকে সফল করে তুলতে জানেন অর্থাৎ অল্পে সুখমস্তি।

সুতরাং অক্ষয়বাবু আবার আরম্ভ করলেন—আপনার আঁকা ছবিটার মর্ম কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না শ্রীমন্তবাবু। অবশ্য পিওর আর্ট বোঝবার মতো লোক এই পোড়া বাংলা দেশে......।

শ্রীমন্ত বাধা দিল—কী বলছেন অক্ষয়বাবু ? পৃথিবীতে যাঁকে একমাত্র সত্যিকারের আর্ট-সমালোচক বলে জানি, সেই অধ্যাপক ত্রিদির ভট্চাজ এই ছবি সম্বন্ধে কী লিখেছেন জানেন ? তিনি লিখেছেন—'এই ছবির মধ্যে যে অব্যয়ীভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বদেশের ও সর্বযুগের রস। সৃষ্টি একদিন মুছিয়া যাইবে, কিন্তু শিল্পী শ্রীমন্ত সেনের আঁকা এই অত্যাশ্চর্য ছবিটির আত্মার কখনো বিনাশ হইবে না।'

উৎসাহিত হয়ে অক্ষয়বাবু বললেন—ঠিক কথা। খাঁটি কথা। এতক্ষণে জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগে এতটা বুঝতে পারিনি। ছবির নাম দিয়েছেন—'স্বর্গীয় মদের ফেনা', অথচ আকাশে একটা ভাঁড়ের মতো জিনিস উপুড় হয়ে রয়েছে।

শ্রীমন্ত—হ্যাঁ, ওটা হলো চাঁদ।

অক্ষয়বাবু—আর ভাঁড়ের মুখ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উথ্‌লে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে কেন ?

শ্রীমন্ত —হ্যাঁ, ওটা হলো জ্যোৎস্না।

অক্ষয়বাবু—আশ্চর্য, আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি শ্রীমন্তবাবু। কী যে বলবো, শুধু বলতে ইচ্ছে করছে—আশ্চর্য। হ্যাঁ, আপনার প্রাপ্য দক্ষিণাটা নিয়ে যান। এই নিন—আট টাকা দিলাম আপনাকে।

শ্রীমন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ প্রতিবাদ করার মতো কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। —আট টাকা ? বেশ তাই দিন। একটু ইতস্তত করে টাকা কয়টা পকেটে পুরে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে বের হয়ে এল শ্রীমন্ত।

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন অক্ষয়বাবু। ঘরে ঢুকলো ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। দ্বিতীয় কিস্তি একটা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন অক্ষয়বাবু।

বিজয় গুপ্ত বললো—আবার আপনি জলছবি ছাপতে আরম্ভ করেছেন ! স্বাক্ষরের সুনাম আর রইল না। আপনার পত্রিকা উঠে যাবে, অবধারিত।

অক্ষয়বাবু বিস্ময়ের ভান করে প্রশ্ন করলেন—জলছবি ?

বিজয় গুপ্ত—হ্যাঁ স্যার, শ্রীমন্ত আর্টিস্টের আঁকা ছবি। কী হয়েছে ওটা ? স্বাক্ষরের মতো কাগজে যদি ঐসব রঙীন রাবিশ ছাপান, তবে আমাদের বাদ দিন। আর্টিস্টদেরই মাথার মণি করে রাখুন আপনি।

অক্ষয়বাবু লজ্জায় জিভ কাটলেন। —ছিঃ, ওরমক করে বলবেন না বিজয়বাবু। বিদেশের গুণী আর রসিকেরা শ্রীমন্ত সেনের ছবির কদর জানে। আজই নিউ ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি এসে 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' ছাপবার জন্য তিনশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে শ্রীমন্ত সেনের অনুমতি নিয়ে গেছে। অথচ আমরা ঐ ছবির কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছি, পাঁচটি টাকা মাত্র। এই তো ?

বিজয় গুপ্তের উত্তেজনা হঠাৎ কেমন মিইয়ে এল। নেহাত অজ্ঞাতসারেই একটা সমবেদনার আভাস যেন তার কথার মধ্যে ফুটে উঠলো—মাত্র পাঁচ টাকা, সে কী অক্ষয়বাবু ?

অক্ষয়বাবু—হ্যাঁ বিজয়বাবু, এমন একজন আর্টিস্টের আঁকা ছবির মূল্য পাঁচ টাকার বেশি দেবার সামর্থ্য নেই আমাদের। আর ধরুন, সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনারা অর্থাৎ ফটোগ্রাফারেরা যা করেন, তার মধ্যে আর্ট বলে জিনিসের বালাই নেই। ভাল ক্যামেরা, ভাল ফটো—ব্যস, আপনাদের কাজ হলো যন্ত্রের কাজ। তবু আপনার দক্ষিণা...।

বিজয় গুপ্তের সারা মুখে একটা রক্তাভ উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর নিন্দা বরদাস্ত করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিজয় গুপ্তকে তাঁর ফটোগ্রাফার গুরু শিখিয়ে দিয়েছেন—ফটোগ্রাফী যন্ত্রের খেলা নয়, ফটোশিল্পীরাও শিল্পী, বরং তারাই নতুন যুগের শিল্পী। গুরুদত্ত সেই বাণীকে সম্পাদক অক্ষয়বাবু নিন্দে করে ভয়ানক ভুল করছেন। ফটোগ্রাফীর নিন্দা—এখানে কারও কাছে হার মেনে কোন আপস করতে রাজী নয় বিজয় গুপ্ত। নেহাত সহ্য করতে না পেরেই বিজয় গুপ্ত বললো—কথাগুলি সংযত করুন অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়বাবু—বেশ বেশ, মাপ করবেন। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম আর্টিস্ট যেমন কল্পনাকে রূপ দিতে পারে...

বিজয় গুপ্ত—ফটোশিল্পী বাস্তবের রূপ ধরে দিতে পারে।

অক্ষয়বাবু—আর্টিস্টের তুলিতে যেন একটা অতীন্দ্রিয় রোমান্স আছে।

বিজয় গুপ্ত—ক্যামেরার সেলুলয়েডের চোখে সত্যের রোমান্স আছে।

অক্ষয়বাবু—আর্টিস্টরা...

বিজয় গুপ্ত বাধা দিয়ে বললো—আর্টিস্টরা বস্তুর ওপর মিথ্যার রূপ দেয়। ওটা রঙের ছলনা।

অক্ষয়বাবু—তাহলে ফটোগ্রাফারেরা...।

বিজয় গুপ্ত—ফটোগ্রাফারেরা মিথ্যার আবরণ সরিয়ে দিয়ে বস্তুর রূপ খুলে দেয়।

অক্ষয়বাবু আবেগভরে বলে উঠলেন—আশ্চর্য, আপনি আমাকে আশ্চর্য করে দিলেন বিজয়বাবু। এভাবে আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি। আপনার কথায় বুঝলাম সত্যিই আপনারা—কী বলবো ! আপনারা হলেন—আর্টিস্টরূপী শশক-জম্বুক সঙ্কুলিত মানব অরণ্যের শিল্পীকেশরী।

বিজয় গুপ্ত শান্ত হয়ে বললো—আজকের মতো উঠি।

সিগারেটের ডিবেটা এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে সম্পাদক অক্ষয়বাবু বললেন—আসুন। সেই প্রতিযোগিতার কথা স্মরণে রেখেছেন তো ? উঠে পড়ে লাগুন এইব্যার, আর যে সময় নেই।

চলে আসবার আগে বিজয় গুপ্ত উৎসাহিত ভাবেই উত্তর দিল—নিশ্চয় মনে আছে। আসি, নমস্কার।

কোনো একটি দেশকল্যাণ সমিতি থেকে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে আর্টিস্ট এবং ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে। —'অনশন ও বুভুক্ষার ফলে মানবতার চরম ক্ষতি কি

হইতে পারে, এই বিষয়ে যে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র অথবা তোলা ফটো সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে, সেই শিল্পীকে মাতৃমঙ্গল সমিতি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।'

স্বাক্ষর পত্রিকার তরফে সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী অক্ষয়বাবু অতিরিক্ত আরও একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রতিযোগী শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং তোলা ফোটো—সবই আগামী সংখ্যা স্বাক্ষরের কলেবর অলংকৃত করে প্রকাশিত হবে।

আর্টিস্ট বনাম ফটোগ্রাফার—প্রতিযোগিতাই শেষাশেষি একটা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মতো হয়ে দাঁড়ালো। বহু আর্টিস্ট যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সবচেয়ে বড় ভরসা শ্রীমন্ত সেন। শ্রীমন্তের হাতের তুলি দুর্বল নয়, তার কল্পনা অনুজ্জ্বল নয়। তার রঙে কত ব্যঞ্জনা, রেখায় কত দ্যোতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট চুপ করে বসে নেই। তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে সংহত করে স্টুডিওর নিরালায় বসে এক রকম ধ্যানস্থ হয়ে আছে শ্রীমন্ত। রাত জাগতে হচ্ছে—স্নানাহার করতে ভুলে যাচ্ছে। আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব শ্রীমন্ত সেনের ওপর পড়েছে।

ফটোগ্রাফারেরাও কম উতলা হয়নি। ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গেছে তারা। নিজের নিজের জয়-পরাজয়ের কথা তারা ভাবে না। তারা শুধু কায়মনে প্রার্থনা করে ফটোগ্রাফার সম্প্রদায়ের জয় হোক। অর্থাৎ বিজয় গুপ্তের জয় হোক্। বিজয় গুপ্তকে তারা শতভাবে প্রেরণা দিয়ে বলেছে—আমাদের মান সম্মান আপনার হাতে বিজয়বাবু। জলছবিওয়ালাদের কাছে যদি হেরে যাই, তবে এ জীবনে ক্যামেরা আর স্পর্শ করবো না।

বিজয়কে তারা রোজই দেখছে। সকাল হতেই কাঁধেই ক্যামেরা ঝুলিয়ে পথে বের হয়ে পড়ে বিজয় গুপ্ত। কোন ত্রুটি করছে না সে। খোলা আকাশ, প্রভাতের সূর্যালোক, সন্ধ্যার রক্তিম মেঘ, কলকাতার উত্তপ্ত পথের রৌদ্রজ্বালা—এই তার স্টুডিও। ফুটপাতে, গাছতলায় বস্তির অন্তরে—পথে প্রান্তরে মানবতার সেই চরম ক্ষতির দুর্লক্ষ্য চিহ্ন আবিষ্কার যাত্রায় বের হয়েছে বিজয় গুপ্ত। ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

স্বাক্ষর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। একটা তীব্র ঔৎসুক্যের স্পন্দন শত শত গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর মনের অনুভব ছেয়ে রেখেছে ঠিক এই মুহূর্তটিতে। সদ্য প্রকাশিত স্বাক্ষরের পাতা উল্টিয়ে দেখছেন সমালোচকেরা। গ্রাহকেরা দেখছেন সাগ্রহে। মেসে বোর্ডিংয়ে ছাত্র হোটেলে লাইব্রেরীতে কৌতূহলী পাঠকের মাথার ভীড় স্বাক্ষর পত্রিকার ওপর ঠোকাঠুকি করছে। পরীক্ষকেরা প্রতিযোগী শিল্পীদের নামের তালিকা হাতে নিয়ে নম্বর দিচ্ছেন একে একে—ঠিক এই মুহূর্তটিতে।

প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই দর্শকের চোখের ওপর একটা বিচিত্র বর্ণরাগের আলিম্পন ঝক্‌ঝক করে ওঠে। আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবি। দর্শকদের মনের গহন থেকে আপনা-আপনি একটা করুণতম আক্ষেপধ্বনি উৎসারিত হয়—আহা! যাঁরা একটু আবেগপ্রবণ তাঁদের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কী করুণ এই ছবি!

—পথের পাশে একটি গাছের ছায়ায় এক ক্ষুধাজীর্ণ ভিখারিণী বসে আছে। তার কোলে একটি মুমূর্ষু শিশু। শিশুটির অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। অস্থিসার ভিখারিণী মাতার বুকে শিশুপ্রাণের পানীয় সেই জীবতুষ্টির ধারা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুমূর্ষু শিশুর তৃষ্ণার্ত অধর শুধু শেষ বিদায়ের আক্ষেপে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর ভিখারী মাতার চোখ থেকে একটি দুটি করে তপ্ত মুক্তার মতো জলের ফোঁটা ঝরে পড়েছে শিশুটির অধরে।

ব্যর্থ মাতৃত্বের একটি সুকরুণ দৃশ্য। সার্থক ছবি। কোন সন্দেহ থাকে না, আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের জয়মাল্যের পুরস্কার অবধারিত।

পরীক্ষকেরা পাতা উল্টিয়ে যান। পর পর কত ছবি, কত ফটো বিচিত্র পটক্ষেপের মতো পাঠক ও দর্শকদের চোখের উপর দিয়ে চকিতে পার হয়ে যায়। কোন ছবি, কোন ফটো মনে ধরে না পরীক্ষকদের। শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবির তুলনায় সবই নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তের তোলা ফোটো। শুধু পরীক্ষকেরা নয়, ঠিক এই মুহূর্তটিতে গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর দল ঠিক এমনিভাবে ফটোর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। যুগ যুগান্তরের প্রত্যয়ে লালিত একটি মোহ রূঢ় আঘাতে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রূপকথা নয়, কল্পনা নয়, কিংবদন্তী নয়, কলকাতার পথের ওপর কুড়িয়ে পাওয়া একটি নিরলঙ্কার ছবি।

—এক শিশু সেবা-প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে গাছের তলায় এক ভিখারী মাতা বসে আছে। তার কোলের ওপর মুমূর্ষু শিশু সন্তান। শিশুটির বুকের পাঁজরা থরথর করে কাঁপছে, বিস্ফারিত ঠোঁটদুটিতে বিদায়ী প্রাণবায়ুর শেষ সাড়া ফুটে উঠেছে। আর ভিখারিণী মাতা পরম প্রসন্নমনে এক মগ-ভর্তি দুধ ঢকঢক করে খেয়ে চলেছে।

শোকাহতের মতো পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। লুপ্ত মাতৃত্বের একটি নিষ্ঠুর ছবি। মানবতার চরম ক্ষতি। শ্রেষ্ঠ ছবি।

পরীক্ষকেরা নম্বর দিলেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী—ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। পুরস্কার ঘোষণা করলেন পরীক্ষকেরা।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন স্বাক্ষর পত্রিকাটিকে ভাঁজ করে বন্ধ করে তুলে রাখলো। একটা মূর্ছাভঙ্গের পর যেন হঠাৎ সে জেগে উঠেছে। রঙের তুলিগুলি একে একে ধুয়ে দেরাজে বন্ধ করলো। তারপর কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখলো। —আমার অভিনন্দন জানবেন বিজয়বাবু।

অধীশ্বরী

সে নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কোন মুখরতা ছিল না। নাটকের মেয়েটি, যার নাম জয়া, সে তখন একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাসছে। কি অদ্ভুত শান্ত হাসি। হাসছে জয়ার চোখ দুটো, দুই অপলক কালো চোখের বড় বড় পাতার ছায়ার মধ্যে হাসিটা যেন নিবিড় হয়ে টলমল করছে।

অভিনয় দেখছেন যাঁরা তাঁদের সবারই চোখে নাটকের জয়ার এই শান্ত হাসি খুবই করুণ একটি দৃশ্য বলে বোধ হয়েছে। জয়ার স্বামী মানুষটা, যার নাম জয়ন্তকুমার, সে এইমাত্র জয়ার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে, উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিয়ে, তারপর বেশ হাস্যময় ও প্রসন্ন একটি মুখ নিয়ে চলে গিয়েছে। জয়া জানে, তার স্বামী এই যে সন্ধ্যা হতেই বেলফুলের মালা হাতে জড়িয়ে আর ব্যস্ত হয়ে চলে গেল, আজ সারা রাতের মধ্যে সে মানুষের পায়ের শব্দের কোন সাড়া আর শুনতে পাওয়া যাবে না।

দর্শকদের কারও বুঝতে অসুবিধে নেই, জয়ার স্বামী জয়ন্তকুমার এখন কোথায় কার কাছে গেল। ভয়ানক এক রাতজাগা ফুর্তির ঘরে, যেখানে এক হাতে গেলাস আর এক হাতে চাঁপা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক রঙ্গিলা নারী, তারই ঘুঙুরের শব্দের কাছে মন-প্রাণ লুটিয়ে দেবার জন্য চলে গেল জয়ন্তকুমার। কিন্তু জয়া কি এটা বোঝে না? খুব বোঝে।

তবু কী আশ্চর্য, জয়া হাসছে। হাসছে জয়ার দুটি অপলক কালো চোখ। দর্শকেরা দেখে বিস্মিত হয়েছেন, জয়ার শান্ত মুখের ও শান্ত চোখের ওই হাসির মধ্যে ওর জীবনের দুঃসহ করুণতার ছবিটা কত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

স্বামী চলে গিয়েছে। একা ঘরের ভিতরে তখন নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়া। শান্ত হাসির সেই চোখ আর সেই মুখ নিয়ে জয়া তাকিয়ে আছে টেবিলের উপর রাখা ছোট একটি ফটোর দিকে। স্বামীর ফটো। ফটোর কাছে টাটকা ফুলের একটি তোড়া রেখে দিল জয়া।

হঠাৎ আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো জয়া। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিল। দপ্ করে জ্বলে উঠলো সবচেয়ে কড়া আলোর বাতিটা। টেবিলের দেরাজ টেনে ভিতর থেকে বের করে নিল উলের একটা গোছা আর কাঁটা। দর্শকেরা এবার আরও বিস্মিত হয়ে দেখলেন, স্বামীর জন্য যে সোয়েটারের অনেকখানি বুনে রেখেছিল জয়া, তারই বাকিটা বুনতে শুরু করেছে। বাঃ!

সামনের সারিতে একটি চেয়ারে বসে অভিনয় দেখছেন যে মহিলা, যাঁর নাম ইন্দুলেখা, তাঁর চোখের তারা ঝিক করে হেসে ওঠে। তিনিও বলে উঠলেন—বাঃ!

এটাও বিস্ময়ের ধ্বনি, কিন্তু কী যে সেই বিস্ময়, সেটা ইন্দুলেখাই জানেন।

ইন্দুলেখার পাশের চেয়ারে বসে আছে যে ধীরাজ, সে কিন্তু শুধু ওই প্রশস্তির ধ্বনি শুনে বিস্মিত হয়। ইন্দুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ধীরাজ—কী হলো?

ইন্দুলেখা—এই তো, এইরকমটি হলেই হয়।

ধীরাজ—কী হয়?

ইন্দুলেখা—ঠিক এইরকম শান্ত ও সরল একটি মেয়ে পাওয়া গেলে বড় ভাল হয়।

হেসে ফেলে ধীরাজ—বুঝলাম। ও মেয়ে কিন্তু নাটকের জয়া। সত্যি করে কোন জয়া নয়।

ইন্দুলেখা—সেটা কি আর বুঝি না? তবু ভাবছি, নাটকের এই জয়ার মতো সত্যি কি কোন মেয়ে থাকতে পারে না?

মঞ্চে এখন অন্ধকার। অভিনয় শেষ হয়েছে। শুধু ড্রপসীনের নদীর নীলজলের ঢেউ অবলোকিত হয়ে কাঁপছে। দর্শকেরা হলঘর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছেন। ইন্দুলেখা আর ধীরাজও এখনি উঠে যাবে।

কিন্তু দুই ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিনীতভাবে ইন্দুলেখা আর ধীরাজের চোখের সামনে দাঁড়ালেন। জিতেনবাবু, যিনি এই অভিনয়ের সব আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার কর্তা, তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে সঙ্গী ভদ্রলোকের পরিচয় জানিয়ে দিলেন। —আমি এই নাটকের সব ব্যবস্থার কাজ করেছি। আর, এই নির্মল, এই নাটকটি লিখেছে।

ইন্দুলেখা—খুব ভাল হয়েছে আপনাদের এই...কী যেন নাম নাটকটার?

জিতেনবাবু—'তবু দীপ জ্বলে'।

ইন্দুলেখা—সুন্দর হয়েছে। খুব ভাল অভিনয় হয়েছে এই মেয়েটির, যার নাম জয়া।

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই এই কথা বলছে।

ইন্দুলেখা—কে এই মেয়েটি?

জিতেনবাবু—আমাদের অফিস-স্টাফের একজন। টাইপিস্ট; এই তো, পুরো এক বছরও হয়নি, আমাদের এই কোম্পানীতে কাজ পেয়েছে শোভা।

ইন্দুলেখা—শোভা?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ। শোভা হলো আমাদের বন্ধু এই নির্মলের বোন।

নির্মল হাসে—হ্যাঁ, শোভা কিন্তু আগে কোনদিন অভিনয় করেনি। এই প্রথম।

ইন্দুলেখাও হাসেন—তাই নাকি? আশ্চর্য! আমার মনে হচ্ছে, শোভা বোধহয় নাটকের

জয়ার মতোই শান্ত ও সরল স্বভাবের মেয়ে।

জিতেনবাবু—আপনি ঠিক ধারণা করেছেন। শোভা নিজে অদ্ভুত শান্ত ও সরল স্বভাবের মেয়ে বলে জয়ার ভূমিকাতে ওর অভিনয় এত নিখুঁত হয়েছে।

ইন্দুলেখা ও ধীরাজকে দর্শকদের মধ্যে বিশেষ মাননীয় মনে করেন বলেই নাটকের প্রযোজক আর স্বয়ং নাট্যকার দুজনেই একটু উৎসুক হয়ে, এবং নিশ্চয় দু'চারটে প্রশস্তির কথাও আশা করে এইরকম বিনীতভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন ও কথা বলছেন।

চা-বাগানের আর কয়লাখনিব মেশিনারী তৈরি করে খুব বিখ্যাত হয়েছে ব্যারাকপুরের যে গ্রেগ অ্যান্ড রতনলাল, তাঁদের অফিসেরই স্টাফ 'তবু দীপ জ্বলে' নাটকের অভিনয় করেছেন। অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নন্দী সাহেবের কাছ থেকে বিশেষ অনুরোধের চিঠি নিয়ে ধীরাজের কাছে গিয়ে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন স্টোরের শঙ্করবাবু—আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে আসতেই হবে। তাই অনিচ্ছা থাকলেও নন্দীসাহেবের বিশেষ অনুরোধের মুখরক্ষা করবার জন্য ধীরাজ এই নাটক দেখবার অনুষ্ঠানে এসেছে। নাটক দেখবার কোন রুচি কিংবা আগ্রহ ধীরাজ ঘোষের ত্রিশ বছর বয়সের জীবনে কোনদিনও ছিল না, আজও নেই।

ধীরাজের সঙ্গে এসেছেন যে মহিলা, তাঁকে এই অফিসার কেউই চেনেন না। নন্দীসাহেব চেনেন না, শঙ্করবাবুও জানেন না। কিন্তু বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয়নি জিতেনবাবুর আর নির্মলের, এই মহিলা নিশ্চয় ধীরাজ ঘোষের কোন আপনজন হবেন। মহিলা বোধহয় বিধবা; কারণ সিঁথিতে সিঁদুর নেই। ধীরাজের চেয়ে বয়সে বেশ বড়ই হবেন মহিলা। ধীরাজ ঘোষের বয়স তিরিশ বছরের বেশি হতেই পারে না। কিন্তু এই মহিলাকে দেখে তাঁর বয়স খুব কম করেও চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বলে মনে হয়। মহিলার সিঁদুরবিহীন সিঁথির সামনের দিকে দু'পাশের চুলের খানিকটা সাদা-কালোতে মেশানো। সুতরাং বয়স হয়েছে বৈকি। কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি, সাদা চিকনের ব্লাউজ, আর পায়ে সাদা চামড়ার জুতো, মহিলার সাজের এই সাদাটে সহজ-সরলতা খুবই চমৎকার একটা স্টাইল বলে মনে হয়।

নন্দীসাহেবও এলেন। নন্দীসাহেব বেশ উৎফুল্ল স্বরে হাসেন—কী ধীরাজ, নাটকটা তোমার বোধহয় ভালই লেগেছে?

জবাব দিলেন ইন্দুলেখা—খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে জয়া মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

নন্দীসাহেব—জয়া? তার মানে আমাদের টাইপিস্ট শোভা? তাই নয় কি জিতেনবাবু?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দীসাহেব—শোভা সত্যি খুব ভাল মেয়ে।

জিতেনবাবু—খুব মৃদু স্বভাবের মেয়ে। শোভাকে কোনদিন আমরা একটু জোরে কথা বলতেও শুনিনি। ক্যাশিয়ার একবার ভুল করে শোভার মাইনের হিসাবে একশো কুড়ি টাকার মাত্র একশো টাকা দিয়ে বসে রইলেন। মেয়েটি এতই শান্ত যে, মুখ খুলে একবার বলতেও পারলো না, কুড়িটা টাকা কম হয়েছে।

ইন্দুলেখার চোখের তারা ঝিক করে হেসে ওঠে—তাই নাকি?

জিতেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ। ক্যাশিয়ারই হিসাব মেলাতে গিয়ে ভুলটা নিজেই ধরলেন। তারপর শোভাকে ডেকে কুড়ি টাকা দিলেন।

নির্মল হাসে—আমাদের তিন ভাইবোনের মধ্যে শোভা একটু অন্যরকমের। আমরা দুই ভাই কতবার ভুল করে ওর ভাগের ভাত ডাল তরকারি চেটেপুটে খেয়ে ফেলি। কিন্তু শোভা কোনদিন ঠাট্টা করেও বলে না যে, আমরা কী ভুল করে ফেলেছি। শোভা না খেয়েই অফিসে

এসেছে আর ফিরে গিয়ে রাত দশটায় ভাত খেয়েছে।

ইন্দুলেখা—আপনি কী করেন ?

নির্মল—আমি একটা প্রাইমারী স্কুলের টিচার।

জিতেনবাবু—নাটক লেখা হলো নির্মলের একটা শখের ব্যামো।

ইন্দুলেখা—না না, ব্যামো কেন হবে ? খুব ভাল নাটক লিখেছেন নির্মলবাবু।

জিতেনবাবু হেসে ওঠেন—আমার সন্দেহ হয়, শোভার স্বভাবের সঙ্গে মিল রেখে জয়া চরিত্রটি তৈরি করেছে নির্মল, যাতে শোভার পক্ষে জয়ার ভূমিকায় অভিনয় করা সহজ হয়।

নির্মল হাসে—জিতেনদার সন্দেহটা খুব মিথ্যে নয়।

ইন্দুলেখা—তাহলে তো বলতে হয়, শোভা একটি অসাধারণ শান্ত স্বভাবের মেয়ে।

জিতেনবাবু—কোন সন্দেহ নেই।

ইন্দুলেখা—নির্মলবাবুরা কোথায় থাকেন ?

জিতেনবাবু—সোদপুরে পঞ্চাননতলার কাছে।

নির্মল—পঞ্চাননতলাতেই আমাদের বাসা।

ইন্দুলেখা—আর কে কে সেখানে থাকেন ?

নির্মল—বাবা আর মা আছেন।

জিতেনবাবু—দুঃখের বিষয়, নির্মলের বাবা আর মা দু'জনেই রোগী মানুষ। প্রায় শয্যাশায়ী বললেই চলে।

ইন্দুলেখা—তাহলে তো বুঝতে হয়, বাড়ির সব কাজ শোভাকেই করতে হয়।

জিতেনবাবু—সব সব। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে কুমড়ো গাছের পরিচর্যা পর্যন্ত সব কাজ শোভাই করে। শোভার কাজও কত নিখুঁত। সব সময় কাজ করছে, কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে। আপনি শোভার কাজেরও কোন শব্দ শুনতে পাবেন না।

ইন্দুলেখা—শোভার বয়স খুব অল্প বলে মনে হয়েছে।

জিতেনবাবু—এই তো, দু'বছর আগে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে।

নির্মল—শোভার বয়স কুড়ি কিংবা একুশ হবে, তার বেশি নয়।

ইন্দুলেখা—বাঃ, চমৎকার।

জিতেনবাবু—পঞ্চাননতলার প্রত্যেকেই বলেন, চমৎকার। কেশববাবু বলেন, তাঁর মেয়ে অরুন্ধতীকে বিয়ের দিনে এমনই সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল শোভা যে, অরুন্ধতীকে একটি অসাধারণ রূপসী মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। অথচ অরুন্ধতী হলো নিতান্ত সাধারণ রকম চেহারার মেয়ে।

ইন্দুলেখা খুশি হয়ে হাসেন—শোভাকে তাহলে ভাল আর্টিস্ট বলতে হয়।

জিতেনবাবু—হ্যাঁ, বলতেই হয়।

ইন্দুলেখা—ভাল সাজাতে জানে যখন, তখন ভাল সাজতেও জানে নিশ্চয় ?

জিতেনবাবু—নিশ্চয়। তা ছাড়া, দেখতেই তো পেলেন, সামান্য একটা লালপেড়ে তাঁতের শাড়িতে জয়াকে কী অদ্ভুত অপরূপ দেখাচ্ছিল। নয় কি ?

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা এখন চলি। কিন্তু আপনি, কালই সকালবেলা আমাদের ওখানে একবার অবশ্যই আসবেন, জিতেনবাবু।

জিতেনবাবু—আজ্ঞে ?

ইন্দুলেখা—আপনি একবার আসবেন। কথা আছে।

২

ব্যারাকপুরের এ বাড়ির দোতলার জানালার কাছে দাঁড়ালে গঙ্গার ঢেউ দেখতে পাওয়া যায়। বেশ বড় বাড়ি, তিনতলা বাড়ি। এ বাড়ির ষোল আনা মালিকানা স্বত্ব যাঁর, তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। তিনি হলেন ধীরাজের ছোট কাকা বিনোদ ঘোষ, যিনি এককালে রেলওয়ের কন্ট্রাক্টর ছিলেন। সত্তর বছর বয়সের ছোট কাকা বিনোদ ঘোষ এখন তাঁর উত্তরপাড়ার ছোট বাড়িতে একাই থাকেন আর গীতা পাঠ করে দিনযাপন করেন। স্ত্রী নেই, তিনি বিগত হয়েছেন কুড়ি বছর আগে। নিঃসন্তান বিনোদ ঘোষ এখন তাঁর এই একা-জীবনের ছোট বাড়িটার মধ্যেই শান্তির নীড় পেয়ে গিয়েছেন। বিনোদ ঘোষের মজাদার ছেলেরা সকলেই ভাল রোজগারে মানুষ, সবারই বাড়ি আছে। তাই তিনি বলে রেখেছেন, তাঁর ব্যারাকপুরের ওই তিনতলা বাড়িটাকে তিনি বড়দার ছেলে ধীরাজকেই গিফ্‌ট্ করে দেবেন। বড়দা আর বড় বউঠান এই বাড়িতেই থেকে জীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের এই এক ছেলে ধীরাজও ওই বাড়িতে থাকুক আর জীবন কাটিয়ে দিক।

হ্যাঁ, ধীরাজ যদি বিয়ে করে প্রকৃত সংসারী হয়, তবেই। তা না হলে একটা একা জীবনের জন্য এত বড় তিনতলা বাড়ি নিয়ে কী করবে ধীরাজ? না, তাহলে বাড়িটাকে কোন জনসেবার ট্রাস্টের কাছে সঁপে দিতে হবে।

এই বয়সে জয়ন্তী জুট মিলের ওয়ার্কস ম্যানেজার হওয়া ধীরাজের মতো ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ, যদি বালিগঞ্জের পিসেমশাই, অনন্তবাবুর সুপারিশের ও চেষ্টার জোর না থাকতো। অনন্তবাবু কিন্তু এই একটি বছরে অন্তত পাঁচবার খুব গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করেছেন— প্রায় দু'বছর হলো কাজ পেয়েছে ধীরাজ ; কিন্তু এখনও বিয়ে করবার কোন ইচ্ছের কথা বলে না কেন? কী ভেবেছে ধীরাজ? এইভাবে একটা ইয়ের মতো জীবনটা কাটিয়ে দেবে? তবে এই দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরিটা ওর কোন্ দরকারের কাজে লাগবে?

ভবানীপুরের কাকার বাড়িতে গিয়ে পিসিমা কয়েকবার বেশ একটু তপ্ত হয়ে তাঁর একটা আপত্তির কথা বলেছেন।—ধীরাজ যদি বিয়ে করতে না চায়, তবে নাই বা করলো। কিন্তু ওই উড়ে এসে জুড়ে বসা বিধবাটি ওবাড়িতে থাকবে কেন? আছেই বা কেন?

করুণা-বউদি বলেন—কী করে বলি!

পিসিমা—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

করুণা-বউদি—দুমকার নিশিবাবুর কথা আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—নিশিবাবুর বাড়ির বাগানটাকে মনে পড়ে?

—হ্যাঁ।

—একদিন একটা হরিণ বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, হরিণটা সারা বাগান ঘুরে ঘাস আর কচি গাছের পাতা খেতো, আমগাছের ছায়াতে ঘুমিয়ে পড়ে থাকতো।

—কিন্তু হরিণটা বাগানের ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল কেন, জানেন কি?

—জানি বৈকি। মালীটা রাত্রিবেলা বাগানের ফটক বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। কাজেই খোলা রাস্তা পেয়ে হরিণটা...।

হেসে ফেললেন করুণা-বউদি—এই ব্যাপারটাও ঠিক ওই রকমের ব্যাপার।

পিসিমা ভ্রূকুটি করেন—কিন্তু ব্যাপারটা যে একটুও ভাল দেখায় না। ইন্দুলেখা চলে যাবে কবে?

করুণা-বউদি—সত্যিই যাবে কি ?

পিসিমা—ইন্দুলেখা ওখানে থাকলে ধীরাজের বিয়ে কোনদিনই হবে কি ?

করুণা-বউদি—বুঝতে পারছি না।

পিসিমা—ছি ছি।

দেয়ালের যেমন কান আছে, বাতাসেরও তেমনই মুখ আছে বোধহয়। এইসব আলোচনা ও মন্তব্যের অনেক কথা যেন হাওয়াই বার্তা হয়ে ইন্দুলেখার কানে পৌঁছে গিয়েছে। শুনে গম্ভীর হয়েছেন ইন্দুলেখা। কিন্তু পর মুহূর্তে হেসে উঠেছে তাঁর চোখের তারা।

ইন্দুলেখার চোখের তারার ভিতরে বোধহয় একটা হীরের কুচি লুকিয়ে আছে। নইলে হঠাৎ ওরকম ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠবে কেন বেয়াল্লিশ বছর বয়সের দুটো মেয়েলী চোখের তারা ?

ঠিক কথা। মনে যখন বিষাদ, আশাটা হঠাৎ যখন অন্ধকার দেখে ভীরু হয়ে যায়, তখন বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায় ইন্দুলেখার চোখ দুটো। আর নতুন আলো দেখতে পেয়ে আশাটা যখন সাহস পায় আর খুশি হয়, তখনই হেসে ওঠে তাঁর চোখের তারার ভিতরে লুকানো হীরের কুচি।

কিন্তু ইন্দুলেখার সম্পর্কে এইসব অভিযোগের মেঘ আর বেশি ঘনিয়ে উঠবার সুযোগ পেল না। ধীরাজের আপনজন এইসব কাকা পিসিমা আর বউদিরা শুনতে পেলেন ও জানতেও পারলেন যে, ধীরাজের বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ইন্দুলেখা। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এদিক ওদিক অনেক মেয়েও দেখেছেন। ইন্দুলেখার কাছ থেকে এঁরা সবাই উল্টো অভিযোগের চিঠি পেয়েছেন আপনারা সবাই যদি চেষ্টা না করেন তবে আমি একা কী করতে পারি ? ধীরাজের বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজে খুঁজে আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম। আপনারা একটু সচেষ্ট হলে এতদিনে কি একটি ভাল মেয়ে পাওয়া যেত না ? নিশ্চয় পাওয়া যেত।

চিঠি পেয়ে এঁরা সবাই বেশ লজ্জাও পেয়েছেন। ইন্দুলেখাকে এতদিন ধরে খুবই ভুল বুঝেছেন তাঁরা। করুণা-বউদি লজ্জিত হয়ে বলেন– যাক ভাগ্যি ভাল আমি তেমন কিছু নিন্দের কথা বলিনি।

পিসিমা বলেন—একটু ভেবেচিন্তে নিন্দে করা উচিত ছিল।

করুণা-বউদি—সবচেয়ে ভয়ানক নিন্দের কথা বলেছেন সুহাসদি।

—কী বলেছে সুহাস ?

করুণা-বউদি—সুহাস বলেছিলেন, ইন্দুলেখা হলেন একটি রাজসাপ, আর ধীরাজ একটা চড়ুই পাখি। রাজসাপের চোখের দৃষ্টির সামনে চড়ুই যেমন মুষড়ে পড়ে আর রাজসাপেরই মুখের কাছে এগিয়ে আসে তেমনই ।

পিসিমা—থাম থাম। তুমি বলেছ হরিণ আর সুহাস বলেছে রাজসাপ। দুইই খুব অন্যায় কথা, খুব ভুল কথা।

ইন্দুলেখা জানেন যে, তিনি যদি ইচ্ছে না করেন তবে ধীরাজ কখনও কোনদিনও বিয়ে করতে ইচ্ছে করবে না। সত্যি কথা, বিয়ে করতে ধীরাজের কোন ইচ্ছে তো নেইই, বরং ঘোর আপত্তি আছে। কিন্তু ইন্দুলেখা বুঝেছেন, ধীরাজের এইসব আপনজনের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করলে ধীরাজের খুবই ক্ষতি হবে। পিসেমশাই বেশি রাগ করলে ধীরাজের দেড় হাজার টাকা মাইনের চাকরিটাকেও তিনি মিথ্যে করে দিতে পারেন। সে জোর তাঁর আছে। ধীরাজ বিয়ে না করলে ছোট কাকা রাগ করে তাঁর এই তেতলা বাড়িটাকে খয়রাতি করে দিতে পারেন।

ধীরাজের মা মারা যাবার আগে তাঁর সব অলঙ্কার করুণা-বউদির কাছে রেখে দিয়ে

রেজিস্টারী করা একটা ইচ্ছাপত্র রেখে দিয়ে গিয়েছেন। ধীরাজ যদি বিয়ে করে, তবে তাঁর সব অলঙ্কার ধীরাজের বউ পাবে। যদি বিয়ে না করে ধীরাজ, তবে সব অলঙ্কার ভবানীপুরের বাড়ির তিন বউ করুণা বিমলা আর অর্চনা পাবে। শুনেছেন ইন্দুলেখা, সে সব অলঙ্কারের সোনার ওজন দেড়শো ভরিরও বেশি। তা ছাড়া হীরের আংটি আর দু'জোড়া দুলও আছে। জড়োয়া হার আছে পাঁচটা। সুতরাং ধীরাজের বিয়ে না করাব কোন মানে হয় না। আর ইন্দুলেখাই বা ধীরাজের বিয়ে না দিয়ে পারবেন কেন? সব হারিয়ে ধীরাজ যদি একটা গাছতলার ধীরাজ হয়ে যায়, তবে তার পাশে বসে কতটুকু ছায়া পাবেন ইন্দুলেখা? তার চেয়ে পুনার স্কুলবাড়ির ভাঙ্গা থামের ছায়াটাও অনেক ভাল।

যে ইন্দুলেখা আজ ধীরাজের সুখ শান্তি আর কল্যাণের জন্য এত ভাবছেন, দু'বছর আগেও সে ধীরাজের সঙ্গে তাঁর সামান্য চোখে দেখা একটা পরিচয়ের সম্পর্কও ছিল না। ধীরাজ শুধু শুনেছিল যে, বড় মামার বড়ছেলে মধুদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যাঁর তাঁরই নাম ইন্দুলেখা। প্রায় দশ বছর আগের কথা, মেজমাসীর একটি চিঠি পেয়ে জানতে পেরেছিল ধীরাজ, মধুদা আর নেই। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন।

দশ বছর আগের একটি চিঠি থেকে পাওয়া খবরেব সেই ঘটনা কবেই স্মৃতি-বিস্মৃতির একটা ঝাপসা ঘটনা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই দু'বছর হলো, মিলেব কাজে পুনাতে গিয়ে মিস্টার মজুমদারের কাছে শুনতে পেল ধীরাজ, মধুদার বিধবা স্ত্রী, ইন্দুলেখা পুনাতেই একটা মেয়ে-স্কুলের বাংলা টিচার হয়ে কাজ করেন, মাইনে আশি টাকা। ইন্দুলেখার সঙ্গে দেখা করে মাত্র একটি ঘন্টার আলাপের পর বুঝতে পেরেছিল ধীরাজ, ইন্দু-বউদির আর এখানে পড়ে থাকা উচিত নয়। ইন্দুলেখা বলেছিলেন—আমার নিজের জন্য একটুও ভাবছি না; ভাবছি, তুমি কেন একেবারে একলাটি হয়ে পড়ে থাকবে? কোনদিনও তোমাকে দেখিনি, সে একরকমের ভাল ছিল। কিন্তু এর পর...।

ইন্দুলেখার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। তার কারণ ইন্দুলেখার জীবনে এইবার একটা নতুন ভাবনার কষ্ট দেখা দিল। এই সুদূর পুনাতে বসে ইন্দুলেখাকে রোজই ভাবতে হবে, ধীরাজ কেমন আছে? কাজের খাটুনির পরে বাড়িতে ফিবে এসে ধীরাজ এক পেয়ালা গরম চা খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না কে জানে' ঠাকুর আব চাকরের যত্ন কি সত্যিই একটা যত্ন?

ইন্দুলেখার ঘরে বসে, গরম চায়েব পেয়ালা হাতে নিয়ে আর ইন্দুলেখারই মুখের অদ্ভুত রকমের দুটি নরম ঠোঁটের দুঃখিত হাসিটার দিকে তাকিয়ে ধীরাজ হঠাৎ বলে ওঠে—না, আমি তোমার কোন আপত্তির কথা শুনবো না ইন্দুবউদি। তুমি চল।

সেই যে পুনা ছেড়ে চলে এসেছেন ইন্দুলেখা, তারপর ব্যারাকপুরের এই বাড়িটাই তাঁর মন-প্রাণের ও হাতের সব যত্নের আশ্রম হয়ে উঠেছে। ধীরাজের বিছানাব উপর আর পুরনো খবরের কাগজ ছড়িয়ে পড়ে থাকে না। আয়নার টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা আর থাকে না। পুরনো ময়লা ফার্নিচারের কিছুই আজ আর নেই। সব সরিয়ে আর বেচে দিয়ে নতুন সেগুনের ফার্নিচারে ঘরগুলিকে সাজানো হয়েছে। মেজেতে নতুন কার্পেট, সিঁড়ির দু'পাশে ফুলের নতুন টব। ঠাকুর আর সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবার সুযোগ পায় না। চাকরকে দু' বেলা প্রত্যেকটি ঘরের ধুলো মুছতে হয়। দিনে আর রাতে ধীরাজ কী খাবে কিংবা খাবে না, সেটা বিচার করে বুঝে দেখবার দায়িত্ব ইন্দুলেখারই। ধীরাজের কিছুই বলবার নেই, কিছু বলবার দরকারও হয় না। মাসের মাইনের দেড় হাজার টাকা ইন্দুলেখার হাতে ফেলে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে যায় ধীরাজ।

নিজের পছন্দ মতো সুখ শান্তি ও প্রীতির একটি স্বর্গ তৈরি করে নিয়েছেন ইন্দুলেখা। তার

মধ্যে নিজের ইচ্ছার মন্দার কাননও তৈরি করে ফেলেছেন। তার মধ্যে পারিজাতও ফুটে উঠেছে। ইন্দুলেখার চেষ্টা ও যত্নের কোন ভুল হয়নি। তাব সব ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে।

ধীরাজও কম যত্নশীল নয়। ইন্দুবউদির সুখ-সুবিধার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত হয়ে আছে ধীবাজ। ইন্দুলেখা মুখ খুলে তাঁর মাথার কষ্টের কথাটা বলেন না, শুধু মাথাটাকে এক হাত দিয়ে ছুঁয়ে আর নীরব হয়ে শুয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট। ধীরাজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাখা নিয়ে ইন্দুলেখার মাথায় বাতাস দিয়ে দিয়ে তিনটি ঘন্টা পার করে দিলেও ক্লান্ত হয় না ধীরাজ। ইন্দুলেখার কপালে ওডিকলোনের পটি লাগাতে গিয়ে ধীরাজের হাতটা খুব সাবধানে কাজ করে। হাতটা যেন তড়বড় না করে, ইন্দুবউদির ঘুম যেন ভেঙ্গে না যায়।

ইন্দুলেখা চান, ধীরাজও চায়, এ বাড়ির জীবনের এই সাজানো রূপের কিছুরই যেন নড়চড না হয়। যেমনটি চলছে, ঠিক যেন তেমনটি চিরকাল চলতে থাকে। তাই ধীরাজের বিয়ে দিয়ে এমন একটি মেয়েকে এ বাড়িতে আনতে চান ইন্দুলেখা, যে মেয়ে তাঁব এই সাজানো বাগানের মধ্যে একটি ফুল হয়ে ফুটে থাকবে। যেন একটা ঝড হয়ে সব ওলট-পালট না কবে দেয়।

বুঝতে পারেননি বালিগঞ্জের পিসিমা. উত্তবপাড়াব ছোটকাকা আর ভবানীপুবেব কবুণা, কেন ধীরাজের বিয়ে হতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা আবোলতাবোল অনেক বাজে চিন্তার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁরা শুনতে পেয়ে নিশ্চয় চমকে উঠবেন, এ বাড়ির রূপেব বাগানে চমৎকার একটি শান্ত শোভার ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারবে, এমনই একটি মেয়ের খোঁজ পেয়ে গিয়েছেন ইন্দুলেখা। কী আশ্চর্য, মেয়েটিব নামও শোভা।

জিতেনবাবুর সঙ্গে কাজের কথা নিয়ে যেদিন আলোচনা করলেন ইন্দুলেখা, তার পরের দিনই সোদপুরে গিয়ে শোভাকে তিনি দেখে এলেন। সোদপুরের সেই পঞ্চাননতলার একজন মনুবউদি এসে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ইন্দুলেখারই প্রশংসা করেছেন—সত্যিই আপনার চোখের প্রশংসা করতে হয় দিদি। আপনি খাঁটি জিনিস চিনতে জানেন। গরীব ঘবেব মেয়ে বটে শোভা কিন্তু গুণে স্বভাবে ও রূপে এ মেয়েকে আপনাদেরই মতো মানুষের বাড়িতে ভাল মানায়।

আর সাতটি দিন পরেই শোভার সেই ভাগ্যের উৎসবটাকে দেখে সোদপুবেব পঞ্চাননতলার সন্ধ্যাবেলার চাঁদটাও যেন খুশি হয়ে জ্যোৎস্না ছড়ালো আব হাসলো। প্রতিবেশী সনাতনবাবু বললেন—একেই বলে ভাগ্য।

৩

ব্যারাকপুরের বাড়িতে ফুলশয্যার রাত্রিটাও আলোতে ভরে গিয়ে ঝলমল করে হেসে উঠলো। ধীরাজের আপনজন বলতে যাঁরা কলকাতাতে আছেন তাঁরা সবাই এলেন। এমন কি বড়কাকার মেয়ে সুহাসিনীও তাঁর তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আর খুশি হয়ে শোভার সুন্দর মুখটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ইন্দুলেখা এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালেন আর হাসলেন—কী দেখছেন সুহাসদি? স্বীকার করুন এবাব আপনার ঋষ্যশৃঙ্গ ভাইটির মনপ্রাণ উতলা করে দেবার মতো জিনিসটি আমি এনেছি।

সুহাসিনী বলেন—স্বীকার করছি ভাই। আগন্তুক অভ্যাগতদের হাসি-হল্লা আর মেয়েদের কলকণ্ঠের কাকলি নীরব হতে হতে রাত দশটা পার হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়ার পালা শেষ হতে আর সবাই বিদায় নিয়ে চলে যেতে রাত এগারটা। তারপর নীরব তিনতলা বাড়িতে শুধু ফুলশয্যার ঘরে একটি বিহ্বল হাসির শব্দ বাজতে থাকে। গল্প করেন আর হাসতে থাকেন

ইন্দুলেখা।

বিছানার উপরে একদিকে বসে আছে শোভা, আর-একদিকে ধীরাজ। ইন্দুলেখা একটা চেয়ার বিছানার কাছে টেনে নিয়ে আর বিছানারই উপর দুই কনুই রেখে গল্প বলতে থাকেন। সাতারার শিবাজীর দুর্গের গল্প, মোগলসরাইয়ের ওয়েটিং রুমের গল্প, আর বোম্বাইয়ের মারাঠী মেয়ে সৌদামিনীর বিয়ের গল্প। ধীরস্থির হয়ে আর চুপ করে বসে গল্প শোনে ধীরাজ, কিংবা গল্পের কথাগুলি শুনতে পাচ্ছে না বলেই ধীরস্থির হয়ে আর চুপ করে বসে আছে। কিন্তু হেসে উঠছে শোভা। দুই কালো চোখ একেবারে অপলক হয়ে আর নিবিড় হয়ে হাসতে থাকে।

সৌদামিনীর বিয়ের গল্পটি বলতে অনেক সময় নিলেন ইন্দুলেখা। গল্পটা যেন ফুরোতেই চায় না। বিয়ের বাজনা বেজে উঠলো অনেক রাতে, এতক্ষণে বর এসেছে। বরের মাথার পাগড়ীর ঝালরের সঙ্গে ফুলের মালা দুলছে। এদিকে ও কী, কাক ডাকছে বোধহয়। ভোর হয়ে গেল নাকি?

ঠিকই ভোর হয়ে গিয়েছে। ইন্দুলেখা বলেন—কী আশ্চর্য, কত শিগগির ভোর হয়ে গেল।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে ধীরাজ। ইন্দুলেখা বলেন—তোমার বোধহয় এখুনি এক পেয়ালা চা চাই।

ধীরাজ—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—তবে যাও, হাত মুখ ধুয়ে নাও।

ধীরাজ চলে যেতেই শোভার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর কথা বলেন ইন্দুলেখা—ঘুমোতে পারলে না বলে কষ্ট হলো না তো, শোভা?

শোভা—না।

ইন্দুলেখা—কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়?

শোভা—না, একটুও না।

হাসছে শোভার দুই কালো চোখ। ঠিক সেই হাসি, যে হাসি সেদিন নাটকের জয়ার চোখে দেখতে পেয়েছিলেন ইন্দুলেখা।

ফুলশয্যার এই রাত্রির পর আরও অনেক রাত্রি পার হয়ে যাবার পর আরও খুশি হলেন ইন্দুলেখা। শোভা সত্যিই শোভা। যেখানে যেমনটি করে এই শোভাকে সাজিয়ে আর বসিয়ে রাখছেন ইন্দুলেখা, শোভা ঠিক তেমনটি করে সেজে বসে থাকতে পারে। সকালবেলা, ঠিক আটটার সময় যখন ইন্দুলেখা আর ধীরাজ নিজের নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এসে ড্রইংরুমের সোফার উপর বসে, তখন শোভাও তার ঘর থেকে বের হয়, আর ড্রইংরুমে এসে কোচের উপর বসে। সন্ধ্যাবেলাতেও এই নিয়ম। তিনজনের মেলামেশার আর গল্প করবার যা-কিছু অনুষ্ঠান সবই এই ড্রইংরুমের সকাল ও সন্ধ্যার দুটি আসর হয়ে দেখা দেয়। ধীরাজ কখন আবার টেবিলের কাছে গিয়ে বসলো, কিংবা বাইরে বের হয়ে গেল, সে-সব ঘটনার কোন খবর রাখবার দরকার নেই শোভার। সে সব ঘটনার দেখাশোনা করবার জন্য ইন্দুলেখাই আছেন।

শোভা যেন মনে-প্রাণেও একেবারে সেই নাটকেরই জয়া। সেই অচঞ্চল শান্ত মুখ, চোখে সেই নিবিড় হাসি। সত্যি, এই শোভা একটি প্রশ্নহীন অস্তিত্ব। যেমন করে শোভাকে মানাতে চাইছেন ইন্দুলেখা, শোভা ঠিক তেমনই করে মানিয়ে চলেছে। যেদিন যে-শাড়ি পরতে বলেন ইন্দুলেখা, সেদিন সেই শাড়িই পরে শোভা। সোদপুরের পঞ্চাননতলার মেয়ে, একুশ বছর বয়স, সে যেন ব্যারাকপুরের এই তিনতলা বাড়িতে শোভার ভূমিকা নিয়ে একটি সুন্দর স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে আছে; হাসছে-বসছে আর ঘুরছে। বুঝতে পেরেছেন ইন্দুলেখা, যা

আশা করেছিলেন তিনি, তার চেয়ে কিছু বেশিই পেয়ে গিয়েছেন।

বাতাসের মুখ আছে, বাতাসও কথা বলে। তাই আবার শুনতে পেয়েছেন ইন্দুলেখা, ছোটকাকা এইবার বাড়িটাকে ধীরাজের নামে গিফট করে দেবার দলিল লেখাবার জন্য উকিলকে ডেকেছেন। ভবানীপুরের করুণা বলেছে, ধীরাজের মায়ের সব অলঙ্কার নিয়ে সে নিজেই শিগগির একদিন এ বাড়িতে আসবে। ইন্দুলেখার ইচ্ছা ও আশার সব স্বপ্নই সফল হতে চলেছে।

বুঝতে পেরেছেন ইন্দুলেখা, অনেক রাতে করিডরের দুই প্রান্তের বিদ্যুতের বাতি দুটো যখন মৃদু হয়ে জ্বলে তখন শোভা তার ঘরের বাইরে পায়ের শব্দের অনেক আনাগোনার কোন সাড়া শুনতে পায় না। শুনতে পেত যদি তবে বোধহয়, অন্তত কোনদিনও একবার দরজা খুলে ঘরের বাইরে উঁকি দিয়ে দেখতো। কিংবা কিছুই ধারণা করতে পারে না। নিজের ঘুম আর নিজের স্বপ্ন নিয়ে ঘরের ভিতরে একা শুয়ে থাকতে ভালবাসে শোভা।

ইন্দুলেখা বলেন—সোদপুরের বাড়িতে যে চিঠি লিখবে, সে চিঠিটা একবার আমাকে দেখতে দিও, শোভা।

শোভা—আচ্ছা।

ইন্দুলেখা বলেন—সুহাসদি যদি কোনদিন এসে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছ শোভা, তবে তুমি তাঁকে কী বলবে, একবার বল তো, শুনি।

শোভা হাসে— আপনি বলে দিন, কী বলবো।

ইন্দুলেখার চোখের হীরার কুচি হেসে ওঠে—এই তো, ঠিক কথা বলেছ। এ বাড়িতে আমরা তোমার কাছ থেকে এইরকম কথাই আশা করি । যাক তুমি শুধু বলবে, খুব ভাল আছি, ইন্দুদি থাকতে আমার ভাল না থাকবার সাধ্যি কী ?

হেসে ওঠে শোভার শান্ত নিবিড় কালো চোখ। শোভা বলে—তাই বলবো।

ড্রইংরুমে বসে গল্প করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ইন্দুলেখা —তুমি কি আগেও কখনও অভিনয় করেছিলে, শোভা ?

শোভা—না।

ধীরাজ হাসে—লায়লা রিজিয়া মৃণালিনী কিংবা শৈব্যা হওনি কোনদিন ?

শোভা—না।

ধীরাজ—শুধু ওই এক জয়া ?

শোভা—হ্যাঁ।

ধীরাজ—তাহলে আর কী করে বলি যে, তুমি খুব ভাল অভিনয় করতে পার।

ইন্দুলেখা—আর অভিনয় করবার দরকার তো নেই। তবে হ্যাঁ, যদি লায়লা-টায়লা সেজে এই ঘরে মাঝে মাঝে বসে থাকে শোভা, তবে আমোদটা মন্দ হয় না।

ধীরাজ—তা ওরকম করে সাজতে-টাজতে পাবে নিশ্চয়ই শোভা। কী যেন তার নাম যাকে বিয়ের দিনে তুমি নিজের হাতে সাজিয়ে খুব রূপসী করে দিয়েছিলে ?

শোভা—অরুন্ধতী।

ধীরাজ—তবে তুমি নিজে একটা লায়লা কিংবা মৃণালিনীর মতো সাজতে পারবে না কেন ? খুব পারবে।

শোভা—যাকে কখনও দেখিনি, তার মতো সাজবো কেমন করে ?

ইন্দুলেখা—তবে তাদেরই মতো সাজ করে দেখাও, যাদের দেখেছো। এই ধর সুহাসদির মেয়ে বরুণা সেদিন যেমন সেজেছিল, তুমি একদিন ঠিক ওইরকম খোঁপার মুকুট করে, তার সঙ্গে জুঁইয়ের মালা জড়িয়ে একেবারে বরুণাটি হয়ে আমাদের আশ্চর্য করে দাও তো, দেখি।

শোভা—আমি বরুণাকে ভাল করে দেখিনি।

ইন্দুলেখা চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন—ও হরি, আগে ভাল করে দেখতে হবে ?

শোভা—তা না হলে... ।

ইন্দুলেখা—তবে আর কী বলা যায় ! তুমি ভাল আর্টিস্ট নও, শোভা ।

শোভা—আমি কিন্তু ঠিক আপনার মতো সাজতে পারি ।

—অ্যাঁ ? কী বললে, ঠিক আমার মতো ?

শোভা—হ্যাঁ ।

—কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি পড়লেই কি ইন্দুদি হওয়া যায় ? অসম্ভব ।

শোভা—কেন সম্ভব নয়, ইন্দুদি ?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন ইন্দুলেখা—শোন বোকা মেয়ের কথা ! কালো পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি না হয় পেলে। কিন্তু কোথায় পাবে ইন্দুদির এই দুই ঠোঁট, এই চকচকে চোখ আর এইরকম দুটি নিটোল হাত ? আমি বলবো, তুমি চেষ্টা করলে লায়লা হতে পারবে, রিজিযা বা শেব্যাও হতে পারবে। কিন্তু শত চেষ্টার তপস্যা করলেও ইন্দুদি হতে পারবে না ।

ধীরাজ রুমাল তুলে মুখের উচ্ছ্বসিত হাসিটাকে চাপা দেয়। ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শোভা। একুশ বছর বয়সের দৃষ্টিটাই হঠাৎ যেন একটা নিথর নিরেট জিজ্ঞাসা হয়ে ধীরাজকে দেখছে ।

৪

অনেক রাত, ঘুম আসেনি তাই বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পায় শোভা, ঘরের বাইরের পায়ের শব্দটা ওদিক থেকে এসে করিডরের শেষদিকে ইন্দুদির ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর শুধু গঙ্গার জলের শব্দ শুনতে থাকে শোভা। বোধহয় গঙ্গাতে বান এসেছে।

সকালবেলা ড্রইংরুমে এসে ঢুকতেই ইন্দুলেখা বললেন—আজ বিকেলে শকসেনা সাহেবের বাড়ির মেয়েরা আসবেন, শোভা। আজ কেমনটি সাজবে, বলো ?

শোভা—বলে দিন ।

ইন্দুলেখা—সালোয়ার পায়জামা আর ওড়না পরবে ?

শোভা—হ্যাঁ ।

ইন্দুলেখা—বেণী রাখবে, না খোঁপা রাখবে ?

শোভা—বলে দিন ।

ইন্দুলেখা—আমার মনে হয়, বেণীই ভাল। তোমার মতো বয়সের মেয়েকে বেণীতেই ভাল মানায় ।

শোভা—আচ্ছা ।

বিকেলের রোদের আভা লেগে ড্রইংরুমের জানালার কাঁচ যখন সোনালী হয়ে জ্বলছে, ঠিক তখন উপস্থিত হলেন মিসেস শকসেনা ও তাঁর দুই বোন। শোভাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মিসেস শকসেনা।—বাঃ, সুন্দর। আমি তো দেখে বুঝতেই পারিনি যে, এই কচি মেয়েটি হলো ঘোষসাহেবের ওয়াইফ ।

ইন্দুলেখা হাসেন—বয়স কিন্তু একুশ বছর ।

মিসেস শকসেনা—কিন্তু দেখে তো ষোল বছর মনে হয় ।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ, তাই মনে হয়। বয়স একুশ বছর হলেও এই মেয়ের প্রাণটা সত্যিই একেবারে ষোল বছর বয়সের মেয়েটির মতো ।

মিসেস শকসেনা—খুব ছটফটে ?

ইন্দুলেখা—না না, একটুও ছটফটে নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। খুব শান্ত, খুব সরল স্বভাবের মেয়ে।

মিসেস শকসেনা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর ইন্দুলেখা হাসতে থাকেন—মিসেস শকসেনাকে ভাল করে দেখেছো তো, শোভা ?

শোভা—হ্যাঁ।

ইন্দুলেখা—তবে একদিন ওইরকমটি ভারী জর্জেট পরে আর মুখে পাঁচ খিলি পান পুরে গালটি ফুলিয়ে নিয়ে মিসেস শকসেনা হয়ে যাও।

শোভা—কিন্তু. ।

ইন্দুলেখা হাসেন—বুঝেছি, সম্ভব নয়। মিসেস শকসেনাব মতো অমন একটি ভুঁড়ি পাবে কেমন করে ?

হেসে ফেলে শোভা—না, সেকথা বলছি না। বলছি মিসেস শকসেনার মুখেব হাসিটি বেশ সুন্দব।

বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ শুনেই সোফা থেকে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন ইন্দুলেখা—এ কি ? ধীরাজ এল নাকি ?

হ্যাঁ, ধীরাজই এসেছে। ঘরে ঢুকেই হেসে ফেলে ধীবাজ—এ কী, এ আবার কোন সঙ ? সালোয়ার পায়জামা আর ওড়না ?

ইন্দুলেখা—আমি বলেছি, তাই শোভা এইরকমটি সেজেছে। মিসেস শকসেনা এই কিছুক্ষণ হলো চলে গেলেন।

ধীবাজেব হাতে একটা চিঠি। চিঠিটাকে শোভার হাতেব উপব ফেলে দিয়ে ইন্দুলেখাবই পাশে সোফাব উপব বসে পড়ে ধীরাজ—গ্রেগ অ্যান্ড রতনলালের অফিসের স্টাফ আবার 'তবু দ্বীপ জ্বলে' প্লে কববার ব্যবস্থা করেছে। নন্দী সাহেব আবাব বিশেষ অনুবোধ করে নাটক দেখবার নেমন্তন্ন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর আরও একটা অতিবিশেষ ইচ্ছের অনুরোধ হলো, শোভা যেন আবার নাটকের জয়া হয়ে অভিনয় করে যায়। স্টাফেরও সবারই তাই ইচ্ছে।

ইন্দুলেখা—কবে হবে অভিনয় ?

ধীরাজ—আজই। নন্দীসাহেব লিখেছেন, জিতেনবাবুও টেলিফোনে অনেক মিনতি করে বলেছেন , শোভা যেন একটু আগেভাগে বিকেল থাকতেই চলে আসে। অভিনযেব পার্ট একটু বিহিয়ার্স করে নেবার দরকার হবে।

ইন্দুলেখা— বেশ তো, শোভা তাহলে আর দেরি না করে এখনই চলে যাক। আমরা ঠিক সন্ধ্যা হলেই যাব কী বল শোভা, তোমার কী ইচ্ছে ?

শোভা—আপনি যা বলবেন।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ, গাড়ি তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। চারটে বাজতে আব বেশি দেরিও নেই। তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গাড়িটা ফিরে আসুক। তারপর আমরা দুজন ।

শোভা—আমি কি এইরকম সালোয়ার পায়জামা পরেই.. ।

ইন্দুলেখা—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ? অভিনয় শেষ হলে তুমি তো আমাদেরই সঙ্গে ফিরে আসবে।

শোভাকে নিযে গাড়িটা যখন চলে গেল তখন বিকেল চারটা। আর ফিরে এসে ইন্দুলেখা আর ধীরাজকে নিযে গাড়িটা যখন অভিনয়েব হলঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ঠিক ছ'টা। অভিনয় শুরু হলো যখন, তখন ঠিক সাতটা আর নাটকেব শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা যখন দেখা দিল, তখন রাত দশটা।

কিন্তু এ কী ব্যাপার ? এ কেমন শেষ দৃশ্য ? নাটকের জয়ার কালো চোখে তো কোন শান্ত-নিবিড় হাসি টলমল করে না। কালো চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে।

জয়ার স্বামী জয়ন্তকুমার হেসে হেসে চলে যেতেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল জয়া। তারপর টেবিলের উপর থেকে স্বামীর ফটোটা তুলে নিয়ে ঘরের মেজের উপর একটা আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝন ঝন করে বেজে উঠলো ভাঙা ফটোর কাঁচ।

আস্তে আস্তে হাঁফাচ্ছে জয়া। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট। অদৃশ্য এক আগন্তুকের পায়ের শব্দ শোনা যায়। ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ। ঘরের দরজার পাটের উপর অদৃশ্য আগন্তুকের ছায়াটা একেবারে সুস্থির হয়ে লেগে রইল। জয়া বলে—কে ? অদৃশ্য আগন্তুকের ছায়াটা বলে—আমি বিকাশ। তোমার মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তোমাকে নিতে এসেছি, জয়া।

চেঁচিয়ে ওঠে জয়া—আপনি ? আপনি এসেছেন ? আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন ? ভেবেছিলেন, জয়া বুঝি মরেই গিয়েছে।

--না, তা ভাবিনি। তুমি চলো।

—চলুন।

নাটক শেষ। মঞ্চে অন্ধকার। ড্রপ সীনের নদীতে নীল জলের ঢেউ কাঁপছে। দেখতে পায় ধীরাজ, শোভার দাদা নির্মল দূরে দাঁড়িয়ে জিতেনবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

ইন্দুলেখা খুব বিরক্ত, আর ধীরাজ বেশ উত্তেজিত। দু'জনের দুই অপ্রসন্ন মূর্তি বেশ ব্যস্ত হয়ে হেঁটে আর এগিয়ে জিতেনবাবু ও নির্মলের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ইন্দুলেখা ভ্রূকুটি করেন—এটা আবার কী রকমের তবু দীপ জ্বলে ?

নির্মল—শেষ দৃশ্যটা বদলাতে হয়েছে।

ইন্দুলেখা—দৃশ্যটা খুবই খারাপ হয়েছে।

নির্মল—কিন্তু সবাই বলছেন, ভাল হয়েছে।

ধীরাজ যাচ্ছেতাই হয়েছে, যাকগে, শোভাকে ডেকে দিন, আমরা এখনই বাড়ি চলে যাব।

নির্মল—শোভা বাড়ি চলে গিয়েছে।

চমকে ওঠেন ইন্দুলেখা—বাড়ি চলে গিয়েছে ? কোন্ বাড়িতে গিয়েছে ?

নির্মল—সোদপুর পঞ্চাননতলার বাড়িতে।

ইন্দুলেখা—কেন ? এরকম না বলে-কয়ে শোভার সোদপুরে চলে যাবার কোন কথা তো ছিল না।

নির্মল—চলে যখন গিয়েছে, তখন আর কী করবেন। আপনারা দু'জনে বাড়ি চলে যান।

ইন্দুলেখা—সে কী ? এ কী রকমের অদ্ভুত কথা। ধীরাজ একা বাড়ি ফিরবে ?

নির্মল—একা ফিরবে কেন ? আপনিই তো সঙ্গে আছেন।

ইন্দুলেখা--কিন্তু ব্যারাকপুরের বাড়িতে কবে ফিরে যাবে শোভা ?

নির্মল—কোনওদিন না।

ধীরাজ চেঁচিয়ে ওঠে—আমি জানতে চাই, কে ওই বিকাশ ?

নির্মল—বিকাশ হলো বিকাশ। নাটকের বিকাশ।

ধীরাজ—কিন্তু আমি জানতে চাই, লোকটা কে ?

নির্মল—একদিন জানতেই পারবেন।

দুই চোখ অপলক করে ধীরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর হাঁপাতে থাকেন

ইন্দুলেখা। যেন গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুঁচকে গিয়েছে তাঁর নরম ঠোঁট, আর চোখের তারার ভিতরে লুকানো সেই হীরের কুঁচিটা বোধহয় মাটির কুঁচি হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ গোধূলি

ওদের দু'জনকে পাশাপাশি একসঙ্গে দেখলে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয়। অলকা আর প্রশান্ত যেন একই ছন্দে একই কবিতার দুটি চরণের মতো মিলে গেছে। দু'জনে পাশাপাশি থাকলে তবেই ওদের দু'জনকে এত সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালের জলভরা পুকুরের পাশে একটি পুষ্পিত ঝুমকো জবার গাছের মতো, ওরা নিজের গুণেই যেন পরস্পরকে রূপ ধার দিয়ে এতটা সুন্দর করে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছে। নইলে, শুধু একটা জলভরা পুকুর কিই-বা এমন সুন্দর! একটা ঝুমকো জবার গাছের একলা রূপের মধ্যে তাকিয়ে দেখবার মতো এমন কিই-বা আছে?

বিয়ের পরেই আগ্রাতে বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। তাজমহলের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একজন আমেরিকান টুরিস্ট আচমকা সামনে এসে দাঁড়ালো। ইশারায় অনুরোধ জানালো—এক মিনিটের জন্য একটু থেমে থাকতে। ক্লিক ক্লিক। উৎফুল্ল পাখির মতো টুরিস্টের ক্যামেরা যুগল-রূপের দিকে তাকিয়ে একবার ডেকে উঠলো।

চৌরঙ্গীতে বাসের প্রতীক্ষায় ওরা দুজনে একটা স্টপে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'একটা বেহায়া টমি একা রাখা কেউটের মতো শিষ দিতে দিতে এগিয়ে আসে। একেবারে সামনে এসে পড়তেই, অলকা ও প্রশান্ত একসঙ্গে তাকায়। কেউটে টমি চকিতে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। দূরে এগিয়ে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে ভীরু চোখ তুলে দেখে—কালা আদমির দেশে কোন শিল্পী যাদুকরের তৈরি একজোড়া মোহ যেন পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু চেহারার জন্য নয়, শুধু গুণ মান শিক্ষা ও বিত্তের জন্য নয়, ওরা সবচেয়ে সুখী ওদের ভালবাসার জন্যই। এই ভালবাসাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন ছলনা আছে বলে ওরা বিশ্বাস করে না।

সুতরাং, নিজের সম্বন্ধে প্রশান্তর ধারণা যদি তার মনের ভেতর একটি সুশোভন স্পর্ধায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে, তবুও তাতে দোষ দেওয়া যায় না। অলকা যদি আত্মবিশ্বাসে একটু বেশি সাহসী হয়ে উঠতে থাকে, তবে তাতে নিন্দে করবার মতো বিশেষ কিছু থাকতে পারে না।

প্রশান্ত এক এক সময়ে বলে—অলকা, তুমি কল্পনা করতে পার, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি। আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তার হাতটা এভাবে তোমার গলা জড়িয়ে আছে।

অলকা প্রশান্তের হাতটা সজোরে টেনে নামিয়ে দেয়—এরকম বিশ্রী কথা বললে তো আমায় ছুঁতে পাবে না।

প্রশান্ত হাসতে থাকে। তার সুপুরুষতার মূল্য আর মর্যাদা অলকার কাছে মাঝে মাঝে এইভাবে নেহাত রসিকতার ছলেই সে যাচাই করে নেয়। অলকা রাগ করে কিন্তু প্রশান্তের বেশ লাগে।

প্রশান্তের একবার জ্বর হয়েছিল। একটি নার্স রাত জেগে প্রশান্তকে শুশ্রূষা করতো।

নার্সটি দেখতে সুন্দর, তার ওপর বেশ ভদ্র আর লাজুক। ওষুধ খাওয়াবার সময় নার্স প্রশান্তের মাথাটা হাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরতো। নার্সের আগ্রহ ভরা দু'চোখের দৃষ্টি প্রশান্তের মুখের উপর ঝুঁকে থাকতো। অলকা সবই দেখতো, তবু তার মনের কোণে কোন মেয়েলি অভিমানে একটুও অস্বস্তির খোঁচা লাগাতো না। অলকার কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অলকা জানে, প্রশান্তের মনে একতিল জায়গাও আর খালি পড়ে নেই। সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছে স্বয়ং অলকা। প্রশান্তের সঙ্গে বের হয়ে, পথে ট্রামে বাসে কতবার কত সত্যিকারের রূপসী চোখে পড়েছে অলকার, কিন্তু অলকা দেখেছে, প্রশান্ত তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না।

দেশ বিদেশের নাম-করা অ্যাথলেটদের ছবির একটা অ্যালবাম এনে একদিন প্রশান্ত অলকাকে দেয়।—নাও বসে বসে দেখ। এক একটি চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার।

অলকা অ্যালবামটা উল্টিয়ে দেখেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়—ভারী সব ছবি। এসব দেখার কোন গরজ নেই আমার, তোমার সাধ থাকে তুমি দেখ।

প্রশান্তর চোখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি, এবং সেই সঙ্গে গর্বও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই রসিকতাগুলি নেহাত তুচ্ছ, কিন্তু তার মধ্যে যেন এক পরম বিশ্বাস বার বার পরীক্ষায় মাজাঘষা হয়ে খাঁটি সোনার মতো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই প্রশান্ত এত খুশী। প্রশান্তের আত্মশ্রদ্ধা অলকার সমাদরের জলবাতাসে সতেজ চারাগাছের মত ঊর্ধ্বে মাথা ঠেলে উঠেছে। সুন্দরী অলকার কাছে পৃথিবীর সব পুরুষ মিথ্যে, রূপেগুণে, ব্যক্তিত্বে ও প্রেমিকতায় সত্য হয়ে মাত্র একটি পুরুষ অলকার কাছে নিশ্বাসবায়ুর মতো মনপ্রাণ ছেয়ে আছে। সে হলো অলকার স্বামী প্রশান্ত। এই উপলব্ধি প্রশান্তের কথাবার্তায় ঠাট্টায় রসিকতায় এক সবিনয় ঔদ্ধত্যের নেশা এনে দিয়েছে। প্রশান্ত সেটা বুঝতে পারে না বোধহয়। কিংবা বুঝতে পারলেও ভাল লাগে।

প্রশান্তকে যদি পুরুষোত্তম বলা যায়, তবে প্রশান্তের বন্ধু শঙ্করকে অপাংক্তেয় না বলে উপায় নেই। বেশ কালো টাকপড়া মাথা, কপালের ওপর চার পাঁচটা বসন্তের দাগ। জীবন বীমার দালালি করে শঙ্কর। সামান্য রোজগার। লেখাপড়া হয়তো সামান্য কিছু জানে।

শঙ্কর প্রায়ই সন্ধ্যার সময় প্রশান্তের বাড়ি একবার ঘুরে যায়। প্রশান্তের সঙ্গে অনেক পদস্থ ও সম্পন্ন লোকের জানাশোনা আছে। তাদের একটু বলে-কয়ে দিলেই শঙ্কর দু'একটা জীবন বীমার মক্কেল পেয়ে যায়।

শঙ্কর করুণার পাত্র সন্দেহ নেই। প্রশান্ত তাই এই গরীব বন্ধুকে সাহায্য করতে কুণ্ঠা করে না। অলকাও তার যথাসাধ্য করে। চা জলখাবার না খাইয়ে সে কখনো শঙ্করকে উঠতে দেয় না।

অলকা ও প্রশান্ত এক একদিন বেড়িয়ে ফিরে দেখে, শঙ্কর বৈঠকখানার ঘরে একা একা বসে আছে, রাত নটা বেজে গেছে যদিও। ওরা আসা মাত্র শঙ্কর গাত্রোত্থান করে। প্রশান্ত বলে—আরে, এতক্ষণ যখন ধৈর্য ধরে বসেই আছ, তখন আর পাঁচ মিনিট বসে যেতে দোষ কি? বসো বসো।

অলকা প্রশান্তের একটা ইশারা বুঝতে পারে। একটা ডিসে কিছু খাবার সাজিয়ে এনে শঙ্করের সামনে রাখে।

এ ছাড়া শঙ্করকে নিয়ে আর একটা ব্যাপার প্রায়ই হয়ে থাকে। হাসাহাসি আমোদের চর্চা। শঙ্করকে নিয়ে প্রশান্ত প্রায়ই রগড় করে। বিয়ের পর থেকে প্রশান্তের এই খেয়ালটা আরও

বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে।

এক-একদিন প্রশান্তের মাথায় যেন রগড়ের একটা ভূত এসে ভর করে। শঙ্কর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তবু অদ্ভুত এক পুলকে মাতাল হয়ে প্রশান্ত বলতেই থাকে—যদি নেহাত বিয়ে করতে হয় শঙ্কর, তবে প্রেম করে বিয়ে করবে। নইলে আমার মতো পস্তাতে হবে।

পস্তাতে হবে—নিছক রঙ্গ করেই এত বড় একটা মিথ্যা না বলে নিলে প্রশান্ত যেন তার পরিণয়ে কৃতার্থ জীবনের সত্যটিকে চরম করে অনুভব করতে পারে না।

অলকা এসে ঘরে ঢোকে। প্রশান্তের রসিকতা আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে—তুমি জান না অলকা, শঙ্কর এযাবৎ তিনবার প্রেমে পড়েছে। ওর দোষ নেই। নায়িকারাই মরিয়া হয়ে ওর পেছনে লেগেছিল। শঙ্করের উপেক্ষায় একটি ভগ্নহৃদয় তরুণী তো আজ পর্যন্ত বিয়েই করলেন না।

সবই নিছক মিথ্যা, তৈরি করা কাহিনী মাত্র। নগণ্য শঙ্করের জীবনে নিতান্তই অলীক উপকথার কতগুলি বিদ্রূপ। তবু এসব কথা বলে প্রশান্ত কি যে আনন্দ পায় তা সে-ই জানে।

অপ্রস্তুত শঙ্কর সত্যিই লজ্জায় আরও কুৎসিত হয়ে ওঠে। অলকা সামনে বসেই সব শুনছে, হয়তো সব বিশ্বাস করে ফেলেছে। শঙ্কর প্রশান্তকে ধমকের সুরে আপত্তি জানায়—কি সব বাজে কথা বলছো প্রশান্ত ? তোমার আর মাত্রাজ্ঞান নেই।

অলকার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে শঙ্কর চোখ নামিয়ে নেয়। অলকা শান্তভাবে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতুকে অলকারও চোখ দুটি হাসতে থাকে। একটা অধঃপতিত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দূর নক্ষত্রের দরদের মতো অলকার চোখের হাসিটা যেন মিটিমিটি জ্বলে।

চা খাওয়া শেষ করে শঙ্কর। জীবন বীমার নতুন একজন মক্কেলের ঠিকানা প্রশান্তের কাছ থেকে জেনে নিয়ে উঠে পড়ে শঙ্কর, চলে যায়।

প্রশান্ত একদিন বললো—তোমার সৌভাগ্যের চন্দ্রকলা এতদিনে পূর্ণ হলো অলকা।

অলকা—কি হলো ?

—তুমি মনে করেছ, শঙ্কর এখানে শুধু খাবার খেতে আর জীবন বীমার মক্কেলের খোঁজ নিতে আসে ?

—তা মনে করবো কেন ? তোমার বন্ধু মানুষ, তুমি ওকে ভালবাস তাই আসে।

—না গো বিশ্বমনোরমা, তোমাকেই দেখতে আসে।

—কি যে বলো। এরকম বিদ্‌ঘুটে কথা আর বলো না, আর যা-ই বলো।

প্রশান্ত যেন এতদিনে তার কল্পনার মধ্যে আর একটি প্রচণ্ড প্রহসন তৈরি করেছে। হাসি থামাতে পারে না প্রশান্ত।

প্রশান্ত প্রস্তাব করে—একটা মজা করতে হবে অলকা। তোমাকে রাজি হতেই হবে।

অলকা একটু ভয় পায়। ঠিক ভয় নয়, লজ্জাই বোধ হয়। ভয় পাবার মতো মন তো তার নয়—আমাকে আবার কি করতে হবে ?

—তুমি শঙ্করকে একদিন প্রেম নিবেদন কর। আমি পাশের ঘরে থাকবো। আমি শুধু বোকাটার মুখের ভাবটুকু স্টাডি করবো ; দেখি ও কি বলে, আর কি করে।

অলকা বিরক্তির সঙ্গে প্রবলভাবে আপত্তি জানায়—এসব কি কথা ! তোমার বন্ধুকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা-রগড় কর, সেটা খারাপ কিছু নয়, কিন্তু আমি ওসব করতে যাব কেন ? ছিঃ।

—আরে, শুধু একটু থিয়েটারী ঢঙে অভিনয় করবে।

—কি করতে হবে ?

—বলবে, শঙ্করবাবু, আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আজও বুঝতে পারলেন না। আপনি হৃদয়হীন... ।

অলকা ঘৃণায় ও লজ্জায় শিউরে ওঠে—রামো রামো ! অভিনয় করেও কি এসব কথা বলা যায় ! তার চেয়ে গুডফ্রাইডের ছুটিতে রাণু যখন এখানে আসবে, তোমরা শালী-ভগ্নীপতিতে ষড়যন্ত্র করে শঙ্করকে নিয়ে যত খুশি মস্করা কর, আমি বাধা দেব না। রাণু চোখেমুখে কথা বলতে পারে, এসব ও-ই ভাল পারবে।

—রাণুকে দিয়ে এসব করালে আমার কি লাভ হলো ? আমি যেটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে চাই, আসলে সেটাই হবে না।

অলকা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। আবার এক কোন খেয়াল নিয়ে মশগুল হয়েছে প্রশান্ত ? না, প্রশান্তের প্রেমিকতার শ্লাঘা মনের ভেতর থাকলেই সুন্দর ছিল। যেটা নিঃসংশয় সত্য, তাকে বার বার নানা তুচ্ছ প্রসঙ্গে খুঁটে খুঁটে যাচাই করবার কোন অর্থ হয় না। অবশ্য এসব রগড় মাত্র। সেটা প্রশান্ত জানে, অলকাও বোঝে। তবু...তবু অলকা একটু বিরক্তই হয়।

অলকা—বড় বেশি ছেলেমানুষী কবছো তুমি। লোকটাকে নিয়ে ছিনিমিনি করে কি সুখ পাও বুঝি না।

কিন্তু প্রশান্তের অনুরোধের জেদে শেষ পর্যন্ত রাজী হয় অলকা—যাই হোক, আমি কিন্তু কথাগুলি বলেই পালিয়ে যাব। কি বলতে হবে লিখে দাও, মুখস্থ করে নিই।

একটা কাগজ টেনে নিয়ে লেখা শেষ করে প্রশান্ত বললো—এই কথা ক'টি বলবে, শঙ্কর, প্রাণেশ আমার। আমার বাইশ বছর বয়সের সকল কামনা শুধু তোমাকেই যে লতার মতো জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ওগো চিতচোরা.. ।

অলকা লেখাটা পড়ে নিয়ে বলে—ভারি রগড় করছো। এসব ভাষা শুনলে কে না বুঝবে যে ভান করা হচ্ছে।

—তা হলে কি ভান করে একেবারে খাঁটি প্রেমের কথা . তা কি করে হয়...তা কি বলতে পারবে ?—অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে প্রশান্ত।

অলকা বিরক্ত হয়ে বলে—কি যে বলো !

প্রশান্ত একটু সমস্যায় পড়ে আমতা আমতা করে উত্তর দেয়—যাই হোক, একটু উদ্‌ভ্রান্তের মতো কথাগুলি বলবে, তা হলেই শুনতে বেশ লাগবে। ভান-ফান বুঝতে না পেরে ঘাবড়ে যাবে।

বৈঠকখানা সেদিন সন্ধ্যায় এত ভাল করে সাজানো হলো কেন ? ফুলদানির ওপর এত বড় দুটো গন্ধরাজের তোড়া রাখবার কিই-বা প্রয়োজন ছিল ? একগুচ্ছ ধূপখাঠি পুড়িয়ে ঘরের বাতাস এত সুরভিত করাই বা কেন ? প্রশান্ত অলকার দিকে তাকিয়ে উৎসাহে হাসতে থাকে—বাপ্‌রে, ঘরে যেন সত্যিই রোমান্স থমথম করছে।

শঙ্করের পায়ের শব্দ শুনে প্রশান্ত পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে গিয়ে বসে থাকে।

বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত এসেই শঙ্কর থেমে গিয়ে প্রশ্ন করে—প্রশান্ত নেই ?

অলকা—না, এই কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরবে ?

—আজ ফিরতে রাত হবে অনেক।

—আচ্ছা, আমি আজ তাহলে যাই।

—সে কি কথা ? নতুন করে আপনাকে অনুরোধ করতে হবে নাকি ? চা খেয়ে তারপর

যাবেন।

চা আনে অলকা। চা খাওয়া শেষ করে শঙ্কর একটা বই তুলে নিয়ে এক মনে পড়তে থাকে। অলকা উসখুস করে, ঘরের ভেতর পায়চারি করে। চেয়ারের ওপর বসে কিছুক্ষণ, তারপরই ছটফট করে উঠে পড়ে। ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দায় আলোর সামনে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো থেকে কাগজটা খুলে লেখাগুলি একবার পড়ে নেয় অলকা। সবই মুখস্থ করা ছিল, তবু আর একবার যেন মনস্থ করে নেয়, যেন আবৃত্তি করতে কোন ভুল না হয়, কোন কথা ফস্‌কে না যায়।

ঘরে ঢুকেই অলকা বলল—শঙ্করবাবু!

শঙ্কর—বলুন।

দুটি মিনিট বৃথাই স্তব্ধ হয়ে রইল। অলকা মনে মনে কথাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকে।

অলকা—শঙ্করবাবু, আপনি রোজই এখানে আসেন কেন ?

শঙ্কর বই পড়া বন্ধ করে বিস্মিত হয়েই অপ্রস্তুতের মতো বলে—আমার আসাটা কি আপনারা পছন্দ কবেন না ?

—শুধু জিজ্ঞাসা করছি, কেন আসেন ?

—কাজের দায়েই আসতে হয়। প্রশান্ত দু'একটা পার্টির খোঁজ দেয়, তাই। তা না হলে এত ঘন ঘন আপনাদের বিরক্ত করতে. ।

—সেই সামান্য খোঁজ নিতে কতক্ষণ সময় লাগে ? কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন কেন ? কি দরকার ?

—দরকার কিছুই নয়। আপনারা কিছু মনে করেন না বলেই বসে থাকি।

—তাই বলে কি বোজ আসতে হয় ? রোজ এখানে আসতে এত ভাল লাগে আপনার ?

—তা, ভাল লাগে বৈকি ! এত সজ্জন আপনারা।

পাশের ঘরের চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে না পড়লেও, বোঝা যায়, সেখানে অস্ফুট একটা প্রতিবাদ যেন ইঙ্গিতে শব্দ করে বেজে উঠছে। মেঝেতে প্রশান্তের জুতোটা দুবার ঘষা লেগে আর বেশ জোবে একটা শব্দ করছে। নেপথ্য থেকে যেন কতকগুলি সঙ্কেত অলকার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে—অভিনয ঠিক হচ্ছে না।

অলকা বলে—আপনার বন্ধু সজ্জন হতে পারেন, কিন্তু আমাকে প্রশংসা করছেন কেন ? আমি তো আপনার কোন উপকার করিনি।

শঙ্কর—বন্ধু তো সজ্জন হবেনই, তার জন্য প্রশংসা করার কি আছে ? বরং আপনি কেউ না হয়েও যতখানি... ।

অলকা—কি ?

শঙ্কর—যতখানি খাতির করেন, আপন জনের মতো ব্যবহার করেন... ।

অলকা—আমি খাতির করি ? আমি আপন জনের মতো ব্যবহার করি ? সত্যি বলছেন ?

শঙ্কর আস্তে আস্তে চোখ তুলে অলকার দিকে তাকায়।

তিন চার মিনিট ধরে ঘরের ভেতর একটা মূর্ছাহত নীরবতার মধ্যে দেয়াল ঘড়িটা শুধু টিক্‌টিক্ করে বাজতে থাকে। কৌতূহলের আবেগে অস্থির প্রশান্তের চোখ দুটো পর্দার আড়াল থেকে সহসা চোরা টেলিস্কোপের মতো উঁকি দেয়।

এক হঠাৎ-গোধূলির ছোঁয়া লেগে বৈঠকখানার ঘরটা যেন অবাস্তব হয়ে আকাশপটের মতো অনেক দূরে সরে গেছে। শঙ্করের মুখটা যেন ছেঁড়া মেঘের মতো তার মধ্যে ভাসছে। বসন্তের দাগগুলি তবু স্পষ্ট চিনতে পারা যায় ! শঙ্করের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

অলকা। একটা রাত্রি-শেষের চাঁদ যেন একটা জঙ্গলের মাথার উপর সান্ত্বনার জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে।

শুনতে পায় প্রশান্ত, যদিও অলকার স্বরটা কানে-কানে বলা কথার মতোই অস্পষ্ট।—এখানে আসতে ভাল লাগে ?

শঙ্করের ছোট ছোট চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে পিলসুজের পোড়া তেলের মতো চিক্‌চিক্ করতে থাকে—হ্যাঁ, ভাল লাগে।

অলকা বলে—রোজ আসবেন, কেমন ?

শঙ্কর চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে অলকা বুঝতে পারে, পাশের ঘরে আলো জ্বলছে, পুঞ্জ পুঞ্জ সিগারেটের ধোঁয়া ভেসে আসছে।

একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে প্রশান্ত বই পড়ছিল। অলকা ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢুকতেই প্রশান্ত হাসে—রগড়টা জমিয়ে তুলেছিলে বেশ।

আবার শান্তভাবে এবং সুস্থির হয়ে একমনে বই পড়তে থাকে প্রশান্ত।

ফল্গু ও ফাল্গুন

আর দেরী না করে, আগন্তুক ভদ্রলোককে স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আপনি এখন চলে যান। কারণ, আপনি যাঁর নামে চিঠি নিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বাড়িতে নেই..., তিনি আজও নয় কালও নয়, একেবারে পরশু'দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরবেন। তাছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় কোন পুরুষ মানুষও নেই যে আপনার সঙ্গে কোন কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবুর কাছ থেকে এই বাড়ির হেমবাবুর নামে যে চিঠি নিয়ে এই ভদ্রলোক এসেছেন, তাতে শুধু লেখা আছে যে, এই ছেলেটি হলো আমার এক বন্ধুর ছেলে জয়ন্ত। জয়ন্ত ওর দরকারের কথাটা নিজেই আপনাকে বলবে। আমি আজ দুপুরে চক্রধরপুর যাচ্ছি, ভোরের ট্রেনে ফিরবো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ময়ূর যোগাড় করেছি। আপনি যদি নিতে চান, তবে পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু আগন্তুক এই ভদ্রলোক, যার নাম জয়ন্ত, যার চেহারা দেখে মনে হয় বয়স তিরিশের বেশি হবে না, আর ওই সামান্য যে পরিচয় স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবুর চিঠিটাতে লেখা আছে, সেটা তো প্রায় একটা অপরিচয়। বলতে গেলে, নিতান্ত অজানা একটা মানুষ।

রেল-স্টেশন এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, এই কদমপুরা এখনও একটা শহর হয়ে উঠতে পারেনি। বাজার আছে, বস্তি আছে ; তাই একটা থানা আছে, আর আছে, রোড ওভারসিয়ারের এই সরকারী কোয়ার্টার, বাংলো-ধাঁচের ছোটখাটো একটি বাড়ি, যার টালির চালা লতানে গোলাপের ফুলে ও পাতায় একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। বারোমেসে হলদে গোলাপ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থোকা থোকা গোলাপের উপর রঙীন ফড়িং আর প্রজাপতি ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায় ; সড়কের পাশে একা মাঠ, তার এদিকে গোটা চারেক পলাশ, ওদিকে কদমের ফুল। সবচেয়ে সুখের হলো, কদমপুরার শালবনের শোভা আর দূরের ওই জোড়া-পাহাড়। ভোরের আলো, পূবের মেঘ, আর চাঁদের আলো-মাখানো শীতের কুয়াশা, সবই অদ্ভুত এক মায়ার খেলা বলে মনে হয় এই জোড়া-পাহাড় আর শালবন আছে বলে।

এই শালবনেরই ভিতরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর কাটার কাজ চলে। ঠিকেদারের মোটর লরি সারাদিন ছুটোছুটি করে আর টন টন কুচো পাথর নিয়ে কদমপুরা রেল-স্টেশনের সাইডিং-এ জমা করে। কদমপুরা বাজারে ঠিকেদারদের অনেক আস্তানা আছে; ডিপো আছে, মোটর-লরির গ্যারেজও আছে। কদমপুরার শান্ত শালবনের মধ্যে ডিনামাইটের চাপা-চাপা শব্দ সারাদিনই বাজে।

আজ প্রায় এক বছর হলো কদমপুরার এই বাড়িতে আছেন রোডি ওভারসিযাব হেম সরকার। তাঁর আগে যিনি রোড ওভারসিয়ার হয়ে এই বাড়িতে ছিলেন, সেই অতুল বায এখন সাসারামে আছেন। একটানা প্রায় চার বছর ধরে এই বাড়িতে ছিলেন সেই অতুল রায়। দু'বছর আগে, তার মানে বদলি হবার একবছর আগে এই বাড়িতেই অতুল বাযেব মেযে প্রভার বিয়ে হয়েছিল। স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবু এখনও ঠিকাদারদের সঙ্গে গল্প করেন—আঃ, বেচারা অতুল কী ভয়ই না পেয়েছিল; এরকম একটা জংলী কদমপুরাতে মেয়ের বিযের সব ব্যবস্থা কী করে হবে? আমি গ্যারান্টি দিযেছিলাম, কোন চিন্তা নেই অতুল। আমি থাকতে কোন ব্যবস্থার অভাব হবে না। চক্রধরপুর থেকে আমিই তো বাঙালী পুবোহিত নিযে এলাম, আমিই রাজবাড়িব পুকুর থেকে মাছ ধবিয়ে নিযে এলাম, প্রায মণ দুই পাকা পাকা কই। আমারই চেষ্টাতে বাবুলাল শেঠেব ধর্মশালাতে ববযাত্রীদেব থাকবাব চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ।

—বাড়িতে কে আছেন! জয়ন্তর ডাক শুনে ঘরেব দরজার পর্দা সরিয়ে বাইবেব বারান্দাতে যাঁরা দুজন উঁকি দিয়েছে, আর জযন্তর হাত থেকে চিঠি নিয়ে ঘরের ভিতরে হেমবাবুব স্ত্রী বিজযার হাতে দিয়েছে, তারা হলো রমা আর ইমা, হেমবাবুর দুটো মেয়ে। একজনেব বযস দশ, আব একজনের বয়স সাত। আর বিজযা সেই চিঠি পড়ে যাকে জানিযেছে, সে হলো বিজয়ারই সমান বয়সের এক মহিলা.. হেমবাবুর বড় ভাই ধীরেশ সরকারের মেযে বীতা সরকার।

ঠিকাদারদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করেন স্টেশনমাস্টার সুধাকববাবু—কে বিশ্বাস কববে যে, আমাদের এই রোড ওভারসিয়ার হেমবাবুর বড়দা হলেন দিল্লীওয়ালা একজন সেক্রেটাবী, একটা সরকারী দপ্তরের বড়কর্তা। সাহেব মানুষ সেই ডি সবকার, যিনি এগার বছব লণ্ডনে ছিলেন, যিনি আজকাল ভাল করে বাংলা বলতেও পারেন না, তাঁরই আপন ভাই এই হেমবাবু কিন্তু কুমড়োর কচি ডাঁটা খুঁজে বেড়ান আর চেঁচিযে রামপ্রসাদী গান করেন। কী আশ্চর্য, এক বৃন্তে এরকম একেবারে দুটি ভিন্ন ফুলও হয়!

ডি. সরকারের মেয়ে রীতা সরকারও কদমপুরার রোড ওভারসিয়ারের এই বাড়ির ভিতরে এখন একটা অভাবনীয় বিস্ময়েরই শোভা। বয়সে প্রায় সমান হলেও বিজয়া কাকিমার সঙ্গে এই রীতা সরকারের রূপে, গুণে, সাজে ও প্রসাধনে, শিক্ষাতে ও রুচিতে, চোখের চাহনিতে ও হাসির ভঙ্গীতে কোন মিল নেই। যে বিছানার উপর শুয়ে বিজয়াকাকিমার হাতের ওই চিঠির কথাগুলি শুনেছে রীতা, সেই বিছানার উপর, কে-জানে কোন বিলিতি পাখির পালক দিয়ে তৈরি একটা ঢাকা, বিছানার উপর, একগাদা বই ছড়িয়ে পড়ে আছে। সবই ফরাসী নভেল। ইংরেজীর এম-এ রীতা সরকার ফরাসী ভাষাও জানে। বিছানার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপরে ছোট একটি আয়না, লিপস্টিক আর পাউডারের ডিবে পড়ে আছে। আর আছে, একজোড়া আইল্যাশ। জিনিসগুলি রীতা সরকারের যখন-তখন দরকার হয়; তাই হাতের কাছেই থাকে। সন্ধ্যা হবার পর গরম জলের ভাপ আর স্কিন-লোশন দিয়ে মুখটাকে ধোয়ামোছা করে নিয়ে তারপর ওই আই ল্যাশ যখন চোখে লাগায় রীতা, তখন রমা ইমা খুশি হয়ে হাততালি দেয় ও নেচে ওঠে—রীতাদির কী সুন্দর চোখ! বিজয়াও আশ্চর্য হয়ে আর

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে। ঠিকই, রীতার দুই চোখের পাতা যেন স্বপ্নমাখানো দুটি মায়ার ঝালর। রীতা হাসে, চোখ বড় করে তাকায়। রীতার ওই সুন্দর মুখের শোভাও যেন টলমল করে দুলতে থাকে।

ওভারসিয়ার কাকার বাড়িতে কুমড়োর কচি ডাঁটার ঝাল খেতে খুব আপত্তি নেই রীতার। কিন্তু সেজন্য রীতার বিজয়াকাকিমার দুশ্চিন্তার কোন ঝঞ্ঝাট নেই। রীতা নিজেই তার দরকারের অনেক উপচার সঙ্গে নিয়েই এসেছে—মাখন বিস্কুট মাংস ও মাছের সস্, জ্যাম ও জেলির গুঁড়ো, ডিম আর গুঁড়ো দুধ, পীচ আর আঙুরের যত ডিবে শিশি আর বোতল। নিজের রুচি আর অভ্যাসের জন্য যা-কিছু দরকার, তার অনেক কিছুই নিয়ে এসেছে রীতা। ভাসুরের সঙ্গে পুরো দুটি বছর জাপানের টোকিওতে ছিল যে ভাসুরঝি, তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কদমপুরার এই কাকিমা মানুষটিকে তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি।

একটি মাস, বড় জোর দুটি মাস এই কদমপুরাতে কাকার বাড়িতে থাকবে, তারপর আবার দিল্লিতে ফিরে যাবে রীতা সরকার। কোন কুণ্ঠা না রেখে, সমবয়সী কাকিমাদের কাছে মনের কথাটা বলেই দিয়েছে রীতা—আমি ইচ্ছে করেই ফেরারী আসামীর মতো গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকবার জন্যে তোমাদের এখানে এসেছি কাকী। কেউ জানে না, শুধু বাবা জানেন যে, আমি এখন তোমাদের এই কদমপুরাতে আছি।

বিজয়া হেসেছেন—কার নজরের ভয়ে গা-ঢাকা দিলে ?

—ভয়ে নয়, ভয়ে নয়। চেঁচিয়ে হেসে ওঠে রীতা।

—তবে ?

—ভালবেসে।

—ভালবাসলেই যদি, তবে আবার লুকিয়ে থাকা কেন ?

—কাকী, তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না,—এটা হলো ভালবাসায় ট্রায়াল। জানতে চাই, বুঝতে চাই, বেচারা সোমেন আমাকে দেখতে না পেয়ে আর খুঁজে না পেয়ে পাগল হয়ে গেল কি না।

—তাতে তোমার লাভ ?

—আমার লাভ এই যে, সোমেন এইবার মর্মে মর্মে বুঝতে পারবে যে, আমিই ওর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সুখ। আমি ছাড়া সোমেনের জীবনটা জীবনই নয়।

বিজয়া আবার হাসেন—সোমেনকে পাগল করতে গিয়ে শেষে তুমি নিজেই পাগল হয়ে যাবে না তো ?

—আমি ? আমি পাগল হব ? রীতা সরকার পাগলী হবে ? তুমি আমার প্রাণটাকে একটুও চিনতে পারনি, কাকী।

রুমাল দিয়ে সুন্দর মুখের চাপা হাসিটাকে একটু আড়াল করে নিয়ে রীতা সরকার বলে—তোমার কাছে মুখ খুলে মনের কথা বলতে আমার কোন লজ্জা নেই, তাই বলছি কাকী, সোমেনকে ভালবেসেছি বটে, তবু এখনও ভাবতে হচ্ছে, সোমেনকে একেবারে স্পষ্ট করে একটা হ্যাঁ বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেওয়া উচিত হবে কি না।

—এ কী কথা ! খুব অদ্ভুত কথা !

—আমি আজ পর্যন্ত কাউকেই একেবারে স্পষ্ট করে হ্যাঁ বলতে পারিনি। মৃগাঙ্ক মনে করে, আমি ওকে বিয়ে করবো। শিবরামন মনে করে, ওরই সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমার দোষ নয়, কাকী। আমি কখনও কাউকে কোন কথা দিইনি। ওরা নিজের নিজের ইচ্ছায় বিশ্বাস করে বসে আছে।

—কিন্তু...।

—আমার মনের ভিতরে কোন 'কিন্তু' নেই কাকী। আমি এত তাড়াতাড়ি কাউকেই কোন কথা দিয়ে ফেলতে পারবো না, এমনকি সোমেনকেও না।

—এ যে আরও অদ্ভুত কথা হয়ে গেল, রীতা।

—হতে পারে, কিন্তু আমার উপায় নেই, কাকী। আমি এত সহজে. ।

বিজয়া-কাকিমা এইবার রীতার হাতে আস্তে একটা চিমটি কাটেন ও হাসেন—তার মানে, ঢলে পড়তে পার, কিন্তু গলে পড়তে পার না। তাই না ?

—জানি না, জানি না। বলতে বলতে মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠে রীতা। দুই চোখে দুই মায়ার ঝালর। সেই চমৎকার আইল্যাশও যেন কেঁপে কেঁপে হাসতে থাকে। বিজয়া-কাকিমার গাল টিপে ধরে রীতা সরকার। কাকী, তুমি ভয়ানক দুষ্ট, তোমার ভাষা আরও দুষ্টু।

অতি আধুনিকা ও অতি শিক্ষিতা ভাসুরঝির সঙ্গে কথা বলতে আর এ রকম অদ্ভুত কথা শুনতে ভালই লাগে কদমপুরার বিজয়া-কাকিমার। একটা ভিন্ জগতের রূপকথা শুনতে কার না ভাল লাগে ?

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ভিন্ জগতের রূপকথার ওই মেয়েকে আগন্তুক ভদ্রলোকের চিঠির কথাগুলি শুনিয়ে দিয়ে কোন লাভ হল না। চিঠির কথাগুলি শুনলো আর হাত বাড়িয়ে একটা নভেল তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল রীতা সরকার। কোন কথা বলে না রীতা। বিজয়া তাই নিজের মনে গুনগুন করে বলেন—ভদ্রলোককে কী যে বলা যায়, বুঝতে পারছি না।

এইবার কথা বলে রীতা। চলে যেতে বলে দাও, এর মধ্যে ভেবে দেখবার কী আছে ?

—বলে দিতে পারা যায়, কিন্তু

—কিসের কিন্তু ?

—কে জানে, হয়তো একজন অতিথি মানুষ। ভদ্রলোক কেন এসেছেন, সে কথাটা না জেনে নিয়ে চলে যেতে বলা উচিত হবে কি ?

রীতা হাসে—তাহলে আমার আর বলবার কিছু নেই, যা ইচ্ছে হয় করো।

ফরাসী নভেলটাকে বুকের উপর রেখে এইবার বিছানার উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ে রীতা।

কদমপুরার রোড ওভারসিয়ার হেম সরকারের স্ত্রী বিজয়া সরকারের পক্ষে একটু চিন্তিত হবারই কথা। চিঠি দিয়েছেন, আর কেউ নয়, ওই স্টেশনমাস্টার সুধাকরবাবু; যিনি কদমপুরার এই বাড়ির সব দরকারে তাঁর সাধ্যমত উপকার করেন। এই সেদিন, তিন সের সোনামুগের ডাল যোগাড় করে পাঠিয়েছেন। ইমার অসুখের সময়ে দিনে তিনবার এসে খোঁজখবর নিয়েছেন, রাঁচি থেকে ওষুধ আনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বন্ধুর ছেলে জয়ন্তকে এখনি একেবারে চলে যেতে বলা উচিত হবে ? কিন্তু চাকর কালুরামও তো এখন বাড়িতে নেই; দুধ আনতে দেড় মাইল দূরের সেই মাহাতোর বাড়িতে গিয়েছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবে কে ?

বিজয়া অগত্যা দরজার আড়ালে দাঁড়াল। দশ বছর বয়সের রমাকে ডাক দিয়ে বললেন—যা রমা, ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর, উনি কেন এসেছেন।

রমা সেই মুহূর্তে দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে আসে আর জিজ্ঞাসা করে—কেন এসেছেন ?

জয়ন্ত—হেমবাবুর সঙ্গে দেখা করা আর কয়েকটা কথা বলবার দরকার ছিল।

রমা—বাবা বাড়িতে নেই।

জয়ন্ত—কখন আসবেন ?

রমা—আজ আসবেন না।

জয়ন্ত—কিন্তু আমার যে আজই দরকার ছিল।

দরজার আড়াল থেকে রমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করেন বিজয়া—কী দরকার ?

সাত বছর বয়সের ইমা সঙ্গে সঙ্গে একটা দৌড় দিয়ে বাইরে চলে যায় আর জিজ্ঞাসা করে—কী দরকার ?

জয়ন্ত হাসে—আমার দরকারের কথা শুনলে তোমরা হেসে ফেলবে না তো ?

রমা বলে—আমি হাসবো না।

জয়ন্ত—আজ সন্ধ্যাবেলা তোমাদের ঘরে যখন আলো জ্বলবে, তখন আমি তোমাদের একটি ঘরের ভিতরে, এই যে বারান্দার এদিকে এই ছোট ঘরটার ভিতরে গিয়ে একটু দাঁড়াবো আর দেখবো।

সন্ধ্যা হতে তো আর বেশি দেরি নেই। পলাশের মাথার উপরে বিকালের শেষ রোদের শেষ আভাটুকুও এখন আর নেই। এরই মধ্যে কদমকুঞ্জের পাশে বুড়োটার বটের মাথার উপরে বাদুর উড়তে শুরু করেছে। ফাল্গুন মাসের পাহাড়ী কদমপুরার শেষ বিকালের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বইতে শুরু করেছে, সিরসির করে কাঁপছে শালবনের মাথা।

দরজার আড়ালের বিজয়ার দিকে একবার তাকায় রমা, তারপর জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে আরও চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে—কেন ?

জয়ন্ত হাসে—আজ একুশে ফাল্গুন, আমার বিয়ের দিন। তিন বছর আগে সেদিন এ বাড়িতে যিনি ছিলেন, সেই অতুল রায়ের মেয়ে প্রভার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। আর, ওই ছোট ঘরটাই হয়েছিল বাসরঘর।

রমা—তোমার বউ কোথায় ?

জয়ন্ত অদ্ভুতভাবে হাসে—আমার বউ মরে গিয়েছে।

ইমা—তুমি খুব কেঁদেছিলে ?

জয়ন্ত—হ্যাঁ।

ইমা—আবার কাঁদবে ?

জয়ন্ত—হ্যাঁ। সব সময়ই তো কাঁদছি, কেউ কিন্তু বুঝতে পারে না।

দরজার আড়ালে চুড়ির শব্দ বাজে, একটা চাপা গলার স্বরও ফিস্‌ফিস্ করে—বসতে বল, রমা।

রমা—তুমি বসো। বারান্দার একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত। বিজয়ার হাতের ইশারা দেখতে পেয়ে রমা ঘরের ভিতরে ছুটে আসে, তারপর বাইরে গিয়ে জয়ন্তর চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ায়—তুমি এখন চা আর পরোটা খাবে, তারপর সন্ধ্যা হলে...।

ইমা ছুটে এসে জয়ন্তর হাঁটুর উপর হাত রেখে ছট্‌ফট্ করতে থাকে—আলু ভাজাও খাবে।

জয়ন্ত চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—না না, আমি কিছু খাব না। আজকের দিনে আমি কিছুই খাই না।

ইমা—তোমার বউ মরে গেল কেন ?

—কে জানে কেন ! নিজেই আমাকে চিঠিতে লিখলে জ্বর কমেছে, এইবার শিগগিরই আমি তোমার কাছে যাব। তুমিই এসে নিয়ে যেও।

রমা—তুমি আসনি ?

—হ্যাঁ। চিঠি পেয়ে সাতদিনের মধ্যেই চলে এলাম। কিন্তু এলে কি হবে, এসেই জানতে পেলাম, প্রভা তিন দিন আগেই চলে গিয়েছে।

ইমা—কোথায় গেল ?

—ওই ওই যে জোড়া পাহাড়ের মাথার উপরে একটা তারা ফুটে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ?

ইমা—হ্যাঁ।

—ওইখানে চলে গিয়েছে প্রভা।

ইমা—কবে আসবে ?

—আর আসবে না, কোনদিনও না। আমি চিরকাল একলা হয়ে এই পৃথিবীতে পড়ে থাকবো।

রমা—তুমি কোথায় থাক ?

—আমি থাকি অনেক দূরে, আসামে। সে জায়গাটাব নাম হাফলং। সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত রেলগাড়ীতে থাকি। তার পর ঘরে ফিরে এসে ঘুমিযে পডি। কিন্তু ঘুম হয় না।

ইমা—তোমাব সাইকেল নেই ?

—আছে।

ইমা—তবে রোজ বেলগাডীতে চডো কেন ?

—আমি ট্রেনের গার্ড।

রমা—তুমি হুইসিল বাজাও ? নিশার্ন দেখাও ?

—হ্যাঁ। ওই তো আমার কাজ।

রমা—কাজ করে টাকা পাও ?

—হ্যাঁ।

রমা—অনেক টাকা ?

—হ্যাঁ, একশো আশি টাকা।

রমা—বাবা পায় দু'শো দশ টাকা।

রমা আর ইমা হঠাৎ এক সঙ্গে দৌড দিযে ঘবেব দবজাব দিকে ছুটে যায। দরজার পর্দাব আডাল থেকে একটা ইশারার হাত ডাক দিযেছে। গলাব স্বব চেপে কথা বলে বিজয়া—তোমবা এখন ঘবেব ভেতরে থাক। কালুবাম আসুক। ঘবে আলো জ্বলুক, তারপর না হয় ।

বুকের উপর থেকে ফরাসী নভেল নামিয়ে রেখে এইবার বেশ একটু বিরক্ত স্বরে কথা বলে রীতা—তুমি বড় বেশি ইয়ে মানুষ, কাকী। আজেবাজে একটা লোককে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হলো না।

বিজযা চোখ বড় করে তাকায়—আজেবাজে লোক নয়, রীতা। সুধাকরবাবুর বন্ধুর ছেলে। আমাদেরই চেনা অতুল রাযের জামাই। অতুল রাযের মেযে প্রভাকেও আমি দেখেছি।

রীতা—যাই হোক না কেন, এরকম একটা মানসিক রোগে ভুগছে যে লোক, তাকে আপ্যায়িত করবার কোন মানে হয না।

বিজযা—মানসিক রোগ ?

রীতা সরকারের চোখের ভ্রূকুটি যেন আরও রাগ করে আব ঘেন্না করে আবও কুঁচকে যায়।—তা ছাড়া আর কী ? ট্রেনের গার্ড তো দূরের কথা, কোন সোমেন মজুমদার যদি আজ এখানে এসে এরকম প্রেমের একটি আষাঢ়ে গল্প বলতো, তবে আমি তাকেও মানসিক রোগের মানুষ বলে মনে করতাম। যদিও সোমেন হলো..।

বিজয়া—কী ?

রীতা—দিল্লীর নাম-করা সার্জন, সোমেনের শুধু একটি ক্লিনিকের মাসিক আয় দশ হাজার টাকার মতো। তা ছাড়া আলমোড়াতে সোমেনের দুটি বাড়ি আছে। দেখতে শুনতে সোমেনের মতো ব্রাইট আর স্মার্ট মানুষ তুমি সারা কলকাতাতেও খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ।

বিজয়া হাসেন—ভগবান করুন, আসছে বৈশাখেই যেন সোমেনের সঙ্গে তোমার...

রীতা—আঃ, চুপ করো, কাকী। ওসব কথা এখন থাক। তুমি এখন লোকটাকে চলে যেতে বলে দাও।

বিজয়া—বলতে পারা যাবে না, রীতা।

রীতা—তুমি যদি বলতে না পার, তবে আমিই বলে দিই।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রীতা। জানালার পর্দাটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেয়। বাইরের বারান্দার দিকে তাকায়। সত্যিই বুঝি এখন ভদ্রলোককে হাঁকিয়ে দেবে রীতা।

—থাম রীতা, লক্ষ্মীটি, তুমি কোন কথা বলো না। রীতার হাত চেপে ধরে মিনতি করেন বিজয়া।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে রীতা হাসতে থাকে—এই লোকটা! ওই কালো কষ্টিপাথর আর আধ-মাথা টাক উনিই নাকি আস্ত একটি রোমান্সের মস্ত একজন হিরো। আমার যে হাসতেও ইচ্ছে করে না কাকী!

কিন্তু হেসে হেসেই আবার ফরাসী নভেল হাতে তুলে নেয় রীতা সরকার। ঘরে এখনও আলো জ্বলেনি, বই পড়া সম্ভব নয়। তবু বোধহয় বিদ্‌ঘুটে একটা অস্বস্তির ছোঁয়া থেকে মনটাকে মুক্ত করবার জন্যে বই পড়তে চেষ্টা করে রীতা।

বিজয়া বলেন—প্রভাও দেখতে বেশ কালো ছিল। তার উপর বেশ রোগা। কিন্তু মুখের হাসিটা বেশ মিষ্টি। লেখাপড়া কিছুই শেখেনি, কিন্তু কী অদ্ভুত খাটতে পারতো মেয়েটা। স্বভাবটাও কত নরম। চার বছর আগে, রামগড়ে বদলি হবার সময় আমরা সবাই এই বাড়িতে এসে একদিন ছিলাম। আমাদের কী যত্নই না করেছিলেন অতুলবাবু। সবচেয়ে আশ্চর্য করে দিয়েছিল ওই প্রভা। আমার কোন আপত্তি শুনলো না, নিজের হাতে গরম জল দিয়ে আমার পা ধুয়ে দিয়ে আলতা পরিয়ে দিল। প্রভার কথা মনে পড়লে সত্যিই মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়।

দুধ নিয়ে ফিরে এসেছে চাকর কালুরাম। বিজয়া বলেন—ওই ঘরে একটা আলো জ্বেলে দাও কালু; আর ওই বাবুকে বল, ঘরে আলো জ্বালা হয়েছে, এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে যা দেখবার দেখে নিন।

পাশের ছোট ঘরে আলো জ্বালে কালুরাম। ঘরের দরজাও খুলে দেয়। রমা আর ইমা সেই মুহূর্তে দৌড় দিয়ে আবার বারান্দায় গিয়ে জয়ন্তর হাত ধরে টানাটানি করে—চল, তোমার বাসরঘর দেখবে চল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। ঘরের আলোর আভা যেন চিকচিক করে জয়ন্তর দুই চোখের তারার উপরে জ্বলতে থাকে।

রমা—কী দেখছো?

জয়ন্ত—ঠিক ওইখানে মেঝের উপর সুন্দর একটা আলপনা ছিল, হলদে রঙের ধানের মঞ্জরী আর সবুজ রঙের অর্জুন পাতা আঁকা হয়েছিল।

রমা—কে এঁকেছিল? তোমার বউ?

—হ্যাঁ। আর ওই যে, যেখানে ছোট একটা টেবিল রয়েছে, সেখানে ছিল চক্‌চকে পেতলের একটা পিলসুজ! সেই পিলসুজের বাতি সারারাত জ্বলেছিল!

ইমা—তোমার বউ খুব সেজেছিল?

—খুব, খুব; চমৎকার সেজেছিল। ফিকে গোলাপী একটি বেনারসী শাড়ি পরেছিল; কপালে আর গালে চন্দনের সব ছাপ ছিল। কপালের মাঝখানে কুমকুমের টিপও ছিল। কী চমৎকার সুগন্ধ, ধূপ পুড়ছিল ওই ওখানে। ঘরের ভিতরে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় জয়ন্ত। একটা জানালার গরাদে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।

রমা—তুমি কাঁদছো কেন ?

হেসে ফেলে জয়ন্ত—কই, কাঁদছি না তো। খুব ভাল লাগছে, তাই আমার চোখ খুশি হয়ে চকচক করছে।...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই জানালার গরাদগুলো ঝাউপাতা দিয়ে মোড়া হয়েছিল, তার মধ্যে লালচে রঙের নানারকম ফুলও গোঁজা ছিল। আর, ওই দরজার দু'দিকে চাঁদমালার ঝালর ঝুলছিল। আর..

রমা—কী ?

—আর, ঠিক এইখানে ছিল একটি খাট, তার উপর বিছানা পাতা। সেই বিছানাতে জুঁইয়ের কুঁড়ি জড়ানো ছিল।

ইমা—বউ গান করেছিল ?

—না, গান তো দূরের কথা, আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

রমা—তুমি রাগ করনি ?

—খুব রাগ করেছিলাম। যখন দেখলাম, অনেক রাত হয়েছে, তবু প্রভা চুপ করে বিছানার একপাশে বসে আছে আর কোনও কথাও বলছে না, তখন আমি রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দার ঠিক ওইখানে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে রইলাম।'

রমা—বউ তখন ঘুমিয়ে পড়লো ?

—না, হঠাৎ দেখি বউ উঠে এসে এই দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

ইমা—বউ খুব ভাল মেয়ে।

—হ্যাঁ ; বার বার আমাকে ডাকলো বউ, ঘরের ভিতরে এসে বসুন। আমি কিন্তু রাগ করে বারান্দায় চেয়ারের উপরেই বসে রইলাম। তারপর.. ।

রমা—কী ? কী ? বলো, বলো !

—চেয়ারের উপর আমি গুটিসুটি হয়ে বসে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। হঠাৎ চোখ মেলে দেখি, ওই জোড়াপাহাড়ের মাথার উপর চাঁদ ভেসে উঠেছে। শালবনের মাথার উপর সাদা কুয়াশা থমথম করছে, আর তোমাদের সেই প্রভাদি আমার একটা হাত ধরে টানছে—ঘরে চলো।

রমা—তারপর কী হলো ?

—আমি বললাম, না এখন আর ঘরের ভিতরে যাব না, তার চেয়ে ভাল, দু'জনে মিলে জোড়াপাহাড়ের মাথার ওই চাঁদ আর শালবনের মাথার ওই সাদা কুয়াশা দেখি। ভোর হোক, পাখী ডাকুক, তারপর ঘরের ভিতরে যাব।

ইমা—ভোর হলো কখন ?

—ঠিক ভোরের বেলাতে। তোমাদের প্রভাদি বললে, জীবনে আমার উপরে কখনও রাগ করবে না বলো ? আমি বললাম কথ্খনো না

আবার বাইরের বারান্দায় এসে চেয়ারটার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত। রমা বলে—তুমি এখন চলে যাবে ?

—হ্যাঁ, যদিও এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ইমা—তবে এখানেই বসে থাকো।

—যদি তোমরা বলো, আপত্তি না করো, তবে থাকবো।

রমা—থাকতেই হবে। এখন স্টেশনে যাবে কি করে ? পথে জঙ্গল আছে ; মহুয়াতলায় ভালুক বসে আছে।

—তাই তো শুনেছি।

রমা—কিন্তু সারা রাত এখানে বসে থাকতে তোমার ভয় করবে না ?

—না।

রমা—প্রভাদি যদি ভূত হয়ে এসে তোমাকে ধরে ?

হেসে ওঠে জয়ন্ত—না না, তোমাদের প্রভাদি কখনও ভূত হতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নের ছবির মতো আমার চোখের কাছে দেখা দিতে নিশ্চয়ই পারে। সেটাও তো চমৎকার ব্যাপার। আমিও তাই চাই।

ভিতরের ঘরে হঠাৎ একটা শব্দ বেজে ওঠে। রীতা সরকার বোধহয় ভুল করে, কিংবা খুব বিরক্ত হয়ে হাতে-ধরা ফরাসী নভেলটাকে রেখে দিতে গিয়ে ঘরের মেজের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রাম আর ইমা দৌড় দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে আসে। আর বিজয়া ফিস্‌ফাস্ করে কালুরামের সঙ্গে কথা বলেন।—বাবুকে বুঝিয়ে বল, সারা রাত এখানে কষ্ট করে বসে না থেকে ঠিকেদার রতন সাহুর আস্তানাতে গিয়ে থাকুন। সেখানে থাকবার জায়গা আছে। পয়সা দিলে খাটিয়া আর কম্বল পাওয়া যায়। নয়তো যদি নেহাতই থাকতে ইচ্ছে করেন, তবে ওই ছোট ঘরের ভিতরেই থাকতে পারেন। কিন্তু তাহলে, কালুরাম তুমিও এখানে থাকবে, তুমি আর আজ বাড়ি যাবে না।

কালুরামের কাছ থেকে সব কথা শুনে জয়ন্ত যা বলে, সে-কথার সবই এই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যায়। বিজয়া শোনে, রীতা সরকার শোনে, আর রমা ও ইমাও শোনে।

জয়ন্ত বলছে—আপনাদের শত ধন্যবাদ, কিন্তু আমি শুধু এই বারান্দাতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিয়ে যেতে চাই ; ঘরের ভিতরে থাকবার দরকার নেই। এই মাঠ, ওই পলাশ আর কদমকুঞ্জ, এসবই তো আমার চেনা। কিন্তু আপনারা যদি কোন অস্বস্তি বোধ করেন, তবে অবশ্য আমি চলেই যাব।

দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে আর বিজয়ার ইশারা বুঝে নিয়ে চাকর কালুরামও একটা হাঁপ ছাড়ে আর কথা বলে—তবে আপনি থেকেই যান, বাবু। আমাদের কোন অসুবিধে নেই।

টকটকে টাট্‌কা লালের প্রলেপ দিয়ে রীতা সরকারের নরম দুই ঠোঁটের শোভা রাতুল করে তোলে যে নন-স্মীয়ার লিপস্টিক, সেই লিপস্টিক টেবিলের উপর থেকে তুলতে গিয়ে রীতা সরকারের হাতটাই যেন খুট করে একটা শব্দ করে বেজে ওঠে। খুবই বিরক্ত একটা অস্বস্তির শব্দ। কী আশ্চর্য, কাকী কি একটুও বুঝতে পারে না যে, এরকম অদ্ভুত স্বভাবের একটা লোককে, একটা আষাঢ়ে গল্পকে এভাবে সারা রাত ধরে বাড়ির বারান্দায় বসিয়ে রাখা কোন ভদ্রতা নয়, সুরুচিও নয়। এখনই আবার একটা অচেনা লোক এসে যদি বলে যে মন্তরের জোরে সে এই বাড়ির সব সোনার গয়না ডবল করে দেবে, তবে কাকী বোধহয় তখনি খুশি হয়ে লোকটাকে ঘরের ভিতরে শোবার ঠাঁই করে দেবে। ছিঃ, এ কেমন দুর্বলতা।

বিজয়া বোধহয় বুঝতে পেরেছেন যে, রীতা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। রীতা খুবই অস্বস্তি বোধ করছে। তাই খুব করুণ করে একটা অনুরোধের কথা বলেন বিজয়া—তুমি কিছু মনে করো না রীতা। কিংবা মনে করো যে কোন মানুষ-টানুষ নয়, শুধু একটা ছায়া বাইরে বারান্দায় বসে আছে।

রীতা হাসে—আমি তাই মনে করি, কাকী।

কদমপুরার বাতাসে শব্দের সাড়া জাগিয়ে ডাউন মাল গাড়ীটা চলে গেল। তার মানে, এখন রাত আটটা। তারপর আরও দুটো ঘন্টা। ফাল্গুন মাসের পাহাড়ী কদমপুরার রাত নিঝুম হয়ে যায়। মাঝে মাঝে শালবনের ঝুরঝুরু বাতাস হঠাৎ উতলা হয় আর এলোমেলো হয়ে উড়ে বেড়ায়। বুড়ো বটের মাথার উপর ঝুপঝাপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুশি বাদুড়ের

ঝাঁক। রোড ওভারসিয়ার হেম সরকারের কোয়ার্টারের বাইরের বারান্দায় সত্যি অদ্ভুত ছায়া চুপ করে চেয়ারের উপর বসে থাকে। কে জানে কিসের আশায়, কাকে দেখতে পাবে বলে এই বারান্দায় বসে রাত জাগছে জয়ন্ত ? সত্যিই কি বিশ্বাস করে জয়ন্ত, বাসবঘরে আবার বাতি জ্বলবে, প্রভা এসে আবার তার হাত ধরবে, আর জোড়াপাহাড়ের মাথায় গিয়ে ভেসে ওঠা চাঁদ দেখে দেখে ভোর হয়ে যাবে ?

জানালার পর্দা দুলিয়ে দিয়ে ফাল্গুনেব কদমপুরাব মাঝরাতের একটা দমকা বাতাস ঘুমন্ত রীতা সরকারের ক্রীমমাখা চুলে ভাঙা স্তবক হঠাৎ শিউরে দিয়েছে, তাই বোধহয় চমকে ওঠে রীতা। রীতার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানার উপরে উঠে বসে আর জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পায় রীতা, ঠিকই একটা ছায়া রাতেব অন্ধকাবের মধ্যে কী ভযানক কালো হযে বারান্দার একটা চেয়ারেব উপব বসে আছে। সত্যি, কী বিদ্‌ঘুটে ও বিশ্রী একটা ছায়া। ছায়াটাকে এখনই বলে দিচ্ছে ইচ্ছে কবে—চলে যাও।

কিন্তু কী দরকার ? যার বাড়ি, সেই বিজয়া কাকী যখন কিছুই বললেন না, তখন দিল্লী থেকে ক'দিনের জন্য বেড়াতে আসা রীতা সরকারই বা কেন সেকথা বলতে যাবে ?

ও-ঘরে ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসেব শব্দ। ঘুমোচ্ছেন কাকী, আব রমা ও ইমা। ভিতরে বারান্দাতে ঘুমন্ত কালুরামের নাক-ডাকার শব্দ ; একটা কম্বলের উপরে পড়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে চাকর কালুরাম। কিন্তু রীতা সরকারের ঘুমভাঙা চোখে আবার নতুন করে ঘুমের আবেশ লাগে না। বিদ্‌ঘুটে একটা ছায়া বসে আছে বাইরে, ঘুম আসবে কেমন করে ? দুঃসহ একটা অস্বস্তি রীতা সরকারের নিঃশ্বাসের বাতাসে বাব বার ছটফট্ করে। লোকটা চলে না গেলে স্বস্তি পাবে না রীতা, ঘুমও আর হবে না।

কিন্তু জোরে চেঁচিযে ধমক না দিযে, খুব আস্তে গলাব স্বব চেপে দিযে এখনই তো লোকটাকে বলে দিতে পাবা যায়—চলে যাও। ঘবের ঘুমন্ত মানুষগুলিব কেউই শুনতে পাবে না, জেগেও উঠবে না। একটি কথায সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু কী দরকার ?

জানে না রীতা, কখন আবার ঘুমিয়ে পড়তে হযেছে। বুঝতেও পারে না, এমন সুন্দর সমুদ্র-স্নানের স্বপ্নটাও হঠাৎ কেন ভেঙ্গে গেল। জাযগাটা হলো জুহুব সমুদ্রতট। সাঁতাবের মিনি সাজ পরে সমুদ্রের জলের ছোট ঢেউযের উপর এলিয়ে পড়েছে রীতা। ওদিক থেকে কাদের হাতেব দুটো ক্যামেরা তাক্ করে রয়েছে। বয়ে গিয়েছে। ক্যামেবার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না রীতা।

কিন্তু কোথায় সেই জুহু, আর কোথায় এই কদমপুরা। রাতের অন্ধকার গায়ে মেখে আরও কালো হয়ে গিয়েছে ওই জায়গাটা। চুপ করে চেয়ারের উপর বসে আছে। না, সত্যিই দুঃসহ। এবাব বলে দেওয়াই উচিত, এখনই চলে যাও।

বিছানা থেকে নেমে পাশের ছোট ঘরের ভিতরে ঢোকে রীতা। তারপর যেন রুক্ষ ও বিরক্ত একটা অস্বস্তির আঘাত হয়ে রীতা সরকারের হাতটা একটান দিয়ে দরজায় কপাটের খিল নামিয়ে দেয়। কপাট খুলে বাইরের পাশের সেই ছায়ার দিকে তাকায় রীতা, যে ছায়ার নাম জয়ন্ত—ট্রেনের গার্ড, কালো টেকো একটা সামান্য মানুষ।

চমকে ওঠে রীতা সরকারের মনের সব অস্বস্তি আর চোখের সব বিরক্তি। জোড়াপাহাড়ের মাথার উপরে চাঁদ ভেসে উঠেছে, সাদা কুয়াশায় ভরে গিয়েছে শালবনের মাথার আকাশ, আর পলাশের গাছে একটা পাখির মিষ্টি শিসের শব্দ যেন গলে ঝরে পড়ছে।

জোড়াপাহাড়ের মাথার চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্ত। চিকচিক করছে জয়ন্তর দুই অপলক চোখ। লোকটা কি জাগা চোখেই স্বপ্ন দেখছে ? তা না হলে এত ধীর আর শান্ত হয়ে বসে আছে কেন ?

জানে না রীতা। বুঝতেও পারে না রীতা, কতক্ষণ ধরে সে ওই জয়ন্তের মুখের দিখে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে আছে। কদমপুরার,ফাল্গুন মাসের শেষ রাতের জ্যোৎস্নাতে যে এত অদ্ভুত একটা মায়া থাকতে পারে, তাও নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেনি রীতা। কী আশ্চর্য, জয়ন্ত নামে ওই লোকটাকে যে একেবারে ভিন্ জগতের একটা মানুষ বলে মনে হয়। কিংবা সেই বনময় কুয়াশার যুগের একটি মানুষ, বুক ফুলিয়ে গুহার মুখের সামনে বসে আছে। এখনই ছুটে আসবে ওর রাতের সঙ্গিনী, আর ওই চওড়া বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জয়ন্তও নিশ্চয় সেই মুহূর্তে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া নিশাসঙ্গিনীর বুকটাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পিষে দিতে থাকবে।

রীতা ডাকে—ঘরের ভিতরে আসুন।

চমকে ওঠে জয়ন্ত। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে বিস্ময়ে বিবশ দুই চোখের অপলক দৃষ্টি তুলে ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। জয়ন্ত যেন সত্যিই তার সফল স্বপ্নের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে।

না, প্রভা নয় ঠিকই, কিন্তু প্রভা যে ঠিক ওইভাবে ওখানেই দাঁড়িয়ে এই কথাই বলেছিল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে জয়ন্ত, আর আবার শালবনের মাথাব সাদা কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ফাল্গুনের কদমপুরার শেষ রাতের বাতাস যেন রীতা সরকারের বুকের ভেতরে ঢুকে রীতার নিঃশ্বাস উতলা করে দিয়েছে। নন-স্মীয়ার লিপস্টিকের রঙীন প্রলেপ দুই ঠোঁটের পিপাসার বাষ্পে ভিজে গিয়েছে। আর সরস উচ্ছলতার এক একটা ঝলক সহ্য করতে গিয়ে সারা শরীরটাই যেন ভিজে ভিজে পিছল হয়ে যাচ্ছে।

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে না রীতা সরকার। এগিয়ে আসে, জয়ন্তর হাত ধরে, জয়ন্তর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তপ্ত নিঃশ্বাসের বাষ্প ছড়িয়ে জয়ন্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে রীতা—ঘরে চলো।

চমকে ওঠে। সরে দাঁড়ায় জয়ন্ত—ছি, এ কী কথা বলছেন ? কে আপনি ?

—তাকিয়ে দেখ, ভাল করে দেখ, আমি কে ? জয়ন্তর চোখের কাছে মুখটাকে যেন ভাসিয়ে দিয়ে কথা বলে রীতা। হ্যাঁ, এই শেষ রাতেও মায়ার ঝালর সেই আই-ল্যাশ চোখে পবতে ভুলে যায়নি রীতা। মায়ার ঝালর কাঁপে, শেষ রাতের চাঁদের আলোও যে কাঁপতে থাকে।

জয়ন্ত—চিনলাম না, বুঝলাম না, কে আপনি ?

রীতা—ঘরে এস, কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে আছে।

জয়ন্ত—অসম্ভব, ক্ষমা করবেন আমাকে। দোহাই আপনার, আমার স্বপ্ন নষ্ট করবেন না। আর কিছুক্ষণ আমাকে এখানে থাকতে দিন। কাক ডাকলেই আমি চলে যাব।

রীতা—তুমি কি সত্যিই একটা পাগল, না একটা অ্যানিমিয়া ?

জয়ন্ত হাসে—আমাকে মিথ্যে গালমন্দ করে আপনার কোন লাভ নেই। প্লীজ, হাত ছেড়ে দিন, সরে যান,...না না, অসম্ভব, মুখ সরিয়ে নিন, বলতে বলতে রীতা সরকারের সেই ঝাঁপিয়ে পড়া মত্ত শরীরটাকে একটা ঠেলা দিয়ে বুকের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় জয়ন্ত, আর নিজেও বারান্দার সিঁড়ির দিকে সরে যায়।

হ্যাঁ, কাক ডেকে উঠেছে। সিঁড়ি থেকে মাঠের পলাশের পাশ কাটিয়ে একেবারে সড়কের উপরে গিয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত। হেডলাইট জ্বালিয়ে ঠিকেদারের একটা লরি স্টেশানের দিকে ছুটে চলে গেল। জয়ন্তও স্টেশন যাবার সড়ক ধরে চলতে শুরু করে দেয়। সড়কের ধারে মহুয়াতলায় এখন বোধহয় আর কোন ভালুক বসে নেই।

ভোরের আলোর আভা জেগেছে। তবু বারান্দার চেয়ারের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রীতা সরকার। ঘরের ভিতর থেকে আশ্চর্য হয়ে বাইরে বের হয়ে এসে আরও আশ্চর্য হয়ে যান বিজয়া—এ কী রীতা! কী হলো?

রীতা—কী আবার হলো?

বিজয়া—এ কী রকমের মূর্তি?

রীতা—কী রকমের?

বিজয়া—এলোমেলো চুল, জামার বোতাম খোলা, গায়ের শাড়ি খসে পড়ে ঝুলে রয়েছে, এ যে একটা পাগল মূর্তি।

—তাই তো, তাই তো! হেসে ফেলে রীতা। ব্যস্তভাবে হাত চালিয়ে ঝুলে পড়া শাড়িটাকে ভাল করে গায়ে জড়াতে থাকে।

সম্পত্তি

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে একটা ভীড়। কাগজপত্রের একটা ফাইল হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোক এই ভীড়ের মধ্যেই ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইনিই হলেন হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু। ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে আদালতের লোকের সঙ্গে নরেশ দত্তের বাড়ি দখল করতে এসেছেন।

তবু এক বিন্দু আনন্দ নেই মহাজন কৈলাসবাবুর মনে। পুরো পাঁচটি হাজার টাকা হাতড়ে নিয়েছে নরেশ দত্ত। অথচ ঐ বাড়ি নিলাম করলে বাজার দর অনুযায়ী বাড়ির দাম চড়বে বড় জোর আট হাজার টাকা, তার বেশি কখনই নয়! কিন্তু বৃথা, কোন লাভই হবে না। জোচ্চোর লোকটা আরও তিন মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়েছে। চন্দননগরের এক মহাজনের কাছ থেকে তিন হাজার, বারাসাতের এক মুদীর কাছ থেকে তিন হাজার আর বড়বাজারের এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে তিন হাজার। সব পাওনাদারই এক একটি মামলা এনে নরেশ দত্তের কাছে টাকা দাবী করেছে। শেষ পর্যন্ত ফল এই হল যে, কোন মহাজনই তাঁর প্রাপ্য পুরো টাকা উদ্ধার করতে পারবেন না। নিলামে যে দাম উঠবে ঐ বিশ্রী চেহারার একটা বাড়ির, তাই সকলকে ভাগ করে নিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা পাওনার বদলে কৈলাসবাবুর কপালে দু' হাজারও জুটবে কিনা সন্দেহ। কি ধূর্ত এই নরেশ দত্ত! ওর ট্যাবা চোখের দিকে তাকিয়ে কখনো কল্পনাও করা যায়নি যে, এত কৌশল আছে ওর মাথার ঘিলুর ভিতরে। চার-চার জন পাকা কারবারী মানুষকে ঐ একটুখানি এক বিশ্রী বাড়ির লোভ দেখিয়ে বন্ধকী হাওলাত করে কতগুলি টাকা হাতড়ে নিল।

শুধু কৈলাসবাবুই নয়, আরও তিন পাওনাদারের উকীল আর এটর্নির লোকও ছিল। ছিল আদালতের কেরানী আর চারজন পুলিশ কনেস্টবল। ফটফট করছে সকলেই। কারও চক্ষে এক বিন্দু সমবেদনার ছায়া নেই। থাকবার কথাও নয়। বরং, একটা প্রতিশোধ নেবার আগ্রহই যেন ছটফট করছে সকলের চোখে।

প্রতিশোধ নেওয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। চারজন কুলি নরেশ দত্তের ঘরের ভিতর থেকে এক এক করে যত অস্থাবর সম্পদ ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে এসে পথের উপর আছাড় দিয়ে ফেলছে। কিন্তু সেই সব অস্থাবর সম্পদের দিকে তাকিয়ে মহাজন কৈলাসবাবুর দু'চোখের আক্রোশ আরও হতাশ হয়ে জ্বলতে থাকে। সব সরিয়ে ফেলেছে জোচ্চোর লোকটা! কুলিরা

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাড়ের উপর যেন এক একটা বিদ্রূপের আবর্জনা তুলে নিয়ে আসছে। কয়েকটা কাঠের আলনা, নড়বড়ে তক্তপোষ, দুটো টিনের ড্রাম—তা'ও আবার ফুটো, দশ বারটা পুরনো ল্যাম্পের কঙ্কাল, ছেঁড়া জুতো দু'বস্তা আর পাঁচটা পায়া-ভাঙা চেয়ার। ছি-ছি-ছি, এই আবর্জনা কি দশ টাকা দিয়েও কেউ কিনবে? হাতের ফাইলটা তুলে নিজের কপালের উপরেই আস্তে একটা আঘাত করেন কৈলাসবাবু।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে কৈলাসবাবু আর আদালতের কেরানী স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, বিছানার উপর বসে তখনো সেই ধূর্ত লোকটা ট্যারা চোখ তুলে বসে বসে হাসছে। তাই আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ছটফট করেন কৈলাসবাবু। লোকটা যে আর একটু পরেই দুনিয়াকে কলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাবে! একেবারে চোখের উপর দিয়েই সরে পড়বে। একটুও দুঃখিত নয়, একটুও বিমর্ষ নয় লোকটা। বের হয়ে যাবার জন্য যে লোকটা মনের আনন্দে তৈরি হয়েই রয়েছে, তাকে বের করে দিয়ে কোন প্রতিশোধের আনন্দও নেই। লোকটা এমনই একটা চতুর ভাঁওতা যে, ওকে জব্দ করার সুযোগ নেই আর শক্তিও নেই এই পৃথিবীর।

নরেশ দত্তের বাড়ি, মাত্র চারখানা ছোট ছোট ঘর, একটুখানি একটা উঠান, সরু সরু বারান্দা, দরজা ও জানলার কাঠ কুঁকড়ে গিয়েছে। দেয়ালের এখানে ওখানে পালেস্তারার তলায় উই। বাড়িটার বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়, নরেশ দত্তের চেয়ে মাত্র দশ বছরের ছোট। নরেশ দত্তের বাপ এই বাড়ি তৈরি করার পর দশটি বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। নরেশ দত্তের বিয়ে হবার বছরেই মারা গেলেন নরেশ দত্তের বাপ। তারপরেও চারটি বছর এই বাড়িটার মধ্যে কলরব ছিল, কিন্তু তারপর আর নয়। তারপর থেকেই বাড়িটা যেন কেমন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুন ধরলো কড়িকাঠে, আর দেয়ালে উই।

কিন্তু যেদিন, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই বাড়িটা শেষবারের মতো শব্দ করে কেঁদেছিল, সেদিন সান্ত্বনা দেবার জন্য এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন প্রতিবেশী বিনোদবাবু। ঐ যে, উই-খাওয়া বাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড লালরঙের দালান বাড়িটা হলো বিনোদবাবুর বাড়ি। বিনোদবাবুও এখন তাঁর দালান বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে গল্প করছেন, আর দেখছেন নরেশ দত্তের বাড়ি ক্রোক করার হল্লা, ছটফটানি উল্লাস আর আক্রোশের দৃশ্যটাকে। কোন সমবেদনা নেই বিনোদবাবুর চোখে, কোন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের চোখে। কারণ, সকলেই জানেন যে, বোগাস নরেশ দত্তই এতগুলি মহাজনকে কলা দেখিয়ে সরে পড়ছে। ইচ্ছে করেই আর রীতিমত প্ল্যান করে লোকটা ভাওঁতা হাসিল করেছে। যা চেয়েছিল নরেশ দত্ত, তাই হয়েছে।

নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি, তিরিশ বছর আগে ঐ বাড়ির দেয়ালে উই লাগেনি। নরেশ দত্তের বউভাতের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়িরই ছাদের উপর বসে। তারপর একদিন নরেশ দত্তের ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণও খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়ির উঠানো ছোট এক রঙীন সামিয়ানার নীচে বসে। কি যেন নাম ছিল ছেলেটার? বিশু, হ্যাঁ বিশু। বিশুর মা বিশুকে কোলে নিয়ে ঐ বাড়িরই ছাদের উপর দাঁড়িয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা কথা চলতো পাশের বাড়ির শ্যামবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে।

কিন্তু ব্যস, তারপর আর নয়। নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি আর কোনদিন হেসে হেসে নিমন্ত্রণ করতে পারেনি প্রতিবেশী বিনোদবাবুকে।

দুটি বছর যেতে না যেতেই বার বার তিনবার কেঁদে উঠল নরেশ দত্তের বাড়ি। প্রত্যেকবার ছুটে এলেন বিনোদবাবু। প্রথমবার, নরেশ দত্তের বাবা মারা গেল যেদিন। দ্বিতীয়বার, নরেশ দত্তের স্ত্রী মারা গেল যেদিন। আর তৃতীয়বার, নরেশ দত্তের ঐ বাড়ির কান্না শুনে ছুটে সেদিন এসেছিলেন বিনোদবাবু আর প্রতিবেশীরা, একমাসের জ্বরে মারা গেল

যেদিন তিন বছর বয়সের বিশু।

হ্যাঁ, আর একবার এসেছিলেন বিনোদবাবু। সেই রাত্রেই। সেই শেষ আসা। শোকার্ত আর সারাদিন উপোসী নরেশ দত্তকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু খেতে রাজি করাবার জন্য এসেছিলেন বিনোদবাবু। এসেই দেখতে পেয়েছিলেন, ঘরের ভিতর দেয়ালের গায়ে ছোট একটা কালো ছাপের দিকে ট্যারা চোখের অপলক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে নরেশ দত্ত। শিশুর কালিমাখা ছোট্ট হাতের একটা ছোট্ট ছাপ।

ছলছল করে উঠেছিল নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের দৃষ্টি। বলেছিল নরেশ দত্ত, বিশ্বাস করুন বিনোদদা, এই বাড়িটাই অপযা, ভয়ঙ্কর অপয়া।

সেদিন নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের ছলছল দৃষ্টিকে বিশ্বাসই করেছিলেন বিনোদবাবু। কিন্তু তারপর ? তারপর নরেশ দত্ত নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ঐ ট্যারা চোখ শুধু ধূর্ত হাসি লুকিয়ে লোক ঠকাবার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায়। অপয়া বাড়িটাকেই পয়া করে তুলেছে নরেশ। আট হাজারও দাম হবে না যে বাড়ি, সেই বাড়িকে ভাঙিয়ে পনর হাজার টাকা বাগিয়েছে।

এই সেদিনও, যেদিন নরেশ দত্তের বিরুদ্ধে মহাজনের মামলা শুরু হলো, সেইদিন বিনোদবাবুর কাছেই এসে বেপরোয়া বেহায়ার মতো হেসে হেসে নরেশ দত্ত বলেছিল, বৃথাই ওরা মামলা করছে বিনোদদা।

— কেন ? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বিনোদবাবু।

নরেশ দত্ত বলেছিল, আমার কোনই লস হবে না বিনোদদা। কাঁচা ইটের বাড়ি, বাজে শাল কাঠের কড়ি বরগা আর চৌকাঠ। তাতে আবার ঘুন ধরেছে। এ বাড়ি ছেড়ে দেবার চেষ্টাই করে আসছি পঁচিশ বছর ধরে।

বিনোদবাবু—কিন্তু কোথাও মাথা গুঁজে থাকতে হবে তো।

ঝক করে হেসে ওঠে নরেশ দত্তের ট্যারা চোখ—তা চেষ্টা করলে কি একটা জায়গা হবে না বিনোদদা!

বিনোদবাবু—নতুন বাড়ি করবার মতলব করেছেন না কি ?

মুখের কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হাসতে থাকে নরেশ দত্ত। তারপর বলে—টাকা হাতে থাকলে কি না হয় ?

পঁচিশ বছর আগে এই নরেশ দত্তকে পাড়ার লোকেরা ঠিক চিনতে পারেনি, চিনেছে অনেক পরে, এবং আজ সবচেয়ে ভাল করে চেনা গেল। ঠিকই বলে পাড়ার ছেলেরা, বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু কথার চালাকিতে মানুষকে বোকা করে দিয়ে লোকটা অনেক ক্লাব সমিতি আর সেবাকার্যের টাকা মেরেছে। ভূয়ো কোম্পানী করার অভিযোগে দু'বার মামলায় পড়েছিল। ওর মুখের কথা আর হাতের সইকে আজ অন্তত এই পাড়ার কোন মানুষ বিশ্বাস করে না।

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে ভীড়ের হল্লা বাড়ে। দৌড়োদৌড়ি করে পুলিশ কনেস্টবল। সেই দিকে তাকিয়ে বিনোদবাবু বলেন—প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলো লোকটার, তবু কি আশ্চর্য, মানুষকে ধাপ্পা দেবার ব্যবসা করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে আর টাকা জমাচ্ছে। মাত্র একটা প্রাণ, টাকার জন্য এত লোভের দরকারই বা কি ?

কিন্তু চিন্ময়বাবু বলেন—ভালই হলো, লোকটাকে পাড়া থেকে সরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, পুলিশকেও অনেকবার বলেছিলাম। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। আজ যাই হোক...।

আজ দেখা যাচ্ছে লোকটা সত্যিই চলে যাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে এরকম একটা সাংঘাতিক বোগাস লোক থাকলে পাড়ার পক্ষেই আশঙ্কার কথা।

আক্ষেপ শুধু এই যে, লোকটা একটুও জব্দ হলো না। বেশ মোটারকম বাগিয়ে নিয়ে,

আর খুশি মনে একটা উই-খাওয়া আর ঘুনধরা অপয়া বাড়িকে পাড়ার বুকের উপর ফেলে রেখে সরে পড়বে বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু নয়, বিনোদবাবু চিন্ময়বাবু, আর প্রতিবেশীদের ভীড়টাও একটা চাপা আক্রোশ নিয়ে নরেশ দত্তের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু লোকটা এখনো বাড়ির ভিতর বসে করছে কি ? বোধহয় ট্যারা চোখ নিয়ে হাসছে আর সিগারেট খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা শোরগোল জাগে বাড়ির সামনে পথের ভীড়ের মধ্যে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? প্রশ্ন করে সকলেই।

পুলিশ কনেস্টবল বলে—বাড়ির বের হতে চাইছে না লোকটা।

গর্জন করেন হাটখোলার মহাজন, আর সেই গর্জনে এতক্ষণের একটা হতাশ আক্রোশ উল্লাস হয়ে ফেটে পড়ে।—গলা টিপে, কান ছিঁড়ে, ঘাড়ে ধরে, লাথি মেরে বের করে দিন বেটাকে। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন ঠগটাকে।

আদালতের কেরানী পুলিশ কনেস্টবলকে লক্ষ করে বলেন—দেখবেন মশাই, একটু সামলে কাজ করবেন। মনে হচ্ছে, লোকটার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে।

কনেস্টবল বলে—আমার মনে হয় লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। বিছানাটা গুটিয়ে বগলদাবা করে নিয়ে চুপ করে মেজের ওপর বসে রয়েছে। কিন্তু উঠতে চাইছে না।

আদালতের কেরানী বলেন—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, অসুখও হয়েছে, মাথাও খারাপ হয়েছে। কাজেই, এ অবস্থায় লোকটার গায়ে হাত দেওয়া ঠিক আইন মতো কাজ হবে কি ?

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু দুটো দশ টাকার নোট বের করে আদালতের কেরানী আর পুলিশ কনেস্টবলের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলেন—আর জ্বালা বাড়াবেন না মশাই। এইবার খুশি হয়ে কাজটা সেরে দিন। লোকটাকে ঘাড়ে ধরে...।

বাড়ির ভিতরের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল কনেস্টবলের মারমূর্তি। চেঁচাতে থাকেন কৈলাসবাবু—কান ধরে হিড়হিড় করে, একেবারে হেঁচড়ে ঘেঁষড়ে টেনে..।

কিন্তু বৃথাই প্রতীক্ষায় ছটফট করেন মহাজন কৈলাসবাবু আর পথের ভীড়। কনেস্টবল ভিতরে গিয়েছে তো গিয়েছেই, ফিরে আসে না।

গর্জন করেন আদালতের কেরানীবাবু—এঃ, এত সমীহ করার কী আছে ? হাত ধরে টেনে আনলেই তো...।

বলতে বলতে কেরানীবাবু তাঁর হাতের ক্রোকী পরোয়ানা বুকে চেপে নিয়ে বোগাস নরেশ দত্তের উই-খাওয়া বাড়ির ভিতর লক্ষ করে ছুটে যান।

কিন্তু বৃথা, কেরানীবাবু ফিরে আসেন না। পুরো দশটা মিনিট সময় পার হয়ে যায়। অস্থির হয়ে আতঙ্কিতভাবে ডাক ছাড়েন কৈলাসবাবু—কি হলো মশাই ?

পথের ভীড় কৌতূহল সহ্য করতে না পেরে মুখর ও চঞ্চল হয়ে ওঠে—কি হলো ? কি হলো ? আবার কি কাণ্ড হলো ?

সামনের বাড়ির বারান্দায় বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কি হলো ?

কৈলাসবাবু বলেন—লোকটা আবার ভোগা দিচ্ছে মশাই, বের হতে চাইছে না।

বিনোদবাবু বলেন—আর দেরি করবেন না। নইলে আবার একটা ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে তুলবে।

ভীড়ের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—বাঁধিয়ে তুলেছে বোধহয়।

কৈলাসবাবু দাঁতে দাঁত চেপে হুঙ্কার ছাড়েন—তাহলে ?

বলতে বলতে স্বয়ং কৈলাসবাবু আর পথের সমস্ত ভীড় হুড়মুড় করে বোগাস নরেশ দত্তের

ঘুনধরা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে।

এতক্ষণে সব চাঞ্চল্য আর মুখরতাকে যেন হঠাৎ গিলে ফেলেছে অপয়া বাড়িটা। একেবারে স্তব্ধ, কোন শব্দ হয় না! বাড়ির ভিতরে ঢুকে এত বড় একটা কলরবও কি মরে গেল?

বিনোদবাবু উঠে দাঁড়ান। ব্যাপার কি? লোকটা বের হয় না কেন?

চিন্ময়বাবু এক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন—লোকটাকে বের করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? এত দেরী কিসের জন্য?

বিনোদবাবু— বোধহয় আবার একটা ব্লাফ দিয়ে সকলকে বোকা বানাচ্ছে বোগাসটা।

চিন্ময়বাবু দুই চোখ কটমট করে ওঠে—তাহলে আমাদের কর্তব্য হলো।

যেন পাড়ার মধ্যে এক ঝোপের ভিতর ক্ষেপা শেয়াল লুকিয়ে রয়েছে। বের হতে চায় না, কিন্তু বের করে দিতে হবে। ধমক না শুনলে ঘাড়ে হাত দিতেই হবে। দিতে দেরী হচ্ছে কেন? কি এমন সমস্যা?

চিন্ময়বাবু বলেন—আপনি একটি ধমক দিলে কাজ হবে বিনোদবাবু।

আর দেরি করলেন না বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু' ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে ঘুনধরা বাড়িটার ভিতরে ঢুকলেন।

সত্যিই কি ভয়ানক ব্লাফ জমিয়েছে বোগাস নরেশ দত্ত।

এতগুলি লোকের ভিড় যেন হতভম্ব হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে নরেশ দত্তের ট্যাবা চোখ দুটোকে, আর মাঝে মাঝে আর একটি জিনিসকে।

পুলিশ কনেস্টবলের হাত দুটো যেন অকর্মণ্য পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, একটুও নড়ে না। বোগাস নরেশ দত্তের ঘাড় স্পর্শ করবার সাহস নেই কনেস্টবলের ঐ দুই হাতে।

আদালতের কেরানী ক্রোকী পরোয়ানা মিছামিছি পড়েন আর এদিক ওদিক তাকান।

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু আস্তে আস্তে মাথা চুলকান, আর এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেন।

আর, ভীড়ের লোক অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন বোগাস নরেশ দত্তকে নতুন করে চেনবার চেষ্টা করছেন বিশ জোড়া চক্ষু।

ময়লা উইধরা দেয়ালের গায়ে ছোট একটি শিশুর হাতের একটি কালিমাখা ছাপ। গোটানো বিছানা বগলদাবা করে বসে আছে বোগাস নরেশ দত্ত, আর তার ট্যারা চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে রয়েছে সেই কালিমাখা ছাপের দিকে তাকিয়ে। যেন হঠাৎ কোমর ভেঙ্গে বসে পড়েছে নরেশ দত্ত, আর উঠতেই পারছে না। অচল অনড় স্তব্ধ করে দিয়েছে নরেশ দত্তকে, ঐ কোন এক শিশুর হাতের ছোট্ট একটি কালিমাখা ছাপ।

বিনোদবাবু চমকে ওঠেন। চিন্ময়বাবু ভয় পেয়ে বিনোদবাবুর কানের কাছে ফিসফিস করেন।—ঐ যে সেই, সেই যে আপনি গল্পটা বলেছিলেন, মনে পড়েছে বোধহয়, ঐ ছাপটা বোধহয় ওরই..।

বিনোদবাবু—হ্যাঁ, ওরই ছেলের হাতের ছাপ।

বোগাস নরেশ দত্তের ভয়ঙ্কর ব্লাফ সত্যিই একেবারে অকর্মণ্য করে দিয়েছে আদালতের ক্রোকী পরোয়ানা আর এতগুলি আক্রোশ আক্ষেপ আর প্রতিশোধের দাবীগুলিকে।

ঠিকই, উঠতে পারেছ না বোগাস নরেশ দত্ত। যেন আজ পঁচিশ বছর পরে নিজেকেই হঠাৎ চিনতে পেরে ভয় পেয়েছে নরেশ দত্ত, আর ধপ করে বসে পড়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি সুবিচার আর প্রতিশোধের মূর্তিগুলিকেও যেন বসিয়ে দিয়েছে নরেশ দত্ত। মহাজন কৈলাসবাবু অসহায়ের মতো ভাঙ্গাগলায় আস্তে আস্তে বলেন—এখন

আপনিই একটা পরামর্শ দিন বিনোদবাবু।

কথা বলেন বিনোদবাবু—তুমি যদি ইচ্ছে করো তবে এখনো এখানেই থাকতে পার নরেশ, কিন্তু মহাজনদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

কোন উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—এই বাড়ির জন্য যদি এতই মায়া ছিল, তবে কেন মিছিমিছি...।

উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—যদি কথা দাও যে, একমাসের মধ্যে সকলের পাওনা মিটিয়ে দেবে, তাহলে...।

চিন্ময়বাবু বলেন—তাহলে এঁরাও ক্রোক স্থগিত রাখবেন, আর তুমিও আপাতত এখানে থাকতে পারবে নরেশ।

গোটানো বিছানাটা আস্তে আস্তে খুলে ঘরের দেয়াল ঘেঁষে পেতে ফেলে নরেশ দত্ত। বিছানার উপর বসে, আর দেয়ালের কালিমাখা ছোট্ট হাতের ছাপের দিকে ট্যারা চোখে অদ্ভুত এক স্নেহান্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। যেন দু'চোখের সাধ ঢেলে দিয়ে জীবনের একটা খাঁটি সম্পত্তির রূপ দেখছে নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু বলেন—তাহলে কি বলছ নরেশ ?

আনমনার মতো বিড় বিড় করে নরেশ দত্ত বলে—পরের কথা পরে। এখন আমি এক পা'ও নড়তে পারবো না বিনোদদা।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মহাজন কৈলাসবাবু—তাহলে আমার কি হবে ? একটা পরামর্শ দিন আপনারা।

ঘরের ভিতরে ভিড় কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

বোধহয় আধ মিনিটও পার হয়নি, মহাজন কৈলাসবাবুও যেন প্রচণ্ড একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এসে বাইরের ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন।

আদালতের কেরানী প্রশ্ন করেন—কি হলো ?

কৈলাসবাবু বলেন—উঃ, কি ভয়ানক জিনিস !

কেরানীবাবু হাসেন—কার কথা বলছেন ? বোগাস নরেশ দত্ত !

কৈলাসবাবু—আরে না মশাই ; দেওয়ালের গায়ে ঐ যে একটা...। যাক্‌গে, এইবার একটা পরামর্শ দিন।

কেরানীবাবু চিন্তিতভাবে বলেন—আপাতত...।

গানের চেয়ে বেশি

বেহালার নতুন রাস্তার ধারে পাশাপাশি তিনটি নতুন বাড়ি। এদিকের বাড়িটা হল মুক্তাকণা মিত্রের বাবা সঞ্জয় মিত্রের বাড়ি। আর ওদিকের বাড়িটা হল বিদুলা সেনের কাকা পার্থ সেনের বাড়ি। মাঝের বাড়িটা ভাড়া খাটে ; বাড়ির মালিক দাশগুপ্ত মশাই থাকেন নিউ শ্যামবাজারে।

মাঝের বাড়িটা বেশ কিছুদিন খালি থাকার পর, সেই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হয়ে যারা এসেছে, তারা হল এক পরিবার। এসেছেন এক অপ্রবীণ বয়সের ভদ্রলোক, তার মা আর তার দুটি

ভাই-বোন। দেখে বোঝাই যায়, এখনও বিয়ে করেননি ভদ্রলোক। আরও বোঝা যায় বছর দশেক আগে বিয়ে করলেই ভাল করতেন ভদ্রলোক। চেহারাটা তেমন কিছু কাঁচা-বয়সেব চেহারা নয়।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম দিনেই নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলেন—বেশ ছেলেটি!

তিন বাড়ির এই মাঝের বাড়িতে যে রায়-পরিবার ভাড়াটিয়া হয়ে থাকতে এসেছে তারা নিশ্চয়ই চিরটা কাল এখানে থাকতে আসেনি। কিন্তু কতদিন থাকবে? কি বলে ছেলেটি? সঞ্জয় মিত্র খোঁজ নিয়েছেন, পার্থ সেনও খোঁজ নিয়েছেন। জানতে পেরেছেন দু'জনেই, মাত্র এক বছর এরা এই বাড়িতে থাকবার জন্য এসেছে। ছেলেটি অর্থাৎ পরমেশ রায় ভারত সরকারের হিসাব বিভাগে বেশ ভালো মাইনের একটা সার্ভিসে আছে। কলকাতার অফিসে মাত্র এক বছরের জন্য কাজ করবে পরমেশ, তার পরেই আবার বদলি। বোধহয় ডিব্রুগড়েই চলে যেতে হবে।

—উঃ, এত দূরে? সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন, দু'জনেই যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন।

পরমেশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ ও পরিচয় হবার পর আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন। প্রায়ই চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ পায় পরমেশ। কোনদিন সকালে সঞ্জয় মিত্রের বাড়িতে, কোনদিন সন্ধ্যায় পার্থ সেনের বাড়িতে।

মাত্র এই তো ব্যাপার। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়ার নিন্দুকেরা আড়ালে ফিসফাস করতে শুরু করে দিয়েছে, জামাই বাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন পার্থ সেন আর সঞ্জয় মিত্তির।

নিন্দুকেরা ভুল ধারণা হয়তো করেনি, কিন্তু নিন্দুকদের ধারণা সত্য হবে বলে মনে হয় না। পাড়ার মেয়েরা সবার আগে বুঝতে পেরেছেন, সঞ্জয় মিত্তির আর পার্থ সেন যে আশায় একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সে আশা নিতান্তই ভুল আশা। পরমেশের মা নিজেই কথায় কথায় বলে ফেলেছেন—ছেলে বিয়ে করতে চায় না। আমি দশ বছর ধরে বলে বলে হার মেনেছি, কিন্তু সব বৃথা। ছেলে যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ধরেছে।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেনের বাড়িতেও এই সমস্যা। দুই বাড়িতে যেন দুটি মেয়ে ভীষ্ম রয়েছে। মুক্তা মিত্র বিয়ে করতে চায় না; বিদুলা সেনও বিয়ে করতে চায না।

বি-এ পাশ করার পর আজ প্রায় পাঁচ বছর হল, মুক্তা মিত্র যেন ইচ্ছে করেই এই বাড়ির একটি ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। একটি তানপুরা, আর এক গাদা স্বরলিপির বই, এই নিয়ে মুক্তা মিত্র তার নিজের মনের জগতে লুকিয়ে আছে। গানকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে মুক্তা। শুধু গান আর গান। মুক্তার জীবন যেন এই সংসারের সব মায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এক সুরলোকের নীড়ে, মীর মূর্ছনা গমক আর ঝংকারের মায়ার মধ্যে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে।

পিসিমা খুবই বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ঝগড়াও করেন।—গান-উলীর বয়স কত হল ভেবে দেখ সঞ্জু। কোন্ মুখে আর মেয়েটি মেয়েটি করছিস? মেয়ের বিয়ে দিবি কবে? আমার মতো যখন চুল পেকে শনের নুড়ি হবে, তখন?

পার্থ সেনের ভাইঝি ঐ মেয়েটি, ঐ বিদুলা সেনও বিয়ে করবে না। কখনও না। আই-এ ফেল করার পর থেকে সেই যে ছুঁচ কাঁটা কুরুশ নিয়ে সেলাই-এর বাতিক ধরেছে, তো ধরেইছে। সে-ও তো প্রায় আট বছর হল। দিবারাত্রি শুধু রঙীন সুতো নিয়ে এক বাতিকের খেলা। শুধু ফুল তোলা আর নক্সা আঁকা। বড়দাও রাগ করে বলেন—এতই যদি পারিস, তবে একটা দরজীর দোকান দিয়ে ফেল না বিদুলা!

বিদুলা বলে—শুধু দরজীর দোকান কেন, আমি একটা রান্নার দোকানও দিতে পারি।

এখুনি যে আমারই হাতের তৈরি পাঁচটা মাছের-চপ টপাটপ খেয়ে ফেললে, সেগুলি খেতে খাবাপ লাগল ?

বড়দা—তবে তাই কর। একটা রান্নার দোকান দিয়ে ফেল।

বিদুলা—তা হলে তো একটা মাথা-টেপার দোকানও দিতে হয়।

বড়দা—কি বললি ?

বিদুলা—তুমিই তো বলেছ, আমি তোমার মাথা না টিপে দিলে ফিজিক্সের কোন ফর্মূলাই তোমাব মনে পড়ে না। পড়াতে গিয়ে ছেলেদের কাছে নাকাল হও।

অধ্যাপক বড়দা সত্যিই একটু নাকাল হয়ে তারপর একটু হেসে ফেলেন।

বেহালার নতুন সড়কের পাশে নতুন তিনটি বাড়ির উপর দিবারাত্রি নিমেষের ছায়া দোলে, কিন্তু তিন বাড়ির জীবনের ভিতরের সমস্যা একটু দোলে না। সমস্যাটা তেমনি নিরেট হয়ে বয়েছে।

কিন্তু এমন সমস্যার কারণটাই বা কি ? কেন বিয়ে করতে চায় না মাঝের বাড়ির পরমেশ ? বিয়ের নামে এত ভীত হয়ে পড়ে কেন এই বাড়ির মুক্তা, আর ওই বাড়ির বিদুলা ?

পরমেশের মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করার পর পিসিমার মুখে যে সব কথা ফুটতে থাকে সে-সব কথা শুনলে মনে হয়, হ্যাঁ, তাই হবে বোধহয়। সমস্যার কারণটা প্রায় আন্দাজ করতে পেরেছেন পিসিমা।

পরমেশের মা'র কাছে পিসিমা বলেন—আমার কি মনে হয় জান ? বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে বিয়ে করবার মনই হারিয়ে ফেলে।

পরমেশের মা হাসেন।—আমার ছেলে কিন্তু দশ বছর আগে থেকে, যখন বলতে গেলে ছেলেমানুষই ছিল, তখন থেকেই বিয়ের নামে শুধু না-না করেছে, আজও তাই করছে।

পিসিমা বলেন—তা'হলে বলতে হয়, এরা মনের মতো জন খুঁজে পাচ্ছে না বলেই বিয়ে করছে না।

পরমেশের মা বলেন—কিন্তু মনের মতো হয় না কেন বলুন ? আমার ছেলের কথাই ধরুন না, কত ভাল মেয়ে দেখিয়েছি, কিন্তু মনে তো ধরল না।

পিসিমা—তা হলে বুঝতে হয় যে, এরা ছাই বুঝতেও পারে না, মনের মতো জন কে হতে পারে। যেমন আপনার বাড়ির ছেলে, তেমনি আমার বাড়ির মেয়ে আর তেমনি হল পার্থ সেনের ভাইঝিটা।

গড়িয়ে চলে দিন, সমস্যাটাও তেমনি থিতিয়ে থাকে, দেখতে দেখতে একটা মাসও পার হয়ে যায়। শুধু পরমেশকে দেখা যায়, কখনও সঞ্জয়বাবুর বাড়িতে, কখনও বা পার্থবাবুর বাড়িতে, চা-এর নিমন্ত্রণে যায়। মুক্তার সঙ্গে চা-এর আসরে যেমন আলাপ-পরিচয় হয়েছে পরমেশের, তেমনি বিদুলার সঙ্গেও হয়েছে। দু'দিকে দুই বাড়িতে দুই মেয়ের সঙ্গে শুধু নমস্কার বিনিময় করে চলে এসেছে মাঝের বাড়ির ছেলে পরমেশ।

ঘটনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে সন্দেহ করার মতো কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। যারা নিন্দে করতে চায় তারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোন বাড়ির চা বেশি মিষ্টি মনে হয়েছে পরমেশের !

সঞ্জয় মিত্র ভাবেন, মাঝের বাড়ির পরমেশ এখানে দশ বছর থাকলেই বা কি হবে ? পার্থ সেন ভাবেন, ওরা ডিব্রুগড় চলে গেলেই বা কি আসে যায় ?

এক মাসের মধ্যে শুধু কয়েকটি দিন, তারপর আর চা-এর নিমন্ত্রণে কোনদিন দু'দিকের কোন বাড়িতেই পরমেশকে যেতে দেখা যায়নি। পরমেশের সঙ্গে পথে যদি দেখা হয়, তবে শুধু ভারত সরকাবের ইকনমিক পলিসি সম্পর্কে পরমেশের সঙ্গে আলোচনা করেন

সঞ্জয়বাবু। পার্থ সেনের সঙ্গেও পরমেশের মাঝে মাঝে দেখা হয়। পার্থ সেন বলেন—তা ডিব্রুগড়ই বা কি এমন খারাপ জায়গা ? শুনেছি ব্রহ্মপুত্রের ভিউ বড় চমৎকার।

নিন্দুকেরা হতাশ হয়ে পড়ে। ঘটনার গায়ে একটুও রং ধরল না। মেলামেশার পালিশও চটেছে। চা-এর নেমন্তন্নের আর সেই হাঁকডাকও নেই। বোধ হয় কোনো বাড়ির চা মিষ্টি মনে হয়নি পরমেশের।

দু'মাস কেন ? তারও বেশি হবে। সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন গল্প করতে করতে নতুন সড়কের উপর পায়চারি করেন এবং মাঝের বাড়ির গেটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালার সঙ্গে জিনিসের দামের দরাদরি করেন, এবং চোখেও পড়ে যে, মাঝের বাড়িটা নিঝুম হয়ে রয়েছে। কিন্তু মনেও পড়ে না দু'জনেরই কারও, এই বাড়িতে মানুষ আছে, এবং পরমেশ নামে এক অল্প বয়সের ভদ্রলোক এখানে থাকেন। পরমেশের সঙ্গে যে এক মাসেরও বেশি হল তাঁদের একবার দেখাও হয়নি, তাও মনে পড়ে না।

কিন্তু মনে পড়ল হঠাৎ এবং দুই জনেই একটু লজ্জিত হয়ে চমকে উঠলেন। দেখতে পেলেন, ডাক্তারের গাড়ি এসে থামল মেঝের বাড়িব গেটের কাছে।

ডাক্তার বাড়ির ভিতরে চলে যেতে সঞ্জয় মিত্র বলেন—পরমেশই অসুখে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পার্থ সেন বলেন—তাই তো অনেক দিন তার দেখা পাই না।

মাঝের বাড়ির ভিতরে স্বচক্ষে সব দেখার পর চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয়বাবু ও পার্থবাবু। টাইফয়েড হয়েছে পরমেশের। পরমেশের বিছানার দু'দিকে দুটি টুলের উপর বসে আছে পরমেশের ভাই আর বোন। মাথার কাছে বসে আছেন পবমেশের মা। উদ্বিগ্ন এক একটি মূর্তির চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, দিন-রাতের কোন মুহূর্তেও এরা ঘুমোয় না। খাওয়াদাওয়ার পাটও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বোধহয়।

সঞ্জয়বাবু আক্ষেপ করেন—আমাদেব একটা খবব দেওয়া উচিত ছিল।

পার্থ সেন বলেন—আপনাদের এখানে তো আর কারও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না, রান্নাবান্না করে কে ?

পরমেশের মা বলেন—লোক আছে।

ডাক্তার বলেন—ক্রাইসিস পার হয়ে গিয়েছে, এখন আর চিকিৎসা বলে কিছু নেই, দরকার হল শুশ্রূষা।

পরমেশের দুই ভাই-বোনের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন—এই দুটি বাচ্চা মানুষ যে কী এক্সপার্ট নার্স, তা আর কী বলব মশাই। ওদের দেখতে পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি। খুব ভালো শুশ্রূষা চলছে।

নিশ্চিন্ত হলেন সঞ্জয়বাবু এবং পার্থবাবু। এবং খুশী মনেই চলে গেলেন। চলে গেলেন ডাক্তার। আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ি।

কিন্তু বোধহয় পনর মিনিটও পার হয়নি মাঝের বাড়ির গেটের দরজা হঠাৎ শব্দ করে ওঠে। তারপরেই একেবারে রোগীর ঘরের ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় এক আগন্তুক।

পরমেশের মা বলেন—বসো বিদুলা।

চেয়ারে বসে না বিদুলা। একবার পরমেশের মুখের দিকে তাকায়। ঘুমোচ্ছে পরমেশ। ঘরের ভিতরেই আস্তে আস্তে ঘোরাফেরা করে বিদুলা। হঠাৎ থামে, রোগীর টেম্পারেচারের চার্ট টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে। ওষুধের শিশিগুলির দিকে একবার তাকায়। রোগীর দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে। তারপর পরমেশের ভাই-এর কানের কাছে আস্তে

আস্তে বলে—বিছানার চাদরটা বদলে দিলে ভালো হয় ভাই।

পরমেশের মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—তুই এখন পাখা ছেড়ে দে মিনি। বিদুলাকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসে গল্প কর। আমি আসছি এখনি।

চোখ মেলে তাকায় পরমেশ। পরমেশের শুকনো চোখ দুটোই যেন হঠাৎ বিস্ময়ে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে—আপনি কখন এলেন ?

বিদুলা বলে—এখুনি। এখুনি কাকার কাছে শুনলাম যে আপনি অসুখে পড়েছেন।

পরমেশ হাসে—পড়েছিলাম, কিন্তু এখন উঠেছি।

মিনি ডাকে—আসুন বিদুলাদি।

মিনি সঙ্গে বাইরের ঘরে ঢুকেই বিদুলা চমকে ওঠে—একি ?

মিনি বুঝতে পারে না—কি বলছেন বিদুলাদি ?

বিদুলা—এত সব তানপুরা এস্রাজ বেহালা এখানে কিসেব জন্য ?

মিনি—দাদার জিনিস। দাদা খুব ভাল গাইতে বাজাতে পারেন। দাদা গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

বিদুলা—কিন্তু কই, পরমেশবাবুকে তো কোনদিন গাইতে শুনিনি ?

মিনি—না, এখানে এসে গান আরম্ভ করতে পারেননি। এই তো ক'দিন আগে যন্ত্রগুলি এসে পৌঁছলো, রেলের বুকিং-এর ভুলে পাটনা চলে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ অসুখে পড়লেন দাদা, কাজেই.. ।

পরমেশের মা এসে ঘরে প্রবেশ করেন—আমি যে তোমার নিন্দে শুনেছিলাম বিদুলা। তুমি নাকি অহংকারী, কখনও কারও বাড়ি যাও না।

বিদুলা হাসে—অহংকারী নই, তবে কারও বাড়ি যাই না ঠিকই।

মিনি হাততালি দিয়ে বলে—তাহলে আমরাই ফার্স্ট, বিদুলাদি আমাদের বাড়িতে ফার্স্ট এসেছেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয় বিদুলা। সত্যিই তো। এবাড়িতে এমন করে ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবার কি দরকার ছিল ? মিনি আর মিনির মা আশ্চর্য হয়েছে। আরও অনেকেই হয়তো এক রকম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে। বাড়ি ফেরা মাত্রই তো কাকিমা প্রশ্ন করবেন—কেমন দেখলি পরমেশকে ? ভুল করে হঠাৎ অনেকগুলি প্রশ্নের ভয় জীবনে ডেকে এনে ফেলেছে বিদুলা।

বড় অস্বস্তি বোধ করে, উঠে দাঁড়ায় বিদুলা। ব্যস্তভাবে বলে—আমি যাই।

মিনির মা বলেন—এসো আবার।

মিনি প্রশ্ন করে—কবে আসবেন ?

—দেখি, কবে আসতে পারি। বিড-বিড় করে বলতে বলতে চলে যায় বিদুলা।

মনে হচ্ছে বিদুলা সেনই বিদুলা রায় হয়ে যাবেন। আড়ালের নিন্দুকেরা যেদিন ফিসফিস করে, ঠিক সেইদিন সন্ধ্যায় মাঝের বাড়ির ভিতর থেকে গানের সুর আর এস্রাজের আওয়াজ উথলে ওঠে। আর, ও দিকের সঞ্জয় মিত্রের বাড়ির জানালায় একটি ছায়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়িয়ে মাঝের বাড়ির একটি ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে মুক্তাকণা। আবার মন দিয়ে, আর সব আগ্রহ নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। কে সাধছে এমন সুন্দর আশাবরী ? পরমেশবাবু। ভদ্রলোক কি সত্যিই গানের মানুষ ? অল্প কথা বলেন, আস্তে কথা বলেন, কিন্তু গানের বেলায় একি দরাজ গলা ! এই মানুষ যে সেই মানুষই নয়, একেবারে ভিন্ন এক জগতের মানুষ।

আর দেরী করে না মুক্তাকণা মিত্র। মাঝের বাড়ির গেটের দরজা আবার ঝন করে বেজে

ওঠে। গেট খুলে বাড়ির ভিতরে চলে যায় মুক্তা। মুক্তা মিত্রের মনের সব কল্পনা যেন এতদিনের নির্বাসন থেকে বেড়া ভেঙ্গে ছুটে এসেছে ; এক গমকে ভেসে এসেছে মুক্তা মিত্রের মনটাই।

যারা ক'দিন আগে দেখেছিল, মাঝের বাড়ির গেট খুলে বিদুলা সেন ঢুকছে বাড়ির ভিতরে, তারাই আজ মুক্তা মিত্রকেও সেই বাড়িতে যেতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। জমলো নাকি খেলা ? তবে কি মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন ?

পরমেশের ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় মুক্তা মিত্র। গান থামিয়ে পরমেশ বলে—বসুন।

মুক্তা বলে—কোন খবর না দিয়ে একেবারে অভদ্রের মতোই এসে পড়লাম পবমেশবাবু। আমি গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।

চমকে ওঠে পরমেশ। মুক্তা মিত্রের মুখের দিকে বিস্ময়ের চক্ষু তুলে তাকায়। পৃথিবীতে তাহ'লে সত্যিই আরও একজন মানবু আছে, যে তারই মতো প্রাণের চেয়েও গানকে বেশি ভালবাসে।

মুক্তা বলে—থামবেন না পরমেশবাবু। গেয়ে যান।

পরমেশ—আপনিও গাইবেন তো !

মুক্তা—নিশ্চয় গাইব।

মাঝের বাড়ির একটি ঘরে সেই সন্ধ্যার মুহূর্তগুলি যেন ঝংকার দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। পরমেশ গান গায়, তারপর মুক্তা, তাবপর আবার পবমেশ। সুরলোকের কুহকের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন আত্মহারা হয়ে যায় দুটি মানুষের সুরপিপাসী প্রাণ।

কে না শুনতে পায়, মাঝের বাড়িব এই সন্ধ্যার সুবময় উৎসবের ধ্বনি ? পথ দিয়ে যারা মাথা হেঁট করে চলে যায় তারা শোনে, যারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যায় তারা শোনে। সঞ্জয়বাবুও কি শুনতে পাননি ? নিশ্চয়ই শুনেছেন। তা না হলে এবই মধ্যে ব্যস্তভাবে মুক্তার মাকে কাছে ডেকে এই কথা বলতেন না—এখন তো আর কোন বাধা নেই।

মুক্তার মা আশ্চর্য হন—কি ?

সঞ্জয়বাবু—এবার পরমেশের মার কাছে তুমি কথাটা তুলতে পার।

মুক্তার মা বলেন—তুলবো।

সঞ্জয়বাবু ভাবেন, পরমেশকে এইবার মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকলে ভালো হয়।

পিসিমা তাঁর জপের মালা থামিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করেন—তোমার মেয়েটি কি সত্যিই বিয়ে করতে রাজী হয়েছে ?

সঞ্জয়বাবু বলেন—রাজি হবে বলে মনে হচ্ছে।

সবাই যখন শুনেছে, তখন বিদুলাও কি না শুনে আছে ?

সারাদিন কাঁটা কুরুশ আর ছুঁচ নিয়ে ফুল তোলা আর নক্সা আঁকার খেলা নিয়ে মনটা যেন ভালোই মেতে থাকে। শুধু সন্ধ্যা বেলাটায় কেমন যেন হয়ে যায়। ভিতরের বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে থাকেন অধ্যাপক বড়দা। ফিজিক্সের ফরমূলা আবার ভুলে যেতে পারেন, তাই চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বড়দার মাথা টেপে বিদুলা। মাঝের বাড়ির একটি ঘরের সুরময় উল্লাসের ঝংকার শোনা যায়। বড়দা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলেন—প্যারালিসিস হল নাকি তোর। হাত থামিয়ে ভাবছিস কি ?

যে-কথা ভাবছিল বিদুলা, সেই কথাই এত তাড়াতাড়ি সত্য হয়ে উঠবে, সেটা এই সন্ধ্যাতেও কল্পনা করতে পারেনি স্বয়ং পরমেশ, এবং মুক্তাও।

সন্ধ্যা শেষ হবার পরেও, এবং গান শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকে মাঝের

বাড়ির একটি ঘর। চলে আসছিল মুক্তা, পরমেশই বাধা দিয়ে বলে—একটু বসো না মুক্তা!

চুপ করে বসে রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়ায় মুক্তা।

পরমেশ বলে—একটি কথা বলবো?

মুক্তা—বলুন।

পরমেশ—আমিও গানকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি, তোমারই মতো।

মুক্তা—তা তো বাসবেনই, দেখতেই পাচ্ছি। তা না হলে...।

পরমেশ—কি?

মুক্তা হাসে—তা না হলে আমিই বা এখানে আসব কেন?

পরমেশ—কিন্তু গানের মানুষকেও কি ভালবাস?

মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে ছটফট করে ওঠে মুক্তা—কেন বাসব না পরমেশবাবু? আপনি মিছামিছি জিজ্ঞাসা করছেন।

পরমেশের দু'চোখের হাসি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আজ তাহলে এস মুক্তা। কাল আবার...।

মুক্তা বলে—কাল আবার টোড়ি আর ছায়ানট!

পরমেশ—অ্যাঁ? আচ্ছা।

পরমেশ আজ বিশ্বাস করে, তার এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সার্থক হয়েছে। কল্পনা একেবারে মূর্তি ধরে চোখের সামনে এসে ধরা দিয়েছে। তার নাম মুক্তা, গানের সুরে বাঁধা একটা সুন্দর জীবন। এই তো পরমেশের জীবনের প্রয়োজন, মনের মতো জন।

পরমেশের মা'ও আজ বুঝতে পারেন, কেন এতদিন বিয়ে করতে রাজি হয়নি তাঁর ছেলে। যেমনটি চেয়েছিল পরমেশের মন, ঠিক তেমনটি আজ ভগবান ওকে পাইয়ে দিয়েছেন। ভালোই হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের মেয়ে মুক্তা মিত্র দেখতেও বেশ সুন্দর।

মুক্তার পিসিমা কথায় কথায় কত কথাই বলেছেন।—আমাদের বাড়ির মেয়েটি সংসারের কুটোটিও নাড়তে শেখেনি। মেয়ে শুধু ছবির মতো সাজতে জানে! ও মেয়ে একটা চিৎকার শুনলে মূর্ছা যায়।

—তাতে কি হয়েছে? পিসিমার সব কথা মনে পড়লেও মনে কোন আপত্তি বোধ করবে না পরমেশের মা। এই সংসারে এসেও মুক্তাকে কোন ঝঞ্ঝাটের কুটো নাড়তে হবে না। থাকুক না ছবির মতো সেজে। পরমেশ যদি সুখী হয়, তা হলেই হল।

এইবার আর সন্দেহ করবার দরকার হয় না। যারা কিছুই জানতো না, তারাও সব জেনে ফেলেছে। মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন। ভালো জামাই প্রায় বাগিয়ে এনেছেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু কবে? বিয়ে হবে কবে?

বিয়ের দিন ঠিক করতে পরমেশের মা'র সঙ্গে আলোচনা কববার জন্য এসেছিলেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু আলোচনা হল না। পরমেশের মা বললেন—পরেমেশের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আর ক'টা দিন যাক্, তারপর ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়েই আপনাকে জানাব।

—তাই ভালো—চলে গেলেন সঞ্জয় মিত্র। তারপরেই এলেন ডাক্তার। পরমেশ জিজ্ঞাসা করে—রেস্ট নিতে অ্যাডভাইস করেছেন, কিন্তু কি রকম রেস্ট?

ডাক্তার—অফিসে যাবেন না, আর গাট-টান একেবারে কমিয়ে দিন।

পরমেশ—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক'দিন থেকে দেখছি, গান বেশি হলেই হার্টের ব্যথাটা বাড়ে।

ডাক্তার—তাহলে কিছুদিন গান একেবারেই বন্ধ করে দিন।

পরমেশ বলে—বেশ।

গান কিছুদিন একেবারে বন্ধ রাখতে হবে, এর জন্য দুঃখ হলেও সে দুঃখ তেমন কিছু নয়। কারণ, তার গানের আশা তো সার্থক হয়েই গিয়েছে। গানের মানুষকেও ভালবাসে মুক্তা।

অসুস্থ শরীরটা বিছানার উপর এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে পরমেশ! শরীরটা রেস্ট পায় ঠিকই, মনটা রেস্ট পায় না। কখন আসবে সন্ধ্যা ? কখন আসবে মুক্তা ? আজ সন্ধ্যায় সুরে সুরে মুখর হয়ে উঠবে না এই ঘর, কিন্তু তার জন্য কোন দুঃখ কববার দরকার হয় না। কল্পনা করতে পারে পরমেশ, গভীর নীরবতার মধ্যে, এই ঘরের ভিতরে একটা বুকজোড়া শান্ত অচঞ্চলতার মধ্যে মুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা না বলে যদি সন্ধ্যাটা পার হয়ে যায়, তাই বা কি কম লাভ ? সে-ও এক নীরব সুরের আনন্দ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘড়িব দিকে তাকায় পরমেশ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চমকে ওঠে মুক্তা—একি ! গানের মেয়ে যেন ঘরের এই নীরবতায় ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

পরমেশ হাসে—কিছুই না মুক্তা। শরীরটা একটু অসুস্থ, এই মাত্র।

মুক্তা বলে—তাহলে আজ শুধু দুটো আশাবরী। বেশিক্ষণ থাকব না।

পরমেশ—ডাক্তার আমাকে রেস্ট নিতে বলেছেন। গান কিছুদিন বন্ধ রাখলেই ভালো হয়।

মুক্তা আশ্চর্য হয়— গান বন্ধ রাখবেন আপনি ? তা হলে...তা হলে আমি এখন কি করি ?

পরমেশ—তুমি সত্যি গান শুনতে চাও ?

মুক্তা হাসে—নিশ্চয় শুনতে চাই।

আস্তে আস্তে উঠে বসে পরমেশ। তানপুরা হাতে তুলে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কি বলছিলে মুক্তা ? আশাবরী ?

মুক্তা—হ্যাঁ।

সুরলোকের আশাবরী এই ঘরের বাতাসে মূর্ছনা ছড়ায়। মুগ্ধ দুটি চক্ষু নিয়ে বসে থাকে মুক্তা। যেন সত্যিই দেখতে পাচ্ছে মুক্তা, পরমেশের গানের ভাষা সুরের ছোঁয়ায় রঙীন হয়ে ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ছে।

গান শেষ হয়। মুক্তা মিত্রের কালো চোখের চাহনি আর সুন্দর ভুরু যেন ব্যথিত হয়েছে। মুক্তা বলে—আপনার আজকের আশাবরীটা কেমন যেন হয়ে গেল।

পরমেশ বলে—কিন্তু গান গেয়ে বোধহয় ভুল করলাম ' হার্টের ব্যথাটা সত্যিই বাড়ছে।

আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে পরমেশ। মুক্তা মিত্র বলে—আমি এখন যাই। কাল আবার...।

পরমেশের দু'চোখে যেন একটা যন্ত্রণার বিস্ময় দপ্ করে ফুটে ওঠে।

—কাল আবার গান গাইতে পারব না। গান কিছুদিন বন্ধ রাখতেই হবে।

মুক্তা হাসে--বেশ তো, গান বন্ধ রাখুন কিছুদিন। তারপর, যেদিন আবার গাইবেন, সেদিন আসব। চলে যায় মুক্তাকণা মিত্র।

সন্ধ্যা হয়েছে, তবু কেন মাঝের বাড়ির একটি ঘরে সুর আর স্বরের ঝংকার বাজে না ? পার্থ সেনের বাড়ির বারান্দায় একটি ছায়া নিজের মনের চঞ্চলতায় এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। বিদুলা শুধু কল্পনা করতে পারে—আজ বোধহয় একসঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে দুটি মানুষ, যারা প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভালবাসে। ওরা দুজন একই মালায় দুটি ফুল। বেশ হল, ভালোই হয়েছে।

ভালো লাগে না শুধু একটি কথা ভাবতে। কেন সেদিন অমন করে বেহায়ার মতো ছুটে

গিয়েছিল বিদুলা, একটা রোগী মানুষকে দেখবার জন্য ? শুধু নিজের মনের কাছে নয়, কাকিমার চোখের কাছেও যে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বিদুলা।

কাকা আর কাকিমার চাপা গলার কথাবার্তাও শুনতে পেয়েছে বিদুলা। কাকীমা রাগ করেছেন, কাকার মনটাও কেমন একটু ব্যথিত হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের সঙ্গে আর তেমন করে জোর গলায় গল্প করতে পারেন না কাকা। আক্ষেপ করেছেন কাকিমা।—এতদিন গম্ভীর হয়ে থেকে, হঠাৎ সেদিন এক দৌড়ে ছুটে চলে গেল কেন বিদুলা ? গেলই যদি, তবে হঠাৎ আবার এক দৌড়ে পালিয়ে এল কেন ? এসব মেয়ের মনের রকম বোঝা ভার !

কাকা বলেন—না গেলেই ভালো করতো। তা হলে কানাইবাবু আমাকে ওরকম একটা প্রশ্ন করতে পারতেন না।

কাকিমা বলেন—আমি মনে করেছিলাম, পরমেশই বুঝি ওকে ডেকেছে।

কাকা—না, কেউ ওকে ডাকেনি। আমিই ওকে খবরটা দিয়েছিলাম। আসল কথা হল, মেয়েটার মনটাই একটু অন্য রকমের কি না। দেখলে না, সে নিজের হাতে বার্লি তৈরি করে নিজেই মতিরামের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

কাকিমা—কি হয়েছে মতিরামের ?

কাকা—বসন্ত হয়েছে।

কাকা ও কাকিমার চাপা স্বরের বার্তালাপ শুনতে ভালো লাগে, খারাপও লাগে। বিদুলার মনটাই অন্য রকমের। সে মন নিয়ে চাকর মতিরামের বাড়িতে ছুটে যাওয়া যায়, কিন্তু সে মন নিয়ে এই রকম গানের মানুষের কাছে ছুটে যাওয়া নিতান্তই ভুল সাহস।

হঠাৎ শোনা যায়, ওদিকের বাড়ির একটি ঘরের জানালা দিয়ে গানের সুর ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার বুকে।

গান গাইছে মুক্তা। এরপর নিশ্চয় গান গাইবেন মুক্তার মনের মতো জন, সেই ভদ্রলোক। পার্থ সেনের বাড়ির বারান্দায় শান্তভাবেই ঘুরে বেড়ায় একটি উৎকর্ণ কৌতূহলের ছায়া। এক গানের পর অন্য গান গাইছে মুক্তা। কিন্তু পরমেশ রায়ের গান শোনা যায় না কেন ?

—একি ? নিজের মনেই চমকে ওঠে বিদুলা। গান বন্ধ করেছে মুক্তা, আজ সন্ধ্যার মতো মুক্তার গানের পালা শেষ হল। তবে পরমেশ রায় এখন কোথায় ? মুক্তা কি একাই গাইছিল গান ? তার গানের আনন্দের কাছে আর একজন কেউ কি এতক্ষণ বসে ছিল না ?

কেমন করে কল্পনা করবে বিদুলা ? বিদুলা যে এখনও কিছুই শুনতে পায়নি। সেই ভদ্রলোক যে এখন তাঁর নিজের ঘরের বিছানার উপরে একা পড়ে আছেন, আর ছোট্ট মিনি শুধু তাঁর মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করছে !

আর, মুক্তার পিসিমাও যে ঐ মাঝের বাড়ির এক ঘরের ভিতরে বসে পরমেশ রায়ের মা-এর সঙ্গে এখন কথা বলছেন।

পিসিমা বলেন—আমাদের মেয়েটির ঠিক উল্টোটি হলেন ও বাড়ির মেয়েটি। সংসারের যত কাজের কুটো কুড়িয়ে সারাদিন খাটবে। পাঁচ-রকমের পথ্যি আর দশ রকমের রান্না রাঁধবে। এর মাথা টেপ, ওর গা ধোয়াও, তার মুখে ওষুধ ঢেলে দাও, এই নিয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে পার্থ সেনের ভাইঝিটা। আমি বলি সংসারের পাঁচ কাজের জন্য যখন এতই শখ তবে বিয়ে করতে চাস না রে কেন ছুঁড়ি !

পরমেশের মা বলেন—আহা, বড় সুন্দর মেয়ে তো !

পিসিমা—না গো, তেমন কিছু সুন্দর নয়, আমাদের মুক্তোর তুলনায় কিছুই নয়।

পরমেশের মা হাসেন—আমি দেখেছি বিদুলাকে, এখানেও এসেছিল এক দিন।

চলে গেলেন পিসিমা। তার পরেই পরমেশের ডাক শুনতে পান পরমেশের মা—শরীরটা খুবই খারাপ বোধ করছি মা। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠাও।

আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ি। দিনে তিনবার ডাক্তার আসেন আর চলে যান। দশদিনের বেশি হয়ে গেল, জ্বর আর বুক ব্যথা নিয়ে বিছানার উপর ছটফট করে পরমেশ। সঞ্জয়বাবু আর পার্থবাবু, দু'জনেই এসেছিলেন। দেখে একটু চিন্তিত হয়ে চলে গিয়েছেন দু'জনেই।

মাঝে মাঝে আবছা ঘুমের মধ্যে যেন দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পায় পরমেশ। মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। মা বলেন—মুক্তা তো একবারও এল না।

পরমেশ—মুক্তার তো আসবার কথা নয়।

পরমেশের মা আশ্চর্য হন—তার মানে?

পরমেশ—এখন তো আমি গান গাইতে পারব না, মুক্তা এসে করবে কি?

পবমেশের মা আরও আশ্চর্য হন—এর মানে কিছু বুঝলাম না।

পরমেশ—মুক্তা এখন আসবে না, আসতে পারে না, তার এসেও কাজ নেই।

ছোট্ট মিনি চেঁচিয়ে ওঠে। তবে বিদুলাদি আসুক না কেন? সেদিন তোমার অসুখের সময় বিদুলাদিই তো এসেছিলেন!

চুপ কবে থাকে পরমেশ! চুপ করে ভাবতে থাকেন পরমেশের মা। বিদুলা কি আসবে? আসবেই বা কেন? মুক্তার সঙ্গে যে মানুষের বিয়ের কথা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে এবং রটেও গিয়েছে, তার কাছে সে বেচারী আসবে কেন?

কল্পনা করতে পারছেন না, জানেনও না পরমেশের মা, ঠিক এই সময়েই ওদিকের বাড়িব বাইরের ঘরের দরজার কাছে একটা অভিমানী বাধার মতো পথ আটক করে দাঁড়িয়ে আছেন বিদুলার কাকিমা—যেও না, যেতে পারবে না বেহায়া মেয়ে।

বিদুলা বলে—বেহায়া বৈকি! কিন্তু যেতে দাও কাকিমা।

কাকিমা—কেন যাবে?

বিদুলা হাসে—যেতে ইচ্ছে করছে, তাই।

কাকিমা—অপমানের ভয় নেই?

বিদুলা—না, অপমান যা হবার হয়েই গিয়েছে, আর নতুন করে অপমানের ভয় কোথায়?

কাকিমা—অপমানের ভয় না হয় নেই, কিন্তু ওখানে গিয়ে তোর লাভটা কি? ওর তো মুক্তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েই গিয়েছে।

বিদুলা—জানি।

কাকিমা—তবে?

বিদুলা—একটা রোগী মানুষকে দেখতে যাব আর চলে আসব, এর মধ্যে ক্ষতিটাই বা কি?

হঠাৎ ছলছল করে চোখ, ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে বিদুলা—আমি একবার না গিয়ে, নিজের চক্ষে একবার না দেখে থাকতে পারছি না কাকিমা। জীবনে এই প্রথম বেহায়া হয়েছি, আর একটু বেহায়া হতে দাও।

আর বাধা দেন না কাকিমা।

পরমেশের অসুখ সারতে সময় নিল অনেক। প্রায় আরও একমাস। বেহালার নতুন সড়কের নিম আবার নতুন ফুলে ছেয়ে গিয়েছে।

শুধু সেদিন নয়, প্রতিদিনই মাঝের বাড়িতে এক রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে

ওদিকের বাড়ির ঐ পার্থ সেনের ভাইঝি বিদুলা। কাকিমাও আর রাগ করেননি। বরং রোজই একই প্রশ্ন করেছেন—পরমেশ আজ কেমন আছে বিদুলা ?

পরমেশের মা'ও নিজের চক্ষেই দেখেছেন, এই মেয়ে একেবারে অন্য রকম মনের মেয়ে। মুক্তার ঠিক উল্টোটি। ঠিকই বলেছিলেন মুক্তার পিসিমা। সংসারের যত জ্বর-জ্বালার গায়ে হাতে বুলোবার জন্য পার্থ সেনের এই ভাইঝির হাত দুটো যে নিশপিশ করে, সাগু জ্বাল দেবার জন্য আর বার্লি তৈরি করবার জন্য তৈরি দুটো পাকা-পোক্ত হাত।

বিদুলা সেনকে শুধু একটা বিপদে পড়তে হল শেষ সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যায় ডাক্তার এসে পরমেশকে বলে গেলেন—কাল থেকে অফিসে যেতে পারেন।

চলে গেলেন ডাক্তার, কিন্তু চলে আসতে পারল না বিদুলা। পরমেশই অনুরোধ করে। আর কিছুক্ষণ থেকে যাও বিদুলা।

ঘর বড় নীরব। বড় বেশি সুরময় সেই নীরবতা। পরমেশ বলে—এ রকম সুন্দর মন তুমি কোথায় পেলে বিদুলা ?

বিদুলা যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে হাঁপাতে থাকে—আমাকে এসব কথা আপনার বলা উচিত নয় পরমেশবাবু।

পরমেশ—তোমাকেই তো বলব।

বিদুলা আশ্চর্য হয়—কেন ? আপনি তো প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভালবাসেন।

পরমেশও হাসে—ঠিকই সন্দেহ করেছ বিদুলা। গান আমার প্রাণের চেয়েও বেশি।

বিদুলা হেসে ফেলে—তবে আর কি !

পরমেশ—কিন্তু তুমি যে আমার গানের চেয়েও বেশি।

চলে গেল বিদুলা। এবং যারা আড়াল থেকে আর উঁকিঝুঁকি দিয়ে অনেক কিছু বুঝে ফেলে, তারাই এক মাস পরে বলাবলি করে—আরে কি আশ্চর্যের কথা, শেষে বিদুলা সেনই বিদুলা রায় হয়ে গেল !

নমিতার সেতার

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরবার পথে মস্ত বড় বাড়িটার তেতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেবেশবাবু।

তেতলার বারান্দার আলো ঝকমক করে। বড় বড় কৌচ আর সোফার রঙীন ভেলভেট জ্বলজ্বল করে। লাফ দিয়ে ছুটোছুটি করে একটি শিশু হাউণ্ড। একটা সোফার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। ঐ তেতলা বাড়ির প্রভু শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল।

বেশ তো দেখতে মেয়েটি। দেখতে থাকেন দেবেশবাবু। সুন্দর সাজে সেজে রয়েছে লেখা সান্যাল, আর হাতের কাছে একটা সেতার। সেতারটাও খুব দামী বলে মনে হয়।

দেখবার জন্য নয়, শোনবার জন্যই পথের উপর এক গাছের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন দেবেশবাবু। দেবেশবাবুর সব কৌতূহল তাঁর দুই কানের মধ্যেই যেন ছটফট করছে। শুনতে চান দেবেশবাবু, লেখা সান্যালের হাতের সেতার কত মিষ্টি ঝংকার দিতে পারে। জানতে চান দেবেশবাবু, সেসন জজ শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল সেতারেতে তার মেয়ে নমিতার চেয়ে ভাল হাত তৈরি করে ফেলতে পেরেছে কি ?

তেতলা বাড়ির বারান্দায় ঐ সুন্দর মেয়েটিই হলো দেবেশবাবুর মেয়ে নমিতার

প্রতিদ্বন্দ্বিনী। সেতার বাজনার এক প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে বাণীনিকেতন। কলকাতা শহরের চারজন বিখ্যাত গুণী, দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক, একজন সরকারী মন্ত্রী, একজন বিশিষ্ট মারোয়ারী ব্যবসায়ী, একজন সিনেমা-বিশেষজ্ঞ আর তিনজন অধ্যাপককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি বিচার করবেন, এই বছরের সেতার বাজনার প্রতিযোগিতায় বাণীনিকেতনের স্বর্ণপদক কাকে উপহার দেওয়া হবে—যাকে মোট বিশজন প্রতিযোগিনীর মধ্যে সেতার বাজনায় শ্রেষ্ঠা বলে মনে হবে।

দেবেশবাবুর মেয়ে নমিতাও একজন প্রতিযোগিনী। তিনদিন অফিস কামাই করে অনেক দৌড়াদৌড়ি আর ধরাধরি করে তবে দেবেশবাবু এই প্রতিযোগিতায় নমিতার জন্য একটি স্থান যোগাড় করতে পেরেছেন। বাণীনিকেতনের সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধর্না দিয়েছেন দেবেশবাবু। কিন্তু দেবেশবাবুর অনুরোধ বার বার ব্যর্থ হয়েছে। আজেবাজে লোককে প্রতিযোগিতায় স্থান দেবার রীতি নেই। কোন বড় গুণী বা ওস্তাদের চিঠি চাই, কিংবা কোন গানের স্কুলের সার্টিফিকেট, নইলে শুধু দশ টাকা ফী দিলেই প্রতিযোগিতায় কাউকে নেওয়া হয় না।

পাড়ার বিজনবাবুকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে, তাঁরই কাছ থেকে চিঠি নিয়ে, এক বিখ্যাত সুরশিল্পীর কাছে গিয়েছেন দেবেশবাবু। বিখ্যাত সুরশিল্পী ভ্রূকুটি করেছিলেন, কিন্তু বিজনবাবুর মতো এতবড় একজন বড লোকেব চিঠির দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিলেন। সেতার হাতে নিয়ে বাজনার পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল নমিতা। কিন্তু সুরশিল্পী বললেন— ওসব থাক, বিজনবাবু যখন বলেছেন ভাল সেতাব বাজায়, তখন আব পবীক্ষা কবাব দবকার নেই।

সার্টিফিকেট যোগাড কবতে যে সংগ্রাম কবেছেন দেবেশবাবু, তাব চেয়ে বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে দশ টাকা যোগাড় কবার জন্য, প্রতিযোগিতায় ভর্তিব ফী পুবো দশটি টাকা।

সত্যিই ঐ দশটি টাকা যোগাড করতে গিয়ে দেবেশবাবুর ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এখানে ওখানে ধারেব জন্য হাত পেতেও ধার পাননি। মাসের আব দুটি সপ্তাহের রেশন আনবার মতো আর ইলেকট্রিকেব আলোব বিল শোধ কবার মতো টাকা শুধু আছে। কিন্তু রেশনটা তো আর বাদ দেওয়া যায় না পেটের দাবী কোন সেতারের সুরের ও মিষ্টি স্বরের কোন দাবীর ধার ধারে না। অগত্যা, এই মাসেব ইলেকট্রিক আলোর বিলটাকেই উপেক্ষা করলেন দেবেশবাবু। ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোক এসে তার কেটে দিয়ে গেল।

রেশন আনতে যার টাকার টান পডে, টাকাব অভাবে ঘরেব আলো বন্ধ হয়ে যায়, এ হেন মানুষের মনে ঐ এক সৌখীন স্বপ্ন এক মোহ হয়ে উঠেছে। অফিস থেকে ফিরে এক গেলাস চা খেয়ে নিয়ে কোলেব কাছে তবলা-বাঁয়া টেনে নিয়ে বসেন দেবেশবাবু। আর মেয়ে নমিতা একটা ময়লা স্বরলিপির বই সামনে রেখে হাতেব কাছে সেতার টেনে নিয়ে বসে। তবলাতে নানা তালের রকম আর কসরৎ ধ্বনিত করেন দেবেশবাবু। টুইলের ছেঁড়া কামিজের আস্তিন গুটিয়ে রোগা হাত দুটিকে নানা ভঙ্গীতে আর উৎসাহে খেলিয়ে খেলিয়ে তবলা বাজান দেবেশবাবু। মেয়ে নমিতা সেই মিষ্টি বোলের তাল ও মাত্রার প্রতিটি সূক্ষ্ম শিহরণের সঙ্গে তার সেতারের স্বর-ঝংকার লুটিয়ে দিতে থাকে। একটা ইমনকল্যাণ শেষ করতেই রাত দশটা বেজে যায়। দেবেশবাবু বলেন, আর আধঘন্টা মাত্র, আর একটু খেটে নে নমি, একটা বাগেশ্রী আলাপ কর দেখি।

এরই মধ্যে, মাত্র ছয় বছরের চেষ্টায় কী মিষ্টি হাত করে ফেলেছে মেয়েটা! দেবেশবাবু তাঁর ছেঁড়া টুইলের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে হাঁপাতে হাঁপাতেও হাসতে থাকেন। বেশ গর্ব করেই বলেন—মাত্র আর দুটি বছর খেটে যা নমি। তারপর দেখবি, অল ইণ্ডিয়া মিউজিকে

গিয়ে দাঁড়াতে তোকে একটুও ঘাবড়াতে হবে না।

তারপরেই যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন—সাধনা থাকলে সিদ্ধি হয় আর গুণ কখনো চাপা পড়ে থাকে না।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আর তেতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ দেবেশবাবুর বুকটা হঠাৎ একটা মিষ্টি শব্দ শুনে ছ্যাঁক করে ওঠে। সেতারে হাত দিয়েছে লেখা সান্যাল। বাজছে সেতার টু-টাং টুং-টাং, মিষ্টি শব্দের ছোট ছোট ফুল যেন ফুটে উঠেছে। বোধহয় একটা টোড়ি ধরেছে লেখা সান্যাল। দুই কান সজাগ করে আর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতে থাকেন দেবেশবাবু।

চমকে উঠলেন দেবেশবাবু। সেতারের শব্দ নয়, খিলখিল হাসির শব্দ। দেখলেন দেবেশবাবু, তেতলার বারান্দায় কার্পেটের উপর গড়াচ্ছে লেখা সান্যালের সেতার। আর লেখা সান্যাল তার দুরন্ত শিশু হাউণ্ডকে কোলে নেবার জন্যে ছুটোছুটি করছে, কিন্তু ধরতে পারছে না হাউণ্ডকে।

তবু দাঁড়িয়ে রইলেন দেবেশবাবু। তাঁর মনের ভয় আর কৌতূহল একেবারে মিটিয়ে নিয়ে আজ নিশ্চিন্ত হবেন দেবেশবাবু। সত্যিই কি টোড়িতে হাত তৈরি করে ফেলেছে লেখা সান্যাল। আশ্চর্য নয়। সপ্তাহে তিন দিন ওস্তাদ আসে, আর ঐ এত দামী সেতার, তার উপর মেয়েটিও খুব স্মার্ট! ঐ হাত একটি টোড়িতেই মাত করে দেবে বাণী-নিকেতনের কমিটির আসর। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

আবার সেতার হাতে তুলে নিয়েছে লেখা সান্যাল। বাজছে সেতার। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে হেসে ফেললেন দেবেশবাবু। নিতান্তই ছেলেমানুষী ব্যাপার। লেখা সান্যালের সেতার যেন একটা শখের পুতুল মাত্র! পলকা ও চটুল সুরে একটা থিয়েটারী ঢঙের গৎ বাজছে লেখা সান্যালের সেতারে। নিতান্তই ছেলেমানুষী কাণ্ড। সুর নিয়ে ছেলেখেলার ব্যাপার। দু'দশ জন গুণীর আসরে ঐ সস্তা গৎ-এর কোন সম্মান নেই।

লেখা সান্যালের সেই চটুল গৎ-ও হঠাৎ যেন মরে গেল। দেখলেন দেবেশবাবু, চাকরের হাতে ট্রে থেকে চা-এর কাপ তুলছে লেখা সান্যাল।

চায়ে চুমুক দিয়েই সেতারটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দেয় লেখা সান্যাল। আর, একটা রঙীন বই খুলে নিয়ে পড়তে থাকে।

হাসতে থাকেন, এবং একটু যেন কষ্টও হয় দেবেশবাবুর। বেচারা লেখা সান্যাল, এই সামান্য যোগ্যতা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে চায়! কিন্তু চেষ্টা করে শিখলেই তো পারতো। টাকা পয়সা আছে, সময় আছে, আর শখও যখন আছে, তখন সেতার নিয়ে এরকম একটা অবহেলার খেলা কেন?

মনে পড়ে দেবেশবাবুর; কাল সন্ধ্যাতেই বাণীনিকেতনের সেতার প্রতিযোগিতার সময় ঠিক করা হয়েছে। আজ মাঝরাত পর্যন্ত সেতার সাধবে নমি। কাল অফিস কামাই করতে হবে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা চেষ্টা করে নমি যদি একটা টোড়ি আর একটা মালকোষ রপ্ত করে নেয়, তবেই আর ভাবনা করার কিছু থাকে না। সেতারে লেখা সান্যালের কত সুখ্যাতিই না শুনেছিলেন দেবেশবাবু। কিন্তু নমির কাছাকাছি যেঁষবারও কোন যোগ্যতা আছে এই সব প্রতিযোগিনীর?

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন দেবেশবাবু।

বাণী-নিকেতনের সেতার প্রতিযোগিতার আসরে স্বরঝংকারের উৎসব জেগে ওঠে। বিচারক কমিটি চোখ বন্ধ করে শুধু দুই কানে কৌতূহল জাগ্রত করে শুনতে থাকেন এক এক জন প্রতিযোগিনীর সেতারের সুর ও স্বর, মীড় গমক আর মূর্ছনা। এক এক জনের জন্য মাত্র

আধ ঘণ্টা সময়। কাগজের উপর লেখা প্রতিযোগিনীদের নামের পাশে নম্বর দেন বিচারকেরা।

অত্যন্ত নিরপেক্ষ বিচারক কমিটি। মাথা দুলিয়ে, বা তারিফ করে, কিংবা সামান্য একটু বাহ্‌বা ধ্বনি করেও মনের আনন্দ প্রকাশ করে ফেলেন না বিচারকেরা। করলে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। একজন প্রতিযোগিনীকে উৎসাহিত করলে আর একজন প্রতিযোগিনী হতাশ হয়ে যেতে পারে। তাই অত্যন্ত সাবধান হয়েছেন বিচারক কমিটি। শুধু গুণ দেখেই গুণের বিচার করবেন তাঁরা।

টোড়ি বাজালো নমিতা। আসরে এক কোণে ছেঁড়া টুইলের আস্তিন দিয়ে মাঝে মাঝে আনন্দের আবেগে চোখের জল মোছেন দেবেশবাবু।

কি কাণ্ডই করছে নমিটার হাতের সেতার। তারগুলিকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিচ্ছে, একটুও ভুল হচ্ছে না।

নমিতার মা'ও এসেছেন। কেলটি মেয়ে বলে দিনে তিনবার ধমক দেন যে কালো মেয়েটাকে, সেই মেয়েটারই মুখটা কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। নমির শাড়ির আঁচলটা পিঠের কাছেই কত বড় একটা ছেঁড়া প্রকাশ করে দিয়ে ফরফর করে উড়ছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের সেতারের শব্দে যেন মনপ্রাণ বিভোর হয়ে আছে মেয়েটার। সন্ন্যাসিনীর মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটার চোখ দুটো। এত গুণও ছিল এই কেলটি মেয়েটার। নমিতার মা'র চোখ দুটো ঝকঝক করে হাসে।

দেখছেন দেবেশবাবু, মুগ্ধ হয়ে আর চোখ বন্ধ করে নমিতার টোড়ি শুনছেন বিচারক কমিটি। কোন সন্দেহ নেই, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে সবাই।

থামলো নমিতার টোড়ি। বিচারক কমিটি একবার তাকিয়ে দেখলেন নমিতাকে। কাগজের উপর নম্বর লিখলেন। দেবেশবাবুর চোখের সামনে একটা মধুর স্বপ্ন ঝক করে ভেসে ওঠে। কল্পনায় দেখতে থাকেন, নমিতার ছেঁড়া শাড়ির আঁচলের গায়ে একটি সোনার মেডেল ঝুলছে।

হঠাৎ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল আসরে। বাণী-নিকেতনের কর্মীরা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একটু বেশি পাওয়ারের একটা আলো এনে রাখা হলো বাজনার আসরে। তবলা-বাঁয়া বদল করা হলো, এল নতুন একজোড়া তবলা-বাঁয়া। মাইক্রোফোনের মিস্তিরিও একটু ব্যস্ত হয়ে মাইক্রোফোনকে নানাভাবে নাড়াচাড়া করে। সেসনজজ শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল বসলো সেতার হাতে নিয়ে। সান্যাল বাড়ির মোটর ড্রাইভার দেশী মহারাজার মতো যার সাজ-পোশাক, সে এসে দশটা ফুলের তোড়া আসরের উপর সাজিয়ে রেখে গেল।

তাকিয়ে রইলেন দেবেশবাবু। কি সুন্দর সাজ করেছে লেখা সান্যাল। নমিতার মা দেবেশবাবুর কানে কানে বললেন—উমা বলেছে, আজ দুপুর থেকেই সাজতে আরম্ভ করেছিল লেখা।

প্রতিযোগিতার আনন্দের উপর দিয়ে যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। বসে আছেন সেসনজজ শ্রীমোহন সান্যাল, কোলের উপর শিশু হাউন্ড। দাঁড়িয়ে আছে দেশী মহারাজার মতো পোশাকে সান্যাল বাড়ির ড্রাইভার। তার উপর, বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো বাতি, লেখা সান্যাল সেতার হাতে তুলে নিতেই লেখার হাতের চার আঙুলে চারটে হীরার আংটি ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো। তাকিয়ে রইলেন বিচারক কমিটি।

মাত করে দিল লেখা সান্যালের গৎ। লেখার সেতারের প্রতি ঝংকারের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে আর বাহ্‌বা দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন বিচারক কমিটি। বাণী-নিকেতনের কর্মীরা মুগ্ধ

হয়ে লেখা সান্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গৎ থামতেই করকাপাতের মতো করতালির শব্দে মুখর হয়ে ওঠে আসর।

উল্লাস জাগে। ধন্যবাদ শুভেচ্ছা ও প্রীতির উচ্ছ্বাস বর্ষিত হতে থাকে। পুরস্কার ঘোষণা করেন বিচারক কমিটি। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকেন আর পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকেন দেবেশবাবু।

সেতার বাজনায় শ্রেষ্ঠ হয়েছে লেখা সান্যাল। সোনার মেডেল ঝুলছে লেখা সান্যালের কাঁধের কাছে, রঙীন সিল্কের শাড়ির কুণ্ঠিত আঁচলের একটি স্তবকের উপর। পাথরের মতোই চোখ নিয়ে দেখতে থাকেন দেবেশবাবু।

যেন পৃথিবীর সব সেতারের তার ছিঁড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে আর সেই ভস্ম উড়ছে দেবেশবাবুর হৃৎপিণ্ডের ভিতরে। নমিতার মা ঠেলা দিয়ে বলেন—বাড়ি চলো।

নমিতা সেতার হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বলে—চলো বাবা।

দেবেশবাবু বলেন—চলো।

রাত হয়েছে। দেবেশবাবুর সৌখীন স্বপ্নকে বিদ্রূপ করে ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়েছিল ক'দিন আগেই। কিন্তু ঘরের এই অন্ধকারকেই বিদ্রূপ করে ঘরের বাইরে এক ফালি উঠানের এক কোণে এসে বসলেন দেবেশবাবু। হাতের কাছে রাখলেন তবলা আর বাঁয়া। নমিতা বসলো সেতার নিয়ে।

ছেঁড়া টুইলের আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে দেবেশবাবু যেন হুংকার দিলেন—ধর একটা পুরিয়া।

পাড়ার লোক শুনে আশ্চর্য হয়, হেরে গিয়ে আবার এত আনন্দের ঝংকার কেন ? মাঝরাত পর্যন্ত বাজনা নিয়ে মাতামাতি ?

হ্যাঁ সেই মাঝরাতের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত নমিতার সেতারের পুরিয়া দেবেশবাবুর তবলার বোলের সঙ্গে যেন এক স্নেহের উৎসবে লুটোপুটি করে পাড়ার নিস্তব্ধতাকে ঝংকারে ঝংকারে শিউরে দিতে থাকে। উমাদের বাড়ির চিলকোঠার পাশ দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখা যায়। যেন ভিন জগতের একটা উপহার, সোনার মেডেল হয়ে ফুটে উঠেছে অনেক রাতের চাঁদ।

দেবেশবাবুর দুই চোখ ঝকঝক করে—এইবার জলদে নিয়ে চল্ নমি।

বলিহারি ! মরি মরি ! বাহবা বাহবা ! দেবেশবাবুর মনের উল্লাস যেন নিজের আবেগেই মুখর হয়ে আর আত্মহারা হয়ে বাতাস শিউরে দিতে থাকে।

বিভোর হয়ে সেতার বাজাতে থাকে নমিতা।

—কিছুছু ভাবিস না নমি। নমিতার হাতের সেতারে যেন নতুন প্রাণের আশ্বাস ছড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন দেবেশবাবু। যেন এই মাঝরাতের আসরে নমিতার হাতে সেতারের গুণ বিচার করছেন সত্যিকারের এক বিচারক এবং সেই বিচারককে দেখতে পেয়েছেন দেবেশবাবু, নইলে তাঁর চোখে-মুখে এরকম উল্লাস জেগে উঠবে কেন ?

মিথ্যা মা

ঠাকুরপুরের রাজবাড়ি, অর্থাৎ সেই বিখ্যাত ঠাকুরপুর জমিদারীর তিনআনি শরিক অজিত রায়চৌধুরীর বাড়ি। রাজবাড়ি নামটা এখন প্রায় অচল হয়ে এসেছে। আর ক'দিন পরে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়েই যাবে। শুধু আশেপাশের দু'চার গ্রামের অতিবৃদ্ধ এবং চাষাভূষা মানুষ ছাড়া আজ আর কেউ ঐ বাড়িকে রাজবাড়ি বলে না।

সদর শহরের মধ্যে নয়, একটু দূরে, শহুরে জীবন এবং গেঁয়ো জীবনের মাঝামাঝি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তিনপুরুষ আগের এই রাজবাড়ি। সদরের আদালতে ওকালতি করেন অজিত রায়চৌধুরী। প্রবীণ উকীল অজিতবাবুর পশারও এতদিনে বেশ প্রবীণ হয়ে উঠেছে। রাজবাড়ি নামটা ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হয়ে উঠতেই উকীলবাড়ি নামটা বেশ প্রবল ও মুখর হয়ে উঠছিল, এবং এই নামটাই পাকা হয়ে যেত নিশ্চয়, কিন্তু হতে পারেনি। ঠাকুরপুরের ছেলেমেয়েদের ভাষায় নতুন একটা আখ্যা সবচেয়ে বেশি মুখর হয়ে পুরনো নামগুলিকে চাপা দিয়ে একেবারে নীরব করে দিয়েছে। ঐ নাম এখন জয়া মায়ের বাড়ি।

এই বাড়ির বড় ছেলে মানিক, অজিতবাবুর ছেলে নয়। মানিক হলো অজিতবাবুর স্ত্রী জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মানিকের মুখের ভাষাটাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। জয়া মাসীমাকে জয়া-মা বলে ডাকে মানিক। তাই ঠাকুরপুরের সব ছেলেমেয়ের কাছে, এবং সদরের কাছে এই বাড়ি জয়া-মায়ের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। কে না চেনে মানিককে? অতি ভাল ছাত্র এবং খেলতে পারেও কত ভাল, সেই মানিক তার যে জয়া-মায়ের বাড়িতে থাকে, সেই জয়া-মায়ের নামের গৌরবই আজ প্রাচীন রাজবাড়ি আর কিছুকালের উকীলবাড়ি নামের গৌরব ছাপিয়ে গিয়েছে।

জয়া-মায়ের নামে যে-সব গল্প আর সংবাদ আজ প্রায় বাইশ বছর ধরে ঠাকুরপুরে, আশপাশের গাঁয়ে, আর সদর শহরেরও মনে মনে স্মৃতি হয়ে রয়েছে, সেই সব গল্প আর সংবাদের গৌরবই জয়ী হয়েছে বলা যায়। সে এক আশ্চর্য মনের ইতিহাস। পরের ছেলেকে সত্যিই খাঁটি মায়ের-মন দিয়ে নিজেরই সন্তানের মতো আপন করে নিতে পেরেছে, এমনই এক নারী জীবনের আগ্রহের ইতিহাস।

এই বাড়িতে যেদিন বধূবেশে প্রথম এসেছিলেন জয়া দেবী, সেই দিনটি হলো আজ থেকে ত্রিশ বছরের বেশি অতীতের একটি দিন। শান্তি ছিল, আনন্দও ছিল, কিন্তু একটি শূন্যতাও যেন অদেখা স্বপ্নের মতো এই বাড়ির জীবনের সব চঞ্চলতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতো। আত্মীয়-স্বজনেরা চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, এবং অজিতবাবুও মাঝে মাঝে কি-যেন ভাবতেন। বছরের পর বছর পার হয়, তবু কোন শিশুর কলরব জাগে না কেন এই বাড়ির বাতাসে? চিঠি-পত্রে অনেক স্বজনের কাছ থেকে অনেক উপদেশ আসতো, জয়া একটা মানত করুক। নইলে এত বড় বাড়ির এই ফাঁকা ফাঁকা আর নেড়া-নেড়া ভাব ঘুচবে না। জয়ার কোল ভরে না উঠলে এই বাড়ির বুকের শূন্যতাও ভরে উঠবে না।

অজিতবাবু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতেন, কিন্তু জয়া হেসে ফেলতেন। মানত করতে হবে কেন? দরকারই বা কি? একেবারে স্পষ্ট করে এবং অদ্ভুত ও তীব্র আগ্রহের ছোঁয়ায় যেন ছটফট করে জয়া বলে ফেলতেন একটা কথা, আর শুনে চমকে উঠতেন

অজিতবাবু। জয়া বলতেন—যেখান থেকে পার একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে ফেলে দাও না আমার কাছে।

নীরব ও নিরুত্তর অজিতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে জয়া তেমনি অতি সহজে অবাধে আর স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বলতেন—কোন জ্বালা-যন্ত্রণার দুর্ভোগ ভুগতে হবে না, অথচ একটা ছেলে চলে এল কোলে। এই তো ভাল।

অজিতবাবু হাসেন—তা না হয় হলো, কিন্তু.. ।

—কিন্তু আবার কি ?

—তুমি কি সত্যিই মায়ের মন নিয়ে পরের ছেলেকে মানুষ করতে পারবে ?

— কেন পারবো না ?

—হয় না জয়া, তাতে পরের ছেলেকে শুধু মানুষ করা হয়, কিন্তু মায়ের আনন্দ পাওয়া যায় না।

জয়া বলেন—খুব হয়, খুব পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত জয়ারই এই অবাধ হাসির আগ্রহ সত্য হয়ে উঠলো, সে সত্য আজ এই বাড়ির জীবনের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখে মনে হয়, অজিতবাবু আর জয়াদেবী হলেন তিনটি ছেলের ও একটি মেয়ের বাপ ও মা।

বড় ছেলে মানিক হলো জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মেজ ছেলে তপেশ হলো জয়া দেবীর সেজ ভাসুরের ছেলে। একমাত্র মেয়ে মালতী হলো জয়া দেবীর ন'দার মেয়ে। আর সবচেয়ে ছোটটি, নিতু যার নাম, সে হলো আরও দূরসম্পর্ক এক আত্মীয়ের সংসারের এক মা-মরা ছেলে। নিতুর ভাষা অনুসারে মানিক হলো বড়দা, তপেশ মেজদা এবং মালতী হলো দিদি। বাড়ির ঝি-চাকরের কাছে অজিতবাবু আর জয়া হলেন বাবা আর মা, এবং মানিক, তপেশ, মালতী আর নিতু হলো, বড় খোকাবাবু, মেজ খোকাবাবু, দিদিমণি আর ছোট খোকাবাবু। এই পৃথিবীর নানা আঙিনা থেকে যেন এক একটি জ্যোৎস্না ছায়া আর শিশিরের কণা কুড়িয়ে নিয়ে এসে আপন সংসারের এক মায়াভরা আঙিনা তৈরি করে নিয়েছেন জয়া দেবী। আপন-পর সম্পর্কের নানা বিচিত্র আখ্যাগুলিও যেন এইখানে এসে এক নারীর স্নেহের কাছে সব ভিন্নতা হারিয়ে এক হয়ে গিয়েছে। জয়া হয়েছেন জয়া-মা। এই বাড়ির তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ের কাছে এই জয়া-মা নামটিই মানুষের ভাষার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি আর মায়াময় নাম। মানিক জানে, তপেশ জানে, মালতীও জানে যে, শুধুই মা নামে ওদের কেউ একজন আছেন, দূরেই আছেন, এবং চিরকাল দূরেই থাকবেন। তাঁরা আসেন মাঝে মাঝে, তাঁদের দেখতেও পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। জয়া-মার চেয়ে এরা বেশি আপন-জন নয়, হতেই পারে না। তপেশের আপন মা একবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, পূজার সময় তপেশকে ক'দিনের জন্য নিয়ে যেতে। তপেশই গোঁ ধরে বসে রইল। পরের বাড়ি গিয়ে থাকতে ওর একটুও ইচ্ছে করে না।

মা না হয়েও এত বড় মায়ের-মনের গৌরব লাভ করেছে, এমন ব্যাপার কোথাও দেখা যায় না। প্রতিবেশীরা তাই বলে থাকেন। জয়ার নাম করতে বেশ একটু শ্রদ্ধাই অনুভব করেন ঠাকুরপুরের অনেক সত্যিকারের মা।

এপাড়া আর ওপাড়া, অনেক বাড়িতেই অনেক সময় আলোচনা হয়। বিনোদের মা বলেন—এর মধ্যে একটা কথা আছে, যা তোমরা কখনো ভেবে দেখনি।

সুধার মা বলেন—কি ?

—আগের জন্মে জয়া সত্যিই ওদের মা ছিল, নইলে পরের ছেলের জন্য এতটা কেউ করতে পারে না। মায়ের-মন কি এমনিতেই হয় ভাই!

এই সব আলোচনার কিছু কিছু কলরব মাঝে মাঝে জয়া দেবীর কানেও আসে। শুনে জয়া দেবীর মনের ভিতরটাও যেন কেমন করে ওঠে। অদ্ভুত এক বিশ্বাসের বিস্ময় যেন বুকের ভিতর তৃপ্তি ছড়াতে থাকে। সত্যিই কি মানিকটা, তপেশটা, মালতীটা আর নিতুটা আগের জন্মে তাঁরই কোলে প্রথম দেখা দিয়েছিল ? তাই নিশ্চয়! হয়ত সেই আগের জন্মে ওদের পুরো আদর করতে পারেনি জয়া দেবী। তাই অদৃষ্ট আজ এই জন্মে ওদের আবার জয়া দেবীর কাছে এনে ফেলেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবেন জয়া দেবী, সত্যিই তো বড়দি আজ ছ'মাসের মধ্যেও চিঠি দিয়ে একবাব খোঁজ নিলেন না কেমন আছে মানিকটা। ও তো বড়দিরই আপন ছেলে।

যাক্ গিয়ে, ওসব প্রশ্ন এখন আর জয়া দেবীর চিন্তারই প্রশ্ন নয়। দুপুরের রোদে ঝলসানো আঙিনার দিকে তাকিয়ে, বাড়ির ভিতরের বারান্দায় পাতা মাদুরেব উপবে বসে জয়া দেবী চশমা-চোখে পড়ছিলেন কতগুলি চিঠি। মানিকের বিয়ের জন্য পাত্রীর পরিচয় নিয়ে এসেছে অনেকগুলি চিঠি। বড় ছেলের বিয়ে, এই বাড়ির বঁউ হয়ে আসবে যে মেয়ে, সে মেয়ে যেমন-তেমন হলে চলবে না। বড়দি একটি পাত্রীর খোঁজ জানিয়েছেন। চিঠি পড়ে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন জয়া দেবী। নিতান্তই বাজে একটা সম্বন্ধ। বড়দি কি বুঝবেন ছাই, মানিকের সঙ্গে কেমন মেয়েকে মানাবে ভাল ? বড়দি শুধু নামেই মা।

—মা, ওগো মা।

অদ্ভুত একটা ডাক। বাড়ির বাইরের বারান্দার দিক থেকে ভেসে আসছে এই আহ্বানেব স্বর। ভিখিরীর গলার স্বর তো এরকম নয়। যেন অনেকদিন পরে দূর থেকে ঘরে এসে ব্যস্তভাবে কেউ তার মাকে ডাকছে—মা, ওগো মা!

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জয়া দেবী। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়ালেন। দেখে আশ্চর্য হলেন। সত্যিই ভিক্ষুক-টিক্ষুক নয়—বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, মানিকের চেয়ে কিছু বড়, রোগা চেহারার একটা লোক বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নোংরা একটা গেঞ্জি গায়ে, ছেঁড়া জুতো, একটা খাটো বহরের কোরা ধুতি। অসুখে ভোগা চেহারা নয়, মনে হয় উপোসী চেহারা। লোকটার চোখ দুটো বেশ ডাগর, নাকটাও বেশ টিকালো। রুক্ষ-সুক্ষ চুলে লম্বা একটি তেড়ি এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

জয়া বলেন—কে গো তুমি ?

লোকটা বলে—আমি তোমাকে এতদিনে চিনতে পেরেছি মা, কিন্তু তুমি আমাকে দেখেও চিনতে পারছো না।

লোকটার দুই চোখ ছলছল করে উঠলো। জয়া বলেন—কি চাও বলো ?

লোকটা হাঁউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে—আপন মা'র কাছে মানুষ যা চায়, তাই চাই, আর কিছু চাই না।

জয়া—তার মানে ?

লোকটা বলে—স্নেহ চাই মা।

অস্বস্তি বোধ করেন জয়া দেবী—তুমি কে ?

—নদীর ওপারে পলাশপুরের করুণা কালীর কাছে পনের দিন ধরনা দিয়েছিলুম মা। এক ফোঁটা জলও মুখে দিইনি, পনেরটি দিন আর পনেরটি রাত্রি করুণা কালীর পায়ের কাছে পড়েছিলুম। শেষে স্বপ্নে দেখা দিলেন করুণা কালী আর বললেন...। লোকটা হঠাৎ চুপ করে গেল।

জয়া দেবী—চুপ করলে কেন ? বল।

—করুণা কালী বললেন, যা তোর আগের জন্মের মায়ের কাছে যা, তোর সব দুঃখু ঘুচে যাবে।

লোকটা কয়েকটা সিঁড়ি উপরে উঠে এসে বলে—করুণা কালী বললেন, ঠাকুরপুরের বাজবাড়ির মা হলেন তোর আগের জন্মের মা। তাই ত ছুটে এলেম মা, মাগো।

চেঁচিয়ে ছটফট করে জয়া দেবীকে প্রণাম করার জন্য সিঁড়ি ধরে উপরের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে লোকটা।

জয়া বলেন—থাম, বসো। ওসব কথা আমি বিশ্বাস করি না।

লোকটা ধপ্ করে বসে পড়ে। বিশ্বাস করতেই হবে মা।

জয়া দেবী হেসে বলেন—বিশ্বাস করি আর নাই করি, তুমি কি চাও বলো।

লোকটা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে এবং অভিমানের স্বরে বলে ওঠে—কিছু চাই না।

চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন জয়া দেবী। এত কাঁদে কেন লোকটা ? কেন এত অভিমান ? পনেরটা দিন কিছু খায়নি। মাথা খাবাপ হয়েছে বোধহয় ; তবু ত মানুষ। ভুল স্বপ্ন দেখে আবোলতাবোল বকছে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, একটা মিথ্যে স্বপ্নের জন্য কত কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা।

জয়া দেবী বলেন—কিছু খাবে ?

—হ্যাঁ।

থালায় ভবে মিষ্টি আনেন জয়া দেবী। মিষ্টিগুলি খেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে জল খায় লোকটা। হঠাৎ বলে—এবার যাই মা।

জয়া বলেন—বসো।

একটা নতুন ধুতি, মানিকের জন্য কেনা, এক জোড়া নতুন চটি আর একটা সিল্কের কামিজ নিয়ে আসেন জয়া। লোকটা ব্যস্তভাবে নতুন সাজ গায়ে চড়িয়ে আবার চুপ করে অন্যমনা হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু চলে যায় না লোকটা। এবং আরও অদ্ভুত, জয়া দেবীও লোকটাকে চলে যাবার জন্য বলতে পারে না। হয়ত পাগল, হয়ত একটা স্বপ্ন দেখেছে ছেলেটা, কিন্তু সেই স্বপ্নটাকে মিথ্যে মনে করবার কি আছে ? আগের জন্মে একটা মায়ের কোলেই তো এসেছিল ছেলেটা, সে মা পৃথিবীতে এখন থাকতেও তো পারে।

জয়া বলেন—আজ যাও তুমি।

উদাসভাবে বলে লোকটা—যদি কয়েকটা টাকা দাও মা।

—কেন ?

—কেন আবার কি ? আমি তোমার ছেলে, টাকা চাইছি তোমার কাছে, দিতে হবে—রাগ করে চেঁচিয়ে আবার কেঁদে ফেলে লোকটা।

জয়া দেবী আর দেরী করেন না। তার মনের ভিতরটা যেন একটা মূর্খ বিশ্বাসের বেদনায় ফুঁপিয়ে উঠছে। এক্ষুনি বিদায় করে দেওয়া ভাল। দশ টাকা লোকটার হাতে তুলে দিয়ে জয়া বলেন—এবার যাও, আর বিরক্ত করো না।

লোকটা প্রসন্নভাবে অথচ তেমনি করুণ ও ছলছল চোখ নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। বোধহয় আগের জন্মের মাকে প্রণাম করতে চায়।

হঠাৎ একটা কঠোর গর্জনের আঘাতে চমকে ওঠে দুপুরের নীরবতা। ফটক পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দননগরের ধীরেন ঠাকুরপো—এ বেটা, এ বেটা এখানে কেন, অ্যাঁ?

তার পরেই এসে দাঁড়ায় শ্রীরামপুরের প্রতুল—এ কি, এ বেটা এখানে কি চাইছে বড়দি?

জয়া বলেন—ওকে চেনো নাকি তোমরা?

প্রতুল বলে—চিনি বইকি, এটা একটা মহাপুরুষ।

জয়া দেবীর গলার স্বর ভয়ে কেঁপে ওঠে—তার মানে?

ধীরেন ঠাকুরপো বলেন—মিথ্যে দুঃখের কথা বলে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই ওর কাজ।

প্রতুল বলে—আজ তিন বছর দেখছি, ট্রেনে ট্রেনে ঘোরে, আর লোকের কাছ থেকে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চায়।

ধীরেন ঠাকুরপো বলেন—সেদিনও আমাদের অফিসে গিয়েছিল, রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।

লোকটা নির্বিকার। কোন ভয় বা উদ্বেগের ছায়ামাত্র নেই লোকটার চক্ষে।

ধীরেনবাবু বলেন—নিশ্চয়ই ওকে এই জুতো জামা আর কাপড় আপনি দিয়েছেন বৌদি?

প্রতুল বলে—নিশ্চয় কিছু টাকাও আপনার কাছ থেকে আদায় করেছে?

জয়া দেবী বলেন—হ্যাঁ।

লোকটার ঘাড়ে হাত দেয় প্রতুল—বের কর টাকা! ফেরত দাও!

লোকটা বলে—কেন দেব? আমার আগের জন্মের মা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা সে টাকা কেড়ে নেবার কে মশাই?

ধীরেনবাবু লোকটাকে একটা ধাক্কা দেন—ছাড়, নতুন কাপড়-চোপড় জুতো সব ছাড়!

ধাক্কার চোটে লোকটার পা থেকে নতুন চটি খসে যায়। ধীরেনবাবু এক টান দিয়ে সিল্কের কামিজটাকে লোকটার গা থেকে খুলে নিলেন।

চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা—মা, ওগো মা, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো মা? এদের মানা কর মা!

জয়া দেবী নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু তাঁর দু'চোখের একটা অর্থহীন চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকেন। প্রতুল লোকটার হাত ধরে টান দেয়। লোকটার শক্ত মুঠো কঠোর এক পেষণে চূর্ণ করে দিয়ে টাকা কেড়ে নেয় প্রতুল। ধীরেনবাবু আবার একটা ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফটকের দিকে টেনে নিয়ে চলেন।

লোকটা চিৎকার করে—মা, ওগো মা, এরা যে আমার সব ছিনিয়ে নিল মা। তুমি ওদের মানা কর মা।

জয়া দেবীর মনের ভিতরে যেন একটা বোবা বিস্ময় দুঃসহ বেদনায় ছটফট করছে। কোন কথা বলতে পারছেন না জয়া দেবী। মিথ্যাবাদী একটা লোক ধরা পড়ে গিয়েছে আব জব্দ হয়েছে, জয়া দেবী বাধা দেবেন কেন ?

ফটকের কাছে লোকটাকে ঠেলে নিয়ে এলেন ধীবেনবাবু। এইবার ধীরেনবাবুর হাতের আব একটি ধাক্কায় অদৃশ্য হয়ে যাবে জয়া দেবীর দুই চক্ষুব সম্মুখ থেকে এক মিথ্যা আগের জন্মের ছেলে।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে জয়া দেবীর দিকে হতাশভাবে তাকায়—তুমি আমার আগের জন্মের মা, কিন্তু তুমি মা হয়েও কি করেছিলে জান ? করুণা কালী স্বপ্নে আমাকে কি বলেছেন, শুনবে ?

লোকটার ছলছল চোখ দুটো হঠাৎ কটমট করে ওঠে। ধীরেনবাবু ও প্রতুল হঠাৎ হাত নামিয়ে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। জয়া দেবী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চায় লোকটা ?

লোকটা বলে—তুমি মা হয়েও নিজের হাতে আমার মুখে বিষ দিয়ে আমাকে মেরে ফেলেছিলে।

লোকটাকে কঠোর একটা ঠেলা দিয়ে ফটকের বার করে দেন ধীরেনবাবু। প্রতুল হাত তুলে তাড়া করে যায় আরও কয়েক ঘা দেবার জন্য।

বাধা দিয়ে জয়া দেবীই আর্তনাদ করেন—আব মেরো না ধীরেন ঠাকুরপো, চলে এস প্রতুল। যেতে দাও ওকে।

জয়াদেবীর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, তাই দেখতে পান না, লোকটা চলে গিয়েছে কি না। জয়া-মাকে মিথ্যা-মা বলে রটাতে চায়, কি ভয়ানক মিথ্যেবাদী ঐ ছোঁড়া ! কিন্তু জয়া দেবীর বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে। মিথ্যে একটা গল্প, কিন্তু কি ভয়ানক সত্যের মতো একটা মিথ্যা !

বৈর নির্যাতন

তখন চুংকিংয়ের তাঁতিরা নিশ্চিন্তমনে রেশমী চাদর বুনছে। মাদ্রিদের অপেরা ঘরে বেহালার সুরের খেলা নিরুদ্বিগ্ন নাগরিকের দিনের ছুটি মধুর করে তুলেছে। আকাশে উঠে মাটির মানুষের মাথায় বোমা ফাটাবার খেলাটা তখনো পৃথিবীতে এত ভালভাবে জমে ওঠেনি। নরহত্যার শিল্পে এই নতুন পদ্ধতিতে হাত-পাকাবার কাজটা মাত্র তখন চলেছে, যে দেশের কাঁচা মাথার ওপর, যেখানে এবং যে সময়ে—সেই সময় !

সেই সময়, বেস কম্যান্ডারকে স্যালুট জানিয়ে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ফ্লাইং কোরের একটি স্কোয়াড্রন উড়লো আকাশে। নীচে ভোরের পেশোয়ার কুয়াশার বোরখায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রইলো চুপ করে। এই শ্বেতাঙ্গ বিমানবিহারীদের মধ্যে মাত্র একটি কৃষ্ণের জীব রয়েছে—অফিসার দিলীপ দত্ত।

ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে আজাদ এলাকা। সভ্য শাসনের শান্তিকে অপমান করবার স্পর্ধায় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে কতগুলি রাষ্ট্রহীন যূথচারী মানুষ। তাদের দুর্বৃত্তি সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। খাড়া পাহাড়, সরু নালা আর চোরা পথের গোলকধাঁধার মতো

এই দেশ। কাদার কেল্লার গর্বেই লোকগুলি আত্মহারা। চুক্তির সম্মান জানে না, সরহদ্ মানে না, মজুরী নিয়ে খাটতে জানে না। বন্দুক বগলে, কার্তুজ দাঁতে কামড়ে—পাহাড়ের মাথায় পাথরের মতো নিঃশব্দে মিশে থাকে। ক্রোশের পর ক্রোশ ছাড়িয়ে ওদের চোখের দৃষ্টি যেন ইংরিজি সড়কের ধূলা শুঁকতে থাকে। সড়ক দিয়ে একটা সদাগরের কাফিলা পার হয়। আচম্বিতে নেকড়ের দলের মতো হানা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে।

ডেরা ইয়াসিনের নাম-করা মহাজন তিলক সাহু আজও বুক চাপ্‌ড়ে বেড়ান। বিয়ের আসর থেকেই তাঁর ছেলে আর ছেলের বউকে ধরে নিয়ে গেছে। তিলক সাহু আপসোস করেন—ছেলের কানে এক জোড়া হীরের মাক্‌ড়ি ছিল। সেটাই ভুল হয়েছে, নইলে রক্ষা পেত ছেলেটা। আর মেয়েটা—সেসব মেয়ের বাবা রাজারামের ভাবনা। সে ইচ্ছে করলেই মেয়েকে ছাড়িয়ে আনতে পারে, ওর টাকার ভাবনা নেই।

ছেলের মায়ের কান্নাকাটি আর চীৎকারেই তিলক সাহু ব্যতিব্যস্ত। জীবনব্যাপী মহাজনী সাধনার যা-কিছু সিদ্ধি এইবার শেষ হতে বসেছে। সত্তর তোলা সোনা নিয়ে এক মুন্সীকে পাঠিয়েছেন আজ সাতদিন হলো। কে জানে কোন্ এক খেলের মালিকের খোঁয়াড়ে ছেলেটা পড়ে আছে। ছাড়িয়ে আনতে হবে। মুন্সী ফিরলে হয়। ভয় হয়—ছেলেটা তো গেছেই, এবার সোনাটাও যাবে, মুন্সীও বোধহয় আর ফিরলো না।

রাজমাক রোডের সব কালভার্টগুলি ভেঙ্গে দিয়েছে। রোডের ধারে পর পর তিনটে খসাদারকে মেরে ফেলেছে। কারা করেছে, বুঝতে দেরী হয় না।

এ সবই সহ্য করা যায়। সুসভ্য চিকাগো কত আল কাপোনকে সহ্য করে। সাম্রাজ্যওয়ালা ইংরাজের স্নেহাধীন কলকাতা কত মীনা পেশোয়ারীকে সহ্য করেছে। তার জন্য আকাশে এক ঝাঁক বম্বোদর বিমান ছাড়তে হয়নি। কিন্তু আজাদী বদমাসদের নতুন একটা অপরাধের খবর পাওয়া গেছে, কোনমতে তার আর ক্ষমা হতে পারে না। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে তিনশো মালিক আর মেহ্‌তরের এক জীর্গা হয়ে গেছে। চেনারের ছায়ায় বসে আইন তৈরি করেছে তারা, পীরগলের চূড়ার ছবি আঁকা সোনার মোহর চালু করেছে। নতুন একটি বসিয়েছে কুনার নালার ধারে। দর-বাঁধা পণ্যের লেনদেন হয়। মেহ্‌মন্দেরা বস্তা বস্তা বাদাম আনে, ইয়ুসুফজাইরা নিয়ে আসে পশম। বিবাদে বিচার করার জন্য এক প্রবীণ মুল্লা কাজীর আসনে বসেছেন—জির্গার প্রস্তাবই তাঁর কাছে হাদিস।

মারামারি ভুলে নতুন করে এক মিতালীর আনন্দে এক লক্ষ ডানপিটে যেন এক রাজ্য গড়ার খেলাপাতি খেলছে। ছোট্ট একটি রাষ্ট্রের পুতুল গড়েছে তারা। এই নতুন বিধান নতুন অহঙ্কারের পতাকার মতো তাদের মনে মনে উড়তে থাকে। জির্গার বৈঠক শেষ হয়—শত শত উদ্ধত শির নেমাজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভরসা ও আশ্বাসে নত হয়ে আসে।

তাই মৃত্যুগর্ভ শাস্তির মেঘ উড়ছে আকাশে। এক দানবের সংসার ছিন্নভিন্ন করতে চলেছে। ভাস্কো-ডা-গামার নখায়ুধ প্রেতাত্মা যেন এক নতুন ভারতের রক্তের গন্ধ পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে।

বায়ুসমুদ্রে ডানা ঝাপটে দিলীপ দত্তের মন সুখে উড়ে চলেছে। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে হুক বেঁধে এক ধূমকেতুর পরিবার যেন সীমাহীন নীলে পাড়ি দিয়ে চলেছে। নীচের দিকে তাকালে তখনো দেখা যায় দু'একটা মিনারের গায়ে হিমকাতর প্রভাতের একটু আড়ষ্ট আলোকের প্রলেপ লেগেছে মাত্র। তারপর যব আর জাফরানের ক্ষেত—কতগুলি মখমলের জাজিম যেন এখানে ওখানে পাতা রয়েছে। স্বাত উপত্যকার গিরিনদীটা রূপালী ফিতার মতো একবার চক্‌চক্ করেই মিলিয়ে গেল।

এমনি করে হেসে বিদায় নিয়েছিল ডোরা। প্ল্যাটফর্মের শত শত মুখের ভীড়ের মধ্যে সেই স্মিতমুখের ছবি ভোলা যায় না। ডোরা কাঁদেনি, মুখভার করেনি। কোন উদ্বেগ কোন অভিমানবাণী মুখ ফুটে বার হয়নি। শুধু ট্রেন ছাড়বার আগে হেসে হেসে এক মুঠো প্রীতির কণিকা দিলীপের যাত্রাপথে মাঙ্গলিকের মতো ছিটিয়ে দিয়েছিল। ডোরার বাবা মিস্টার নন্দীও সঙ্গে এসেছিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে সমাদরে বিদায় দিয়েছেন।—যাও, বড় হও, সুনাম কর, জীবনের সব ব্রত সফল কর। বাঙালীর মর্যাদা বাড়িয়ে তোল। তারপর সুস্থদেহে আমাদের কাছে আবার ফিরে এস দিলীপ।

দিলীপ ভাবছিল—ডোরা যখন পরের ডাকে তার চিঠি পাবে, বিবরণ পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

দিলীপ দত্তের ভাবনায় পুলকের বিদ্যুৎ শিউরে ওঠে। তার কারণ আছে। চিরকালের সাহসী ছেলে দিলীপ। তার গায়ের জোরের খ্যাতি সুজাবাগের মৌমাছিটিও জানে। হারু ফটোগ্রাফারের দোকানে শো-কেসের ভেতর দিলীপের একখানি ফটো যেন পৌরুষ ও রূপের নমুনা হয়ে এখনো সুজাবাগের বুকে মেডেল হয়ে ঝুলছে। তাইতো ডোরা নন্দীর মতো মেয়ে—আজ নয়, দিলীপ যখন সেন্ট ডেনিসে পড়তো, তখন থেকেই . ।

বিলিতি ছাত্র। চালিয়াতির সব কায়দাগুলি বেশ দুরস্ত ছিল দিলীপের। সার্জের স্যুট ছাড়া ক্লাসে আসতো না। কোটের বুকের ওপর আল্মামেটারের ইনসিগ্নিয়া হলদে সুতোয় আঁকা থাকতো। কলেজ ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে হুড্রু ঝর্ণাতে যখন পিকনিক জমে উঠতো, পথে যেতে মোটর লরীর ছাদে বসে জ্যাক উড়িয়ে সবচেয়ে বেশী গলা ফাটিয়ে হুর্‌রা দিত দিলীপ। নন্দী সাহেবের বাংলোর বারান্দায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতো ডোরা। দিলীপের সব চপলতা ধন্য হয়ে যেত। মিষ্টি মিষ্টি হাসতো ডোরা, তাকিয়ে থাকতো ঘাড় হেলিয়ে।

হঠাৎ শোনা গেল, ডোবা নন্দীর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। মোমের মতো সাদা ও সিড়িঙ্গে সেই পাঞ্জাবী প্রফেসর আর্থার সিংহের সঙ্গে। দিলীপের বিহ্বল যৌবনের অভ্যর্থনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক চারুমুখী অ্যাফ্রোদিতে যেন হঠাৎ অকারণে মুখ ভেংচে দিল। সাহেবিয়ানার পালেস্তারার নীচে চিড় খেয়ে ফেটে উঠলো একটি মেটে-মলিন বাঙালী-অভিমান।

সেইদিন প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পড়ে ক্লাসে দেখা দিল দিলীপ। সেইদিন সেন্ট ডেনিস নতুন চোখে দেখলো দিলীপকে। দিলীপও সেন্ট ডেনিস-এর এক নতুন রূপ দেখলো।

সংস্কৃতের অধ্যাপক মিস্টার শর্মা অর্থাৎ পণ্ডিতজী দিলীপকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন।—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তুম্হারা হৃদয় গগনমে বিবেককা সূর্য চমক্ উঠা হ্যায়। সম্‌ঝা ?

মৌলবীসাহেব দিলীপকে দেখেই খুশিতে থমকে দাঁড়ালেন।—বাহবা বাহবা। কেয়া বাৎ হ্যায়—জওয়ান-ই-বঙ্গাল।

ফার্স্ট ইয়ারের কয়েকটি ছেলে কমনরুমে দিলীপকে ঘিরে দাঁড়ালো—ধুতি-পাঞ্জাবিতে আপনাকে কী সুন্দর মানিয়েছে দিলীপদা !

দিলীপদা ! এই সামান্য একটি সম্বোধনের আবেদন দিলীপকে যেন প্রীতিভরে গলা জড়িয়ে ধরলো।

যে রমেশ খদ্দেরের উড়ুনি গায়ে খালি-পায়ে কলেজ আসতো, কোনদিনও দিলীপের দিকে অবহেলাভরেও চোখ তুলে তাকাতো না, সেই রমেশ দিলীপকে নেমন্তন্ন করে বাড়ি নিয়ে গেল। রমেশের মা এসে দিলীপের কুশল-পরিচয় নিলেন। রমেশের বোন শোভা খাবার এনে দিল। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পড়ে, আলোচনা করে রমেশ, দিলীপ ও শোভার একটি সুন্দর সন্ধে কেটে গেল।

তোচিখেল পার হয়ে গেল। উদগ্রীব পাথুরে কেল্লাটা যেন নিঃশব্দে চুপিচুপি দেখলো, ব্যোমচর গ্রহের মতো কষ্ট বিমানবহুব গোঁ গোঁ কবে উড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, উঁচু উঁচু পাহাড়ের সর্পিল বিস্তার—একটা কবচাবৃত সরীসৃপ যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সূর্য ওপরে উঠছে। পূর্বদিক থেকে একটা আলোব ঝালর হেলে পড়েছে মাটিব দেশেব কুহকেব ওপর। সবই ছলনা বলে মনে হয়। নীচে হাজার মিটারের ব্যবধানে মহীতল যেন মিথ্যে হয়ে গেছে।

আজ তেমনি মিথ্যে হয়ে গেছে শোভা।

ডানাভবা নতুন পরাগের আবেশে প্রজাপতি যেমন খানিক ওড়ে, খানিক বসে—কাছে আসে না, দূরেও সরে যায় না, শোভার ব্যবহার ছিল সেই রকম। সেই যে'দিন প্রথম দেখা, সেদিন থেকে। কথা বলে যায় ঠিকই, কিন্তু উত্তরটা শোনে কিনা বোঝা যায় না। দুটো কথা বলেই হয়তো দেরাজের দিকে এগিয়ে এল , চোখে পড়লো আয়নাটা, তখুনি সবে গিয়ে ঘরের কোণের দিকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। দিলীপেব বাড়িতে বেড়াতে আসতো শোভা, ড্রইং রুমের নিভৃতে গল্পের ভেতব দিয়ে কত দুপুব সন্ধে হযে যেত।

দিলীপ কতবার অনুযোগ করতো—একটু সুস্থির হয়ে বসো শোভা। এ রকম ছটফট কর কেন ?

শোভা—ভয় করে।

—কেন ? যদি ধরে ফেলি, তাই কি ?

—না, যদি ধবা পড়ে যাই।

সেদিন এই দূবে-সরে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, হৃদয়ের দিক দিয়ে এত সান্নিধ্য ছিল বলেই। শোভার ভালবাসাব হাওয়া দিলীপেব মনের গায়ে গিয়ে লেগেছে। দিলীপের সাজপোষাকের রেশমী বাহার কবে যে সাদা খদ্দবে এসে শুচিতা লাভ করেছে তা সে নিজেই ঠিক বলতে পারে না। দিলীপ একেবারে বদলে গেছে। কার্তিক পূর্ণিমার দিন ধীরাজের বাড়ির সবাইয়ের সঙ্গে শোভাও গিয়েছিল মধুবনেব মেলা দেখতে। মাত্র একটি বেলার জন্য দশ মাইল দূরে একটু ঘুরে আসা। কিন্তু যাবাব আগে দিলীপের মুখভার শোভাব মেলা দেখার আনন্দটুকু মাটি করে দিল। শোভার মনে হলো—ভালবাসাব রীতিই বুঝি এই রকম। একটু মাত্রা ছাড়া, একটু অভিমান-ভীরু।

তাই যদি না হয়, তবে দিলীপ এত বদলে যায় কি করে ?

মামুদদের একটা গ্রাম। দূরবীনটা একবার চোখে লাগালো দিলীপ। অনেক দূরে একটা চাপ্টা পাহাড়ের মাথায় হাজার খানেক লোক হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে আছে। পাশে এক একটি লম্বানল রাইফেল শোয়ানো আছে। আজ জুম্মার দিন। সকালবেলার নেমাজ সারছে একটা লস্করের দল। স্কোয়াড্রন উল্কার মতো ঝাঁপ দেবার আবেগে স্পীড বাড়িযে দিল। চোখের পলক ফেবাতেই দেখা গেল—ত্রস্ত চতুর হরিণের পালের মতো তরতব্ কবে নেমে লস্করের দল লুকিয়ে পড়লো একটা সুগভীর পাহাড়ী খাদের ভেতর।

প্রতিবছর রামনবমীর মিছিলের দিনে কসাইপাড়ার মসজিদের কাছে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতো। জের চলতো চারদিন ধবে। সাঁজবাতির অর্ডার আর মিলিটারী পাহারা তুচ্ছ করে সুজাবাগের অলি-গলিতে অন্ধকারের মধ্যে ছুরির উৎসব চলতো।

গত বছর দাঙ্গার সময় দিলীপ খুব নাম কিনেছিল। চকের ওপর যে ভয়ানক দাঙ্গাটা হয়েছিল, তাতে হিন্দুপক্ষের নেতা ছিল দিলীপ। বড় হিংস্র আর বেপরোয়া দিলীপের হাতের

লাঠির মার। বাছবিচার নেই। চেনামুখ, অচেনামুখ, বুড়ো হোক্, জোয়ান হোক্, রোগা হোক বা মোটা—একবার সামনে পড়লেই হলো। শিক্ষিত ডেনিসিয়ানের রুচির মুখোশ যেন কিছুক্ষণের জন্য খুলে পড়ে যেত। শুধু খুলি ফাটাবার নেশায় পাগল হয়ে যেন বারভূঁয়ে বাংলার একটা লেঠেল সর্দার লাফঝাঁপ দিয়ে বেড়াত।

মিলিটারী এসে গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, প্রতিবেশীর হিংসার চেয়ে বীভৎসতর বুঝি আব কিছু হয় না। তাই সারারাত্রি গলিতে গলিতে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি কোপাকুপি চলে। পথের উপর বোবা ভিখারী, বাধ পাগল আর ছোট্ট ছেলের লাশ পড়ে থাকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সুজাবাগ শহরের হিন্দু-মুসলমানের মতো চিরকালের ভীরু মেনিমুখো প্রাণগুলি হঠাৎ খুনী তাতাবের মতো হত্যার প্রেরণায় এত উতলা হয়ে উঠলো কি করে? এই চকেব উপরেই গত মাসে এক মাতাল সাহেবের মোটর ইশাকের ছেলেটাকে চাপা দিয়ে মেরেছিল। এক হাজার হিন্দু-মুসলমানেব ভীড় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা হজম করেছিল। সাহেবটাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতেও কেউ এগিয়ে যাযনি। শুধু এক হাজার পদদলিত ব্যাঙের ফুসফুস যেন মোটর ঘিরে দাঁড়িয়ে সুনীচ সৌজন্যে ফিসফাস্ করে আপসোস করছিল। এখনও একটা কাবুলিওয়ালা একা ছুতোরপাড়ায় ঢুকে পেটে লাঠি খুঁচিয়ে সুদ আদায় করে আনে। সেই ইশাক্ আজ যদি দিলীপকে একবার বাগে পায়? থাক্ সে কথা। দিলীপের কথাই ধবা যাক্—খুড়িমার কার্বঙ্কল অপারেশন দেখে যার মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সেই দিলীপ আজ ।

শোভা বললো—তুমি এসব নোংরা কাজে থেকো না দিলীপদা।

দিলীপ—আমি গায়ে পড়ে কাউকে ঠেঙ্গাতে যাব না। তবে পাডার ভেতর ঢুকে কেউ উপদ্রব করতে এলে বা বেলতলার ঐ মন্দিরটাকে কেউ ভাঙ্গতে এলে বাধা দিতে হবে অবশ্য। নইলে বৃথাই এতদিন এক্সারসাইজ করে হাতের গুলি পাকিয়েছি।

—কিছু করতে হবে না তোমাকে।

—এসব ব্যাপারে তোমার গান্ধীমার্কা অহিংসা কিন্তু কোন কাজের কথা নয় শোভা।

—বেশ তো, তোমার গায়ের জোর যখন আছে, তখন দু'দলকেই লাঠিপেটা করে শায়েস্তা কর।

—কি রকম?

—হিঁদুরা যখন মুসলমান পাড়ায় আগুন দিতে দৌডয়, তখন ওদের ঠেঙ্গিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দিও। মুসলমানদেরও তাই কর।

—তা হয় না।

—তা হয় না যখন, তখন দু'দলকেই হাতজোড় করে বাধা দাও।

—তাতে কোন ফল হবে কি?

—তুমি একবার করেই দেখ, ফল হয় কি না?

দিলীপের মুখে মৃদু হাসি দেখে বোঝা যায়, শোভার কথাগুলি তার বিশ্বাসের মধ্যে আমল পাচ্ছে না। হাসিটা ভদ্রগোছের বিদ্রূপের মতো মনে হয়।

শোভা বলে—শুনেছি, হিন্দুরা তোমাকে একটি বীর বলে শ্রদ্ধা করে। মুসলমানেরাও নাকি তারিফ করেছে—সাবাস্ দিলীপবাবুর হিম্মৎ! তাতেই বোধহয় গলে গেছ! মেকলে সাহেবের টিটকারি মিথ্যে করে দিতে গিয়ে তোমরা শেষে গুণ্ডাগিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছ। এটাও এক ধরনের পাঁঠা মেরে শক্তিপূজা। ছি ছি!

দিলীপ আর উত্তর দিল না। শোভার কথাগুলির রূঢ়তায় প্রথমে রাগ হলো। তারপর কিছুক্ষণের জন্য যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো। তারপর একটা অস্বস্তি। কিছুক্ষণ চঞ্চল হয়ে পড়লো দিলীপ। উঠে গিয়ে জানালার ধারে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

শোভা বললো—সত্যিই তুমি সিগারেট ছাড়তে পারবে না দিলীপদা ?

জ্বলন্ত সিগারেটটা আর সিগারেটের প্যাকেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল দিলীপ।

শোভা—আমার উপর রাগ করো না। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তবে আমায় মাপ করো।

দিলীপ—না, কোন অন্যায় হয়নি ; আমি কাল কসাইপাড়ায় মসজিদের সামনে একা দাঁড়িয়ে মিছিল পার করবো।

শোভার মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে এল—এরকম করো না দিলীপদা।

—ভয় নেই। তুমিও আমার সঙ্গে থেকো শোভা।

শোভার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মিলিটারী পুলিশের ট্রাকগুলি বৃথাই সিন্দুক ভরা বুলেটের বোঝা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। পেট্রল পুড়লো শুধু শুধু। কোতোয়ালী কর্তাদের তোড়াজোড় এবারের শোভাযাত্রায় নতুন একটা সঙের মতো মনে হলো। মসজিদের সিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছিল দিলীপ আর শোভা। মুসলমান ছাত্রেরা এসে মাঝে মাঝে হেসে গল্প করে যাচ্ছিল। কাতার বেঁধে মুসলমান জনতা রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখলো। শোভাযাত্রার আগে আগে লাঠিধারী পুলিশগুলি বেকুবের মতো মাথা নীচু করে হাসছিল।

বেতারের অপারেটর দিলীপের হাতে একটা নোটিশ গুঁজে দিয়ে গেল। আর নাহি দূর। একটি সুকোমল সবুজ রেজাই দিয়ে ঢাকা আকা-খেল প্রান্তর। ঠাসা গমের খেত। মাঝে মাঝে এক একটা বুড়ো দেওদারের মাথায় তখনো লম্বা লম্বা কুয়াশার জট ঝুলছে।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে নন্দী সাহেবের আলাপের হর্ষ ও উচ্ছ্বাস শোনা যায়। ডোরাও নিশ্চয় এসেছে—ওর চুলের ক্রীমের মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে।

ওঁরা এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। দিলীপের চাকরির কথাটা শুনেছেন। আজ পর্যন্ত কোন বাঙালীকে যে সুযোগ দেওয়া হয়নি, দিলীপ তা পেয়েছে। এক অভাবিত গৌরবে আজ দিলীপের কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। ফৌজী কৌন্সিলের ফুলের মুকুটটি যে বিমানসেনা দিলীপ, আজ সেই সেরা পদ ও পংক্তির সম্মান গ্রহণ করতে আহ্বান-লিপি পেয়েছে। শীঘ্রই পেশোয়ার গিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য কাজে যোগ দিতে হবে।

প্রফেসর আর্থার সিংহ অসুখে পড়ে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে। তাই ডোরা নন্দী এখনও সিংহ হয়নি।

—সুপ্রভাত।

অপ্রতিভভাবে হেসে ডোরা দিলীপের পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। ঠিক আগের মতো মুখ ভরে হাসির ঝলক ফুটিয়ে তুলতে পারছে না ডোরা। চেষ্টা করলেও দ্বিধায় জড়িয়ে যায়।

—কেমন আছেন ?

দিলীপের প্রশ্নে আরও লজ্জিত হয়ে পড়লো ডোরা। বললো—এবার একেবারে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গেলেন ; ঘাসের ফুলকে কি আর চিনতে পারবেন ?

—মাটির ঢেলা আকাশে উঠলে ঝুপ্ করে মাটিতেই পড়ে যায়।

—না-ও পড়তে পারেন। যদি আকাশকুসুম হয়ে যান ?

দিলীপ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সেই প্রথম জীবনের স্বপ্নে দেখা মাটির কোহিনুর আজ ঘাসের ফুলের মতো সুলভ হয়ে গেছে।

ডোরা বললো—আমার একটা অনুরোধ আছে দিলীপবাবু।

দিলীপ—বলুন।

—দূরে গিয়েই একেবারে পর হয়ে যাবেন না। অন্ততঃ সপ্তাহে একটিবার করে যাতে আপনার খবর পাই তার ব্যবস্থা করবেন। ভুলবেন না, আমি কিন্তু আশা করে থাকবো।

—সত্যি আশা করে থাকবে তুমি?

হ্যাঁ দিলীপ।

—তুমি এতদিন এই আশার কথা আমাকে বলনি কেন ডোরা? তাহলে আমি হয়তো এ কাজটা নিতাম না। অবশ্য, এখনো নেব কিনা ঠিক নেই।

—ভুল করো না দিলীপ। তোমার জীবনের উন্নতির পথে আমি কোন বাধা দিতে চাই না, তাতে আমার যত দুঃখই হোক না কেন, সব সইতে পারবো। জানি, একদিন তোমায় ফিরে পাব।

স্কোয়াড্রন ক্রমেই ওপরে উঠছে—রাবণের সিঁড়ির মতো যেন ঔদ্ধত্যে স্বর্গের দিকে মাথা ফুঁড়ে চলেছে। হিমাক্ত বাতাসের জীব যেন ছুরির মতো গায়ের চামড়া ছুলে ফেলবে। একটা কাঁপুনির বেগ পুরু ফ্লানেলের কিট ভেদ করে দিলীপের হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগলো। বমির তোড় এল গলা ঠেলে। অসাড় নাকের নালী দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অক্সিজেনের মুখোশটা চাপিয়ে কোন মতে সুস্থির হয়ে নিল দিলীপ।

শোভার জন্য দুঃখ হয়, রাগও হয়। কিরকম যেন ওর প্রকৃতি। দাদা রমেশের দেশ জাতি সমাজ স্বাধীনতার কতগুলি বুলি শিখে তোতাপাখির মতো শুধু আওড়ায়।

সুজানাগের কে না শুনে খুসী হয়েছে? প্রত্যেক বাঙালীই শুনে বোধহয় খুসী হবে—দিলীপ দত্ত যোদ্ধা হয়েছে। এমন বুকের ছাতি, এমন নির্ভীক দুঃসাহসী ছেলে, ওকি কলম পিষে পিষে জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে? যোগ্য কাজই পেয়েছে দিলীপ।

এতদিন পরে অনেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। পাঁচু ডাক্তারের সেই তোখড় মেয়েটার পাল্লায় পড়ে স্রেফ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। ঐ মেয়েটারই নাম শোভা—এক নম্বরের স্বরাজওয়ালী। ভাই বোনে মিলে শুধু গান্ধী গান্ধী করে। পাঁচু ডাক্তারের পসার তো জানা আছে—ফুটো স্টেথিস্কোপ। দেনার দায়ে ভিটে বিকোতে বসেছে। মেয়েটাকে যদি দিলীপের মতো ছেলের কাছে গছিয়ে দিতে পারে—তবে আর ভাবনা কি? ভাউচারে হাতী কেনা হয়ে গেল।

ডোরার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিন পরেই শোভা উপস্থিত। দিলীপ বেড়াতে যাবার জন্য সবে সাজ সেরে গারেজের দিকে চলেছে—আজ টু-সীটার নিয়ে বার হবে। আজকের সাজটার মধ্যেও নিদারুণ এক ব্যতিক্রম। সন্ধে হতেই ট্রাই-কলার-ট্রাউজারে একটি আধ-ময়লা বৈলাতিক সন্ধ্যাতারার মতো আবার বহুদিন পরে নতুন করে চমকে উঠেছে দিলীপ।

শোভা বুঝে বুঝে এই অসময়েই এসে দাঁড়িয়েছে, যেন পথ রুখে।

—তোমার চিঠি পেয়ে আসছি, অবশ্য আসতে লেখনি। কিন্তু ক্ষমা চেয়েছ কেন? লিখেছ, ভাগ্য তোমাকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে চললো, সেই চরম দণ্ড বরণ করে নিয়েছ—তবু আমাদের ভালবাসার স্মৃতি চিরন্তন হয়ে থাকবে । বেশ সুন্দর লেখাটা।

দিলীপ—তুমি ভুল বুঝে ঠাট্টা করেছো, কিংবা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে

কথাগুলি তোতাপাখির মতো শোনালো। যেন একটা আত্মগ্লানির লাঞ্ছনাকে জোর করে এড়িয়ে যাবার জন্য ফাঁক খুঁজছে দিলীপ।

শোভা—আজ সুজাবাগের কাক-কোকিলও জানে যে তোমার সঙ্গে আমার নাকি প্রেম হয়েছে।

—তাদের এই জানা তো মিথ্যে নয় শোভা।

—বেশ তো, এখন তারা যদি কেউ তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, সেই প্রেমযমুনা এক লম্ফে ডিঙিয়ে তুমি চললে কোথায় ?

—বলবো, জীবনে একটা কঠোর পরীক্ষার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, তাই এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে হলো।

—বাপ্‌রে বাপ্‌। পরীক্ষা ? তার ওপর কঠোর ? সোজা কথায় যাকে বলে, একটা চাকরি পেয়েছ মাত্র। বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ ঘোচাবে, মিছে কেন এত সব বড বড কথা বলছো দিলীপদা ? বল, তোমার নিজের অপবাদ ঘুচবে, তুমি নিজে বীর হবে, যোদ্ধা হবে। তাই দিয়ে বাঙালীব বীরত্ব বোঝায় না।

—কেন বোঝায় না ?

—যেমন তুমি মোটর গাড়ীতে বেডাও মানে বাঙালী জাতির মোটব গাডীতে বেডানো বোঝায় না।

—আমার একটা খুব সোজা কথার উত্তর দেবে শোভা ? সত্যিই কি বিশ্বাস কর তুমি, চবকায় সূতা কেটে স্বরাজ পাওয়া যাবে ?

—মেনে নিচ্ছি পাওয়া যাবে না। এবার তুমিই বল, কি করে পাওয়া যাবে।

—যুদ্ধ করেই পেতে হবে, পৃথিবীর আব পাঁচটা পরাধীন জাত যে ভাবে লড়াই করে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই ভাবে।

—তাও মেনে নিলাম।

—তাই বাঙালীকে শুধু কলমবাগীশ কেবানী হযে থাকলে চলবে না। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে।

—অন্য সময় হলে তোমার মতো লোকের মুখে একথা শুনলে বসিকতা মনে করে হাসতাম। কিন্তু আজ সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। যুদ্ধে চাকরি করা আব যুদ্ধবিদ্যা শেখা কি একই ব্যাপার দিলীপদা ? এই তত্ত্বটা কি তোমাকে বুঝিযে বলাব দবকাব আছে ? তুমি তোমাব মনকেই প্রশ্ন করে দেখ একবাব।

সুবিজ্ঞ আচার্যর মতো শোভা উপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছে। দিলীপের মনের তারগুলি ক্রমেই বিবক্তিতে মোচড দিয়ে কড়া হয়ে উঠতে লাগলো। বললো—তুমি কোন নতুন কথা শোনাচ্ছ না শোভা, তোমাবই মতো গোঁড়া ঠাকুবমাযেরা এই যুক্তি দিয়েই হিন্দু ছেলের সমুদ্রযাত্রাকে পাপ মনে করতেন। সব বিদ্যারই অধিকারী হতে হলে আগে ছাত্র হতে হয়। ছাত্র হওয়াকে চাকরি করা বলে না।

শোভাকে এতক্ষণ সত্যিই যেন আততায়িনীর মতো দেখাচ্ছিল। দিলীপের বিরক্তিভরা উত্তর শুনে চোখ নামিয়ে নিল। না, আজ আর দাবী কবে বলবাব কিছু নেই। চুপ করে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে বইলো শোভা। দিলীপের মনে হলো, বড় বেশি কালো দেখাচ্ছে শোভাকে। বোধহয় এত ঘামিয়েছে আর হাঁপাচ্ছে তাই। মমতা হয়, কেন এরা মানুষকে শুধু পেছনে টেনে রাখতে চায়। জানে না, তাতে কোন ফল হয় না। দিলীপ একটু অনুনয় করে বললো—দুঃখ করো না শোভা।

শোভা—যুদ্ধ শিখতে হলে মানুষ মারতে হয়, সেটা জান তো ?

দিলীপ—শত্রুকে মারতে হয়।

—তুমি শত্রুকে চেন ?

—চেনবার কোন প্রয়োজন হয় না।

—আমাকে জব্দ করার জন্য গায়ের জোরে কিছু বলো না দিলীপদা। আমার কথার উত্তর

দাও।

—না, উত্তর দেবার কিছু নেই।

দিলীপের কথাগুলি ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছে, পালাবার পথ না পেলে বেড়াল যেমন রুষ্ট হয়ে ওঠে। শোভাও তেমনি টিট মেয়ে, সব অপমান সহ্য করে আজ যেন একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্যই সে এসেছে। বললো—তুমি এই চাকরি নিও না। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না যে, তোমার দ্বারা এসব কাজ হতে পারে না।

—কেন ?

—দশজনের বাহবা আর হাততালির উস্কানিতে দাঙ্গা করতে গিয়েছিলে, ভুল বুঝতে পেরেছিলে। এবারও হাততালির তারিফ পেয়ে যোদ্ধা হতে চলেছ।

দিলীপ শোভার কাছে এগিয়ে এসে সান্ত্বনার সুরে বললো—আজ অন্য কথা কি আর বলবার কিছু নেই শোভা ? শুধু আমার চাকরিটা নিয়েই তোমার দুঃখ ? আমি চলে যাব, শুধু এই কথাটা ভেবে তোমার কি...।

শোভা এইবার হেসে ফেললো—সে দোহাই দেবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে ডোবা। থাক্, সে সব কথা।

একটি কথার আঘাতে দিলীপের সব মুখর চপলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছু একটা বলবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

শোভা—এইবার আমি যাই। অনেক সময় নষ্ট করলাম।

থার্মোমিটারের পারা শূন্য-সেন্টিগ্রেড-এর নীচে বিশ ডিগ্রী নেমে গেছে। সময়ের প্রবাহ যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এক চরম লুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানবহরের সেই একটানা সরোষ গুঞ্জন আর নেই। অদ্ভুত এক শব্দের উৎসবে মহাব্যোম স্পন্দিত হচ্ছে, যেন গান গাইছে একটা বিদেহী পরমাণুর জগৎ। আলোক ও শব্দের গুঁড়ো ছড়ানো এই বায়ুর দেশে পৃথিবীর জ্ঞানবুদ্ধি অসহায় হয়ে পড়ে। দিলীপ দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানী হওয়া উচিত ছিল তার, তাহলে না এই পদার্থ-প্রপঞ্চের কিছু রহস্য লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো। যদি এখানে কেউ আসে, সে যেন এই অগোচরের অহঙ্কার ভেঙে এক মুঠো আলোক-কণিকা বন্দী করে নিয়ে যায়। মাটির দুনিয়ার মান রাখতে হলে তার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই।

ডোরাকে এইসব কথা লিখতে হবে। কিন্তু সে কি খুসী হবে ? খুসী হতো যে সে আজ তার পথ থেকে সরে গেছে। বোধহয় এখন বিলিতি-কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে। হয়তো ছ'মাস জেলও হয়ে গেছে।

স্কোয়াড্রন বধ্যভূমির ওপর পৌঁছে গেছে। নীচে ওয়াজিরিস্তানের বিচিত্র প্রান্তর—ছোট ছোট গ্রাম ক্ষেত আর বাগিচা। পাহাড়ের ঢালুতে ভেড়া চড়ছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে একটা আবেশ আসে। শিল্পী হয়ে ছবি এঁকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস হয় না পৃথিবীতে ধুলো আছে, কাঁটা আছে, বিষ আছে। সব মিথ্যা অপবাদ বলে মনে হয়। মাটির পৃথিবীর এই রূপ মানুষেরা জানে না। তাই তারা স্বর্গ কামনা করে। শিল্পী হওয়া উচিত ছিল দিলীপের।

একটা বাজার। তাজটুপি আর পাগড়িবাঁধা শত শত মাথা কিলবিল করছে। বাজারের পাশে খাড়া পাহাড়টার মাথায় একটা জীর্ণ বৌদ্ধ স্তূপ। পাথরের গায়ে ঘুলঘুলির মতো কতগুলি গুম্ফা, কতগুলি কালো চোখের কোটর যেন আকস্মিক দুঃস্বপ্নে বিক্ষত হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষের কোন্ ছাত্র না ইতিহাস পড়েছে ? মীরাগ্রাম থেকে তক্ষশীলা—তক্ষশীলা

থেকে পুরুষপুর—পুরুষপুর থেকে রাজগৃহ। এই সেই পুরাতন হৃদয়ের পথ আজও পড়ে রয়েছে—অবহেলা ও অপরিচয়ের কাঁটায় ঢাকা। সেই যুগ-যুগের কুটুম্বিতার সুখস্মৃতি যেন বিষণ্ণ বেদনায় পাহাড়টার মাথায় ভেঙে পড়ে আছে। আজ কিন্তু সেই...।

দিলীপের হঠাৎ মনে পড়ে যায় —রসিদ খলিফার মামাবাড়ী এই দেশে।

রসিদ খলিফা। দিলীপের ঠাকুরদার আমলের দরজি। আজও সে বেঁচে আছে। সাদা শনের মতো ফুরফুরে তার দাড়ি, পাকা ডালিমের মতো গায়ের রঙ। ছেলেবেলায় পুজোর সময় জামা সেলাই নিয়ে রসিদের সঙ্গে দিলীপের প্রতি বছর একটা সংঘর্ষ বাধতো। জামার ছাঁট মোটে পছন্দসই হতো না দিলীপের। বুড়ো রসিদকে খিমচে চড়ঘুঁষি মেরে নাজেহাল করতো দিলীপ। তারপর দেয়ালীর সময়, লেপ সেলাই করতে আসতো রসিদ। দিলীপ বসে বসে রসিদের কাছে গল্প শুনতো—রসিদের মামাবাড়ী ওয়াজিরিস্তানের গল্প।

শক্রপুরী নয়, সেই রূপকথার দেশ আজ তার পায়ের নীচে। রাবণের সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে সেই দেশ। কখন আবার বৈদ্যুতিক ঘন্টি বেজেছে, কাজের অর্ডার এসেছে, দিলীপ কিছুই জানে না। ঠাণ্ডা আয়নার মতো চোখ দুটোতে শুধু নীচের পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি চিক্‌চিক করছে। বোমা পড়ছে—এক একটি বিস্ফোরণে এক একটি প্রকাণ্ড ধোঁয়ার গোলাপ হঠাৎ পাঁপড়ি মেলে উঠছে। বাজারটা আর নেই। শুকনো পাতার মতো কতগুলি নিরুপায় ভূচর প্রাণ এক ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ছিট্‌কে পড়ছে চারদিকে।

দিলীপের সহকর্মী দুজন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ওদের চোখে মুখে কী অকপট সংহারের আনন্দ। শুধু দিলীপের অন্তরাত্মা যেন ধরা-পড়া চোরের মতো আসরের এক কোণে মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

শুধু মনে পড়ে—রসিদ খলিফার মামাবাড়ি। হিমে নয়, বৈরাগ্যে নয়, নিতান্ত এক পার্থিব মমতার আবেশে দিলীপের সংবিৎ অসাড় হয়ে রইল। নীচে যে জীবনের সুখদুঃখের নর্তন চলেছে, সে নিজেই যে তার একটি উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত জীবাণু। সেখানে রসিদ খলিফার মামার বাড়ি—মৃত্যুর ঢিল ছুঁড়ে মারতে হাত ওঠে না। একেই বলে ভীরু কাপুরুষ, একেবারে হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুষ।

বোম্বারের দল ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। বিমানের ভেতর থেকে মূর্ছাহত দিলীপ দত্তকে বের করে একটা স্ট্রেচারের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। ধরাচূড়া ছেড়ে কয়েকটি গগনবিহারী চণ্ড চণ্ডা ডার্বিশায়ার দুলাল চায়ের বাটি হাতে নিয়ে আরামে চুমুক দিচ্ছে। দিলীপের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ঠিক মূর্ছা নয়, চোখ মেলে তাকাতেই পারছিল না দিলীপ। অভিযান এখনও শেষ হয়নি, আরো পথ বাকী আছে। এখান থেকে হাসপাতাল, তারপর হেড কোয়ার্টারে চালান, তারপর তদন্ত। তদন্তের শেষে বরখাস্ত। একটি মেকি বীর্যবন্তের কুশপুত্তলিকা আবার চুপি চুপি হাওড়া এক্সপ্রেসে চড়ে বসবে। আবার সুজাবাগ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবার আর্দালি আর টু-সীটার এসে অপেক্ষায় বসে থাকবে।

ডোরা আসবে, নন্দীসাহেবও বোধহয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ডোরা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে? কতক্ষণ তার সুন্দর ঠোঁট দুটিতে হাসি ফুটে থাকবে? এক মিনিট দু'মিনিট....পাঁচ মিনিট। তারপর আর বুঝতে বাকী থাকবে না।

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরার হাত কাঁপতে থাকবে। সেই ধিক্কারে ফুলের তোড়া লুটিয়ে পড়বে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপর। ফুলের তোড়াটা হাত তুলে দিলীপ নিতেও পারবে না, মাটি থেকে তুলে ফিরিয়ে দিতেও পারবে না। শুধু নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে

রিতা

জল নেবার জন্য রিতা ছোট পাহাড়ী নদীটার বালির ওপর এসে দাঁড়ালো।

মাঝ নদীতে বালির ওপর দিয়ে সরু একটা জলস্রোত, ঘড়া ডোবে না। অনেকক্ষণ হাত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে একটা গর্ত করলো রিতা। তারপর সেখানে ঘড়া ডুবিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে নীচের স্রোতের ধারে বসে হাত পা ধুয়ে নিল। মুখটা ভাল করে মেজে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো, দূর মহুয়ার ভিড় অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একফালি চাঁদ উঠেছে মাথার ওপর। ভর সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে।

কলসীটা কাঁখে তুলতে আর ইচ্ছে করলো না। কানাটায় হাত দিয়ে হেঁচড়ে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে একটা কালো পাথরের চটানে এসে দাঁড়ালো। আজ তাব আব কিছু ভালো লাগছে না।

অনেকদিন থেকেই তার ভাল লাগছিল না। সাঁওতাল চাষার মেয়ে রীতা। পাহাড়ের ঢালুতে ছোট একটা ডিহি। এ ডিহিতে যে সাঁওতালদের বসতি তাবা তাদের জংলীপনা হারিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু চাষ আবাদেও হাত পাকেনি। আইন-কানুনকে ভয় খায় বেশি। জংলীদের মতো বেপরোয়া মহুয়ার মদ চোলাই করতে পারে না। ট্যাক্স দেয় বেশি, কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন বেড়েছে, অথচ আয় নেই। বার মাসে একটা ফসল তাদের ক্ষিধে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাই মাঝে মাঝে কুলি রিক্রুটারের ক্যাম্প বসে। টাণ্ডেলেরা ডিহি বস্তি ঘুরে ঘুরে জোয়ান খাটিয়ে লোক যোগাড় করে আনে। কিছু আগাম পায়, খাকি কোট আর পাগড়ী পায় বিনা পয়সায়। তিন বছরের কন্ট্রাক্টে ফিজি দ্বীপে চালান হয়।

রিতা শুধু শুনেছে তার বিয়ে হয়েছে। চাষী সাঁওতালেরা প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। অল্প বয়সেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়। লগন মাঝির মেয়ে রিতার বিয়ে হয় মাত্র সাত বছর বয়সে।

তারপর থেকেই রিতা আজ দশ বছর ধরে শুনে আসছে মুনার কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরে সেও তিন বছরের কন্ট্রাক্টে ফিজি চলে গেছে। রিতার শ্বশুরবাড়ির ভিটের ওপর এখন একটা ধুতুরার জঙ্গল। সে বাপ-মায়ের কাছেইথেকেছে,আর বড় হয়েছে। দিনের পর দিন শুনে আসছে,—মুনা এবার ঘরে ফিরবে। চিঠি এসেছে।

সত্যিই মুনার চিঠি আসে। সে খুব ভাল আছে। কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, পয়সা জমেছে কিছু। সে লেখাপড়াও কিছু কিছু নাকি শিখেছে। সাহেবরা তাকে ভালবাসে। সাহেবরা কত বকশিশ দেয়, দামী দামী পোশাক বাঁশি টুপি...

চিঠিতে প্রবাসী পতির এইসব কুশল সংবাদ দিনের পর দিন শুনে আসছে রিতা। লগন মাঝি সমস্ত ডিহি ঘুরে সগর্বে এইসবা বার্তা আরও বেশি করে রটিয়ে বেড়ায়। রিতার সৌভাগ্যের কথা সকলে আলোচনা করে।

কৌতূহলের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। ওসব সংবাদে রিতার আর মন ভরে না। এতদিনে তার আসা উচিত ছিল।

পাথরের চটানে দাঁড়িয়ে রিতার মনে এই চিন্তাই মন্থর কুয়াশার মতো ভর করেছিল। আর

কতদিন এই ভাবে, এই মনে মনে দেখবার একটানা অভিনয় চলবে ?

রিতা আবার চলতে শুরু করলো। উঁচু নীচু মেঠো জমি পার হয়ে ডিহ্রির কাছাকাছি পৌঁছেছে। কাঠগোলাপের বনে হালকা ঝড়ের দোলা লেগেছে। কাকের ঝাঁক কলরব করে দেওদারের মাথায় এসে আড্ডা নিচ্ছে। রিতা রাগ করে একটা হোঁচট খেল।

আর একটু দূর এগুতেই দেখা গেল, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে নুটু। একথা রিতার জানাই ছিল। শুধু আজ নয়—আজ তিন বছর ধরে নুটু তার পেছনে ঘুর ঘুর করছে। নুটু বাঁশী বাজিয়ে রিতার নামে গান গায়। উত্তরে রিতা ওকে গালাগালি দেয়। নুটু খরগোস শিকার করে এনে লগন মাঝির বাড়িতে দিয়ে যায়। ঘরশুদ্ধ লোক মাংস খায়, রিতা ছোঁয় না। নুটু যতবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, রিতা তাকে বিমুখ করেছে।

নুটুর উপদ্রবে রিতার রাগ পড়তো গিয়ে ফিজি প্রবাসী মুনার ওপর। নুটুর এই দুঃসাহস কি করে সম্ভব হয় ? হয় ও জানে মুনা আর আসবে না, নয় মনে করে রিতা বুঝি মুনাকে ভালবাসে না।

মুনাকে ভালবাসে রিতা। কিন্তু মুনাকে তার প্রথম যৌবনের চোখে সে আজও দেখতে পায়নি। মুনা তার কাছে কল্পনা মাত্র। কিন্তু সে কল্পনার মধ্যে রামধনুর মতো কত না বিচিত্র মোহ মিশিয়ে আছে। সমস্ত ডিহি যার নামে স্তুতিমুখর, সেই মুনা তার স্বামী। মুনা জোয়ান মরদ, মুনা রোজগার করে, পয়সা জমিয়েছে। যখন দেশে ফিরবে মুনা, সমস্ত ডিহির দাম যেন বেড়ে যাবে। ভাগ্যিস অনেকদিন আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, নইলে ঝড়ু মাঝির মেয়েই হয়তো মুনার ঘরনী হয়ে যেত ! রিতার চেয়ে সে অনেক সুন্দর।

নুটুকে ডিহ্রির লোকে দেখতে পারে না, গরীব বলে নয়, বেজায় কুঁড়ে আর বখা। বিতাব ওপর ওর অনুরাগের কথা ডিহ্রির অনেকে টের পেয়েছে। ওকে কড়া কথায় অনেকে শাসিয়েও দিয়েছে—সামলে চল। নিজে ভাল হতে শেখ তবে বিতার মতো ভাল মেয়ে তোকে বিয়ে করতে চাইবে। তা ছাড়া পরের বউ, অত মাখামাখি ভাল দেখায় না। মুনা মাঝিও শীগগির আসছে। শেষকালে কি ডিহ্রির মধ্যে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটাবি।

দূর ফিজির বাগানেও চাঁদ ওঠে। মুনা দেশের কথা ভাবে নিশ্চয়। কিন্তু বেশি করে ভাবে রিতার কথা। চিঠিতে খবর পেয়েছে—রিতা ডাগর হয়েছে, তার ওপর নাকি রাগ অভিমান করে আর মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে।

সমস্ত বছরে তিনটে বা চারটে চিঠি পায়। তার মধ্যে শেষ চিঠিগুলিই মুনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। রিতা নাকি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তবে বাপ-মার সঙ্গে প্রায়ই কোঁদল করে—মুনা কেন দেশে ফিরছে না।

রিতাকে মনে পড়ে। কিন্তু আট বছর আগে বিয়ের দিনে দেখা রিতার সে-মুখটি আর মনে পড়ে না। হলুদ ছোপানো কাপড় পরে কাকার কোলে চড়ে বিয়ের আসরে এল রিতা। তারপর পুজোপাঠ হয়েছে, মাদল বেজেছে, ঝুমুর হয়েছে, আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

রিতাকে এইভাবে শুধু চিঠির মধ্যেই পেয়ে এসেছে মুনা—আর ছুটির পর বাগান থেকে ঘরে ফিরতে একা পথে কল্পনায় অনেক কিছু পেয়েছে।

মুনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে। তাই সে শুধু মুখ বুজে কঠোর পরিশ্রম করে। কিছু পয়সা জমানো চাই। সেই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। তারপর দেশে ফিরে নিজের সঙ্গিনীকে আবার কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু ডিহিতে থাকা আর চলবে না। শহরে একটা ছোট ভাড়া ঘরে সে নতুন সংসার পাতবে। বিনা মাইনেতে এপ্রেন্টিস খেটে বয়লার মিস্ত্রির কাজটা সে ভাল করে শিখেছে।

আর জীবনে বাগানের কুলিগিরি নয়।

একটা সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়ম কিনেছে মুনা। মাদ্রাজী গান, হিন্দী গান গাইতে শিখেছে। সাহেবদের দেওয়া ট্রাউজার পরে নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে মাঝে মাঝে পোর্টেতে সিনেমা দেখে আসে।

মুনার কুলিদের টাভেল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছে—কুলি হয়ে এসব কাপ্তেনী ভাল নয় রে ছোঁড়া। দেশে ফিরলে বউ আর চিনতেও পারবে না। ঘরেও নেবে না।

মুনা জানতো দেশে ফিরে আর থাকছে কে? রিতাকেও তারই মতন কায়দা-দুরস্ত করে নেবে। তাকে কুলির বউ করে রাখবে না সে। পাহাড়িয়া চাষী জীবনে ফিরে যাবার মতো মতিগতি তার আর নেই। কিন্তু এবার বোধহয় ফেবা উচিত। বেচারী রিতা।

মুনার মনে তার কল্পনার রিতা সমস্ত রূপ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ডিহির পঞ্চায়েতের বৈঠকে নুটুর সাজার নির্দেশ হয়েছে। দশ টাকা জরিমানা। যেমন করেই হোক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে পাথর ভেঙে ওকে দশ টাকা রোজগার করতে হবে আর জরিমানা দিতে হবে। নইলে এ ডিহিতে ওর স্থান নেই।

নুটু বললো—আমি রিতার কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা কবে দিক। জরিমানা যেন না করা হয়। গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।

কিন্তু অপরাধ বড় কঠিন। সহজে মুক্তি দেওয়া যায় না। নোংরা চেহারা, কাজে কুঁড়ে, নুটুর জংলী স্বভাব আজও গেল না। উপোসেও ওর পাথুরে শরীর যেন কাবু হয় না। দিন গেলে দুটো কাঠবিড়ালী মেরে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেই ওর চলে গেল। চুলের ঝুঁটিতে সর্বদা বাঁশী গুঁজে রাখে। সকলে যখন মাঠে খাটতে বের হয় নুটু তখন একটা আলের ওপর শুয়ে বাঁশী বাজায়।

এসব অপরাধ ক্ষমার্হ। কিন্তু পরের বিয়ে করা বউয়ের পেছনে একটা উপদ্রবের মতো লেগে থাকা, কোন পঞ্চায়েত ক্ষমা করতে পারে না।

রিতা সেদিন স্রোতে স্নান করতে গিয়েছিল। বনের নিরালায় নিশ্চিন্ত মনে সে স্নান করছে, একটা কুলের ঝোপ থেকে এক ঝাঁক তিতির উড়ে পালিয়ে গেল, যেন ভয় পেয়ে। রিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তখুনি ধরে ফেললো অপরাধীকে। ঝোপের ভেতর নুটুর ঝাঁকড়া চুলের মাথা দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসেই রিতা লগন মাঝিকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এই অপরাধেই নুটুর শাস্তি। নুটু হাত জোড় করে পঞ্চায়েতের কাছে নিবেদন করলো—আমি রিতাকে বহিন বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক।

রিতা বললো—না।

নুটু ডিহি ছেড়ে চলে গেছে। রিতা তার ঔদ্ধত্যকে মাপ করতে পারেনি, এর জন্য রিতার মনেও কোনো আপসোস নেই। নুটুর এই অপরাধ, এই আবদার অনেকটা বামন হয়ে চাঁদ ধরার সখের মতো। তার স্বামী মুনার কথাও তো নুটু সবই শুনেছে। তবে কেন সে প্রতিযোগিতায় নামে, কোন সাহসে?

চিঠিও এসে গেল, মুনা আসছে। আগামী সপ্তাহে ওদের জাহাজ ছাড়বে।

রিতার বুক দুরদুর করে উঠলো। এ কী অদ্ভুত চাঞ্চল্য। মুনা আসছে। ফিজি দ্বীপের চাঁদ নীল আসমানে ভেসে এসে এই মহুয়ার মাথায় এসে দাঁড়াবে।

জঙ্গল থেকে কোঁচড় ভরে বিঠা ফুল কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখলো রিতা। মোটা মুক্তার মালা

একটা ধুয়ে রাখলো।

খিদিরপুর থেকে চিঠি এসে গেছে। জাহাজ পৌঁছে গেছে। মুনা তিনদিন পরে পৌঁছচ্ছে দেশে।

ডিহির সব মাঝিরা রাত থাকতে স্টেশনে এসে বসে রইল। ভোরে কলকাতার ট্রেন থামে। লগন মাঝি একটা পালকি খুঁজেছিল, কিন্তু ভাড়া বেশি বলে আর যোগাড় হলো না।

ট্রেন থেকে একদল কুলি নামলো। নানা গাঁ ও ডিহি থেকে কুলিদের মা বউ ও ছেলেমেয়েরা এসেছে। বুড়ীরা তাদের ছেলেদের কাঁধে মুখ রেখে একচোট কেঁদে নিল। যাদের ছেলেরা আসেনি তারাও কাঁদলো। শোরগোল শেষ হবার পর নানা দিকের পথে মাঠে জঙ্গলে যে যার ঘরে চললো।

আর নামলো মুনা। কালো ফুল প্যান্ট পরা, গায়ে কোট আর কম্ফোর্টার জড়ানো। পায়ে জুতো আর মোজা। বিবর্ণ একটা পুরানো ফেল্টের টুপি মাথায়, মোটা বর্মা চুরুট হাতে।

মাঝিরা হাঁ করে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। মুনা লগন মাঝির কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সকলের জড়তা যেন একটু ভাঙলো। বুড়ো মাঝিদেব দু'একজন মুখ ফুটে সাহস করে কুশল প্রশ্ন করলো।

তারপর ডিহির পথ। মুনা আগে আগে চলেছে। মাঝিরা সকলে পেছনে দল বেঁধে চলেছে। সাড়াশব্দ বড় কিছু নেই। মুনা এক একবার থেমে তাদের সঙ্গ নিলেও তারা যেন থেকে থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

কথা ছিল মুনা ডিহিতে ঢোকা মাত্র ছেলেরা মাদল বাজাবে। তাবপব তো সমস্ত দিনের উৎসব লাগবে। লগন মাঝি একটা পাঁঠা কিনে রেখেছে।

রিতা তার মায়ের নির্দেশ মতো সাজ কবেছে। ভয়ে বুক কেঁপেছে, লজ্জা কবেছে, তবুও। নিজেকে জোর করে শান্ত করে আনে রিতা। বেশি লজ্জা করে প্রথম দেখাব সব আনন্দটুকু যেন নষ্ট না হয়। সে হয়তো রাগ করবে।

বটতলার নীচে লোকজনের গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু ছেলেদের মাদল বাজলো না। রিতা কৌতূহলী হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

লগন মাঝি আর তার সঙ্গে আরও দুতিনজন মাঝি ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অদ্ভুত ইংরাজী পোশাকে একজন লোক। রিতা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এরা মুনার খবব নিয়ে আসছে।

মুনা হয়তো তুলসী মাঝির গোলায় বিশ্রাম করছে।

লগন মাঝিরা রিতার সামনে এসে দাঁড়ালো। রিতা বোকাব মতো তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন মাঝি চোখ টিপে ইশারায় জানালো—ঘরের ভেতর যা।

রিতা তবু দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। লগন মাঝি আবার মুখের ইশারায় জানিয়েছিল—মুনা।

এক দৌড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে রিতা থরথর কাঁপতে লাগলো। ওর মা এসে ধরে দু'বাব ঝাঁকুনি দিল—ওকি হচ্ছে?

সমস্ত ডিহিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুনা ফিরেছে, ডিহির ছেলে মুনা। কিন্তু আমোদ তো জমল না। ছোট ছেলেরা দেয়ালে মাদল ঝুলিয়ে রাখলো। পাহাড়ের ওপার থেকে গির্জার একটা দেশী সাহেব আজ তাদের ডিহিতে ঢুকেছে, ভয় দেখাবার জন্য।

আট-হাতি খেরো কাপড়ে রিঠে মাজা শরীর জড়ানো, শালবনের জংলী চাষীর মেয়ে রিতা। চোখে জল দেখা দেবার আগেই মাকে বললো—ছেড়ে দাও, আমি ঠিক আছি।

তবু চোখের জলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আর একটা কল্পনার ছবি চকচক করে উঠলো—ডিহি ছাড়িয়ে বহু দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে রোদের মধ্যে বসে জংলী নুটু একা পাথর ভাঙছে। ওর পাশে ঝুড়ি হাতে সে যদি গিয়ে একবার দাঁড়াতো, খারাপ কিছু বোধহয় হতো না।

পণরক্ষা

এক একবার সত্যিই আজ মনে হয়, কী কুক্ষণে সেদিন সরযূদের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। সেদিন সরযূর ওই মিষ্টি অনুরোধের কথা শুনে আর খুশি হয়ে যদি সরযূদের বাড়িতে চা খেতে না যেত অলকা, তবে আজ আর এভাবে এই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে মনের এই যন্ত্রণার সঙ্গে এত লড়াই করতে হতো না।

বেশ দূরে কাদের বাড়িতে রেডিওর গান বাজতে শুধু করেছে; গানের ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটা বোঝা যায়। বেশ মিষ্টি সুর! অলকার মনের যন্ত্রণাটা তখনি যেন নিজেই লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে যায়। এই তিন বছর ধরে অলকার মনটা যে তৃপ্তিতে ভরে আছে, সেটা যে সেই সেদিনেরই ঘটনার দান। আজ হঠাৎ রাগ করে ওকথা ভাবলে চলবে কেন? এই তিন বছরের জীবনে অলকার মনের ভিতরে যে আলো হাসছে, সেটা যে সেই সুক্ষণেই জ্বলে উঠেছিল। সরযূর কাকা অবনীশের সঙ্গে যদি সেদিন দেখা না হতো, তবে অলকার মন আজ এই গর্বের সুখে ভরে উঠতে পারতো না যে, তার মতো একটা কুরূপা মেয়েকে একজন সুন্দর মানুষ এত ভালবাসতে পারে। সেদিন সরযূর মনের কোন কল্পনাতেও এ সন্দেহ ছিল না যে, ওর কাকা অবনীশের চোখে বা মনে এমন ভুল কখনও সম্ভব হতে পারে। সন্দেহ হলে সরযূ নিশ্চয়ই সাহস করে অলকাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করতো না।

শুধু সরযূ কেন, পৃথিবীর যে কোন মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দেবে, অবনীশের মতো ছেলের পক্ষে অলকাকে ভালবেসে ফেলা সম্ভবই নয়। সম্ভব হলে ওটা একটা নিয়ম-ছাড়া কাজ হবে, একটা দুর্ঘটনার মতো ব্যাপার হবে।

কিন্তু এমন অসম্ভবই তো সম্ভব হয়েছে। আজ সরযূও অস্বীকার করতে পারবে না, ওর কাকা অবনীশ অলকাকেই চিরকালের আপনজন করে কাছে ডেকে নেবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। সরযূ আর সরযূর মা, দুজনেই প্রথমে বোধহয় সন্দেহ করেছিল, না অবনীশ বোধহয় একটা খেয়ালের খুশিতে অলকার জন্মদিনে ফুল আর বই উপহার পাঠিয়েছে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অবনীশের বিয়ের জন্য বাড়ির মানুষের সব চেষ্টা যখন বিফল হয়ে গেল, তখন সকলেই বুঝতে পেরেছেন আর ভয়ানক আশ্চর্যও হয়ে গিয়েছেন, অলকা তাহলে অবনীশের কাছে একটা খেয়ালের খেলনা মাত্র নয়।

তবু সবাই আশা করেছিলেন, ভালবাসার মধ্যেও তো কোন ভুল থাকতে পারে। সে ভুল নিজেই একদিন ভালবাসার মোহটা ভেঙ্গে দেবে। অলকা আর অবনীশের সঙ্গে দেখা করতে আসবে না, অবনীশও আর মাঝে মাঝে অলকার বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার অভ্যাস বন্ধ করে দেবে।

কিন্তু তা হয়নি। আর অবনীশের বাড়ির কেউই যে তাতে খুশি হয়নি, এটাও বোঝা যায়। সরযূর সঙ্গে এই তিন বছরে আরও কতবারই তো দেখা হলো, কিন্তু সরযূ হেসে কথা বললেও সে হাসির মধ্যে যেন একটা গম্ভীর অভিযোগের ছায়া লুকিয়ে থাকে। সরযূ আর সরযূদের

বাড়ির কেউই চায়নি যে, অবনীশ শেষে অলকাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠুক।

সরযূদের বাড়ির সবারই মনের এই ধারণা খুব ঠিক ধারণা নয়। অলকাকে বিয়ে করবার জন্যে অবনীশের ব্যস্ততা এখনও শুধু মনেরই একটা ব্যস্ততা। তিনটি বছর পার হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত সরযূর বাবাকে কিংবা মাকে, এমনকি সরযূকেও মুখ খুলে বলে দিতে পারেনি অবনীশ, এবার একটা দিন ঠিক করে ফেললেই তো হয়।

সরযূরাও একটু আশ্চর্য হয়েছে বৈকি ; অবনীশ এখনও কথাটা বলে দিচ্ছে না কেন ? কিসের বাধা ? বাড়ির কেউ তো আপত্তি করবে না। আপত্তি করবার দিন পার হয়ে গিয়েছে। সকলেই জেনে গিয়েছে, অলকা ছাড়া আর কোন মেয়ে অবনীশের জীবনের কামনা হয়ে ওঠেনি, উঠবেও না।

সরযূর বাবা অনন্তবাবু বলেছেন, অবনীশের মনের রকম-সকম আমার পছন্দ হচ্ছে না। যখন অলকাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন কবে ফেললেই তো হয়। জীবনের এরকম একটা ইচ্ছার কাজ এভাবে তিন বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।

না হয় তো স্পষ্ট করে বলে দিলেই পারে অবনীশ, এ বিয়ে হবে না। তাহলে দুঃখিত হবেন না অনন্তবাবু, সরযূদের বাড়ির একটিও মানুষের প্রাণ ব্যথিত বা দুঃখিত হবে না। কারণ এ-বাড়িতে কেউই ঠিক অন্তর থেকে কোনদিনও অবনীশ ও অলকার এই ভালবাসার সম্পর্কটাকে পছন্দ করেনি, সমর্থনও করতে পারেনি।

অলকা একটি অসামান্যা মেয়ে নয়, আই-এ পরীক্ষায় ফেল করেছে, প্রায় ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, আর ঘরে বসে আছে, এমন মেয়ের অভাব পৃথিবীতে নেই। দেখতেও তো নিতান্ত একটি সাধারণ চেহারার মেয়ে ; আর গুণ বলতে যা আছে সেটাও অসাধারণ রকমের কিছু নয়। কিছুদিন এক প্রাইমারী স্কুলের টিচার হয়ে চাকরি করেছিল। অলকার হাতের আঁকার কয়েকটা ছবি কলকাতায় বড়দিনের এগজিবিশনে প্রাইজও পেয়েছিল। পাড়ায় কোন সভায় উদ্বোধনের গান গাইতে হলে অলকাকেই ডাকাডাকি করে নিয়ে আসতে হয়। এসবও এমন বিরল কোন প্রতিভার কীর্তি নয়। সুলেখা, প্রতিমা আর উৎপলা আরও ভাল ছবি আঁকতে পারে, আরও ভাল গান গাইতে পারে, দেখতেও অলকার চেয়ে অনেক সুন্দর।

এই তিন মেয়ের সবারই সঙ্গে তো অবনীশের পরিচয় ছিল, আজও আছে। কিন্তু কই, সেই পরিচয় তো ভালবাসার কোন সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি ?

সরযূর মা বলেন, আমি কোন আপত্তিই করতাম না, যদি দেখতাম অবনীশ প্রতিমাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সরযূর ধারণা, সুলেখার সঙ্গে কাকা অবনীশের বিয়ে হলে ভাল হতো। আর অনন্তবাবুর ধারণা, সবচেয়ে ভাল হতো যদি উৎপলার সঙ্গে অবনীশের বিয়ে হতো।

অলকাকে কেন যে ঠিক মন থেকে পছন্দ হয় না, সেটা অবশ্য এ বাড়ির কেউ বুঝতে অথবা জানতে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। অলকা একদিন চা খেতে এলো, সেদিনই অবনীশের সঙ্গে আলাপ হলো, আর সেদিনই অবনীশের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে চলে গেল ; শুধু এই সামান্য একটু চেষ্টার জোরেই অবনীশের মতো ছেলের মন জয় করে নিয়ে চলে গেল অলকা, ঘটনাটাকে প্রায় এইরকমের একটা বিস্ময়ের কাণ্ড বলে মনে হয়। সরযূর মা'র মনে আছে, ঠিক পরের দিনই দমদমে অলকাদের বাড়িতে গিয়েছিল অবনীশ। অলকার মতো মেয়ের জীবনে এটা যে প্রচণ্ড একটা জয়েরই গৌরব। কত সহজে বিজয়িনী হয়েছে দেবকীবাবুর এই মেয়ে, এই অলকা।

দেবকীবাবুর মতো মানুষকেও যে একটুকুও পছন্দ করে না এ-বাড়ির কোন মানুষ। অলকা কোন দিনও সরযূকে বাড়িতে চা খেতে ডাকতে পারেনি। কেন পারেনি, সেটা সরযূ ভাল

করেই জানে। দেবকীবাবুর মতো কৃপণ স্বভাবের মানুষ খুব কমই আছে। আছে কিনা সন্দেহ! অলকা জানে, যদি বিনা আহ্বানেও কোনদিন অলকাদের বাড়িতে যায়, তবে সরযূকে এক পেয়ালা চা আর একটা সন্দেশও খাইয়ে বন্ধুত্বের একটা সামান্য ইচ্ছাকে সফল করতে পারবে না অলকা। এটা অনুমান নয়; এটা চোখে দেখা একটা বাস্তব সত্য। একদিন উৎপলা আর সরযূ দুজনেই ইচ্ছে করে দমদমে অলকাদের বাড়িতে গিয়েছিল। দু'ঘণ্টা ধরে অনেক গল্প করেছিল। অলকার বাবা আর মা কাছে এসে উৎপলা আর সরযূর সঙ্গে হাসাহাসি করে অনেক গল্প করেছিলেন; কিন্তু ওই পর্যন্ত। মুখ খুলে এমন একটা কথাও বলেননি যে, চা না খেয়ে চলে যেও না। নিজেদেরই মেয়ের দুটি বান্ধবী, যারা বিকেলবেলা বাগবাজার থেকে দমদম গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রইল, তাদের এক পেয়ালা চা খাওয়াবারও কোন আগ্রহ দেখা গেল না অলকার বাবা আর মা'র একটিও কথায় কিংবা একটিও আচরণে।

কিন্তু অলকাও তো মুখের কথায় একটা অনুরোধ করতে পারতো। তাও করেনি অলকা। শুধু অলকার মুখটা যেন দুঃসহ একটা লজ্জার বেদনা চাপতে গিয়ে করুণ হয়ে উঠেছিল। অলকার জন্যে একটু দুঃখ বোধ করতে হয়েছিল বটে, তবু মনে মনে অলকাব এই অক্ষমতার চেহারাটাকে ক্ষমা করতে পারেনি উৎপলা আর সরযূ। বাপ-মাব বাধ্য মেয়ে অলকা, কিন্তু বাপ-মার অভদ্রতার কাছেও এতটা বাধ্য না হলেই ভাল ছিল। না হয় একটু বিরক্তই হতেন অলকার বাবা আব মা, তবু চেষ্টা করা উচিত ছিল অলকাব, যেন এক পেয়ালা চা না খেয়ে না চলে যায় ওবই পাঁচ বছরের চেনা-জানা দুটি বান্ধবী।

অনন্তবাবুর মনে এমন কোন স্পৃহা নেই যে, তাঁর ভাইয়ের বিয়েতে তিনি পাত্রীর বাপের ঘাড় মুচড়ে একগাদা দানসামগ্রী আর পণ আদায় করবেন। এমন ইচ্ছা থাকলে ক্ষিতীশবাবুর মেয়ের সঙ্গে অবনীশের বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। ক্ষিতীশবাবু শুধু বরপণ হিসাবে নগদ দশহাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন, তা ছাড়া দানসামগ্রীর বিপুল একটা ফর্দও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অনন্তবাবু কোন উৎসাহ বোধ করেননি। অবনীশ নিজেই ওর জীবনের সঙ্গিনী বেছে নিক, কোন আপত্তি নেই অনন্তবাবুর। তিনি খুশি হয়ে সেই মেয়েরই সঙ্গে অবনীশের বিয়ে দেবেন। এর মধ্যে টাকা আদায়ের কোন প্রশ্ন নেই। অলকার সঙ্গে বিয়ে হলেও যে কি ব্যাপার হবে সেটা অনুমান করতে পারেন অনন্তবাবু। বরযাত্রী হয়ে মেয়ের বাড়িতে যারা যাবে, তাদের হয়তো হোটেলে নিয়ে গিয়ে নিজেদেরই খরচে খাওয়াতে হবে। দেবকীবাবু কাউকে এক পেয়ালা চা দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন কিনা সন্দেহ।

তবু, অবনীশের যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন অলকার সঙ্গেই বিয়েটা হয়ে যাক। কোন আপত্তি নেই অনন্তবাবুর। কিন্তু কোন উৎফুল্লতাও নেই, খুশিও নেই। দেবকীবাবুর মতো মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, এটা অনন্তবাবুর পক্ষে নিতান্তই একটা অকাম্য দুর্ঘটনা।

যাই হোক, তিনটি বছর তো পার হতে চললো। এবার অবনীশ বলে দিলেই তো পারে; তাহলে বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলতে পারেন অনন্তবাবু।

২

অলকার মনেও আজ একটা একটা দারুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, কি ভাবছে অবনীশ? ভালবেসেও কারও প্রাণ কি এত অলস হয়ে তিনটে বছর শুধু ভেবে ভেবে পার করে দিতে পারে?

একটুও মিথ্যে নয়, নিজের মনের কাছে তো আর মিথ্যে কৈফিয়ত দেওয়া যায় না।

ভুলেও যায়নি অলকা, সেদিন সরযূর কাকাকে প্রথম চোখে দেখতেই বুকের ভিতরে নিশ্বাসের বাতাসটা হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে-কথা তো চেঁচিয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের কানের কাছে বলে দেয়নি অলকা। ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে; জীবনে কত মানুষেরই সঙ্গে তো দেখা হয়েছে। কিন্তু একদিনের হঠাৎ দেখার অনুভব কখনও এমন করে সারা শরীরটাকে লজ্জা পাইয়ে দেয়নি, মনের গোপনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছাও জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

কিন্তু অবনীশের কাছে তো কোন দাবি জানায়নি অলকা। অবনীশকে এমন আহ্বানও করেনি যে, একদিন আমাদের বাড়িতে যাবেন। অবনীশ নিজেই হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিল। আর অলকাও আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিল, এ কেমন করে সম্ভব? অবনীশ কি অলকার স্বপ্নের ভিতরে লুকানো ইচ্ছাটাকে চোখে দেখে ফেলেছে?

আশ্চর্য হয়েও কিন্তু বিশ্বাস করবার সাহস হয়নি। খুবই সন্দেহ হয়েছিল; খুবই ভয় পেতে হয়েছিল। কেন, কিসের জন্য আর কী দেখে মুগ্ধ হয়ে অলকার মতো মেয়ের কাছে মনের কথা বলতে এসেছে অবনীশ? এত সুন্দর এত ভাল রোজগারের চাকরি করে, আর সাজে-পোষাকেও এমন একজন শখের মানুষ। অলকার মতো মেয়ের কাছে তার মনেরও বা কি দাবি থাকতে পারে? খুবই ভয় হয়েছিল, অবনীশ হয়তো অলকাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে চাইবে। চেনাজানা জগতের কোন এক ভয়ানক অন্তরালে নিয়ে গিয়ে ভয়ানক একটা অনুরোধ করে বসবে। অলকার স্বপ্নটাই আর্তনাদ করে উঠবে; আর দেখতে পাবে অলকা, একটা নির্মম কৌতুক অলকার কাছ থেকে শুধু দুদিনের তৃপ্তি পেতে চাইছে। মনে মনে একটা অপমানের ছবি কল্পনা করে সেদিন অলকার প্রাণটা সত্যিই শিউরে উঠেছিল।

কিন্তু এই ভুল ধারণার জন্যেও কী লজ্জাই না অলকাকে পেতে হয়েছে! কোনদিনও অলকাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়নি অবনীশ। কেউ দেখতে পায়নি, এই ঘরেরই ভিতরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপ করে বসে অলকাকে কেঁদে ফেলতে হয়েছে। অবনীশ যে-কথা বলেছে, তার চেয়ে সম্মানের কথা জীবনে কোন দিনও শুনতে পায়নি অলকা। বলেছিল অবনীশ—তোমার সঙ্গে যদি আর কারও বিয়ে হয়েও যায়, তবুও আমি তোমার উপর রাগ করতে পারবো না।

সত্যি রাগ করে জবাব দিয়েছিল অলকা।—হঠাৎ এরকম একটা সাংঘাতিক বাজে কথা বলে ফেলতে পারলে কেমন করে?

—একটুও বাজে কথা নয়। আমার রাগ হবেই না।

—কেন?

—তোমাকে সত্যি ভালবাসি বলে।

—কোন দুঃখও হবে না বোধহয়?

—সেটা আর তোমাকে বলে লাভ কি? বললেও তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না।

—তখন আমাকে ঘেন্না করতেও পারবে না?

—না।

—তবু নিজে একটা বিয়ে করতে পারবে তো?

—তোমার তাই মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি পারবো না।

—কিন্তু যা কখনও হবে না, তাই নিয়ে এত কল্পনাই বা করছো কেন?

হেসে ফেলেছে অবনীশ—কল্পনা করতে একটুও ভাল লাগে না।

—তবে এসব কথা তুলছো কেন?

—না, আর তুলবো না।—তা হলে এবার দাদাকে স্পষ্ট করে বলে দিই, কেমন?

—কি বলবে ?

—বলবো অলকাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখা ভাল দেখায় না।

অবনীশের এই প্রতিশ্রুতির কথাও তো প্রায় দুবছর আগের কথা। তারপর আরও একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যেও অবনীশ তার দাদার কাছে কথাটা স্পষ্ট করে বলে দিতে পারেনি। এমন ধৈর্য কি করে সম্ভব হয় ?

তাই তো আজ হঠাৎ এক-একবার অলকার ভাবনার এক কোণে ভযানক নির্মম একটা কৌতুকের ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে অলকার মন। অবনীশ কি একটা হেঁয়ালি ? ওর ভালবাসার ভাষাকেও যে সত্যিই হেঁয়ালি বলে মনে হয়। অলকার সঙ্গে আর কারও বিয়ে হবে, এমন একটা অসম্ভব ঘটনাকে কল্পনা করে কী আনন্দ পায় অবনীশ ?

কিন্তু অবনীশকে সন্দেহ করবারও সাধ্যি নেই। সন্দেহ করবার মতো কিছুই যে হয়নি ! অবনীশের অফিসের ঠিকানাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটি চিঠি লিখতে হয়। অবনীশের চিঠি প্রতি সপ্তাহে আসে। অলকার চিঠিগুলি যেমন নিশ্চিন্ত ভালবাসার একটা অপেক্ষার আনন্দ, তেমনি অবনীশের চিঠিগুলিও ভালবাসার অটুট প্রতিশ্রুতি ! লিখেছে অবনীশ, আমি ইচ্ছে করে অনায়াসে মরে যেতে পারি, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, অসম্ভব। আমি তোমাকে কোনদিন অপমান করতে পারবো না।

যেদিন অলকাদের বাড়িতে আসে অবনীশ, সেদিন চলে যাবার আগের মুহূর্তে অলকার মুখের দিকে নিবিড় আগ্রহের একটি দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে একটি কথা খুব মৃদুস্বরে, যেন চিরক্ষণের স্বপ্নে ধরে রাখা একটি অঙ্গীকারের সুরে বলে দিযে যেতে ভুলে যায় না অবনীশ—সামান্য একটা অসুবিধে আছে, সেই জন্যেই দেরি হচ্ছে অলকা। তুমি কিছু মনে করো না।

অলকার মন বলে, হোক দেরি, এমন দেরি অনন্তকাল ধরে চললেও ক্ষতি নেই, যদি তুমি এভাবে এসে আর এই কথা বলে অলকার ভালবাসার মনটাকে সুখী করে আর ধন্য করে দিয়ে চলে যাও।

কী অসুবিধে আছে, সেটা অবশ্য জিজ্ঞাসা করে জানবাব জন্যে কোনদিন জেদ করেনি অলকা। বিশ্বাসও করেছে, নিশ্চয় কোন অসুবিধে আছে। অবনীশ যে জানে, অলকার কাছে মিথ্যে কথা বলবার দরকারই নেই। অলকা যে কতবার বলেই দিয়েছে, তোমার জীবনের কোন অসুবিধে, কোন ক্ষতি, কোন দুশ্চিন্তা ঘটাতে আমি চাই না। সেজন্যে যদি আমাকে চিরকুমারী হয়ে থাকতে হয়, আমি তাতেও রাজি আছি। আমাকে বিয়ে করো না, তবু তুমি সুখী হও।

তবু জানতে ইচ্ছে করে, সত্যি কি অসুবিধে আছে ? একটা অসুবিধের কথা জানাই আছে, কেউ চায় না অবনীশের সঙ্গে অলকার বিয়ে হোক। অবনীশ আর অলকার ভালবাসার উপর যেন এই পৃথিবীর কারও কোন আশীর্বাদ নেই, কোন মায়া নেই, সমাদর নেই। সরযূর বাবা, সরযূর মা আর সরযূ, কেউ খুশি নয়। আরও অনেকের মনের খবর কিছু না কিছু পেয়েই গিয়েছে অলকা, তারাও কেউ খুশি নয়। প্রতিবেশী কান্তিবাবু আর ভবতোষবাবু, যাঁরা অলকার বাবার বন্ধু, তাঁরা খুশি নন। তাঁদের ধারণা, তিন বছর ধরে দেবকীবাবুর মেয়ে একটা ছলনার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক বাধিয়ে বসে আছে।

হাওড়া থেকে অলকার মামা এসেছিলেন। তিনিও যে কথা বলেছেন, সে কথা বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছে অলকা। দেবকীবাবুর কাছে একেবারে গলা খুলে চেঁচিযে কথা বলেছেন মামা—মিথ্যে, মিথ্যে, একেবারে বাজে ব্যাপার। অবনীশকে আমি চিনি, বেশ ভাল ছেলে, কিন্তু তিন বছর ধরে শুধু অপেক্ষা করবার অর্থ এই যে, বিয়ে করতে সে রাজি নয়।

দেবকীবাবু খুবই গম্ভীর হয়ে আর বেশ কঠোরস্বরে কথা বলে আমার সন্দেহকে সমর্থন করেন—আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি। কিন্তু আসল দোষ হলো অলকার। মূর্খ মেয়ে নিজেরই বুদ্ধির ভুলে একটা ব্লাফকে বিশ্বাস করে বসে আছে।

অলকার বুক কেঁপে ওঠে। চোখের সামনের সব কিছুই ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। সত্যিই কি বুদ্ধির ভুল ? অবনীশ একটা বঞ্চনা ?

৩

দেবকীবাবু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁর মেয়ে ভুল করে জীবনের একটা অপমানের আঘাতের সঙ্গে ভালবাসার কাণ্ড করে বসে আছে। অবনীশের মতো ছেলে কেন যে অলকাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের কোন জবাব তিনি অনেক চিন্তা করেও খুঁজে পাননি।

অবনীশের দাদা অনন্তবাবু উকিল মানুষ। কিন্তু তেমন কিছু রোজগেরে উকিল নন। সংসার চালিয়ে যাবার মতো রোজগার আছে, এই মাত্র। বরং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আর বাগবাজারের যে বাড়িতে থাকেন অনন্তবাবু, সেটাও ভাড়া বাড়ি। তা ছাড়া নিজেরই মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকি আছে। সুতরাং, অনন্তবাবুকেও সন্দেহ না করে পারেন না অলকার বাবা, সে ভদ্রলোক কি ভাইয়ের বিয়েতে কিছু টাকা আদায় করবার স্বপ্ন ছেড়ে দিতে পারেন ?

অবনীশ একটি কারখানার ক্যাশ বিভাগের হেড। মাইনে মন্দ নয়। সাত বছরের চাকরিতে চারশো টাকা মাইনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অনন্তবাবু ও তাঁর এই ভাই, আর বাড়ির মেয়েরাও যে স্টাইলে থাকেন, সেটা দেখে মনে হবে, যেন মস্ত বড় এস্টেট আছে এঁদের। পয়সাতে বড়মানুষ নয়, কিন্তু বড়মানুষী চাল-চলন। এঁরা ফাঁকা মানুষ, শূন্য মানুষ। উপরে রঙ, ভিতরে ঘুণ।

অনন্তবাবুর সঙ্গে দেবকীবাবুর দূর সম্পর্কের কুটুম্বিতাও আছে। কাজেই অবনীশ দেবকীবাবুর কাছে একেবারে অচেনা-অজানা জগতের কোন মানুষ নয়। কিন্তু অবনীশের চাল-চলন দেখে অবনীশকে অচেনা-অজানা জগতের মানুষ বলে মনে না করে পারবেন কেন দেবকীবাবু ? দু'হাতে যথেষ্ট পয়সা খরচ করা, তার মানে অপব্যয়ের ছন্নছাড়া আনন্দে ভরা একটা শখের জীবন। জানেন দেবকীবাবু, ট্যাক্সি ছাড়া এক পা হাঁটে না অবনীশ। বছরে একবার করে শিলঙ-আলমোড়া বেড়াতে যাবেই অবনীশ। অবনীশ যখন দেবকীবাবুর এই বাড়ির বারান্দাতে বসে অলকার মার সঙ্গে গল্প করে, তখন অবনীশের জামা-কাপড়ের সুগন্ধ সারা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এক বছরের মধ্যে চার রকমের ঘড়ি অবনীশের হাতে দেখেত পেয়েছে দেবকীবাবু।

দেখতে ভাল লাগেনি , অবনীশকে নিতান্ত লঘু স্বভাবের একটি ছেলে বলে সন্দেহ হয়েছে দেবকীবাবুর। দেবকীবাবুর সাবধানী মন বিশ্বাসও করতে পারেনি যে, এ ধরনের ফ্যাশনবিলাসী ছেলের মনের কোন ইচ্ছের মধ্যে কোন বলিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা থাকতে পারে। অলকার মা অবশ্য মাঝে মাঝে বলেন, না, অবনীশের মনটা খাঁটি ; চালচলনে বিলাসিতা যতই থাকুক না কেন, অলকার জন্যেই অপেক্ষা করছে অবনীশ। তা না হলে, এতদিনে ক্ষিতীশবাবুর মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যেত।

কিন্তু দেবকীবাবুর পক্ষে বিশ্বাক করতে অসুবিধা আছে। তাঁর মনের সবচেয়ে বড় অভিযোগের প্রশ্ন এই যে, তবে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনও আমার কাছে এসে একথা বলতে পারলো না কেন অবনীশ, অলকাকে সে বিয়ে করতে চায়, আর বিয়েটা হয়েই যাক ?

দেবকীবাবু বেশ একটু অপমানিত বোধও করেছেন। এর জন্য অবনীশের বিরুদ্ধে তাঁর যতখানি অভিযোগ, তার চেয়ে বেশি অভিযোগ নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে।

তিন বছর আগে অলকার বিয়ের সব আয়োজন করে ফেলেছিলেন দেবকীবাবু। সে ছেলেও দেবকীবাবুর এক কুটুম্বের ছেলে। দেখতে শুনতে অবনীশের মতো একটা সুন্দরতা আর চমৎকার ফ্যাশন না হলেও হালিসহরের মঙ্গলবাবুর ছেলে সলিল একজন কৃতী ও গুণী ছেলে। মঙ্গলবাবুর কারবারের একমাসের রোজগার অনন্তবাবু আর অবনীশের এক বছরের রোজগারের সমান। সলিলের শুধু একটু বয়স হয়েছে, চল্লিশ বছর। বিয়ে হয়েছিল সলিলের, বিয়ের তিনমাস পরেই স্ত্রী মারা গিয়েছে। এছাড়া সলিলের জীবনের আর কোন খুঁত আছে কি? অলকার মতো মেয়ের পক্ষে সলিলকে কোনদিনই অকাম্য মনে করবার যুক্তি নেই।

হালিসহরের মঙ্গলবাবু তাঁর ছেলের বিয়েতে একটি পয়সাও দাবি করবেন না, করেনও নি। তিনি দেবকীবাবুর মেয়ে অলকার সঙ্গে তাঁর ছেলে সলিলের বিয়ে দিতে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছেন, কারণ অলকাকে তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

কিন্তু অলকা কিছুই বুঝতে রাজি নয়। হালিসহরের মঙ্গলবাবুর মতো সজ্জন মানুষের একটা শুভ সদিচ্ছার আহ্বান অলকাকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। মঙ্গলবাবু নিজেও একদিন এসে অলকার কাছে হেসে হেসে তাঁর ইচ্ছের কথাটা বলে ফেলেছিলেন—তোমার মতো মেয়ে আমাদের আপন জন হলে আমরা খুবই খুশিই হব অলকা।

দেবকীবাবু জানেন, এই মেয়ে ওর বাবার ইচ্ছারও কোন সম্মান দিতে রাজি নয়। মার কাছে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে, ওখানে বিয়ে হতে পারে না।

দেবকীবাবুর এই বাড়িও ভাড়া বাড়ি। জীবনের চল্লিশটি বছর পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করে পার করেছেন। হ্যাঁ, গায়ের রক্ত জল-করা কিছু টাকাও জমিয়েছেন। চারটে পয়সা খরচ করতে তাঁর বুক টনটন করে, এটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু অলকা কি মনে করে, বিনা খরচে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন বলেই হালিসহরের মঙ্গলবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে তিনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন?

মঙ্গলবাবুর ছেলে সলিলের এখনও বিয়ে হয়নি। এখনও অলকা যদি রাজি হয়, তবে দশদিনের মধ্যে সলিলের সঙ্গে অলকার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। এই সেদিনও মঙ্গলবাবুর চিঠি পেয়েছেন দেবকীবাবু, কি খবর দেবকীবাবু? আমরা কি আরও অপেক্ষা করবো?

দেবকীবাবু জানেন অলকার ভুল একদিন নিজেই ভয় পেয়ে চমকে উঠবে আর ভেঙে যাবে। কিন্তু ততো দিন কি অপেক্ষায় থাকবেন মঙ্গলবাবু?

বুঝতে আর কোন কি অসুবিধে আছে, অবনীশ কেন আজও নীরব হয়ে রয়েছে? অনন্তবাবু নীরব কেন? ওরা কি মনে করেছে যে এভাবে অলকাকে ধৈর্যহারা করে দিলে শেষে অলকার বাবা দেবকীবাবু বাধ্য হয়ে থলেভরা বরপণের টাকা আর দানসামগ্রীর বিরাট ফর্দ নিয়ে অনন্তবাবুকে সাধাসাধি করবেন? দেবকীবাবু যে পাগল হয়ে গেলেও হাজার দশ-বারো টাকা খরচ করে মেয়ের বিদেয় দেবেন না, এই কঠিন সত্যটা অনন্তবাবু আর অবনীশের জানা উচিত ছিল।

অলকার মা'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেবকীবাবু তাঁর প্রতিজ্ঞতার অটলতার কথা আজও একবার বলে দিলেন। —অসম্ভব, অবনীশের মনে কিংবা ওর দাদার মনে যদি এরকমের কোন মতলব থেকে থাকে, তবে ওরা পশ্চিমদিকে সূর্য উঠবে বলে আশা করছে।

অলকার মা বেশ ভয়ে ভয়ে একটা যুক্তির কথা তুলতে চান—কিন্তু যেখানেই মেয়ের বিয়ে দাও না কেন, কিছু টাকা খরচ করতেই তো হবে।

—না, পারবো না। এখানে তো আরও পারবো না!

—তার মানে?

মঙ্গলবাবু যদি কিছু বরপণ দাবি করতেন, তবু তার একটা মানে হতো। হয়তো আমি রাজিও হতাম। কিন্তু এখানে রাজি হতে পারি না। এরা কপটতা করবে, ভালবাসার নামে করে একটা চক্রান্ত করবে, সে ফাঁদে পা দিতে আমি রাজি নই। তার চেয়ে ভাল, মেয়েব বিয়েই হবে না।

পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এঘরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠেছে অলকা। দেবকীবাবুব গলার ভয়নাক রুষ্ট স্বরের শব্দ শুনতে পেয়েছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে অলকা।

চেঁচিয়ে উঠলেন দেবকীবাবু।—ছিঃ, এর নাম ভালবাসা? তবে জোচ্চুরি আর কাকে বলে? তিন বছর ধরে মেয়েটাকে আশা দিয়ে দিয়ে হয়রান করেছে একটা চালাক ফাঁকি।

অলকার মা—আস্তে কথা বলো, অলকা শুনতে পাবে।

দেবকীবাবু—আমি যে কৃপণ, সে-কথা কে না জানে? কিন্তু সেজন্যে কি আমি মেয়েব বাপও নই? অবনীশ যে কাণ্ড করেছে, সেটা আমার পক্ষে যে কত অপমানের কথা, সেটুকু বোঝবার মতো মনুষত্ব অবনীশের নেই।

দরজার আড়াল থেকে দেখতে পেয়েছে অলকা, দেবকীবাবুর চোখ দুটো ছলছল কবছে।

অলকার চোখ ভিজে যায়। সারা শরীরটা ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। চেঁচিয়ে বলে দিতে ইচ্ছে করে—তুমি অবনীশের উপর রাগ করো না। ওব কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। আমাকে যত খুশি ঘেন্না করো, সে বেচারাকে ঘেন্না কবো না।

চলে যায় অলকা। আর বাইরের ঘরে ঢুকেই দেখতে পায়, বারান্দায দাঁডিযে আছে অবনীশ।

৪

অলকার মনে আজ একটা প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত হয়েছে। চরম মীমাংসা হয়ে যাওযাই ভাল। ভালবাসার নামে এমন ভয়ানক একটা গ্লানির উৎখাত সৃষ্টি করে রাখবার আব কোন মানে হয় না।

পৃথিবীর মুখে যত শক্ত কথা আছে, সবই মুখব হয়ে অলকাকে যত খুশি গাল-মন্দ করুক, চুপ করে সহ্য করতে পারবে অলকা। কিন্তু অবনীশকে যেন এমন অভিশাপ স্পর্শ করতে না পারে। অবনীশ একটা ফাঁকি, এই ধিক্কাব যেন আর কানে শুনতে না হয়।

অলকা বলে—যদি রাগ না করো, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি!

অবনীশ হাসে—তোমার ওপর রাগ করতে পেরেছি কি কোনদিন?

অলকা—কবে বিয়ে হবে?

অবনীশের দুই চোখ সেই মুহূর্তে যেন সাদা হয়ে যায়।—আমি নিজেই আজ একথা তুলতাম। সেজন্যই আজ এসেছি।

অলকা—বলো।

অবনীশ—বিয়ে হবে না।

—কেন?

—অসুবিধে আছে।

—কিসের অসুবিধে?

—তোমার না জানাই ভাল।

—না, জানতে হবে।

—আমি না বললেও দু'চার দিনের মধ্যে জানতে পারবে।

—তার মানে ?

– তার মানে, আমি গ্রেপ্তার হব। আর জেলও হয়ে যাবে।

—কে বললে ?

—আমি বলছি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি অফিসের প্রায় দশ হাজার টাকা নিজের দরকারে খরচ করে বসেছি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অলকা। —তুমি একাজ করতে পারলে ?

—আমার হাতেই তো সব হিসেব ; তাই কেউ জানতে পারেনি। প্রত্যেক বছর অনেক চেষ্টায় ধার-কর্জ করে দশ হাজার টাকার ঘাটতি পুরিয়ে হিসেব ঠিক করেছি। কিন্তু এবারে আর পারলাম না। আর পারবোও না। আর চেষ্টা করবার সময়ও নেই। কালই আমার সব হিসেবের খাতা অডিট হবে। অডিটার এসে সবার আগে ব্যাঙ্কের বই দেখবেন।

—তারপর কি হবে ?

—আগেই তো বলেছি। গ্রেপ্তার হব আর জেল হবে।

—এই জন্যেই কি এতদিন...।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করো অলকা। এই জন্যেই এতদিন বিয়ের কথা বলতে পারিনি। বিশ্বাস ছিল, দেশের জমি বিক্রী করে হাজার পনেরো টাকা একসঙ্গে পেয়ে যাব আর হিসেবও ঠিক করে ফেলতে পারবো। কিন্তু দেশের জ্ঞাতিরা আপত্তি করে আর মামলা বাধিয়ে জমি বেচতে দিলো না। কাজেই আর কোন উপায় নেই।

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় অবনীশ। তারপরেই চোখ ঢাকতে চেষ্টা করে। চোখ দুটোও যেন ভিজে রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে। —তোমার কাছে ক্ষমা চাই অলকা। তোমার বাবা আর মা যেন ক্ষমা করেন।

অলকা—কেমন করে ক্ষমা করবো বলো ?

অবনীশ—তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে অপমান করতে চাইনি।

অলকা—এখন আমি কি করবো ?

অবনীশ—আমার অনুরোধ শুনবে ?

অলকা—বলো।

অবনীশ—তুমি তোমার বাবার কথা মেনে নাও।

অলকা—তার মানে, মঙ্গলবাবুর ছেলেকে বিয়ে করবো ?

অবনীশ—হ্যাঁ।

অলকা—কেন ? যদি আরও অপেক্ষা করি ?

অবনীশ—না। আমাকে আর বিশ্বাস করো না।

অলকা—ঠিক কথা, তোমার সবই অবিশ্বাস্য। তোমার ভালবাসাও একটি মিথ্যে।

অবনীশ—আমার আর কিছু বলবার নেই। বলবার মুখও নেই।

অলকা—আমারও আর কিছু বলবার নেই।

চলে গেল অবনীশ।

কিন্তু দেখতে পেলেন দেবকীবাবু, চালাক-ফাঁকি অবনীশ কেমন যেন ভয় পেয়ে আর একবারে উপোসী ভিখারীর মতো একটা শুকনো করুণ মুখ নিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে। ট্যাক্সি নেই, অবনীশের পায়ে জরিদার নাগরাও নেই। পায়ে ধুলো-মাখা আর ছেঁড়া-ছেঁড়া চেহারার চটি, গায়ে একটা আধময়লা কামিজ ; অবনীশ যেন একটা কাঙালপনার আতঙ্কিত

মূর্তি হয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই দেখতে পেলেন দেবকীবাবু, টেবিলের উপর মাথা ঠেকিয়ে দিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অলকা।

—অলকা। ডাক দিলেন দেবকীবাবু। তাঁর দু'চোখে নিদারুণ সন্দেহের ছায়া।

অলকা কথা বলে না। চেঁচিয়ে ওঠেন দেবকীবাবু—অবনীশ কেন এসেছিল ? কী বলে গেল ? ওভাবে চোরের মতো ছুটে পালিয়ে গেল কেন অবনীশ ?

অলকা—বিয়ে হবে না।

দেবকীবাবু—এটা তো জানা কথা। কিন্তু কেন হবে না ?

অলকা—ওর জেল হবে।

—কে বললে ?

—নিজেই বললে।

—কি করেছে, যে জন্যে জেল হবে ?

—অফিসের ক্যাশ খরচ করে ফেলেছে। কাল অডিট হবে।

— বেশ তো, আজই টাকা নিয়ে গিয়ে হিসেব ঠিক করে ফেলুক।

—টাকা নেই।

—ধার করুক।

—চেষ্টা করেছিল, ধার পায়নি।

—তা হলে জেলে যাক।

-হ্যাঁ।

—সে কথা তোমাকে জানাবার কি দরকার ছিল ?

—জানি না।

—আর কি বলেছে ?

উত্তর দেয় না অলকা। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন দেবকীবাবু—তোমার লজ্জা করবার কোন মানে হয় না।

অলকা—বলেছে—

—কি ?

—ক্ষমা চেয়েছে।

—কার কাছে ?

—আমার কাছে- -তোমাদের সবারই কাছে।

-আর কি বলেছে ?

উত্তর দেয় না অলকা, দেবকীবাবুর দুই চোখের তারা জ্বলতে শুরু করেছে। দেবকীবাবুর গলার স্বরও এইবার তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে। —কি বলেছে বলো ?

অলকা—অনুরোধ করেছে।

—কিসের অনুরোধ ?

— তোমার ইচ্ছে মেনে নিতে।

—তার মানে ?

—বিয়ে করতে।

—কার সঙ্গে বিয়ে ?

—হালসহরের।

—তুমি কি বলতে চাও, তোমারও তাই ইচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

চমকে ওঠেন দেবকীবাবু। অলকার কাছে এগিয়ে এসে, আর অলকারই মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন।—মন থেকে একথা বলছো?

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। তুমি আমাকে ভয় করে আর নিজেকে ঘেন্না করে একথা বলছো। কিন্তু সবচেয়ে ভুল করবে যদি...।

দেবকীবাবুর চোখ দুটোর চেহারাও হঠাৎ অদ্ভুত হয়ে যায়।—খুব ভুল হবে যদি এমন ধারণা করো যে অবনীশ একটা ফাঁকি।

চমকে উঠে দেবকীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অলকা।

দেবকীবাবু বলেন—অবনীশ বেচারার মনে কোন ফাঁকি নেই। সাবধান, যাই করো, অবনীশকে ভুল বুঝবে না। অবনীশকে ঘেন্না করবে না।

ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দেন দেবকীবাবু—শুনছো?

অলকার মা ব্যস্তভাবে ছুটে আসতেই দেবকীবাবু হেসে ফেলেন—আমার চেক বইটা দাও।

—কেন?

—এখনই একবার বের হতে হবে।

—কোথায় যাবে?

—পাগলা অবনীশকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কেন?

—হাতে হাতে বরপণ ধরিয়ে দিয়ে আসি। তা না হলে তোমার মেয়ে অলকা যে ভাবতেই লজ্জা করবে, ওর বাবাটা কি সাংঘাতিক কিপটে।

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তবে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। এখন তাড়াতাড়ি চেক বইটা এনে দাও।

অমানিশা

ডাক্তার বিভূতিবাবু বলেছেন, না, কোনমতেই না; রাত ন'টার পর আর এক মিনিটও জেগে বসে থাকা উচিত হবে না। চুপচাপ, একেবারে শান্ত হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ঘুম যত বেশি হবে, শরীরের তত বেশি উপকার হবে।

এবাড়ির রোগিণী মেয়ে দেবিকাও জানে, বিভূতি ডাক্তারের নির্দেশ তুচ্ছ করবার মতো শক্তি তার এই রক্তহীন শরীরের হাড়মাংসে নেই। একদিন সত্যিই রাত একটা পর্যন্ত বই পড়েছিল দেবিকা, কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে তিনবার জ্ঞান হারাতে হয়েছিল। একবার শ্বাসকষ্ট হয়ে, একবার বমি করে, আর একবার মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল।

দেবিকার শরীরের এই অবস্থাটা এ বাড়ির প্রাণের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। শুধু বিভূতি ডাক্তার নয়, কলকাতার বড় বড় ডাক্তারও সত্য কথাটা চাপা না দিয়ে মোহিতবাবুকে বলে দিয়েছেন, এখন শুধু নিয়ম আর সাবধানতাই আপনার মেয়ের প্রাণ। একটু এদিক ওদিক হলেই আপনার মেয়ের জীবন বিপন্ন হবে।

একথা দেবিকারও অজানা নয়। পঁচিশ বছর বয়সের শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে অনুমানেও

অনেক কিছুই বুঝে নেওয়া সম্ভব। বুঝে নিতে দেরি হয়নি দেবিকার, বাবা আর মা হেসে-হেসে যা-ই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন, এই সত্যটি বুঝতে একটুকুও অসুবিধে নেই যে, আর দেরি নেই। যেমন দেবিকার সাধের সেতারের তারে মরচে ধরেছে, তেমনই দেবিকার এই শরীরের পাঁজরের হাড়েও মরচে ধরেছে। যে কোন মুহূর্তে ঠুং করে একটি ব্যথার নিঃশ্বাস ছেড়েই দেবিকার রুগ্ন প্রাণের তার ছিঁড়ে যাবে।

দু'বছর আগেও দেবিকার মুখের দিকে তাকালে কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সাধ্য ছিল না, এই মেয়ের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য একটি বছরের মধ্যে একটা করুণ রুগ্নতার চেহারা হয়ে উঠবে। সেই টানা-টানা চোখ দুটির তারার কালো নিবিড়তা ফিকে হয়ে গিয়েছে। গলার শিরাগুলি যেন ছেঁড়া জালের সুতোর মতো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। হাতের কব্জির হাড় কাঠের গাঁটের মতো উঁচু, তাই সোনার সরু বালাটা গড়িয়ে পড়ে না গিয়ে কোনমতে ঠেকে আছে।

মেঘলা দিনে আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পেত এই মেয়ে। যখন সাত বছর বয়স ছিল, তখন থেকেই আকাশের বিদ্যুৎকে বড় ভয় করতো দেবিকা। বিদ্যুৎ চমকালেই মেয়ের বুক চমকে উঠতো, সাদা মুখে রক্তের ঝলকের আভা রাঙা হয়ে ফুটে উঠতো। আজও, এখনও বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দেবিকা। কিন্তু দেবিকার মুখ আর একঝলক রক্তের আভার ছোঁয়া লেগে রাঙা হয়ে ওঠে না। ওই শরীরে যেটুকু রক্ত আজও আছে, সে রক্তের পক্ষে ঝলক দিয়ে উথলে ওঠবার কিংবা মুখ রাঙা করে দেবার শক্তি নেই।

কিসের অসুখ? এই প্রশ্নটার কোন সহজ উত্তর থাকলে দেবিকার বাবা মোহিতবাবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, আর দেবিকার মাও বোধহয় তাঁর আড়ালের কান্নাকাটি একটু কম করে দিতে পারতেন। নানা ডাক্তারের অভিমতে অসুখটা এখন একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ কিসের অসুখ নয়? দেবিকার এই পঁচিশ বছর বয়সের শরীরের সবই যেন ভয়ানক এক অভিশাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ। ডান পাঁজরের একপাশে সব সময় একটা ব্যথা। ক্ষুধা হয় না, সামান্য তাপের জ্বর সব সময় গায়ে লেগে আছে। ঘুম কম। যখন তখন হাঁপ ধরে পিঠে ফিক ব্যথা দেখা দেয়। তাঁর ওপর রক্তাল্পতা, হাত পা প্রায়ই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এইতো সেই মেয়ে, মোহিতবাবুর মেয়ে সেই দেবিকা, যে-মেয়ে কোনদিন রঙিন নখ পালিশ ছোঁয়নি, তবু কলেজের বান্ধবীরা সন্দেহ করতো, দেবিকা রোজই হাতের দশ আঙুলের নখে রঙিন পালিশ লাগায়।

আজ বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসতে হলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কেউ একজন সামনে না থাকলে এতটা নড়াচড়া করতে সাহস করে না দেবিকা। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকাও সম্ভব নয়, ডাক্তারের নিষেধ আছে। তাই চুপ করে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ না মা এসে ঘরে ঢোকেন। তখন উঠে দাঁড়ায় দেবিকা।—আমি এখন বাইরের বারান্দায় একটু বসবো, মা। আমার হাতটা ধর।

এই বারান্দায় বসলে আজও দেখতে পাওয়া যাবে, সামনে ব্যাডমিন্টনের লন। সেই লন এখন জংলী আগাছায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মোহিতবাবুও আজকাল আর মালীটাকে বলেন না যে ব্যাডমিন্টন লনটাকে একটু পরিষ্কার করে রাখুক। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে একবার বলেছিলেন কিন্তু বলতে গিয়ে মোহিতবাবুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। গলার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। আর কী হবে ওই ছাই ব্যাডমিন্টনের লন পরিষ্কার করে? যে মেয়ে দু'বছর আগেও ছুটোছুটি করে হেসে আর চেঁচিয়ে ওই লনে রায়সাহেবের বউ নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছে, সে মেয়ে আজ বারান্দার সিঁড়িতে একটানা দু' মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মোহিতবাবুর বুকের ভিতরে একটা করুণ নিঃশ্বাস যেন কথা বলে ছটফট

করে—আর কি কোনদিনও মেয়েটাকে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখতে পাওয়া যাবে ?

দীপ নিভছে। মোহিতবাবু জানেন, দেবিকার মা জয়াও জানেন, এই অসুখটা একটা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর অসুখ। একটা নামহীন অভিশাপ। কোন ঠিক নেই, যে-কোন মুহূর্তে একটি ভয়ানক ফুৎকার হেনে দীপ নিভিয়ে দেবে। তবু আশা ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় না। দেবিকার আবার সুস্থ হবে ও বেঁচে থাকবে, এটা আশা করা একটা অসম্ভবকে বিশ্বাস করা মাত্র। কিন্তু অনেক সময় অসম্ভবকে তো সম্ভব হতে দেখা গিয়েছে। চারুবাবুর মা, সত্তর বছর বয়সের বুড়ো মানুষটি অসুখে ভুগে ভুগে হাড়সার হয়ে গিয়েছিলেন, এক মাস ধরে যাঁর বুকটা শুধু ধুকধুক করতো, জীবনের আর কোন লক্ষণ ছিল না, সেই মানুষও তো সেরে উঠলো। চারুবাবুর মায়ের হিক্কা দেখে এই বিভূতি ডাক্তারই একেবারে পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন—আর বড়জোর এক ঘন্টা। কিন্তু তারপর, প্রায় সাত মাস পরে এই পাঁচ দিন হলো চারুবাবুর মা কাশী বেড়াতে গিয়েছেন।

তাই আশা ছেড়ে দিতে পারেননি মোহিতবাবু আর জয়া, যদিও আশা করবার মতো কোন কারণ খুঁজে পাননি, কোন লক্ষণও দেখতে পাননি। আলমারির একটা তাক ভরে এক্স-রে প্লেটগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। প্রেসক্রিপসনের ফাইলগুলি আব-একটা তাক ভরে রেখেছে। সেই সঙ্গে এই বাড়ির মন আর প্রাণের উপরেও একটা করুণ আতঙ্কের ভার চেপে রয়েছে।

ঠিক কথা ; শুধু নিয়ম আর সাবধানতা এখন দেবিকার প্রাণ। ওষুধ খেতে হয়, কিন্তু দেবিকার মা জয়া কতবার নিজের চোখে দেখেছেন, ওষুধ খেতে গিয়ে দেবিকার সাদা ও শুকনো ঠোঁটে একটা শীর্ণ হাসির রেখা শিউরে উঠেছে। দেবিকা নিজেও জানে দীপ নিভছে। পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ের মুখের এই হাসি যেন এতদিনের এই জীবনটারই উপর একটা ঠাট্টার হাসি। একটা অভিমানও বটে। অসুখের প্রথম বছরটা দেবিকার চোখে মুখে যে ভয় ঘনিয়ে রেখেছিল, সেই ভয়ের কোন চিহ্ন আজ আর নেই। সেই ভয় আজ একটা ঠাট্টার হাসি হয়ে উঠেছে। দেবিকা জানে, সেই অবধারিত লগ্নটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বিভূতি ডাক্তারের ওষুধ, আর নিয়ম ও সাবধানতা বলতে গেলে একটা মিথ্যের চেষ্টার ব্রত মাত্র।

দেবিকার স্বামী সুমন্ত চৌধুরীও জানে, দীপ নিভছে। সুমন্তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিভূতি ডাক্তার যে-সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে মিথ্যে আশার কোন ছলভাষণ ছিল না। বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবাদী মানুষ, যদিও খুব নরম মনের মানুষ। দেবিকার বাঁচবার আশা নেই, কথাটা সুমন্তকে বলতে গিয়ে বিভূতির ডাক্তারের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠেছিল।

আজ নয়, দেবিকার সঙ্গে সুমন্ত চৌধুরীর বিয়ে হবার প্রায় এক বছর আগেই সত্য কথাটা খোলাখুলি ভাষায় সুমন্তকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার। সুমন্ত বিভূতি ডাক্তারের জেঠতুতো দাদার ছেলে ; সুতরাং সুমন্ত ছেলেটির জীবনের জন্য বিভূতি কাকার মনে একটা মায়ার ভাবও ছিল। বিভূতি ডাক্তার বরং চেষ্টাই করেছিলেন, মোহিতবাবুর মেয়ে দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর যেন বিয়ে না হয়। তাঁর মতে, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। সুমন্তর পক্ষে দেবিকাকে বিয়ে করার অর্থ সুমন্তর জীবনে মিছিমিছি একটা শোকের আঘাত আহ্বান করা।

যেমন বিভূতি ডাক্তারের আপত্তি ছিল, তেমনই দেবিকার বাবা আর মারও আপত্তি ছিল। তাঁরাও বুঝেছিলেন, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত মেয়ের ইচ্ছা আর সুমন্তরও ইচ্ছার কাছে হার মেনে গেলেন।

ত্রিশ বছর বয়সের সুমন্ত চৌধুরীও কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি যে একদিন গিরিডিতে বেড়াতে এসে একটা অদ্ভুত ঘটনার মায়ায় পড়তে হবে, আর মোহিতবাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলতে হবে। মোহিতবাবুর সঙ্গেও সুমন্ত চৌধুরীর একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে।

মোহিতবাবুর স্ত্রী জয়া হলেন সুমন্তর লক্ষ্মী মামীর দিদি। লক্ষ্মীমামীকে গিরিডিতে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সুমন্ত। দুটো দিন গিরিডির বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। তারপর আবার নিজের কাজেব জায়গায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

জায়গাটা হলো সিজুয়া কলিয়ারি, গিরিডি যেতে বেশি সময় লাগে না। সিজুয়া কলিয়াবিব ম্যানেজার সুমন্ত চৌধুরী কিন্তু সিজুয়াতে ফিরে এসেও দুদিনের গিরিডিব জীবনের স্মৃতিটাকে ভুলে যেতে পারেনি। সব সময় মনে পড়েছে, লক্ষ্মীমামীর দিদিব মেয়ে দেবিকা এখন সেই রঙিন আলোয়ানটি গায়ে জড়িয়ে, বারান্দার চেয়ারে বসে সামনের লনের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি ডাকছে, লনের জংলী আগাছার উপর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, চারদিকে সকালবেলার রোদ ঝলমল করছে; আর দেবিকার চোখের কালো তারা দুটো যেন করুণ বিষাদে সাদা হয়ে গিয়ে একটি আসন্ন অস্তিমের পায়ের শব্দ শুনছে।

দেবিকাকে দেখলে একটা সাদা মোমের পুতুল বলে মনে হয়। কিন্তু কী সুন্দর মুখটা। সেই রক্তহীন সাদা মুখেও যেন অদ্ভুত এক মায়ার প্রলেপ মাখানো আছে। প্রথম আলাপের পরেই একটি কথা বলেছিল দেবিকা, যদি সময় আর সুযোগ পান আর যদি ইচ্ছে থাকে, তবে মাঝে মাঝে আসবেন।

এই সামান্য অনুরোধের ভাষাটা সত্যিই ক্ষণিকের রক্তচ্ছটা হয়ে দেবিকাব মুখ রাঙা কবে দিয়েছিল। সেদিন বিভূতি ডাক্তারও দেবিকাকে দেখতে এসে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কী ব্যাপার, দেবিকার চেহারা এই একদিনের মধ্যে এত ভাল হয়ে গেল কি করে? মুখটি তো খুবই লালচে দেখাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। রক্তাল্পতায় সাদাটে হয়ে গিয়েছে যে মেয়ের মুখ, সেই মেয়ের মুখে যেন রক্তাভ স্বাস্থ্যের সঞ্চার দেখতে পেয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার; তাই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

সিজুয়া কলিয়ারি থেকে গিরিডি পৌঁছতে তিন ঘন্টাও সময় লাগে না। তাই, প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার গিরিডি এসেছে সুমন্ত।

মোহিতবাবু আর জয়ারও বুঝতে দেরি হয়নি, কেন আসে সুমন্ত। কিন্তু খুশি না হয়ে বরং বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন। ঘটনাকে তাঁদের মেয়ের জীবনে নিয়তির একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলেও মনে করেছিলেন। শুধু নিজেদের মেয়ের জন্য নয়, সুমন্তর কথাটাও তাঁরা ভেবেছিলেন। ছেলেটা কেন এই ভুল করছে? দেবিকার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক নিবিড় করে তুলে কী লাভ হবে সুমন্তর? দেবিকাকে তো বিয়ে করতে পাববে না সুমন্ত। দেবিকাও সুমন্তকে বিয়ে করতে চাইবে না।

কিন্তু মোহিতবাবু আর জয়া দুজনেই একদিন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন, সুমন্ত সতিাই দেবিকাকে বিয়ে করতে চায়। কথাটা বলেছিলেন বিভূতি ডাক্তার।

হ্যাঁ, সব জেনেশুনেই দেবিকাকে বিয়ে করতে চাইছে সুমন্ত। দেবিকার প্রাণটা যে একটা নিবু-নিবু দীপের প্রাণ, জেনেও সুমন্তর কোন আপত্তি নেই।

মেয়েকেও একেবারে স্পষ্ট করে প্রশ্ন করেছিলেন মোহিতবাবু, তোমারও কি এই ইচ্ছে? হ্যাঁ, বলে দিতে একটুও দেরি করেনি দেবিকা।

—কিন্তু ভেবে দেখ। এ বিয়ের কোন মানে হয় না।

দেবিকা—সব ভেবে দেখেছি বলেই বলছি, তোমরা আপত্তি করো না।

সবই ভেবেছিল সুমন্ত আর দেবিকা, দুজনেই। সত্যি কথা, খুব বেশি করে ভাবলে বুঝতে অসুবিধে থাকে না যে, এ বিয়ের সত্যিই সে-রকম কোন মানে হয় না, যে-রকম মানে পৃথিবীর অন্য দুটি নরনারীর বিয়েতে থাকে। সুমন্তের জীবনে দেবিকা শুধু নামেই স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জীবনের দরকারে হতে পারে না। সে সামর্থ্য ও শক্তি দেবিকার এই রুগ্ন জীর্ণ ও ভঙ্গুর

শরীরে নেই। কিন্তু সেজন্য একটুও ব্যথিত নয় সুমন্ত। সুমন্তর ভালবাসায় সেই দুঃসাহস আছে, দেবিকার শুধু হাত ধরেই ধন্য হয়ে আর সুখি হয়ে থকতে পারবে সুমন্ত।

সুমন্তকেও একটা কথা বলে দিতে দেবিকার এই রোগার্ত বুকের নিশ্বাসেও একটুও অসুবিধে ঠেকেনি।—আমি তো নিভে যেতেই চলেছি, দিনও ফুরিয়ে আসছে। আমি তোমাকে শেষে একটা দুঃখ দিয়ে চলে যাব। কিন্তু তুমি সে দুঃখ ভুলে যেও।

সুমন্ত—তার মানে ?

দেবিকা—তুমি আবার বিয়ে করো।

সুমন্ত হাসে—বাজে কথা।

বাজে কথা বটে। কিন্তু সুমন্ত আর দেবিকা দুজনেরই মনের মধ্যে কোন কপটতা নেই। অস্বীকার করবার উপায় নেই, সুমন্তর জীবনটা হঠাৎ একদিন একলা হয়ে যাবে , গিরিডির এই বাড়িতে এসে এই বারান্দার এই চেয়াবে দেবিকাকে আব দেখতে পাওযা যাবে না।' বিভূতি ডাক্তার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, বড জোব আর এক বছর। সুমন্তব ভালবাসার প্রাণটাও যেন নীরবে চিৎকাব করে বলে উঠেছে, এক মাস হলেই বা কি ?

দু'বছব আগে ঠিক যখন এম-এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল দেবিকা, তখনই এই অদ্ভুত অসুখের অভিশাপ দেখা দিয়েছিল। আর পড়তে পারেনি, পরীক্ষাও দিতে পারেনি দেবিকা। বাযসাহেবের বউ নমিতা আরও কতবার এসেছে, কিন্তু আর ব্যাডমিন্টন খেলবার সৌভাগ্য হয়নি। শুধু ওষুধ নিয়ম আর সাবধানতা নিয়ে রুগ্ন শরীরটাকে কোনমতে ধরে রেখে এই পৃথিবীর আলো-ছায়ার কাছ থেকে চরম বিদায় নেবার জন্যই তৈরি হয়েছিল যে মেয়ে, সেই মেয়েরই সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে হয়ে গেল।

পুরো এক বছরও পার হয়নি, যে বিয়ের কোন মানে হয় না, সেই বিয়ে গিরিডির এই বাড়িতেই হয়ে গিয়েছে। বিয়েতে সুমন্তর দুই দাদা এসেছিলেন। তাঁরা কেউই প্রসন্ন হননি। শুধু একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থেকে আর গম্ভীর হয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। বিভূতি কাকাও খুশি হননি। মোহিতবাবু আর জয়া তাঁদের মেয়ের মুখের হাসি দেখে হেসেছিলেন বটে, কিন্তু আড়ালে গিয়ে চোখও মুছে ছিলেন।

গিরিডির এ বাড়ির জীবনের সমস্যা বলতে সত্যিই কিছু ছিল না। ছিল শুধু একটা বিষণ্ণ করুণ উদ্বেগ। দেবিকার এই রুগ্ন প্রাণের সব সাড়া যে-কোন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, সুস্থ হয়ে উঠবার কোন লক্ষণও নেই। একটা শোকের আঘাত মাথা পেতে স্বীকার করবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন মোহিতবাবু আর জয়া। কিন্তু বিয়ের পর সত্যিই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে ; তাই ভয় পেয়ে আরও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছেন দেবিকার বাবা আর মা। বড় কঠিন, বড়ই নিষ্ঠুর, আবার খুব করুণও বটে, এই সমস্যা।

সুমন্ত মাসের যে-কটা দিন তার সিজুয়া কোলিয়ারির কাজের জীবনে ব্যস্ত থাকে, সে-কটা দিন গিরিডির এই বাড়ির ভয়টাও যেন আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। বরং, মাঝে মাঝে বেশ খুশি হয়ে হাসতে পারেন মোহিতবাবু, যখন দেখতে পান যে, সুমন্তকে চিঠি লিখছে দেবিকা, আর দেবিকার সারা মুখ ভরে একটা রঙিন আলোর হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবক্তা ; তামর ভাষার মধ্যেও কোন রাখা-ঢাকা চাপাচাপির ব্যাপার নেই। বিভূতি ডাক্তার আবার বলেছেন—বিয়ে হলো, এক রকম ভালোই হলো। কিন্তু আরও একটু সাবধান থাকতে হবে মোহিতবাবু।

—আপনি যা নিয়ম করে দিয়েছেন, তা তো সবই...

—সে-সব ছাড়াও একটা সাবধানতা দরকার।

—বলুন কি করতে হবে ?

—কথাটা হলো, দেবিকার যদি ছেলেপুলে হয়, তবে কিন্তু সর্বনাশের ব্যাপার হবে। তা হলো আর দুটো মাসও বেঁচে থাকবার কোন আশা থাকবে না।

কিন্তু এই ভয়ানক করুণ সত্যটা কি সুমন্তর অজানা আছে ? বিভূতি ডাক্তার বলেন, তিনি সুমন্তকে একেবারে খোলা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে দেবিকা কি জানে না ? বিভূতি ডাক্তার বলেছেন, নিজেই দেবিকাকে কথাটা বলে দিয়েছে সুমন্ত। কাজেই এখন ব্যাপাবটা আব কাবও জানা-অজানা সমস্যাব কথা নয়। এখন এ বাড়ির প্রাণের ভয় শুধু এই যে, যেন ভুল না হয়।

শিক্ষিত ছেলে সুমন্ত এমন নিদারুণ ভুল করবেই বা কেন ? শিক্ষিতা মেয়ে দেবিকাব পক্ষেও এমন সাংঘাতিক অসতর্কতা সম্ভব নয়। ওরা দুজনের কেউই অবুঝ নয়। মোহিতবাবু আর জয়া মাঝে মাঝে বিশ্বাস করেন, না ওরা ভুল করবে না।

সুমন্তর লক্ষ্মীমামী একদিন এসেছিলেন, তিনি নিজেও অনেক করে সুমন্তর চিঠি খুঁজে বেব করে নিয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মীমামী তাঁর জয়াদিকেও চিঠির কথাগুলি শুনিয়ে দিয়েছেন। শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন জয়া। না, এত ভয় করবার কিছু নেই। সুমন্ত তো দেবিকার কাছে লেখা চিঠিতে একেবারে স্পষ্ট করে লিখেছে, বিভূতিকাকা মিথ্যে ভয় করছেন। আমাকে আব তোমাকে বোধহয় দুটো পাগল বলে সন্দেহ করেছেন।

সুমন্ত নিজেই নিয়ম করে নিয়েছে, প্রতি মাসে অন্তত দুটি-তিনটি দিনেব জন্য গিবিডিতে এসে থাকে আর চলে যায় সুমন্ত।. এই দুটি-তিনটি দিন গিরিডিব এই বাড়িব বিষণ্ণ প্রাণেও একটা খুশির সাড়া জেগে ওঠে।

আবার মাঝে মাঝে সিজুয়া কোলিযারিব অফিসে গিরিডির টেলিফোনের একটা উদ্বেগেব আহ্বানও ক্রিং-ক্রিং করে বেজে ওঠে। দেবিকার শরীর ভাল নয়, লক্ষণ খাবাপ। যদি সম্ভব হয়, তবে তাড়াতাডি চলে এস।

এসেই দেখতে পেয়েছে সুমন্ত, জ্ঞান হারিয়ে আর অসাড় হয়ে শুয়ে আছে দেবিকা। খোঁপাটা ভেঙে গিয়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শুকনো শীর্ণ হাত দুটো দুপাশে এলিয়ে পড়েছে। বিভূতিডাক্তার ঘরের ভিতরে চেয়ারে বসে আছেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দেবিকার বিছানার মাথার কাছে বসেছে সুমন্ত। একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না, দেবিকার মাথায় আর কপালে আস্তে আস্তে হাত বোলায়, মাঝে মাঝে দেবিকাব একটা হাত ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

সুমন্ত যেন নিবু-নিবু দীপের সবচেয়ে বড় কামনার তৃপ্তিটি পূর্ণ করে দিয়ে বসে থাকে। এই তো চেয়েছিল দেবিকা। এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করা তো দেবিকার রুগ্ন প্রাণের আব দেহের সামর্থ্যে সম্ভব নয়। একদিকে মৃত্যুর হাত, আর একদিকে সুমন্তের হাত, দেবিকাব প্রাণ যে এইরকম একটি অভ্যর্থনা নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে।

কিন্তু অন্যদিন, যেদিন দেবিকার অসুখের এরকম কোন বাড়াবাড়ি থাকে না, সেদিন সুমন্তকে কাছে দেখতে পেলে দেবিকা যেন ভুলেই যায় যে, দীপ নিভছে।

সুমন্ত আসে, সেদিন সময় মতো ওষুধ খেতে ভুলে যায় দেবিকা। বেশি কথা বলতে নিষেধ আছে কিন্তু ভিতরের ঘরে বসে একটানা একটি ঘন্টা ধরে গল্প করেও যেন ক্লান্ত হতে বা থামতে চায় না। স্নানের সময় পার হয়ে যায়, দেবিকা তবু সুমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দেবিকা হাসে—এবার এসেও আমাকে দেখতে পেলে কিন্তু আসছে মাসে কি দেখতে পাবে ?

সুমন্ত হাসে, কিন্তু হাসিটা যেন একটা চাপা বেদনার করুণ হাসি—তা, আশা করতেই হবে,

দেখতে পাবো।

দেবিকা—আমার ভাবতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়, তুমি একদিন এখানে এসে আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার জন্যে কান্নাকাটি করো না।

সুমন্ত—চুপ করো।

দেবিকা হাসতে চেষ্টা করে—সত্যিই, এছাড়া আমার আর কোন দুঃখ নেই।

সুমন্তর চোখ দুটোও যেন আসন্ন সেই শূন্যতার দিনটার রূপ দেখতে পেয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘরের এই সব ছবি, ওই ফুলের টব, সবই সেদিন থাকবে। শুধু থাকবে না দেবিকা। দেবিকাকে সারা জীবনে এই পৃথিবীর কোন আলোছায়ার কাছে দেখতে পাওয়া যাবে না। তবু এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা এই যে...।

সুমন্তর মনের কথাটা দেবিকারই হাসি-ভরা কথার ভাষাতে যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে। দেবিকা বলে—তবু সুখের মরণই বলতে হবে। তোমার স্ত্রী হতে পেরেছি, এই তৃপ্তি নিয়ে সুখেই মরতে পারবো।—তারপরেই মুখ টিপে যেন আরও একটা খুশির হাসি হাসতে থাকে দেবিকা—তখন তোমারও মুক্তি।

সুমন্ত বলে—সাংঘাতিক মুক্তি। যাক্, ওসব কথা না তুললেই ভাল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গিরিডির এ-বাড়ির প্রাণের উদ্বেগটাও যেন মিথ্যে হয়ে কোথাও সরে থাকে। মোহিতবাবু হেসে-হেসে সুমন্তর সঙ্গে গল্প করেন। জয়াও মাঝে মাঝে এসে সুমন্ত আর দেবিকার কাছে বসে গল্প করে চলে যান।

যখন রাত হয়, রাত নটা পার হয়েও ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে পৌঁছে যায, তখন একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া। মোহিতবাবুও মাঝে মাঝে উপরতলার ঘর থেকে নীচে নেমে এসে বারান্দায় পায়চারি করতে থাকেন। সুমন্ত যখন দেবিকার হাত ছেড়ে দিয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে উপরতলার ঘরেব দিকে চলে যায়, তখন নিশ্চিন্ত হন মোহিতবাবু, নিশ্চিন্ত হন জয়া।

অনেকদিন পর আবার লক্ষ্মীমামী গিরিডির বাড়িতে এসেছেন। সুমন্তও এসেছে। বাড়ির সবারই মনেও পড়ে গিয়েছে, দেবিকা আর সুমন্তের বিয়ের একটি বছর পূর্ণ হলো। এই এক বছরের মধ্যে দেবিকার শরীরের কোন উন্নতি হয়নি। কিন্তু কোন অবনতি হয়েছে বলেও বিভূতিডাক্তারও মনে করেন না।

লক্ষ্মীমামী বলেন—ভগবানের দয়া।

কিন্তু দেবিকা নিজেই ঠাট্টা করে হেসে ওঠে—ভগবান যদি আরও বেশি দয়া করেন, তবে একজনের ওপর খুবই অবিচার করা হবে।

লক্ষ্মীমামী—বুঝলাম না।

দেবিকা—আধমারা ফিঙ্গের মতো এভাবে ধড়ফড় করে আর ধুকধুক করে যদি আরও ক'বছর বেঁচে থাকি, তবে তোমার ভাগ্নে বেচারার কি দশা হবে?

—কি হবে?

—বুঝে দেখ, কি বলছি।

চমকে ওঠেন লক্ষ্মীমামী। দেবিকার এই ঠাট্টার কথাটা যে ভয়ানক একটা বাস্তব সত্যের বজ্রধ্বনি। বেচারা সুমন্তের জীবনটা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে মানে ক'দিনের একটা মায়ার বন্ধন স্বীকার করা মাত্র। সকলেরই জানা আছে, সে বন্ধন শিগগিরই ক্ষয় করে দেবার জন্য দেবিকার প্রাণের শিয়রে যমের ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সুমন্তর জীবনটা তো সব আশা আর পিপাসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবে। দেবিকা যে

সুমন্তর যত সাধ আর সখের, স্বাস্থ্যের আর বয়সের কাছে একটা বঞ্চনা। এমন বঞ্চনা চিরস্থায়ী হবে না জেনেই তো সুমন্তর সঙ্গে দেবিকার বিয়ে হয়েছে।

লক্ষ্মীমামী আর কথা বাড়িয়ে তুলতে চান না।

এমন বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবার দিনটিতে কীই বা উৎসব হতে পারে? তেমন কিছুই হলো না। লক্ষ্মীমামী শুধু দুটো ফুলদানীতে দুটো টাটকা ফুলেব তোড়া বসিয়ে দিয়ে দেবিকাব ঘরে রেখে গেলেন।

সন্ধ্যা পার হয়। আর রাতটাও জ্যোৎস্নায় ভরে যায়। একবছর আগের রাতেও এইরকম একটা আলোমাখানো উতলা ভাব ছিল। মোহিত দত্তের এই বাড়ির বাগানের সব লতাপাতা ফুরফুরে হাওয়াতে সে-রাতে যেরকম দুলেছিল, আজও ঠিক সেইরকম দুলছে।

রাত দশটা পার হয়ে যাবার পরেও দেবিকার ঘরের ভিতরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করছে সুমন্ত। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলে। এটাই নিয়ম। তবু একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া।—তমি সুমন্তকে ডেকে একটু বলে দাও লক্ষ্মী, যেন আর বেশি গল্প না করে।

লক্ষ্মীমামী ডাক দেন—এবার তুমি ওপরে যাও, সুমন্ত।

—এখনই যাচ্ছি। উত্তর দেয় সুমন্ত। কিন্তু বুঝতে পাবেন লক্ষ্মীমামী, তবু দেবিকার সঙ্গে গল্প করেই চলেছে সুমন্ত।

জয়া বলেন—রাত এগারটা যে পার হতে বসলো লক্ষ্মী। আর তো এসব ভাল দেখায় না।

—কি বললে?

—আমার সত্যিই ভয় করছে লক্ষ্মী।

—ভয়?

—হ্যাঁ। তুমি সুমন্তকে আর একবার ডাক দাও, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীমামী ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে, আর দেবিকার ঘরের দরজাব কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে গিয়েই চমকে ওঠেন। সুমন্তর একটা হাত ধরে রেখেছে দেবিকা। দেবিকার মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু মেয়েটার চোখ দুটো যেন কথা বলছে।

সুমন্তর চোখেও কী অদ্ভুত চাহনি। দেবিকার চোখেও ওই ভয়ানক ব্যাকুলতাকে শান্ত করার জন্য সুমন্তের চোখের দৃষ্টিটা ছটফট কবছে। দেবিকা বলছে—আজ আব ওপবে যেও না।

সুমন্ত বলছে—আমারও আজ আর ওপরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

মরণভয় নেই মেয়েটার? আর সুমন্তই বা কী ভয়ানক অবুঝ মনের ছেলে। এত রাতে, এভাবে, এমন করে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে যে দেবিকার শিয়বের মৃত্যু মুখ টিপে হেসে ফেলবে। মেয়েটাও কি ভুলে গেছে যে, ওর হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ, ওর ডান পাঁজরের একপাশে সাংঘাতিক একটা ব্যথা আছে। বিভূতিডাক্তার এত স্পষ্ট করে যে-কথাটা বলে দিয়েছেন, সে-কথা ভুলে যাবার জন্যেই কি ওরা দুজন আজ পাগল হয়ে উঠলো?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়। জেগে উঠেছেন মোহিতবাবু। বোধহয় জয়া নিজেই গিয়ে আর আতঙ্কিত হয়ে মোহিতবাবুকে জাগিয়েছেন।

লক্ষ্মীমামীর আতঙ্কিত প্রাণটাও আর নীরব হয়ে থাকতে পারে না। চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে ফেলেন লক্ষ্মীমামী—ও সুমন্ত, আর রাত করো না। ছিঃ, দেবিকার শরীরের কথাটা তো একবার ভেবে দেখতে হয়।

—যাচ্ছি মামী। ব্যস্তভাবে সাড়া দেয় সুমন্ত।

ঘর ছেড়ে চলে যায় সুমন্ত। দেখতে পান লক্ষ্মীমামী, দেবিকার চোখ দুটো ছলছল করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেবিকার দুই চোখের ঘন ভুরু দুটো যেন আহত সাপের শরীরের মতো কুঁচকে পাকিয়ে কাঁপছে।

আজ না হয় লক্ষ্মীমামী ছিলেন তাই এ বাড়ির প্রাণ একটা বিপদের ভয় থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু তারপর? তারপর যতবারই সুমন্ত এবাড়িতে এসেছে, এ বাড়ির মন আতঙ্কে ভরে গিয়েছে। একদিন এমন ঘটনাও চোখে দেখতে হয়েছে, দেবিকা নিজেই মাঝরাতে ঘরের বাইরে এসে উপর তলায় যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। জয়া বলেন—একি কাণ্ড!

দেবিকা বলে—কিছুতেই ঘুম আসছে না, মা।

মোহিতবাবু দেখেছেন, অনেক রাতে নীচের তলায় নেমে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে আছে সুমন্ত। মোহিতবাবু ভয় পেয়েছেন, বিপন্ন বোধ করেছেন আর করুণস্বরে সুমন্তকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছেন।—দুঃখ করো না, সুমন্ত। এখনও ভোর হতে অনেক দেরি, এবার শুতে যাও।

জয়া মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর কাছে এসে ফুঁপিয়ে উঠেছেন—এমন বিয়ে না হলেই তো ভাল ছিল। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

কিন্তু বিভূতিডাক্তার স্পষ্টবক্তা; আবার সাবধান করে দিয়েছেন। সাবধান, যতই দুঃখের ব্যাপার হোক, এমন ভুল করতে দেবেন না।

২

বিভূতিডাক্তার সবচেয়ে বেশি খুশি। ছ'মাসের মধ্যে দেবিকার অসুখের অনেক খারাপ লক্ষণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দশ পাউন্ড ওজন বেড়েছে দেবিকার। মাথা ঘোরা আর নেই। পাঁজরের ব্যথাটাও খুব কম।

তবে কি সত্যিই সেরে উঠবে দেবিকা? বিভূতিডাক্তার বলেন—এখন আমি জোর করে বলতে পারি, আশা আছে।

মিথ্যে বলেননি বিভূতিডাক্তার। সত্যিই এক-একটা মাসে দেবিকার এই জীর্ণ শীর্ণ ও ভঙ্গুর শরীরটার উপর যেন একটা অভাবিত আকস্মিকের করুণা ঝরে পড়ছে। লালচে হয়ে উঠেছে দেবিকার সাদা ঠোঁট। খাবারের পরিমাণ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। লনের চারদিকে একবার ঘুরে বেড়ালে হাঁপ ধরে না।

রায়সাহেবের বউ নমিতা এসে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।—আমি এখন চেঁচিয়ে বলতে পারি দেবি, আবার আমি তোমার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলবো।

সুমন্ত আসে। কিন্তু সুমন্তর চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের নিবিড়তা টলমল করে। দেবিকার হাত ধরতে গিয়েই সুমন্তর হাতটা যেন একটা প্রাণময় কোমলতার স্বাদ পেয়ে চমকে উঠেছে। দেবিকার হাতের সরু বালা দুটো আর কব্জির গাঁটের কাছে ঢলঢল করে না। হাড়সার সেই হাত দুটো বেশ সুডোল হয়ে উঠেছে। সত্যিই তো, এটা যে একটা আশাতীত ঘটনা।

আরও ছ'টা মাস পার হতেই গিরিডির এই বাড়ির জীবনে চার বছর আগের সুস্থ সুখী হাসির কলনাদ আবার বেজে ওঠে। নমিতা এসেছে, নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছে দেবিকা, পনের মিনিট খেলার পরও হাঁপিয়ে পড়েনি।

যে সেতারের তার মরচে ধরেছিল, সেই সেতারে নতুন তার পরানো হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা

একবার সেতার বাজাতে ভুলে যায় না দেবিকা। মোহিতবাবু বলেছেন, এবার পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হলেই তো ভাল হয় দেবি।

দেবিকা বলে—হ্যাঁ, পরীক্ষা দেবো।

সুমন্তর একটা চিঠিতেও নতুন একটা অনুরোধের কথা যেন নতুন আশার গুঞ্জন তুলে দেবিকাকে নিশ্চিন্ত করে দেয়।—হ্যাঁ, তুমি এখন এম-এ পরীক্ষাটা দেবার জন্যেই তৈরি হও। আমি কিছুদিন নতুন কাজে ব্যস্ত থাকবো। কাজেই অন্তত তিন মাসের মধ্যে গিরিডি যাবার সুযোগ হয়ে উঠবে না। যাই হোক, তোমারই সুবিধে হবে। তোমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে না। আমি থাকলেই তো যত ব্যাঘাত আর উৎপাত। আশা করি, এখন আরও ভাল আছ।

দেবিকা জবাব দেয়।—তবু বলছি, যতই ব্যাঘাত আর উৎপাত হও না কেন, তিন মাসের পর কিন্তু আর দেরি করো না।

তিন মাসের মধ্যে একদিন হঠাৎ উৎপাতের মতো দেখা দিয়েছে সুমন্ত। সুমন্তর গাড়িটা এসে শুধু দুটি ঘণ্টার মতো গিরিডির এবাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কাজের দরকারে মধুপুর যেতে হবে। তাই এসেছে সুমন্ত।

খুব ব্যস্ত সুমন্ত। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়েও চেয়ারে বসতে চায় না সুমন্ত। ঘরের ভিতরে ঘুরে ফিরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করে আর চা খায়। দেবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার হাসতে থাকে সুমন্ত। সুমন্তের পক্ষে দেবিকার এই সুন্দর চেহারাটাকে দেখতে পাওয়া যে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। যে বাড়িতে এসে একদিন দুঃসহ একটা শূন্যতাকে দেখে ফিরে যেতে হবে বলে মনে করেছিল সুমন্ত, সে বাড়িতে দেবিকা আজ যেন একটি পূর্ণ অভ্যর্থনা হয়ে সুমন্তর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমন মোহিতবাবু তেমনই জয়া, দুজনেই একটু বিস্মিত হলেন। সুমন্ত এল, কিন্তু একটি ঘণ্টাও থাকতে পারলো না। মধুপুর চলে গেল। কে জানে সুমন্তকে আজ এত ব্যস্ত করে তুলেছে কিসের জরুরী কাজ! এ বাড়ির এই ঘরের একটা চেয়ারেও কিছুক্ষণের জন্য বসে থাকতে পারলো না? সত্যিই সুমন্তর এই তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার মধ্যে যেন একটা উদ্বেগও আছে। সুমন্তর গাড়িটাও এত জোর স্পীড নিয়ে চলে গেল যে, দেখলে মনে হবে, ছুটে পালিয়ে গেল গাড়িটা।

দেবিকাও ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে, চলে যাচ্ছে সুমন্ত। কিন্তু সেজন্য দেবিকার চোখে কোন করুণতা আর কাতরতা নেই। হাসছে দেবিকার চোখ। আজ আর দেবিকার চোখের তারাতে সেই সাদাটে বিষাদের কোন চিহ্নও নেই। ঘন কালো চোখের তারা দুটো হাসতে গিয়ে আরও কালো হয়ে কাঁপছে আর দেখছে। আজ আর সুমন্তর দিকে তাকিয়ে দেবিকার চোখের চাহনিটার ব্যথিত হবার কোন দরকার হয় না। কারণ কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

এম-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরি হতে হবে। কিন্তু বিভূতি ডাক্তার বললেন, এখন কিছুদিনের জন্যে ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে থাকলে দেবিকার স্বাস্থ্যের সবচেয়ে ভাল উপকার হবে। পরীক্ষা এখন থাকুক।

সুমন্ত চৌধুরী শুধু দেবিকার চিঠিতে জানতে পারে, ওয়াল্টেয়ারে চলে গিয়েছে দেবিকা, সঙ্গে গিয়েছেন দেবিকার মা। গিরিডির বাড়িতে এখন শুধু মোহিতবাবু আছেন। অন্তত তিনটে মাস ওয়াল্টেয়ারে থাকবে দেবিকা।

কিন্তু চিঠিতে একথাটা লিখতে পারেনি দেবিকা, বোধ হয় লিখতে ভুলেই গিয়েছে যে, তুমিও একবার ওয়াল্টেয়ারে এস। তবু সুমন্তর মনে কোন অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। বরং

মনে হয়, এরকম তাগিদ না করে ভালই করেছে দেবিকা। সুমন্তর কাজের চাপ যে এখন আরও বেড়েছে। তাছাড়া খনির মেশিনারি কিনতে দুমাসের জন্য ইউরোপে যাবার কথাও উঠেছে। ইচ্ছে থাকলেও এখন ওয়াল্টেয়ারে যাওয়া সুমন্ত চৌধুরীর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ঝরিয়ার মণিবাবুর অনুরোধের চাপে পড়ে পনের দিনের জন্যে দার্জিলিং বেড়াতে যেতেই হয়। আর দার্জিলিংয়ে এসেও ওয়াল্টেয়ারে দেবিকার কাছে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যায় সুমন্ত।

শুধু মোহিতবাবু খবর রাখেন, সুমন্ত এখন দার্জিলিংয়ে আছে। শুধু মোহিতবাবুই চিন্তা করেন, দার্জিলিংয়ে না গিয়ে সুমন্ত এখন একবার ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে দেবিকাকে দেখে এলেই তো ভাল করতো। আজ তো সুমন্তর পক্ষে সবচেয়ে বেশি খুশি হবার কথা, দেবিকা সেরে উঠেছে। এমন সৌভাগ্য তো কোনদিনও আশা করতে সাহস করেনি সুমন্ত।

ওয়াল্টেয়ার থেকে দেবিকা গিরিডিতে ফিরে আসবার পর মোহিতবাবু দেবিকার কাণ্ড দেখেও একটু আশ্চর্য হন। সুমন্ত এখন গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাচ্ছে না, সময় করতে পারছে না, এর জন্য দেবিকার মনে যেন কোন আক্ষেপ আর কোন অভিযোগ নেই। সন্দেহ করেন মোহিতবাবু, সুমন্তকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠিও লেখে কিনা দেবিকা।

জয়া জিজ্ঞেস করে, সুমন্ত কবে আসবে ?

দেবিকা হেসে হেসেই জবাব দেয়—সময় করতে পারলেই আসবে।

বিভূতি ডাক্তার আবার স্পষ্ট ভাষায় মোহিতবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন, না, আর ভয় করবার কিছু নেই। দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কথাটা বলতে গিয়ে বিভূতি ডাক্তারের গলার স্বরে খুশির উল্লাস বেজে ওঠে।—এখন ছেলেপুলে হলেও দেবিকার স্বাস্থ্যের কোন বিপদ দেখা দেবে না। বরং ভালই হবে।

গিরিডির এ বাড়ির প্রাণটা এইবার এতদিনে যেন একটা দুঃস্বপ্নের গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। আর দুঃখ করবার, ভয় করবার, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। মেয়েটার তো বলতে গেলে পুনর্জন্ম হয়েছে। দেবিকার ভাগ্য আর বিভূতি ডাক্তারের চিকিৎসা এ বাড়ির মেয়ের অকাল মরণের অভিশাপ মিথ্যে করে দিয়েছে। সুমন্তর জীবনটাও একটা শূন্যতার আঘাত থেকে বেঁচে গেল।

মোহিতবাবু চিঠি দিয়ে সুমন্তকে জানিয়ে দিতে দেরি করেন না, দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তার আগে বিভূতি ডাক্তার নিজেই সুমন্তকে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন—তুমি এখন দেবিকাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে পার। দেবিকার স্বাস্থ্যের সব বিপদ কেটে গিয়েছে।

মোহিতবাবুর কাছে, বিভূতিকাকার কাছে, আর দেবিকারও কাছে চিঠি দিয়েছে সুমন্ত। কিন্তু স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি, ঠিক কবে গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাওয়া যাবে, আর ঠিক কবে দেবিকাকে সিজুয়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। একটা অসুবিধে আছে, সিজুয়া কোলিয়ারির ম্যানেজারের বাংলোটা সুবিধের নয়। এটা একটা পুরনো ফাটলধরা বাড়ি। নতুন বাংলো তৈরি হচ্ছে।

জয়া একটু বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, না হয় পুরনো বাড়িই হলো, তাতে কি এসে যায় ? অন্তত একটা ভাল ঘর তো আছে। দুটো প্রাণীর থাকবার পক্ষে একটা ভাল ঘরই যথেষ্ট।

দেবিকা হেসে ফেলে—সে যখন মনে করছে অসুবিধে আছে, তখন অসুবিধে আছেই। তা ছাড়া, এত ব্যস্ত হবার কী আছে ?

লক্ষ্মীমামী যেদিন আবার গিরিডির বাড়িতে এলেন, সেদিন জয়া আর মোহিতবাবু তাঁদের মনের কথাগুলি খুলে বলবার সুযোগ পেলেন। এখন সুমন্ত একবার এলেই তো পারে। আর

তো কোন ভয় নেই। বিভূতি ডাক্তার বলেছেন আর কোন সাবধানতার দরকার নেই।

লক্ষ্মীমামীর চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। না, আর ওদের প্রাণের ইচ্ছার উপর সেই ভয়ানক নিষ্ঠুর পাহারা রাখবার দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে। মনে পড়ে লক্ষ্মীমামীর, সে রাতে দেবিকার ছলছল চোখের তারাতেও যেন আগুনের রেখা ঝলসে উঠেছিল। বাধা দিতে গিয়ে লক্ষ্মীমামী সেদিন নিজেও কেঁদে ফেলে ছিলেন। আজ আর কোন সন্দেহ নেই, যে বিয়ের কোন মানে ছিল না, সে বিয়ের এখন খুবই মানে হয়।

লক্ষ্মীমামী খুব তাগিদ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, তাই সুমন্ত এসেছে। কিন্তু দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত আর দেবিকা দুজনে শুধু বাইরের ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি মিনিট মাত্র কথা বলেই চুপ করে গেল। সুমন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় আর বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেবিকা উপরতলায় উঠে যায়। যেন অপরিচিত দুটো মানুষ হঠাৎ মুখোমুখি দেখার ঘটনাকে শুধু একটা আলাপ করেই শেষ করে দিল।

সে রাতে ছিল আকাশভরা আলো, আজকের এই রাতে শুধু আকাশভরা কালো। কিন্তু গিরিডির এবাড়ির প্রাণে সে রাতের সেই করুণ আতঙ্ক আর নেই। তাই নীচতলার একটি ঘরের একটি খাটে নতুন করে বিছানা পাতা হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্মীমামী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, রাত দশটা বেজে গিয়েছে, তবু দেবিকা এই ঘরে ঢোকেনি। বারান্দার শেষ প্রান্তের ছোট ঘরের ভিতরে দরজার কাছে আর বাগানের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে দেবিকা।

সুমন্ত কোথায়? দেখলেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত তখনও বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে বই পড়ছে। লক্ষ্মীমামী বলেন—রাত হয়েছে, তুমি এখন ওঘরে যাও সুমন্ত।

দেবিকারও কাছে এসে লক্ষ্মীমামী বলেন—এখানে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ওঘরে যা। অনেক রাত হয়েছে।

দেবিকা বলে—না।

—কি?

—ওঘরে যাব না।

—কেন?

—বিশ্রী লাগছে।

ধমক দেন লক্ষ্মীমামী—বাজে কথা বলো না। যাও, এখনি যাও।

চলে গেলেন লক্ষ্মীমামী। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বুঝতেও পারেন না, এ আবার কোন্ সমস্যা? কিসের অভিশাপ?

মোহিতবাবু আর জয়া, আর লক্ষ্মীমামী, তিনজন তিনটি স্তব্ধ আতঙ্কের মূর্তির মতো উপরতলার একটি ঘরে বসে থাকেন আর রাত জাগেন। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেন, এতক্ষণে বোধহয় নীচেরতলার বাইরের ঘরের আলো নিভেছে, সুমন্ত শোবার ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু দেবিকা কি এখনও ওর বেয়াড়া অনিচ্ছা নিয়ে ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে?

নীচের তলায় এসে দেখতে পেলেন লক্ষ্মীমামী, সুমন্ত তখনও বই পড়ছে, আর দেবিকা তেমনি দূরের ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আজকের এই অমানিশা যেন একটা নতুন অভিশাপ। সুমন্ত আজ দেবিকার জীবনের ভয়। দেবিকা আজ সুমন্তর জীবনের ভয়। আর, বাসরঘরের মতো ওই ঘরটা যেন একটা কারাগারের যাবজ্জীবন শাস্তির কুঠুরি। ওঘরের ভিতরে ঢুকতে দু'জনের কারও মনে একটুও আগ্রহ নেই।

লক্ষ্মীমামী আর ডাকাডাকি করে এই ভয়ানক অমানিশার স্তব্ধতাকে ভেঙে দেবার সাহস

পেলেন না। কিন্তু আজও আবার চোখ মুছলেন। উপরতলায় উঠে গিয়ে মোহিতবাবু আর জয়ার কাছে একটা কথা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন।—না, এমন বিয়ের কোন মানে হয়

অনাত্মিক

এক যে আছে একানড়ে...।

এই একানড়ে কিন্তু তালগাছে চড়ে থাকে না। তার দাঁত দুটো মুলোর মতো নয়। পিঠখানাও কুলোর মতো নয়। ইনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, চমৎকার চেহারা, গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

কোমরে বিচুলির দড়ি; বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি। না, এই একানড়ের কোমরে ওরকমের কোন বিদ্ঘুটে জঞ্জাল কেউ কখনও দেখতে পায়নি। বরং মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিশেষ করে শীতকালের দুপুরে কিংবা বিকেলে, একটি বাদামী রঙের আলোয়ান কোমরে জড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন এই একানড়ে। অফিস থেকে সোজা বাড়ি। মাঝপথে কোথাও থামেন না, আশেপাশের কোন বাড়ির দিকে তাকান না। লোকের বাড়ি-বাড়ি বেড়াবার জন্যে এই একানড়ের মনে কোন সাধের তাগিদ নেই।

সুকিয়া স্ট্রীটের এক গলির একটি বাড়িতে অনন্ত মিত্তির নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁরই বিশেষ একটি দুর্নাম বা সুনাম এই যে, তিনি একটি অদ্ভুত একানড়ে।

অনন্ত মিত্তির নামে এই ভদ্রলোক একলা থাকতে ভালোবাসেন। পাড়ার কোন উৎসবের ধারে-কাছেও আসেন না। ছেলেদের ক্লাবের কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিতেও তাঁর বেশ আপত্তি দেখা যায়। যদিই বা, অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু' একটা টাকা চাঁদা কখনও দিয়েছেন, তবে বেশ গম্ভীর হয়ে আর মুখ ফিরিয়ে রেখে সেই চাঁদার টাকা জানালা দিয়ে বাইরে ছেলেদের হাতে ফেলে দিয়েই ঘরের ভিতরে সরে গিয়েছেন। রসিদ নেবার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেননি। রসিদ নেবার জন্য কোন আগ্রহও তাঁর নেই।

রসিদের কাগজটা জানালার ফাঁকে রেখে দিয়ে ছেলেরা চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে, অনন্তবাবু নিজেই এসে সেই রসিদের কাগজটাকে টোকা মেরে জানালার বাইরে ফেলে দেন। কাগজটা যেন বাইরের পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের একলা সুখী জীবনটাকে একটা সম্পর্কের বন্ধন দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। একটুও পছন্দ করেন না অনন্ত মিত্তির। ক্লাবের ছেলেরাও অনন্তবাবুর এই নির্লিপ্ততা একটুও পছন্দ করেন না। ছেলেরাই ঠাট্টা করে কথাটাকে রটিয়েছে—একানড়ে।

গলির একুশ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা অনন্ত মিত্তির বাইশ বছর ধরে এই বাড়ির ভাড়াটে হয়ে দিন কাটিয়েছেন। পাড়ার জীবনে মাঝে মাঝে মেলামেশার আলোড়ন জাগে। কোন বাড়িতে বিয়ে, কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ। অনন্তবাবুও নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। টালিগঞ্জের মানুষও ঝড়-বৃষ্টি বাধা উপেক্ষা করে নিমন্ত্রণের প্রীতিভোজে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু পাড়ার মানুষ অনন্তবাবু আসেননি। সকলেই জানেন, হঠাৎ অসুস্থতা নয়, কোন জরুরী কাজের চাপও নয়, অনন্তবাবু ইচ্ছে করেই আসেননি।

কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে, অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা, আর মেয়ে শুভা, দুজনেই এসেছে।

একুশ নম্বর বাড়ির এই দুটি মানুষ কোন নিমন্ত্রণের আহ্বান তুচ্ছ করবে না। কিন্তু একথাও কারও জানতে বাকি নেই যে, অনন্তবাবু তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের এই সব সামাজিকতার হৈ-চৈ একটুও পছন্দ করেন না। জানতে কোন অসুবিধে ছিল না ; কারণ রেণুকা নিজেই উৎসবের বাড়ির মেয়েমহলের জিজ্ঞাসার দাবি শান্ত করতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছেন, আসতে কেন দেরি হলো। —আসতে কি দেয় ? শেষে একরকম ঝগড়া করেই চলে এসেছি।

তবে আর জানতে ও বুঝতে কিসের অসুবিধে আছে ? অনন্তবাবু চান, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েও একানড়ে হয়ে, এই পাড়ার মধ্যে ভিন্নতর একটি একলা-জগৎ সৃষ্টি করে দিনগুলি কাটিয়ে দিক।

অনন্ত মিত্তিরের এই বাড়ি, এই একুশ নম্বর, এই ভাড়া-বাড়ির ঘর বলতে একটি মাত্র ঘর। ঘরটি অবশ্য ক্ষুদ্র নয়, ঘরের বারান্দাও দৈর্ঘে-প্রস্থে বেশ বড়। তবু শুধু একটি চেয়ার।

ক্লাবের ছেলেরাও বুঝে নিয়েছে, বাইরের মানুষ এখানে এসে যেন দশটা মিনিটও বসে থাকবার মতো কোন ঠাঁই না পায়, সেই জন্যেই একানড়ে অনন্ত মিত্তির সাবধান হয়ে এই একটি মাত্র চেয়ার রেখেছেন। যদি হঠাৎ বাইরের দু'জন ভদ্রলোক অনন্তবাবুর এই বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ান, তবে তাঁরা বসবেন কোথায় ? এরকমের কোন প্রশ্ন অনন্তবাবুর মনে নেই। অনন্তবাবু চান না যে, বাইরের মানুষ হঠাৎ এসে একটা ভাল কথার ছুতো করে তাঁর বাড়িতে ভিড় করে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তিনি ওই একলা চেয়ারটির উপর চুপ করে বসে থাকতে আর ভাবতে ভালবাসেন।

পাড়ার আশপাশের বাড়ির বয়স্ক ভদ্রলোকেরা ঠাট্টা করে অন্য একটা কথা বলেন—স্বামী একলানন্দ। অনন্তবাবু সম্পন্ন অবস্থার মানুষ নন। দেশী মার্চেন্ট অফিসের কনিষ্ঠ পদের কেরানী ; কত টাকাই বা মাইনে পান ? কিন্তু মনে হয়, যা পান তাতেই তিনি প্রসন্ন। এই বাইশ বছরের মধ্যে পাড়ার কোন মানুষের কাছে তিনি কখনও টাকা ধার চেয়েছেন এমন ঘটনার কথা কেউ কখনও শোনেনি। অনন্ত মিত্তির কাউকে কখনো একটি পয়সা ধার দিয়েছেন বলেও কেউ শোনেনি। ভদ্রলোক কারও উপকার নেন না, কারও উপকার করেন না। সত্যিই মনে-প্রাণে বিশুদ্ধ একটি একলানন্দ।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়িতে এসেই শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু, ঘরের ভিতরে অনেক মানুষের কলরব।

কে ওরা ? কেনই বা ওরা আসে আর এরকম একটা উৎপাত বাধিয়ে সন্ধে পর্যন্ত ঘরের ভিতরে বসে থাকে। বেশ বিরক্ত হয়ে আর ক্ষুব্ধ হয়ে বারান্দার সেই একলা চেয়ারটির উপর বসে থাকেন অনন্তবাবু।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে অনন্তবাবুর মেয়ে শুভা—একটু জিরিয়ে নাও বাবা, তারপর চা খেও।

—তার মানে এই যে, আমার চা পেতে এখন বেশ দেরি হবে ? অনন্তবাবুর কথার মধ্যে আর গলার স্বরে আন্তরিক বিরক্তিটা আরও তীব্র হয়ে বেজে ওঠে।

শুভা বলে—হ্যাঁ, একটু দেরি হবে।

—কেন ?

—পেয়ালা নেই।

—তার মানে ?

—তার মানে, কমলা মাসিমাকে চা দেওয়া হয়েছে।

অনন্তবাবুর এই সংসারে যে একটি মাত্র চায়ের পেয়ালা আছে, সে পেয়ালা এখন অভ্যাগতা কমলা মাসিমার হাতের কাছে রয়েছে। সুতরাং অনন্তবাবুর চা পেতে একটু দেরি হবে বইকি।

শুভার চা খাওয়া অভ্যেস নেই। শুভার মা রেণুকা অবিশ্যি চা খান। কিন্তু অসুবিধে নেই। সে জন্যে দ্বিতীয় একটি পেয়ালার দরকার হয় না। অনন্তবাবুর চা খাওয়া সারা হলে পেয়ালাটা যখন মুক্তি পায়, তখন রেণুকা সেই পেয়ালাতে নিজের চা ঢেলে নেন। কোন সমস্যা নেই।

এখনও বাইরের যাঁরা ঘরের ভিতরে বসে আছেন আর গল্প গুঞ্জন ও হাসাহাসির উৎপাত সৃষ্টি করছেন তাঁদের মধ্যে শুধু নরহরিবাবুর স্ত্রী কমলার চা খাওযার অভ্যাস আছে। সুমতির মা, মনোজের কাকিমা আর জয়া কাজল শান্তি ওরা কেউই চা খায় না। ওবা এই কথা বলেছে বলেই অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাস করেছেন যে, সত্যিই ওরা চা খায না। কিন্তু ভুল বিশ্বাস। ওরা জানে, একলানন্দ অনন্তবাবুর বাড়িতে একটি ছাড়া দুটি পেয়ালা নেই। বেচারা রেণুকা মাসিমা অসুবিধেয় পড়বেন, অপ্রস্তুত হবেন, এক-এক করে একটি পেয়ালাতে এতগুলি মানুষকে চা খাওয়াতে গিয়ে হয়রান হবেন, তাই ওরা আগেই মিথ্যে কথা বলে সমস্যাটাকে মিথ্যে করে দিয়েছে।

অনন্তবাবুর বিরক্তির সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার ভাবও আছে। ওরা চা নাই বা খেল, কিন্তু খাবাব কি খায়নি ? রেণুকা কি অন্তত একটি টাকার সিঙ্গাড়া আনিয়ে ফেলেনি ? অনন্তবাবুর এই দুশ্চিন্তার সবই বর্ণে বর্ণে সত্য।

শুভাও বলে--আর সবাই শুধু খাবার খাচ্ছে , চা খাবে না।

অনন্তবাবু—কী খাবার ?

শুভা—সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ।

অনন্তবাবু—কত টাকার ?

শুভা—দু' টাকা।

অনন্তবাবু—বেশ ! চমৎকার !

দুটি টাকা ক্ষয় করিয়ে দিয়ে এই উৎপাত বড় জোর আর পাঁচ মিনিট পরেই সরে যাবে। যাই হোক, একটা বিরক্তির ব্যাপার হলেও, দুঃসহ রকমের কোন ভযের ব্যাপার নয়। চা খাওয়া এবং তারপর আরও একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকবার পর প্রসন্ন হতে পারবেন অনন্তবাবু। এ ধরনের উৎপাত অনন্তবাবুর জীবনের বড়রকমের কোন ভয় নয়। রেণুকাকে শুধু একটু বুঝিয়ে বললেই হবে—একটু হাত টান করে চলতে শেখ। ভুলে যেও না যে, মেয়ের বিযে দিতে হবে ; সে জন্যে অন্তত আটটি হাজার টাকার জোগাড রাখতে হবে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন অনন্তবাবু। দরজার কাছে যেন কোন আগন্তুকের পায়ের শব্দ বেজে উঠেছে। তবেকি সেই উৎপাতটা আবার এসেছে ? সেই দুঃসহ উৎপাত ? অনন্তবাবুর এই একলা জগতের ভিতর ভয়ানক একটা অনধিকার প্রবেশ।—না, সেই উৎপাতটা নয় ! লেংড়া আমের ঝুড়ি মাথায় করে একটা ফেরিওয়ালা এসেছে।

—না, আম চাই না। ফেরিওয়ালাকে হাঁকিয়ে দিয়ে অনন্ত মিস্তির আবার তাঁর জীবনের সব চেয়ে প্রিয় ভাবনার মধ্যে একলা হয়ে বসে থাকেন।

মেয়ের বিয়ের জন্যে আটটি হাজার টাকার সঞ্চয় এখন প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। কাজেই, অনন্তবাবু যেমন একটু নিরুদ্বিগ্ন হয়েছেন, তেমনই একটু বেশি সবিধানও হয়েছেন। এই সঞ্চয়ের উপর যেন কোন আঘাত না পড়ে। সংসারের খরচের টাকা আগে রেণুকার বাক্সে থাকতো। কিন্তু রেণুকার স্বভাবের একটি গোপন সত্য একদিন হঠাৎ জানতে পেরে সাবধান হয়ে গিয়েছেন অনন্তবাবু। সুমতির বিয়েতে বারো টাকা খরচ করে একটি ধনেখালি শাড়ি আশীর্বাদী দিয়েছিলেন রেণুকা। অনন্তবাবুকে না জানিয়ে, দত্তবাবুর ছেলে নৃপেনকে দিয়ে এই

শাড়ি কিনিয়েছিলেন রেণুকা।

জানতে পেরে সেই যে সাবধান হয়ে গেলেন অনন্তবাবু, তারপর থেকে রেণুকার হাতের নাগালে পাঁচ টাকার বেশি একটি টাকাও আর রাখতে দিতে পারেননি।

কলেজে পড়ছে শুভা। শুভার বড়মামা জানিয়েছেন, ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু অন্তত আটটি হাজার টাকা খরচ করতে হবে। তা না হলে এখানে শুভার বিয়ে সম্ভব হবে না। নগদ বরপণের দাবি নেই কিন্তু বড় ঘরের সঙ্গে কাজ করতে হলে দানসামগ্রীর কিছু বড়ত্ব চাই। মেয়েকে অন্তত ত্রিশ ভরি সোনার অলঙ্কারে সাজিয়ে দিতে হবে। বরযাত্রীর সংখ্যাও কম করে একশো জন হবে। কাজেই. ।

অনন্তবাবু জবাব দিয়েছেন, রাজি আছি। পাত্র দেখতে শুনতে ভাল, পাত্র বেশ বিদ্বান রোজগার ভাল, কলকাতাতে তিনতলা বাড়ি আছে। সুখে থাকবে শুভা। অনন্তবাবু আপত্তি করবেন কেন ?

আপত্তি দূরে থাকুক, এটাই যে অনন্তবাবুর জীবনের একমাত্র কামনার ধ্যান। যাঁরা অনন্ত মিত্তিরকে একলানন্দ বলেন কিংবা একানড়ে বলে ঠাট্টা করেন, তাঁরাও জানেন যে, ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের কোন সুখের বা সাধের আবদারের কাছে কিন্তু একটুও কৃপণ নন।

রবিবারের সকালবেলাতে বন্ধু শুভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জয়া নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখেছে, তাতে জয়ার দু' চোখে অদ্ভুত এক বিস্ময়ও চমকে উঠেছে। বারান্দার এক কিনারায় বসে অনন্ত মিত্তির ব্যস্তভাবে দু'হাতে চালিয়ে তাঁর মেয়ের জুতো পালিশ করছেন।

বাপের আদুরে মেয়ে কতই তো দেখা যায়। আর আদুরে মেয়ের বাপও তো কতই আছে। কিন্তু অনন্ত মিত্তির যেসব কাণ্ড করেন, তার তুলনা নেই বললেই চলে। শুভা চেঁচিয়ে আপত্তি করে, রাগারাগি বকাবকিও করে, কিন্তু অনন্তবাবু যেন কিছুই শুনতে পান না। জ্বরের শরীর নিয়ে বিছানার উপর চুপ করে বসে শুভার শাড়ির ছেঁড়া আঁচল সেলাই করেন।

শুভা কোন দাবি করে না, তবু শুভার জন্য বাজার থেকে হালফ্যাশনের দামী শাড়ি কিনে আনেন অনন্তবাবু। যখনই শুভাকে দেখতে রোগা-রোগা মনে হবে, তখনই পাঁচ-সাত টাকা খরচ করে পুষ্টির মণ্ট কিনে ফেলবেন। মাঝে মাঝে অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে, আর বড়বাবুর কাছ থেকে বাড়ি যাবার অনুমতি নিয়ে, সোজা মেয়ে-কলেজের ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বৈশাখ মাসের দিন, তাই অফিসের কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও অনন্তবাবুর মনে একটা সন্দেহের প্রশ্ন ছটফট করে উঠেছে, মেয়েটা বোধহয় ছাতা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

ছুটির পর ফটকের বাইরে এসেই দেখতে পায় শুভা, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। শুভাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে শুভার মাথার উপর ছাতা ধরেন অনন্তবাবু। শুভা লজ্জা পেয়ে ছটফটিয়ে ওঠে—কী করছো বাবা ! আমাকেও বাবলু মনে করলে নাকি ? জয়া কাজল আর শান্তি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে থাকে।

মেয়ের বিয়ে হবে ; যেদিন থেকে এ কথা শুনেছেন রেণুকা, সেদিন থেকেই তাঁর চোখ দুটো যখন-তখন ছলছল করে। মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে একলা বসে বিড়বিড়ও করেন, নিজের কথা ভাবছি না—ভাবছি, এই মানুষটার কী দশা হবে ?

রেণুকার বাতের ব্যথা আজকাল আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে। তার উপর হার্টের অবস্থাও ভাল নয়। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে কাজের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, জোরে জোরে শ্বাস টানেন ; তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকবারও সামর্থ্য থাকে না। শুয়ে পড়েন। অনন্তবাবু অফিস থেকে ফিরে এলে রেণুকা আর নিজের হাতে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিতেও পারেন না।

কিন্তু শুভা আছে। অনন্তবাবুর প্রত্যেকটি দরকারের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য মেয়ে যেন কান পেতে আছে। অনন্তবাবু যদি ডাক না দেন তাতেই বা কি আসে যায় ? শুভা ঠিক সময়েই কাছে এসে দাঁড়াবে, বাজারের ঝোলাটি অনন্তবাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দেবে। এই যে একটানা তিন বছর ধরে উলের জামাটা গায়ে দিচ্ছেন অনন্তবাবু, সেটা শুভারই হাতের কাজ। অনন্তবাবু জানেন না, পাঁচদিনের মধ্যে এই জামাটি বুনেছিল শুভা। তা ছাড়া উপায় ছিল না। ধারণা করতে পারেনি শুভা, নভেম্বর মাসটা শেষ না হতেই শীতের মেজাজ এত প্রখর হয়ে উঠবে।

মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে পুরো দুটি গেলাস জল খাওয়া অনন্তবাবুর অভ্যেস। কিন্তু সেজন্যে অনন্তবাবুকে কোন সমস্যায় পড়তে হয় না। শুভা যেন ওর ঘুমের নিয়মটাকেও চেষ্টা করে গড়ে নিয়েছে। ঠিক মাঝরাতে শুভা উঠে এসে অনন্তবাবুর বিছানার কাছে দাঁড়ায়। অনন্তবাবুর নিবিড় ঘুমের স্বপ্নটাও যেন একটা স্নিগ্ধ স্পর্শের স্বাদ পেয়ে চমকে ওঠে। কারণ, অনন্তবাবুর কপালে হাত রেখে ডাক দেয় শুভা—বাবা, জল খাও।

রেণুকা বলে—আমাকে তো ভগবান যত রোগজ্বালা দিয়ে আধমরা করে রেখেছেন। এই সংসারের জন্যে আমি কতটুকু আর করতে পারি। যা করে মেয়েই করে। হাত মোছার গামছাটিও মেয়েই বাপের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এই মেয়ে যখন পরের বাড়ি চলে যাবে, তখন বাপের দশা কী হবে ?

কিন্তু অনন্তবাবুর আসন্ন ভবিষ্যতের দুঃখের ছবিটা কল্পনা করে শুধু রেণুকাই যত আক্ষেপ করেন। অনন্তবাবুর চোখের চাহনিতে, মুখের ভাষায়, কিংবা চিন্তার মধ্যে কোন আক্ষেপ নেই। বরং দেখা যায়, মেয়ের সুখের জীবনের রূপটাকেই কল্পনা করে করে অনন্তবাবু যেন তাঁর মন-প্রাণ বিচিত্র এক তৃপ্তি দিয়ে ভরে রেখেছেন। খবর পেয়েছেন অনন্তবাবু, শুভার ভাবী শ্বশুর জগৎবাবু নতুন গাড়ি কিনেছেন। জগৎবাবু নাকি বলেছেন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা দিন শুভাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবেন। মন্দিরের আরতি দেখে, আর ঘাটের সিঁড়িতে বসে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে নিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন।

এ তো নিতান্ত কল্পনার ছবি নয়, এ যে অনন্তবাবুর জীবনের এক সফল স্বপ্নের ছবি। লোকে না বুঝুক, রেণুকা কেন না বুঝবে, মেয়েকে ভালঘরে দেবার জন্যেই তো এই মানুষটা তার সারাজীবনের কেরানীগিরির সামান্য উপার্জনের উপর কঠোরভাবে খবরদারী করে কিছু টাকা জমাতে চেয়েছিল। নিজের গায়ের গরম জামার জন্যে উল কিনতে কি সহজে রাজি হয়েছিল এই মানুষ ? শুভা রাগ করে বাপের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছিল বলেই শেষে বাধ্য হয়ে সেই উল কিনেছিলেন বাপ।

রেণুকাকে মাঝে মাঝে বেশ কঠিন একটা খোঁচা মেশানো কথার আঘাত পেতে হয়। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে কি যেন ভাবেন অনন্তবাবু, তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার দশা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আমার মতো মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়াই ভাল ছিল। খুব ভুল করেছ তুমি।

রেণুকা—আমি ভুল করিনি।

অনন্তবাবু—জানি, তোমার বাবাই ভুল করেছিলেন। একই কথা। কিন্তু তোমার মেয়ের বাবা আর ভুল করবে না। খেয়েপরে সুখে থাকবে, এমন ঘর না পেলে মেয়ের বিয়ে দেব না।

ভাল ঘর পেতে হলে ভাল খরচ করতে হবে, এই সার সত্যটিকে খুব ভাল করে বুঝে নিয়েছিলেন অনন্তবাবু। স্মরণ করতেও ভুলে যাননি যে, রেণুকার বাবার পক্ষে টাকা খরচের সামর্থ্য ছিল না বলেই অনন্ত মিত্রের মতো পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়েছিলেন। কাজেই,

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনন্তবাবুর চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা গর্বের গম্ভীরতা থমথম করে।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে করতে গিয়ে মায়ের চোখ ভিজে যায় ; বাপের শুকনো চোখ কিন্তু খটখট করে। মেয়ের মা যেমন আগে তেমনি আজও বিশ্বাস করেন, মেয়ের বাপ এই ভদ্রলোকের মনটা সত্যিই লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা কঠিন মন। যে মেয়ে এই বাপের কাছে একটি সর্বক্ষণের মায়াব পুতুল, সে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে শূন্য হয়ে যেতে হবে, সেজন্যে মনের কোণে একটু ব্যথা বেজে ওঠে না। কোনদিনও দেখা গেল না যে ভদ্রলোকের চোখ দুটো একটু স্যাঁতসেঁতে হয়েছে।

অনন্তবাবু বরং সেই শুকনো চোখের চাহনি তীব্র করে নিয়ে আরও ভয়ানক একটা খোঁচা-মেশানো কথা রেণুকাকে শুনিয়ে দিয়েছেন।—আমি কাঁদবো কেন ? কাঁদবে তুমি, কারণ ভয় তোমার।

—কিসের ভয় ?

—শুভা চলে গেলে তোমার বাতের শরীরের খাটুনি আরও বাড়বে, এই ভয়।

—এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে ?

—যা দেখছি তাই বলছি।

—কি দেখছো ?

—ওই যে বসন্তদার মেয়েটা এলেই তুমি যেন হাতে স্বর্গ পাও।

হ্যাঁ, বসন্তদার মেয়ে চারু। আজ এক বছর ধরে এই মেয়েটাই অনন্ত মিত্রের জীবনের একটা দুঃসহ উৎপাত, একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। অথচ দেখতে পাওয়া যায়, রেণুকা এই মেয়েটাকে বেশ সহ্য করতে পারছেন। মেয়েটা যখন এ বাড়িতে আসে আর দু'চারদিন থাকে তখন রেণুকার জীবনটা যেন চমৎকার এক প্রিভিলেজ লীভের আনন্দে একেবারে অলস হয়ে যায়। রান্না থেকে শুরু করে দু'বেলা বারান্দা ধোওয়া পর্যন্ত সব কাজ এই মেয়েই করে, এমন কি শুভাকেও চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখে চারু, কোন কাজ করতে দেয় না।

সে-সময় এই বাড়ির একলাসুখী আর আপনমুখী জীবনের নিয়ম-টিয়ম সবই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায়। শুভা নয়, ওই চারু মেয়েটাই ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বলে—পান নাও কাকা।

অফিসে যাবার সময় চাদরটি কাঁধে ফেলে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অনন্তবাবু, খুবই তিক্ত অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখ। একটা পান মুখে দেবার ইচ্ছা থাকলেও সেকথা মুখ খুলে বলতে ইচ্ছেও করে না। বললেই তো ওই মেয়েটা তখুনি ব্যস্ত হয়ে পান সাজতে বসে যাবে। রেণুকা খাটের উপর বসে শুধু তাকিয়ে থাকবে, আর শুভটা গুণগুণ করে গান গাইবে। অনন্তবাবু একটুও পছন্দ করেন না যে চারু পান হাতে নিয়ে এভাবে ছুটে এসে কাছে দাঁড়ায়।

কে এই বসন্তদা যাঁর মেয়ে চারু ? অনন্তবাবুর কাছে বসন্তদা আজ একটা নাম মাত্র। আত্মীয় নন, ঠিক কুটুম্বও বলতে পারা যায় না, সম্পর্কের দিক দিয়ে বসন্তদা যেন একটা ছায়া-কুটুম্ব। শুধু মনে আছে, খুড়তুতো দাদার বিয়েতে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বরযাত্রী হয়ে নদীয়া জেলার এক গ্রামে যেতে হয়েছিল। সে গ্রামে তিন দিন থাকা হয়েছিল। আর নতুন বউদির এক মাসতুতো দাদার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। তিনিই বসন্তদা। সারা রাত জেগে বসন্তদার সঙ্গে তাস খেলা হয়েছিল। একদিন জাল নিয়ে বসন্তদার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরাও হয়েছিল। নৌকার লগি ঠেলেছিলেন বসন্তদা ; অনন্ত শুধু জাল ফেলে ফেলে সের দশেক কালবোশ আর ফলুই তুলেছিল। সেই বসন্তদা বলেছিলেন—আমার বিয়েতে নেমন্তন্নের চিঠি দেব অনন্ত ; আসতে ভুলে যেও না।

একদিন সেই বসন্তদার বিয়ের চিঠি এসেছিল ঠিকই ; কিন্তু বিয়েতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ পুরনো দিনের স্মৃতির মাত্র এটুকু বিবরণ স্মরণ করতে পারেন অনন্ত মিত্র। কিন্তু আর কিছুই জানেন না।

সেই বসন্তদা আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণের সেই চিঠির পর কোথায় ছিলেন, কি করতেন আর কতদিন বেঁচে ছিলেন বসন্তদা, কিছুই জানেন না অনন্ত মিত্তির। কোন দিন জানবার দরকারও হয়নি। চেষ্টা করলে বসন্তদার চেহারাটা আজ স্পষ্ট করে কল্পনা করতেও পারবেন না অনন্তবাবু।

শুভা যে নতুন হ্যান্ডিক্রাফট্‌ শিখেছে, তার জন্য ভাল শোলা চাই। শুভা নিজেই একটা ঠিকানা দিয়েছিল, বরানগরের এক দোকানের ঠিকানা, যেখানে এই শোলা পাওয়া যায়। সেই শোলা কিনতে গিয়েই তো বিপদ হলো।

বরানগরের পথে ছেলেবেলার বন্ধু মাধব সেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাধব সেন বললেন—আমাদের পাড়াতে তোমার এক বউদি থাকেন ; তিনি প্রাইমারী মেয়ে স্কুলের টিচার।

অনন্তবাবু আশ্চর্য হন—এরকমের কোন বউদি আমার নেই।

—কি আশ্চর্য, উনি যে তোমার নাম করে অনেক কথাই বললেন।

—কি বললেন ?

—আমার বাড়ি হেতমপুর শুনে উনি বললেন, ওঁর এক দেবর অনন্ত মিত্তিরও হেতমপুরের মানুষ। তখন বুঝলাম, তুমি ছাড়া হেতমপুরের অনন্ত মিত্তির আর কেই বা হবে ?

বিস্ময়ের কথা বটে। তাই মাধব সেনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বরানগরের বস্তিগোছের একটা পাড়ার একটি ঘরের দরজার কাছে এসে যাঁকে দেখতে পেলেন ও যাঁর পরিচয় পেলেন অনন্তবাবু, তিনি হলেন বসন্তদার বিধবা স্ত্রী। তিনি বললেন—আমি আপনাদেরই মঙ্গলা বউঠান।

ইচ্ছা ছিল না, তবু বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দিলেন অনন্তবাবু। মনের দিক থেকে কোন তাগিদ নেই, তবু মুখের কথায় মঙ্গলা বউঠানকে অনুরোধ করলেন—সময় করে আমাদের ওখানে যাবেন একদিন।

মঙ্গলা বউঠান ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে আর চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—চারু এদিকে আয় ; কাকাকে প্রণাম কর।

চারু আসে, অনন্তবাবুকে প্রণামও করে। এর পর হয়তো আরও দু'এক মিনিট থাকতেন অনন্তবাবু ; কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। কারণ, হঠাৎ যে-কথা বলে উঠলেন মঙ্গলা বউঠান, তারপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনন্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

মঙ্গলা বউঠান বললেন—এমন কাকা যখন মাথার উপর আছেন, তখন তোর কোন ভাবনা নেই চারু।—তখুনি একটা দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল অনন্তবাবুর। কিন্তু সামলে গিয়েছিলেন।

বয়স কুড়ি-একুশের কম নয়, দেখতেও ভাল, চারুর মুখের দিকে চোখ পড়তেই ভয় পেয়েছিলেন অনন্তবাবু। কোথাকার কোন্ এক বসন্তদা, যিনি আজ ভবপারে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তাঁরই মেয়ে এই চারু কেন যে বিধবা মায়ের জীবনের দুশ্চিন্তা হয়ে উঠেছে, সেটা কি বুঝতে একটুও দেরি হবার কথা ? চারুর বিয়ে হয়নি। আর এই মঙ্গলা বউঠানও কী সাংঘাতিক মতলবের মানুষ। এক কথায় পথের একটা মানুষকে মেয়ের কাকা বানিয়ে, সেই মেয়ের জন্যে সব ভাবনার দায় কাকার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

শুধু ভয় নয়, বিরক্তিও নয়, বেশ একটু ঘৃণাও বোধ করেছিলেন অনন্তবাবু। আর, কোন

কথা না বলে চলেও এসেছিলেন।

কিন্তু পালাবার পথ নেই, মঙ্গলা বউঠান আছে পিছে। এই মঙ্গলা বউঠান নিজেই চারুকে সঙ্গে নিয়ে অনন্তবাবুর এই বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন আব চলে গিয়েছেন। একদিন রেণুকার হার্টের কষ্ট দেখে নিজেই একটা ব্যবস্থা করে গেলেন মঙ্গলা বউঠান।—চারু ক'টা দিন এখানেই থাকুক। ঘরের সব কাজ চারুই করবে। তুমি একটুও ভেব না রেণু।

সত্যি কথা, রেণুকার ইচ্ছা ছিল, চারু ক'টা দিন থাকুক। শুভাবও খুব গরজ, চারুদি ক'টা দিন এবাড়িতে থাকুক।

কাজের সাহায্য হবে, হ্যাঁ, এই সুবুদ্ধিব ধাবণা বেণুকাব মনে অবশ্যই ছিল। আব শুভার মনে এই লোভও ছিল, চারুদি থাকলে যখন-তখন চারুদিব গান শোনা যাবে। চারুদিব গল্প বড মিষ্টি। চারুদি চমৎকাব করে খোঁপা বাঁধবাব আর্ট জানে।

এই এক বছরের মধ্যে এই চারু এই বাডিতে অন্তত দশবার এসেছে। কোন দিনও চিঠি দিয়ে চারুকে কখনও আসতে বলা হয়নি ; মেয়েটা নিজেই এসেছে। অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—কি ব্যাপার ?

চারু হাসতে থাকে—মা বললে, একবার গিয়ে দেখে আয়, তোর কাকিমা কেমন আছেন।

অনন্তবাবু—দেখলে তো, বেশ ভালই আছেন।

চারু আবার হাসে—না কাকা, কাকিমার হাঁটুতে একটা ব্যথা কনকন করছে, ভাল করে হাঁটতে পারছেন না।

—তা তুমি আর কি করবে ?

—আমি দুটো দিন থেকে যাই কাকা। শুভারও পরীক্ষার সময়। একা কাকিমা এই হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ঘরের কাজ সামলাবেন কি করে ?

বেণুকা বুঝতে পারে না, শুভার তো বুঝবাব মতো বুদ্ধিই হয়নি যে, মঙ্গলা বউঠান নামে এক মতলবের মহিলা কী ভয়ানক চাল চেলেছেন। কোথাকাব কোন এক বসন্তদা, তাঁর মেয়েব কাছ থেকে অনন্তবাবুর সংসাব উপকার নিতে গিয়ে কোন্ বিপদে জড়িয়ে পড়ছে, সেটা অনুমান করতে পাবেন অনন্তবাবু। এইবার একদিন হঠাৎ এখানে এসে মঙ্গলা বউঠান যখন দাবি করবেন, আমার মেয়ের বিয়ের খরচ দিন, তখন কী হবে ?

অনন্তবাবু বলেন—তুমি কেন মিছিমিছি বার বার ছুটে আস চারু, আমাদেব সুবিধে-অসুবিধে আমরাই বুঝবো। মঙ্গলা বউঠান তোমাকে এখানে যখন-তখন পাঠিয়ে দিয়ে বড়ই অন্যায় করেন।

চারু হাসে—আমিও তো তাই বলি। কিন্তু আমাকে উল্টে ধমকে দিয়ে মা বললে, আপনজনের দরকাবের কাজে নিজেই গরজ করে যেতে হয়। পর তো নয় যে চিঠি দিয়ে ডাকবে।

এসব কথার উত্তর দেওয়া অনন্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু বুঝতে পাবেন, খুবই কঠিন এক বুদ্ধির চক্রান্ত অনন্তবাবুর জীবনের এই সঞ্চয়ের দিকে হাত বাডিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে।

চারুর সঙ্গে খুব কম কথা বলেন অনন্তবাবু। চারু যখন এবাড়িতে থাকে, আর ঘুরঘুর করে সর্বক্ষণ কাজ করে, তখন সে দৃশ্য দেখতে একটুও ভাল লাগে না। মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়, জল খাওয়ার জন্য বিছানার ওপর উঠে বসেন তখন ব্যস্ত হয়ে কঠিন একটা ছায়া কাছে এসে কথা বলে—জল খাবে কাকা ?

শুভা নয়, চারু এসেছে। অনন্তবাবুর পিপাসাটাও যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। জল খাওয়ার স্পৃহাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু চারু জল নিয়ে আসে। অনন্তবাবুও জল খান।

চারু যে-ক'টা দিন এখানে থাকে তখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেই দেখতে পান অনন্তবাবু, ঘরের চেহারা ঝকঝক করছে। আর, বসন্তদার মেয়ে এই চারু উনানে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে বসে আছে।

—কাকিমা কোথায় ?

—সুমতি মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন।

—তোমার কাকিমার না হার্টের কষ্ট বেড়েছে ?

চারু হাসে—এবেলা ভাল আছেন।

—শুভা কোথায় ?

—জয়া এসেছিল, শুভা বোধহয় জয়াদের বাড়িতে গিয়েছে।

অনন্তবাবুর মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ যেন গর্জন করে উঠতে চায়। কী অদ্ভুত কাণ্ড। কোথাকার এক বসন্তদার মেয়ের কাছে এবাড়ির আত্মাটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। তাই মা আর মেয়ে দুজনেই বেড়াতে বের হয়েছেন। জীবনে কারও কাছ থেকে কোন উপকার গ্রহণ করেনি যে মানুষ, সে মানুষকে আজ বসন্তদার মেয়ের হাত থেকে চায়ের পেয়ালা তুলে নিতে হবে। মেয়েটাও অদ্ভুত, উনানের ধোঁয়াতে ছোট রান্নাঘরটা ভরে গিয়েছে ; তারই মধ্যে বসে আছে। মেয়েটাকে ভয়ানক এক উপকারের তপস্বিনীর মতো দেখাচ্ছে।

মঙ্গলা বউঠানের মতলবের কাছে হার মানবেন, তেমন মূর্খতার মানুষ নন অনন্তবাবু। তাঁর মনটাও নরম কাদা দিয়ে তৈরি কোন তুলতুলে পদার্থ নয়। চারুর জীবনের জন্য ভাবনা করবার কোন দায়িত্ব তাঁর নেই। মঙ্গলা বউঠান বুঝে নিন, তাঁর মেয়ের ভাগ্য কী বলে ? বিয়ে হবে কি হবে না ?

অনন্তবাবুর কথাতে কিংবা আচরণেও কোন ভুল হয়নি, হয়ও না ; হবেও না। বসন্তদার মেয়ে চারুর সঙ্গে ভুলেও একটা হাসির কথা কিংবা মায়ার কথা বলাবলি করেন না অনন্তবাবু। অনন্তবাবু জানেন, মঙ্গলা বউঠান আর তার মেয়ে এই চারু, দুজনেই ধূর্ত দুটি মতলবের প্রাণী, যারা মানুষের মনের কোন দুর্বলতা বা কোমলতার গন্ধ পেলেই পেয়ে বসবে। হয়তো আট হাজার টাকার চার হাজার টাকা এই ছলনার হাতে লুঠ করে নিয়ে সবে পড়বে। কোথাকার কোন্ বসন্তদার মেয়ে চারুর বিয়ে হয়ে যাবে ; আর নিজের মেয়ে শুভার বড়ঘরে বিয়ের আশাটা ছলনা হয়ে অনন্ত মিত্তিরের সবচেয়ে বড় সুখের স্বপ্নটাকেই ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

না, অসম্ভব। অনন্ত মিত্তির পাগল হয়ে গেলেও এমন ভুল করবেন না। এই চমৎকার চতুর কপটতার কাছে ঠকতে পারবেন না।

চারুকে দেখতে যেমন ভাল লাগে না, ভাবতেও তেমনি বেশ ঘৃণা বোধ করেন অনন্তবাবু। রেণুকাকে অনেকবার আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু—সত্যি কথা এই যে, চারুকে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি চাই না যে, কোন ছুতো করে চারু এখানে বার বার আসে আর থাকে। তোমরাও একটু সাবধান হও।

অনন্তবাবু নিজেই সবচেয়ে বেশি সাবধান হয়েছেন। শুভার বড়মামা যেদিন চিঠি দিলেন, এইবার প্রস্তুত হলে ভাল হয়, সেদিনই জবাব দিয়ে দিলেন অনন্তবাবু—আমি প্রস্তুত।

যাঁর মুখে কোনদিন হাসি দেখতে পায়নি পাড়ার কোন মানুষ, সেই অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক গর্বের তৃপ্তি হেসে ওঠে। পরম নিশ্চিন্ততার হাসিও বটে। এই হাসিটাই যে অনন্তবাবুর ভাগ্যের চরম লাভ। সব বাধা ব্যাঘাত জয় করতে পেরেছেন। মেয়েকে বড়ঘরে বিয়ে দিতে পারবেন। অনন্ত মিত্তির এইবার হাসিমুখ নিয়ে বাকি জীবন পার করে দিতে

পারবেন।

২

পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা দেখে আশ্চর্য হয়েছে, একানড়ে অনন্তবাবুর সেই গম্ভীর মুখ আর নেই। অনন্তবাবুর মুখে সব সময় হাসি ফুটে রয়েছে।

শুভার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড়মামা নিজেই এবাড়িতে এসে বিয়ের সব কাজ চুকিয়ে দিয়েছেন।

পাড়ার মানুষও খুশি হয়ে শুভার বিয়ের প্রীতিভোজ খেয়েছে।

কিন্তু মেয়ের বিয়ের দিনেও একলানন্দ অনন্তবাবুকে পাড়ার ভদ্রলোকেরা দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেন না। তিনি বাড়ির ভিতরেই ছিলেন। বিনা কাজে একাই ঘুরঘুর করছেন, আর বার বার এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছেন।

রেণুকার চোখ তো সকাল থেকেই ছলছল করেছিল। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখে হাসি। অদ্ভুত উজ্জ্বল হাসি। সকলেই বলছেন, খুব ভাল ঘরে শুভাকে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু। অনন্তবাবুর প্রাণের গর্ব না হেসে থাকতে পারবে কেন?

বিয়ের দিনে মঙ্গলা বউঠান এসেছিলেন। বিয়ের দিনেই চলে গেলেন। কিন্তু চারু থেকে গেল। রেণুকা একটা কথা কতবারই না বললো।—চারু না থাকলে আমার এই ভাঙা শরীরের হাড়গোড় কিছুই আর থাকতো না। উঃ, মেয়েটা দিনরাত কী খাটুনিই না খেটেছে।

কথাটা শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু, কিন্তু তাঁর মনে কোন বিকার নেই। তিনি শুধু একবার জবাব দিতে গিয়ে রেণুকাকে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন—চারুকে কেউ কি দিব্যি দিয়েছিল যে খাটতে হবে?

ভয়ানক এক গোঁয়ার বুদ্ধিহীনের বাজে কথার মতো এই কথাটা রেণুকার কানে লেগেছে। খুব আশ্চর্য হয়েছেন রেণুকা। বুঝতে পারেন না রেণুকা, চারু মেয়েটার সব কাজের মধ্যেই একটা অপরাধ আবিষ্কার করেন কেন এই ভদ্রলোক।

রেণুকা শুধু বলেন—কী অদ্ভুত মানুষ তুমি।

অনন্তবাবু বলেন—আমাকে গালমন্দ করো না। শুধু বিশ্বাস কর, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছ।

শুভা যেদিন চলে গেল, সেদিন রেণুকার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সুমতির মা নিজেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। কে না জানে, মেয়ে বিদায়ের দৃশ্যটা মেয়ে-মহলের চোখে কান্নাভরা করুণতা না জাগিয়ে পারে না।

কিন্তু মেয়ের বাপের চোখ কি এত শুকনো খটখটে হয়, আর এত হাসি নিয়ে ঝকঝক করতে পারে? লোকে জানে, পারে না। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে সকলেই বিরল বিস্ময়ের ব্যাপার দেখতে পেয়েছে, সত্যিই অনন্তবাবু হাসছেন। যেন বিজয়ীর গর্বের হাসি। যেন সারা জীবনের সাধনার সফলতার হাসি। শুভার শ্বশুর নতুন গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। সেই গাড়িতে স্বামীর পাশে বসে চলে গেল শুভা। রেণুকাকে একবার একলা পেয়ে কথাটা বলেও নিলেন অনন্তবাবু।—কাঁদবো কেন? মেয়েকে তো জলে ফেলে দিইনি যে কাঁদতে হবে।

সুকিয়া স্ট্রীটের গলিতে একুশ নম্বর বাড়ির অনন্ত মিত্তিরের জীবনে কোন ব্যথা নেই। শুভার তোয়ালেটার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন রেণুকা, কিন্তু অনন্তবাবু বারান্দায় পায়চারি করেন আর গুনগুন করে গান করেন।

শুভা নেই; কিন্তু চারু এখনও আছে। বিয়ের পর পাঁচটা দিন পার হয়ে গিয়েছে, তবু চারু

আছে।

কেন আছে চারু? নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পান না অনন্তবাবু।

অফিসে যাবার সময় হয়। চারু এসে অনন্তবাবুর হাতের কাছে পানের ডিবে এগিয়ে দেয়। শুভার একটা অভ্যাস ছিল, মাঝে মাঝে মিছরির সরবত তৈরি করে নিয়ে অনন্তবাবুর চায়ের পিপাসাটাকে বাধা দিত।—না, যা গরম পড়েছে, আর চা খেতে পাবে না। সরবত খাও বাবা।

কি আশ্চর্য, কোথাকার কোন্ এক বসন্তদার মেয়ে এই চারুও বলে—এই গরমে আর চা খেও না কাকা। সরবত খাও।

সরবত খান অনন্তবাবু; কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যান না, তুমি তো এবার বরানগরে চলে যাবে?

—হ্যাঁ কাকা।

সামান্য একটা কথা; কিন্তু এই সামান্য কথাটা বলতে গিয়ে চারু যেন মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। লজ্জা? কিসের লজ্জা? মঙ্গলা বউঠানের মতো ধুরন্ধরা নারীর মেয়ের মুখে এই লজ্জা একটুও মানায় না। পরের বাড়িতে থাকতে যদি কোন লজ্জার বাধা থাকতো, তবে বারবার এখানে এসে ঠাঁই নেবার এত চেষ্টা করতো না।

সেদিন রবিবার, অনন্তবাবু বাড়িতেই ছিলেন। সারা দুপুর ধরে অনন্তবাবুর কামিজের ছেঁড়াগুলিকে সেলাই করেছে চারু। বিকেল যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর হাতের কাছে সরবতের গেলাস এনে ধরেছে চারু। সন্ধ্যা যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর বিছানার চাদর বদলে দিয়েছে চারু।

রাত্রিবেলা সুজির পায়েস খেতে ভালবাসেন অনন্তবাবু। শুভারই কাজ ছিল, সুজির পায়েসটা শুভা নিজের হাতে তৈরি করতো। রেণুকার হাতে সুজির পায়েস ভাল হয় না। অনন্তবাবুর রাতের সুজির পায়েস আজও মিথ্যে হয়ে গেল না, যদিও শুভা নেই। চারু খুব ভাল সুজির পায়েস তৈরি করেছে।

মাঝরাতেও সেই একই ব্যাপার। শুভা নেই, তবু অনন্তবাবুকে জল খাওয়াবার জন্যে একটি মেয়ে ঠিক তাঁর বিছানার কাছে উপস্থিত হয়েছে। চারু নাকি? শুধু মৃদুস্বরে একটা প্রশ্ন করেন অনন্তবাবু। চারু বলে—হ্যাঁ, কাকা।

সকাল হয়েছে। অনন্তবাবু জেগেছেন, তবু শুয়ে আছেন। অনন্তবাবু জানেন, শুভা নেই, আজ আর শুভা চা নিয়ে আসবে না। ঠিক তখনই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে চারু।—ওঠো কাকা, মুখ ধুয়ে নিয়ে চা খাও।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু একটি চুমুক দিয়েছেন অনন্তবাবু, ঠিক তখন চারু আবার ঘরে ঢুকে অনন্তবাবুকে প্রণাম করে—যাই কাকা।

চারুর হাতে একটা ঝোলা। বেশ চমৎকার স্টাইল করে একটা শাড়িকে গায়ে জড়িয়েছে চারু। কি আশ্চর্য! বসন্তদার এই মেয়েকে সত্যিই যে মস্ত বড় এক বড়লোকের মেয়ের মতো দেখাচ্ছে।

এস, সামান্য একটা কথা। কিন্তু বলতে পারলেন না অনন্তবাবু। বলতে ইচ্ছেও নেই। যাও, কথাটা ভাল শোনায় না বলেই বলতে পারলেন না। অনন্তবাবু শুধু বললেন—হুঁ।

চলে গেল চারু।

রেণুকা ঘরে ঢোকেন।—খবরটা বোধহয় জান না?

—কিসের খবর?

—চারু আর এখানে আসতে পারবে না।

—কেন ?

—চারুর বিয়ে।

চমকে ওঠেন অনন্তবাবু। রেণুকা বলেন—চারুর মা সেদিন দুঃখ করে অনেক কথা বলে গেলেন।

—কি কথা ?

—টাকা-পয়সা না থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে। চারুকে খুব গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে হচ্ছে। বেশ বয়স্ক ছেলে, দেখতে শুনতে একটুও ভাল নয়, রোজগারও সামান্য। মোট কথা, বেশ অভাবের ঘর। বিয়েতে পাত্রপক্ষের কোন দাবি নেই, এক পয়সাও খরচ নেই ; কাজেই রাজি হয়েছেন মঙ্গলা বউঠান।

—এ কি রকমের ব্যাপার হলো ? অনন্তবাবুর হাতের পেয়ালা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

—যা হবার ছিল তাই হলো। চারুর জন্যে এর চেয়ে ভাল ঘর পাওয়া যাবেই বা কেমন করে ?

বেশ শান্ত সহজ স্বরে কথাটা বলেই পান মুখে দিলেন রেণুকা। কিন্তু অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে একটা যন্ত্রণার জ্বালা লালচে হয়ে ফুটে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠেন অনন্তবাবু—ভাবতে পারিনি, মঙ্গলা বউঠান যে এ-রকম সাংঘাতিক একটা মিথ্যুক।

পেয়ালার চা যেন পেয়ালাভরা গরম বিষ। তখনও ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বসন্তদার মেয়ে চারুর হাতের তৈরি সেই চা। পেয়ালাটাকে নামিয়ে রেখে দিয়ে কাঁপতে থাকেন অনন্তবাবু।—এ কি হলো ? চারু তবে এতদিন ধরে মিছি-মিছি এসব কাণ্ড করলো কেন ?

টিপ টিপ করছে অনন্তবাবুর বুকটা ! আর মুখটা যেন চাবুকের মার খাওয়া একটা মানুষেব মুখ।—কোথায় চারু ? একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ান অনন্তবাবু। জানালার গরাদ শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন। বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন, চলে যাচ্ছে বসন্তদার মেয়ে চারু।

—কি হলো ? ডাকবো চারুকে ? রেণুকা জিজ্ঞেস করেন।

—আর ডেকে কি হবে ? অভিমানী ছেলেমানুষের মতো মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্তবাবু।

চারু চলে যাবার পর দুটি ঘন্টা পার হয়ে যায়, তবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্তবাবু। রেণুকা এসে কতবার ডাক দিয়ে যান, এদিকে এস, বলো তো আবার চা করে দিই।

কিন্তু শুনতে পেয়ে থাকলেও সাড়া দিতে পারেন না অনন্তবাবু। একলাসুখী জগৎটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আর ভদ্রলোক নিজেও যেন বধির হয়ে গিয়েছেন।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে সুমতির বাবা আর মা একসঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের বাড়ির এই জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে গেলেন।

সুমতির বাবা বলেন—শত হোক্ মেয়ের বাপ তো বটে। না কেঁদে পারবেন কেন ?

—মেয়েকে তো জলে ফেলে দেননি, বেশ ভাল ঘরেই দিয়েছেন। তবে এত কান্না কেন ?

—কে জানে কেন !